মার্কসবাদ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণী

Ph.D.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়.

Dhaka University Institutional Repository

Ph.D.

382288

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতাবাদ ও আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ
[১৯২০-১৯৫০]

আকিমুন নেসা
[পিএইচডি রেজিস্ট্রেশন : ১৪ (১৯৮৬-১৯৮৭)]

পিএইচডি উপাধির জন্য উপস্থাপিত

১৯৯১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্র

বাস্তবতাবাদ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ (১৯২০–১৯৫০)
আকিমুন নেসার স্বলিখিত মৌলিক অভিসন্দর্ভ।
সন্দর্ভটিতে আকিমুন নেসা পরিচয় দিয়েছে মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যের:
তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ও ভাষ্যরচনায় প্রকাশ পেয়েছে তার অসাধারণ মেধা।
বাস্তবতার মতো দুরূহ ধারণাকে সে দার্শনিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে
মূর্ত ক'রে তুলেছে, এবং বাস্তবতাবাদের বিভিন্ন রূপ
ও ধারার যে-বিস্তৃত পরিচয় সে দিয়েছে, তা বাঙলা ভাষায় অভিনব।
বাস্তবতাবাদী তত্ত্ব ও উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ ব্যাখ্যায় তার শক্তি নিঃসন্দেহ।
আকিমুন নেসার অভিসন্দর্ভটি আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ
বৈশিষ্ট্যের অত্যন্ত মূল্যবান ভাষ্যরূপে গণ্য হবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

হুমায়ুন আজাদ

হুমায়ুন আজাদ
তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০ এপ্রিল ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

"বাস্তবতাবাদ ও আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ (১৯২০-৫০)" অভিসন্দর্ভটি দুটি ভাগে বিভক্ত : প্রথম চার পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে বাস্তবতাবাদ বিষয়ক তত্ত্ব এবং বাস্তবতাবাদের ইতিহাস; পঞ্চম থেকে দশম পরিচ্ছেদে উদঘাটিত হয়েছে আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ। বাস্তবতাবাদের তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কিত ধারণা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উপন্যাসে বাস্তবতাবাদ যেহেতু প্রথম বিকশিত হয় পাশ্চাত্যে, তাই পাশ্চাত্যে বাস্তবতা বিষয়ক যে-সমস্ত তত্ত্ব প্রস্তাবিত হয়েছে, তার সবই এ-অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে এবং বাস্তবতাবাদের বিভিন্ন ধারার স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। পাশ্চাত্য উপন্যাসে বাস্তবতাবাদের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন দেশে কীরূপ পরিগ্রহ করে, তাও নির্দেশ করা হয়েছে। এর ফলে বাস্তবতা ও বাস্তবতাবাদের রূপ সুস্পষ্টভাবে উদঘাটিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করি। তাত্ত্বিক আলোচনায় বাঙলা ভাষায় বাস্তবতা সম্পর্কিত ধারণা ও তর্কবিতর্কের পরিচয়ও বিশদভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এর ফলে বাঙালি লেখক ও চিন্তাবিদদের বাস্তবতা-ধারণার সম্পূর্ণ পরিচয় ধরা পড়েছে। পঞ্চম থেকে দশম পরিচ্ছেদে উদঘাটিত হয়েছে আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে উপস্থাপিত বাস্তবতার শ্রেণীসমূহ ও বাস্তবতার স্বরূপ। এ-অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত সময়ের সমস্ত প্রধান ঔপন্যাসিক ও তাঁদের সমস্ত প্রধান উপন্যাস গৃহীত হয়েছে। এটি যেহেতু এ-সময়ের উপন্যাসের ইতিহাস নয়, তাই সমস্ত উপন্যাস আলোচনার অর্ন্তভুক্ত করা হয় নি; করা হলেও আমাদের নির্দেশিত বাস্তবতার ধারাসমূহ ও বাস্তবতার স্বরূপের কোনো পরিবর্তন ঘটতো না। এ-অভিসন্দর্ভের শেষে যে-রচনাপঞ্জিটি দেয়া হয়েছে, সেটি আধুনিকতম পদ্ধতিতে প্রস্তুত। প্রতিটি রচনার বাঁ-পাশে রচনাটির প্রথম প্রকাশের তারিখ দেয়া হয়েছে এবং রচনাটির পরিচিতিতে অন্যান্য তথ্য দেয়া হয়েছে। রচনাপঞ্জিতে শুধু সে-সব রচনাই উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো অভিসন্দর্ভের পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে।

382288

এ-অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পন্ন হওয়ায় যিনি সবচেয়ে সুখী বোধ করতেন, এবং যাঁর হাতে এটি তুলে দিয়ে আমি সব চেয়ে সুখী বোধ করতাম, তিনি আজ আমার কাছ থেকে মহাকালের মতো সুদূরতম। তিনি আমার বাবা ওয়ালিউর রহমান, যাঁর হাত এটিকে কোনোদিন স্পর্শ করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

আমি কৃতজ্ঞ আমার তত্ত্বাবধায়ক কবি-সমালোচক-ভাষাবিজ্ঞানী-প্রাবন্ধিক প্রফেসর হুমায়ুন আজাদের কাছে, যাঁর স্নেহে ও তত্ত্বাবধানে আমার জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পেয়েছে । বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বে তাঁর অশেষ জ্ঞানের ফলেই আমার পক্ষে এ-অভিসন্দর্ভের তাত্ত্বিক অংশ রচনা সম্ভব হয়েছে । আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আমার শিক্ষক, সহ-উপাচার্য, প্রফেসর ওয়াকিল আহমদের কাছে, — তাঁদের সুপরামর্শের জন্য । ডঃ বেগম আখতার কামাল আমাকে বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন বলে তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ । অভিসন্দর্ভ রচনাকালে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আমার ছোট ভাই-বোনেরা-সোনামণি, রাহনুমা, লাবণ্য, এবং অন্তরঙ্গতম শিশুমণি । মা আমাকে ঘিরে রেখেছেন তাঁর এমন দুটি বাহু দিয়ে, যা আমার আজন্ম আশ্রয় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণার জন্য আমাকে একটি বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করেছে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ ।

আকিমুন নেসা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

বাস্তবতার স্বরূপ ঃ দর্শন ও সাহিত্যে ১

১.১ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনে বাস্তবতার স্বরূপ ১

১.১.০ দর্শন থেকে সাহিত্যে বাস্তবতাবোধের সংক্রমণ ১৩

১.২ সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপন তত্ত্ব ১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

সাহিত্যে বাস্তবতাবাদ ও বাস্তবতাবাদী আন্দোলন ২৭

২.১ সাহিত্যে বাস্তবতাবাদের বিকাশ ২৭

২.২ বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন তত্ত্ব ৪৪

২.৩ বাস্তবতাবাদী আন্দোলন ৬৬

২.৪ বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের লেখকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

প্রাকৃতবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ ৯৫

৩.১ প্রাকৃতবাদের উদ্ভব - বিকাশ ৯৫

৩.২ প্রাকৃতবাদী তত্ত্ব...... ১২১

৩.৩ মার্কিন প্রাকৃতবাদ ১৫৩

৩.৪ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী ধারা ১৬৬

৩.৫ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী তত্ত্ব ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

বাঙলা সাহিত্যে বাস্তবতার স্বরূপ ১৯৮

৪·১ উনিশ শতকে বাস্তবতার ধারণা ১৯৮

৪·২ রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতাবোধ ও বাস্তবতা-বিষয়ক বিতর্ক ২২০

৪·৩ আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বাস্তবতার বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ ২৩৫

৪·৪ শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাবোধ ও রক্ষণশীলদের সঙ্গে নৈতিকতা বিতর্ক.....২৬২

৪·৫ ১৩২১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বাস্তবতাবাদী বিতর্ক ২৭৪

৪·৬ বাঙালি আলোচকদের দৃষ্টিতে ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদ ও প্রাকৃতবাদ ২৯৬

৪·৭ আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বাস্তবতাবোধ ও বাস্তবতাবাদী বিতর্ক ৩০৬

৪·৮ রক্ষণশীল সমালোচকদের বাস্তবতা ধারণা ও সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা-বিষয়ক মতামত ৩৩২

৪·৯ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী বিতর্ক ৩৪৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ ঃ শ্রেণীকরণ ৩৭৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

পল্লীসমাজ ও জীবনের বাস্তবতা ৩৮৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ

উদভ্রান্ত-অস্থির ও কামনা-বিকার-ঘোরগ্রস্ত জীবনের বিচূর্ণ বাস্তবতা ৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ :

নগর ও শহরতলীর জীবনের বাস্তবতা ৫০২

নবম পরিচ্ছেদ :

রাজনৈতিক বাস্তবতা ৫৪১

দশম পরিচ্ছেদ :

ব্যক্তিগত ক্লেদ-ব্যাধি ও রসাতলের বাস্তবতা ৫৯০

র চ না প ঞ্জি ৬১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাস্তবতার স্বরূপ : দর্শন ও সাহিত্যে

১·১ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনে বাস্তবতার স্বরূপ ।

পাশ্চাত্যে 'বাস্তবতাবাদ'(Realism) কথাটি দর্শন থেকে সাহিত্যে গৃহীত হয় । তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যে বাস্তবতাবাদ শব্দটি যে-অর্থ জ্ঞাপন করে প্রাচীন পাশ্চাত্য দর্শনে শব্দটি সে-অর্থে ব্যবহৃত হয় নি ।[১] পাশ্চাত্য দর্শনে বাস্তবতাবাদ (Realism) কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন প্লেটো । তবে দর্শনে শব্দটি সব-সময় একই ধারণা প্রকাশ করে নি । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক শব্দটিকে বিভিন্ন, এমন কি বিপরীত ধারণা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করেছেন । আঠারো শতকে টমাস রীড প্রবর্তিত 'কাণ্ডজ্ঞান ধারা'-য় (Commonsence school) এসে শব্দটি বর্তমান তাৎপর্য পরিগ্রহ করে এবং এ-তাৎপর্যেই শব্দটিকে সাহিত্যিক সমালোচক ও শিল্পীরা গ্রহণ করেন ।[২] 'Real', 'Reality', 'Realism' শব্দগুলো প্রথম ব্যবহৃত হয় ভাববাদী দর্শনে । ভাববাদী দার্শনিকেরা 'Real' এবং 'Reality' শব্দ দুটি ব্যবহার করতেন এক কল্পিত আদর্শলোকের বাস্তবতা ও তার অস্তিত্ব বোঝাতে । ভাববাদীরা কিছু ধ্রুবভাবরাশিতে (Universals)বিশ্বাস করতেন । তাঁরা মনে করতেন এই বাহ্যজগত নয়, ধ্রুবভাবগুলোই 'Real' বা 'প্রকৃত বাস্তব' বা 'সত্য' ।[৩] আর এই বস্তুজগত হচ্ছে সেই পরম আদর্শ লোকের (Real world) প্রতিভাস ।

---

১. Grant, Damian, Realism, (Methuen, London and New York, Reprinted 1981), P.3.

২. Ibid, P.4

৩. Baldwin. James Mark, (ed.,) Dictionary of Philosophy and psychology Vol.11, (macmillan and company Ltd., New York & London, 1902) P.421.

Dhaka University Institutional Repository

প্লেটো থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভাববাদের সূচনা। প্লেটো এক কল্পিত আদর্শজগত, ধ্রুবভাবরাশি (Universals) ও মনকে সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করেছেন। প্লেটোর মতে এই ধ্রুবভাবরাশির অনুর্ভুক্ত হচ্ছে 'ভাব' (Idea), 'রূপ' (Form), 'নীতি' (Principle), 'বিধি' (Law) ইত্যাদি। প্লেটো মনকে গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিকই, তবে তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ধ্রুবভাবরাশি।[8] প্লেটোর মতে এই ভাবরাশিই সত্য বা বাস্তব (Real) এবং অনশ্বর; আর আমাদের চারপাশে ছড়ানো বস্তুরাশি ওই ভাবরাশিরই অপরিশুদ্ধ রূপ।[৫] ধ্রুবভাবরাশি হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের আদর্শ বা মানরূপ। প্লেটোর মতে এই অনশ্বর বিশুদ্ধ ভাবরাশি অবস্থান করে এক আদর্শ জগতে, আমাদের চারপাশের বস্তুরাশিতে কখনো সেই আদর্শলোকের ভাবরাশির বিশুদ্ধরূপ পাওয়া যায় না। প্লেটোর মতে এই জগতের কোনো কোনো বস্তুতে বিশুদ্ধ ভাবগুলোর কোনো-কোনোটি অপরিশুদ্ধ রূপে বিদ্যমান থাকলেও অধিকাংশ বিশুদ্ধ ভাবই এই জগতে বিমূর্ত ধারণা রূপে অবস্থান করে। যেমন, 'শয্যা' একটি ধ্রুবভাব (Idea), এর বাস্তব বা সত্য অস্তিত্ব রয়েছে আদর্শলোকে, আদর্শজগতের 'শয্যা'র ধারণাকে ভিত্তি করেই এই জগতের সূত্রধর শয্যা তৈরী করে। পার্থিব শয্যাগুলো ওই ধ্রুবভাবের অপরিশুদ্ধ বহিঃপ্রকাশ, আদর্শলোকের শয্যার অনুকরণ মাত্র। অন্যদিকে সৌন্দর্য, প্রেম, দয়া, ভালোত্ব, মন্দত্ব ইত্যাদি ভাবরাশিকে এ-জগতে শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ কোনো রূপে মূর্ত হতে দেখা যায় না, এগুলো বিমূর্ত ধারণারূপে অবস্থান করে। প্লেটো মনে করেন ধ্রুবভাবরাশিকে কখনোই আমাদের চারপাশের জগতে পাওয়া যাবে না। কারণ এই পৃথিবী নশ্বর ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাঁর মতে যা কিছু ধ্রুব ও সত্য তা কখনোই বিনষ্টিপ্রাপ্ত বা ক্ষয় প্রাপ্ত হতে পারে না। আমাদের পরিপার্শ্বে আমরা দেখি শুধু ক্ষয়, বিনাশ, ভাঙন ও পরিবর্তন, এর কোনো বস্তুই অপরিবর্তনীয় নয়। বাস্তব বা সত্য (Real) কখনো এতো বিনষ্টি বা বিবর্তনের মধ্যে থাকতে পারে না। সত্য বা বাস্তবের (Real) একটি বিকারহীন, সুনির্দিষ্ট ও ধ্রুবরূপ থাকতে হবে। সত্যের যদি অবিকৃত ও ধ্রুব রূপ না থাকে তবে তা সত্যই নয়। ধ্রুবভাবরাশি চির অপরিবর্তনীয়, অনশ্বর ও চির অস্তিত্বশীল। আদর্শজগত সকল বিনষ্টি মুক্ত। ধ্রুবভাবরাশি চির অবিকৃতরূপে চির অপরিবর্তনীয় ও স্থির আদর্শজগতে (Ideal world) অবস্থান করে।[৬]

---

৪. Patrick, George Thomas White, Introduction to Philosophy (George Auen & Unwin Ltd., London Revised, 2nd ed. 1961)

৫. Butler, J.Donald, Four Philosophies, (Harpas & Row, ?, 1968), P. 113.

৬. Baldwin. J.M, (ed.,) Dictionary of Philosophy and Psychology Vol.1 (The macmillan Company, New York, 1911) P.500.

Dhaka University Institutional Repository

প্লেটো এই বস্তুজগতকে ধ্রুব সত্যের (Reality) বা আদর্শজগতের প্রতিভাস বলে মনে করেন। কারন এই জগতের বস্তুরাশিতে ধ্রুবভাবের বিশুদ্ধ রূপ কিছু পরিমাণে মাত্র অভিব্যক্ত হয়, এই বস্তুরাশিতে ধ্রুব ভাবগুলোর পরিশুদ্ধ রূপ দ্যোতিত হয় না। প্লেটো এই বস্তুজগতকে প্রতিভাস বলে মনে করেন, কারণ এই জগত জুড়ে আছে বৈপরীত্য ও নানা খুঁত। প্লেটোর মতে যা প্রকৃত বাস্তব বা ধ্রুব (Real), তাতে কোনো খুঁত বা বৈপরীত্য থাকতে পারে না। আমাদের চারপাশের জড়জগতের বস্তু ও তার গুণরাশি নিয়ত পরিবর্তিত হয়, ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, বস্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বিশেষ একটি বস্তু এক সময় সুন্দর থাকে, আবার এক সময় ওই সৌন্দর্য বিনষ্টপ্রাপ্ত হয়। আবার কখনো একটি বৃহৎ বস্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে ক্ষুদ্রকায় হয়, তার রূপ বদলে যায়। এ-জগতের সকল বস্তুই রূপান্তরশীল ও নশ্বর। তাই এ-জগত প্রতিভাসের জগত। প্লেটো মনে করেন বস্তুর বিশুদ্ধ রূপের (Form) কোনো বদল বা ক্ষয় ঘটে না। বস্তুর চির অক্ষয় ও অপরিবর্তনশীল রূপই বস্তুর সত্য বা বাস্তব (Real) রূপ, এই সত্য বস্তু এই লৌকিক জগতে অবস্থান করে না, অবস্থান করে এক কল্পিত আদর্শ জগতে। এই পরম জগতকে শুধুমাত্র চেতনা বা মন দিয়ে বোধ করা সম্ভব।[৭] প্লেটোর কাছে বাস্তব হচ্ছে ওই কল্পিত আদর্শলোক ও ধ্রুবভাবরাশি।

গ্রীক দ্বৈতবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় দু ধরনের সত্য বা বাস্তবতার (Reality) অস্তিত্বে বিশ্বাসী। দ্বৈতবাদীরা মন ও পদার্থ এ-দুটি বিষয়কে সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করেন। তাঁরা মনের অস্তিত্বকে পদার্থের অস্তিত্বের মতোই সত্য বা বাস্তব (Real) বলে মনে করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন যে, পদার্থের মতোই মনেরও রয়েছে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।[৮] মন ও বস্তু (Mind and matter) পৃথিবীর দুই মৌল সত্য বা বাস্তবতা (Fundamental Realities)। দ্বৈতবাদী এনাক্সাগোরাস (Anaxagoras) বাস্তব বা সত্য বলে মনে করেন পরমাণু এবং মনকে। তিনি বলেন, এই পরমাণুর পৃথিবীতে পরমাণুর পাশাপাশি মনও শাশ্বত অস্তিত্বশীল। এই চিরায়ত সত্য উপাদানটি পৃথিবীর অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সহাবস্থান করে।[৯] গ্রীক দ্বৈতবাদী দার্শনিক থেলেস (Thales) ও তাঁর সহযাত্রী আয়োনীয় (Ionian) সম্প্রদায়ের কাছে বাস্তব বলে গণ্য হয়েছে তিন ধরনের পদার্থ। এগুলো হচ্ছে জল, বায়ু ও অগ্নি। তাঁদের মতে এই জড় পদার্থগুলোই প্রাণসৃষ্টির মূল উপাদান এবং এ-পদার্থগুলোই

---

৭. Ibid, P. 500

৮. Patrick, G.T.W, Ibid, P. 184

৯. Ibid, P. 183

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের সকল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের চালিকাশক্তি।[১০] তাই এই পদার্থগুলোই একমাত্র বাস্তব বা সত্য। দার্শনিক এমপেডোকেলস্ (Empedocles) অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, বায়ু-এই চারটি পদার্থকে বাস্তব বলে গণ্য করেন। সেইসঙ্গে ভালোবাসা ও ঘৃণা নামক দুটি অদৃশ্য আবেগেরও বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।[১১] সাধারণভাবে দ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা মন এবং পদার্থকে পৃথিবীর মৌল বাস্তবতা বলে গণ্য করেছেন, তবে তাঁরা কোনো একটি নির্দিষ্ট পদার্থকে বাস্তব বলে মনে করেননি, একাধিক পদার্থ-কে বাস্তব বা সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন। গ্রীক বহুত্ববাদী দার্শনিকেরা বহু বাস্তব বা সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বহুত্ববাদীদের মতে, বাস্তব একটি বা দুটি বিষয় মাত্র হতে পারে না, একটি অথবা দুটি বিষয়কে বাস্তব বলে মেনে নেয়া হবে একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত, কারণ এই বিশ্বে রয়েছে একাধিক বাস্তব বা সত্যের উপ-স্থিতি।[১২] প্লেটোকে বহুত্ববাদী দার্শনিক ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্লেটো মন ও আদর্শ জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, আদর্শলোকে অবস্থিত ধ্রুবভাবরাশির বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। দ্বৈতবাদী দার্শনিক-দের অনেককে, যাঁরা বহু পদার্থকে মৌল সত্য বা পরম বাস্তব বলে গণ্য করেছেন, এ-ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গ্রীক অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ধারাটি দ্বৈতবাদী তত্ত্বের বিরোধী। অদ্বৈতবাদীরা দ্বৈতবাদীদের মতো দু ধরনের সত্য বা বাস্তবের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাঁদের কাছে বাস্তব একটিই। অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ধারাটি জড়বাদ ও ভাববাদ এ-দুধারায় বিভক্ত। জড়বাদ বাস্তব বলে গণ্য করে পদার্থকে। এ-গোত্রের দার্শ-নিকেরা মনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (Democritus) ও লিউক্রিটাস (Lu-critus)জড়বাদী অদ্বৈতবাদীদের সূচনা ও বিকাশ ঘটান। এ-ধারার দার্শনিকদের মতে বাস্তব বা সত্য হচ্ছে পদার্থ। মন হচ্ছে পদার্থের এক রকম ক্রিয়া মাত্র, একে বাস্তব মনে করা নিরর্থক।[১৩] ভাববাদী অদ্বৈতবাদের অনুসারীদের কাছে একমাত্র বাস্তব হচ্ছে মন বা আত্মা। এ-গোত্রের দার্শনিকেরা বাহ্যজগত ও তার বস্তুরাশিকে প্রতিভাস বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, আমাদের মনে নানা বিষয়ে অসংখ্য ধারণা

---

১০. Ibid, P. 183.

১১. Ibid, P. 183.

১২. Ibid, P. 185.

১৩. Ibid, P. 184.

Dhaka University Institutional Repository

ও ভাব এসে জমা হয়, মনের এই ধারনাগুলোই আমাদের কাছে পদার্থরূপে প্রতিভাত হয়। তাই পদার্থগুলো প্রতিভাস মাত্র।[১৪] প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাববাদী দার্শনিকেরা 'Real', 'Reality', 'Realism' শব্দগুলো এক আদর্শলোকের ও আদর্শলোকে অবস্থিত ধ্রুবভাবরাশির বাস্তবতা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। ভাববাদে 'রিয়ালিজম,' 'রিয়ালিটি' 'রিয়েল' শব্দগুলো ধ্রুবভাবরাশির (Universals) সত্যতা বোঝাতো ও বিশেষের (Individual) সঙ্গে এই ধ্রুবভাবরাশির সম্পর্ক নির্দেশ করতো। ভাববাদ এই শব্দগুলো দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতো যে ধ্রুবভাবরাশি ও আদর্শলোক সত্য বা বাস্তব ব্যাপার।[১৫] মধ্যযুগে দুটি দার্শনিক গোত্র ভাববাদী এই বাস্তবতা ধারণাটির বিরোধিতা করে। এ-দুটি দার্শনিক ধারা হচ্ছে নামবাদ (Nominalism) ও ধারণাবাদ (Conceptualism) নামে পরিচিত। নামবাদীরা মনে করেন ধ্রুবভাবরাশি হচ্ছে নামমাত্র, এর কোনো বাস্তব বা সত্য (Real) অস্তিত্ব নেই। ধারণাবাদীদের মতে আদর্শলোক বা ধ্রুবভাবরাশি হচ্ছে এক ধরণের মন সাপেক্ষ ধারণা মাত্র, এদের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই।[১৬]

পাশ্চাত্য ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য ভাববাদী দার্শনিকেরা আমাদের এই বাহ্য বাস্তবকে প্রতিভাস বলে মনে করেছেন, ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিকদের অনেকেই এ জগতকে প্রতিভাস বা মায়া বলে গণ্য করেন। আদিকাল থেকে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদী দর্শনের পাশাপাশি জড়বাদী ধারাটি বিদ্যমান ছিলো। প্রাচীন শ্রেণীকরণ অনুসারে ভারতীয় দর্শন দুটি গোত্রে বিভক্ত: আস্তিক্য গোষ্ঠী ও নাস্তিক্য গোষ্ঠী। ভারতীয় দর্শন গড়ে উঠেছে বেদকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর কোনোটি বেদে বিশ্বাস করতো, কোনো কোনো গোত্রের ছিলো বেদে অনাস্থা ও অবিশ্বাস। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর বেদ-এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন শ্রেণীকরণটি করা হয়। যাঁরা বেদ-এ বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা আস্তিক্য গোষ্ঠীভুক্ত দার্শনিক সম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত হন, যাঁরা বেদ-এর প্রামাণ্য অস্বীকার করেন ও বেদকে পরম পূজ্য বলে গণ্য করেন নি তাঁদেরই নাস্তিক্য গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়। মীমাংসা, বেদান্ত, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায়

---

১৪. Ibid, P. 215

১৫. Baldwin, J.M,(ed.,) Dictionary of Philosophy and Psychology. Vol, 11, P. 421.

১৬. Grant, Damian, Ibid, pp. 3 - 4.

Dhaka University Institutional Repository

আস্তিক্য গোষ্ঠীভুক্ত। নাস্তিক্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত বা চার্বাক প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায়কে।[১৭] ভারতীয় দর্শনের এই সাবেকী শ্রেণীকরণ ছিলো অসম্পূর্ণ, কারণ এই শ্রেণীকরণ দার্শনিক গোত্রগুলোর একটি প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। চারিত্র্য অনুসারে ভারতীয় দর্শনকে তাই ভাববাদী ও জড়বাদী এই দু'ধারায়ও বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন আস্তিক্য গোষ্ঠীভুক্ত বেদান্ত দার্শনিক সম্প্রদায় ও প্রাচীন নাস্তিক্য গোষ্ঠীভুক্ত বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় ভাববাদী ধারার অন্তর্ভুক্ত। নাস্তিক্য গোষ্ঠীভুক্ত জৈন, লোকায়ত বা চার্বাক পন্থী দার্শনিকেরা, মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায় প্রভৃতি সম্প্রদায়কে জড়বাদী দার্শনিক ধারাভুক্ত করা হয়ে থাকে।[১৮] ভারতীয় ভাববাদ ঋণাত্মক (Negative) ও ধণাত্মক (Positive) এই দুটি ধারায় বিভক্ত।[১৯] ঋণাত্মক ভাববাদীরা মনে করেন এই বাহ্যবাস্তব ও তার বস্তুরাশির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। জড়পদার্থরাশি ও জড়পদার্থময় বাহ্যবাস্তব অলীক ও মায়া মাত্র। ধনাত্মক ভাববাদী মতে এই বাহ্যজগত আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। তাঁরা ঋণাত্মক ভাববাদীদের মতো বাহ্যজগতকে শূণ্য বা মায়া বলে গণ্য করে না, গণ্য করে প্রতিভাস রূপে।

ঋণাত্মক ভাববাদী ধারার অন্তর্গত বৌদ্ধ যোগাচার পন্থীরা মন বা চিত্তকেই একমাত্র বাস্তব বা সত্য বলে গণ্য করেন। এই দার্শনিক সম্প্রদায় মন বা চিত্ত বা চেতনার পরিভাষা রূপে ব্যবহার করে ' বিজ্ঞান' শব্দটি। এ-কারণে বৌদ্ধ যোগাচার দর্শনকে বিজ্ঞানবাদ বলে অভিহিত করা হয়।[২০] এই দার্শনিক সম্প্রদায় বাহ্যবাস্তবের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, তাঁরা পরম আদর্শলোকের সত্য (Real) অস্তিত্বেও বিশ্বাসী নন। তাঁরা এই জড়জগত কিংবা কল্পিত আদর্শলোক-কোনো কিছুকেই বাস্তব বা সত্য বলে গণ্য করে না। একমাত্র মনই সত্য বা বাস্তব। তাঁদের মতে বহির্জগত প্রকৃতপক্ষে আমাদের মানসিক ধারনা মাত্র, এর বাস্তব অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ যোগাচারবাদীরা বস্তু ও বাহ্যজগতের মননিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন।[২১] এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে, আমাদের চিত্ত বা মন একই সঙ্গে জ্ঞেয় বিষয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞান ক্রিয়া-এই তিনের কাজ করে। আমাদের চারপাশের বাহ্যপদার্থরাশি বস্তুতঃ বাস্তব অস্তিত্বশীল পদার্থ নয়, এগুলো অনুজ্ঞেয় পদার্থগুলোর প্রতিভাস। আমরা যেমন রজ্জুতে সর্পদর্শন কিংবা শুক্তিতে রজতদর্শনের মতো ভুল

---

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬

১৯. Nikunja Vihari Banerjee, The Spirit of Indian Philosophy,(Curgon Press, London,1975), P. 195.

২০. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৭

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

করি, তেমনি আমাদের মনোগত ধারণার প্রতিভাসরাশিকেই বাস্তব বা সত্য বলে ভুল করি।[২২] বৌদ্ধ মাধ্যমিক দার্শনিক সম্প্রদায় একমাত্র শূন্যতাকে সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করে থাকেন। মন বা চেতনা, জড়জগত, পরম ব্রহ্ম কিংবা আদর্শলোক কোনো কিছুই তাঁদের কাছে বাস্তব বা সত্য নয়। এই তত্ত্বানুসারীদের মতে আমাদের চার পাশের বহির্জগত কিংবা অন্তর্জগত সব কিছু শূন্য, মিথ্যা ও অস্তিত্বহীন। তাঁরা এই জগতকে প্রতিভাস বলে মনে করে না কারণ তাঁদের মতে, যা অস্তিত্বহীন ও শূন্যমাত্র তাকে প্রতিভাস বলা যায় না।[২৩] বেদান্ত বা অদ্বৈত বেদান্ত পন্থীরা আত্মন বা ব্রহ্মণকে একমাত্র বাস্তব বা সত্য বলে গণ্য করে। এ-ধারার দার্শনিক শঙ্করাচার্যের মতে, এই বস্তুজগত মায়া মাত্র, আত্মন্ বা ব্রহ্মণই একমাত্র বাস্তব বা সত্য। আমাদের অজ্ঞানতার কারণেই এই পরিদৃশ্যমান জগতকে আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই আমাদের এই অজ্ঞানতার কারণ। নির্গুণ ব্রহ্মই বাস্তব বা সত্য।[২৪] অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন অনুসারে এই পরিদৃশ্যমান জগত কিংবা এই জগতের যে কোনো বস্তুকে সত্য বা বাস্তব বলে মনে হলেও এই জগত ও বস্তুরাশি যে প্রকৃতই সত্য বা বাস্তব তা নিঃসংশয়ে বলা যায়না। অদ্বৈত বেদান্তপন্থীরা উদাহরণ হিসেবে বলেন যে একখন্ড শুক্তিকে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কাছে রজত বলে বোধ হয়, যদিও তা বাস্তবিকই রজত নয়, শুক্তি মাত্র, তবু আমাদের মন অনেক সময়ই শুক্তিকে রজত বলে মনে করছে। তেমনি আমরা যে বাহ্যবস্তুরাশি যথা, ঘট, পটমঠ ইত্যাদি দেখে থাকি, এই বস্তুরাশি সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও জ্ঞানকে যথার্থ ও সত্যজ্ঞান বলে বিশ্বাসও করি। বেদান্ত ভাববাদীদের মতে, বাহ্যজগত সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে সত্যজ্ঞান বলে প্রত্যয় হলেও তা যে শুক্তিতে রজত ভ্রমের মতো ভ্রম নয় তা কে নিশ্চয় করে বলতে পারে?[২৫]

ভারতীয় ভাববাদী দর্শন অনুসারে এই বাহ্যবস্তুর ও বাহ্যবাস্তব সম্পর্কিত সমস্ত জাগ্রত প্রত্যয়ই স্বপ্নপ্রত্যয়ের মতো নিরালম্ব ও ভ্রম মাত্র। ভাববাদীদের কোনো কোনো গোত্র বাহ্যবাস্তবের অস্তিত্বের অবাস্তবতা প্রমাণের জন্য স্বপ্নপ্রত্যয়ের উদাহরণ ব্যবহার করেন। স্বপ্নের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেখানে প্রত্যয় থাকলেও বহির্জগতে সে প্রত্যয়ের কোনো বাস্তব আলম্বন থাকে না। যেমন, যে-কেউ স্বপ্নে হাতি দেখতে পারে। কিন্তু স্বপ্নের

---

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা, ২৭৭। এবং Jadhunath Sinha, A History of Philosophy, (Sinha Publishing House. Cal-26, India, 1956) pp 218 - 219.

২৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭৮

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৮

২৫. প্রবোধচন্দ্র শর্মা, মায়াবাদ, (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৬), ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

এই হস্তীজ্ঞানের আলম্বন রূপে বাস্তব হস্তী নেই। বাহ্যবাস্তব সম্পর্কিত আমাদের সমস্ত জাগ্রত প্রত্যই স্বপ্নজ্ঞানের মতো নিরালম্ব। স্বপ্নের ভেতর যেমন স্বপ্ন প্রত্যয়কে মনে হয় সত্য ও বাস্তব, জাগ্রৎজ্ঞানেও একই ভাবে আমাদের কাছে বহির্বস্তুকে সত্য বা বাস্তব বলে প্রতীতি হতে থাকে। স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্ন প্রত্যয়কে সুনিশ্চিত সত্য বলেই বোধ হতে থাকে, অতএব জাগ্রদ্‌বস্থায় বাহ্য বাস্তব বিষয়ে জাগ্রৎপ্রত্যয়কে সুনিশ্চিত সত্য বলে বোধ হলেও, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে জাগ্রৎ প্রত্যয় সত্য বা বাস্তব।[২৬] ভাববাদীরা চিন্তা, ধারণা, জ্ঞান, মন ও পরম ব্রহ্মকে পরম সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করে। মন বা চেতনার সাহায্যে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ জ্ঞান, সত্য ও বাস্তব জ্ঞানলাভ করা সম্ভব।[২৭]

ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের পাশাপাশি জড়বাদী দর্শনেরও উন্মেষ ঘটে উপনিষদগুলোতেই। উপনিষদ-গুলোতে ভাববাদের পাশাপাশি এক আদিম বস্তুবাদী চেতনার পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে।[২৮] এই প্রাকৃত জড়বাদীদের কাছে পরম ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা বাস্তব নয়, তাঁরা অন্নকে চরম সত্য ও পরম সত্তা রূপে গণ্য করেছেন।[২৯] এই আদিম বস্তুবাদীরা উচ্চকণ্ঠে অন্নবন্দনা করেছেন। এই আদিম জড়বাদীরা বাহ্যবাস্তবের বাস্তবতা, জড়বস্তুর অস্তিত্বের সত্যতা প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেন নি। এ বিষয়ে তাঁদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ও অভিমত ছিলো বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবু তাঁরা উল্লেখযোগ্য এ-কারণে যে পরম ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়ে তাঁরা পার্থিব জীবনকে মায়া বা শূন্য বলে অগ্রাহ্য করেন নি। তাঁদের কাছে সত্য বা বাস্তব বলে মনে হয়েছে জড়বস্তুময় বাহ্যজগত। তাঁরা এই জড়বস্তুরাশি বা বাস্তবতার অকুণ্ঠ স্তব করে গেছেন। ভাববাদীদের মতো আত্মা বা পরম ব্রহ্ম-কে সর্বশক্তির আধার ও পরম সত্য বলে বন্দনা করেন নি তাঁরা, অন্ন তাঁদের কাছে সর্বশক্তির আধার রূপে গণ্য হয়, অন্নকে গণ্য করা হয় ব্রহ্মরূপে। বিভিন্ন উপনিষদে পাওয়া যায় আদি জড়বাদীদের অন্নউচ্ছ্বাসময় বহু শ্লোক। এই অন্নউচ্ছ্বাস ও অন্নসুরের মধ্য দিয়েই উপনিষদ-গুলোতে আদিম বস্তুবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। পরবর্তীকালে নানা দার্শনিক সম্প্রদায় জড়বাদী দর্শন

---

২৬. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮৬-২৮৭।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৫।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩২।

২৯. পূর্বোক্ত পৃঃ ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ধারাটিকে বিকশিত ও পরিপুষ্ট করে তোলে। ভারতীয় জড়বাদী ধারাভুক্ত করা যায় লোকায়ত বা চার্বাক পন্থী দার্শনিক সম্প্রদায়, জৈন, পূর্ব মীমাংসা, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্যযোগ প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায়কে। ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিক গোত্র ও পুরানগুলো জড়বাদী দর্শনের ধারাটির প্রতি কখনোই শ্রদ্ধাশীল ছিলো না। পুরানগুলো জড়বাদী ধারাটিকে নানাভাবে উপহাস করেছে, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে। বিষ্ণুপুরাণ জড়বাদীদের অসুর বলে নির্দেশ করে। বিষ্ণুপুরাণ মতে জড়বাদীরা অসুর, কারণ তাঁরা পারলৌকিক অমরত্বে আস্থাশীল নন, ইহলৌকিক সুখ ও পার্থিব জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগই তাঁদের কাম্য। বিষ্ণুপুরাণে এই পার্থিব সুখমত্ত সম্প্রদায়কে তীব্র নিন্দা করা হয়। বিষ্ণুপুরাণে জড়বাদীদের চারিত্র্য নির্দেশিত হয়। এ-পুরাণ মতে জড়বাদীরা আত্মার অমরত্ব, স্বর্গে অনন্ত সুখ ভোগ ও ব্রহ্মের মহিমায় বিশ্বাস করেন না। জড়বাদীরা পরকাল ও বেদ-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে পারলৌকিক অমরত্বের জন্য কৃচ্ছ্রতা ও সংযমপূর্ণ জীবন যাপনকে অপ্রয়োজনীয় গণ্য করেন। তাঁদের কাছে পার্থিব জীবনই একমাত্র সত্য বা বাস্তব।[১০] লোকায়ত বা চার্বাক পন্থীরা এই জড়বাদী চিন্তা চেতনার পোষক। কিন্তু মীমাংসা, ন্যায়বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায় বাহ্যবাস্তবের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেও এ-জগতকেই একমাত্র সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করেন না। তাঁরা জড়জগতকে বাস্তব বলে গণ্য করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মা বা চেতনাকেও বাস্তব বলে গন্য করেন। পরম গ্রন্থ বেদে বিশ্বাসী মীমাংসা, ন্যায়বৈশেষিক সাংখ্য-যোগ প্রভৃতি সম্প্রদায়। এই দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো বেদে বিশ্বাসী, তবে ভাববাদীদের মতো তাঁরা জড়জগতকে মায়া বা শূণ্য বলে মনে করেন না। তাঁরা জগতকে বাস্তব বা সত্য বলে গণ্য করেন, তবে তাঁরা বস্তুবাদী নন। নিজেদের দর্শন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বাহ্যজগতকে বাস্তব বলে স্বীকৃতি দেয়া তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এ-জগতকে প্রতিভাস বা মায়া বলে গণ্য করা হলে এ-দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর দর্শনেরই অস্তিত্ব থাকে না। শুধু চার্বাক বা লোকায়তপন্থীরাই বিশুদ্ধ জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। লোকায়তপন্থীরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী নন, বেদে আস্থাশীল নন, আত্মাকে তাঁরা দেহের ক্রিয়া মাত্র মনে করেন। অন্যান্য পরবৈদিক মতবাদগুলোর অনুসারীরা বেদ অনুরক্ত, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী, আত্মাকে পদার্থ থেকে ভিন্ন মনে করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা জড়জগতের সত্য বা বাস্তব অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন। তাই প্রাথমিক ভাবে এই দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোকে জড়বাদী শ্রেণীভুক্ত করা

---

১০. Jadhunath Sinha, Ibid, pp. 232 - 233.

Dhaka University Institutional Repository

হলেও তাঁরা বিশুদ্ধ জড়বাদী নন। কেউ কেউ তাঁদের চিহ্নিত করতে চান বাহ্যবাস্তবতাবাদী সম্প্রদায় বলে,[৩১]। কেউ কেউ অভিহিত করেন বাস্তবতাবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় রূপে।[৩২]

মীমাংসা, বৈশেষিক-ন্যায়, জৈন প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায় জড়জগতের অস্তিত্বকে সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করেন। মীমাংসা মতে, এই বাহ্য জড়জগত কল্পনা নয়, তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলেই এ-জগত বাস্তব বা যথার্থ। এ-জগত বাস্তব ও সত্য বলেই ব্যক্তি এখানে কর্মের উদ্যোগ নেয়, পুণ্য অর্জনের জন্য ধর্মীয় নানা ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হয়। বাহ্যজগতকে যদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বাস্তব বলে গ্রহণ না করা হয়, তবে এই পার্থিব জীবনে ব্যক্তির সকল কাজকেই অর্থহীন ও অহেতুক বলে গণ্য করতে হবে। মীমাংসা দার্শনিকেরা জড়-জগতের বাস্তবতা প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে ভাববাদের সমালোচনাও করেন। মীমাংসা দার্শনিকেরা মনে করেন যে এই জড়জগতকে মায়ামাত্র বলে গণ্য করা হলে আমাদের প্রাত্যহিক পার্থিব জীবন হয়ে উঠবে নৈরাজ্যপূর্ণ। মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভাববাদী মতবাদের সমালোচনা করে বলেন যে এই জড়জগত ও আমাদের জীবনকে যদি মায়া মাত্র এবং আমাদের সকল ক্রিয়াকর্মকে যদি স্বপ্নতুল্য বলে মেনে নিতে হয় তবে পুণ্য ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি যে যজ্ঞকর্মে উদ্যোগী হয়, সেই যজ্ঞ লব্ধ সুখও হবে অবাস্তব স্বপ্ন সুখের অনুরূপ। স্বপ্নসুখের আশায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিদ্রিত হওয়াকেই শ্রেয় জ্ঞানকরবে, আয়াসসাধ্য যজ্ঞকর্মের আয়োজন করবে না।[৩৩] মীমাংসা দর্শন যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপকে বাস্তব ও সত্য ও যথার্থ বলে প্রতিপাদন করার প্রয়োজনেই জড়জগতকে বাস্তব বা সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে তৎপর থেকেছে।[৩৪] ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অনুসারে বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে স্থান ও কালের ব্যাপার। এ-দুটি গোত্রের দার্শনিকেরা মনে করেন জড়জগত গঠিত হয়েছে অনুর (atom) সংমিশ্রনে এবং জড়জগত পরিচালিত হয় কার্যকারণ সূত্রের সাহায্যে।[৩৫] ন্যায় দর্শনের Physical ও Metaphysical দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে পরমানুর বাস্তবতাই হচ্ছে সত্য ও বাস্তব। বৈশেষিক দর্শন ও বাস্তবতা বিষয়ে অভিন্ন ধারণা পোষণ করে।[৩৬] বৈশেষিক মতে জড়জগতের বস্তুগুলো অদৃশ্য ও অনশ্বর

---

৩১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৬।
৩২. Nikunja Vihari Banerjee, Ibid, P. 139.
৩৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৬।
৩৪. Jadhunath Sinha, Ibid, pp. 218 - 219.
৩৫. পূর্বোক্ত পৃঃ ২৭৬।
৩৬. Sarvepalli Radhakrisnan, & Moor, Charles A., (ed.,) The Source Book of Indian Philosphy, (Princeton University Press, 1957). P. 356.

Dhaka University Institutional Repository

পরমানুর বিন্যাসে গঠিত। এই দার্শনিক সম্প্রদায় মৃত্তিকা, জল, আলো ও বায়ু এ-চার ধরণের পদার্থের বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাসী।[৩৭] এ সম্প্রদায় জড়জগতে নটি পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এগুলো হচ্ছে, মৃত্তিকা, জল, আলো, বায়ু,আকাশ, সময়, স্থান, আত্মা এবং মন এ সকল পদার্থেই পৃথিবীর দেশী ও বিদেশী সবকিছু গঠিত।[৩৮] জগতের পরমানু কাঠামোকে সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করেন জৈন দার্শনিক গোত্রও।[৩৯] এই তত্ত্বানুসারে জড়জগত ভ্রম বা মায়া নয়, সত্য বা বাস্তব এবং অস্তিত্বশীল। জৈন মতে বাহ্য-বাস্তব বা এ-পৃথিবী সমরূপ বা একরূপ পরমানু সমবায়ে গঠিত।[৪০] বাহ্যজগতের বস্তু সম্পর্কে ব্যক্তি-মাত্রেরই সাধারণ অভিজ্ঞতা আছে। আমরা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় এই বাহ্যজগতকে যে-ভাবে জানতে পারি, কিংবা বলা যায় আমাদের উপলব্ধি বা চেতনার কাছে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব যে-রূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বস্তুর সে-রূপই হচ্ছে যথার্থ এবং সত্য বা বাস্তব।[৪১] বস্তুর জগত বাস্তব বস্তুরই সমষ্টি এবং বস্তুর মন-নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে।[৪২] বস্তুর অস্তিত্ব ও সত্যতা কখনোই মন বা সত্তা বা উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল নয়। জৈন দার্শনিকেরা জড়জগতের বস্তুরাশিকে জীব ও অজীব এই দুইগোত্রে বিভক্ত করেন। তাঁরা ভাববাদীদের সমালোচনা করে বলেন যে বাহ্যবাস্তবের অস্তিত্ব ও বাহ্যবাস্তব বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে উপেক্ষা করে কোনো এক পরম জগতকে সত্য বলে কল্পনা করা নিরর্থক।[৪৩]

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে লোকায়ত দার্শনিক সম্প্রদায় বিশুদ্ধ জড়বাদী সম্প্রদায় রূপে গণ্য হয়ে থাকেন। বার্হস্পত্য বা চার্বাক দর্শন নামেও এ দর্শন ধারাকে অভিহিত করা হয়। শুরু থেকেই এ গোত্রটি নঞর্থক ও ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করেছে। এ-গোত্রের দার্শনিকেরা আশাবাদী নন। তাঁরা স্বপ্ন-আশা-সুখ-আত্মায় বিশ্বাসী নন, আত্মার অমরত্ব, আদর্শ পরম জগত, পরম ব্রহ্ম, পরলোক ও বেদ-এর মহিমায় আস্থাশীল নন। বরং তাঁরা ভাববাদী সকল ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণে তৎপর হন। অন্যান্য

---

৩৭. Ibid, P. 386.

৩৮. Ibid, P. 386.

৩৯. Radhakrisnan & Moor (ed.,) Ibid, P. 251.

৪০. Jadhunath Sinha, Ibid, pp 218 - 219.

৪১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬।

৪২. Radhakrisnan & Moor (ed.,) Ibid, P. 250.

৪৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক সম্প্রদায়ের কোনো বিশ্বাস বা ধারণাকে লোকায়তরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না এবং তারা প্রবল ইহলোকনির্ভর দর্শন প্রচারের মধ্য দিয়ে ভাববাদী সকল বিশ্বাসের বিনাশ সাধনে যত্নবান হন।[৪৪] লোকায়ত দার্শনিকদের কাছে মন বা চেতনা গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইন্দ্রিয়রাশি ও ইন্দ্রিয়বেদ্যতাই গুরুত্বপূর্ণ। এ-তত্ত্বানুসারে ইন্দ্রিয়বেদ্য এই বস্তুজগতই বাস্তব এবং আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় যে-সব বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে থাকে, শুধু ওই বস্তুরাশিই বাস্তব বা সত্য। যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শুধু তাকে অস্তিত্বশীল ও বাস্তব বলে গণ্য করেন এই দার্শনিক গোষ্ঠি, এবং যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তার কল্পিত অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁরা।[৪৫] এ বিশ্বাস থেকেই লোকায়ত সম্প্রদায় ভাববাদীদের অনুমিতি তত্ত্বকে (Possibility of Inference) আক্রমণ ও প্রত্যাখ্যান করেন।[৪৬] বাহ্যবাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই এমন অনেক কাল্পনিক বিষয় ও বস্তুকে ভাববাদী অনুমিতিতত্ত্বে বাস্তব বা সত্য বলে গণ্য করা হয়। লোকায়ত পন্থীদের মতে শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনোকিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা অর্থহীন, কারণ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়বেদ্য বিষয় বা বস্তুই একমাত্র বাস্তব বা সত্য, যা কিছু ইন্দ্রিয়বেদ্য নয় তার অস্তিত্ব সত্য বা বাস্তব বলে গ্রহণ করা যায় না। স্বর্গ ও নরককে সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না, কারণ এ-দুটি বিষয় সম্পর্কে কখনো আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়রাশি দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করি না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন বস্তুর যদি অস্তিত্ব থাকতো তাহলে কল্পিত বস্তুর অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব হতো না। লোকায়ত তত্ত্ব অনুসারে ইন্দ্রিয়বেদ্যতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস, মন বা চেতনা নয়।[৪৭] পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ বিষয় ও বস্তুই আমাদের বহির্জাগতিক বাস্তবতা সম্পর্কে সজ্ঞান করে তোলে। আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় কোমলতা রুক্ষতা, তাপ, শৈত্য ইত্যাদি উপলব্ধি করে, রসনেন্দ্রিয় উপলব্ধি করে বস্তুর মিষ্টতা, তিক্ততা ইত্যাদি গুণ, ঘ্রানেন্দ্রিয় উপলব্ধি করে সৌরভ ও অসৌরভের পার্থক্য, দর্শনেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করে বাহ্য-জগতের নানা বস্তুঃ পশুপাখি, বৃক্ষরাজি, মানুষ, পর্বত, স্তম্ভ মৃৎপাত্র ইত্যাদি, আর শ্রবণেন্দ্রিয় উপলব্ধি করে বিচিত্র ধ্বনি রাশি। লোকায়ত পন্থীদের মতে এই ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতই একমাত্র বাস্তব সত্য। এজগত

---

৪৪. Nikunja Vihari Banerjee, Ibid, P. 135.

৪৫. Jadhunath Sinha, Ibid, P. 240 & Nikunja Vihari Banarjee, Ibid, P. 136. & Radhakrishnan & Moor (ed.,) Ibid, P.227

৪৬. Jadhunath Sinha, Ibid, P. 235, Banarjee, Ibid, P. 136 And

৪৭. Radhakrisnan & Moor, Ibid, P. 227. And Sinha.Jadhunath, Ibid, 235.

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরাশি ও গুণরাশির সমবায়ে গঠিত, তা আমাদের কল্পনা মাত্র নয়।[৪৮] লোকায়তপন্থীদের মতে, শুধু যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাই অস্তিত্বশীল ও বাস্তব, ইন্দ্রিয়াতীত কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। তাঁরা বিশ্বাস করেন, এ-জগত ছাড়া আর কোনো জগত নেই। কোনো স্বর্গ-নরক নেই, ওসব নির্বোধদের আবিষ্কার। এ-দর্শনে পরমাণুর অস্তিত্বও স্বীকৃত হয়। এ-তত্ত্ব মনে করে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু-এই চার ধরনের পরমাণুর সমবায়ে আমাদের ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ গঠিত।

১.১.৩ <u>দর্শন থেকে সাহিত্যে বাস্তবতাবোধের সংক্রমণ</u>

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় দর্শন থেকে সাহিত্য বাস্তবতার ধারণা ঋণ করেছে। বাস্তবতাবাদী তত্ত্ব ও পরিভাষাটি পাশ্চাত্য সাহিত্য বাস্তবতাবাদী দর্শন থেকে গ্রহণ করে; এবং সূচনা করে বাস্তবমুখী সাহিত্য ধারার। তাই পাশ্চাত্য বাস্তবতাবাদী সাহিত্য ধারার বিবরণ রচনার আগে বাস্তবতাবাদী দর্শনের আলোচনাও অপরিহার্য। কিন্তু বাঙলা সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের মতো দর্শনের কাছে ঋণী নয়। ভারতীয় জড়বাদী বা বাস্তবতাবাদী দর্শন দ্বারা এদেশের সাহিত্যিকেরা পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক-সমালোচকদের মতো প্রভাবিত হন নি। উনিশ শতকে গদ্যের বিকাশ কালে নকশা ও উপন্যাসধর্মী রচনায় লেখকেরা বাস্তবমনস্ক হন নিজেদের প্রয়োজনে, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আবির্ভূত আধুনিক কথা-সাহিত্যিকেরা বাস্তব মনস্ক হন পাশ্চাত্যের লেখকদের বাস্তবতাবোধের প্রভাবে, ভারতীয় জড়বাদী দর্শনের প্রেরণায় নয়। তবে এ-দেশের লেখকেরা, তিরিশি আধুনিকদের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে আদর্শায়িত বাস্তবতার উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো বিশুদ্ধ আদর্শপ্রিয় ভাববাদী, নির্মোহ বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লেখক।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে বাস্তবতাবাদী তত্ত্ব ও পরিভাষা গৃহীত হয় দর্শন থেকে। আঠারো শতকে টমাস রীড 'কান্ডজ্ঞানধারা' (Commonsence school) নামে যে বাস্তবতাবাদী ধারার প্রবর্তন করেন, তা-ই লেখক-সমালোচক-শিল্পবোদ্ধাদের আকৃষ্ট করে। আঠারো শতকে কান্ডজ্ঞানধারা প্রবর্তনের পর বাস্তবতা বিষয়ক ধারণা বদলে যায়। ভাববাদী দর্শন কল্পিত আদর্শ জগতকে বাস্তব বা সত্য বলে গণ্য

---

৪৮. Jadhunath Sinha, Ibid, P. 240.

Dhaka University Institutional Repository

এবং ওই আদর্শজগতকেই একমাত্র অনুধাবনের বিষয় বলে গণ্য করেছে। কান্টজ্ঞানধারা ওই ধারণাগুলোকে প্রত্যাখান করে এবং বাহ্যবাস্তব ও জড়জগতই অনুধাবনের একমাত্র বিষয় বলে ঘোষণা করে। আঠারো শতকের এই কান্টজ্ঞানধারাটিকে অনুসরণ করে পরে বিভিন্ন ধরনের বাস্তবতাবাদী ধারার উদ্ভব ঘটে। এই বাস্তবতাবাদীরা বিভিন্ন ধরনের বিশেষণ প্রয়োগ করে তাঁদের বাস্তবতাবাদী ধারণার ভিন্নতাকে নির্দেশ করেছেন, যেমন, Naive Realism, New Realism, Critical Realism প্রভৃতি। এই বাস্তবতাবাদীরা 'Real' শব্দটির সাহায্যে বাহ্যবাস্তবকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর রূপে নির্দেশ করতে তৎপর হন। 'রিয়েল' 'রিয়ালিটি' প্রভৃতি শব্দ তাঁরা বস্তুর মননিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব নির্দেশে ব্যবহার করতে থাকেন। ভাববাদ বিশ্বাস করে যে বস্তুর অস্তিত্ব মনসাপেক্ষ, বাস্তবতাবাদীরা এই ভাববাদী বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বস্তুর মননিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে।[৪৯] বাস্তবতাবাদী দর্শন বা ধারণা উনিশ শতকের মধ্যভাগে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। তবে সে সময় বাস্তবতাবাদ তীব্র এক জড়বাদী ধারনাই জ্ঞাপন করেছে।[৫০] জড়বাদ এবং বাস্তবতাবাদ দুটি ভিন্ন দর্শন ধারা হলেও দুয়ের মধ্যে বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান। জড়বাদ শুধুমাত্র পদার্থকেই সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করে এবং এই একটি-মাত্র সত্য বা বাস্তবের অস্তিত্বেই তাঁরা স্বীকার করেন। জড়বাদী ধারণা অনুসারে এ-বিশ্বলোক (Universal) একটি জড়জগত মাত্র, যা পদার্থের সমবায়ে গঠিত। জড়বাদের আদি প্রবক্তা গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতে এই বিশ্ব জড়অনুর সমবায়ে গঠিত। আমাদের ইন্দ্রিয়বেদ্য উপলব্ধি ও পৃথিবীতে অবস্থিত বস্তুরাশি-র সংখ্যা ক্ষুদ্রঅনুর সমষ্টি মাত্র।[৫১] জড়বাদ মন বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এ তত্ত্ব অনুসারে চেতনা বা আত্মা বা মন পদার্থের একরকম ক্রিয়া মাত্র। প্রকৃতি জগতে বিশৃঙ্খলার স্থান নেই, এ-জগতে কোনো কিছুই আকস্মিক ভাবে ঘটে না। জড়জগতে সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে। প্রকৃতির শৃঙ্খলার রাজত্ব কখনো বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হতে পারে না।[৫২] বাস্তবতাবাদ বস্তুর মন নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তবে তাঁরা জড়বাদীদের মতো পদার্থ কিংবা অনুকেই একমাত্র বাস্তব বা সত্য বলে গণ্য করেন না। আঠারো

---

৪৯. Grant, Damian, Ibid, P. 4.

৫০. Ibid, P. 3.

৫১. Patrick, G.T.W., Ibid, P. 200.

৫২. Ibid, P. 200.

Dhaka University Institutional Repository

শতকে টমাস রীড কান্ডজ্ঞানধারা নামক যে দার্শনিক ধারা প্রবর্তন করেন তাকে 'নাঈভ রিয়ালিজম' নামেও অভিহিত করা হয়।[৫৩] এ-ধারার অনুসারীরা বাস্তব বলে গণ্য করেন চারপাশের বাহ্যজগতকে। তাঁদের মতে, বৃক্ষরাজি, অট্টালিকা, নদী- পর্বত অরণ্য শোভিত যে বাহ্যজগতকে আমরা প্রতিদিন দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করি, ওই বাহ্যজগতের অস্তিত্ব মিথ্যে নয়। ওই জগত মায়া বা কল্পনা বা প্রতিভাস মাত্র নয়, এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়রাশির সাহায্যে এজগতের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে থাকি। আমাদের ইন্দ্রিয় উপলব্ধিই এই জড়জগতের অস্তিত্বের বাস্তবতা বা সত্যতা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত করে। কান্ডজ্ঞানধারাবাদীদের মতে ইন্দ্রিয় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমরা এ-জড়জগতকে যে ভাবে জানি বা বাহ্যজগত যে-রূপে আমাদের চেতনায় ধরা দেয়, বাস্তব জড়-জগত অবিকল একই। তবে বাহ্যবাস্তবের বস্তুরাশির অস্তিত্ব ব্যক্তির উপলব্ধি সাপেক্ষ নয়। যখন আমরা একটি বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, বাহ্যজগতে তখনও যেমন বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান তেমনি যখন উপলব্ধি করি না তখনও বস্তু অস্তিত্বশীল।[৫৪] এই কান্ডজ্ঞানধারা বা নাঈভ রিয়ালিজমই পাশ্চাত্যের লেখক, সমালোচক, শিল্পবোদ্ধা, শিল্পীদের আকৃষ্ট করে।

১.২ সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপন তত্ত্ব

পাশ্চাত্যে বাস্তবতাবাদ ধারণাটি দর্শন থেকে সাহিত্যে গৃহীত হয়।[৫৫] সত্য কী-এ-সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে যেমন মতবিরোধ আছে তেমনি সত্যসম্পর্কে দার্শনিকেরা পোষণ করেন নানা বিপরীত মত। সত্য সম্পর্কে দার্শনিক উত্তরগুলোকে দুটি বিপরীত ও পরিপূরক ভাগে বিন্যস্ত করা সম্ভব। সত্য হতে পারে বৈজ্ঞানিক ও কাব্যিক।[৫৬] বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয় জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং কাব্যিক সত্য সৃষ্ট হয় সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রথম প্রক্রিয়াটির পারিভাষিক নাম 'অভেদতত্ত্ব' (Correspondence theory), দ্বিতীয়টির পারিভাষিক নাম 'সামঞ্জস্যতত্ত্ব' (Coherence

---

৫৩. Grant, Damian, Ibid, P. 9.

৫৪. Hosper. Jonh, (ed.,) An Introduction to Philosophical Analysis, (Routledge & Kegan Paul Limited, U.K., Rivised ed. 1970), P. 494

৫৫. Grant, Damian, Ibid, P. 3.

৫৬. Ibid, P. 9.

Dhaka University Institutional Repository

theory)।[৫৭] অভেদতত্ত্ব অভিজ্ঞতামূলক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক। অভেদবাদীরা দৃশ্যমান বাহ্য-জগতকেই একমাত্র সত্য ও বাস্তব বলে গণ্য করেন। যেমন, ডঃ জনসন একটি পাথরকে লাথি ছুঁড়ে বলে-ছিলেন, এটি যেহেতু পায়ে বেশ ব্যথা দেয় কাজেই এটি আছে। অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যে জড়বস্তুজগত রয়েছে, যাকে আমরা আমাদের সাধারণ বোধ দিয়ে প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করি, সে বাস্তবজগতই সত্য। অভেদবাদীদের মতে আমরা পর্যবেক্ষণ করে ও তুলনার মাধ্যমে এই বাস্তববিশ্বকে অনুধাবন করতে পারি। অভেদবাদীদের সত্য বাস্তব সত্যের সঙ্গে অভিন্ন, বাস্তবজগতে বস্তু ও সত্য যেরূপে অবস্থান করে তাঁরা ওই রূপকেই বিশ্বস্তভাবে যথাযথ উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে সামঞ্জস্যতত্ত্বে বোধিগত অনুভবের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। অর্থাৎ বস্তুজগতই সত্য সামঞ্জস্যবাদীরা এমন ধারণা পোষণ করেন না। উপলব্ধি ও মন এখানে গুরুত্বপূর্ণ। মন বস্তুজগতকে যেরূপে উপলব্ধি করে, তা-ই বাস্তব ও সত্য। এ-তত্ত্বে উপাত্ত -সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় না, সামঞ্জস্যবাদীরা সত্য সৃষ্টি করেন। তাঁরা সত্য সৃষ্টি করেন আত্মোপলব্ধির দ্বারা। প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্থান এখানে অধিকার করে স্বতঃপ্রমাণ।[৫৮] অভেদতত্ত্বে বাস্তবতা হচ্ছে ' as it were waylaid by truth , arrested by it ' আর সামঞ্জস্যতত্ত্বে আবিষ্কার করা হয় বাস্তবতাকে, ও নতুন করে সৃষ্টি করা হয় অনুভবের সাহায্যে। বলা যায়, প্রথমটি বন্দী করে আর দ্বিতীয়টি মুক্তি দেয়।[৫৯]

দর্শনে যেমন সত্য বা বাস্তবতাবিষয়ক দুটি ধারণা বা ধারা বিদ্যমান, সাহিত্যে তেমনি বাস্তবতা উপস্থাপনের দুটি রীতি রয়েছে, - একটি অভেদতত্ত্ব (correspondence theory)অন্যটি সামঞ্জস্যতত্ত্ব (coherence theory)। বাস্তবতা উপস্থাপনার রীতি দুটির পরিভাষা গ্রহণ করা হয় দর্শন থেকেই।[৬০] ডমিয়ান গ্র্যান্ট সাহিত্যের অভেদতত্ত্বকে বলেছেন ' সাহিত্যের বিবেক' (con-science of literature)[৬১] বা ' বিবেকপূর্ণ বাস্তবতাবাদ' (Conscientious Realism)[৬২], আর সাহিত্যে সামঞ্জস্যতত্ত্বকে বলেছেন, ' সাহিত্যের সচেতনা' (Cons-ciousness of literature)[৬৩] বা ' সচেতন সাহিত্য' (conscious

---

৫৭. Ibid, P. 9.
৫৮. Ibid, P. 9.
৫৯. Ibid, P. 9.
৬০. Ibid, pp. 12 - 13
৬১. Ibid, P. 13.
৬২. Ibid, P. 20.
৬৩. Ibid, P. 15.

Dhaka University Institutional Repository

Realism)।[৬৪] অভেদতত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে বাস্তবতার অবিকল অনুপুঙ্খ উপস্থাপন আর সামঞ্জস্যতত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে স্রষ্টার নিজের মনের আলোকে বাস্তবতা যে ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তার উপস্থাপন। আঠারো শতকের ইংলন্ডে উপন্যাস নামক নতুন সাহিত্য ধারার সূচনা করেন ড্যানিয়েল ডেফো, স্যামুয়েল রিচার্ডসন ও হেনরি ফিল্ডিং প্রমুখ। এই আদি ঔপন্যাসিকত্রয় বাস্তবতা নির্ভর সমকালীন জীবনের আখ্যান রচনা করেন। পরে উনিশ শতকের প্রথম ও মধ্য ভাগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হন বাস্তবতামনস্ক ঔপন্যাসিক গোত্র। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে সূচনা ঘটে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন রচিত হচ্ছিলো নিজস্ব ধরনের বাস্তবতাবাদী উপন্যাস, যা ফরাশি বাস্তবতা-বাদী আন্দোলনের প্রভাবমুক্ত ছিলো। আঠারো শতকের বাস্তবতামনস্ক আদি ঔপন্যাসিকদের রচনা ও উনিশ শতকের প্রথম ও মধ্যভাগের ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব ধরনের বাস্তবতাবাদী রচনাবলীকে আদি বাস্তবতাবাদী ধারা বলে অভিহিত করা যায়। মধ্য উনিশ শতকের ফরাশি বাস্তবতাবাদী ধারাটিকে আন্দোলনকারী বাস্তবতাবাদী ধারা বলে অভিহিত করা যায়, কারণ এ ধারার অনুসারীরা বাস্তবতাকে নিয়ে একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের পরে উনিশ শতকের শেষভাগে ফ্রান্সে আবির্ভূত হয় প্রাকৃতবাদী আন্দোলন, পরে দেখা দেন মন্ময় বাস্তবতাবাদী ধারার লেখকগোত্র। গ্র্যান্ট ফ্রান্সের আন্দোলনকারী বাস্তবতাবাদ ও প্রাকৃতবাদকে সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রথম শ্রেণীভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ আন্দোলনকারী বাস্তবতাবাদ ও প্রাকৃতবাদকে তিনি নির্দেশ করেছেন বিবেকপূর্ণ বাস্তবতাবাদ (conscientious Realism) বা অভেদতত্ত্বরূপে।[৬৫] কারণ বাহ্যবাস্তবতার অবিকল অনুপুঙ্খ উপস্থাপনাই এই ধারা দুটির লক্ষ্য। আমরা আঠারো ও উনিশ শতকের আদি বাস্তবতাবাদীদেরও এ-শ্রেণীভুক্ত করতে চাই। সমকালীন জীবন ও দৈনন্দিন বাস্তবতার অবিকল অনুলিপি করা হয় এসব রচনায়। গ্র্যান্ট মন্ময় বাস্তবতাবাদকে নির্দেশ করেন 'সচেতন বাস্তবতাবাদ' রূপে।[৬৬]

সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনার অভেদতত্ত্ব হচ্ছে সেই বিবেক যা বাহ্যবাস্তবতার প্রতি কোনো অবহেলা সহ্য করে না, বরং বাহ্যবাস্তবতার চরিত্রটি কোথাও ক্ষুণ্ণ হলে এ-তত্ত্ব প্রতিবাদ জানায়।[৬৭] ওয়ালেস স্টিভেন্স্

---

৬৪. Ibid, P. 47.

৬৫. Ibid, P. 20.

৬৬. Ibid, P. 47.

৬৭. Ibid, P. 13.

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, এই তত্ত্বে 'কল্পিত জগৎ সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ শূণ্য'।[৬৮] এ-বাস্তবতাবাদ বাস্তবের কাছে আত্মসমর্পিত। রুশ তাত্ত্বিক ভিস্সারিয়ান বেলি নস্কির মতে, এই গোত্রভুক্ত লেখকেরা জীবনকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেন না, জীবনকে উপস্থাপিত করেন। বেলিনস্কি প্রত্যাশা করেন সেই কাব্যের যাকে অভিহিত করা যাবে 'রূপে'।[৬৯] বস্তুবাদী চেরনিশেভস্কি মনে করেন যে শিল্পকলার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তবতা উপস্থাপন।[৭০] উইলিয়াম ডীন হোয়েলস্ও বলেছেন একই কথা: ' the foolish old superstition that literature and art are anything but the expression of life, and are to be judged by any other test than of their fidelity to it. '[৭১] ' সাহিত্যে-সচেতনা'- রূপে বিবেচিত সাহিত্যের সামঞ্জস্যতত্ত্বে বাস্তবতার অনুকরণ করা হয় না, বাস্তবতা সৃষ্টি করা হয়। এখানেও ব্যবহৃত হয় জীবনবাস্তবতার উপাদানরাশি, তবে তা কল্পনা সহযোগে পুনর্সৃষ্টি করা হয়, পরিশোধিত, শিল্পিত বাস্তবতা ও সত্যের রূপায়ন করা হয় এপদ্ধতিতে। হেনরি জেমস এ-পদ্ধতিকে ' sacrament of execution ' বলে নির্দেশ করেছেন।[৭২] হেনরি জেমস Faet ও Truth -কে সমার্থক বলে মনে করেন না। তাঁর মতে বাস্তবতার শিল্পিত প্রয়োগের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সত্যের স্বরূপ তুলে ধরা সম্ভব।[৭৩] ফ্লবেয়ার একটি চিঠিতে তাঁর বিশুদ্ধ শিল্পবাদী প্রবণতার পরিচয় খোলাখুলি তুলে ধরেন। ফ্লবেয়ারের আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে সাহিত্যে সামঞ্জস্যতত্ত্বের চারিত্র্যও নির্দেশিত হয়ে যায়। ১৮৫২-এ Louise colet কে লেখা চিঠিতে তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার অনুকরণে ক্লান্ত হয়ে বলেন;

---

৬৮. উদ্ধৃত Ibid, P. 14.

৬৯. Grant, Damian, Ibid, P. 14.

৭০. উদ্ধৃত, Ibid, P. 14

৭১. উদ্ধৃত, Ibid, P. 14.

৭২. James, Henry, 'The Awkward Age', The Art of the Novel, (chrles Scribner's Sons; New York, London 1934) pp.115-116

৭৩. James, Henry, 'The Lesson of the Master', The Art of the Novel, pp. 230 - 231.

Dhaka University Institutional Repository

What seems to me ideal, what I should like to do, is to write a book about nothing, a book with no reference to anything outside itself, which would stand on its own by the inner strength of its style, just as the earth holds itself without support in space, a book which would have almot no subject or at least where the subject should be almost imperceptible, it that were possible' [৭৪]

ডমিয়েন গ্রান্ট ফ্লবেয়ারের এই প্রকাশতা ব্যাখ্যা করে বলেন, There could be no clearer, more final statement of the coherence theory of realism than this - and no plainer illustration of how this theory supersedes the clumsier idea of establishing truth by the laborious process of correspondence. [৭৫] সামঞ্জস্যবাদীদের কাছে বাস্তবতা উপলব্ধি করার আগে থেকেই বিরাজমান কিছু নয়, তাঁদের কাছে বাস্তবতা হচ্ছে এমন কিছু যা সব সময়ই সৃষ্টি করতে হয়। তাই এমন কিছু নেই যার সঙ্গে অভেদত্ব রক্ষা করতে হবে। 'মেনডিলোর মতে,' Reality in the artist's sense is always something created; it does not exist a priori', এবং তিনি মনে করেন সে-কারণেই শিল্পী বাহ্যবাস্তবতার দাসত্ব করবেন না। [৭৬] ক্রোচে বলেন, মনের বাইরে কোনো প্রকৃতি বা বাস্তবতা নেই এবং এ-সম্পর্কে শিল্পীর উদ্বিগ্ন হবারও কিছু নেই। পার্গারও মনে করেন শুধুমাত্র অনুকরণের মধ্য দিয়েই বাস্তবতার উপস্থাপন করা যায় না, বাস্তবতাকে সৃষ্টি করে নিতে হয়। [৭৭] এ-শ্রেণীর লেখকেরা কল্পনা ও বাস্তবতার সংশ্লেষ সাধনের ওপর জোর দেন। এ-দুয়ের সমীকরণ সাধন তাঁদের লক্ষ্য। ওয়ালেস স্টিভেন্স্ মনে করেন কল্পনা প্রতিভা ও বাস্তবতার আনুসম্পর্কই হচ্ছে সাহিত্যের ভিত্তি। তিনি বারবার এ-দুয়ের সমীকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'Reality is not what it is. It consists of the many realities which it can be made into', ? তিনি মনে করেন

---

৭৪ . উদ্ধৃত Grant, Damian, Ibid, P. 17

৭৫ . Grant, Damian, Ibid, P. 16.

৭৬ . Grant. Damian, Ibid. P. 16

৭৭ . Ibid, P. 16.

Dhaka University Institutional Repository

'no fact is a bare fact'[৭৮] সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনার রীতি দুটিকে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে অভেদতত্ত্ব বা conscientious Realism হচ্ছে শিল্পকলার সেই প্রবণতা ও প্রয়াস যা বাস্তবতার সমতুল্য হতে চায়। আর সামঞ্জস্যতত্ত্ব বা Conscious Realism হচ্ছে শিল্পকলার সেই প্রবণতা যা বাস্তবতাকে কল্পনার সাহায্যে পুর্ণসৃষ্টি করে নিতে চায়।[৭৯]

সাহিত্য ও শিল্পকলায় বাস্তবতা উপস্থাপনার আরো দুটি তত্ত্ব আছে। একটি দর্পণ তত্ত্ব অন্যটি প্রদীপ তত্ত্ব। দর্পণ তত্ত্বটি অতি প্রাচীন আর প্রদীপতত্ত্ব রোম্যান্টিকদের সৃষ্টি। দর্পণ তত্ত্ব অভেদতত্ত্বেরই অন্যনাম, আর প্রদীপতত্ত্বকেও বলা যায় সামঞ্জস্যতত্ত্বের অন্যনাম। আদি ও আন্দোলনকারী বাস্তবতাবাদী গোত্র, প্রাকৃতবাদী গোত্র প্রভৃতি, অর্থাৎ বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা যাঁদের লক্ষ্য, তাঁর দর্পণ তত্ত্বানুযায়ী, এবং মন্ময় বাস্তবতাবাদীদের অভিহিত করা চলে প্রদীপতত্ত্ববাদীরূপে। তাঁরা রোম্যান্টিকদের মতোই বাস্তবতাকে দেখেছেন আনুর আলোকে। দর্পনতত্ত্ববাদীরা রচনাকর্মকে 'মহামড়ক ধরে পরিভ্রমণরত একটি দর্পণ' বলে গণ্য করেন, যাতে পারিপার্শ্ব ও বাহ্যবাস্তবতার অবিকল প্রতিফলন ঘটে। তাই অবিকল উপস্থাপনবাদীদের বহু ব্যবহৃত চিত্রকল্প হচ্ছে দর্পণ। এই দর্পণতত্ত্ব বা অনুকরণবাদ শিল্পকলার আদিমতমতত্ত্ব হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।[৮০] এ-তত্ত্বকে অনুকরণবাদ বলা হয় এ-অর্থে যে শিল্পকলা হচ্ছে বাস্তবতা বা বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাপারের অনুকরণ। প্রাচীন দার্শনিক (যেমন আরিস্ততল) ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা এ-তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এবং তত্ত্বটিকে গ্রহণ করেছেন আধুনিক লেখকেরাও, যদিও অনুকরণের বিষয় সম্পর্কে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারণা ও বিশ্বাস আধুনিক লেখকেরা বর্জন করেছেন। আদি থেকেই শিল্পকলা তথা কাব্য গণ্য হয়েছে অনুকরণ হিসেবে; গ্রীক দার্শনিকেরা শিল্পকলাকে গণ্য করেছেন অনুকরণ হিসেবে এবং যেহেতু অনুকরণ তাই একে সত্য থেকে দূরবর্তী ও নিম্নস্তরের বলেও গন্য করেছেন। সক্রেটিস বলেছেন চিত্রকলা, কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য সবকিছুই হচ্ছে অনুকরণ।[৮১] অনুকরণ হচ্ছে এমন একটি সাম্পর্কিক শব্দ যা দুটি বস্তু এবং তাদের মধ্যে একধরণের সাদৃশ্য-সাম্য নির্দেশ করে। অনুকরণের ক্ষেত্রে প্লেটো গুরুত্ব দিতেন তিনটি

---

৭৮ . উদ্ধৃত, Ibid, P. 18.

৭৯ . Grant. Damian, Ibid, P. 19.

৮০ . Abrams. M.H, The Mirror and the Lamp, (The Norton Library, W.W. Norton & Company. Inc. New York, 1958),P. 8.

৮১ . Ibid, P. 8.

Dhaka University Institutional Repository

ভাব বা ধারণার ওপর, তবে পরবর্তী কালের অনুকরণবাদী তত্ত্বসমূহে স্থান পেয়েছে দুটি ক্যাটেগরি। এ দুটি হচ্ছে অনুকরণের বিষয় ও অনুকৃত বিষয়। প্লেটো যে-তিনটি বিষয়ের কথা বলেছেন তার প্রথমটি হচ্ছে শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় ভাবরাশি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওই শাশ্বত ভাবের অনুকরণে সৃষ্ট বাস্তব জগতের সামগ্রীরাশি, এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বাস্তবজগতের অনুকরণে সৃষ্ট বস্তুরাশি বা শিল্পকলা। প্লেটোর মতে ও শিল্পকলা অনুকরণের অনুকরণ।[৮২] সক্রেটিস শিল্পকলার অনুকরণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনটি শয্যার উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যানুযায়ী আদর্শলোকে রয়েছে শয্যার একটি পরম ভাব, এটি তৈরি হয়েছে ঈশ্বর কর্তৃক, আদর্শলোকের শয্যার অনুকরণে একজন সূত্রধর তৈরি করে দ্বিতীয় শয্যাটি এবং দ্বিতীয় শয্যাটির অনুকরণে চিত্রকর আঁকেন আরেকটি শয্যা। এই তৃতীয় শয্যাটির চিত্রকরকে সক্রেটিস অভিহিত করেছেন একজন অনুকরণকারী হিসেবে, যে অন্যজনের তৈরি বস্তুর অনুকরণ করেমাত্র।[৮৩]

চিত্রকরের মতো কবিও অনুকরণকারী। সক্রেটিস বলেন ;

the tragic Poet is an imitator, and therefore, like all other imitators, he is thrice removed from the King and from the truth[৮৪]

প্লেটোর তত্ত্বানুসারে শিল্পকলা অনুকরণ করে প্রতিভাসিক বিশ্বের। তা ভাবের জগতকে অনুকরণ করে না। এর অর্থ হচ্ছে বাস্তব জগতের বস্তুরাশির মধ্যে শিল্পকলা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ; তার কারণ তা অনুকরণের অনুকরণ।[৮৫] আরিস্টটলও কবিতাকে অনুকরণ বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, Epic Poetry and Tragedy, as also comedy, Dithy rambic Poetry, and most flute-playing and lyre-playing, are all, viewed as a whole, modes of imitation'[৮৬] তবে অনুকরণ কথাটিকে আরিস্টটল এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা প্লেটো থেকে পৃথক হয়ে উঠেছে, আরিস্টটলও প্লেটোর মতোই মনে করেন যে কোনো শিল্পকর্ম কোনো প্রাকৃতিক বস্তুর কাঠামো অনুসরণে গঠিত হয়ে থাকে। তবে আরিস্টটলের

---

৮২. Ibid, P. 8.

৮৩. Ibid, P. 8.

৮৪. উদ্ধৃত, Ibid, P. 8.

৮৫. Abrams. M.H, Ibid, pp 8 - 9.

৮৬. উদ্ধৃত Ibid, P. 11.

Dhaka University Institutional Repository

কাছে ভাবের এই অনুকরণ দূষণীয় বলে মনে হয় নি। আরিস্টটলের পরে অনেক শতাব্দী ধরে, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অনুকরণবাদ টিকে থাকে। তবে এ সময় বিভিন্ন সমালোচক অনুকরণের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে শিল্পকলা অনুকরণ, তবে কারো মতে শিল্পকলায় বাস্তবতার অনুকরণ করা হবে, কেউ কেউ মনে করেন যে শিল্পে অনুকরণ করা হবে 'ভাব'। আবার সবসময় 'অনুকরণ' শব্দটিই যে নন্দনতত্ত্বে ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইতালীতে নন্দনতাত্ত্বিকেরা অনুকরণের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করতে থাকেন নানা শব্দ। এ সময় reflection, representation, counterfeiting, feigning, copy কিংবা image এ শব্দগুলোর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়।[৮৭] আঠারো শতকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরেই নেয়া হয় যে শিল্পকলা অনুকরণ মাত্র। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কিংবা সত্যতা যাচাই-এর প্রয়োজনও কারো মধ্যে দেখা দেয় নি। এ সময়ের বিভিন্ন আলোচনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আঠারো শতকের নন্দনতাত্ত্বিক রিচার্ড হার্ড তাঁর "Discourse on poetical Imitation"-এ (১৭৫১) সপ্রেমটিস, প্লেটো আরিস্টটলের অভিমতের প্রতিধ্বনি করেই বলেন, 'আরিস্টটল ও গ্রীক সমালোচকদের সঙ্গে একমত হয়ে যথার্থভাবে বলতে হয় যে সবধরণের কবিতাই হচ্ছে অনুকরণ।[৮৮] তিনি বলেন,' It is, indeed, the noblest and most extensive of the mimetic arts; having all creation for its objects and ranging the entire circuit of universal being,'[৮৯] আঠারো শতকের শেষার্ধে যাঁরা নিজেদের 'মৌলিক প্রতিভাবাদী' বলে দাবী করতেন তাঁরাও শিল্পকলাকে অনুকরন বলেই গণ্য করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে মৌলিক রচনাও একধরণের অনুকরণ মাত্র। তাঁরা একে চিহ্নিত করেন একধরণের 'মৌলিক অনুকরণ' রূপে।[৯০] মৌলিক প্রতিভাবাদীরা মনে করেন যে এই অনুকরণ হতে পারে দুধরণের। যেমন ইয়াং তাঁর "conjectures on original composition" গ্রন্থে দুধরনের অনুকরণের উল্লেখ করেন; একটি প্রকৃতির অনুকরণ, অন্যটি অন্য লেখকদের অনুকরণ।

---

৮৭ . Abrams. M.H, Ibid, P. 11.

৮৮ . উদ্ধৃত, Ibid, pp 11 - 12.

৮৯ . উদ্ধৃত, ... Ibid, P. 12.

৯০ . Abrams, M.H, Ibid, P. 12.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমটিকে তিনি নির্দেশ করেন মৌলিক বলে।[১১] এই মৌলিক প্রতিভাবাদীরা এক ধরনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। এসময় নন্দনতাত্ত্বিকদের কেউ কেউ শিল্পকলার অনুকরণকারী শিল্পীকে প্রকৃতিবিজ্ঞানীর সমতুল্য বলে গণ্য করেন, তখন অনুকরণের আরেক অর্থ হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন। আঠারো শতকের বিখ্যাত ফরাসি সমালোচক Charles Batteux অনুকরণকারী শিল্পীর ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, ' Let us imitate the true physicists, who assemble experiments and then on these found a systam which reduces them to a principle.[১২]

এই অনুকরণ তত্ত্বের প্রকৃতি এবং শিল্পকলার প্রকৃতি বোঝাবার জন্য নন্দনতাত্ত্বিকেরা দর্পণের রূপক ব্যবহার করেন। প্লেটোর "রিপাবলিক"-এর দশম গ্রন্থে সক্রেটিস কাব্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতেগিয়ে একে দর্পণের সঙ্গে তুলনা করেন।[১৩] প্লেটোও শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করার জন্য দর্পণের রূপকটি ব্যবহার করেছেন, তিনি কখনো ব্যবহার করেছেন দর্পণ, কখনো জলের প্রতিবিম্ব কিংবা বস্তুর ছায়ার রূপক। এসব রূপকের সাহায্যে তিনি বিশ্বের বস্তুরাশির সঙ্গে তাদের পরম, ভাব'-এর (Idea) সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন। প্লেটোর পরে বহু শতাব্দী ধরে এই দর্পণ রূপকটি নন্দনতাত্ত্বিকেরা শিল্পকলার প্রকৃতি নির্দেশের ক্ষে[illegible] ব্যবহার করেছেন। রেনেসাঁসের সময় দর্পণের রূপকটি হয়ে ওঠে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রূপক। এটি তখন বারবার ব্যবহৃত হতে থাকে। রেনেসাঁর সে সময়ের একজন নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পকলাকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে, 'What should painting be called, except the holding of a mirror upto the original as in art?'[১৪]

১১, . উদ্ধৃত, Ibid, P. 12.

১২ . উদ্ধৃত, Ibid, P.12.

১৩ . Abrams, M.H, Ibid. P. 12.

১৪ . উদ্ধৃত, Ibid, P. 32.

Dhaka University Institutional Repository

লিওনার্দো চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ও চিত্রকরের মনের সঙ্গে প্রকৃতি বা বাহ্যজগতের সম্পর্ক বোঝাবার জন্য বার-বার দর্পণ রূপকের ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, ' The mind of the painter should be like mirror which always takes the colour of the thing that it reflects and which is filled by as many images as there are things placed before it....... you can not be a good master unless you have a universal power of represent,[১৫]
এই রূপকটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় হয় কমেডিনাটকে। ইতালীয় এবং ইংরেজ অনেক বিখ্যাত সমালোচক কিকেরোর নামে প্রচলিত কমেডির সংজ্ঞাটি বারবার ব্যবহার করেছেন। এ-সংজ্ঞানুসারে কমেডি হচ্ছে জীবনের অনুলিপি, আচার আচরণ ও প্রথার দর্পণ এবং সত্যের প্রতিফলন।[১৬] আঠারো শতকের শেষদিকেও প্রধান তাত্ত্বিকেরা অনুকরণ তত্ত্বটি নির্দেশ করতে গিয়ে দর্পণ রূপকটি ব্যবহার করেছেন। জনসন শেক্সপীয়রের অসামান্যতা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে শেক্সপীয়র ' halds up to his readers a faithful mirror of manners and of life,'[১৭]
দর্পণের রূপকটি গ্রহণ করেন বাস্তবতাবাদীরাও। বাস্তবতাবাদীরা উপন্যাসকে গণ্য করেন দর্পণরূপে। দর্পণে যেমন বস্তুবিশ্ব ও ব্যক্তি অবিকল প্রতিফলিত হয়, উপন্যাসেও তেমনি তাঁরা বাহ্যবাস্তবতা ও ব্যক্তিজীবনের অবিকল প্রতিফলন ঘটাতে চান। তবে এই বাস্তবতাবাদীদের সঙ্গে প্রাচীন নন্দনতাত্ত্বিকদের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

রোমান্টিকেরা অনুকরণতত্ত্ব বা দর্পণতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা বাহ্য বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার চেয়ে আত্মগত ভাব ও অভিব্যক্তির প্রকাশের ওপর গুরুত্ব দেন। কাব্য তাঁদের কাছে গণ্য হয় ব্যক্তিগত বিমোক্ষণ (Personal catharsis) হিসেবে।[১৮] তাঁদের মতে, ' Aristotle, as is well known, considered the essence of poetry to be

---

১৫ . উদ্ধৃত Ibid, P. 32.

১৬ . Abrams, M.H, Ibid, P. 32.

১৭ . উদ্ধৃত, Ibid, P. 32.

১৮ . Abrams, M.H, Ibid, P. 48.

Dhaka University Institutional Repository

Imitation . . . . . Expression we sah, rather than imitation; for the lather word clearly conveys a cold and inadequate notion the writers meaning...[৯৯] 'কাব্য আবেগের অভিব্যক্তিমাত্র'-এ সংজ্ঞাটি ১৮৩০ এর দিকে গৃহীত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অন্তর্লোকের আলোড়ন ও উপলব্ধির চিত্রনে মগ্ন রোম্যান্টিকেরা বাস্তবতাকে দেখেছেন মনের চোখে। মনের কাছে বাহ্যবস্তুর যে-রূপে ধরা পড়ে, মন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাস্তবতাকে যে-ভাবে দেখে, বাস্তবতার সেরূপের চিত্রনই রোম্যান্টিকদের লক্ষ্য। রোম্যান্টিকদের বাস্তবতা মন্ময়। তাঁরা বাহ্যবাস্তবতার প্রতিফলক বা দর্পণ রূপকটি ত্যাগ করে গ্রহণ করেন একটি নতুন রূপক। তারা গ্রহণ করেন প্রদীপের রূপক। মনকে রোম্যান্টিকেরা নির্দেশ করেন প্রদীপ বলে, যার আলোয় বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। বাহ্যবাস্তবতা নয়, এখানে গুরুত্ব পায় মন। রোম্যান্টিক কবি নোভালিস কাব্যের সংজ্ঞা দেন এভাবে: Poetry is representation of the spirit, of the inner world in its totality,[১০০] টিক্ বলেন 'not these plants, not these mountains, do I wish to copy, but my spirit, my mood shich governs me just at this moment,'[১০১] রোম্যান্টিকেরা দর্পণ রূপকের বদলে প্রদীপ রূপক গ্রহন করেন এই বোঝাতে যে' a poet reflects a world already bathed in an emotional light he has himself projected,'[১০২] তারা কাব্যের উদ্দেশ্য ও প্রদীপ রূপকের ব্যাখ্যা দেন এভাবে Neither a mere description of natural objects, nor a delineation of natural feelings, however distinct or forcible, constitutes the ultimate end and aim of poetry . . . . The light of poetry is not only a direct but also a reflected light, that while it shews us the object, throws a sparkling radiance on all around it . . . .[১০৩]

---

৯৯ উদ্ধৃত, Ibid, P. 48.

১০০ উদ্ধৃত, Ibid, P. 31.

১০১ উদ্ধৃত, Ibid, P. 50.

১০২ উদ্ধৃত, Abrams. M.H, Ibid, P. 52

১০৩ উদ্ধৃত, Ibid, P. 52.

Dhaka University Institutional Repository

মন্ময় বাস্তবতাবাদীদের বাস্তবতাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী রোম্যান্টিকদের অনুরূপ। রোম্যান্টিকদের মতোই মন্ময় বাস্তবতাবাদীরাও বাস্তবতাকে দেখেন মন দিয়ে, তাঁদের কাছে বাস্তবতা হচ্ছে একরকম ব্যক্তিগত উপলব্ধি। এ-ধারায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত দৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। মন্ময় বাস্তবতা-বাদীরা বা সামগ্রস্যবাদীরা স্রষ্টার মন যা দেখে তাকেই বাস্তব বলে গণ্য করে। মন্ময় বাস্তবতাবাদকে বাহ্যবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনবাদের বিরুদ্ধে এক রকম প্রতিক্রিয়া বলেও গন্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহিত্যে বাস্তবতাবাদ ও বাস্তবতাবাদী আন্দোলন

২.১ সাহিত্যে বাস্তবতাবাদের বিকাশ

পাশ্চাত্য উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে আঠারো শতকে। আঠারো শতকে ইংলন্ডে ড্যানিয়েল ডেফো (১৬৬১-১৭৩১), স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১), হেনরি ফিল্ডিং (১৭০৭-১৭৫৪) প্রমুখ উপন্যাস নামক একটি নুতন সাহিত্যধারার সূত্রপাত করেন। উদ্ভবকাল থেকেই এই নতুন সাহিত্যধারাটি বাস্তবতা সংলগ্ন। ডেফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং-এর উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় তাঁদের সমকালীন সমাজের সাধারণ ব্যক্তি বিশেষের জীবনবৃত্তান্ত। সমকালের সমাজ ও বাস্তবতা নির্ভর এ-উপন্যাসগুলোর উদ্ভবের পেছনে ছিলো পাঠক শ্রেণীর চাহিদা নিবৃত্তির তাগিদ। সেইসঙ্গে লেখকেরা সমকালের সাধারণ জীবনের কাহিনী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সামন্ত সাহিত্য রোমান্সের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেছেন। রোমান্স সামন্ত মানসকে তৃপ্ত করেছে। ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের পর গড়ে ওঠা নগরকেন্দ্রিক সমাজে নতুন পাঠক শ্রেণী জন্ম নেয়। এই নতুন নাগরিক পাঠকশ্রেণী চায় তাদের সমকালের প্রাত্যহিক জীবন নির্ভর গল্পগাথা। রোমান্স তাদের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয় এবং ওই চাহিদা মেটাতে এগিয়ে আসে উপন্যাস। উপন্যাস রোমান্সকে হটিয়ে প্রতিষ্ঠা করে নিজের আধিপত্য।[১] নতুন পাঠকশ্রেণীর চাহিদা অনুযায়ী এ-লেখকেরা সমকালীন ইংলন্ডের সমাজের 'contamporary incident', 'individual experience', Manner of real life' -এর উপস্থাপনা শুরু করেন। তাঁদের রচনায় উপস্থাপিত করে চলেন ওই সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে দীর্ণ সাধারণ মানুষের কাহিনী। এ-সবের মধ্য দিয়েই আঠারো শতকের উদ্ভবকালের উপন্যাস হয়ে ওঠে বাস্তবতাসংলগ্ন। ইয়েন ওয়াট এই তিন লেখকের উপন্যাসের বাস্তবমুখিতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, the 'realism' of the

---

১. Allott, miriam, Novelist on the novel, (Routledge and kegan Paul. London, 1st pub.1959, reprănted.1973), P. 22.

Dhaka University Institutional Repository

Novel of Defoe, Richard Son, and Fielding is closely associated with the fact that moll Flanders is a thief, Pamela a hypocrite, and Tom Jones a fornicator '[২]

ডেফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং তাঁদের রচনাকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য প্রথাগত কাহিনী বর্জন করেন। তাঁরা কাহিনী সংগ্রহের জন্য পুরান, ইতিহাস, কিংবদন্তী কিংবা পূর্ববর্তী সাহিত্যের দ্বারস্থ হন নি, কিংবা অলৌকিক বীর্যবান নায়কের দুর্গম অভিযান ও অসম্ভব ঘটনাবহুল প্রণয় কাহিনীও বর্ণনা করেন নি। এখানেই চসার, স্পেনসার, শেক্সপীয়র কিংবা মিল্টনের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য। এই লেখকেরা সকলেই কাহিনী ধার করেছেন গ্রীস কিংবা রোমের লেখকদের কাছ থেকে। কিন্তু আদি উপন্যাসিকেরা নতুন গল্প সৃষ্টি করেন, সমকালীন ঘটনা ও প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে তাঁদের উপাখ্যানের বিষয়। ওই সময়ের দর্শনে যে প্রাতিস্বিক চেত— ্যক্তিসত্তার ওপর গুরুত্ব দেয়া হতো, আদি উপন্যাসিকেরা চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করেন। ...দের চরিত্রগুলো পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ায় 'সমকালীন সামাজিক প্রতিবেশের স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে'।[৩] রচনাকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য এই উপন্যাসিকেরা 'human nature as it is' তুলে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা অনুপুঙ্খ বর্ণনায় মনোযোগী হন এবং অনুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে বিশেষ বস্তু, বিশেষ ঘটনা ও চরিত্রদের উপস্থাপিত করেন। এই অনুপুঙ্খ বর্ণন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রধান করে তোলেন 'বিশেষকে'। তাঁদের এই অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা রীতির সঙ্গে তুলনা করা চলে ওলন্দাজ চিত্রশিল্পীদের অনুপুঙ্খ চিত্র... রিচার্ডসনের প্রথম জীবনীকার মিসেস বারবল্ড রিচার্ডসনকে ওলন্দাজ চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করে রিচার্ডসনের উপন্যাস সম্পর্কে বলেন যে এতে আছে 'the accuracy of finish of a Dutch pinter . . . . content to produce effects by the patient labour of minuteness'[৪] এই আদি উপন্যাসিকদের বলা যায়

---

২ . Watt, Ian, <u>The Rise of the novel</u> (Penguin, 1957, 1963), P.11

৩ . Ibid, P. 18.

৪ . Ibid, P. 18.

Dhaka University Institutional Repository

ওলন্দাজ চিত্রশিল্পী রেমব্রান্ড ট -এর মতোই বাস্তবাস্তবতার ' mere face- painters and historians'[৫] তাঁদের এই অনুপুঙ্খ উপস্থাপন রীতির মাধ্যমে চরিত্রগুলো প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং পরিবেশ পটভূমি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়ে রচনাকে বাস্তবঘনিষ্ট করে তোলে। উপন্যাসে 'বিশেষ'কে চিত্রণের এই প্রবণতা. পদ্ধতিটি প্রাচীনপন্থীদের ক্ষুব্ধ করে। সমকালীন বাস্তবতার এই অনুপুঙ্খ উপস্থাপকদের 'Face - painter ' বলে তাচ্ছিল্য করেন রক্ষণশীল সমালোচক স্যাফ্টসবেরি। তিনি বলেন, ' The mere face - painter, indeed, has little in common with the poet; but, like the mere historian, copies what he sees, and minutely traces every feature, and oddmark '[৬]

ডেফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং গুরুত্ব দেন চরিত্রের বিশেষীকরণ'-এর (Particularization of character)ওপর।[৭] এই 'বিশেষীকরণ' প্রযুক্ত হয় উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের নামকরণের ক্ষেত্রে। তাঁরা নাম বিশেষ্যের ব্যবহার করে বাস্তব সাধারণ মানুষের নামের মতোই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের নামকরণ করেন। বাস্তব জীবনে এই নামবিশেষ্য বা নাম প্রতিটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। উপন্যাসের চরিত্রদের এমন নামকরণের মধ্য দিয়ে তাঁরা বাস্তবতার আবহ সৃষ্টি করেন; এ-ভাবে তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রদের 'সমকালীন সামাজিক প্রতিবেশের স্বতন্ত্র একজন ব্যক্তি হিসেবে' প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হন। চরিত্রদের নামকরণের ক্ষেত্রে আদি উপন্যাসিকেরা ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। পূর্ববর্তী সাহিত্যে সাধারণত ঐতিহাসিক বা 'টাইপ'নাম (Type name) নেয়া হতো, এসব নাম আহরণ করা হতো পুরান, কিংবদন্তী কিংবা প্রাচীন সাহিত্য থেকে। পূর্ববর্তী সাহিত্যের ওই নামগুলো অধিকাংশই ছিলো বৈশিষ্ট্য সূচক। এ-থেকে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে লেখকেরা চরিত্রদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেননা ডেফো খুব কম সময়ই প্রথাগত নাম ব্যবহার করেন, তাঁর অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর নামই সম্পূর্ণ ও বাস্তব সম্মত;

---

৫ . Ibid, P. 18

৬ . Ibid, P. 17

৭ . Ibid, P. 18.

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি তিনি অনেকক্ষেত্রে ডাকনামও দিয়েছেন। রিচার্ডসনও নামকরণের ক্ষেত্রে একই রীতি অনুসরণ করেন। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং সযত্নে তাঁর প্রধান ও গৌণ চরিত্রদের আসল নাম ও ডাক নাম দেন। ফিল্ডিংও এমনভাবে নামকরণ করেন যা দিয়ে বিশেষ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা যায়। চরিত্রদের নামকরণের মতো উপন্যাসের স্থান ও কালের ক্ষেত্রেও আদি ঔপন্যাসিকেরা 'বিশেষীকরণ' রীতি অনুসারী। আদি উপন্যাসে দেখা যায় যে লেখকেরা বিভিন্ন দৃশ্য বেশ সযতনে স্থাপন করে, দৃশ্যগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন এবং বিভিন্ন ঘটনা সংঘটনের জন্য বিশেষ একটি সময়কে বেছে নেন। আদি উপন্যাসে কাহিনীকে একটি বিশেষকালে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রাচীন, মধ্য ও রেনেসাঁসযুগের সাহিত্যের কালের ভূমিকা থেকে উপন্যাসের কালের ভূমিকা খুবই ভিন্ন। ট্র্যাজেডিতে কাহিনীকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হতো। এটি ছিলো মানবজীবনে সময়ের ভূমিকা অস্বীকার করার মতো। ধ্রুপদী বিশ্বদৃষ্টিতে যেহেতু বাস্তবতা ছিলো কালনিরপেক্ষ ধ্রুবভাবরাশি, তাই মনে করা হতো জীবনের সত্য যেমন সমগ্র জীবন ধরে উন্মোচন করা যেতে পারে, তেমনি তা একদিনেও একদিনেও উন্মোচিত করা হতো জীবনের সত্য যেমন সমগ্র জীবন ধরে উন্মোচন করা যেতে পারে, তেমনি তা একদিনেও উন্মোচিত করা সম্ভব।[৮] আঠারো শতকের উপন্যাস ধারায় এসে কালচেতনা বদলে যায়। আদি ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের রচনাকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য কালের প্রেক্ষিতে জীবনচিত্রণে মনোযোগী হন। ই,এম, ফর্স্টার প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য নির্দেশ করে বলেন, 'প্রাচীন সাহিত্যের লক্ষ্য ছিলো মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে জীবন চিত্রন আর উপন্যাসের লক্ষ্য হচ্ছে সময় বা কালের প্রেক্ষিতে জীবন চিত্রন।'[৯] নর্থ্রোপফ্রাইয়ের মতে, 'সময় ও পাশ্চাত্য মানবের সন্ধিসাধনই' উপন্যাসের প্রধান কৃতিত্ব।[১০] ইয়েন ওয়াট ডেফোর কালচেতনা সম্পর্কে বলেন,' At his best, he convinces us completely that his narrative is occuring at a particular place and at a particular time, and our memory of his novels consists largely of these vividly realized moments in the lives of his characters, moments which are loosely strung together to form a convincing biographical perspective[১১]

---

৮ . Ibid, pp. 20 - 23.

৯ . Forster. E.M., Aspects of the Novel,(Penguin, 1st pub. 1927. Reprinted 1963) P. 36.

১০ . উদ্ধৃত, Watt. Ian, Ibid, P. 22.

১১ . Watt. Ian, Ibid, P. 25.

Dhaka University Institutional Repository

রিচার্ডসনও উপন্যাসের ঘটনারাশিকে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্থাপন করেছেন। তিনি প্রতিটি ঘটনাকে বাস্তবসম্মত করার জন্য প্রত্যেক সপ্তাহের প্রতিটি দিন, এমন কি প্রতিটি দিনের বিশেষ ক্ষণও নির্দেশ করেন। রিচার্ডসন তাঁর একটি চরিত্র ক্লারিসার মৃত্যুর বর্ণনা দেবার সময় মৃত্যুর দিনক্ষণ উল্লেখ করেন। তিনি জানান ক্লারিসা মারা যায় ৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেল ৬.৩০ মিনিটে। অন্যদিকে এই উপন্যাসিকেরা উপন্যাসের জীবনকে বাস্তব জীবনের মতো স্বাভাবিক সত্য করে তোলার জন্য পাত্রপাত্রীদের বাস্তব প্রতিবেশে স্থাপনের দিকে মনোযোগী হন। আদি ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য ছিলো 'সত্যিকার বাস্তব প্রতিবেশ' সৃষ্টি করা। তাঁদের এই প্রবণতা পর্ববর্তী লেখকদের প্রবণতা থেকে ভিন্ন ছিলো। প্রথাগত ট্র্যাজেডি, কমেডি কিংবা রোমান্সে কালধারণার মতো স্থান ধারণাও ছিলো অস্পষ্ট ও সাধারণ শেক্সপীয়রের স্থান ও কালচেতনা নির্দেশ করতে গিয়ে জনসন বলেন, ' had no regard to distinction of time or place'. বার্নিয়ানের পিকারেস্ক উপন্যাসগুলোতে অনেক বিষয়ে ' Vivid and particularized physical description' পাওয়া যায়, তবে সেগুলো লেখকের সজ্ঞানসৃষ্টি ছিলো না। আদি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ডেফোই প্রথম তাঁর উপন্যাসের প্রতিবেশকে বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলেন। ডেফোর পরিচর্যায় তাঁর উপন্যাসের প্রতিবেশ, ঘটনাস্থল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সহ উঠে আসে। রিচার্ডসন স্থানের বর্ণনাকে অনেকখানি এগিয়ে নেন। তাঁর উপন্যাসে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা খুব বেশি নেই, কিন্তু পাত্রপাত্রীদের বাসস্থান, প্রতিবেশ বা গৃহাভ্যন্তরের বর্ণনা প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন, "পামেলা" উপন্যাসে রিচার্ডসন পামেলার লিংকনশায়ার ও বেডফোর্ডশায়ারের বাড়ির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। আঠারো শতকের এই উপন্যাসিকেরা যদিও পরবর্তী ফরাশি বাস্তববাদী লেখক স্তাঁদাল বা ব্যালজাকের মতো প্রতিবেশ ও জীবনের সমগ্র ছবি ধরতে সমর্থ হননি, তবু তাঁদের অসাধারণত্ব এখানে যে তাঁরা উপন্যাসের জীবনকে বাস্তবজীবনের মতো স্বাভাবিকসত্যে পরিণত করেছিলেন।[১২] ডেফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং তাঁদের রচনায়

---

১২ . Ibid, pp. 27 - 28.

Dhaka University Institutional Repository

যে আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ, পত্ররচনা পদ্ধতি, বা চেতনা প্রবাহ রীতি ব্যবহার করেছেন, এই রীতি পদ্ধতির সবই তাঁরা ব্যবহার করেছেন তাঁদের রচনার প্রামানিকতা ও সত্যপ্রতীয়মানতা প্রতিষ্ঠার জন্য।[১৩] এই রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করার ফলেই তাঁদের রচনায় ওলন্দাজ চিত্রকলার অনুপুঙ্খতা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়, যা তাঁদের উপন্যাসকে করে তোলে বাস্তবসম্মত।

ফরাশি উপন্যাস বাস্তব সংলগ্ন হয়ে ওঠে স্তাঁদাল (১৭৮৩-১৮৪২) ও ব্যালজাকের (১৭৯৯-১৮৫০) রচনাবলীতে। ফরাশি উপন্যাসের বিকাশও ঘটে এ-দুই শক্তিমানের হাতে। এঁদের দুজনের রচনাই সমকালের সমাজপ্রতিবেশ ও জীবনের ছবি ধরা পড়েছে। স্তাঁদাল যদিও মনোজগতের দ্বন্দ্ব আলোড়ন উপস্থাপনায় মনোযোগী ছিলেন বেশি, তবু ভালো ও মন্দের সমবায়ে গঠিত বাস্তবতার অবিকল প্রতিফলনের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। Ze Rouge et le noir উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদে তিনি উপন্যাসকে 'Mirror walking down the road' বলে অভিহিত করেন। তার মতে দর্পণে যেমন সবকিছুই অবিকল প্রতিফলিত হয়, উপন্যাসও তেমনি বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন করবে। জীবনের স্মিত ও কুশ্রী দুদিকের উপস্থাপনাই করবেন ঔপন্যাসিক নৈর্ব্যক্তিকভাবে। জনচিত্তকে পীড়িত করবে ভেবে কদর্যের উপস্থাপনায় কুণ্ঠিত হবে না তিনি, কারণ বাস্তবতা শুধু সুন্দর ও ভালোর সমষ্টি নয়, রূঢ়তা ও ক্লেদের উপস্থিতিও আছে সেখানে। প্রথম দিকের উপন্যাস Armance-এর ভূমিকায় তিনি এ ব্যাপারে স্পষ্ট অভিমত দেন; 'Is it the fault of the mirror that ugly people have passed in front of it? On whose side is the mirror?[১৪] ব্যালজাকের দৃষ্টি ফরাশি সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূত্রাবলী অনুসন্ধান করেছে। ব্যালজাক 'History of manners' রচনা করেন। সমকালের ফরাশি সমাজ জীবনের আচার প্রথা, ব্যক্তির আচার আচরণ পেশা জীবিকা পোশাক ইত্যাদি সমস্ত কিছুর অনুপুঙ্খ উপস্থাপ

. Allott. Miram., Ibid, P. 24.

. Wellek, Rene, 'Realism in Literary scholarship' in concepts of criticism, (Yale University press, London, New Haven, 1963, 1964) P. 249.

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য দিয়ে ব্যালজাক তাঁর রচনাকে বাস্তবঘনিষ্ঠ করে তোলেন। উনিশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হন বাস্তবমনস্ক ঔপন্যাসিকেরা। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে বাস্তবতাবাদী ধারা নামক সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। তবে ফরাশি দেশের এ-আন্দোলন ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যে তেমন প্রভাব ফেলেনি। এ-শতকের মধ্য ও শেষভাগে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশের সাহিত্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যে বাস্তবমনস্ক লেখক গোত্র একধরনের বাস্তবতাবাদী উপন্যাস রচনা করে চলেন। কোনো কোনো দেশে, যেমন রাশিয়ায়, এ-ধরনের উপন্যাস রচিত হতে থাকে উনিশ শতকের প্রায় প্রথম থেকে। রাশিয়া, ইংলন্ড, জার্মানী, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের এই বাস্তবমনস্ক লেখকগোত্রের রচনায় একধরনের স্বদেশী নিজস্ব বাস্তবতাবোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে ফ্রান্স ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাস্তবতাবাদ কোনো আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে নি। এ-সব দেশে সৃষ্টিশীল লেখকেরা উপন্যাসে বাস্তবতার উপস্থাপনার পাশাপাশি কদাচিৎ নিজেদের বাস্তবমনস্কতার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো কোনো দেশে তাত্ত্বিকেরা শিল্পকলার বাস্তবমনস্কতার ঔচিত্য ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমকালীন লেখকদের বাস্তবসংলগ্ন উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু বাস্তবতাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন নি। এর ব্যতিক্রম অবশ্য লক্ষ্য করা যায় যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রে উলিয়ম ডীন হোয়েলস্ বাস্তবতাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতাবাদী আন্দোলনও ফরাশি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের প্রভাবজাত নয়। হোয়েলস্ ফরাশি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের তাত্ত্বিকদের অপছন্দ করতেন আর ফরাশি সৃষ্টিশীল লেখকদের উপন্যাসে উপস্থাপিত রূঢ় ও অসুন্দর বাস্তবতা তাঁর অসহ্য বোধ হতো। আকাঁড়া বাস্তবতার অনুপুঙ্খ রূপায়ন পদ্ধতিটিও হোয়েলসের অপছন্দ ছিলো। বরং তাঁকে তৃপ্ত করেছে রুশ, ব্রিটিশ বাস্তবমনস্ক লেখকদের স্বদেশী বাস্তবতাবোধ, ওই সব দেশের উপন্যাসে উপস্থাপিত জীবনের সাদাসিদে স্নিগ্ধ অংশটুকু তাঁকে আকৃষ্ট করে। হোয়েলস্ এইসব বাস্তবমনস্ক লেখকদের সাদাসিদে বাস্তবতাবোধ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

ইংল্যান্ডে বাস্তবতাবাদী ধারার উদ্ভব ও বিকাশের কোনো সুনির্দিষ্ট কাল নির্দেশ করা কঠিন, কারণ ফ্রান্সের মতো ইংলন্ডে বাস্তবতাবাদ আন্দোলন হিশেবে আবির্ভূত হয় নি। তবে ইংলন্ডে 'রিয়ালিজম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে। ১৮৫১ সালে ইংলন্ডে Fraser's Magazine-এ 'realist school' কথা কোনো সংজ্ঞা ছাড়াই ব্যবহৃত হয় এবং ১৮৫৩ সালে West minster Review পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যালজাক সম্পর্কিত এক আলোচনায় ' Realism '

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।[১৫] ফরাশি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ব্রিটিশ পাঠক পরিচিত হয় ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে, জর্জ হেনরি লিউসের প্রবন্ধের মাধ্যমে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এক গোত্র ইংরেজ উপন্যাসিকের রচনায় একধরনের নিজস্ব বাস্তবতাবাদ পরিলক্ষিত হয়। এই লেখকগোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায় উলিয়ম মেকপিস থ্যাকারে (১৮১১-৬৩), চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-৭০), জর্জ এলিয়ট (১৮১৯-৮০) প্রমুখকে। তাঁদের রচনায় প্রাত্যহিক বাস্তবতার সাধারণ মানুষ ও ঘটনাবলী যথাযথ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁরা মামুলি সাধারণ বাস্তবতার উপস্থাপনায় উৎসাহী ছিলেন। সাধারণ জীবনের সরল সহজ সদগুণ ও নৈতিক উৎকর্ষের পরিচয় তুলে ধরেন তাঁরা। উপন্যাসে এই বাস্তবতার উপস্থাপনায় তাঁরা যে রীতি ব্যবহার করেন সমালোচকেরা তাকে অভিহিত করেন 'Cult of commonplace' ... বলে।[১৬] উনিশ শতকের মধ্যভাগের এই ইংরেজ লেখকেরা তাঁদের সমকালীন ফরাশি সতীর্থদের চেয়ে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও চমৎকার বাস্তবজীবন নির্ভর সাহিত্যসৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। তবে এই বাস্তবতাবাদীরা বাস্তবতার একটি সীমিত অংশের উপস্থাপনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। তাঁরা প্রধানত মানবজীবন ও সমাজের স্নিগ্ধ অংশেরই উপস্থাপনা করেছেন; জীবন ও সমাজের রূঢ়তা, কদর্যতা কে উপেক্ষা করে গেছেন, জীবনের ক্লেদাক্ত ও গ্লানিকর অংশের উপস্থাপনা করতে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেছেন। অনেক সমালোচক, যেমন David-sauvegeot of পরিহাসের সঙ্গে ইংরেজি উপন্যাসের এই বাস্তবতাবাদকে সংকীর্ণ, গোত্রীয় বাস্তবতাবাদ বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, এই বাস্তবতাবাদকে সবসময় কড়া পাহারায় রেখেছে ধর্মযাজকেরা, চার্চ এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রন করেছে এবং চলাচলের সীমানা নির্দেশ করে দিয়েছে।[১৭]

জার্মানীতে উনিশ শতকের মধ্যভাগে কোনো নিজস্ব বাস্তবতাবাদী ধারার উদ্ভব ঘটেনি। কিংবা ফরাশি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনও সেখানে কোনো আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়নি, যদিও সেখানে 'Realism'

---

১৫. Beeker, George J (ed.,) Documents of modern literary Realism (Princeton University Press, 1963), P. 7.

১৬. Stronberg, Roland N., An Intellectual History of Modern Europe, (Prentice - Hall Inc. Engle wood Clifts, U.S.A, 2nd Edition 1975), p. 304.

১৭. উদ্ধৃত, Beeker, George J. (ed.,), Ibid, P. 15.

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষাটি নানা সময় প্রযুক্ত হয়েছে। ১৮৫০-এ হেরমান হেটনার (১৮২১-৮২) গ্যেটের 'বাস্তবতাবাদ' সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ-সময়ের জার্মান সমালোচকের কাছে শেক্সপীয়র গণ্য হতে থাকেন ' the supreme realist 'রূপে।[১৮] অটো লুডভিগ (১৮১৩-৬৫) শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলোতে ' Realism '-এর উপস্থাপনা ঘটেছে বলে নির্দেশ করেন। তিনি ওই ' Realism 'কে ' Poetic ' বা ' artistic realism ' বলে অভিহিত করেছেন।[১৯] ১৮৫০ থেকে ১৮৮০-র দশকের প্রথম ভাগ ব্যাপী জার্মানীতে আধিপত্য করেছে এক ধরণের বাস্তবতাবাদ, যাকে বলা হয় কাব্যিক বাস্তবতাবাদ। তবে ওই সময়ের জার্মানীতে কোনো সুনির্দিষ্ট বাস্তবতাবাদ ছিলো না। বাস্তবতাবাদের একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারা গড়ে ওঠে স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়। ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) ও বিইয়র্ণসন এই বাস্তবতাবাদের নেতা হিশেবে চিহ্নিত হন, এবং গিয়র্গ ব্রান্ডেস (১৮৪২-১৯২৭) চিহ্নিত হন এর ভাষ্যকার রূপে। ইবসেন, বিইয়র্ণসন, ব্রান্ডেস প্রমুখের প্রচেষ্টায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভন্ডামীপূর্ণ ও সংকীর্ণতাগ্রস্ত সাহিত্যিক পরিমন্ডলে মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত হয়। তবে তাঁদের পক্ষে এ কাজটি খুব সহজে করা সম্ভব হয় নি। স্ক্যান্ডিনেভীয় সাহিত্যের রক্ষণশীল প্রথাগতদের সঙ্গে এই বাস্তবতাবাদীদের ক্রমাগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। ১৮৭১-এ ব্রান্ডেস কোপেন হেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, ওই বক্তৃতা রক্ষণশীলদের ক্ষুব্ধ করে। এ-বক্তৃতায় তিনি বলেন বিভিন্ন সমস্যাকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করে আমাদের কালের সাহিত্য প্রতিপন্ন করেছে যে সে জীবিত।' স্ক্যান্ডিনেভীয় অঞ্চলে বাস্তবতাবাদ বিকশিত হয় প্রধানত নাট্য সাহিত্যে। তখনকার সমাজের শ্বাসরুদ্ধকর সংকীর্ণতা নির্দেশ করে ইবসেন ১৮৭৭ থেকে ১৮৮২ -র মধ্যে রচনা করেন অত্যন্ত বাস্তবধানধর্ম নাটক: <u>Pillars of society</u>, <u>A Doll's House</u>, <u>Ghosts</u>, <u>An Enemy of the People</u> ইত্যাদি। ইবসেন তাঁর রচনায় সমাজ ও ব্যক্তির বাস্তবজীবন চিত্র এতো সত্য ও জীবন্ত করে তোলেন যে তিনি নাটকে বাস্তবতাবাদের

---

১৮. Wellek, Rene, 'Realism in literary scholarship' in <u>concepts of Criticism,</u> P. 230.

১৯. Wellek, Rene, <u>A History of Modern criticism: 1750 - 1950</u>, (Jonathan cape, London, 1966) P. 307.

Dhaka University Institutional Repository

একধরণের প্রতীক হয়ে ওঠেন। ইটালিতে বাস্তবতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশকালরূপে নির্দিষ্ট কোনো সময়কে নির্দেশ করা যায় না। তবে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ইতালির প্রধান সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা ফ্রানসেসকো দ্য সাংকতিস বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থে শিল্পকলা ও বাস্তবতার সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেন। রাশিয়ায় বাস্তবতাবাদের নিজস্ব একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী ধারা ছিলো। ফ্রান্সে বাস্তবতাবাদী আন্দোলন উদ্ভবের অনেক আগে, ১৮৩৫ সালেই রুশ সমালোচক বেলিনস্কি (১৮১১-১৮৪৮)'রিয়ালিজম' পরিভাষাটি একটি সাহিত্যধারা বোঝাতে ব্যবহার করতে থাকেন এবং বাস্তবতাবাদের কেন্দ্রীয় দার্শনিক মূলতত্ত্বটি নির্দেশ করেন। এ-তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে তিনি কবিতা তথা সাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর ভাষ্য রাশিয়ায় একটি নতুন ধারার সাহিত্য সৃষ্টির পরিমন্ডল গড়ে তোলে। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবও রাশিয়ায় তাঁর সমালোচনামূলক রচনার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। ১৮৪০-এর দশকে বেলিনস্কির পৃষ্ঠপোষকতাই গুরুত্বপূর্ণ নতুন লেখকদের আবির্ভাবের পথ সুগম করে দেয়। যেমন ফিওদর দস্তয়েভস্কির (১৮২১-৮১) প্রথম উপন্যাস "অভাজন"-এর গুরুত্ব অনুধাবণ করে বেলিনস্কি উপন্যাসটি প্রকাশে সহযোগিতা করেন এবং তাঁর উদ্যোগে ১৮৪৬-এ এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাবাদী উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ফরাশি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনটি ফ্রান্সে যে আলোড়ন- অভিঘাত সৃষ্টি করে, রুশ বাস্তবতাবাদী আন্দোলন রাশিয়ায় ততখানি বিতর্কের সৃষ্টি করে নি। কারণ এই সময়ের রাশিয়ায় ছিলো নৈতিক ও সামাজিক নানা সমস্যা ও বিতর্ক এবং এই বিষয়গুলো নিয়েই সে-সময় ছিলো নানা প্রশ্ন, প্রবল বিতর্ক ও আলোড়ন। সাহিত্যিক বাস্তবতাবাদ প্রসঙ্গে বিতর্ক ও প্রশ্ন তোলার অবকাশ ছিলোনা। রাশিয়ায় বেলিনস্কির সাথে বাস্তবতাবাদের ভাষ্য রচনা করেন নিকলাই চেরনিশেভস্কি (১৮২৮-১৮৮৯)। তিনি " The Aesthetic Redations of art to Reality " (১৮৫৫) নামে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। এটি রাশিয়ার বাইরে প্রচারিত ও পরিচিত হয় নি, তবে এ-অভিসন্দর্ভটি রুশ বাস্তবতাবাদী ধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অভিসন্দর্ভে চেরনিশেভস্কি শিল্পকলার সমস্যা, বাস্তবতা ও শিল্পকলার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। এ-অভিসন্দর্ভটি বাস্তবতাবাদী শিল্পকলার ইশতেহার হিশেবে রাশিয়ায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। তিনি শিল্পকলার ভাববাদী দর্শন প্রত্যাখ্যান করেন এবং শিল্পকলার মহৎভূমিকা বিষয়ক বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাগুলোকে তিনি আক্রমণ করেন। শিল্পকলা বাস্তবতার চেয়ে উৎকৃষ্ট ও উন্নত এই ভাববাদী নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি শিল্পকলার ভূমিকা নির্দেশে তৎপর হন। তাঁর মতে, যেহেতু শিল্পকলার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিরূপ উপস্থাপন করা, তাই শিল্পকলার বিষয়বস্তু হিশেবে গৃহীত হবে বাস্তবতা ও জীবন, সৌন্দর্য নয়। কোনো কাল্পনিক সৌন্দর্য কিংবা শিহরণ সৃষ্টি করা শিল্পকলার লক্ষ্য নয়, এর দৃষ্টি স্থির

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে জীবনের দিকে, জীবন ও প্রকৃতিকে অনুধাবনে সহায়তা করাই শিল্পকলার দায়িত্ব। তাঁর এ-তত্ত্বটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রুশ উপন্যাস সাহিত্যের সামনে একটি বিশাল ভুবনের দরোজা খুলে দেয়। উপন্যাসিকেরা বিচিত্র বাস্তবতানির্ভর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস রচনা করে চলেন। এ-সব উপন্যাসে জীবনের নানা বৈচিত্র্য উপস্থাপন করার দিকেই লেখকেরা মনোযোগী ছিলেন, তাঁরা বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের আঙ্গিকগত ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না। ১৮৫০-এর দশকে ইভান তুর্গেনিভ (১৮১৮-৮৩), লেভ তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)-এর অনবদ্য বাস্তবতাবাদী উপন্যাসগুলোর সঙ্গে প্রকাশিত হয় পেসিমস্কির "A thousand soul" (১৮৫৮) এবং গংকোরভের "Oblomov" (১৮৫৯)। প্রথম উপন্যাসটিকে সমালোচকেরা চিহ্নিত করেন প্রাণবন্ত পল্লীজীবনের দলিলধর্মী উপন্যাস রূপে। উনিশ শতকের ষাটের দশকে তুর্গেনিভ, দস্তয়ভস্কি ও তলস্তয় তাঁদের উপন্যাসে বাস্তবতাবাদের মহান বিকাশ সাধন করেন। তাঁদের পরে রুশ সাহিত্যে আবির্ভূত হন আন্তন শেখভ (১৮৬০-১৯০৪)। শেখভ প্রধানত নাটক ও ছোটগল্পে সমাজের অন্ত্যজ, উন্মূল সাধারণের জীবন বাস্তবতার উপস্থাপনা করেন।

রুশ উপন্যাসিকেরা সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে অসামান্য ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তত্ত্বপ্রবণ ছিলেন না। একটি তত্ত্ব তৈরি করা ও তার ব্যাখ্যা ভাষ্য রচনা করে, একটি সাহিত্য ধারা গড়ে তোলার মেজাজ তাঁদের ছিলো না। তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনাগুলোর মধ্য দিয়েই তাঁরা নির্দেশ করেছেন তাঁদের বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস। যদিও দস্তয়ভস্কি "লেখকের দিনপঞ্জি" গ্রন্থে সাহিত্যের ভূমিকা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেন; তলস্তয়ও শিল্পকলা বিষয়ে, শিল্প ও নীতির সম্পর্ক বিষয়ে রচনা করেন "শিল্পকলা কী" (১৮৯৮) নামক গ্রন্থ, কিন্তু এ সব গ্রন্থ রুশ সাহিত্যের বাস্তবতাবাদী ধারার ইশতেহার কিংবা পথ নির্দেশক হয়ে ওঠে নি। বরং তাঁরা যে শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টি করেন তা-ই প্রবর্তন করে নতুন যুগের। মূলত বেলিনস্কি, ও চেরনিশেভস্কির তাত্ত্বিক আলোচনায় সাহিত্যে বাস্তবতাবাদের বিকাশের ভিত্তি গড়ে তোলে, আর বাস্তবতাবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সৃষ্টিশীল রচনায়, সৃষ্টিশীল রচনাই রুশ বাস্তবতাবাদকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[২০]

---

২০. Becker, Gearge J. (ed.,) DMLR. Ibid, pp. 10 - 11.

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের আখির দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবতাবাদের প্রবক্তারূপে আবির্ভূত হন হোয়েলস। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে হোয়েলস যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবতাবাদকে একটি সাহিত্য আন্দোলন রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হন। এ-আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা রূপে হোয়েলস তাঁর নিজের নামের সঙ্গে হেনরি জেমসকেও জড়িয়ে নেন। হোয়েলসের বেশ আগে, ১৮৬৪-তেই হেনরি জেমস ফরাশি উপন্যাসিকদের উল্লেখ করতে গিয়ে 'বাস্তবতাবাদী ধারা' কথাটি ব্যবহার করেন, তবে এ-তত্ত্বটির ভাষ্য রচনায় তিনি ব্যাপৃত হন নি কিংবা এ আন্দোলনের প্রবক্তার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হন নি। এ-ভূমিকা গ্রহণ করেন হোয়েলস্। হোয়েলস আশির দশকের মধ্যভাগে বোস্টন থেকে নিউইয়র্কে চলে আসেন এবং বাস্তবতাবাদী ধারাটির ত্রিমুখী প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হন। তিনি রচনা করে চলেন (ক) বাস্তবতাবাদী উপন্যাস, (খ) ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী লেখকদের রচনারীতি, বাস্তবতাবোধ ও উপন্যাসে বাস্তবতার ভূমিকা বিষয়ক সমালোচনা গ্রন্থ, এবং (গ) পত্রিকার সাহিত্যিক স্তম্ভে তুলে ধরতে থাকেন বিভিন্ন দেশের বাস্তবতাবাদের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য। হোয়েলস্ যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবতাবাদ প্রতিষ্ঠার একক সাধনা চালিয়ে যান ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি একদিকে যেমন বাস্তবতাবাদ বিমুখ মার্কিন রক্ষণশীলদের সঙ্গে এক দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হন, অন্যদিকে অবতীর্ণ হন এ-আন্দোলনের প্রচারকের ভূমিকায়। যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান পত্রিকা Atlantic monthly এবং Harper's onthly -র সাহিত্য স্তম্ভে হোয়েলস্ তাঁর প্রচার কার্য চালান। এ-সব পত্রিকায় হোয়েলস্ বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের পরিচয় দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদীয়মান নবীন লেখকদের প্রথাগত রচনারীতি ও বিষয়-বস্তুর থেকে সরে আসার প্রেরণা জুগিয়ে চলেন। ১৮৮৬-র জানুয়ারীতে হোয়েলস Harper's Monthly-র ' Editor's study' শাখাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন থেকেই পত্রিকাটির ওই স্তম্ভটি বাস্তবতাবাদী ধারার প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ স্তম্ভে হোয়েলস ইউরোপীয় লেখকদের রচনার বাস্তবতাবাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণরাশি ব্যাখ্যা করে চলেন। তবে ফরাশি বাস্তবতাবাদী লেখকদের প্রতি হোয়েলস বিমুখ ও অনীহ ছিলেন। তিনি ফরাশিদের তুলনায় রুশীয় ও স্পেনীয়দের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ বাস্তবতাবাদী বলে গণ্য করতেন। মাসের পর মাস ধরে Harper's Monthly-র ' Editor's study 'স্তম্ভে হোয়েলস্ স্ক্যান্ডিনেভীয়, রুশীয়, ইতালীয়, স্পেনিশ বাস্তবতাবাদ ও বাস্তবতাবাদী লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করে চলেন, তাঁর এ-আলোচনার মধ্য দিয়েই মার্কিন পাঠকেরা ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী লেখকদের অধিকাংশের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। স্পেনীয়, রুশ, ইতালীয় বাস্তবতাবাদীদের অতিমূল্যায়নের প্রবণতা হোয়েলসের মধ্যে দেখা যায়। এ অতিমূল্যায়নের পেছনে ছিলো দুটি কারণ; প্রথমতঃ এসব অঞ্চলের লেখকেরা হোয়েলস ও তাঁর পাঠকদের কাছে একেবারে অপরিচিত

Dhaka University Institutional Repository

ও নতুন ছিলেন। নতুনের সঙ্গে মার্কিন পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার আগ্রহেই তিনি এসব অঞ্চলের বাস্তবতাবাদী রচনার ব্যাপক ব্যাখ্যা ভাষ্য রচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ ফরাশি বাস্তবতাবাদকে হোয়েলস্ কখনো সুনজরে দেখেন নি, বরং অবজ্ঞা করতেন। তিনি তাঁর সাহিত্যিক সুস্তে ফরাশিদের চেয়ে রুশীয়, স্পেনীয়দের বড়ো মাপের বাস্তবতাবাদীরূপে প্রতিপাদন করে ফরাশি বাস্তবতাবাদের প্রতি তাঁর বিমুখতা প্রকাশ করেছেন। হোয়েলসের মতে ফরাশিরা যাকে বাস্তবতাবাদ বলে তা হচ্ছে একধরণের ' ugly French Fatich', এবং তিনি মনে করেন ফরাশিদের এ-ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতাবাদের সুনামকে কলুষিত করেছে।[১৯]

১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় হোয়েলসের সমালোচনা গ্রন্থ "Critisim and Fiction"। গ্রন্থটিকে মার্কিন বাস্তবতাবাদের ইশতেহার রূপে গণ্য করা হয়। এ-গ্রন্থে মার্কিন বাস্তবতাবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়ে আছে। Harper's Monthly পত্রিকার' Editor's study ' সুস্তে প্রকাশিত বাস্তবতাবাদ বিষয়ক বিভিন্ন লেখাই এতে সংকলিত হয়েছে। এ-গ্রন্থে হোয়েলস্ সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাস্তবতাবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যার পাশাপাশি মার্কিন বাস্তবতাবাদী লেখকদের দায়িত্বও নির্দেশ করেন। হোয়েলসের মতে সাহিত্য ও শিল্পকলা জীবনের অভিব্যক্তি, সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পকলায় জীবন কতোটা উপস্থাপিত হয়েছে সততার সঙ্গে তা নির্দেশ করা। তিনি বলেন, ঔপন্যাসিক প্লট নির্মানের নিবিষ্ট থাকবেন না, বরং উপন্যাসে প্লটের গুরুত্ব যথাসম্ভব হ্রাস করতে হবে। চরিত্র সৃষ্টিতে নিবিষ্ট থাকাও ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব নয়। ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব একটাই-তা হচ্ছে তাঁর রচনাকে অবশ্যই জীবনের প্রতিফলন হয়ে ওঠতে হবে। রুশীয় বাস্তবতাবাদী রচনার প্রশংসা করলেও হোয়েলস্ প্রধান রুশ বাস্তবতাবাদী দস্তয়েভস্কির বাস্তবতাবাদকে অপছন্দ করতেন। মার্কিন বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উপন্যাস অবশ্যই জীবনকে অবিকল অবিকৃতরূপে উপস্থাপিত করবে, কিন্তু তা কখনোই দস্তয়েভস্কির করুণ বিষাদ ও হতাশাবাদকে প্রশ্রয় দেবে না। মনুষ্য প্রকৃতি ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো আশাবাদী এবং গণতান্ত্রিক। তাঁর মতে মার্কিন ঔপন্যাসিকদের উচিত জীবনের স্নিগ্ধ সুস্মিত দিকে ব্যাপৃত থাকা, কারণ আমেরিকার জীবন ধারা সম্ভাবনাপূর্ণ, সুন্দর ও সুস্মিত। হোয়েলস্ বলেন, নরনারীর সম্পর্ক বর্ণনার সময় মার্কিন ঔপন্যাসিক মাত্রাজ্ঞান হারাবেন না। যদিও বাস্তবতার যথাযথ বিশ্বস্ত উপস্থাপনই একজন লেখকের কর্তব্য, তবে বাস্তবতার যথাযথ উপস্থাপনার সময়ও মার্কিন লেখক অবশ্যই মাত্রাজ্ঞানদ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকবেন। তিনি বলেন ফরাশি ঔপন্যাসিদের মতো মার্কিন বাস্তবতাবাদীরাও নরনারীর সম্পর্কের ক্লেদ ও গ্লানির অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করবেন না,

---

১৯. Wellek, Rene, <u>A History of Modern criticism: 1750-1950</u>, (Jonathan cape, London, 1966) P. 307.

Dhaka University Institutional Repository

কারণ তা অসুন্দর ও অনৈতিক। তাই ওই সম্পর্ককে আরো পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রূপে দেখাতে হবে। এই অভিমত থেকেই মার্কিন বাস্তবতাবাদ প্রবক্তার অন্তর্গত বিরোধ, দ্বিধা ও সংশয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি চেয়েছেন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা, একই সঙ্গে চেয়েছেন সুন্দর, নৈতিক, পবিত্র ও মার্জিত জীবন-চিত্র। উপন্যাসে নরনারীর সম্পর্কের যে-রূপের উপস্থাপনা তাঁর কাম্য, ওই রূপটি অবিকৃত বাস্তবরূপ নয়, তা আদর্শায়িত এবং বাস্তব থেকে দূরবর্তী। তিনি একই সঙ্গে কামনা করেছেন প্রাত্যহিক অবিকল বাস্তবতাকে এবং আদর্শায়িত, শুদ্ধ জীবনকে, তিনি মনে করেন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনই লেখকের লক্ষ্য হবে, একই সঙ্গে তিনি বলেন বাস্তবতাবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার কদর্য, কুৎসিত অংশটিকে পরিহার করে চলবে। হোয়েলস পরবর্তী প্রজন্মের মার্কিন বাস্তবতাবাদী লেখকদের জীবনের রূঢ়তা, অপ্রেম স্বার্থপরতা, যৌন রিরংসা ইত্যাদি ব্যাপারকে পরিহার করতে পরামর্শ দেন। হোয়েলস অবশ্য নরনারীর ক্লেদাক্ত পঙ্কিল সম্পর্কের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। তিনি স্বীকার করেন যে, 'সমাজের বাহ্য বাস্তবের নিচে কলুষিত, দূষিত প্রেমের অস্তিত্ব রয়েছে।'[২১] তবে তিনি মনে করেন সমাজজীবনে কলুষিত প্রেমের অস্তিত্ব থাকলেও তাকে গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। তাঁর মতে উপন্যাসে যৌনতার স্থান হবে সামান্য। কামনা-বাসনা-সংরাগ শুধু যৌনসংরাগ নয়, সংরাগ হয়ে থাকে বিবিধ। মানব জীবনে যৌন সংরাগের ভূমিকা গভীর হলেও, অন্যান্য সংরাগের ভূমিকাও সামান্য নয়। তিনি বলেন, 'বেদনার সংরাগ, পাপের সংরাগ করুণার সংরাগ, উচ্চাশার সংরাগ, ঘৃণার সংরাগ, ঈর্ষার সংরাগ, ভক্তির সংরাগ বন্ধুত্বের সংরাগ, প্রেমের সংরাগ থেকে, পাপিষ্ঠ প্রেমের সংরাগ থেকে এ সমস্ত সংরাগের ভূমিকা জীবন নাট্যে অনেক বেশি'।[২২] হোয়েলসের মতে আমেরিকার এই আশাবাদী, গণতান্ত্রিক ও শোভন বাস্তবতাবাদী শিল্পকলা মনুষ্যত্বের সেবা করবে এবং মানুষকে 'দয়ালুতর' ও 'উৎকৃষ্টতর' করে তুলবে। হোয়েলস্ জীবনের স্মিত অংশটুকু পছন্দ করেন, তাই দস্তয়েভস্কির বিষণ্ণতা ও হতাশা তাঁর পছন্দ হয় নি; বরং তলস্তয়ের রচনার সাদাসিদে সরলতা ও সহজভঙ্গীর কারণে তলস্তয়কে হোয়েলস্ পছন্দ করেছেন। ক্লেদ, রূঢ়, হতাশা আছে বলে ফরাসি বাস্তবতাবা-

২১. Wellek, Rene, A History of Modern Critisism 1750-1950, P. 209

২২. Ibid, P. 209.

Dhaka University Institutional Repository

বাদীদের লেখাও তিনি অপছন্দ করেছেন, একই কারণে অপছন্দ করতেন পরবর্তী ফরাশি প্রাকৃতবাদী এমিল জোলার রচনাবলী।

এই নতুন সাহিত্যধারা প্রবর্তনের ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথাগত ধারার সমর্থক রক্ষণশীল গোত্রকে ক্ষুব্ধ করে। তাঁরা হোয়েলসের নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। রক্ষণশীলেরা যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবতাবাদী ধারা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের রুচি ও চেতনা যেহেতু ইউরোপীয়দের চেয়ে ভিন্ন, তাই ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদ আমেরিকায় খাপ খাবে না। রক্ষণশীল বিরোধী গোত্রের প্রধান ছিলেন মরিস থমসন (Mauriee Thompson)। হোয়েলসকে আক্রমণ করে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর মতে, তলস্তয় কোনোভাবেই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রূপে গণ্য হবার উপযুক্ত নয়। কারণ তলস্তয়ের উপন্যাসে শিল্প সৌকর্যের চিহ্ন মাত্র নেই, বাচালতা ও দুর্নীতি এই রচনাবলীতে অসংস্কৃত ও অমার্জিত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। থমসন মনে করেন উপন্যাস বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রুচি ফরাশি, স্পেনীয়, পর্তুগাল কিংবা রুশীদের চেয়ে অনেক ভিন্ন। তিনি বাস্তবতাবাদকে মার্কিন আদর্শবিরোধী বলে গণ্য করেন, এ-প্রবণতাটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত, সম্পূর্ণ বিদেশী একটি ধারা মাত্র। তিনি বলেন যে জাতীয় মূল্যবোধ ও আদর্শের পরিপন্থী কোনো ধারার আবির্ভাব ও সাহিত্যে উপস্থাপনকে কোনো খাঁটি দেশপ্রেমিকই মেনে নিতে পারে না।[২৩] বিরোধীদের আক্রমণ ও সমালোচনা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবতাবাদের গতি অব্যাহত থাকে। বলা যায় হোয়েলসের একক প্রচেষ্টাই বাস্তবতাবাদকে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বিকশিত করে। তবে বাস্তবতাবাদী ধারার প্রবক্তা হিসেবে হোয়েলস যেমন সাফল্য লাভ করেন, বাস্তবতাবাদী লেখক হিসেবে ততখানি সফল হন নি তিনি। ঔপন্যাসিক হিসেবে হোয়েলস যুক্তরাষ্ট্রে শক্তিশালী বাস্তবতাবাদী উপন্যাস ধারা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হন। ফ্রান্সে ফ্লবেয়ার যেমন বাস্তবতাবাদী উপন্যাস ধারার সূচনা ও বিকাশ ঘটান, যুক্তরাষ্ট্রে হোয়েলস্ তা করে উঠতে পারেন নি। সাধারণভাবে হোয়েলসের উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় সামাজিক পরিস্থিতি। তিনি উপন্যাসে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপস্থাপনার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন এবং তাঁর উপন্যাসের মূল ভিত্তিও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাজাত হলেও হোয়েলস্ উপন্যাসে যে সামাজিক পরিস্থিতির উপস্থাপনা করেছেন তা অসামান্য নয়। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে সমাজ- প্রতিবেশ-পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে অগভীর

---

২৩. উদ্ধৃত Becker. George J. (ed.,) Ibid, P. 11.

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে, পরবর্তী পর্যায়ের উপন্যাসেও বাস্তবতার অসাধারণ উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায় না। তবে হোয়েলস্ তাঁর সমকালীন পরিবর্তনমুখী সমাজ ও মূল্যবোধের পরিচয় বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপন্যাসে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন; "A modern Instance" (১৮৮১) ও "The Rise of silas Hapham" (১৮৮৫) উপন্যাস দুটিতে এই প্রয়াস মুদ্রিত হয়ে আছে। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত সময়ে হোয়েলস্ পাঁচটি সামাজিক উপন্যাস লেখেন, ঐ-সকল উপন্যাসে সমকালীন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে; যে- সমাজে অর্থ সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ও সবকিছুর নিয়ন্তা, সে-সমাজে ব্যক্তির অবস্থান নির্দেশেও সচেষ্ট হয়েছেন; কিন্তু ওই অন্ধ, দুর্জ্ঞেয়, নৈর্ব্যক্তিক শক্তির স্বরূপ নির্দেশে সমর্থ হন নি তিনি। নানা ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হোয়েলস্ মার্কিন বাস্তবতাবাদী উপন্যাস ধারার পথিকৃৎ রূপে গণ্য হয়ে থাকে। তাঁর বাস্তবতাবাদী উপন্যাস অসামান্য নয়; কিন্তু এই উপন্যাস সমূহ ও প্রবন্ধ -আলোচনাই তাঁর পরবর্তী মার্কিন লেখকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভর উপন্যাস সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত করে।

১৮৮০-র দশকে ইতালিতে লুইগি কাপুয়ানা, জিওভান্নি ভের্গা প্রমুখের প্রচেষ্টায় স্থানীয় একধরনের বাস্তবতাবাদের বিকাশ ঘটে, যাকে বলা হতো 'ভেরিসমো' (Verismo)। ভের্গা নগ্ন ও অশোধিত সত্যের উপস্থাপনাকেই বাস্তবতাবাদী রচনার বৈশিষ্ট্য বলে গন্য করেন। তিনি তাঁর ' Gramiga's Mistress ' গল্পের ভূমিকায় গল্পটিকে 'মানবিক দলিল' বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে তাঁর রচনায় উপস্থাপিত হয়েছে 'নগ্ন ও অশোধিত সত্য' যা লেখকের দৃষ্টি -কাঁচের দ্বারা বিকৃত হয়নি।[২৪] ভের্গা বলেন যে এ-গল্পে তিনি যা করেছেন তা হচ্ছে ' Picked up along the paths in the countryside, with nearly the same simple and picturesque words that characterize popular narration'।[২৫]

---

২৪. Becker, George. J (ed.,), Ibid, P. 14.

২৫. উদ্ধৃত, Ibid, P. 14.

Dhaka University Institutional Repository

নিরস্তু ধরণের বাস্তবতাবাদের বিকাশ ঘটে স্পেনেও। স্পেনে এই নিরস্তু ধরণের বাস্তবতাবাদের বিকাশ ঘটে উনিশ শতকের শেষভাগে, এমিলিয়া পারদো বাজান (১৮৫৮-১৯২১), বেনিতো পেরেজ গলদোস (১৮৪৩-১৯২০), প্রমুখের হাতে। এ-সময় ফরাশি প্রাকৃতবাদের ঢেউও স্পেনে পৌঁছোয়, কিন্তু স্পেনীয় বাস্তবতাবাদীরা জোলার প্রাকৃতবাদ দ্বারা দীক্ষিত হননি। বরং তাঁরা এ-তত্ত্বের প্রতি বিমুখ ছিলেন। প্রাকৃতবাদী রচনারীতি ও তত্ত্বের প্রতি তাঁদের অনীহা ও অবজ্ঞা বিভিন্ন আলোচনায় খোলাখুলি প্রকাশ করেন। বিচ্ছিন্ন বাস্তবতার প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু জোলার মতো একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বের আলোকে জীবন ও ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ রীতিটি তাঁদের ভালো লাগেনি। নগ্ন, অপরিশোধিত জীবন উপস্থাপনার ব্যাপারটিও তাঁদের কাছে প্রতীয়মান হয় অমার্জিত ব্যাপার রূপে। স্পেনীয় বাস্তবতাবাদীরা পছন্দ করেন ব্যালজাক, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট প্রমুখের সরল জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাটি। ইংলন্ডে জর্জ এলিয়ট উপন্যাসে জীবনের যে সহজ সরল ও শোভন বাস্তবতার উপস্থাপনা করেন, স্পেনীয়রা তেমন বাস্তবতার উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন। জোলার প্রাকৃতবাদের জড়বাদী বস্তুবাদের কারণে এমিলিয়া বাজান প্রাকৃতবাদকে অপছন্দ করতেন। জড়বাদী বস্তুবাদকে তিনি অভিহিত করেন প্রাকৃতবাদের প্রধান পাপ বলে। স্পেনে এমিলিয়া বাজান যে বাস্তবতাবাদী ধারার প্রবক্তা ছিলেন তা' ক্যাথলিক বাস্তবতাবাদ' নামে পরিচিত।[২৬] জোলার জড়বাদী নিয়ন্ত্রণবাদকে অপছন্দ করলেও স্পেনীয় বাস্তবতাবাদীরা ফরাশি প্রাকৃতবাদের অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ রীতিকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন। এমিলিয়া বাজান, পেরেজ গালদোস, লিওপোলদো আলাস প্রমুখের রচনায় তীক্ষ্ণ ও অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ রীতির চমৎকার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেন ব্যক্তিজীবন ও সমকালের সমাজজীবনের শোভন বাস্তবতাকে, এবং অনুপুঙ্খ উপস্থাপন রীতির সাহায্যে তাকে উপন্যাসে বিধৃত করেন।

---

২৬. Bazan. Emilia pardo, 'on Spanish Realism' in DMLR, P. 261.

Dhaka University Institutional Repository

২.২ বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন তত্ত্ব

সাধারণ বাস্তবতাবাদী ও আন্দোলনকারী বাস্তবতাবাদী-উভয় গোত্রের লেখক ও তাত্ত্বিকেরা বাস্তবতাবাদী রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই কোনো একটি রচনা বাস্তবতাবাদী রচনা হয়ে ওঠে। আদি ঔপন্যাসিকদের একজন, রিচার্ডসন, বাহ্যবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাকেই একটি রচনার বাস্তবঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার প্রধান শর্ত বলে গণ্য করেন। তিনি নিজেকে প্রকৃতির অনুলিপিকার ভেবে গর্বিত হতেন। ১৭৬২-তে রিচার্ডসন বলেন, 'আপনি কি মনে করেন যে আমি রোমান্স লিখছি? দেখতে কি পাচ্ছেন না যে আমি নকল করছি প্রকৃতির?'[২৭] বাস্তবতাবাদী লেখকেরা বাস্তবতাকে কখনোই নতুনরূপে সৃষ্টি করেন না। বাস্তবতাবাদের তাত্ত্বিক ভিসসারিওন বেলিনস্কি এ-শ্রেণীর রচনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেন যে বাস্তবতাবাদী রচনা বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত। আদর্শবাদী ও বাস্তবতাবাদী কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের এ বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করেন। তাঁর মতে জীবন যে-রকম সত্য উপস্থাপিত করে বাস্তবতাবাদী কবিতা তার সঙ্গে সৌষম্য রক্ষা করে। এ-শ্রেণীর রচনা জীবনের বাস্তবতাকে বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে উপস্থাপিত করে।[২৮] বেলিনস্কির মতে বাস্তবতাবাদী কবিতা জীবনকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করেনা, বরং জীবনকে উপস্থাপিত করে। দর্পণে যেমন বস্তুরাশির অবিকল নৈর্ব্যক্তিক প্রতিফলন ঘটে, এ-সাহিত্যেও বাস্তবতাকে পাওয়া যায় তেমনি অবিকল ভাবে। তিনি বলেন, '..... Like a convex glass, mirrors in itself from one point of view, life's diverse phenomena, extracting from them those that are necessary to create a full, vivid and ~~organically~~ -

---

২৭. উদ্ধৃত, Allott. Miriam, Novelists on the Novel, P. 41.

২৮. Belinsky, Vissarian, 'On Realistic Poetry', in Becker, George J. (ed.,) Documents of Modern literary Realism. P. 43.

Dhaka University Institutional Repository

organically unified picture.[২৯] তার মতে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্মম অকপটতা, এখানে জীবন নগ্নভাবে তার সমস্ত কদর্যতা ও সৌন্দর্যসহ উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, 'আমরা জীবনের আদর্শকে চাইনা, চাই জীবন যেরকম, সেরকম জীবনকেই, ওই জীবন ভালো বা মন্দ যা-ই হোক তাকে আমরা অলঙ্কৃত করতে চাইনা।'[৩০] বাস্তবতার এই নিরলঙ্কার অবিকল উপস্থাপনই বাস্তবতা বাদীদের লক্ষ্য। বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেরনিশেভস্কি একই মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন শিল্পকলা হচ্ছে বাহ্যবাস্তবতার প্রতিলিপি এবং সাহিত্যের কাজ হচ্ছে জীবন ও প্রকৃতির পুনরুপস্থাপন। তাঁর মতে, সাহিত্য জীবনের এমন দর্পন, যা জীবনকে শুধু প্রতিফলিত করবে, বাস্তবতার কোনো বদল ঘটাবে না।[৩১] শিল্পকলার প্রকৃতি নির্দেশের জন্যে আরো একটি রূপক ব্যবহার করেছেন তিনি। তিনি মনে করেন শিল্পকলা বাস্তবতার engraving বা খোদাই চিত্র। যখন কোনো ছবির এনগ্রেভিং বা খোদাই তৈরি করা হয়, তখন মূল ছবিটিকে আরো সুন্দর বা নিখুঁত করার জন্যে খোদাই করা হয় না। খোদাই করা হয় মূল ছবিটির বহু প্রতিলিপি বহু জনের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। শিল্পকলার চরিত্রও এমনি। শিল্পকলা বাস্তবতাকে আরো সুন্দর বা নিখুঁত করার জন্যে পুনরুপস্থাপন করে না, শিল্পকলা বাস্তবতার পুনরুপস্থাপন করে কেননা বাস্তবতা স্বভাবতই সুন্দর। এনগ্রেভিংয়ের মতো শিল্পকলাও বাস্তবতার সৌন্দর্য বাড়ায় না, হ্রাসও করে না। শিল্পকলা বাস্তবতার পুনরুপস্থাপন করে কাজ করে বাস্তবতার বিকল্পরূপে। চেরনিশেভস্কির মতে বাস্তবতা কল্পনার থেকে অনেক সুন্দর ও জীবন্ত।[৩২] তিনি মনে করেন, বাস্তবতার সৌন্দর্যের পাশে কল্পনার চিত্রকল্পরাশি ম্লান। তাঁর মতে, বাস্তবতার সৌন্দর্য ও মহিমা কখনো শিল্পকলার আয়ত্তে আসবে না, তবু শিল্প-

---

২৯. Ibid, P. 42.

৩০. Ibid, P. 43.

৩১. উদ্ধৃত, Wellek, Rene. A History of modern literature: 1750, P.240.

৩২. Chernishevsky. N.G, ' Life and Aesthetics', in Becker, George J. (ed.,) Ibid, P. 63 - 64.

Dhaka University Institutional Repository

কলার লক্ষ্য হবে বাস্তবতাকে উপস্থাপন করা। এ-লক্ষ্যের কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে এভাবে বাস্তবতার সৌন্দর্য বহুস্থানে ও বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব।[৩৩] চেরনিশেভস্কি শিল্পকলায় বাস্তবতা উপস্থাপনের যে কারণগুলো নির্দেশ করেছেন সেগুলো বেশ স্থূল। তবে ইতালীয় সমালোচক ফ্রান্সেসকো দে সাংকতিস ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে শিল্পকলার লক্ষ্য সত্য বা বাস্তবের উপস্থাপন ঠিকই, তবে সে বাস্তবতা অবশ্যই হবে শিলিত ও পরিমার্জিত। তাঁর মতে শিল্পকলা অনুকরণমাত্র নয় কিংবা শিল্পকলা শুধুই বাস্তবতার নিষ্ক্রিয় প্রতিফলন মাত্র নয়।[৩৪]

কোনো কোনো বাস্তবতাবাদীর মতে বাস্তবতার সত্যপ্রতীয়মান রচনার জন্যে এবং সেই সঙ্গে 'মানব-অভিজ্ঞতার অসাধারণত্বের জন্যে প্রীতি'কে তৃপ্ত করার জন্য ঔপন্যাসিককে অবশ্যই তাঁর পাত্রপাত্রী ও ঘটনাবলীকে 'সম্ভবপর' করে তুলতে হবে।[৩৫] আদি বাস্তবতাবাদীদের কেউ কেউ, যেমন ফিল্ডিং চরম ভালো কিংবা চরম মন্দকে পরিহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। ফিল্ডিং যদিও সাধারণ ঘটনার উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু কেবলই দৈনন্দিন বাস্তবতার বৃত্তান্ত বর্ণনায় তৃপ্তি বোধ করেন নি তিনি। ফিল্ডিং মনে করেন রচনাকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্যে প্রত্যেক ভালো লেখককেই 'সম্ভবপরতা'র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে।[৩৬] তবে তার মানে এই নয় যে পাত্রপাত্রী ও ঘটনা হয়ে উঠবে কেবলই দৈনন্দিনতাগ্রস্ত। সম্ভবপরতার বৃত্তের ভেতর তিনি অবস্থান করলেও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ও চরিত্রদের উপস্থাপনাও তিনি করবেন। যেমন ঘটনা ঘটে প্রত্যেক রাস্তায় বা বাড়িতে, কিংবা যা পাওয়া যায় সংবাদ পত্রের স্তম্ভে - তেমন দৈনন্দিনতাদুষ্ট ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর আখ্যায়নই শুধু তাঁর রচনার উপজীব্য হবে না, যে সব ব্যক্তি ও বস্তু পাঠকের অভিজ্ঞতার মধ্যে কখনোই পড়েনি লেখক তা গ্রহণেও দ্বিধান্বিত হবেন না।[৩৭] স্যামুয়েল রিচার্ডসন মনে করেন চরম ভালো কিংবা চরম মন্দকে

---

৩৩. উদ্ধৃত, Ibid, pp. 64 - 79.

৩৪. উদ্ধৃত, Wellek, Rene, Ibid, P. 99.

৩৫. উদ্ধৃত, Allott, Miriam, <u>Novelists on the Novel</u>, P. 20.

৩৬. উদ্ধৃত, Allott, Miriam, Ibid, P. 20.

৩৭. উদ্ধৃত, Allott, Miriam, Ibid, P. 61.

Dhaka University Institutional Repository

পরিহার করার মধ্য দিয়েই লেখকের পক্ষে বাস্তবতার প্রতীয়মান রচনা সম্ভব। তাই উপন্যাসিককে চরম - ভালো কিংবা মন্দকে পরিহার করতে হবে। তিনি ঘটনার আকস্মিক বদলেরও পক্ষপাতী নন, কারন তা রচনার স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ন করে। তাঁর মতে, 'তাঁর রচনার ভাগ্য যাই হোক না কেনো উপন্যাসিককে অবলম্বন করতে হবে এক ভিন্ন পদ্ধতি। তাঁকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আকস্মিক পরিবর্তন, যা সাধারণত পাঠকের অনুমানশক্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়-তাতে কোনো শিল্প নেই, স্বাভাবিকতা নেই, এমন কি সম্ভাব্যতাও নেই'।[৩৮] সাধারণ বাস্তবতাবাদী লেখকদের কারো কারো বিশ্বাস 'বাস্তবজীবনের রীতিনীতি'র' উপস্থাপনাই রচনাকে বাস্তবসম্মত করে তোলে, কারণ শুধু বাস্তবজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়েই লেখক সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন। এ-কারনেই হথর্ন বলেছেন যে 'উপন্যাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, এবং মানব অভিজ্ঞতার সাধারণ ব্যাপারগুলোকেও নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন করবে।[৩৯] হথর্নের মতে 'উপন্যাস অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেবে মানবজীবনের সমস্ত দিকের। ওই বর্ণনা শুধু সম্ভবপরতার হবে না, তা হবে যেমন সম্ভাব্যতার তেমনি মানব অভিজ্ঞতার সাধারণ ধারারও'।[৪০] উইলিয়ম মেকপীস থ্যাকারে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই কোনো একটি রচনা বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে বলে মনে করেন। বাস্তবতার হুবহু উপস্থাপনাই একটি রচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি নির্দেশ করেন। থ্যাকারে বলেন, 'উপন্যাসের লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃতি তথা বাস্তবের উপস্থাপন, যতটা যথাযথ, বিশ্বস্ত ও শক্তভাবে পারা সম্ভব, সেভাবেই বাস্তবতার আবহসৃষ্টি কতে হবে। ট্র্যাজেডি, কবিতা কিংবা অত্যুচ্চ মহিমান্বিত কোনো নাটকে লেখক ইচ্ছেমতো বিভিন্ন আবেগের উপস্থাপন করতে পারেন, এসব রচনায় চরিত্রেরা বীরের ভঙ্গীতে চলাফেরা করে ও কথা বলে। কিন্তু একটি ড্রইংরুমকেন্দ্রিক নাটকে একটি কোট হবে প্রকৃত কোটই, পোকার হবে অবিকল পোকারই, এবং আমার বিশ্বাস সেখানে অবশ্যই বাহুল্য কিছু থাকবে না, থাকবে না কোনো কারুকার্যখচিত টিউনিক'।[৪১] অর্থাৎ থ্যাকারে মনে করেন বাস্তবতাবাদী লেখকের অবশ্যই থাকবে গভীর পরিমিত -বোধ ও বাস্তবতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী।

---

৩৮. উদ্ধৃত, Ibid, P. 61.

৩৯. উদ্ধৃত, Ibid, P. 21.

৪০. উদ্ধৃত, Ibid, P. 51.

৪১. উদ্ধৃত Ibid, P. 67.

Dhaka University Institutional Repository

মপাসাঁও মনে করেন, সরল বাস্তবতার অনুভূতি সঞ্চার করাই উপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য। বাস্তবতাবাদীদের এক গোত্র সম্ভবপরতার সীমার মধ্যে অবস্থান করার মধ্য দিয়ে বাস্তবতার বিশ্বস্ত থাকা সম্ভব বলে মনে করেন। অন্য আরেক গোত্রের কাছে এ ব্যাপারটি এক সংকীর্ণ গণ্ডীর ভেতর একরকম বন্দীজীবন যাপন রূপে গণ্য হয়। তাঁরা মনে করেন বাস্তবতা এতো সংকীর্ণ ব্যাপার নয়। তাঁদের মতে শুধুমাত্র বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনাই কোনো রচনাকে বাস্তবতাঘনিষ্ঠ করে তোলে এমন নয়। তাঁরা বাস্তবতার সীমানা বিশাল বলে মনে করেন। তাই অন্যেরা যখন তাঁদের রচনার বিরুদ্ধে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রমের অভিযোগ তোলেন তখন তাঁরা সযত্নে ব্যাখ্যা করেন যে তাঁরা সীমা অতিক্রম করেননি, বরং বাস্তবতার সীমাকে সম্প্রসারিত করেছেন। যেমন, দস্তয়ভস্কি দাবী করেন যে যদি তাঁর কোনো ঘটনা বা উপন্যাসকে অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে হয়, তবে তা তাঁর দোষ নয়, বরং তা পাঠকের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভুল ধারনার ফল।[৪২] তিনি মনে করেন তাঁর রচনাকে যে ব্যতিক্রমধর্মী বলে অভিযুক্ত করা হয় তা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রমের ফল নয়, তা হচ্ছে সত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের ও পাঠককুলের বিশ্বাসগত ভিন্নতার ফল। দস্তয়ভস্কি বলেন, 'শিল্পকলা সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা আছে। তা হচ্ছে, অধিকাংশ লোক যাকে উদ্ভট ও সর্বজনীনতাহীন ব'লে মনে করে, আমি তাকে মনে করি সত্যের সারৎসার বলে'।[৪৩] ডিকেন্সও তাঁর উপন্যাসে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে গেছেন। তিনিও দস্তয়ভস্কির মতোই বলেন যে যাকে সীমা লঙ্ঘন বলে মনে করা হচ্ছে, তা সীমা লঙ্ঘন নয়। ঘটনা ও চরিত্রের অনিবার্য পরিণাম দেখানোর জন্যেই তিনি এমন করেছেন। যেমন " A Tale of two cities" উপন্যাসে ম্যাডাম ডিফার্জের আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য মৃত্যু তাঁর মতে ' inseparable from the passion and action of the character' এবং 'consistent with the entire design[৪৪]

---

৪২. Ibid, P. 42.

৪৩. উদ্ধৃত Allott. Miriam, Ibid, P. 68.

৪৪. উদ্ধৃত Ibid, P. 21.

Dhaka University Institutional Repository

ডিকেন্স মনে করেন যে-কোনো আকস্মিক ও অভাবনীয়ও সম্ভাব্য বলে গণ্য হতে পারে, যদি তা সমগ্র উপ-ন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তিনি মনে করেন উপন্যাসে অভাবনীয়ের উপস্থাপন: মানেই বাস্তবতার মর্যাদা হানি করা নয়। ডিকেন্স বলেন, 'যেখানে দুর্ঘটনা (যেমন মৃত্যু) চরিত্রের সংরাগ - ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, যেখানে তা উপন্যাসের সমগ্র রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং সমগ্র কাহিনীর পরিণতিরূপে যেখানে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তা আমার কাছে অনেকটা স্বর্গীয় সুবিচার' বলে মনে হয়।'[৪৫] কিন্তু জর্জ এলিয়ট পোষণ করেন বিপরীত ধারণা। তাঁর মতে, শুধুমাত্র সম্ভবপরতার ভেতর অবস্থান করেই রচনাকে বাস্তবসম্মত করা সম্ভব। তিনি মনে করেন লেখক ইচ্ছে করলেই ইচ্ছেমতো সুন্দর জীবনের গল্পকথা বলে যেতে পারেন, সৃষ্টি করতে পারেন চরম ভালো পাত্রপাত্রীদের, কিন্তু তা হয়ে উঠবে অবাস্তব উপাখ্যান এবং বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক সত্য থেকে লেখক দূরে সরে যাবেন। এলিয়ট মনে করেন বাহ্যবাস্তবতা, সমাজ ও পরিবেশ লেখকের মনের দর্পণে যেমন অবিকল প্রতিফলিত হয় তিনি উপন্যাসে তা-ই উপস্থাপনা করেন। এভাবেই লেখকের পক্ষে সম্ভব বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। তিনি বলেন : 'it happens, on the contrary, that my strongest effort is to avoid any such arbitrary picture, and to give no more than a faithful account of men and things as they have mirrored themselves in my mind.'[৪৬]

---

৪৫. উদ্ধৃত Ibid, P. 66

৪৬ . Eliot, George, 'On Realism', in Beeker (ed.,) P. 113.

Dhaka University Institutional Repository

বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনা অবিকল উপস্থাপনাবাদীদের লক্ষ্য হলেও, বাস্তবতার সকল সুর সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে কিনা এ-ব্যাপারে বাস্তবতাবাদীদের মধ্যে মতভেদ-দ্বিধা রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন বাস্তবতার সকল দিকই সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে। সুন্দর ও মধুর বাস্তবতার পাশাপাশি কদর্য, রূঢ় বাস্তবতারও নিরপেক্ষ উপস্থাপনা করবেন লেখক। কারণ বাস্তব জীবনে কদর্য ও সুন্দর পাশাপাশি অবস্থান করে, রূঢ়তা নিষ্ঠুরতার পাশেই থাকে ক্ষমা প্রেম দয়া করুণা ইত্যাদি। তাই বাস্তবতাবাদী লেখক দুটি অংশেরই চিত্রন করবেন। কেউ কেউ জীবনের স্মিত অংশটুকুর উপস্থাপনার পক্ষপাতী, কারণ রূঢ় ও ক্লেদাক্ত বাস্তবতা মনকে পীড়িত করে। কোন্ ধরনের বাস্তবতা উপন্যাসের বা শিল্পকলার উপজীব্য হতে পারে এ-সম্পর্কে নানা মত বিদ্যমান। ইতালীয় সমালোচক ফ্রান্সেসকো দে সাংকতিস মনে করেন বাস্তবতার সকল দিকই শিল্পকলার উপজীব্য হতে পারে। শিল্পকলা গ্রহণ করতে পারে বাস্তবতার যে কোনো বিষয়। এমন কিছু নেই যা শিল্পকলার উপাদান হতে পারে না। এমন কি অসম্পূর্ণ, অনৈতিক, উদ্ভট ও তুচ্ছ বিষয়ও সাহিত্যের উপাদান হয়ে অমর শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে। তাঁর মতে বাস্তবতাবাদী লেখক সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিতের উপস্থাপনায়ও সমান আগ্রহ বোধ করেন। অসুন্দর শুধু শিল্পকলার উপযুক্ত বিষয়ই নয়, তা সুন্দরের চেয়েও অধিক আদরণীয়, তার কারণ সুন্দর শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু অসুন্দর নিজের ও তার বিপরীতের সমন্বয়। এ-কারণেই সাংকতিসের কাছে "ইনফার্নো"-র থায়িস বিয়াত্রিচের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত ও কাব্যিক, আর ইয়াগো 'কাব্যজগতের সর্বাধিক সুন্দর প্রাণীদের অন্যতম'। তাঁর কাছে ফাউস্টের চেয়ে মেফিস্টো আর স্বর্গের চেয়ে নরক উৎকৃষ্ট। তাঁর মতে বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্যে সতীনারী উৎকৃষ্ট বিষয় নয়। তিনি মনে করেন যে চরম উৎকর্ষ বা আদর্শ হচ্ছে বিমূর্ত এবং সে কারণে কাব্যিক।[৪৭]

ব্যালজাক বলেন বাস্তবতাবাদী লেখক হিসেবে তাঁর লক্ষ্য 'history of menners' রচনা করা, এবং তিনি নিজেকে মনে করেন সমসাময়িক সমাজ জীবনের ঐতিহাসিক।[৪৮] তিনি উপন্যাসে একজন

---

৪৬ .Wellek, Rene', A History of modern criticism: 1750-1950, P.102.

৪৭ . Ibid, P. 3.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিলিপিকারের ভূমিকা পালন করে চলেন। তাঁর মতে উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিগত মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ নেই, লেখক শুধু যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিধৃত করেন বাস্তবতা। ব্যালজাক বলেন, ' I should only be the secretary, By drawing up an inventory of vices and virtues, by collecting the chief facts of the Passions, by depicting characters, by choosing the principal incidents of Social life, by composing types out of a combination of homogeneous characteristics, I migh perhaps succeed in writing the history which so many historians have neglected that of manners. '[৪৯] ব্যালজাকের মতে লেখক শুধু তাঁর সময়ের মানুষের আচার আচরণের দলিলই লিপিবদ্ধ করবেন না, তাঁকে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে সাধারণ মানুষের পোশাক-পরিচ্ছেদ, ঘরবাড়ির পরিচয়, তুলে ধরতে হবে তাদের পেশা ও জীবিকার সকল দিকের পরিচয়। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে লেখকের সময়ের সমাজ ও মানুষকে খুব সহজেই চিনে নেয়া সম্ভব হয়।[৫০] অর্থাৎ লেখককে তিনি গণ্য করেন সামাজিক ইতিহাস রচয়িতা রূপে। তাঁর মতে, এই সামাজিক ঐতিহাসিকেরা উপন্যাসে সমাজের বিবরন তুলে ধরেই দায়িত্ব শেষ করেন না, তাঁরা অবশ্যই সকল সামাজিক পরিবর্তন ও ঘটনারাশির কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশ করেন। তারা আয়ত্ত করবেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বৈজ্ঞানিকের মতোই তাঁদের কাজ হবে সকল কার্যের কারণ নির্দেশ করা যেগুলো বিভিন্ন ফলাফল উৎপাদন করে।[৫১] ব্যালজাক শুধু সমাজ বাস্তবতার শুধু সাধারণ উপস্থাপনা করেন নি। তিনি সমাজ ও মানুষকে দেখেছেন একটি বিশেষ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে।

---

৪৯. উদ্ধৃত, Ellmann, Richard, & Feidelson. Charles JR, (ed.,) <u>The Modern Tradition</u> (Oxford University Press, New York, 1965, Seventh edition 1977), P. 248.

৫০. Forester, Norman, (ed.,) <u>American Prose and Poetry</u> (Houghton mifflin company, U.S.A. 1st pub.?, 3rd edition 1947) P. 933.

৫১. Ibid, P. 934.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যালজাক মানুষ সম্পর্কে যে-তত্ত্ব পোষণ করবেন তা হচ্ছে মানুষ তার পরিবেশের অসহায় শিকার । মানুষ তাঁর কাছে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মহৎ সৃষ্টি রূপে গণ্য হয়নি, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকেও তাঁর কাছে কল্যাণ-কর, উপকারী ও চমৎকার বলে মনে হয়নি । তিনি " হিউম্যান কমেডি" গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, প্রকৃতি জগতে যেমন আছে প্রাণীরাজ্য তেমনি এই সমাজও একটি প্রাণীরাজ্য । প্রাণীরাজ্য যেমন বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের সমষ্টি , তেমনি ' men are like varieties in Zoology ।[৫২] [illegible]

[illegible]

ব্যালজাক বলেন :

> I, for my part, convineced of this scheme of nature long before the discussion to which it has given rise, preceived that in this respect society resembled nature. For des not society modify Man, according to the conditions in which he lives and acts, into men as manifold as the species in Zoology? The difference between a soldier, an artisan, a man of business a lowyer, an idler, a student, a statesman, a marchant a sailor, a poet, a begger, a priest, are as great, though not so easy to define, as those between the wolf, the lior, the ass, the crow, the shark, the seal, the sheep, etc. Thus social species have always existed, and will always exist, just as there are zoological species.[৫৩]

---

৫২. উদ্ধৃত , Ellmann & Feidelson (ed.,) The Modern Tradition, P.247

৫৩. উদ্ধৃত, Ibid, P. 247

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এমন : Man is neither good nor bad; he is born with instincts and capabilities; society, far from depriving him as Rousseau asserts, improves him, makes him better, but self-interest also developes his evil tendencies.[৫৪] তাঁর মতে মানুষ স্বভাব ও সামাজিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কোনো ব্যাপারেই মানুষ স্বাধীন নয়, মানুষ প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণী মাত্র। তাঁর মতে ঔপন্যাসিক পালন করবেন বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা, একজন বৈজ্ঞানিক যেমন প্রাণীজগতের বিভিন্ন প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকেন, তেমনি ঔপন্যাসিকেরও দায়িত্ব হচ্ছে একই প্রক্রিয়ায় সামাজিক প্রাণী মানুষকে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করা।[৫৫] তাই ব্যালজাকের মতে বাস্তবতাবাদী সাহিত্য হচ্ছে 'রীতিনীতি'-র ইতিহাস। লেখক স্রষ্টা নন, সমাজের দলিল লেখক। তিনি জীবন সৃষ্টি করেন না, জীবন যেরকম তার প্রতিলিপি রচনা করে চলেন।

এঙ্গেলসও (১৮২০-১৮৯৫) সমাজবাস্তবতার চিত্রনকেই বাস্তবতাবাদ বলে গণ্য করেন। তাঁর মতে যে-লেখকের রচনায় সমাজজীবন, সমাজজীবনের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের ইতিহাস ধরা পড়ে তিনিই মহৎ বাস্তবতাবাদী। মার্গারেট হারকনেসকে লেখা চিঠিতে (এপ্রিল ১৮৮৮) তিনি বলেন, " Realism, to my mind, implies, besides truth of detail, the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances."[৫৬] তিনি মনে করেন শিল্পকলার মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্য যতটা গুপ্ত থাকে শিল্পকলা ততোই শিল্পগুণ সম্পন্ন হয়। ওই চিঠিতে তিনি বলেন, 'The Realism I allude to may creep out even in spite of the author's view,'[৫৭] তিনি এর উদাহরণ হিশেবে ব্যালজাকের

---

৫৪. উদ্ধৃত, Ibid, P. 249.

৫৫. Forester, Norman (ed.,) Ibid, P. 933.

৫৬. Engles, Friedrich, 'On Socialist Realism' in Becker (ed.,) P. 484.

৫৭. Ibid, P. 484.

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতাবাদের উল্লেখ করেন। এঙ্গেলস বলেন 'ব্যালজাককে আমি মনে করি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত জোলার থেকেও মহত্তর বাস্তবতাবাদী। তিনি তাঁর "Comidie Humaine" উপন্যাসে ফরাসি সমাজের সবচেয়ে বিস্ময়কর বাস্তবসম্মত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, এখানে ১৮১৬ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস কালপঞ্জির ধরনে বর্ষানুক্রমিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে ক্রমবৃদ্ধি-প্রাপ্ত বুর্জোয়াদের উত্থানের চাপ সামন্তদের ওপর পড়েছে; সামন্তদের ওপর কীভাবে অর্থগৃধ্নু, ভুঁইফোঁড়রা তাঁর আদর্শ সমাজ কাঠামোকে ধীরে ধীরে নষ্ট করেছে তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যালজাকের এই বর্ণনা থেকে ফরাসি সমাজের যে-সম্পূর্ণ চিত্র আমি পেয়েছি, এমনকি তার আর্থনীতিক হিসেব নিকেশের যে-খবর আমি পেয়েছি, তা আমি কোন ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ কিংবা পরিসংখ্যানবিদের রচনায়ও পাই না। .. তাঁর মহাগ্রন্থটি হচ্ছে " সমাজের ভেঙে পড়ার এক ধারাবাহিক শোকগীতি'।[৫৮] এঙ্গেলস স্বরূপ দেখিয়েছেন ব্যালজাক সে-শ্রেণীটির প্রতি সহানুভূতিশীল যাদের বিনাশ অনিবার্য।

এঙ্গেলস বলেন :

> But for all that, his satire is never keener, his irony never more better, than when he sets in motion the very men and women with whom he sympathizes most deeply - the noblis' . . . . That Balzac was thus compelled to go against his own class sympathies and political prejudices, that he saw the necessity of the downfall of his favorite nobles and described them as people deserving no better fate; that he saw the real man of the future where, for the time being, they alone were to be found - that I consider one of the greatest triumphs of realism, and one of the greatest features in old Balzac.[৫৯]

---

৫৮. Ibid, pp. 484 - 485.

৫৯. Ibid, p. 485.

Dhaka University Institutional Repository

এঙ্গেলস সমাজজীবনের অনুপুঙ্খ অবিকল উপস্থাপনাকেই বাস্তবতাবাদ বলে গণ্য করেছেন। তিনি মনে করেন বাস্তবতার উপস্থাপনায় লেখক থাকবেন নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ ও নিরাবেগ। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি তাঁর দুর্বলতা থাকলেও সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রয়োজনে তিনি কখনোই পক্ষপাত দেখাবেন না; কিংবা ব্যক্তিগত আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন না। বাস্তব সত্য যা তাকেই তুলে ধরবেন তিনি, ঐতিহাসিকের মতো বিধৃত করবেন সমাজ দ্বন্দ্ব ও তার অনিবার্য পরিণাম।

জর্জ এলিয়ট গড়পরতা গ্রামীন মধ্যবিত্তদের জীবনচিত্র অঙ্কনকেই বাস্তবতাবাদ বলে গণ্য করেছেন। তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায় প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ ব্যাপারগুলোর উপস্থিতি, তিনি রিরংসা সন্ত্রাস শ্রেণী সংগ্রাম প্রভৃতি ব্যাপার এড়িয়ে চলেছেন। তিনি ঘোষনা করেন যে উপন্যাসের দায়িত্ব হচ্ছে মামুলি, বহুব্যবহৃত ব্যাপারের বর্ণনা দেয়া, যদি তা অসুন্দরও হয় তবুও লেখক তার বর্ণনায় বিরত হবেন না, কারণ যা চিত্রনযোগ্য তা হচ্ছে বাস্তবতা। রোম্যান্টিকেরা যে-ব্যাপারগুলোকে অবহেলা করেছেন বাস্তবতার সেই তুচ্ছ অসুন্দর ও প্রাত্যহিক ব্যাপার গুলো চিত্রিত করাতেই এলিয়ট আগ্রহী ছিলেন। এলিয়টের আকর্ষণ ছিলো সমাজের সাধারণ বিষয় এবং গার্হস্থ্য বিষয়ের প্রতি। তবে তাঁর উপন্যাসেও দেখা যায় - 'সত্যের দুর্লভ দামি গুণাবলির' প্রতি অনুরাগ। এলিয়ট ওলন্দাজ ডাচ চিত্রকরদের প্রশংসা করেছেন তাঁদের অনুপুঙ্খতা ও সত্যনিষ্ঠার জন্য। সমাজের সাধারণ স্তরের অতিসাধারণ মানুষ ও তাদের গার্হস্থ্য জীবনকে উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হিশেবে গ্রহণ করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতার নিত্যসঙ্গীই এইসব সাধারণ মানুষ। এদের জীবন চিত্রনের মধ্য দিয়েই একজন লেখকের পক্ষে বাস্তবতাসংলগ্ন থাকা সম্ভব। তিনি দাবী করেন যে অধিকাংশ মানুষ যেমন মহাবীর এবং মহানায়ক নয় তেমনি মহাখলও তারা নয়, কিংবা ধনী অথবা মহাদরিদ্রও নয়। বরং মানুষ এ-দুয়ের মধ্যপর্যায়ের, কাজেই এই সাধারণদের জীবনচিত্রনই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য হওয়া উচিত, আর অতিচেনা সাধারণ স্থান ও বিষয়ের বিশ্বস্ত উপস্থাপনাতেই উপন্যাস লাভ করে বাস্তবতার স্বাভাবিকতা। রোম্যান্টিক বিষয় উপাদানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তুচ্ছ সাধারণ জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন;

> 'আমি মেঘলোকে জন্ম দেবতাদের থেকে, মহামানবদের থেকে, ডাইনীদের থেকে এবং বীরযোদ্ধাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি ফুলদানির দিকে অবনত হওয়া বৃদ্ধা মহিলার প্রতি, কিংবা তার নিঃসঙ্গ আহার গ্রহণের দিকে, যখন দুপুরের ছায়াচ্ছন্ন রৌদ্র তার টুপির ওপর পড়ে এবং তার পাথরের জগ কিংবা চরকার ওপর পড়ে। এই সমস্ত সস্তা সাধারণই হচ্ছে তার জীবনের মূল্যবান ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় জিনিশ। কিংবা আমি তাকাই পল্লীর বিবাহানুষ্ঠানের দিকে, যেখানে একজন কদাকার বর তার প্রশস্ত কাঁধ ও হ্যাবড়ামুখের কনের সঙ্গে নাচা শুরু করে এবং প্রৌঢ় ও মধ্যবয়সের বন্ধুরা তাদের ঘিরে থাকে। তাদের নাক আর ঠোঁটের গঠন অস্বাভাবিক কিন্তু তাদের চোখেমুখে প্রকাশ পায় নির্ভুল পরিতৃপ্তি ও শুভকামনা। আদর্শবাদী বন্ধু বলবেন, ফু, কি জঘন্য অনুপস্থিতা! এই বৃদ্ধা মহিলা আর ভাঁড়ের যথাযথ বর্ণনা দিয়ে কী লাভ? জীবনের কী নিম্নসুর! কী নোংরা কুৎসিত লোকজন! কিন্তু জিনিসপত্র অনমনে সুন্দর না হলেও আকর্ষনীয়, ভালোবাসার যোগ্য হতে পারে।[৬০] এলিয়ট মনে করেন দোষেগুণে ভরা এদের হৃদয়েই আছে মানবিক বোধের সেই ঝরনাধারা যা পৃথিবীকে ভালোবাসায় সিক্ত করছে। তিনি বলেন,

> Yes! Thank God; human feeling is like the mighty rivers that bless the earth; it does not wait for beauty it flows with resistless force and brings beauty with it.'[৬১]

তাঁর মতে আমাদের মনে 'আদর্শ' মানুষের ধারণা থাকে ঠিকই কিন্তু বাস্তবতাবাদী লেখক কখনোই কল্পিত অসামান্যের চিত্র অঙ্কনে তৎপর হবেন না। কারণ তাতে সত্যের প্রতি তিনি অবিশ্বস্ত হয়ে উঠবেন। আমরা যেমন চাই বস্তুর পৃথিবী ঠিক তেমন নয়। জর্জ এলিয়ট বলেন:

> "In this world there are so many of these common, coarse people, who have no picturesque sentimental wretchedness! It is so needful we should remember their existence, else we may happen to leave them quite out of our religion and philosophy, and frame lofty theories which only fit a world of extremes.[৬২]

---

৬০. Eliot, George, 'On Realism', in Beeker (ed.,) pp. 114 - 115.

৬১. Ibid, P. 115.

৬২. Ibid, P. 116.

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকলার কাজ সাধারণ মানুষদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। সুতরাং তেমন লেখক দরকার যাঁরা সাধারণ মানুষ ও বস্তুর চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত করবেন। তাঁরা সাধারণ বস্তুতে সৌন্দর্য দেখবেন এবং দেখিয়ে দেবেন কীভাবে এই সাধারণ মানুষের মুখের ওপর স্বর্গের দয়ালু আলো পতিত হয়। পৃথিবীতে মহাপুরুষ খুবই কম, অনিন্দ্য রূপসীর সংখ্যা সামান্য, বীর মুষ্টিমেয়। এলিয়ট বলেন, 'আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা এই গুটিকয় দুর্লভকে দিতে পারি না। আমি আমার ওই আবেগের একটা বড়ো অংশ দিতে চাই আমার প্রাত্যহিক জীবনের সহমানুষদের ..... যাদের মুখ আমার চেনা, যাদের হাত আমি ছুঁই।'[৬৩] এলিয়ট চান অতিরঞ্জনহীন বাস্তবতাকে। তিনি বলেন, " যা যেমন আছে তাকে তার থেকে উৎকৃষ্ট দেখানোর চেয়ে আমি আমার সহজ গল্প বলেই তৃপ্ত। একমাত্র মিথ্যা ছাড়া কোনো কিছুকেই আমি ভয় পাই না। মিথ্যাকে ভয় করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মিথ্যা খুবই সহজ, আর সত্য খুবই কঠিন। আমরা পেন্সিল যখন একটি গ্রিফিনের ছবি আঁকার কাজে ব্যবহার করি, তখন সেই কাল্পনিক জীবটিকে আমরা মনের খুশিমতো সাজাই, গ'ড়ে তুলি; তার মস্ত থাবা এবং বিশাল পাখা গড়তে কোনো বাধা থাকে না, দ্বিধাও হয় না। কিন্তু যখন বর্ণনা করতে হয় এই বাস্তব পৃথিবীর কোনো প্রাণীকে, আমাদের সতর্ক থাকতে হয় তার যথাযথ বাস্তবরূপ সম্পর্কে, একটি সিংহকে উপস্থিত করতে হয় তার সঠিক আদলেই। কোনোরকম অতিরঞ্জনের অবকাশ এখানে নেই।"[৬৪]

জর্জ এলিয়ট সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনাকে বাস্তবতাবাদ বলে গণ্য করেন এবং দাবী করেন যে রোমান্টিকেরা যেসব বিষয় অসুন্দর ও তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করেছেন বাস্তবতাবাদীরা তুলে ধরবেন সে-সকল বিষয়ই। বার্নার্ড শ আরো তীব্রভাবে দাবী করেছেন যে লেখকের দায়িত্ব হচ্ছে আদর্শ ভাবরাশির (Ideal) অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরা। ইবসেনের প্রভাবে বার্নার্ড শ শিল্পীদের সবরকম ভন্ডামীর মুখোশ খুলে ফেলার উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন লেখকদের দায়িত্ব হচ্ছে পাঠকদের বড় বড় আদর্শের আনুগত্য থেকে মুক্ত করা।[৬৫]

---

৬৩. Ibid, P. 116.

৬৪. Ibid, P. 114.

৬৫. Ellmann & Feidelson (ed.,), <u>The Modern Tradition</u>, p. 229.

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়েরই বর্ণনা দেবেন না, তিনি যা কিছু ঘৃণা করেন সেসব বিষয়ও চরম যথাযথভাবে বর্ণনা করা উচিত। [৬৬] আনুন হে হতও মনে করেন ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের কথা বিস্মৃত হয়ে লেখক বাস্তবতার সম্যক পরিচয় তুলে ধরবেন। মনোরম দৃশ্য বর্ণনার মতোই আগ্রহভরে এবং অনুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করবেন গোবরস্তুপের। তাঁর মতে লেখকের কাজ হচ্ছে অন্যেরা এবং তার নিজের মন যা চেপে রাখতে চায় তা প্রকাশ করা। লেখক হবেন সর্বগ্রাহী ও বস্তুনিষ্ঠ। তিনি বলেন 'চিকিৎসকের কাছে পৃথিবীর কোনো কিছুই নোংরা নয়, একজন লেখককে হতে হবে চিকিৎসকের মতো বস্তুনিষ্ঠ। তাঁকে মন্মগ্নতা পরিত্যাগ করতে হবে। তাঁকে জানতে হবে যে ভূদৃশ্যের মধ্যে গোবরস্তুপ খুবই মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং অশুভ সংরাগ বা কুপ্রবৃত্তিরাশি সুপ্রবৃত্তির মতোই জীবনের সহজাত।'[৬৭] জীবনে রয়েছে অসম্পূর্ণতা। শেখভ মনে করেন লেখকের দায়িত্ব হচ্ছে সেই অসম্পূর্ণতার চিত্রই তুলে ধরা, কেননা তাতেই বাস্তবতার প্রতিবিম্ব থাকা সম্ভব হবে। তাঁর মতে :

> 'Human nature is imperfect, and it would therefore, be strange to find only nighteous people on this earth. But to think that the task of literature is together the pure grain from the much heap, is to reject literature itself. Aristic literature is called so just because it depicts life as it really is. Its aim is truth, unconditional and honest',[৬৮]

কদর্য, রূঢ় ও নোংরা বাস্তবতাকে পরিশোধিত করে সহনীয় ও সুন্দর করে তোলার তিনি বিরোধী। শেখভের মতে মাখন খুব চমৎকার বস্তু, কিন্তু লেখক মাখন প্রস্তুতকারী নন, প্রসাধনসামগ্রী বিক্রেতাও নন, বিনোদনকারীও নন। লেখক তাঁর দায়িত্ব ও বিবেকের কাছে বন্দী মানুষ। তিনি জীবনচাষে হাত দিয়ে জীবনের কদর্যতায় তার প্রতি বিমুখ হবেন না। তিনি একজন সংবাদদাতা, তিনি পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্যে শুধু সৎ পৌর - পিতাদের, উচ্চতাপন্ন নারীদের ও সৎ ঠিকাদারদের সংবাদ দেবেন না।[৬৯]

---

৬৬. Ibid, P. 229

৬৭. উদ্ধৃত, Ibid, p. 245.

৬৮. উদ্ধৃত, Ibid, pp. 244 - 245.

৬৯. Ibid, P. 245.

Dhaka University Institutional Repository

হোওয়েলসের মতে বাস্তবতাবাদী লেখক বাস্তবতার সকল অংশকেই গ্রহন করবেন। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন যাই হোক না কেন জীবনের সকলরূপই তিনি চিত্রিত করবেন। বাস্তবতাবাদী লেখকের প্রকৃতি সম্পর্কে হোওয়েলস্ বলেন ঃ

> 'In life he finds nothing insignificant; all tells for desting and character; nothering that God has made is contemplible. He cannot look upon human life and declare this thing or that thing unworthy of notice any more than the scientist can declare a fact of the material world beneath the dignity of his inquiry. He feels in every nerve the equality of things and the unity of men; his sould is exalted not by vain shows and shadows and ideals; but by realities, in which alone the truth lives.'[৭০]

তাঁরমতে অবিকল উপস্থাপনার শক্তিই বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিকের প্রধান গুন। তাই ঔপন্যাসিককে তিনি অভিহিত করেন 'মানুষের আবেগ ও চরিত্ররাশির বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ঐতিহাসিক'হিসেবে।[৭১] বিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকের মতো ঔপন্যাসিকও নির্বাচন করেন মানব অভিজ্ঞতার যে কোনো সুর এবং রচনায় তা বিধৃত করতে থাকেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী কিংবা বীর চরিত্রদের তিনি বলেন, 'I don't believe in heres and heroines and willingly avoid the heroic,'[৭২] তিনি গ্রহণ করেন প্রাত্যহিক বাস্তবতাকে। তিনি মামুলি বিষয়ের চিত্রনকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন রচনায় অসাধারণকেই শুধু উপস্থাপনা করতে হবে এমন নয়, আবার শুধু সাধারণ হলেই কোনো কিছুর আবেদন থাকবে না, এমনও নয়। তাঁর মতে সাধারণ স্থান এবং প্রাত্যহিক সাধারণ জীবন তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সমগ্র মনুষ্যজাতি সকল সময়েই তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। বাস্তবতাবাদী হিসেবে তাঁর আকর্ষণ গড়পরতা সাধারণ শ্রেণীটির প্রতিই। তিনি বলেন ঃ

---

৭০. Howells. W.D., 'On Truth in fiction' in Becker (ed., 1963), P. 136.

৭১. Forester. Norman, Ibid, P. 934.

৭২. Wagenknecht, Edward, Cavalcade of the American Novel, (Oxford & IBA Publisning Co. India, First Pub. in U.S.A. 1952, Indian Edition 1969), P. 132.

Dhaka University Institutional Repository

'Unless the thing seen reveals to me an intrinsic poetry, and puts on phrases that cloths it pleasantly to the imagination, I do not much care for it; but if it will do this, I do not mind how poor or common or squalid it shows at first glance; it challenges my curiosity and keeps my sympathy'[৭৩]

লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ে তিনি উপন্যাসে বিধৃত করতে চেয়েছেন 'the more smiling aspects of life which are the more American'[৭৪] প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা উপস্থাপনেও এ-সময় মনোযোগী ছিলেন তিনি। যে সমাজে তিনি অবস্থান করেন তাকে তিনি নষ্ট, গলিত কিংবা বন্ধ্যা বলে মনে করেন নি; সমাজকে গণ্য করেছেন বন্ধুত্বপূর্ণ, হিতৈষী এবং উপকারী বলে। তাঁর প্রথম দিককার রচনা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই' সুসমাজের বর্ণনা। জীবনের রূঢ়তার পরিচয় সেখানে নেই, ব্যভিচার, বিবাহ বিচ্ছেদ, লোভ হিংসা, ভ্রষ্ট হয়ে যাবার গল্প-অর্থাৎ জীবনের অস্বস্তিকর ও অরুচিকর দিকগুলো পরিহার করে-ছেন হোওয়েলস। এদিক দিয়ে তিনি জর্জ এলিয়টের সমগোত্রীয়। তবে তাঁর এই বাস্তবতাবোধ পরে বদলে যায়। এ পর্যায়ে তিনি সমাজ সমালোচনামূলক বাস্তবতার উপস্থাপনায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি তুলে ধরেন নিম্নশ্রেণীর জীবনবাস্তবতা, নির্দেশ করেন সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি। তিনি ওই সমাজের পরিচয় তুলে ধরেন যে- সমাজে স্বল্পসংখ্যক মানুষ বিত্তশালী, বিলাস ও আলস্যে ধনসম্পদ ও সময়ের অপচয় করে; অন্যদিকে সে-সমাজেরই অধিকাংশ মানুষকে জীবন ধারনের জন্য করতে হয় কঠোর পরিশ্রম এবং অর্ধাহারে জীবনধারন করতে হয়।

---

৭৩. Ibid, P. 132.

৭৪. Carter, Evert, <u>Howells and the Age of Realism</u>, (J.B. Lippincott Company, New York, First Pub. 1950, Reprinted 1954), P. 177.

Dhaka University Institutional Repository

এই বাস্তবতাবাদীরা বাস্তবতাকে সর্বদা প্রীতির চোখে দেখেন নি। বাহ্যবাস্তবতার প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারটি ক্লান্ত করে তোলে এ- ধারার অনেককে। তাঁদের অনেকে শেষ পর্যন্ত রচনাকে বাহ্যবাস্তবতার প্রতিলিপি করে তুলতে অনাগ্রহী হয়ে ওঠেন, অনেকে অনুকরণকে ক্লান্তিকর বলে গণ্য করেন। দৈনন্দিন বাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনায় ক্লান্তিবোধ করেন দস্তয়ভস্কি। তিনি সাহিত্যকে গণ্য করেন চরম সত্যের অনুসন্ধানরূপে, বাস্তবতার প্রতিলিপি রূপে নয়। তাঁর মতে, 'বাহ্যবাস্তবতার খুঁটিনাটি উপস্থাপনে কোনো মহত্ত্ব নেই। যে-লেখক চরম সত্যের অনুসন্ধানী তাঁকে অবশ্যই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও পাত্রপাত্রী গ্রহণ করতেই হবে।'[৭৫] তিনি বাহ্যবাস্তবতার প্রতিলিপি রচনায় মগ্ন থাকতে চান না, তিনি সাহিত্যে মানবজীবনের গভীরতর বাস্তবতার উপস্থাপনা করতে চেয়েছেন। দস্তয়ভস্কি তাঁর উপন্যাসের ওই বাস্তবতা সম্পর্কে বলেন, 'লোকে আমাকে মনস্তাত্ত্বিক বলে থাকে, এটা সত্য নয়। আমি শব্দটির (বাস্তবতাবাদ) উচ্চতর অর্থে একজন বাস্তবতাবাদী মাত্র, অর্থাৎ আমি মানবাত্মার সমস্ত গভীর প্রদেশকে চিত্রিত করি।'[৭৬] তাঁর কাছে দৈনন্দিন তুচ্ছতার পর্যবেক্ষণ বাস্তবতা বলে গণ্য হয় নি। তিনি বলেন :

> "শিল্পকলা সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা আছে। অধিকাংশ লোক যাকে উদ্ভট এবং সর্বজনীনতাহীন বলে মনে করে তাকে আমি গণ্য করি সত্যের অনুঃসার বলে। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার আঁকড়া উপস্থাপনকে আমি অনেক আগেই বাস্তবতা বলে গণ্য করা থেকে বিরত হয়েছি - বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। পত্রিকা খুললেই প্রতিদিন পাঠক এমন অনেক সত্য ঘটনার বিবরণের মুখোমুখি হয় তা তার কাছে অসাধারণ বলে প্রতিভাত হয়। আমাদের লেখকেরা ওগুলো-

---

৭৫. উদ্ধৃত, Ellmann & Feidelson (ed.,), The Modern Tradition, p. 132.

৭৬. উদ্ধৃত, Becker, George J. (ed.,), DMLR, P. 31.

Dhaka University Institutional Repository

> উদ্ভট বলে গণ্য করেন এবং বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করেন না। তবে এগুলো সত্য, কারণ এগুলো সত্য ঘটনা। কিন্তু কে এসবের পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা ও বর্ণনা করার কষ্ট স্বীকার করে? এগুলো প্রত্যেক দিন প্রতি মুহূর্তে ঘটে, সুতরাং এগুলো ব্যতিক্রমধর্মী নয়।[৭৭]

বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনায় মত্ত হয়ে বরং লেখক প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেন বলে দস্তয়ভস্কি মনে করেন। তাঁর মতে, 'দৈনন্দিন পারিবারিক ঘটনার বর্ণনা কি তুচ্ছ ও সামান্য। সব সময়েই একই পুরোনো গল্প। এভাবে আমরা সমস্ত সত্যকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িতে ফেলে দিই।'[৭৮] দস্তয়ভস্কির মতে তিনি সাধারণ বাস্তবতার উপস্থাপনা করেন না, বিশেষ বাস্তবতাকেই তিনি তুলে ধরতে চান। তিনি সাধারণ এবং বিশেষের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে যা বিশেষ তাকে হয়তো সব সময় দেখা যায় না, কিন্তু শিল্পী চিনতে পারেন। তিনি এই যুক্তিতে সৃষ্টি করেন তাঁর উপন্যাসে আপাত দৃষ্টিতে উদ্ভট মনে হওয়া চরিত্রগুলো। তাঁর "ইডিয়টে"র' মিশকিন' চরিত্রটিকে অনেক সময় অবাস্তব উদ্ভট বলে মনে হয়। কিন্তু দস্তয়ভস্কি মনে করেন মিশকিন অবাস্তব কোনো চরিত্র নয়, এরকম মানুষের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে।[৭৯] তিনি বলেন, 'আমার উদ্ভট 'ইডিয়ট' কি চরম প্রাত্যহিক সত্য নয়? .... এমন চরিত্রের উপস্থিতি আমাদের সমাজের কোথাও অবশ্যই আছে।'[৮০]

তলস্তয়ও অনেকাংশে বাহ্যবাস্তবতা থেকে সরে আসেন। তিনি বাহ্যবাস্তবতারপ্রতি অন্ধ আনুগত্যের অর্থহীনতার কথা স্মরণ করে একে উপহাস করেন। তাঁর মতে চরিত্রদের মুখমণ্ডলের অনুপুঙ্খ বিবরণ, তাদের অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি, পোশাক বা বাসস্থানের অনুকরণের মধ্যে গর্ব করার কিছুই নেই। এই অনুকরণ প্রসঙ্গে তিনি

---

৭৭. উদ্ধৃত, Ellmann & Feidelson (ed.,) P. 310.
৭৮. উদ্ধৃত, Ibid, P. 310.
৭৯. Ellmann & Feidelson (ed.,) pp. 232 - 233.
৮০. উদ্ধৃত, Ibid, P. 310.

Dhaka University Institutional Repository

বলেন :

> The essence of this method consists in rendering the details which accompany that which is described or represented. In the literary art this method consists in describing, down to the minutest details, the appearance, faces, garments gestures, sounds, apartments of the acting persons, with all those incidents which occur in life. Thus, in novels and stories, they describe, with every speech of the acting person, in what voice he said it, and what he did then. And the speeches themselves are not told so as to make the best sense, but as incohereently as they are in life, with interruptions and abrupt endings ....[৮১]

তিনি মনে করেন ' বাস্তবতার মাত্রাও অনুপুঙ্খতাকে কোনো রচনার উৎকর্ষের মাপকাঠি মনে করা ভুল, বাহ্য বাস্তবতার বিস্তারিত বর্ণনা কখনোই কোনো রচনাকে উৎকৃষ্ট করে তোলার শক্তি রাখে না '।[৮২]

বাস্তবতার উপস্থাপন সম্পর্কে তলস্তয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সব সময় একই রকম থাকে নি । তলস্তয় প্রথম পর্যায়ে উপন্যাসে উপস্থাপন করেন রূঢ় বাস্তবতা, দরিদ্রশ্রেণীর প্রাত্যহিক বাস্তবতা । তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনা জুড়ে আছে সেই সামাজিক বাস্তবতার পরিচয়, যেখানে স্বল্প সংখ্যক মানুষ সম্পদশালী ও অমিতাচারী, অন্যদিকে সমাজের অধিকাংশ সদস্য জীবন যাপন করে দারিদ্র্যে । তিনি তুলে ধরেছিলেন জীবন যে- রকম হয়ে আছে তার

---

৮১. উদ্ধৃত, Allott. Miriam, Ibid, P. 74

৮২. উদ্ধৃত, Ibid, P. 75.

Dhaka University Institutional Repository

হবি। পরে তলস্তয়ের বাস্তবতাবোধের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপারটিই প্রধান হয়ে ওঠে। তিনি শিল্পকলাকে গণ্য করা শুরু করেন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মাধ্যম হিশেবে। তিনি বলেন ঃ

> Art is the creation of a community of feeling to unit men everywhere, and in all times, with each other and with God.[৮৩]

এসময় তাঁর কাছে বাস্তবতা বলে গণ্য হতে থাকে 'দয়া, ধার্মিকতা'। তলস্তয় আর সৌন্দর্যকে মূল্যবান বলে মনে করেন না, মূল্যবান মনে করেন দয়া ও ধার্মিকতাকে। তিনি মনে করেন অনেক সময়ই সৌন্দর্য ও দয়া-ধার্মিকতা পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। তার কারণ সৌন্দর্য সংরাগের সঙ্গে যুক্ত আর দয়া-ধার্মিকতা জড়িত থাকে মানুষের ঈশ্বর বোধের সাথে। এই মানদণ্ডে তলস্তয় তাঁর সময়ের বহু রচনাকে এবং তাঁর নিজের অধিকাংশ রচনাকেও অবক্ষয়গ্রস্ত বলে নিন্দা করেন।[৮৪]

বাস্তবতাবাদীদের অনেকেই বাস্তবতা ও স্বপ্ন-কল্পনা-আদর্শের মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। হাঁকাড়া বাস্তবতা তাঁদের ক্লান্ত করে তোলে। তাঁরা রচনায় যথার্থবাস্তবতার উপস্থাপনা করতে চেয়েছেন, তবে ওই বাস্তবতার সঙ্গে ভাবাবেগ, কল্পনা বা উচ্চ আদর্শের মিশ্রণ তাঁদের কাম্য ছিলো। অর্থাৎ বাস্তবতাকে তাঁরা গ্রহণ করতে চেয়েছেন প্রাথমিক উপাদানরূপে এবং কল্পনা-ভাবাবেগের মিশ্রণে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন আদর্শায়িত বাস্তবতা। ব্রিটিশ বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিক ট্রলোপ ভাবালুতাকে অবাস্তব ব্যাপার বলে মনে করেন নি। তিনি মনে করেন ; 'ভালো উপন্যাসকে একই সঙ্গে বাস্তবতাবাদী ও ভাবাবেগবাদী হওয়া উচিত, এবং উভয় ব্যাপারই উচ্চতম মাত্রায় হওয়া উচিত। যদি কোনো উপন্যাস এর যে-কোনো একটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তাহলে ব্যর্থতা ঘটে শিল্পকলার।[৮৫] তিনি বলেন ;

---

৮৩. উদ্ধৃত, Ellmann & Feidelson (ed.,) P. 232.

৮৪. Ellmann & Feidelson (ed.,) Ibid, P. 232.

৮৫. উদ্ধৃত, Allott. Miriam, Ibid, P. 67.

Dhaka University Institutional Repository

> Heart and draw his tears, and he has, so far, done his work will. Truth let there be, truth of description, truth of character, human truth as to men and women. If there be such truth, I do not know that a novel can be too sensational.[৮৬]

স্টিভেনসন মনে করেন প্রতিনিধিত্বশীল সকল সাহিত্যেই যুগপৎ বাস্তবতা ও আদর্শের সম্মিলন ঘটে থাকে। কোনো সাহিত্যকর্ম যেমন শুধু বাস্তবতাবাদী হতে পারে না, তেমনি কোনো রচনায় কেবলই আদর্শের উপস্থাপনা অসম্ভব ব্যাপার মাত্র। অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র বাস্তবতা নির্ভর সাহিত্যে বিশ্বাসী নন। তিনি মনে করেন বাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বাস্তবতাবাদ সাহিত্যের জগতে মহাপরিবর্তন ঘটিয়েছে, তবে এ-রীতিটিকে তিনি কোনো মহৎব্যাপার বলে গণ্য করেন না। তিনি বলেন, 'সব প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পকলাই, ... একই সঙ্গে বাস্তবতাবাদী এবং আদর্শবাদী। যে বাস্তবতাবাদ নিয়ে আমরা কলহ করি তা সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক। এটি প্রকৃতির কোনো বিশেষ সত্য নয়, বরং এটি নতুন ফ্যাশনের খামখেয়ালি মাত্র।'[৮৭] মপাসাঁও মনে করেন যে আকাঁড়া বাস্তবতা বা প্রাত্যহিক জীবন বাস্তবতা সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না। কারন বাস্তবজীবনে থাকে অনেক অসামঞ্জস্য, তাতে মহত্তর সত্যকে পাওয়া যায়না। সে-কারণেই প্রকৃত সত্যানুসন্ধানী লেখক বিষয় বাছাই করবেন, তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার প্রতিকৃতি রচনায় সন্তুষ্ট থাকবেন না। মপাসাঁর মতে বাস্তবতাবাদী লেখক যদি শিল্পী হন তবে তিনি সাহিত্যে জীবনের তুচ্ছ প্রতিকৃতিধর্মী উপস্থাপনা ঘটাতে চাইবেন না, বরং চাইবেন এমন এক দিব্য-বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করতে যা পূর্ণতর, উজ্জ্বলতর, এমনকী এই বাস্তবতার চেয়ে তা অনেক বেশি সত্য।

---

৮৬. উদ্ধৃত, Ibid, P. 68.

৮৭. উদ্ধৃত, Ibid, pp. 72 - 73.

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে সবকিছুর বিবরণ দেয়া অসম্ভব। কারণ যে-সব তুচ্ছ ঘটনা মানবজীবনকে ভরে রাখে, সেগুলোর বিবরণ দিতে গেলে প্রতিদিনের জন্য এক একটি খন্ড দরকার হবে। সুতরাং বাছাই দরকার।[৮৮] অর্থাৎ তিনি বাস্তবতার সকল অংশের নিরপেক্ষ উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন; তিনি মহৎ, তাৎপর্যমন্ডিত ঘটনাবলী বা বিষয়কে দিতে চেয়েছেন বাস্তবতার মর্যাদা এবং সাহিত্যে তিনি তা-ই উপস্থাপিত করার পক্ষপাতী। মপাসাঁ বাস্তবতাবাদীদের গণ্য করেন 'প্রতিভাসবাদী' বলে। তাঁর মতে, 'সাহিত্যে সত্যসৃষ্টির জন্য উপস্থাপন করতে হয় সত্যের প্রতিভাস এবং তা করা হয় ঘটনার স্বাভাবিক যুক্তি অনুসারে; জীবনে নানা ঘটনা যেমন বিশৃঙ্খলভাবে আসে সাহিত্যে সেভাবে বর্ণনা করে না। তাই আমি বলতে চাই প্রতিভাবান বাস্তবতাবাদীদের ~~বলা~~ ~~উচিত~~ প্রতিভাসবাদী।'[৮৯]

২.৩ বাস্তবতাবাদী আন্দোলন

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে দেখা দেয় বাস্তবতাবাদী আন্দোলন। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন একগোঁয়ে চিত্রশিল্পী। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে চিত্রশিল্পী গুস্তাভ কুরবে (Gustave Courbet) তাঁর একক চিত্রপ্রদর্শনীর প্রবেশ পথের দরোজায় 'Du Realisme' লেখা কাগজ ঝুলিয়ে দেন, এবং তারপর থেকেই শব্দটি একটি জনপ্রিয় শ্লোগানে পরিণত হয়।[৯০]

'Realism' শব্দটির উদ্ভব 'res', ধাতু থেকে, যার অর্থ বস্তু বা জিনিস হ্যারি লেভিন তাই 'রিয়ালিজম' শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন 'Chosisme', 'Thing-ism' প্রভৃতি শব্দ।[৯১] 'রিয়ালিজম' শব্দটি সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন জার্মান লেখক শিলার

---

৮৮. উদ্ধৃত, Ibid, P. 71.

৮৯. উদ্ধৃত, Ibid, P. 71.

৯০. Grant, Damian, Realism, (Methuen London, 1870; Reprinted, 1981). P. 20.

৯১. Ibid, P. 43. Realism - এর বাঙলা পরিভাষা করা হয় বাস্তবতাবাদ। বাঙলায় 'বাস্তব' শব্দটি একইসঙ্গে বিশেষ্য এবং বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় আর 'বাস্তবতা' ব্যবহৃত হয় শুধু বিশেষ্যরূপে। তাই Realism এর পরিভাষা 'বাস্তববাদ' না হয়ে বাস্তবতাবাদ হওয়াই যথার্থ।

Dhaka University Institutional Repository

এবং ফ্রেডরিখ শ্লেগেল। ১৭৯৭-এ একটি অপ্রকাশিত নোটবুকে উপন্যাস প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্লেগেল বলেন,' this realism is based on its nature ' শ্লেগেল Tick -এর সমালোচনা প্রসঙ্গেও 'রিয়ালিজম' শব্দটি প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন Tieck -এর মধ্যে' Matter , Realism and philosoph ' -র অভাব রয়েছে। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে গেটেকে লেখা একটি চিঠিতে শিলার বলেন' Realism cannot make a poet ' ফরাসিদের সাহিত্যিক প্রবণতা নির্দেশ করতে গিয়ে শিলার এ-শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি ফরাসিদের সাহিত্যিক প্রবণতা প্রসঙ্গে বলেন,' তাঁরা যতটা ভাববাদী তার চেয়ে বেশি বাস্তবতাবাদী'। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে একটি প্রবচনে শ্লেগেল মন্তব্য করেন,' there is no true realism except in poetry' । শ্লেগেল এবং শিলিং-এর বহু রচনায় বাস্তবতা বিষয়ক এরকম বহু মন্তব্য পাওয়া যায়। তাঁরা প্রত্যেককে বাহ্যবাস্তবতা বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, নির্দিষ্ট কোনো রচনারীতি কিংবা ধারা বোঝাতে নয়। ফ্রান্সে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে। এই শব্দটি তখন বিশেষ এক ধরনের সাহিত্যকে নির্দেশ করার জন্য প্রয়োগ করা হতো। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে একজন অজ্ঞাতনামা লেখক "Mercure Francais" পত্রিকায় বাস্তবতাবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে লেখেন, 'এই সাহিত্যতত্ত্ব- যা দিন দিন আধিপত্য বিস্তার করছে এবং যা শিল্পকলার মহৎ নিদর্শনগুলোর অনুকরণ না করে প্রকৃতির বিশ্বস্ত অনুকরণ করছে, একে বাসবতাবাদ আখ্যা দেয়া যায়; এবং এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে এটিই হয়ে উঠবে উনিশ শতকের সাহিত্য—সত্যের সাহিত্য।' ১৮৩৩ -এর পরে ফ্রান্সে এ-পরিভাষাটি ব্যবহার করেন Gustave planche । তিনি এ-পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন বর্ণনার যথাযথতা বোঝাতে। ১৮৩৪ সালে ফ্রান্সে Hippolyte Fortoul একটি উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে 'বাস্তবতার (Realism) অতি-রঞ্জনের সাহায্যে, যা হুগোর রীতি থেকে ধার করা।' এমন্তব্য থেকে বোঝা যায় উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে ফ্রান্সে 'রিয়ালিজম' বলতে বর্ণনার অনুপুঙ্খতা বা যাথার্থ্য বোঝাতো। এ-জন্য এ সময় অনেক রোমান্টিক লেখকের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশে 'রিয়ালিজম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। রোমান্টিকেরা অনুপুঙ্খ বর্ণনারীতির অনুসারী ছিলেন, এ-সময় 'রিয়ালিজম' শব্দটি এই 'বর্ণনার অনুপুঙ্খতা অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।[১২]

---

১২. Wellek. Rene, <u>A History of Modern Criticism</u>: 1750, pp. 1 - 2

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে 'বাস্তবতাবাদ' (Realism) শব্দটির অর্থবদল ঘটে। এ-সময় সমসাময়িক জীবনধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ১৮৪৬-এ Hippolyte Castille ব্যালজাককে একটি 'বাস্তবতাবাদী ধারা'র অন্তর্ভুক্ত করেন। এ-সময় ফরাশি ঔপন্যাসিক Murger -এর উপন্যাস সম্পর্কেও এ-শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। ব্যালজাক ও Murger -এর উপন্যাসে সমকালীন জীবন ও রীতিনীতি অনুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে, এই অনুপুঙ্খতা এ-সময় বাস্তবতাবাদের বৈশিষ্ট্যরূপে নির্দেশিত হতে থাকে।[১৩] এ-দশকেই Arsine Houssage ওলন্দাজ ও ফ্লেমিস চিত্রকলার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে এই পারিভাষিক শব্দটি গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেন। তবে 'রিয়ালিজম' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কুরবের চিত্রপ্রদর্শনীর সময় থেকে। ১৮৫৫-এ কুরবে-র চিত্রপ্রদর্শনীর পর থেকেই শব্দটি একটি জনপ্রিয় শ্লোগানে পরিণত হয়।

কুরবে শুধু তাঁর প্রদর্শনশালার দরোজায়ই ' Du Realisme কথাটি ঝুলিয়ে দেন নি, তিনি নিজেকে ' Realist ' বলে আখ্যায়িত করেন। Realist বলতে তিনি বুঝতেন 'প্রকৃত সত্যের আন্তরিক বান্ধব।'[১৪] কুরবে নিজের পদ্ধতি সম্পর্কে ঘোষণা করেন, ' To be able to translate the customs, ideas, and appearances of my time as as I see them, in a word, to creat a living art - these has been my aim ' কুরবে মনে করেন চিত্রকর শুধুমাত্র দৃশ্যমান বস্তুরাশিরই প্রতিকৃতি আঁকবেন এবং এর মধ্যদিয়েই বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, 'the art of painting can only consist of the representation of objects which are visible and tengible for the artist'[১৫] কুরবে-র চিত্রপ্রদর্শনী বাস্তবতা-

১৩. Wellek. Rene, 'The Concepts of Criticism', P. 228.

১৪. Grant. Damian, Ibid, pp. 20 - 21.

১৫. উদ্ধৃত, Nochlin. Linda, Realism, (Penguin Books, London, First Pub. 1971, Reprinted 1988) P. 25.

Dhaka University Institutional Repository

বাদকে একটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ দেয়। কুরবে-র চিত্রকলার বিষয় ছিলো কৃষকদের অনাড়ম্বর গ্রামীন জীবন, শ্রমজীবীদের প্রাত্যহিক জীবন ও বুর্জোয়াদের জীবন। সাধারণ জনজীবনের বাস্তবতা নির্ভর এই চিত্রগুলো প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র সমালোচকদের প্রথাগত বিশ্বাস ও সৌন্দর্যবোধকে আহত করে। কুরবে-র চিত্রকলার ভূমিকা এদিক থেকে ছিলো বিপ্লবাত্মক। ক্ষুব্ধ প্রথাগত সমালোচকেরা কুরবে-কে আক্রমণ করেন। এ-সময় কুরবে-র সমর্থনে এগিয়ে আসেন ফরাসি ঔপন্যাসিক শাঁফ্লুরি (Champfleury) (তাঁর প্রকৃত নাম Jules Husson, dit Fleury) । কুরবে-র বিরোধীরা অভিযোগ করেন যে তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু বাস্তবের চেয়েও কদর্য। এ-অভিযোগের উত্তরে শাঁফ্লুরি বলেন যে 'বুর্জোয়ারা প্রকৃতপক্ষে তাই'।[১৬] শাঁফ্লুরি কুরবে-র সমর্থনে রচনা করেন একাধিক প্রবন্ধ, এ-প্রবন্ধগুলো ১৮৫৭ সালে " La Realisme " নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬-এ এডমন্ড দুরাঁতি (Edmond Duranty) " Realisme " নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বল্পজীবী (জুলাই ১৮৫৬-মে ১৮৫৭) এই পত্রিকায় বাস্তবতাবাদের সমর্থনে নানা রচনা মুদ্রিত হয়। শাঁফ্লুরি তাঁর প্রবন্ধগুলোতে এই নবজাগ্রত চেতনার প্রতি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন এবং দুরাঁতি তাঁর পত্রিকায় বাস্তবতাবাদ বিষয়ে নানা আলোচনা, বিতর্ক প্রকাশ করেন। শাঁফ্লুরির প্রবন্ধগুলো এবং দুরাঁতির পত্রিকায় মুদ্রিত বিতর্ক ও বাস্তবতাবাদের পক্ষসমর্থনকারী রচনাগুলো ফ্রান্সে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এভাবে কুরবে-র চিত্রপ্রদর্শনী, শাঁফ্লুরির সমর্থন ও ব্যাখ্যা-আলোচনা, দুরাঁতির পত্রিকার বিতর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 'বাস্তবতাবাদ' নামে একটি বিশেষ সাহিত্যবিধির সূচনা হয়। শাঁফ্লুরি, দুরাঁতি প্রমুখ পক্ষসমর্থন ও ব্যাখ্যা-ভাষ্য রচনার মধ্য দিয়ে একটি নতুন সাহিত্যবিধির সূচনা করলেও, তাঁদের কাছে ব্যাপারটি নতুন একটি সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা বলে গণ্য হয় নি। বরং শিল্পকলায় বিষয় বা উপাদান নির্বাচনের এই প্রবণতাটি শেষ পর্যন্ত একটি সাহিত্য ধারায় (School) পরিণত হয়ে উঠবে ভেবে তাঁরা উদ্বিগ্ন হন। এ-প্রসঙ্গে দুরাঁতি বলেন যে 'বাস্তবতাবাদী ধারা' বলে এ-আলোড়নকে চিহ্নিত করতে

---

১৬. Wellek, Rene, A History of Modern Criticism: 1750 - 1950, P. 2.

Dhaka University Institutional Repository

চাওয়া অর্থহীন; কারণ এ-শব্দটি কোন অর্থই জ্ঞাপন করে না। 'রিয়ালিজম' শব্দটি 'ধারা' (School) শব্দের সঙ্গে কোনক্রমেই খাপ খায় না, কারণ এ-শব্দটি 'ধারা' শব্দের সম্পূর্ণ বিপরীত। শাঁফ্লুরি মনে করেছেন সাহিত্যশিল্পে বিষয় উপাদান গ্রহণের এই রীতিটি হবে স্বল্পকালস্থায়ী। বাস্তবতাবাদী ধারাটি তিরিশ বছরের বেশি আয়ুলাভ করবে না বলেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

কুরবে-র চিত্রপ্রদর্শনীজাত আলোচন ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে একটি ধারা হিশেবে বাস্তবতাবাদ যাত্রা শুরু করে। তবে নানা আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে বাস্তবতাবাদ একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যবিধি হিশেবে গড়ে উঠতে থাকলেও, এটি তখন কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থে সংজ্ঞায়িত হয়ে ওঠে নি। ওই সব আলোচনা-বিতর্কগুলোতে বাস্তবতাবাদী প্রবণতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, তা থেকে এই ধারাটির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। দুরাঁতি বাস্তবতাবাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেন, বাস্তবতাবাদ প্রাতিস্বিকতার অকপট ও পরিপূর্ণ প্রকাশ। যেকোনো প্রথা ও যেকোনো ধারাকে আক্রমণ করাই এর প্রধান কাজ। বাস্তবতাবাদের পৃষ্ঠপোষকেরা মনে করেন যে শুধু সুপ্রবন্দনা বা সৌন্দর্য সৃষ্টি শিল্পকলার কাজ নয়। শিল্পকলার দায়িত্ব হচ্ছে বাস্তব জগত ও জীবনের আন্তরিক, যথাযথ ও সম্পূর্ণ উপস্থাপন। বাস্তবজগত ও জীবন বলতে তাঁরা নির্দেশ করেছেন সমকালীন প্রতিবেশ ও সমকালীন জীবনকে। [১৭] তাঁদের মতে যেহেতু শিল্পকলার দায়িত্ব হচ্ছে বাস্তব জীবন ও প্রতিবেশের রূপায়ন, তাই বাস্তবঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার জন্য একজন শিল্পী সমকালীন জীবন, সমাজ, ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার আচরণসমূহ অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করবেন। এ-ভাবে ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শব্দ 'রিয়ালিজম' একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হতে থাকে। বাস্তবতাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠার আগে 'রিয়ালিজম' শব্দটি ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করতো, তখন প্রকৃতির যে কোনো রকম বিশ্বস্ত উপস্থাপন বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হতো। ১৮৫৫-এ যখন একগোত্র লেখক ও শিল্পী শব্দটি ব্যবহার করা শুরু করেন, তখন থেকে শব্দটি একটি বিশেষ সাহিত্য আন্দোলনের স্লোগান হিশেবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

১৭. Grant, Domian, Ibid, pp. 22 - 27.

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতাবাদকে একটি সুসংবদ্ধ সাহিত্যবিধি করে তোলার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের উদ্ভবকালের বিতর্ক-আলোচনা-প্রবন্ধ ইত্যাদির চাইতে আঠারো শো পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত উপন্যাসগুলোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাখ্যা-ভাষ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও তর্কবিতর্ক বাস্তবতাবাদকে যতোটা স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছিলো, বাস্তবতাবাদী উপন্যাসগুলো ওই ধারাটিকে তারচেয়ে বেশি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে তোলে। ১৮৫৬-এর অক্টোবর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের (Gustave Flaubert) "মাদাম বোভারী"। "মাদাম বোভারী"র মধ্য দিয়েই সূচিত হয় বাস্তবতাবাদী ধারাটির। এ-উপন্যাসটির বাস্তবতাবাদকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। "মাদাম বোভারী"তে বাস্তবতাবাদী ফ্লবেয়ারের অতুলনীয় পর্যবেক্ষণ ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে। বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের সূচনাকারী রূপে চিহ্নিত হন ফ্লবেয়ার। তিনি প্রথমে আগ্রহের সঙ্গে নিজেকে প্রথম বাস্তবতাবাদী উপন্যাসিক হিশেবে চিহ্নিত করতে চান। ফ্লবেয়ারের একটি চিঠি থেকে জানা যায় বাস্তবতাবাদী ধারার প্রথম উপন্যাস হিশেবে "মাদাম বোভারী"র মর্যাদা ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা তাঁকে বিচলিত করে। "মাদাম বোভারী প্রকাশের আগে ফ্রান্সে Feydeau রচিত " Fanny " উপন্যাসটি মুদ্রিত হয় এবং এ-উপন্যাসটিকে প্রথম বাস্তবতাবাদী উপন্যাস হিশেবে দাবী করা হলে ফ্লবেয়ার বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হন। কারণ তাতে "মাদাম বোভারী"প্রথম বাস্তবতাবাদী উপ-ন্যাসের মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হবে। পরবর্তীকালে " Fanny " বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যায়, ও ব্যাপক পর্যবেক্ষণ সমৃদ্ধ "মাদাম বোভারী"র মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে। ফ্লবেয়ার অল্প সংখ্যক উপন্যাস রচনা করলেও তাঁর রচনাবলীতে বাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা ঘটেছে। বস্তুনিষ্ঠা ও ব্যাপক পর্যবেক্ষণ তার উপন্যাসের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এসবের মধ্য দিয়ে ফ্লবেয়ার হয়ে ওঠেন বাস্তবতাবাদী ধারার সূচনাকারী প্রধান উপন্যাসিক এবং তাঁর চারপাশে দেখা দেন ফরাশি অন্যান্য বাস্তবতাবাদী লেখকেরা, তাঁদের মধ্যে গোঁকুর ভ্রাতারা (Edmond and Jules Goncourt)উল্লেখযোগ্য। তবে একটি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া কিংবা কোনো আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ ও বিকশিত করে তোলার শক্তি এই বাস্তবতাবাদীদের ছিলো না। এ-যোগ্যতা বা শক্তি দেখা যায় পরবর্তী প্রাকৃতবাদীদের মধ্যে। প্রাকৃতবাদের সূচনাকারী এমিল জোলা একই সঙ্গে ছিলেন তাত্ত্বিক এবং উপন্যাসিক। জোলা একই সঙ্গে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং উপন্যাসে তত্ত্বের শিল্পিত প্রয়োগেও ব্যাপৃত থেকেছেন। জোলার নেতৃত্বেই প্রাকৃতবাদ সাহিত্যের একটি প্রধান ধারায় পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তবতাবাদের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে নি। কোন

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন বা ধারার নেতৃত্ব দেবার মেজাজ ফ্লবেয়ারের ছিলো না, এবং শেষজীবনে ফ্লবেয়ার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন যদি তাঁকে বাস্তবতাবাদী আখ্যা দেয়া হতো। গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় উপন্যাসকে 'মানবিক দলিল' আখ্যায়িত করেন এবং তাঁর নিজেদের চিহ্নিত করেন 'মানবিক দলিলের আদি আবিষ্কর্তা' হিশেবে। কিন্তু একটি ধারার নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তাঁদের ছিলো না, অন্যদিকে গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় এতো উচ্চসুরের উপন্যাসিক ছিলেন না যে শুধুমাত্র উপন্যাসের মাধ্যমে বাস্তবতাবাদকে একটি প্রধান সাহিত্যধারায় পরিণত করবেন। ফলে যতোটা আলোড়ন সৃষ্টি করে বাস্তবতাবাদের আবির্ভাব ঘটে, ওই পরিমাণ শক্তিশালী ধারা হয়ে ওঠে নি বাস্তবতাবাদ। এই বাস্তবতাবাদীরা উপন্যাসে বাস্তবতা উপস্থাপনার কথা জোর দিয়ে বলেছেন, কিন্তু কোনো বাস্তবতাবাদী তত্ত্ব তৈরি করতে ব্যর্থ হন তাঁরা, বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রক্রিয়াও নির্দেশ করেন নি তাঁরা। বলা যায় বাস্তবতাবাদীরা বাস্তবমনস্ক কিন্তু তাঁরা তাত্ত্বিক নন, বাস্তবতাবাদী নন্দনতত্ত্বের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেন নি তাঁরা।[১৮]

ফ্রান্সে বাস্তবতাবাদী আন্দোলন তুমুল আলোড়ন তুললেও সমকালীন ইউরোপের অন্যান্য দেশে এ-আন্দোলনের তেমন কোনো প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। বিভিন্ন দেশের লেখক তাত্ত্বিকেরা কখনো এ-আন্দোলন সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধ লিখে পাঠককে এর সঙ্গে পরিচিত করাতে চেয়েছেন, কোনো দেশে এ-আন্দোলনটিকে নিন্দা করে প্রবন্ধ লেখা হয়, দু'একটি দেশের লেখকেরা তাঁদের নিজস্ব বাস্তবতাবাদকে এ-আন্দোলনের প্রভাবে কিছুটা বিকশিত করে তোলেন। ইংলন্ডে এ-আন্দোলনের কোনো প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। সেখানে বেশ সহজ ও সাধারণভাবে পাঠকের কাছে এ- আন্দোলনের পরিচয় তুলে ধরা হয় এবং শিল্পকলায় এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়। ইংলন্ডে ফরাশি বাস্তবতাবাদী তত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যাতা জর্জ হেনরি লেউস। লেউস নৈর্ব্যক্তিকভাবে বাস্তবতাবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেন, এই নতুন সাহিত্য বিধিটির সঙ্গে ব্রিটিশ পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়াই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। তাই তাঁর রচনায় এ-ধারার প্রতি অনুরাগ ও সমর্থন কিংবা বিরাগ-বিদ্বেষ কিছুই প্রকাশ পায় নি। " West Minister Review "তে ‹ October 1958 সংখ্যায়› লেউসের ' Realism in art : Recent German Fiction ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লেউস এ-প্রবন্ধে শিল্পকলা ও

---

১৮. Beeker, George J. (ed.,), Ibid, pp. 7 - 9.

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। এ-প্রবন্ধে তিনি লেখেন, শিল্পকলা বাস্তবতারই উপস্থাপন। তিনি দাবি করেন, সকল শিল্পকলার ভিত্তিই হচ্ছে বাস্তবতাবাদ - Realism is the basis of all art। লেউস এ-প্রবন্ধে সমকালীন দুজন জার্মান ঔপন্যাসিক Gustave Freytag ও Otto Ludwig -এর উপন্যাসের অবাস্তবতা ও বিরক্তিকর ভাবালুতার সমালোচনা করেন, ভিকটর হুগোর " Travailleurs de La mer " উপন্যাসটিকে অবাস্তব রচনা বলে অভিযুক্ত করেন, " জেন আয়ার " উপন্যাসের সমালোচনা করে বলেন যে ' melodrama ... and improbability 'ই উপন্যাসটিকে অবাস্তব রচনা করে তুলেছে।[৯৯] বাস্তবতা-বাদী আন্দোলন জার্মানীতেও তেমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় নি; রাশিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ইটালি প্রভৃতি দেশে বাস্তবতাবাদের স্বাধীন, স্বতন্ত্র নিজস্ব ধারা গড়ে ওঠে। পর্তুগালে ফরাশি প্রভাবে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটে উনিশ শতকের শেষার্ধে। পর্তুগালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বাস্তবতাবাদী লেখক Eça da Quliroz। তাঁর উপন্যাস " O Primo Basilio " পর্তুগীজ " মাদাম বোভারী " রূপে গণ্য হয়। Quliroz বাস্তবতাবাদী উপন্যাস রচনার পাশাপাশি এ-আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতাও দিয়ে চলেন। ১৮৭০-এর গোড়ার দিকে Quliroz লিসবনে বাস্তবতাবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এ-ভাবে পর্তুগালে এ-ধারাটি পরিচিত ও গৃহীত হয়ে উঠতে থাকে। স্পেনে ফরাশি বাস্তবতাবাদ ও প্রাকৃতবাদের মিশ্রনে একধরণের বাস্তবতাবাদের উদ্ভব ঘটে। Emilia Pardo Bazon স্প্যানিশ বাস্তবতাবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা। বাস্তবতাবাদের আঞ্চলিক-রঙবাদী (Local colourism) ধারাটিও স্পেনে প্রধান হয়ে ওঠে। Bazan প্রমুখের উপন্যাসে এ-ধারার উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। অনতিবিলম্বে এ ধারাটিকে স্প্যানিশ বাস্তবতাবাদী Benito Perez Galdos শক্তিশালী একটি ধারায় পরিণত করেন।[১০০] যুক্তরাষ্ট্রে ফরাশি বাস্তবতাবাদী আন্দোলন নিন্দিত হয়, তবে ইউরোপের অন্যান্য দেশের নিজস্ব ধরণের বাস্তবতাবাদ সেখানে ব্যাপক ব্যাখ্যাত হয়।

---

৯৯. Wellek, Rene, A History of Modern Criticism: 1750 - 1950, P.151.

১০০. Becker, George J., (ed.,), Ibid, pp. 20-21.

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রান্সে প্রবল বিতর্কের মধ্যে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনটি জন্ম নেয় এবং নানা বিরুদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে বিকাশ লাভ করে। এ-আন্দোলনের শুরু থেকেই একদল এর বিরুদ্ধাচারী, এই রক্ষণশীল সমালোচক গোত্র কখনো তাঁদের মত পরিবর্তন করেন নি। এই বিরোধী গোত্রের একটি প্রিয় বুলি ছিলো যে বাস্তবতাবাদ নিয়ে মাতামাতি করা অর্থহীন, কারণ এতে নতুনত্ব কিছু নেই। এ-আন্দোলন শুরু হবার আগেও সাহিত্যে বাস্তব উপাদান ছিলো এবং বরাবরই সাহিত্য কোনো না কোনো ভাবে বাস্তবতা নির্ভর। তাঁদের মতে, বাস্তবতা ব্যাপারটি খুব ক্লান্তিকর এবং বাস্তবতা বিষয়টি এতোই সহজ ও স্বতঃস্পষ্ট যে তা নিয়ে সূক্ষ্ম চিন্তা করার কিছু নেই। কতিপয় বিরোধী সমালোচক এতোদূর অগ্রসর হন যে তাঁরা বাস্তবতাবাদ নামক কোনো সাহিত্য আন্দোলনের অস্তিত্বেই স্বীকার করেন নি। এই বিরোধী গোত্রের মতে, বাস্তবতাবাদীদের সাধারণ জীবন চিত্রণ তত্ত্বটি তাঁদের নিজস্ব তত্ত্ব নয়, এটি তাঁরা সাহিত্যে নতুন নতুন বিষয় তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদী প্রথাগুলো ভাঙারও প্রয়াস চালান। রোম্যান্টিকদের অনেকেই যদিও বিমূর্ততা ও রহস্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তবু তাঁদের কেউ কেউ, যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাধারণ মানুষের জীবনকথা, সাধারণ প্রাত্যহিক বিষয় ও কথ্য ভঙ্গিটি তুলে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন। <u>Lyrical Ballads</u> (১৭৮০)-এর ভূমিকায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেন যে তিনি দৈনন্দিন সাধারণ জীবন অভিজ্ঞতার উপস্থাপনা করবেন 'জনসাধারণের নিজস্ব ভাষায়।' বিরোধী রক্ষণশীলেরা বলেন যে রোম্যান্টিসিজমের ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় এধারাটিই চলে এসেছে ফরাসি বাস্তবতাবাদে। বাস্তবতাবাদের অনুসারীরা বিরোধী গোত্রের এ-অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের আগেও সাহিত্যে বাস্তবউপাদান ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু উনিশশতকের মধ্যভাগের এই আন্দোলনের আগে 'বাস্তবতা' বিষয়টি কখনো কোনো সম্পূর্ণ গ্রন্থকে নিয়ন্ত্রণ করে নি। পূর্বেকার কোনো কোনো লেখকের প্রবণতা বাস্তবমুখী হলেও, ইতিপূর্বে কখনো বাস্তবতা প্রবণতাটি একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে নি। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনটি বাস্তবমনস্কতার এমন একটি বন্যা নিয়ে আসে, যা এর সামনের ভাববাদী সকল প্রবণতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁদের মতে, বাস্তবতাবাদ মোটেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রবর্তিত সাধারণ জীবন রূপায়ণ ধারার সম্প্রসারণ নয়। কারণ রোম্যান্টিকদের কেউকেউ দৈনন্দিন জীবনের কথা সাধারণের ভাষায় উপস্থাপিত করলেও ওই জীবন আদর্শায়িত ও শিল্পিত, জীবন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা তা নয়। ফলে ওই জীবনকে অবাস্তব, সুদূর, স্বপ্নের জীবন বলে মনে হয়। বাস্তবতাবাদের পক্ষ সমর্থনকারীরা এ প্রসঙ্গে বলেন যে, এ জন্যই লন্ডনের সাধারণ মানুষের দিকে যখন ওয়ার্ডসওয়ার্থের চোখ পড়তো, তিনি তখনই তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন। কারন সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁর যে পূর্বধারণা ও আদর্শ ছাঁচ ছিলো, এবং প্রাত্যহিক

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতায় তিনি যাদের দেখতেন-এ দুয়ের মধ্যে কোনো মিল ছিলো না। প্রাত্যহিক বাস্তবতার সাধারণদের সঙ্গে কাল্পনিক 'আদর্শ' সাধারণদের ছিলো দুস্তর ভিন্নতা। কিন্তু বাস্তবতাবাদীরা এমন কোনো 'আদর্শ' নিয়ন্ত্রিত নন। দৈনন্দিন বাস্তবতার মানুষকে আদর্শায়িত না করে অবিকল তুলে ধরাই তাঁদের লক্ষ্য। কাজেই ফরাশি বাস্তবতাবাদ রোম্যান্টিসিজম থেকে বেরিয়ে এসেছে একথা বলা যায় না। রোম্যান্টিসিজম ও রিয়ালিজম-কে কখনোই একই উৎস থেকে উদ্ভূত দুটি ধারা বলা যাবে না, কারণ এ-দুটি ধারা একটি অভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়, বরং এ-দুয়েরই আছে দুটি সুস্পষ্ট ভিন্ন দার্শনিক মত। রোম্যান্টিসিজমের ভিত্তি হচ্ছে 'ভাববাদী পরাবিদ্যা', রোম্যান্টিক শিল্পকলাকে সবসময় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ হতে হতো। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে উদ্ভূত এই বাস্তবতাবাদী ধারাটি রোম্যান্টিসিজমের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণার পোষক। দার্শনিক বাস্তবতাবাদ যেমন কোনো কল্পিত আদর্শলোককে বাস্তব বলে বিশ্বাস করেনা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতকেই একমাত্র সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করে; তেমনি সাহিত্যিক বাস্তবতাবাদ সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত প্রতিবেশ ও জীবন ধারাকেই সত্য বা বাস্তব বলে গণ্য করে। বাস্তবতাবাদীরা মনে করে যা কিছু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত, শুধু তা-ই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব এবং শুধুমাত্র এই বাস্তবতাই হবে সাহিত্যের উপজীব্য। এ-বাস্তবতার উপস্থাপনাই শিল্পকলার দায়িত্ব। বাস্তবতাবাদের আবির্ভাবের আগে এমন একটি ধারনা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে শিল্পকলা সর্বদা ধ্রুবভাবেরই (Ideal) উপস্থাপনা করবে। বাস্তবতাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্বাস ওই পূর্ববর্তী বিশ্বাসকে আঘাত করে। ফলে বাস্তবতাবাদী ধারাটি রক্ষণশীলদের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে আক্রান্ত হতে থাকে। তাঁরা আদর্শ নির্বাসিত হয়ে গেছে বলে আর্তনাদ করে ওঠেন, এবং সাহিত্যে পুনর্বার ফিরিয়ে আনার জন্য বহু জার্মান ও ইংরেজ সমালোচক বিস্ময়কর অর্থতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কসরত শুরু করেন।[১০৯]

---

১০৯. Ibid, pp. 5 - 6.

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী রোমান্টিক ধারাটির প্রতি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনকারীদের প্রবল বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ শিল্পের জন্য শিল্পবাদীথিয়োফিল গতিয়ে (Theophile Gautier) পূর্ববর্তী ধারার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে আর্তনাদ করেন, 'এই মধ্যযুগ থেকে আমাদের পরিত্রাণ করো।[১০২] পূর্ববর্তী রোম্যান্টিসিজমের আবেগের আতিশয্যপূর্ণ পরিমণ্ডলে বাস্তবতাবাদীদেরও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। স্বপ্নঘোরাচ্ছন্ন বিষয়বস্তুকে বিতাড়নের জন্য তাঁরাও তৎপর হয়ে ওঠেন। ফরাশি বাস্তবতাবাদের তাত্ত্বিকেরা বাস্তবতা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা কিংবা বাস্তবতাবাদী প্রবণতার ব্যাখ্যা ভাষ্য রচনার পাশাপাশি রোম্যান্টিসিজমকে আক্রমণ করে চলেন। তাঁরা রোম্যান্টিক প্রবণতারাশিকে নানাভাবে উপহাসও করেন। এই বাস্তবতাবাদীরা রোম্যান্টিকদের ভাবালুতাগ্রস্ত ও স্বাপ্নিক বলে উপহাস করেন; রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভব ও বিকাশ কালটিকে তাঁরা মধ্যযুগেরই সম্প্রসারিত একটু ভিন্নরূপ বলে গণ্য করেন। রহস্যময় সুদূর ভূভাগ কিংবা বনদেবী ও প্রকৃতির সৌন্দর্য বা প্রাচীন বীরদের বীরত্বের বর্ণনায় মগ্ন ছিলেন রোম্যান্টিকেরা। রোম্যান্টিকদের রহস্যময়তা, সৌন্দর্য ও সুদূরের স্বপ্নমগ্নতা বাস্তবতাবাদীদের ক্ষুব্ধ করে। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভবকাল থেকেই, এ-ধারার প্রবক্তারা আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই-এর পাশাপাশি বাস্তবতাবাদের আক্রমণস্থলগুলো নির্দেশ করতে বিস্মৃত হন নি। এদমঁ দুরাঁতি তাঁর স্বল্পজীবী পত্রিকা " Realisme " -র নানা লেখায় বাস্তবতাবাদের আক্রমণস্থল নির্দেশ করেন। এ-পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভিকটর হুগোর ধ্যান বা রোম্যান্টিক বিপদের রসাতল' শীর্ষক একটি লেখায় দুরাঁতি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। মন্তব্যটি তাঁর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ক হলেও এটি বাস্তবতাবাদীদের প্রবণতা ও রোম্যান্টিকদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলে। তিনি বলেন, 'তিনি নারীদের পছন্দ করেন না, শিশুরা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য, এবং প্রকৃতিকে লক্ষ্য করার দিকেও তাঁর ঝোঁক নেই।[১০৩] রোম্যান্টিকদের প্রতি তাঁর আক্রমণ হয়ে ওঠে তিরস্কার-

---

১০২. Stromberg, Ronald N, An Intellectual History of Modern Europe., (Prentice Hall, Inc. Englewood cliffs, New Jersey 1975), P. 302.

১০৩. Ibid, P. 302.

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণ। রোম্যান্টিকদের আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'এডগার পো হচ্ছে ডাচ পনিরের মতো এবং বোদলেয়ার ধার্মিক ইঁদুর .... লা মার্তিন (La Martine) একজন সংকর, মুৎসে (Musset) ডন জুয়ানের ছায়ামাত্র, যাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে, আর দ্য ভিনি একজন উভলিঙ্গ (Harmaphrodite)।'[১০৪] শাঁফ্লুরি ঘোষণা করেন যে বাস্তবতাবাদীরা 'রোম্যান্টিকদের ছন্দবদ্ধ মিথ্যায় ক্লান্ত'। তিনি রোম্যান্টিকদের উপহাস করে বলেন যে তাঁরা 'নিজের সময়কে অস্বীকার করে শুধু অতীতের লাশ খুঁড়ে তোলে এবং তা সাজিয়ে রাখে ঐতিহাসিক অসার কারুকার্যে।'[১০৫] ফরাসি বাস্তবতাবাদী প্রাবন্ধিকেরা রোম্যান্টিকদের যেভাবে প্রত্যাখ্যান করে, ইংলন্ডে আঠারো শতকের প্রথমভাগে একই ঘটেছিলো। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইংলন্ডে এডিসন, স্টীল প্রমুখ লেখক পূর্ববর্তী রোমান্সগুলোকে একই ভাবে আক্রমণ ও প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ফের্দিনঁ দেসনোয়েরর (Fernand Desnoyers) তাঁর ' Du Realisme ' প্রবন্ধে বাস্তবতাবাদের আবির্ভাবকে অভিবাদন জানান। তিনি ঘোষণা করেন, রোম্যান্টিকদের চন্দ্রালোকে ভ্রমণরত বনদেবী, রুগ্ন ও বিষন্ন প্রণয়াবেগ ও স্বপ্নঘোরাচ্ছন্ন পৃথিবীতে বাস্তবতাবাদ ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে।[১০৬] একজন বেশ উপহাস করে বলেন যে প্যারিসের দুরন্ত শিশুরা এখন বিগত রোম্যান্টিকদের জন্য ক্রন্দনরত। এই আক্রমণ সত্ত্বেও বাস্তবতাবাদের পক্ষে রোম্যান্টিসিজমকে সম্পূর্ণ উৎখাত করা সম্ভব হয় নি। বাস্তবতাবাদের প্রবল আগ্রাসনের ফলে রোম্যান্টিসিজম তার প্রাধান্য হারালেও, অপেক্ষাকৃত গৌণ ভাবে এ-ধারাটি এর পরেও দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলো। এজন্য বাস্তবতাবাদের পরবর্তী প্রাকৃতবাদী...ও রোম্যান্টিসিজমকে উচ্ছেদের জন্য অভিযান চালাতে হয়। বাস্তবতাবাদ ও রোম্যান্টিসিজমের মধ্যেকার প্রবল দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে একটি গৃহযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যে যুদ্ধ চলেছে একটি পুরো শতাব্দীধরে। বাস্তবতাবাদের তাত্ত্বিকেরা সমালোচনা প্রবন্ধ ইত্যাদি মধ্য দিয়ে রোম্যান্টিসিজমকে আক্রমণ ও প্রত্যাখ্যান করেন, আর ফরাসি বাস্তবতাবাদী উপন্যাসিকেরা তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনায় রোম্যান্টিসিজমের বিরুদ্ধে চালান আক্রমণ।

---

১০৪. উদ্ধৃত, Grant. Damian, Ibid, P. 23.

১০৫. উদ্ধৃত, Ibid, P. 23.

১০৬. উদ্ধৃত, Ibid, P. 23.

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা রোম্যান্টিক স্বপ্ন-কল্পনা-আবেগ বিদ্রূপ করেন এবং এসবের অন্তঃসারশূন্যতা উদঘাটন করেন। ফরাশি বাস্তবতাবাদী উপন্যাসধারার প্রধান পুরুষ ফ্লবেয়ার স্বপ্নঘোরাচ্ছন্ন রোম্যান্টিক বিষয়বস্তু উচ্ছেদ অভিযানে গ্রহণ করেন উদ্যোগী ভূমিকা। ফ্লবেয়ার সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ও 'বৈজ্ঞানিক' সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান। তাঁর লক্ষ্য ছিলো এমন কাহিনী উপস্থাপন করা যাতে বাস্তবিকই কোনো বীরসুলভ বা অসাধারণ পাত্রপাত্রী থাকবে না। ''মাদাম বোভারী' (১৮৫৮) উপন্যাসে ফ্লবেয়ার রূঢ় বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে স্বপ্ন-সৌন্দর্য-প্রণয় সম্পর্কে রোম্যান্টিক মধুর ধারণাগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি দেখান বাস্তবের কাছে স্বপ্ন কীভাবে পরাজিত হয়, স্থূল, নির্বোধ সমাজজীবন কীভাবে ব্যক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ-উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ইমা-র জীবনবৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে জীবনের অ্যান্টি রোম্যান্টিকতা নির্দেশের প্রয়োজনে। তিনি এ-উপন্যাসে নির্দেশ করেছেন কীভাবে এই অবক্ষয়গ্রস্ত রুদ্ধ সমাজ ইমা বোভারীর সম্ভাবনাময় জীবনের বিকশিত হবার সকল পথ রুদ্ধ করে রেখেছে, হত্যা করেছে তার সকল সম্ভাবনা। সাহিত্যে রোম্যান্টিসিজমকে প্রত্যাখ্যানের এ-ব্যাপারটি কোনো বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ব্যাপার ছিলো না। ওই সময়ের রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞান-দর্শনের মতো-সাহিত্যেও পূর্ববর্তী ভাবধারাকে প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা দেখা দেয়।

রোম্যান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিশেবে এই নব্যধারার লেখকেরা উদ্যোগী হয়ে ওঠেন বাস্তব ঝাঁঝালো রুক্ষ জীবন উপস্থাপনায়, এবং তুচ্ছ সাধারণ বিষয়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনায়।[১০৭] এ-ধারার তাত্ত্বিক রোম্যান্টিসিজমকে আক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে বাস্তবতার কোন অংশের উপস্থাপনা হওয়া উচিত তা নির্দেশ করে চলেন, আর সৃষ্টিশীলেরা 'বস্তুনিষ্ঠ' ও 'বৈজ্ঞানিক' সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। রোম্যান্টিক

---

১০৭. Stromberg. Ronald N, Ibid, P. 302.

Dhaka University Institutional Repository

ভাবালুতার পরিবর্তে প্রাত্যহিক সামান্য বাস্তবতার উপস্থাপনার কথা বললেও এই বাস্তবতাবাদীদের অনেকেই ছিলেন স্ববিরোধিতাগ্রস্ত। এই স্ববিরোধ যেমন ছিলো বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের তাত্ত্বিকদের মধ্যে, তেমনি ছিলো সৃষ্টিশীলদের মধ্যেও। দুরাঁতি এবং সাঁৎ বভ্‌এ-ধারার দুজন প্রধান প্রবক্তা। তাঁরা রোম্যান্টিক প্রবণতাকে আক্রমণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু রোম্যান্টিক প্রবণতাগুলোর প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিলো প্রবল। তাই 'মাদাম বোভারি'তে উপস্থাপিত প্রাত্যহিক বাস্তবতা ও তুচ্ছ বিষয়ের অনুপুঙ্খ নিরাবেগ বর্ণনারীতিটি এবং জীবনের রূঢ় দিকের উপস্থাপনাকে ক্ষুব্ধ করে, কারণ এ-উপন্যাসে অনুভূতি থেকে উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ততা নেই বলে তাঁর মনে হয়েছে। আর বভ্‌ব্যথিত হয়েছেন এ-উপন্যাসের অ্যান্টি-রোম্যান্টিকতায়। গ্রন্থটিতে আদর্শ ও ভালোর অনুপস্থিতি তাঁর পছন্দ হয় নি, তবে লেখকের রচনাশৈলী, ঘটনা বিন্যাস ইত্যাদি অসাধারণ বলে গণ্য করেন তিনি। দুরাঁতি উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেন,

'গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের "মাদাম বোভারি" উপন্যাসে দেখা যায় বর্ণনার একগুঁয়েমি। এটি স্মরণ করিয়ে দেয় রেখা ড্রইংকে। এর সবকিছুই হিসেব করা, বারবার রচিত। এর সবকিছুই সমকোণী এবং পুরোপুরি শুষ্ক ও ঊষর। ... বাস্তবিকই এর বিশদ বর্ণনা একের পর এক বিন্যস্ত এবং প্রতিটিকেই দেয়া হয়েছে সমান মূল্য। প্রতিটি সড়ক, প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ঘর, প্রতিটি স্রোতস্বিনী প্রতিটি ঘাসের ডগা সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত। ..... এ ধরনের একগুঁয়ে বর্ণনাপদ্ধতির ফলে উপন্যাসটি প্রায় পুরোপুরি উপস্থাপিত হয়েছে আঙ্গিক সংকেত বা ইশারার সাহায্যে। .... এ উপন্যাসে কোন আবেগ নেই, অনুভূতি নেই, জীবন নেই, আছে শুধু একজন গাণিতিকের মহাশক্তি, যিনি সবকিছু হিসেব করে উপস্থিত করেছেন। .... এ উপন্যাসে সবসময়ে আছে বস্তুগত বর্ণনা এবং কখনোই মানসিক অনুভূতি নেই। এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করা আমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে; কারণ পূর্বে উল্লেখিত ত্রুটিরাশি একে আকর্ষণ শূন্য করে তুলেছে। উপন্যাসটি প্রকাশের আগে মনে করা হয়েছিলো যে এটি আরো ভালো হবে - অতিরিক্ত বর্ণনা, বিবরণ কখনোই অনুভূতি থেকে উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ততার স্থান নিতে পারে না'।[১০৮]

---

১০৮. Duranty, Edmond, & Sainte - Beuve, Charles Augustin, 'Two view of Madam Bovary' in Becker (ed.,), pp. 98 - 99.

Dhaka University Institutional Repository

এ-উপন্যাসে নৈতিকতা ও আদর্শের অনুপস্থিতি সাঁৎ বভ (১৮০৪-১৮৬৯) এর কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হয়েছে। তিনি আপত্তি তুলে বলেন এখানে 'আদর্শ অনুপস্থিত হয়ে গেছে। গীতিময়তার ঝর্ণাধারা শুকিয়ে গেছে, আমরা তা থেকে দূরে সরে এসেছি। এক কঠোর সমবেদনাহীন সত্যনিষ্ঠা অভিজ্ঞতার শেষ কথারূপে এমন কী শিল্পকলার জগতেও উপস্থিত হয়েছে। .... তিনি দেখেছেন শুধু নীচতা, দুর্দশা, ভণ্ডামি, নির্বুদ্ধিতা, একঘেয়েমি ও গ্লানি এবং তিনি সেকথাই আমাদের বলেছেন। .... এই বইয়ে ভালো খুব বেশি অনুপস্থিত। গ্রন্থের একটি চরিত্রও এর প্রতিনিধিত্ব করে না।'[১০৯] প্রাত্যহিক বাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনার কারণে দুর্নীতির বিরাগে, আর নীতিকথার অনুপস্থিতিতে বভ-এর অসন্তোষে রোম্যান্টিক ভাবালুতা ও আদর্শবাদের প্রতি তাঁদের অনুরাগই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্লবেয়ারের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় দুই বিপরীত প্রবণতার উপস্থিতি। তিনি Louise Colet এর কাছে তাঁর এই দ্বৈতসত্তা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেন। তিনি বলেন লেখক হিশেবে তাঁর মধ্যে রয়েছে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত সত্তা; একটি সত্তা মুগ্ধ হয় গীতিময়তায়, আবেগ ও ঘটনার ঘনঘটায়, Great eagle flights, all the sonorities of style and the high summits of ideas -এ; অন্য সত্তাটি যতদূর সম্ভব সত্যকে খুঁড়ে তোলে। এ সত্তাটি গুরুত্বপূর্ণ বিরাট ঘটনায় যেমন জোর দিতে চায়, তেমনি সামান্য ও তুচ্ছবিষয়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনায়ও জোর দিতে চায়। বস্তুকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে চায় যাতে পাঠক বস্তুর উপস্থিতি অনুভব করতে পারে।[১১০] এই দুই বিপরীত প্রবণতার কারণে ফ্লবেয়ারকে একই সঙ্গে বলা যায় বাস্তববাদী এবং প্রতীকী ধারার লেখক।[১১১] ফ্লবেয়ার

---

১০৯. Ibid, P. 100

১১০. উদ্ধৃত, Grant, Damian, Ibid, P. 60.

১১১. Grant. Damian, Ibid, P. 59.

Dhaka University Institutional Repository

যতটা বাস্তবতাবাদী তার চেয়েও বেশি বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক। বাস্তবতাকে তিনি গণ্য করেন শুধুমাত্র একটি ' Spring Board ' হিসেবে,[১১২] যাকে নির্ভর করে বিশুদ্ধ নান্দনিকতায় প্রবেশ করা যায়। বিভিন্ন বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে তিনি বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত বেশ স্পষ্ট ভাবে ব্যক্তি করেছেন। তিনি এমনকি নিজে বাস্তবতাবাদী হিসেবে পরিচিত হতেও অপছন্দ করেছেন। জর্জ সাঁকে লেখা চিঠিতে (ফেব্রুয়ারী ৬, ১৮৭৬) বাস্তবতাবাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা ও ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন এভাবে, ' যাকে প্রথাগত-ভাবে বাস্তবতাবাদ বলা হয় আমি তাকে ঘৃণা করি, যদিও লোকেরা আমাকে তার একজন প্রধান পুরোহিত বলে গণ্য করে।[১১৩] Laurent - Pichat -এর কাছে লেখা চিঠিতে (অক্টো ২,১৮৫৬) তিনি বলেন, ' আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে এই নোংরা বাস্তবতা যা আপনাকে পীড়িত করে, তা আমার চিত্তকেও সমপরিমাণে অসুস্থ করে? আপনি যদি আমাকে আরেকটু ভালোভাবে জানতেন তাহলে আপনি জানতেন যে আমি সাধারণ জীবনকে ঘৃণা করি। আমি সব সময়ই যতটা সম্ভব এর থেকে দূরে থেকেছি।[১১৪] তুর্গে-নিভকে লেখা চিঠিতেও (নভেম্বর ৮,১৮৭৭) বাস্তবতা সম্পর্কে ফ্লবেয়ারের একই রকম বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করা যায়। ফ্লবেয়ার বলেন, ' আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি ' Spring board ' আমার বন্ধুরা (দুদে ও জোলা) দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে বাস্তবতাই সবকিছু। এধরণের বস্তুবাদীরা আমাকে রুষ্ট করে "।[১১৫] শিল্পকলার গণতন্ত্রীকরণের বাস্তবতাবাদী প্রবণতাটিও তাঁকে ক্ষুব্ধ করে। বাহ্যবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা একপর্যায়ে তার কাছে অসহ্যবোধ হয়। তিনি মনে করেন এভাবে সাহিত্যকে আবর্জনাস্তূপে পরিণত করা হয় মাত্র। এই চেতনা থেকেই তুর্গেনিভকে তিনি লিখেছিলেন , ' এইজড়বাদ আমাকে ক্ষিপ্ত করে। প্রতি সোমবার যখন আমি জোলার প্রচারপত্র পড়ি তখন আমার প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত প্রচন্ড। বাস্তবতাবাদী-দের পর আমরা পেয়েছি প্রাকৃতবাদীদের এবং ইম্প্রেশনিস্টদের। কি অগ্রগতি! এক ভিড় বাস্তবপন্থী বিদূষক।[১১৬]

---

১১২ • তুর্গেনিভকে লেখা চিঠি, উদ্ধৃত, Allott. Miriam, Ibid. P. 69

১১৩ • Flaubert. Gustave, 'On Realism' in Becker (ed., 1963), P. 96

১১৪ • Ibid, P. 94.

১১৫ • Ibid, P. 96.

১১৬ • Ibid, P. 96.

Dhaka University Institutional Repository

ফ্লবেয়ারের এই মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় তাত্ত্বিক বাস্তবতাবাদীদের পূর্ববর্তী শিল্পের জন্য শিল্পবাদী ও পরবর্তী প্রতীকীদের সঙ্গে। শিল্পবাদীগোষ্ঠি রোম্যান্টিসিজমের ভাবালুতা ও প্রকরণ রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রোম্যান্টিকদের ভাবালুতা ও তারল্যে'র পরিবর্তে তাঁরা প্রবর্তন করতে চান সুসংহত আঙ্গিক-প্রকরণ ও বিষয়বস্তু। রোম্যান্টিকেরা তাঁদের ক্লান্ত ও ক্রুদ্ধ করেন। এ-ধারার পুরোহিত থিয়োফিল গতিয়ে ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে 'এই মধ্যযুগ থেকে আমাদের পরিত্রান করো।' শিল্পবাদীদের মতোই বিশুদ্ধ শিল্পের পক্ষপাতী ছিলেন ফ্লবেয়ার। ফ্লবেয়ার মনে করেন শিল্পকলাই স্রষ্টাকে নিয়ে যেতে পারে বাস্তবতার অসহ্য কোলাহল থেকে দূরে এক সুউচ্চ নির্জন মিনারে। ফ্লবেয়ারের আর্তচিৎকারে বাস্তবতার অসহ্য কোলাহল থেকে দূরে যাবার আকাঙ্খাই ধ্বনিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, Give me the highest one possible [১১৭] ফ্লবেয়ার একই সঙ্গে ছিলেন বাস্তবতাবাদী এবং বিশুদ্ধ শিল্পবাদী। তাঁর "মাদাম বোভারী" বাস্তবতাবাদী ধারার প্রধান রচনা হিসেবে গণ্য হয়, এ-উপন্যাসে লেখকের রূঢ়-বাস্তবতার গাণিতিক প্রদর্শন সমকালীনদের ক্রুদ্ধ করে। কেউ কেউ রচনাটিতে উপন্যাসিককে খুঁজে পাননি, খুঁজে পান একজন শবব্যবচ্ছেদকারী ও শারীরবিদকে। রূঢ় বাস্তবতার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনার পাশাপাশি ফ্লবেয়ার সাধনা করেছেন বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টির। তাঁর পত্রগুচ্ছে তাঁর এই দ্বিধাপরিপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে।

২.৪ বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের লেখকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আন্দোলনকারী বাস্তবতাবাদীরা যা করতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে 'সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন।' তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন উদ্ভট ও পরীর গল্পের মতো বিষয়, রূপক ও প্রতীকতা, বিমূর্ত

---

১১৭. Stromberg. Ronald N, Ibid, P. 302.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপার ইত্যাদি। অসম্ভব, আকস্মিক এবং অসাধারণ ঘটনার পরিবর্তে তাঁরা গ্রহণ করেন সাধারণ জীবন বাস্তবতাকে, জীবনের গোপন ব্যাপারগুলো -যেমন যৌনতা ইত্যাদিও তুলে ধরেন তাঁরা সাধারণ ও প্রাত্যহিক বাস্তবতাসংলগ্ন বিষয় নির্বাচনের মধ্য দিয়েই একজন লেখক বাস্তবঘনিষ্ঠ হতে পারেন বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাঁরা এও বিশ্বাস করেন যে সাধারণ ও তুচ্ছ বিষয়ের পাশাপাশি অসাধারণ ও সুন্দর বিষয়ও সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের সূচনাকারী চিত্রশিল্পী গুস্তাভ কুরবেঁ নিজেকে পূর্ববর্তী প্রথাগত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন এবং বাস্তবতাবাদী বলে ঘোষণা করেন। তাঁর চিত্রকলায় তিনি তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করেন। তাঁর চিত্রকলার বিষয়রূপে তিনি নেন কৃষকদের জীবনধারা এবং বুর্জোয়াদের জীবন। শাঁফ্লুরি Jules Husson, dit Fleury ছদ্মনামে যে সব উপন্যাস রচনা করেন তাতে গ্রামীন সাধারণ জীবন চিত্রনকেই বাস্তবতা বলে গণ্য করেন।[১১৮] দুরাঁতি বাস্তবতাবাদের লক্ষ্য প্রসঙ্গে বলেন 'বাস্তবতাবাদের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক অবস্থার ও সমকালীন জগতের যথাযথ, সম্পূর্ণ ও আন্তরিক উপস্থাপনা। সুতরাং এই উপস্থাপনা হবে যথাসম্ভব সহজ সরল যাতে যে কেউ তা বুঝতে পারে'।[১১৯] ফেরনার্ড দেশনোয়েরের (১৮২৮-১৮৮৯) এর মতে, 'বস্তুবতাবাদ হচ্ছে সত্য চিত্রন।[১২০] তিনি বলেন 'যাঁরা রঙিন কাঁচের' ভেতর দিয়ে বস্তুকে দেখেন তাঁদের সঙ্গে আন্তরিক ও স্পষ্ট দৃষ্টি সম্পন্ন স্রষ্টাদের ভিন্নতা বোঝাবার জন্যই বাস্তবতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে'।[১২১] তিনি বলেন, Since the word truth puts everybody in agreement and since everybody approves of the word, even liars, we must admit that, without being an apologist for ugliness and evil realism has the right to represent whatever exists and whatever we see'[১২২] কুরবেঁ তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর দরোজায় যে ইশতেহার ঝুলিয়েছিলেন

---

১১৮. Wellek. Rene, A History of Modern Criticism: 1750 - 1950, P.2

১১৯. উদ্ধৃত, Grant. Damian, Ibid, P. 27.

১২০. Desnoyers. Fernand. ' On Realism' in Becker (ed.,) P. 80.

১২১. Ibid, P. 81.

১২২. Ibid, P. 81.

Dhaka University Institutional Repository

তাতেও প্রকাশিত হয় একই বক্তব্য : ' To know in order to create, that is my idea. To be capable of depicting the manners, ideas and appearance of my time as I see it , in short, to produce living art, that is my goal ,[১২৩] অধিকাংশ সাধারণ মানুষ যে-জীবন যাপন করে তাঁরা তার উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন । তাঁরা অনেকটা বেনহামের মতোই বিশ্বাস করতেন যে অধিকাংশ মানুষ যে জীবন যাপন করে সে জীবনই কোনো-না-কোনোভাবে সর্বাধিক সত্য । সেখানেই আছে জীবনের প্রকৃতরূপ । নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে সমাজের এই নিম্নতলের জীবনের চিত্রনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত বাস্তবতাকে তুলে ধরা সম্ভব । গঁকুরভ্রাতৃদ্বয় বলেন, ' আমরা মানবতার তলানী নিয়ে শুরু করেছিলাম, কারণ নিম্নতলের পুরুষ ও নারীরা অনেক বেশি প্রাকৃত ও বর্বর অবস্থার নিকটতর্বী হয়ে থাকে । তারা সরল ও জটিলতাহীন প্রাণী । অন্যদিকে প্যারীসীয় ভদ্রলোকেরা এর বিপরীত । অতি প্রতিভাবাপন্ন ঔপন্যাসিকের পক্ষেও তাদের বুঝে ওঠা কঠিন।'[১২৪] বাস্তবজীবনে আছে আনন্দ ও বেদনার, কদর্য ও শুভ, সুন্দর ও প্রকৃত বাস্তবতাবাদী হয়ে ওঠার জন্য এ দুয়ের উপস্থাপনাকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এই লেখক ভ্রাতৃদ্বয় । যদিও রূঢ় বাস্তবতা ও নিম্নতলের জীবন চিত্রনের দিকেই তাঁদের আগ্রহ ছিলো বেশি কিন্তু তাঁরা মনে করেন বাস্তবতার যে কোনো বিষয়ই সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে । অসুন্দর যেমন বাস্তব তেমনি সুন্দরও বাস্তবতাই একটি অংশ । তবে রোমান্টিকেরা যে সুন্দরে উপস্থাপনা করেছেন তার সঙ্গে বাস্তবতাবাদীদের সুন্দরের বিপুল দূরত্ব থাকবে ।[১২৫] দেসনোয়ের বলেন, ' আমি বিশ্বাসকরি সুন্দরের মধ্যে যতটা কবিতা পাওয়া যায় অসুন্দরের মধ্যেও এতটাই পাওয়া যায় । যতটা পাওয়া যাবে বাস্তবে এতটাই মিলবে উদ্ভটত্বে । ··· সৌন্দর্য বা অসৌন্দর্য কবি ও শিল্পীর কাছে বিষয়বস্তু

---

১২৩ . উদ্ধৃত, Ibid, P. 88.

১২৪ . Goncourt. Edmond De, 'Levels of Realism' in Becker (ed.,) P.245

১২৫ . Ibid, P. 245.

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র। তিনিই স্থির করবেন কোন বিষয় তিনি নেবেন। তবে একটি বিষয় স্থির নিশ্চিত যে কবিতা বাস্তবতার মতোই মাত্র যা কিছু অস্তিত্বশীল তাতেই পাওয়া যাবে। যা দেখা যায়, যার ঘ্রাণ নেয়া যায়, যাকে শোনা যায় যার স্বপ্ন দেখা যায় তার মধ্যেই তাকে পাওয়া সম্ভব। তবে একটি শর্ত এই যে ওই স্বপ্ন ইচ্ছাকৃত হবে না।'[১২৬]

বাস্তবতাবাদীরা বাস্তবতার সকল অংশে উপস্থাপনার পক্ষপাতী। ফ্লবেয়ারের মতে, বস্তু যেরকম আছে বাস্তবতাবাদী লেখক তাকে সেভাবেই দেখে থাকেন। তিনি মনে করেন বাস্তবতার সকল বিষয়ই বাস্তবতাবাদীদের উপজীব্য-হবে, কারণ প্রতিটি বিষয়ই সুন্দর। বাস্তবতা বাদীলেখক বাস্তবতার কোনো অংশকেই অবজ্ঞা করেন না। তিনি গ্রহণ করেন যে-কোনো বিষয় এবং সকল বিষয়কে দেন সমান গুরুত্ব। Louise colet কে লেখা চিঠিতে (মার্চ ২৭, ১৮৫৩) এ-প্রসঙ্গে ফ্লবেয়ার বলেন,··· ' বস্তুরাশি যেমন আছে আমরা তেমন দেখারই চেষ্টা করতে চাই·····। আগে লোকেরা মনে করতো শুধুমাত্র আখ থেকেই চিনি উৎপন্ন হয়, আজকাল প্রায় সবকিছু থেকেই চিনি বের করা যায়। কবিতার ব্যাপারেও একই রীতি। আমরা যে কোনো বিষয় থেকেই কবিতা বের করতে চাই, কারণ তা গুপ্ত আছে সবকিছুতেই এবং সবখানেই। বস্তুর এমন কোনো অনু নেই যা কোনো ভাবনা বহন করে না'।[১২৭] তিনি বলেন, 'So let's become occustomed to considering the world as a work of art, the way of which we must reproduce in our work '।[১২৮] বাস্তবতাবাদী লেখকের কাছে সমান গুরুত্ব পায় সকল বিষয় Louise colet কে লেখা অপর চিঠিতে (জুন ২৬, ১৮৫৩) ফ্লবেয়ার বলেন, ' যে বইটি আমি এখন বহুকষ্টে লিখছি যদি সেটি ঠিক-ঠাক মতো লেখা হয় তাহলে আমি তার মধ্যদিয়ে আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয় এমন দুটি সত্য

---

১২৬. Desnoyers. Fernand. Ibid, P. 82.

১২৭. Falubert. Gustave, ' On Realism', P. 92

১২৮. Ibid, P. 92.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। প্রথমত: কবিতা বিশুদ্ধ ভাবে মন্ময় অর্থাৎ সাহিত্যের জন্য কোন বিশুদ্ধ শিল্পসম্মত বিষয় নেই। সুতরাং কনস্টান্টিনোপল যতটা মূল্যবান ইভেটটও ততটাই মূল্যবান। তাই একটি বিষয় অন্য যে কোন বিষয়ের মতোই চমৎকার। শিল্পীর কাজ হচ্ছে প্রতিটি বিষয়কে শিল্পে উন্নীত করে তোলা। তিনি বলেন: he is like a pump, he has a big tube in him which goes down to the vitals of things to the deepest layers',[১২৯] '। একই অভিমত ব্যক্ত হয় গঁকুর ভ্রাতাদের বক্তব্যে, 'বাস্তবতাবাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র নিম্ন, অরুচিকর ও পূতিগন্ধময় জিনিসের চিত্রন ছিলো না। এর আবির্ভাব ঘটেছিলো উন্নত, সুন্দর, সুগন্ধময় জিনিসের শিল্পিত চিত্রনের জন্য, পরিশীলিত মানুষ ও ঐশ্বর্যের উপস্থাপনা করাও বাস্তবতাবাদের লক্ষ্য ছিলো'।[১৩০] মপাসাঁ যদিও মন্ময় বাস্তবতাবাদের অনুসারী ছিলেন তবু তিনিও মনে করেন যে-কোনো বিষয়ই সাহিত্যের উপজিব্য হতে পারে। নিম্নতম উপাদান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একজন লেখক গ্রহণ করতে পারেন সুন্দর বিষয়াদিও। মপসাঁও দাবী করেন যে ঔপন্যাসিকের যে কোনো বিষয়বস্তু গ্রহণের অধিকার আছে। তিনি বলেন, 'আজকালকার ঔপন্যাসিকেরা সত্য উপন্যাস লেখার দাবী করেন। কিন্তু উপন্যাসে শুধু হীন বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা যেমন অযৌক্তিক হবে, তেমনি শুধু সুন্দর-শোভন বিষয়ের উপস্থাপনাও অযৌক্তিক হবে।'[১৩১] উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ' What difference would there be between a work in which all the characters were the very image of goodness and one in which they were all low and criminal? In the one as in the other there would exist a bias toward good or toward evil which would in no way be in harmony with the expressed intention to reproduce life, that is, to be more balanced, more just, more life like than life itself'[১৩২]

---

১২৯ . Ibid, P. 93.

১৩০ . Goncourt, Edmond de, Ibid, P. 245.

১৩১ . Maupassant, Guy de, 'The Lower Element', in Becker (ed.,) P. 248.

১৩২ . Ibid, P. 249.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ তিনি বাস্তবতার ভালো ও মন্দ একসঙ্গে এ-দুয়েরই উপস্থাপনার পক্ষপাতী, কারণ বাস্তবতায় ভালো ও মন্দ একইসঙ্গে অবস্থান করে ।

যে-কোনো বিষয় বা বাস্তবতার যে-কোনো সুর সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে বলে আন্দোলন-কারী বাস্তবতাবাদীরা বিশ্বাস করলেও, তাঁদের অনেকে সমাজের নিম্নতলের জীবন বাস্তবতার উপস্থাপনায়ই মনোযোগী ছিলেন । যেমন গঁকুর ভ্রাতাদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিলো মূলতঃ সমাজের নিম্নতলের দিকে । কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সমাজের নিম্নতলের মানুষদের জীবন আদিম অবস্থার অনেক কাছাকাছি রয়েছে । প্রায় আদিম জীবন যাপনকারী ওই পশু-মানুষদের জীবনচিত্রনের মধ্য দিয়ে তাঁরা দেখাতেন যে ওই পশুমানুষেরা একই সঙ্গে আর্থনীতিক চাপে অসহায় এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির ক্রীড়নক মাত্র । গঁকুর ভ্রাতারা মধুর প্রণয়োপা-খ্যান বর্ণনার চেয়ে প্রণয়ের আবরণে ঢাকা রিরংসা ও প্রবঞ্চনা নির্দেশ করার দিকে মনোযোগী ছিলেন । এমন বিষয়বস্তু নির্বাচনের কারণে বাস্তবতাবাদী লেখকেরা বেশ আক্রান্ত হন । বাস্তবতাবাদীদের বিরুদ্ধে নীতিলঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা হয় । অভিযোগ করা হয় বাস্তবতাবাদীরা নিম্নতম উপাদানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের নীতিলঙ্ঘন করেছেন । মূলতঃ বাস্তবতাবাদীরা রোমান্টিক ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাবার জন্যই নিম্ন-তলের রূঢ় বাস্তবতার উপস্থাপনা করেন । রোমান্টিক প্রবণতা সম্পর্কে দুরাঁতি বলেন, ' The litterateurs and versifiers have spiled artists and the calling of art by their insistence on upholding the noble genre, on acclainaing the noble genre, on shouting that we must poetize and idealize - sords which artists have understood as meaning to 'dress up'; that is never to tcld rate nature but to take everything back to an archaic type which has been preeciously observed in museums and has been carried tc perfection by Annibal Carrache'[১৩৩]

---

১৩৩ . ভূমিকা অংশ থেকে উদ্ধৃত, Duranty, Edmond, and Sainte-Beuve. chartes Augustin, Ibid, P. 97.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ রোম্যান্টিকদের সবকিছুকে সুন্দর, সুদূর ও আদর্শায়িত করে তোলার যে-প্রবণতা ছিলো, নিম্নতলের বিষয়বস্তু গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাস্তবতাবাদীরা তার বিরুদ্ধেই প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেন।

এ-প্রসঙ্গে মপসাঁ বলেন, 'এখন নিম্নতর উপাদান গ্রহণের যে বাতিক দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে পূর্ববর্তী প্রবল ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ····· আমাদের পূর্বপুরুষেরা উপন্যাসের জন্য ব্যতিক্রম খুঁজতেন, খুঁজতেন অস্তিত্বের উদ্ভট্ত্ব, সন্ধান করতেন দুর্লভ ও রোমাঞ্চকর বিষয়। তাঁরা যে-জন্য সৃষ্টি করেছিলেন তা মানবিক হলেও ছিলো কাল্পনিক। তাঁদের এ-পদ্ধতিকে বলা যায় ভাববাদী পদ্ধতি। অধুনা উপন্যাস থেকে ব্যতিক্রমকে নির্বাসিত করার প্রচেষ্টা চলছে। আমরা মানবজীবনের লঘিষ্ট সাধারণ অনুপাত খুঁজি। যে-সমস্ত অভিজ্ঞতা, অভ্যাস ও আচরণ ব্যাপক, আমরা তা-ই গ্রহণ করে থাকি। এ-জন্যই দরকার নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পর্যবেক্ষণ।···
·· আমরা যে নিম্নতলের জীবন বা হীন উপাদান বারংবার উপস্থাপিত করি তার কারণ হচ্ছে এটি বস্তু বা বাস্তবতা সম্পর্কে কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শতাব্দী ধরে কবিরা কুমারী, নক্ষত্ররাজি, বসন্তকাল ও পুষ্প সম্পর্কে কাব্য রচনা করেছেন। নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সংরাগ, যেমন ঈর্ষা ও ঘৃণার টানাপোড়েনের কাহিনী। শিশিরের সৌন্দর্যমগ্ন ওই কবিকুলের কথা ভেবে আমাদের করুণা জাগে। আমরা বলতে চাই একজন লেখকের কাছে সুন্দর ও কুৎসিত দুই-ই সমানগুরুত্বপূর্ণ। ···· এবং আধুনিক ঔপন্যাসিক এই নীতিতে বিশ্বাস করেন যে মানবিক কোনো কিছুই তাঁর শত্রু নয়।'[১৩৪] তবে রচনায় নিম্নতম উপাদান গ্রহণের মধ্যদিয়ে পূর্ববর্তী রোম্যান্টিকদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপনই আন্দোলনকারী বাস্তবতা-বাদীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলোনা। এই উপাদান গ্রহণের পেছনে তাঁদের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিলো তাঁরা সমাজের নিম্নতলের ক্লেদ-নোংরামি-দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত অবহেলিত শ্রেণীটির জীবনচিত্র সমাজের ভাগ্যবান শ্রেণীর সামনে তুলে ধরে সমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদের সজ্ঞান করতে চেয়েছেন। তাঁরা মনে করেন এ-ভাবে ওই দুর্দশাগ্রস্থ শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে। তাই উপন্যাস তাঁদের কাছে গণ্য

---

১৩৪. Maupassant. Guy de, Ibid, pp. 249 - 250.

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে এক সামাজিক অনুসন্ধান হিসেবে, যেখানে সমাজের প্রকৃত বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়। তাঁদের মতে বাস্তবতাবাদী উপন্যাস হচ্ছে সমাজবাস্তবতার দলিল, সমকালের নৈতিক ইতিহাস, এবং এ-ভাবেই একজন বাস্তবতাবাদী লেখকের পক্ষে তাঁর নীতির প্রতি সৎ থাকা সম্ভব। তাঁরা যে-প্রশ্ন দ্বারা তাড়িত হয়েছেন তা ব্যক্ত হয়েছে গঁকুরভ্রাতাদের বক্তব্যে :

> আমরা নিজেদের প্রশ্ন করেছি যাদের নিম্নশ্রেণী বলা হয় তাদের কি উপন্যাসে স্থানলাভের অধিকার নেই? সমাজের নিম্নতলের এই 'জনসাধারণ' কি সাহিত্যিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই থাকবে? লেখকেরা এ-পর্যন্ত যাদের সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, তারা কি কেবলই ভোগ করবে লেখকদের তিরস্কার? আমরা আমাদের প্রশ্ন করেছি, এই সাম্যের যুগে এমন অবহেলিত শ্রেণী কি থাকা উচিত, এমন নোংরামো-দুঃখ-দুর্দশা, ঘৃণ্য দণ্ড ও বিপর্যয় কি থাকা উচিত যা লিপিবদ্ধ হওয়ারও অযোগ্য? .... আজ যখন উপন্যাস সম্প্রসারিত ও বিকশিত হচ্ছে, যখন তা হয়ে উঠছে মহৎ, গুরুত্বপূর্ণ, শকাতর সাহিত্য আত্মিক ও সামাজিক অনুসন্ধান যখন উপন্যাসতার বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে হয়ে উঠছে সমকালীন নৈতিক ইতিহাস, আজ যখন উপন্যাস পরিগ্রহ করছে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও দায়িত্ব, তখন তা দাবী করতে পারে বিজ্ঞানের স্বাধীনতা ও অকপটতা। উপন্যাসের লক্ষ্য হোক শিল্পকলা ও সত্য। উপন্যাস ভাগ্যবান প্যারিসবাসীদের সামনে উন্মোচিত করুক সেই দুঃখকষ্ট, যা তাদের ভুলে থাকতে দেয়া উচিত নয়। ...... গত শতাব্দী যাকে 'মানবতা' নামে অভিহিত করেছে, আজ তা-ই হয়ে উঠুক উপন্যাসের ধর্ম।[১৩৫]

আন্দোলনকারী বাস্তবতাবাদী উপন্যাসিকেরা বাস্তবতার নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনার পক্ষপাতী। শঁফ্লুরি উপন্যাসে নিম্নশ্রেণীর জীবনচিত্রনকেই লেখকের বাস্তবতানিষ্ঠার পরিচায়ক বলে মনে করেন। তাঁর মতে

---

১৩৫. Goucourt, Edmond and Jules de, 'On True Novels' in Becker (ed.,) pp. 118 - 119.

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিক নৈর্ব্যক্তিকভাবে বাস্তবতার উপস্থাপনা করবেন। তিনি বলেন, 'লেখককে তাঁর বই থেকে যথাসম্ভব তাড়িয়ে দিতে হবে।'[১৩৬] বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিক হবেন নিরপেক্ষ। সুন্দ-কদর্যের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি যেমন পক্ষপাতশূন্য হবেন, সৌন্দর্যের বর্ণনার সময়ও তেমনি থাকবেন নিরাবেগ। তিনি কখনো আবেগ-উচ্ছ্বসিত হবেন না, কোনো প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্যও করবেন না, তিনি শুধু সবকিছুর বিশদ বর্ণনা দেবেন এবং সব কিছুকে দেবেন সমান মূল্য। আন্দোলনকারী বাস্তবতাবাদীরা মনে করেন এ-ভাবেই বাস্তবতার যথাযথ উপস্থাপনা সম্ভব। মাদামোয়াজেল Leroyer de chandepie কে লেখা চিঠিতে (মার্চ ১৮,১৮৫৭) ফ্লবেয়ার বলেন, ' The artist ought to be in his work like God in creation, invisible and omnipotent.He should be felt every where but not be seen.'[১৩৭] বিভিন্ন প্রকৃতিবিজ্ঞান যেমন নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে বস্তুরাশিকে দেখেন, নিরপেক্ষভাবে তাদের বৈশিষ্ট লিপিবদ্ধ করেন, বাস্তবতাবাদীও সে-ভাবেই কাজ করেন। বাস্তবতাবাদী উপন্যাস তাই গণ্য হয় শুধুমাত্র বাস্তবতার নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা হিসেবে। ফ্লবেয়ার আরো বলেন, দর্পণে যেমন সবকিছু অবিকল প্রতিফলিত হয়, বাস্তবতাবাদী তেমনি অবিকলভাবে বাস্তবতার উপস্থাপনা করবেন। সত্য ও বাস্তবতাকে যিনি যতোবেশি নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখতে সমর্থ হবেন, তিনিই ততোবেশি শক্তিমানরূপে গণ্য হবেন। তিনি ঔপন্যাসিককে গণ্য করেন বাহ্যবাস্তবতার বিবর্ধকদর্পনরূপে। Louise Colet কে লেখা চিঠিতে (নভেম্বর ৮,১৮৫৩) তিনি বলেন, Let us always bear in mind that impersonality is a sign of strength. Let us absorb the objective; let is circulate in us, until it is externalized in such a way that no one can understand this marvelous chemistry. Our hearts should serve only to understand the hearts of others. Let us be magnifying mirrors of external truth. '[১৩৮] বাস্তবতার উপস্থাপনাই একজন বাস্তবতাবাদী লেখকের লক্ষ্য থাকে, ব্যতিক্রম, উদ্ভট বা অসম্ভবের বর্ণনা করা তাঁর লক্ষ্য নয়। তাই একজন বাস্তবতাবাদী লেখক তাঁর রচনা থেকে যেমন নিজেকে সরিয়ে রাখেন, নিজস্ব মতামত জ্ঞাপন বা পক্ষপাত প্রদর্শন থেকে বিরত থাকেন, তেমনি উদ্ভট বা ব্যতিক্রমী বিষয়বস্তুও তিনি সযতনে

---

১৩৭. Flaubert. Gustave, ' On Realism' , P. 94.

১৩৮. Ibid, pp. 93 - 94.

Dhaka University Institutional Repository

পরিহার করেন। এ-দুইই কোনো রচনার বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার প্রধান শর্ত।

ফ্লবেয়ার মনে করেন ঔপন্যাসিক কোনো ব্যাপারেই নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করবেন না। George Sand কে লেখা চিঠিতে (ডিসেম্বর ৫-৬, ১৮৬৬) এ-প্রসঙ্গে ফ্লবেয়ার বলেন, 'I believe, even, that a novelist does not have the right to express his opinion on anything whatsoever,'[১৩৯] Louies colet লেখা চিঠিতে (ফেব্রুয়ারী ১, ১৮৫২) ফ্লবেয়ার "মাদাম বোভারি" উপন্যাসে তাঁর সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠার প্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন এ-ভাবে: 'এ-বইতে কোনো গীতিময়তা নেই, কোনো মন্তব্য নেই, এখানে লেখকের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এটি পাঠ করা কঠিন হবে। এতে থাকবে দুর্দশা ও নোংরামোর মতো মাত্রাত্মক জিনিস।'[১৪০] তাঁরমতে বাস্তবতাবাদী লেখক জীবনের যা-কিছু দেখে থাকেন- নীচতা, দুর্দশা, ভণ্ডামি, নির্বুদ্ধিতা, একঘেয়েমি, ক্লান্তি কিংবা মধুর মুহূর্ত- তার কোনোকিছু সম্পর্কেই তিনি প্রশ্ন তুলবেন না। তিনি যেমন তাঁর নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করবেন না, নৈতিকতার প্রশ্ন তুলবেন না, তেমনি সান্ত্বনার বাণীও উচ্চারণ করবেন না। যা সত্য শুধু তা-ই বিবৃত করা একজন বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করার কোনো অধিকার তাঁর নেই বলেই তিনি মনে করেন। তাই Rougon Macquart গ্রন্থমালার ভূমিকায় জোলা যে লক্ষ্য ও পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন তা পাঠ করে ফ্লবেয়ার বেশ আহত হন। কারণ একজন বাস্তবতাবাদী হিসেবে তিনি মেনে নিতে পারেন নি যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যদ্বারা পরিচালিত হয়ে বাস্তবতার যথাযথ ও নিরপেক্ষ উপস্থাপন সম্ভব। তিনি জোলাকে লেখেন (ডিসেম্বর ১, ১৮৭১), 'আমি এইমাত্র আপনার ভয়াবহ ও সুন্দর বইটিকে (La Fortune des Rougon) শেষ করেছি। এটি এতো শক্তিশালী! অতি শক্তিশালী! তবে আমি আপনার মুখবন্ধটিকে মেনে নিতে পারি না। আমার মনে হয় এটি আপনার বইকে নষ্ট করেছে। ...... এতে আপনি আপনার মতামত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু

---

১৩৯. Ibid, P. 95.

১৪০. Ibid, P. 91.

Dhaka University Institutional Repository

আমার সাহিত্য তত্ত্বানুসারে উপন্যাসিকের এমন করার কোনো অধিকার নেই। আমার আপত্তি এখানেই।'[১৪১] ফ্লবেয়ার মনে করেন বাস্তবতাবাদী উপন্যাসিক হবেন সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, তাঁর সৃষ্ট পাত্রপাত্রী সম্পর্কে তিনি কোনো মতামত দেবেন না। উপন্যাসিকের সে অধিকার নেই।[১৪২] দুরাঁতি বাস্তবতাবাদী রচনা-রীতি সম্পর্কে বলেন যে বাস্তবতাবাদী লেখক ব্যালজাকের পর্যবেক্ষণ রীতি আর চিত্রকরের বাহ্যবাস্তবতার প্রতিলিপিকরণ রীতির অনুসরণ করবেন।[১৪৩] শঁফ্লুরিও গুরুত্ব দিয়েছেন ' accuracy of description '-এর ওপর।[১৪৪] ফ্লবেয়ার মনে করেন প্রতিটি বিষয়ের- তা যতোই তুচ্ছ ও বিরক্তিকরই হোকনা কেনো অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়াই বাস্তবতাবাদী লেখকের দায়িত্ব। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াবে না।[১৪৫] গঁকুরভ্রাতারাও মনে করেন শুধুমাত্র ব্যাপক ও গভীর পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই বাস্তবতাকে অধিগত করা সম্ভব, অধিগত করা সম্ভব রসাতলের বাসিন্দাদের বর্বর জীবনধারা ও প্রতিবেশের অতি ভয়াবহ বাস্তবতা। এঁদমঁদ গঁকুর বলেন,

> These men and women, and even the milieu in which they live, can be captured only through on immense storing up of observation, by innumerable notes taken through a lorgnette, by the amassing of a collection of human documents, like those heaps of pocket sketches which, assembled at at painter's death, represent his lifetime of work. For let me say it aloud, human documents alone make good books: books in which there are real human beings on two legs'[১৪৬]

~~১৪১. Ibid, P. 96.~~

১৪২. Ibid, P. 96.

১৪৩. Duranty. Edmond, and Sainte-Bauve, charles Augustin, Ibid, P.97.

১৪৪. Wellek, Rene, Ibid, P. 2.

১৪৫. Flaubert. Gustave, Ibid. P. 91.

১৪৬. Goncourt. Edmond de, ' Levels on Realism". pp. 245 - 246.

Dhaka University Institutional Repository

তবে এই বাস্তবতাবাদীদের মধ্যে বেশ স্ববিরোধ লক্ষ করা যায়। ফ্লবেয়ার যদিও বলেন যে শুধু বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনাই বাস্তবতাবাদীদের লক্ষ হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি নিজেকে শুধু বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনাতেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। একপর্যায়ে বাস্তবতা তাঁর কাছে গণ্য হয়েছে বিশুদ্ধ নান্দনিকতায় পৌঁছবার 'স্প্রিংবোর্ড' রূপে। এ-পর্যায়ে তিনি মনে করেন বাস্তবতা কোনো শিল্প সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান রূপে গৃহীত হবে আর লেখকের লক্ষ্য হবে বিশুদ্ধ শিল্প সৃষ্টি নভেম্বর ৮,১৮৭৭-এ তুর্গেনিভকে লেখা চিঠিতে ফ্লবেয়ারের এ-অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতা হচ্ছে শুধু একটি Spring Board মাত্র।[১৪৭] ফ্লবেয়ার বাস্তবতা ও কল্পনার সংশ্লেষ সাধনই শিল্পীর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন। তাই বাস্তবতা তাঁর কাছে শুধুমাত্র একটি যাত্রাবিন্দু বা Spring board রূপে গণ্য হয়েছে। অন্য একটি চিঠিতে তিনি আঁকাড়া বাস্তবতাকে গুরুত্বহীন একটি বিষয় বলে উল্লেখ করেন। উপন্যাসে এই গুরুত্বহীন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন তাঁকে ক্ষুব্ধ করে। তিনি বলেন, ' Don't you think that this unworthy reality, whose reproduction disgusts you, doesn't turn my stomach also? If you knew me better, you would know that I execreat ordinary life,'[১৪৮] তবে ফ্লবেয়ার বাস্তবতার এই যাত্রাবিন্দু বা spring board টি দরকারী বলে মনে করেন। বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষপাতী তিনি নন, তবে বাস্তবতার পরিশোধন তাঁর লক্ষ্য। তিনি বলেন, ' exterior reality must enter into us, must make us almost cry out, if we are to reproduce it well.'[১৪৯]

---

১৪৭. Flaubert. Gustave, Ibid, P. 96

১৪৮. উদ্ধৃত, Grant. Damian, Ibid, P. 59.

১৪৯. উদ্ধৃত, Ibid, P. 59.

Dhaka University Institutional Repository

ফ্লবেয়ারের মতে বাস্তব পৃথিবীতে থাকতে পারে বহু আবর্জনাতুল্য ব্যাপার, ঘটতে পারে হাস্যকর তুচ্ছ সব ঘটনা। এইসব ব্যাপার বা ঘটনা হুবহু তুলে ধরার মধ্য দিয়ে-শুধু নকল করার প্রতিভা প্রমাণ করা যায়, শিল্পসৃষ্টির প্রতিভা নয়। বাস্তবতার পরিমার্জনা ও নতুনরূপে সৃষ্টি করা হলেই তা শিল্প হয়ে ওঠে, হুবহু তুলে ধরা শিল্প হতে পারে না। J. K. Huysmans কে লেখা চিঠিতে (ফেব্রুয়ারী মার্চ ১৮৭৯) ফ্লবেয়ার বলেন, ' Art is not reality whatever else you do, you must choose from the elements which the latter furnishes', ১৫০ ফ্লবেয়ারের এমত বাস্তবতাবাদীর নয়, কলাকৈবল্যবাদীর।

---

১৫০. Flaubert. Gustave, Ibid, P. 96.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃতবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ

৩.১ প্রকৃতবাদের উদ্ভব-বিকাশ

বাস্তবতাবাদেরই একটি বিশেষ তাত্ত্বিক রূপ হচ্ছে হচ্ছে প্রকৃতবাদ (Naturalism)।[১] প্রকৃতবাদকে কখনো গণ্য করা হয়েছে বাস্তবতাবাদের শাখারূপে, কখনো গণ্য করা হয়েছে একটি পৃথক ও ভিন্ন ধারা রূপে। বাস্তবতাবাদের কিছুকাল পরে প্রকৃতবাদ সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান ধারা হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে ১৮৬০-এ ধারার শুরু, সত্তর দশকে একটি প্রাধান্য বিস্তার করে চলে, আর ১৮৮০ তে এটি প্রতীকবাদীদের তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়।[২] প্রকৃতবাদের উদ্ভবের পর থেকে একে নির্দেশ করার জন্যে ' Naturalism '-এর পাশাপাশি ' Realism ' পরিভাষাটিও নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে, দুটিকে

---

১. ' Naturalism '-এর সুস্পষ্ট পরিভাষা হতে পারে 'প্রকৃতবাদ'। বাঙলায় বহু নামে একে ডাকা হয়েছে, কিন্তু আত্মবিশ্লেষণাত্মক কোনো পরিভাষা লাভে সমর্থ হয়নি এ-শব্দটি। বুদ্ধদেব বসু Naturalism -এর পরিভাষা করেছেন 'প্রকৃতিপন্থা', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যবহার করেন 'স্বভাবোক্তি' শব্দটি ' সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একে চিহ্নিত করেছেন 'যথাস্থিতবাদ' অভিধায় এবং ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এ-শব্দটির বাঙলা প্রতিশব্দ করেছেন 'প্রকৃতবাদ'। আমাদের মনে হয় 'প্রকৃতবাদ'ই Naturalism -এর যথার্থ প্রতিশব্দ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে Naturalism নামটি গৃহীত হয় বিজ্ঞান থেকে। বিভিন্ন প্রকৃতিবিজ্ঞান যেমন প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে থাকে, এই ধারার সাহিত্যিকদেরও লক্ষ্য প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ। তাঁরা নিজেদের প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের পর্যবেক্ষক ও নিরীক্ষক বলে দাবি করেন। তাই Naturalism -এর গ্রহণযোগ্য পরিভাষা হওয়া উচিত প্রকৃতবাদ।

২. Stromberg, Roland N. (ed.,) Realism, Naturalism and symbolism (Macmillan, London, Melbourne, 1968), P. XIX.

Dhaka University Institutional Repository

একই ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়েছে। Naturalism শব্দটি একটি প্রাচীন দার্শনিক পরিভাষা, যা নির্দেশ করে Materialism, Epicureanism বা যে-কোনো ধরনের ইহজাগতিকতাবাদ। এ-শব্দটি সাহিত্যে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন হাইনে। ১৮৩১ সালে হাইনে নিজেকে দাবি করেন 'পরা-প্রাকৃতবাদী' (super naturalist) বলে। তবে এ-শব্দটি একটি তাত্ত্বিক ধারণাবহ হয়ে ওঠে ফ্রান্সে এমিল জোলার (১৮৪০-১৯০২) সূত্রে। জোলা Naturalism -এর নামটি গ্রহণ করেন বিজ্ঞান থেকে। বিভিন্ন প্রকৃতিবিজ্ঞান যেমন প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে থাকে, এ-ধারার জনক জোলাও তেমনি ঘোষণা করেন যে প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকও প্রাকৃতিক প্রপঞ্চরাশির পর্যবেক্ষক ও নিরীক্ষক। প্রাকৃতবাদী উপন্যাসে বর্ণিত হয় ওই পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার ফলাফল।[৩] Theres Raquin (১৮৬৮) গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় জোলা প্রাকৃতবাদী তত্ত্বের সূচনা করেন, এবং সে থেকে Naturalism ক্রমশ জোলার বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষামূলক উপন্যাসতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। তবে 'Naturalism ও 'Realism' শব্দ দুটির পার্থক্য সুস্থিতি লাভ করতে দীর্ঘ সময় লাগে। যেমন, ফের্দিনাঁ ব্রুনেতিয়ের (Ferdinand Brunetiere) তাঁর Le Roman naturaliste (১৮৮৩) গ্রন্থে ফ্লবেয়ার (Flaubert), দুদে (Daudt) জর্জ এলিয়ট (George Eliot) মপাসাঁ (Maupassant) ও জোলা (Zola) কে একই সঙ্গে আলোচনা করেন। ফ্রান্সে 'Realism' ও তার স্বতন্ত্র পরবর্তী সুর 'Naturalism' শব্দ দুটি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশের ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকদের প্রায় সকলেই 'Naturalism' কে 'Realism' বলে উল্লেখ করেছেন। এ-দুটি পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য সূক্ষ্মভাবে নির্দেশ করেন আধুনিক সমালোচকেরা, ফ্রান্সে পিয়ের মার্তি (Pierre Martino) তাঁর Le Roman realiste (১৯১৩) ও Le Naturalisme francais (১৯২৩) গ্রন্থে 'Realism' ও 'Naturalism'-এর পার্থক্য বিশদভাবে নির্দেশ

---

৩. Grant. Damian, Realism, P. 40.

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি দেখান যে জোলা প্রবর্তিত ' Naturalism ' -এর দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক এবং এর দর্শন হচ্ছে নিয়ন্ত্রনবাদী বস্তুবাদ (Deterministic Materialism); অন্যদিকে পূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদীদের (Realist) কোনো সুস্পষ্ট দার্শনিক মত ছিলো না, তাঁরা বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনায় আগ্রহী ছিলেন। তবে আধুনিক সমালোচকদের অনেকেই এ দুটি পরিভাষার পার্থক্য রক্ষা করেননি। যেমন George J. Becker, "Documents of modern Literary Realism" (1963) গ্রন্থের ভূমিকায় ' Naturalism ' বোঝাতে ' Realism ' শব্দটিই ব্যবহার করে গেছেন।[৪]

১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয় জোলার বিখ্যাত প্রবন্ধ- 'নিরীক্ষামূলক উপন্যাস' (Le Roman experimental)। এ-প্রবন্ধটি প্রাকৃতবাদীতত্ত্বের ইশতেহার রূপে গণ্য হয়ে থাকে, আর জোলার Rougon - Macquart Series নামক কুড়িটি উপন্যাস গণ্য হয়ে থাকে এ-তত্ত্বের শিল্পিত ভাষ্য-রূপে। জোলাকে প্রাকৃতবাদের জনকের মর্যাদা দেয়া হয়। তবে জোলার আগে সাহিত্যে একধরণের নিয়ন্ত্রনবাদীতত্ত্ব প্রচার করেন হিপ্পোলিত তেইন (Hippolyte Taine, (১৮২৮-১৮৯৩) যা দিয়ে প্রথম দিকে জোলাও প্রভাবিত ছিলেন। জোলা ~~তাঁর কোন উপন্যাসের~~ ১৮৮৬তে লেখা একটি চিঠিতে নিজেকে তেইনের ' humble disciple ' বলে ঘোষণা করেন।[৫] সাহিত্যে তেইনই প্রথম নিয়ন্ত্রনবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যা ভাষ্য রচনা করেন।[৬] " ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস " (১৮৬৩-৪) গ্রন্থে তিনি এই

---

৪ . Wellek, Rene. 'Realism in literary scholarship' in <u>concepts of criticism</u>, (Yale University press, New Haven, London 1963, 1964) pp. 233 - 234.

৫ . Wellek, Rene, <u>A History of Modern criticism: 1750</u> - 1950, P. 18

৬ . Becker, George J. <u>Documents of Modern Literary Realism</u> (Princeton University press, New Jersey 1963). pp. 1 - 31.

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণবাদীতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এ-বইয়ের ভূমিকায় যে-বিখ্যাত সূত্রটি তেইন তৈরি করেন তা হচ্ছে : 'সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত বা নির্ধারিত হয়ে থাকে জাতি (Race), প্রতিবেশ (Milieu) ও গতি (Momentum) দ্বারা।'[৭] তাঁর মতে, উপন্যাসের দায়িত্ব হচ্ছে বাস্তবে আমরা যা ঠিক সেরূপটিই প্রদর্শন করা; আর সমালোচনার দায়িত্ব হচ্ছে আমরা যা ছিলাম ও আছি তা প্রদর্শন করা। তেইন উপন্যাসকে একরকম উপাত্ত সংগ্রহ বলে মনে করেন।[৮] তিনি মনে করেন জীবন ও জগত নিয়ন্ত্রিত হয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, এবং বিশ্বের সবকিছু - যেমন, মানুষ, তার নৈতিক জীবন, তার সকল ক্রিয়াকর্ম, কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাঁর মতে কারণ সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয় তথ্য সংগ্রহের পর। ঘটনা বা সত্য শারীরিক কিংবা নৈতিক যা-ই হোক না কেনো, তার অবশ্যই কারণ থাকবে। অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য, সাহস কিংবা সততার পেছনে যেমন কারণ আছে, ঠিক একই রকম কারণ রয়েছে পরিপাক শক্তির পেছনে। তেমনি বিমূর্ত বিষয়ের পেছনেও বিদ্যমান থাকে কোনো না কোনো কারণ। তেইন মনে করেন পাপপুণ্য গন্ধক ও চিনির মতোই উৎপন্ন দ্রব্য।[৯] তাঁর এই তত্ত্ব ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম দিকে জোলাকে প্রভাবিত করে। তবে জোলা তাঁর 'নিরীক্ষামূলক উপন্যাস' প্রবন্ধে যে-প্রকৃতবাদীতত্ত্ব প্রস্তাব করেন, তার প্রেরণা ছিলো মূলত: চিকিৎসাবিজ্ঞানী ক্লদ বার্নার্দের (Claude Bernard) "Introduction to the study of Experimental Medicine" গ্রন্থটি। জোলা তার প্রবন্ধে নতুন ধরণের নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাসের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেন। বার্নার্দ চিকিৎসাশাস্ত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন, জোলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সে-পদ্ধতিই অনুসরণ করতে চান। জোলার কাছে ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেন চিকিৎসকের সম্পূর্ণ সমার্থক। বার্নার্দ পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে দেখান যে রসায়নবিদ্যা ও পদার্থ বিদ্যায় যে-পদ্ধতি জড়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, সে-পদ্ধতিই সমভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে, বা জীবন্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রেও। তাঁর আলোচনা এই সাধারণ

---

৭. Grant, Damian, Ibid, P. 36

৮. Wellek, Rene. A History of Modern Criticism: 1750 - 1950, P. 27.

৯. Taine, Hippolyte, 'The world of Balzac' in Beckr's (ed.,) DMLR, Ibid, P. 105.

Dhaka University Institutional Repository

সূত্র নির্দেশ করে যে জড়বস্তু ও জীবনু প্রাণী একই সূত্রের অনুর্গত। বার্নার্ড পর্যবেক্ষণাত্মক বিজ্ঞান ও নিরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানের পার্থক্যও নির্দেশ করেন। পর্যবেক্ষণাত্মক বিজ্ঞানশুধু প্রকৃতিতে কী আছে, তা পর্যবেক্ষণ করে বা উদ্ঘাটন করে; কিন্তু নিরীক্ষা হচ্ছে মূলতঃ শ্রমসাধ্য পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষাবিজ্ঞান শুধু পর্যবেক্ষণ করে না। নিরীক্ষাকারী প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো পূর্বধারণা পোষণ করেন না। পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে-সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেন, শুধু তা-ই তিনি গ্রহণ করেন। বার্নার্ডের মতে জড়বস্তুর মতো জীবনু প্রাণীদেরও নিরীক্ষা করা সম্ভব। জড়বস্তু ও জীবনু প্রাণী বা মানুষ একই রকম প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। নিয়ন্ত্রণ বলতে তিনি সেই কার্যকারণকে নির্দেশ করেন যা বিশেষ প্রপঞ্চের উদ্ভবকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর মতে নিরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞান কোনো ঘটনা কেনো ঘটে শুধু তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে না, সেটি কীভাবে ঘটে তা-ও ব্যাখ্যা করে।[১০]

বার্নার্ডের এ-তত্ত্ব দ্বারা জোলা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন এবং 'নিরীক্ষামূলক উপন্যাস' নামক প্রবন্ধটিতে রচনা করেন একটি নতুন সাহিত্য আন্দোলনের ইশতেহার। জোলা বাস্তবতা-কে দেখতে চান পূর্ববর্তীদের থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে। একটি বিশেষ তত্ত্বের আলোকে তিনি জগৎ, জীবন ও বাস্তবতাকে দেখেন। অচিরেই জোলার প্রাকৃতবাদী তত্ত্বটি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে ইউরোপ ও আমেরিকার ঔপন্যাসিকদের। ফ্রান্সে জোলাকে ঘিরে দেখা দেয় প্রাকৃতবাদী লেখকগোত্র। তবে নানা তর্কবিতর্ক ও উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে তিরিশ বছরের মতো সময় ধরে এ-আন্দোলনে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকেন জোলা। ১৮৭১ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে জোলার বিখ্যাত Rougon - Macquart series -এর কুড়িটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থগুলোতে একটি ঘৃণ্য সময়ের কুৎসিত সমাজের পরিচয় অনুপুঙ্খ উপস্থাপিত হয়। জোলা তাঁর উপন্যাসগুলোতে

---

১০. Grant, Damian, Ibid. P. 41.

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতার নতুন নতুন এলাকা ব্যাপকভাবে কর্ষণ করেন, বাস্তবতার নানা স্তরের ব্যাপক উপস্থাপনা করেন। ফলে জোলার প্রতিটি উপন্যাস নানারকম বিতর্কের সৃষ্টি করে, ইউরোপের কোনো কোনো দেশে জোলার উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হলে রক্ষণশীলদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। তবে পাঠকসমাজ এধরনের নতুন উপন্যাসের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং জোলার গ্রন্থগুলোর হাজার হাজার কপি বিক্রী হতে থাকে।[১১] জোলা-পূর্ববর্তী গঁকুর ভ্রাতারা অবশ্য দাবি করতেন যে জোলা নয়, তাঁরাই 'মানবিক দলিল-'এর (Human Document) আদি রচয়িতা। তাঁরা সমাজের নিম্নতলের বাসিন্দাদের জীবনের নগ্ন, অশোধিত চিত্র উপস্থাপিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা কোনো নতুন সাহিত্যধারা গড়ে তুলতে সমর্থ হন নি। রসাতলের (Lower Depth) জীবনবাস্তবতা তাঁদের উপজীব্য বিষয় হলেও, জোলার মতো ওই বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রনবাদী তত্ত্ব ও নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেন নি। ১৮৭১ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত জোলা হয়ে ওঠেন সর্বাধিক উচ্চারিত নাম এবং প্রাকৃতবাদ হয়ে ওঠে জোলার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। যতোই সময় যেতে থাকে জোলা বিদেশে ব্যাপকভাবে অনুকৃত হতে থাকেন, তাঁর নামে প্রচুর বই উৎসর্গ হতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতবাদ যতোটা প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়, জোলাও ততোটা তিরস্কৃত হন, আর জোলা যতোটা প্রশংসিত ও গৃহীত হন, প্রাকৃতবাদও ততোটাই গৃহীত হয়। কেননা প্রাকৃতবাদ ও জোলা তখন অভিন্ন।[১২] তেইন প্রাকৃতবাদী ধারার আদি তাত্ত্বিক, জোলা তাত্ত্বিক, স্রষ্টা ও প্রাকৃতবাদের প্রধান পুরুষ। জোলা বলতেই তাই প্রাকৃতবাদ বোঝায় আর প্রাকৃতবাদ বলতে জোলাকে বোঝায়।

উনিশ শতক অতিক্রান্ত হবার আগেই ফ্রান্সে প্রাকৃতবাদী আন্দোলনের অভিঘাত নিঃশেষ হয়ে আসে। উনিশ শতকের শেষদশকের প্রথমভাগে ফ্রান্সে প্রাকৃতবাদ বিরোধীদের দ্বারা নানাভাবে আক্রান্ত হতে থাকে,

---

১১ . Zola Emile, 'The experiemental Novel' in Becker (ed.,) DMLR. Ibid, P. 163.

১২ . Becker, George J. (ed.,), Ibid, P. 9.

Dhaka University Institutional Repository

আক্রান্ত হন জোলা। প্রকৃতবাদ ও জোলাকে আক্রমণ করে রচিত হতে থাকে প্রবন্ধ। প্রকৃতবাদের অনুসারীদের অনেকে এ-তত্ত্বকে অর্থহীন বলে গণ্য করা শুরু করেন এবং এধারাটিকে পরিত্যাগ করে নতুন ধারায় সাহিত্য-সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। জোলা প্রতিষ্ঠিত করেন 'মেদাঁ সংঘ' (Medan Group)। জোলার অনুসারীদের অনেকে এ-সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। জোলা-পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রকৃতবাদী লেখক ও জোলার অনুসারী উইস্‌মাঁ (Huysmans ,১৮৪৮-১৯০৭) 'মেদাঁ সংঘে'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই প্রধান প্রকৃতবাদী ঔপন্যাসিক উনিশশতকের শেষভাগে হয়ে ওঠেন প্রকৃতবাদের এক প্রধান বিরোধী। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "A rebours" -এ তাঁর প্রকৃতবাদ বিমুখতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ক্রমশ তিনি 'ইম্প্রেশনিস্ট' ধারার প্রবক্তা হয়ে ওঠেন এবং এ-ধারা সম্পর্কে "L'Art Moderne" (১৮৮২) নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জীবনের প্রথম পর্যায়ে জোলার অনুসারী ও 'মেদাঁ সংঘে'র সদস্য উইসমাঁ যেমন যুক্তির সাহায্যে প্রকৃতবাদের মহিমা প্রমাণ করেছেন, জীবনের শেষ পর্যায়ে তেমনি তিনি এতত্ত্বের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা প্রতিপাদনে তৎপর হন। উইসমাঁ তাঁর প্রকৃতবাদ বিরোধিতা তাঁর La - Bas (১৮৯১) উপন্যাসের দুটি চরিত্রের তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। তিনি জোলা ও প্রকৃতবাদী ঔপন্যাসিক গোষ্ঠের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাটির নিন্দা করে বলেন যে এই লেখক গোত্র সাহিত্যে জড়বাদকে উপস্থাপিত করছেন এবং শিল্পকলার গণতন্ত্রীকরণ করে এর শিল্পগুণ ধ্বংস করেছেন। প্রকৃতবাদীরা শিল্পকে সর্বজন ভোগ্য সস্তা এক পণ্যে পরিণত করেছেনবলেও উইসমাঁ অভিযোগ করেন।[১৩] উইসমাঁ প্রকৃতবাদের সমালোচনা করে বলেন যে প্রকৃতবাদ নিজতত্ত্বের বিকৃত ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রকৃতবাদী লেখকদের বিষয় নির্বাচনে সীমাবদ্ধতাই এ-ধারার পাংশুতার প্রধান কারণ রূপে নির্দেশ করেন তিনি। তিনি বলেন, মাঝারি ধরণের

---

১৩. Huyomans J.K., ''Emile Zola and L' Assommoir', in Becker DMLR, Ibid,pP. 230 - 231.

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রদের একঘেয়ে বর্ণনা, আর এর ফাঁকে ফাঁকে ড্রইংরুম ও ভূদৃশ্যের বর্ণনা ছাড়া উপন্যাসে প্রাকৃতবাদী লেখক আর কিছুই করেন না। এভাবে প্রাকৃতবাদ হয়ে ওঠে পাংশু ও নিষ্প্রাণ। বিষয় নির্বাচনে সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের কল্পনাপ্রতিভার দারিদ্র্যও এ ধারাটিকে পাংশু করে তুলেছে। তিনি বলেন প্রাকৃতবাদীরা কল্পনাকে সম্পূর্ণ পরিহার করেন, কিন্তু উপন্যাসে তাঁরা যে 'আইডিয়া' উপস্থাপন করেন তাও অসামান্য কিছু নয়।[১৪]

১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় জোলা ও প্রাকৃতবাদকে আক্রমণ করে লেখা ইশতেহার ' The Manifesto of Five against La Terre '। ১৮৮৯ সালে Bourget ' Le Disciple' শীর্ষক রচনায় প্রাকৃতবাদের অনৈতিকতা ও প্রভাবকে আক্রমণ করেন, ১৮৯১-এ প্রকাশিত হয় Jules Huret -এর " Sur L'ivolution literaire Enquete " সাক্ষাৎকার সংকলন। প্রাকৃতবাদকে এখানে মৃত বলে প্রতিপাদন করা হয়। এসব আক্রমণে প্রাকৃতবাদ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।[১৫] ' The Manifesto of Five against La Terre '(১৮৮৭) শীর্ষক ইশতেহারটি মুদ্রিত হয় " Le Figaro " পত্রিকায়। জোলাকে আক্রমণ করে লেখা এ-ইশতেহারের নিচে নাম স্বাক্ষর করেন পাঁচজন: Paul Bonnetain, J-H Rosny, Lucien Descaves, Paul Margueritte ও Gustave Guiches। তাঁরা জোলার "La Terre" উপন্যাসটির বিরুদ্ধে অনৈতিকতার অভিযোগ তোলেন। "La Terre" উপন্যাসটি এ-সময় " Gil Blas " পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলো। ইশতেহারটি

---

১৪. Grant, Damian, Ibid, P.45.

১৫. Becker, George J. (ed.,), Ibid, P. 9.

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করেন J.H. Rosny, , অন্যেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এতে স্বাক্ষর করেন ইশতেহারে। তাঁরা নিজেদের জোলার অনুরাগীভক্ত বলে পরিচয় দেন, তবে পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, এই অনুরাগী ভক্তেরা Le Terre গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আক্রমণ স্থগিত রাখতে পারেন নি। জোলাকে তাঁরা ~~জোলাকে তাঁরা~~ অনৈতিক বলে আক্রমণ করেন, মজার ব্যাপার হচ্ছে এ-ইশতেহারে স্বাক্ষর দাতাদের দুজন, Bonnetain ও Descaves ও পরে একই অভিযোগে অভিযুক্ত হন। মূলত এ-ইশতেহারটিই প্রকৃতবাদী ধারার পতনবার্তা ঘোষণা করে। এ-ইশতেহারে জোলার উপন্যাস La Terre আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হলেও, ইশতেহার রচয়িতারা জোলার প্রায় প্রধান উপন্যাসগুলোর বিরুদ্ধেই বিষোদগার করেন, জোলাকে আক্রমণ করেন কদর্য-অশ্লীল ভাষায়। এই পাঁচজন অভিযোগ তোলেন যে জোলা দিনদিন তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। জোলা উপন্যাসে যে ব্যক্তিগত নিরীক্ষার কথা ঘোষণা করেছিলেন, ওই নিরীক্ষা করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। জোলা ব্যর্থ হয়েছেন কারন তিনি অলস। জোলাকে তাঁরা বাতিল করে দেন এ-অভিযোগে যে জোলার রচনা তুচ্ছ রঙচঙে আবর্জনার স্তূপ মাত্র। তাঁরা জোলার প্রাকৃতবাদী তত্ত্ব সম্পর্কেও অভিযোগ তোলেন। ওই তত্ত্ব তাঁদের কাছে ছেলেমানুষীপূর্ণ ও অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁদের মতে জোলার ' Natural end Social History of a Family under the second Empire' -এ আছে শুধু বংশানুক্রম বা উত্তরাধিকার সূত্রের শীর্ণ প্রকৃতি, শিশুসুলভ বংশলতিকা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে অসীম মূর্খতা। Rougon - Macquart সিরিজকে তাঁরা অশ্লীল বলে অভিযুক্ত করেন। তাঁদের মতে এতে দলিলধর্মিতার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে সীমাহীন অশ্লীলতা। তাঁরা বলেন " La Terre " উপন্যাসের সীমাহীন অশ্লীলতা কোনো মহৎপ্রতিভার আকস্মিক সাময়িক পতন নয়, বরং তা দীর্ঘকালের ধারাবাহিক পতন প্রবণতার শেষসুর।। একে তাঁরা এক কৌমার্যসম্পন্ন পুরুষের অচিকিৎস্য লাম্পট্যরূপে চিহ্নিত করেন। জোলা প্রাকৃতবাদী উপন্যাসকে বলেছিলেন, ' A corner of nature seen through a temperament ।'এ-সূত্রটি আর জোলার উপন্যাসের

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে তাঁরা ঘোষণা করেন। তাঁরা বলেন, জোলার উপন্যাস হয়ে উঠেছে A corner of Nature seen through a morbid sensory apparatus এ-ইশতেহার প্রকাশের দু'সপ্তাহ পরে ফের্দিনঁ ব্রুনেতিয়ের লেখেন ' প্রাকৃতবাদের দেউলেপনা ' নামে একটি প্রবন্ধ।[১৬] এ- প্রবন্ধে

---

১৬. The Manifesto of Five against La Terre', in Becker, (ed.,), pp. 344 - 349.

Dhaka University Institutional Repository

ব্রুনেতিয়ের অভিযোগ করেন যে জোলা ক্রমাগত সত্য, শোভনতা, পরিমিতিবোধ ও স্বাভাবিকতা থেকে দূরে সরে গেছেন। প্রকৃতবাদীতত্ত্বে ক্লান্তিবোধ করেন মার্কিন উপন্যাসিক হেনরি জেমসও। তিনি প্রকৃতবাদী উপন্যাসিক সম্পর্কে জোলার বিরোধীদের বক্তব্যেরই প্রায় পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি বলেন, তাঁরা যেভাবে জীবনকে উপস্থাপিত করেন, তাতে তাঁদের রচনা হয়ে ওঠে বিপুল, ভয়াবহ,মর্মান্তিক তথ্যস্তূপ। জীবনের পাঁচালী এখানে আছে খুব বেশি পরিমাণে, শৈল্পিক সৌন্দর্য অতি সামান্য।[১৭]

১৮৯১ সালে ফ্রান্সে প্রকৃতবাদের পতনের সত্যতা যাচাই করার জন্য সাংবাদিক জুলে হুরে (Jules Huret) এক সাক্ষাৎকার-জরিপ চালান। তিনি ধরে নেন প্রকৃতবাদ নিঃশেষিত হয়েছে। হুরে প্রধান লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ওই সময়ের সাহিত্যিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত জানতে চান। এ-সাক্ষাৎকার ১৮৯১-এর ৩রা মার্চ থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত ফ্রান্সের " L'Echo de Paris "পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরে " Enquiete sur L8 evolution literaire"(১৮৯১) নামে মুদ্রিত হয়। ওই সময়ে ধারণা করা হতো নবোদ্ভূত (প্রতীকী) ধারাটিই প্রকৃতবাদী ধারার স্থান দখল করবে। হুরে সাক্ষাৎকার শুরু করেন এই তথাকথিত প্রতীকী ধারার লেখকদের দিয়ে। এ-ধারার অন্যতম আনাতোল ফ্রাঁসের কাছে প্রকৃতবাদ অসুস্থ কিনা জানতে চান। ফ্রাঁস উত্তরে বলেন যে তাঁর জানামতে প্রকৃতবাদ মৃত। হুরে প্রকৃতবাদের জনক জোলাকেও প্রকৃতবাদের অন্তিমদশা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জোলা এধরণের প্রশ্নকে দৃঢ়তার সঙ্গে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেন নি। জোলাকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিনয়ের সঙ্গে বলেন-'হয়তো'। এদমঁ গঁকুর বলেন, উনিশ শতকের এই শেষপাদে প্রকৃতবাদ মৃত না হলেও, এর প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকৃতবাদ হয়ে উঠবে নিঃশেষিত ও মৃত একটি ধারা। কেউকেউ প্রকৃতবাদী ধারার অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। যেমন, হেনরি কেয়ার্দ (Henry Céard) বলেন প্রকৃতবাদের মৃত্যুই হতে পারে না, কারন এর অস্তিত্বই কখনো ছিলো না। মপাসাঁ সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হন নি। হুরের সাক্ষাৎ-

---

১৭ . James, Henry. The Art of the Novel, pp. 259, 122.

Dhaka University Institutional Repository

কারের মূলবক্তব্য ছিলো যে প্রাকৃতবাদ নিঃশেষিত হয়ে গেছে এবং এ-সাক্ষাৎকারগুলো বেশ আলোড়ন তোলে তবে প্রাকৃতবাদী ধারার লেখকেরা এ-ব্যাপারটির নীরব দর্শক ছিলেন না। এ-সাক্ষাৎকার জরিপটি তাঁদের ক্ষুব্ধ করে এবং তাঁরা অভিযোগ করেন যে এতে প্রাকৃতবাদের মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ অতিশায়িত করে দেখানো হচ্ছে। হুরের এই সাক্ষাৎকারমালা উদ্বিগ্ন করে তোলে মেদাঁ সংঘের সদস্য ও জোলার বিশ্বস্ত অনুসারী পল আলেক্সিকে (Paul Alexis)। প্রাকৃতবাদী ধারার উল্লেখযোগ্য এই ঔপন্যাসিক তাঁর Madame Meuriet (১৮৯১) উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। সাক্ষাৎকার মালা প্রকাশকালে তিনি দূরে ছিলেন, তিনি এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠান যে 'প্রাকৃতবাদের মৃত্যু হয় নি, চিঠি আসছে।'[১৮] ১৮৯১-এর ৪ঠা এপ্রিলে লেখা চিঠিতে আলেক্সি দাবি করেন যে প্রাকৃতবাদ দেখা ও চিন্তা করার একটি পদ্ধতি, এটি লেখার কোনো পদ্ধতি নয়, দেখা ও চিন্তা করার এ-পদ্ধতি মানুষের চিন্তা প্রণালীর স্থায়ী অঙ্গ, সুতরাং এর মৃত্যু হতে পারে না। প্রাকৃতবাদী তত্ত্বের মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাকৃতবাদ মরে নি। শতাব্দীর শেষপ্রান্তে যখন বহু জিনিস বৃদ্ধ ও বাতিল হয়ে গেছে, বয়ো-ভারে ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে, তখনও প্রাকৃতবাদ অত্যন্ত তরুন, সজীব ও প্রাণ চঞ্চল। তিনি বলেন, যদি মনে করা হয় যে প্রাকৃতবাদ মানে হচ্ছে ঠান্ডাভাবে অশ্লীল শব্দ লেখা, তাহলে তা খুবই ভুল। তাঁর মতে, প্রাকৃতবাদ ঠান্ডাভাবে অশ্লীল শব্দ লেখা নয়, এটি অত্যন্ত গভীর ও মহৎ একটি তত্ত্ব। এধারার ব্যাপকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি। তাই সব ধরণের রচনাই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তিনি মনে করেন এ-কারণেই প্রাকৃতবাদী ধারায় স্যাঁদালের দলিল রচনা-রীতি কিংবা দুরাতিঁর শুষ্কতা যতোটা স্থান পায়, ততোটাই স্থান পায় ————

---

১৮. Alexis.Paul, 'Naturalism is not Dead', in Becker's (ed.,) ~~Ibid~~, P. 407.

Dhaka University Institutional Repository

ফ্লবেয়ারের নিখুঁত ও সংহত গীতিময়তা, গঁকুরদের পূজনীয় পেশলতা, জোলার বিশালত্ব এবং দদের নরম-কোমল অনুর্দৃষ্টি।[১৯] প্রাকৃতবাদের পক্ষে পল আলেক্সিস এই ওকালতি সত্ত্বেও প্রাকৃতবাদ এ-সময় প্রকৃতই নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলো। উনিশ শতকের নব্বই-এর দশকে প্রাকৃতবাদ গণ্য হতে থাকে প্রায় বিগত ব্যাপার-রূপে। বিরোধীদের নানা আক্রমণে যেমন প্রাকৃতবাদী ধারাটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, সেইসঙ্গে কয়েকজন প্রধান লেখকের মৃত্যু ও জোলার মানসিক বিপর্যয় প্রাকৃতবাদের অবস্থা আরো সঙ্গীন করে তোলে। ১৮৯৩ কেই মোটের ওপর প্রাকৃতবাদের পতনকাল রূপে ধরা হয়। এ-বছর তেইন ও মপাসাঁ মৃত্যুবরণ করেন, জোলার " Rougon-Macquart " উপন্যাস সিরিজ সমাপ্ত হয়, জোলার চরম শত্রু ব্রুনেতিয়ের জোলাকে পরাভূত করে ফরাসি একাডেমির সদস্য হন। এ পরাজয় জোলাকে বিপর্যস্ত করে। পরের বছরগুলোতে জোলা দ্রেইফুস মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং সাহিত্যিক আবহাওয়া বদলে যায়। এ-সময় প্রধান হয়ে ওঠেন প্রতীকবাদীরা এবং প্রাকৃতবাদী লেখকেরা অনুরালবর্তী হয়ে ওঠেন। ১৯০৩-এ জোলার মৃত্যুর পর ফ্রান্সের সাহিত্যিক পরিমন্ডলের মানুষেরা জোলা সম্পর্কে এমন নীরবতা পালন করেন যে ওই নীরবতাকে নীরব ষড়যন্ত্র বলা যায়।[২০] পরবর্তী পরাবাস্তবতাবাদীরা এ-সময় প্রাকৃতবাদের নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। প্রাকৃতবাদী রচনাকে তাঁরা 'তথ্যের ভয়াবহ অনুঃসারশূণ্যতা' বলে উপহাস করেন। তাঁরা বাস্তবতা বিষয়ক ধারণাটিরই পুনর্বিন্যাস করেন। রেনে ওয়ালেকের মতে এই পুনর্বিন্যাস যখন সম্পূর্ণ হয় তখন উনিশ শতকে বাস্তবতার গৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে যায়।[২১] পরাবাস্তবতাবাদীরা প্রাকৃতবাদী পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। তাঁরা বলেন এ-পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুকে এতো নীরস ও বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয় যে এতে কোনো মূল্যবোধ ও অর্থ খুঁজে পাওয়া

---

১৯ . উদ্ধৃত, Ibid, pp. 408.

২০ . Becker. George J., (ed.,) Ibid, pp. 9 - 10

২১ . Wellek. René, 'Realism in Literary scholarship' in concepts of criticism p. ২৩০

Dhaka University Institutional Repository

যায় না। তাঁদের মতে অতীতে এ-পদ্ধতি যতোই গুরুত্ব পাক না কেনো বর্তমানে এর গুরুত্ব নিঃশেষিত। এ-সব সত্ত্বেও ফ্রান্সের সাহিত্যজগত থেকে প্রাকৃতবাদের প্রভাব একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের " Populist Novel " আন্দোলনের প্রবক্তারা প্রাকৃতবাদ থেকেই তাঁদের জীবনী-শক্তি আহরণ করেন।[২২]

জার্মানীতে প্রাকৃতবাদী আন্দোলন সাড়ম্বরে শুরু হয় নি। এ-অঞ্চলে প্রাকৃতবাদ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে দুটি সংবাদপত্র। মিউনিখ থেকে ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হতে থাকে এম,জি, কনরাড সম্পাদিত " Die Gesellschaft" পত্রিকাটি। কনরাড তাঁর সাময়িক পত্রে জোলার পক্ষ গ্রহণ করে জার্মান পাঠকদের সামনে এই নতুন সাহিত্য ধারার পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি এই নতুন সাহিত্যধারার প্রতি পাঠকদের উৎসাহিত করে তুলতে সচেষ্ট হন। কনরাড তাঁর সাময়িকপত্রের প্রথম খন্ডে জোলার নৈতিকতা ও প্রাকৃতবাদের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকগুলো আলোচনা প্রকাশ করেন। এ-সব আলোচনার শিরোণাম ছিলো এরকম-'জোলাবাদ', 'জোলা কি অনৈতিক?' ইত্যাদি। ১৮৮০ থেকেই বার্লিনে প্রকাশিত হতে থাকে " Freie Guhne " (পরে এর নাম হয় " Neue Rundschau ") নামে আরেকটি পত্রিকা। এটিও জোলার প্রাকৃতবাদ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাকৃতবাদ বিষয়ক নানা রচনা নিয়ে জার্মানীতে তাত্ত্বিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জার্মান উপন্যাসে প্রাকৃতবাদী ধারা বিকশিত না হলেও এ-ধারার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নাটকে। জার্মান নাট্যশালা প্রাকৃতবাদ বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জার্মানীপ্রবাসী নরওয়েজীয় নাট্যকার ইবসেনের নাটক Ghosts (১৮৭৭) বার্লিনে অভিনীত হয় ১৮৮৯-এর ২৯ সেপ্টেম্বর,

---

২২. Lemonnier. Leon, 'A Literary Manifesto: The populist Novel' in Becker (ed.,) Ibid, pp. 466 - 467.

Dhaka University Institutional Repository

একই বছরের ২০-এ অক্টোবর বার্লিনে অভিনীত হয় হপ্টমানের (Hauptmann) " সূর্যোদয়ের আগে " । জার্মানীতে এ-নাটকটি অবলম্বন করেই প্রাকৃতবাদের উন্মেষ ঘটে, যদিও পরে হপ্টমান প্রাকৃতবাদী ধারার অনুসারী থাকেন নি । জার্মানীতে প্রাকৃতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিরামহীন পরিশ্রম করেন হেনরিশ হার্ট (১৮৫৫-১৯০৬) ও জুলিউস হার্ট (১৮৫৯-১৯৩০)। হার্ট ভ্রাতারা নিষ্ফল-নিরর্থক প্রথানুগত্য থেকে জার্মান সাহিত্যকে মুক্ত করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, এবং জার্মান সাহিত্যকে সংস্কৃতিহীন, গোঁড়া, প্রথানুগত সমালোচকদের কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন । জার্মানীতে প্রাকৃতবাদের প্রসারের জন্য তাঁরা কাজ করেন নানা ভাবে । প্রাকৃতবাদীতত্ত্ব ও জোলাকে নিয়ে লেখেন বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ প্রবন্ধ, প্রকাশ করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যেগুলো প্রাকৃতবাদের মুখপত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । বিভিন্ন সংকলনগ্রন্থও তাঁরা প্রকাশ করেন । হার্ট ভ্রাতারা প্রাকৃতবাদকে পছন্দ করেন কারন এই ধারার রচনায় জীবনের বিশুদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাঁরা জোলার অন্ধঅনুরক্ত ছিলেন না । তাঁদের কাছে তাত্ত্বিক জোলার চেয়ে ঔপন্যাসিক জোলা অনেক বেশি মহৎ । জোলার জড়বাদী নিয়ন্ত্রনবাদকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাঁদের মতে এ-তত্ত্বের মধ্য দিয়ে জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখা সম্ভব নয় । এতে জীবন ও মানবপ্রকৃতির একটি বিশেষরূপই শুধু ধরা পড়ে । এ-কারণে তাঁরা জোলার এ-দৃষ্টিভঙ্গীকে স্থূল ও সংকীর্ণ বলে প্রত্যাখ্যান করেন । স্পেনে যেমন বাজান নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ধরণের প্রাকৃতবাদের কথা বলেন, হার্টভ্রাতারাও তেমনি নিজস্ব ধরণের জার্মান প্রাকৃতবাদের কথা বলেন ।[২৩]

হার্টভ্রাতারা ' For and Against Zola ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, প্রবন্ধটি ১৮৮২তে তাঁদের সম্পাদিত "Kritische Waffengange " পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

---

২৩ . Becker, George J. (ed.,), Ibid, pp. 12 - 14.

Dhaka University Institutional Repository

হার্টভ্রাতারা এ-প্রবন্ধে জোলার উপন্যাসে সমাজের নিম্নতলের জীবন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনকে প্রশংসনীয় বলে অভিনন্দন জানান, কিন্তু জোলার তত্ত্বের মধ্যদিয়ে জীবন দেখার প্রবণতাটির সমালোচনা করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত এই মহৎ ঔপন্যাসিকের পক্ষাবলম্বন করেন তাঁরা, তাঁরা বলেন, 'জোলার চরিত্রগুলো শুচিবায়ুগ্রস্থ সমালোচকদের আতঙ্কিত করে তুলেছে এ-কারণে যে জোলা ওই রসাতলের পশুমানুষদের অমার্জিত আদিম রূপই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি চমৎকার বাক্যস্নান করিয়ে সুগন্ধি অডিকোলন মাখিয়ে তাদের দেহকে সভ্য সুন্দর পোশাকে ঢেকে দেন নি, এবং তাদের মার্জিত, শোভন রূপে রুচিশীল পাঠকের সামনেও তুলে ধরেন নি। তারবদলে তারা বাস্তবে ঠিক যেভঙ্গী ও শব্দসহযোগে কথা বলে, সেভাবেই জোলা তাদের কথা বলতে দেন। জীবনের এই বাস্তব নগ্নরূপই সুরুচি সম্পন্ন সমালোচক ও শোভন সমাজের বাসিন্দা পাঠকশ্রেণীর সুরুচিকে আঘাত করেছে। তাঁরা প্রশ্ন করেন যে একজন লেখক কি শুধু প্রথাগত সমাজের সুরুচির মুখচেয়ে লিখে যাবেন? তিনি কি সামাজিক ব্যক্তি হিশেবে সামাজিক বিধিমতো শুধুই মনোরঞ্জনকারীর ভূমিকা পালন করবেন, তিনি কি শুধুই কুসংস্কার, আপাতশোভনতা ও প্রথাগত মিথ্যায় আবদ্ধ থাকবেন? নাকি তিনি নিজেকে উপস্থাপিত করবেন ভণ্ডামী, নির্বুদ্ধিতা ও কুসংস্কারমুক্ত প্রতিভারূপে?'[২৪] হার্টভ্রাতারা সামাজিক সুরুচির প্রতি অনুগত থেকে শোভন, সীমিত বিষয়বস্তু গ্রহণ করার পক্ষপাতী নন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে-কোনো বিষয়বস্তু, তা আপাতদৃষ্টিতে যতোই অশোভন বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ হোক না কেনো, অকাব্যিক নয়। সবই সাহিত্যের উপাদানরূপে গৃহীত হতে পারে। প্রাকৃতবাদী উপন্যাসের যে-কোনো বিষয় উপাদান গ্রহণের প্রবণতাটিই তাঁদের এ-ধারার প্রতি আকৃষ্ট করে। তবে তাঁদের মতে ঔপন্যাসিক জোলা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আর তাত্ত্বিক জোলা মেঘাচ্ছন্ন নক্ষত্র। তাঁরা মনে করেন যে ফ্রান্সে উগো, দুমা প্রমুখের অতিকথন ও মিথ্যার প্রতিক্রিয়া হিশেবে প্রাকৃতবাদের উত্থান ঘটে ঠিকই, তবে সে-প্রতিক্রিয়া এতো তীব্র ছিলো যে তাতে সাহিত্য আরেক নতুন ধরনের মিথ্যা ও অগভীরতায়

---

২৪. Hart, Heinrich and Julius, 'For and against Zola', in Becker's DMLR, Ibid, P. 251.

Dhaka University Institutional Repository

আক্রান্ত হয়। হার্টভ্রাতারা জোলার নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন যে জোলা ক্লদ বার্নার্দের নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু তখন চিকিৎসাশাস্ত্রকে কলাবিদ্যা থেকে বিজ্ঞানে উন্নীত করা হয়, তাই জোলা মনে করেন যে উপন্যাসকেও বিজ্ঞান হয়ে উঠতে হবে। হার্টভ্রাতারা উপন্যাসের এই বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রীতির চোখে দেখেন নি। উপন্যাস ও বিজ্ঞান-দুটো ভিন্ন বিষয় বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মতে বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে প্রকৃতির অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও প্রকৃতির শৃঙ্খলা উদ্ঘাটন করা। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে দ্বিতীয় নতুন প্রকৃতি সৃষ্টি করা। উপন্যাসের বিবর্তন যাই হোক না কেনো, উপন্যাস কখনো রোগবিদ্যার পাঠ্যগ্রন্থ হয়ে উঠবে না। উপন্যাসে থাকবে একই সঙ্গে সত্য আর কবিত্বের সংমিশ্রণ। হার্টভ্রাতাদের মতে, জোলা নিঃসন্দেহে একজন মহৎ উপন্যাসিক, কিন্তু তাঁর রচনায় সত্য ধরা পড়লেও তাতে কবিত্বের পরিমান কম'।[২৫]

ফরাশি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে ইংলন্ডে যেমন কোনো বাস্তবতাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে নি, প্রাকৃতবাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। ফ্রান্সের মতো ইংলন্ডের সাহিত্যে কোনো সুসংগঠিত প্রাকৃতবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। কয়েকজন সমালোচক ফ্রান্সের এ-সাহিত্যতত্ত্বটির সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করাতে উদ্যোগ নেন, কয়েকজন লেখক এ-তত্ত্ব তাঁদের রচনায় উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেন। তাঁরা বিশেষ সফল হন নি। তবে অনুবাদের মাধ্যমে ফরাশি প্রাকৃতবাদী রচনার সঙ্গে ব্রিটিশ পাঠকের পরিচয় ঘটে, সাহিত্যে জীবন ও বাস্তবতার এমন উপস্থাপনা তাঁদের ক্ষুব্ধ করে। যুক্তরাজ্যের সাহিত্যে ১৮৮০-র দশকটি তুমুল আলোড়নের কাল। এ-দশকের প্রথমদিকে ব্রিটিশ লেখকেরা প্রাকৃতবাদী ধারায় সাহিত্যসৃষ্টি করে আলোড়নবিক্ষোভ জাগিয়ে তোলেন। এ-দশকের প্রথমার্ধে ফরাশি প্রাকৃতবাদী উপন্যাসগুলো ইংরেজিতে অনূদিত হতে থাকে। এ-সব রচনায় জীবন ও

---

২৫ উদ্ধৃত, Ibid, pp. 253 - 258.

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতার যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা ব্রিটিশ পাঠকের শোভনতাবোধকে আহত করে। ইংলন্ডে জোলার প্রকাশক দণ্ডিত হন, ইবসেন উপেক্ষিত থাকেন। ইংরেজদের প্রাকৃতবাদ বিমুখতা অবশ্য প্রমাণ করে না যে বাস্তবতা ব্যাপারটি ইংরেজদের কাছে অসহনীয় ছিলো। তারা সরল, শান্ত প্রাত্যহিক জীবনের ও সাধারণ মানুষের সাদাসিদে জীবনবাস্তবতার গল্পকাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিলো। কিন্তু ফরাশি বাস্তবতাবাদী ও প্রাকৃতবাদী রচনায় জীবনের সরল, শোভন বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়নি। ফরাশি প্রাকৃতবাদীরা মানুষকে দেখেছেন বংশগতি ও প্রতিবেশের ক্রীড়নক রূপে এবং রিরংসা, লাম্পট্য, স্বার্থপরতাপূর্ণ ক্লেদাক্ত জীবনের পরিচয়ই তাঁরা তুলে ধরেছেন। একারণেই এসব রচনা ইংরেজদের আহত করে। জীবনের নগ্নরূপ ও অবিকৃত বাস্তবতা ইংরেজ পাঠকদের আহত করবে ভেবেই ১৮৭৮-এর আগে ইংলন্ডে কুবেয়ার সম্পর্কে কোনো আলোচনাই করা হয় নি। অথচ ওই সময় ফরাশি দেশে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের পরে দেখা দিয়েছে প্রাকৃতবাদী আন্দোলন। মধ্যবিত্তের নৈতিকতাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন ইংরেজ লেখকেরাও। পাঠকের নীতিবোধকে আঘাত করবে এমন কোনো সাহিত্যসৃষ্টিতে আগ্রহবোধ করেন নি তাঁরা। পাঠক যে শোভন, নৈতিক, সুন্দর বাস্তবতার গল্প শুনতে চায়, তেমন গল্প লিখতেই উৎসাহী ছিলেন লেখকেরা। তাই ফরাশিবাস্তবতাবাদ ও প্রাকৃতবাদকে পরিহার করে চলেন ইংলন্ডের ঔপন্যাসিকেরা। ইংলন্ডের ঔপন্যাসিকদের প্রাকৃতবাদ বিমুখতার কারণ একজন সমালোচক স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের Lippincotts Maga_ine -এ জনৈক সমালোচক এ-প্রসঙ্গে লেখেন, ' The Quarrel between the romanticists and the realists is sufficiently amusing in view of the fact that realism in the Anglo-Saxon literature of the present time is simply impossible. No Novelist dares to paint life as it realy is .'[২৬]

---

২৬ • উদ্ধৃত, Becker, George J., (ed.,) Ibid, P. 15.

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে পাঠকের সনাতন নৈতিকতাবোধে আঘাত করার মতো কোনো গ্রন্থ প্রকাশে অনীহ ছিলেন ইংরেজ-প্রকাশকেরাও। তাই ১৮৮০-র দশকে প্যারিস থেকে ফিরে জর্জমুর (১৮৫২-১৯৩৩) যখন প্রাকৃতবাদী সাহিত্য-সৃষ্টি শুরু করেন, তখন ব্রিটেনের পাঠকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মুরের উপন্যাস "A Modern Lover (১৮৮৩) ইংলন্ডে বাজারজাত করার দায়িত্ব নেন ইংলন্ডে পুস্তক বিক্রয় ও সরবরাহের ক্ষেত্রে অসীম প্রভাবশালী মুডিস সিলেক্ট লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মুডি। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত মুরের উপন্যাসটি বাজারজাত করতে অস্বীকার করেন, কারণ মফস্বলবাসী দুজন মহিলা ওই উপন্যাসটির অনৈতিকতার বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। ক্ষুব্ধ মুর তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "A Mummer's Wife" নিজেই প্রকাশ করেন। মুর পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা করতে পারলেও, সাহিত্যে মধ্যবিত্তের প্রথাগত নৈতিকতার রোষ ও আক্রমণ থেকে আত্ম-রক্ষা করতে পারেননি।[২৭] বেশকিছু ইংরেজ সমালোচক জোলার প্রাকৃতবাদী ধারা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। এঁদের মধ্যে এডমন্ড গসে (১৮৪৯-১৯২৮), ভেরনন লি (Violet Paget (১৮৫৬-১৯৩৫) এর ছদ্মনাম) উল্লেখযোগ্য। গসে ফরাশি প্রাকৃতবাদীতত্ত্ব ও জোলার সাফল্য-সীমাবদ্ধতা নিয়ে 'The Limits of Realism in Fiction' (১৮৯০) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি আমেরিকার Forum পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এ-প্রবন্ধে গসে নিরাসক্তভাবে প্রাকৃতবাদীতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে এর সমালোচনা করেন। প্রসঙ্গত তিনি জানান যে জীবন ও বাস্তবতা উপস্থাপনার এই রীতি বহু আগে থেকে ব্রিটিশ লেখকদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধের শেষে প্রাকৃতবাদের প্রতি তাঁর সমর্থন গোপন থাকে না। তিনি বলেন, প্রাকৃত-বাদী উপন্যাসগুলো সাহিত্যকে হাজারো রকমের নির্বুদ্ধিতা ও বাগাড়ম্বর থেকে মুক্ত করেছে। মেডোনা ধরনের নায়িকা, দেবতুল্য নায়ক, তাদের অসম্ভবপুণ্য ও ভাবালুতাপূর্ণ পাপের কোনো চিত্রই এখন আর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ-উপন্যাসিকেরা জনগণকে জ্ঞানের আপেল খাইয়েছেন এবং এখন আর জনগণ পুতুল নাচের পুতুল নিয়ে তুষ্ট থাকতে পারবে না। তবে এর পরেও যে পুরোনোপন্থীরা সুনির্মিত, অসম্ভব প্লট ফেঁদে উপন্যাস লিখতে বসবেন না এমন নয়, প্রাকৃতবাদ এসে যাবার পরেও তাঁরা থাকবেন, তবে তাঁদের কেউ আর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভাবান বলে গণ্য করবে না।[২৮] ১৮৯৩-এ ব্রিটেনের প্রকাশিত -

---

২৭. Becker. George J., (ed.,) Ibid, P. 16.

২৮. Gosse, Edmond, 'The limits of Realism', in Becker's DMLR P. 392.

Dhaka University Institutional Repository

হয় জেরনন লির ' The moral Teaching of Zola ' প্রবন্ধটি। এতে লি জোলাকে নির্দেশ করেন মহানস্রষ্টারূপে, যাঁর সৃষ্টি ত্রুটিমুক্ত নয়, কিন্তু তা-এতো বিশাল, ব্যাপক ও জটিল যে তা আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। তাই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জোলা আমাদের জন্য অপরিহার্য। লি মনে করেন জোলাকে গ্রহণ করতে হবে সামাজিক মহাপুরুষ রূপে।[২৯] ১৮৫৫তে ইংলন্ডে ফরাশি বাস্তবতাবাদী ও প্রাকৃতবাদী উপন্যাসের অনুবাদ শুরু হয়। লন্ডনের প্রকাশনা সংস্থা ভিজেটেলি অ্যান্ড কোম্পানি উপন্যাসের ইংরেজ অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। ১৮৮৫ তে তারা প্রকাশ করে জোলার L' Assommair ও "নানা", ফ্লবেয়ারের "মাদাম বোভারি" প্রকাশ করে ১৮৮৬তে, ১৮৮৭তে প্রকাশিত হয় জোলার La Terre । এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু ইংরেজপাঠকদের কাছে অত্যন্ত অরুচিকর ও অশ্লীল বলে মনে হয়। এসব রচনা তাদের মধ্যবিত্ত নৈতিকতাকে আঘাত করে। ফলে ইংলন্ডে এ-সব রচনার বিরুদ্ধে দেখা দেয় প্রবল আন্দোলন।

ফরাশি অনৈতিক সাহিত্যের ক্রমপ্রসারের কুফল ও ব্রিটিশ জনগণের নৈতিক জীবন ধ্বংসের আশঙ্কায় আহাজারি শুরু করে ব্রিটেনের পত্রপত্রিকাগুলো। ১৮৮৫-র ১লা আগস্ট ব্রিটেনের "Fortnightly Review" পত্রিকায় জোলার উপন্যাস ও প্রাকৃতবাদী তত্ত্বের প্রতি আক্রমনাত্মক ও নিন্দাজ্ঞাপক একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। গোঁড়া নীতিবাদী ইংরেজ সমালোচক W.S. Lilly তাঁর " The New Naturalism " নামক রচনাটিতে নির্দেশ করেন জোলার অনৈতিকতা, জোলার তত্ত্বের স্থূলতা ও তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের মহত্ত্বের অভাব। তিনি প্রাকৃতবাদী তত্ত্বকে অশ্লীল ও কদর্য বলে গণ্য করেন, কারণ এ-তত্ত্বে মানুষের কোনো মহিমা নেই। এ-তত্ত্ব মানুষের সকল শুদ্ধবোধ, মহত্ত্ব, মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করে; মানুষের নৈতিক জীবনকে বিবেচনার যোগ্য বলেও মনে করে না। মানুষের মহত্ত্বকে এ-তত্ত্ব অস্বীকার করে বলেই লিলি এধারাকে কদর্য ও অশ্লীল বলে নির্দেশ করেন।[৩০] তিনি বলেন,

---

২৯. ভূমিকা অংশ থেকে উদ্ধৃত, Gosse. Edmond, Ibid, P. 383.

৩০. Lilly, W.S, 'The New Naturalism', in Becker's (ed.,) DMLR, p. 294.

Dhaka University Institutional Repository

এ-ধারা মানুষকে দেখে মানব-পশুরূপে, অশ্লীলতা ও কদর্যতার উপস্থাপনা ছাড়া এ-শ্রেণীর উপন্যাসে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ জুড়ে আর কিছুই থাকে না। লিলি "নানা" উপন্যাসটি উদাহরণ হিসেবে নেন। তিনি বলেন প্রাকৃতবাদীদের কাছে "নানা" মহৎ সৃষ্টিরূপে গণ্য হলেও, প্রকৃতপক্ষে "নানা" উপন্যাসটিতে আছে শূণ্য ও স্থূল জড়বাদের সমারোহ। এতে উপস্থাপিত হয়েছে কদর্য, অশ্লীল, তুচ্ছ পশুজীবন বৃত্তান্ত। লিলি মনে করেন এ-উপন্যাসে জোলা মানুষ সম্পর্কে তাঁর যে বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন, তা হচ্ছে মানুষ পশু মাত্র, এর বেশি কিংবা কম কিছুই সে নয়। এমন কি নায়িকার যে বাৎসল্যবোধ তাকেও লিলির মনে হয় পাশবিক সহজাত প্রবৃত্তি বলে। তাঁর মতে, এমন কি একটি কুকুরীও তার ছানার প্রতি আরো অনেক বেশি খাঁটি ও আন্তরিক আবেগ বোধ করে থাকে। তিনি বলেন, এ-উপন্যাসে উদগ্র কামলালসা ও রিরংসা চরিতার্থতার কাহিনী বর্ণনাই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য। "নানা" উপন্যাসে কোনো আধ্যাত্মিকতার অন্বেষণ করা অসম্ভবের সাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মার মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ বা নৈতিকতার প্রশ্ন এ-উপন্যাসের মানবপশুদের নেই, তাদের রচয়িতারও নেই। প্রবন্ধের উপসংহারে লিলি প্রাকৃতবাদকে মানুষের মহত্ত্ব ও নৈতিক শুদ্ধতার ওপর প্রাণঘাতী আঘাত বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন শুধুমাত্র মহত্ত্ব ও আদর্শই এ-পৃথিবী ও মানুষকে পতন-অবক্ষয় থেকে রক্ষা করছে, প্রাকৃতবাদ হচ্ছে সেই আদর্শের ওপর প্রাণঘাতী আঘাত। তাঁর মতে প্রাকৃতবাদরূপী মারাত্মক ব্যাধি আক্রমণ করেছে মানবিক মহৎব্যাপারগুলো ও শুদ্ধ বিশ্বাসকে এবং চাইছে আমাদের নৈতিক জীবন ধ্বংস করে দিতে।[৩১] ইংলন্ডে ফরাসি সাহিত্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয় প্রধানত "নানা"কে কেন্দ্র করে। <u>Fortnightly Review</u> পত্রিকার পাশাপাশি আরো অনেক পত্রিকায় জোলার উপন্যাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। এদের মধ্যে "দি স্যাটারডে রিভিউ", "সোসাইটি", "দি সেন্টিমেন্ট" উল্লেখযোগ্য।[৩২]

---

৩১. Ibid, P. 294

৩২. The National vigilence Association, 'Pernicious literature' in Becker (ed.,), P. 345.

Dhaka University Institutional Repository

" দি স্যাটারডে রিভিউ" পত্রিকা অনূদিত প্রকৃতবাদী-গ্রন্থগুলো সম্পর্কে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, যে সমস্ত বই প্যারিস, এমন কি ব্রাসেলস-এর কোনো দোকান প্রদর্শন করতে সাহস করে না, সেগুলোই লন্ডনের বিভিন্ন বইয়ের দোকানের জানালায় দেখা যায়। যে-সব বই ফরাসি প্রশাসনের বিস্ময়কর ঢিলেমির জন্য ফ্রান্সে নিষিদ্ধ করা হয় নি এবং যেগুলোর জন্য প্যারিসের কোনো কোনো এলাকা রুচিসম্মত মানুষের কাছে পরিহার্য হয়ে উঠেছে, সেসব বইই এখানে অনুবাদ করা হচ্ছে এবং তা প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপিতও হচ্ছে। " সোসাইটি " পত্রিকায় জোলার " লা টার " উপন্যাসের পাশবিকতায় ক্ষুব্ধ হয়। এ-পত্রিকা অভিযোগ করে যে ফরাসি লেখকদের কাছে বাস্তবতাবাদ হচ্ছে পুরোপুরি পাশবিকতা। এ-ধারার লেখকের কাজ হচ্ছে বিপথগামী হয়ে নোংরা ভাবনা প্রকাশের জন্য নোংরা প্রকাশভঙ্গী খুঁজে বের করা। এ-শ্রেণীর লেখকেরা আগেকার লেখকদের মতো অবৈধ প্রণয়কে পরোক্ষভাবে ও কৌশলে প্রকাশ করেন না, বরং তাঁরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন; তাঁরা খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেন সমাজের জঘন্য ঘাগুলোকে। এককথায় এ-শ্রেণীর রচনায় নোংরা ও বিভীষিকা খাঁটি ও সরলভাবে উপস্থাপিত। এ-পত্রিকার মতে জোলার " লা টার " উপন্যাসের অশ্লৈলিক আবর্জনা যে কোনো ইংরেজ সাহিত্য রসিককেই বিরক্ত ও ক্লান্ত করে তুলবে। ব্রিটিশ মধ্যবিত্তের নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্ততার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে " দি সেন্টিমেন্ট " পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা। জোলার উপন্যাসের বিষ কীভাবে সরলমতি ব্রিটিশ কিশোর-তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে লেখক তার বিবরণ দেন এবং ব্রিটিশ জাতির নৈতিক অবক্ষয়ের কথা ভেবে তিনি শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তিনি আক্ষেপ করে জানান যে জোলার কুখ্যাত গ্রন্থগুলো লন্ডননগরীর বিখ্যাত বইয়ের দোকানের খোলা জানালায় সাজিয়ে রেখে কোমলমতি কিশোরদের সর্বনাশ করা হচ্ছে। পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য বইগুলোর অশ্লীল অংশ জানালার সামনে খুলে রাখছে অসাধু ব্যবসায়ীরা এবং ওই রগরগে বর্ণনায় প্রলুব্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বালকেরা গ্রন্থগুলো কিনে নিচ্ছে। লন্ডনের এক বিখ্যাত বইয়ের দোকানে তিনি এমন ঘটনা ঘটতে দেখেন। তিনি ওই দোকানে জোলার গ্রন্থের খোলাপৃষ্ঠাগুলো পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন; কারণ তাঁর মতে ওই খোলা পৃষ্ঠা দুটোর জঘন্য বিষয়বস্তু কোনো তরুণ পাঠ করার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোনো না কোনো পাপ করতে বাধ্য হবে। কিছুক্ষণ পরে লেখকের চোখে পড়ে আনুমানিক চোদ্দ বছরের একটি কিশোরের ওই পৃষ্ঠাগুলো অভিনিবেশ সহকারে পড়ার দৃশ্য। ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত লেখক দোকানের ম্যানেজারকে এতথ্য জানালে ম্যানেজার বিমূঢ় হয়ে পড়েন ঠিকই, তবে এক মিনিট ত্রিশেক পরে দোকান ত্যাগের মুহূর্তে লেখক দেখেন সেলফে বইটি নেই। অর্থাৎ কিশোরটি বইটি কিনে নিয়ে গেছে।[৩৩]

---

৩৩. Ibid, pp, 354 - 358.

Dhaka University Institutional Repository

এই অনৈতিক সাহিত্যের প্রসার রোধ করতে এগিয়ে আসে ন্যাশনাল ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন। ১৮৮৯ সালের ১লা জানুয়ারী ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন এ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এতে অশ্লীল ও অনৈতিক সাহিত্যের ক্রমপ্রসারে কুফল সম্পর্কে ব্রিটিশ জনগণকে অবহিত করা হয়। তাঁরা দাবি করেন যে এই অনৈতিক সাহিত্য ব্রিটিশ তরুণদের অনৈতিকতাগ্রস্ত ও বিপথগামী করে তুলেছে, ব্রিটিশ জাতির সুস্থ মানসিক ও নৈতিক জীবনকে ধ্বংস করছে। তাঁদের মতে এই অনৈতিক ও অশুভ সাহিত্যের ক্রমপ্রসারে ব্রিটিশদের ধর্মীয়, সামাজিক ও জাতীয় জীবন ভয়াবহ অবক্ষয় ও নৈরাজ্যগ্রস্ত হয়ে উঠছে। ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন জনগণকে এই অশুভের বর্ধন ও সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ হতে আহবান জানায়, এই অশুভ সাহিত্যের প্রভাব থেকে নৈতিকতাকে রক্ষার জন্য জাতিকে সোচ্চার হতে আবেদনও জানায়। এর আগে ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন এই অনৈতিক সাহিত্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পার্লামেন্টে একটি বিতর্কের ব্যবস্থাও করে। ১৮৮৮ সালের ৮ই মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ-বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়। কমনস্ সভার সদস্য স্মিথ বিশদ-ভাবে বহু উদাহরণ সহযোগে এ-সাহিত্যের কুফল নির্দেশ করেন। পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে তিনি বলেন, এ-সংসদ দেশে অনৈতিক সাহিত্যের ক্রমপ্রসারের নিন্দা করছে, এ সংসদ দেশে প্রচলিত অশ্লীল প্রকাশনা, অশোভন ছবি ও চিত্রবিরোধী আইনের আরো কড়াকড়িভাবে প্রয়োগের প্রস্তাব করছে, প্রয়োজন হলে এ-আইন আরো কঠোর করতে হবে, কারণ আইনের শিথিলতার সুযোগেই ইংলন্ডে এসব অশ্লীল গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে এবং সমগ্র জাতি তথা তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। পার্লামেন্টে স্মিথ ফরাশি অনৈতিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার পত্রপত্রিকাগুলোর কথা উল্লেখ করেন, এই অনৈতিক সাহিত্যের কুফলের গভীরতা ও ব্যাপকতা নির্দেশ প্রসঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা উদাহরণ হিশেবে উদ্ধৃত করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এ-সাহিত্য ব্রিটেনকে শুধু দুর্নীতি-গ্রস্ত করে তুলবে কারণ এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতিসত্তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করা এবং সকল মূল্যবোধের ধ্বংস সাধন। তিনি বলেন, ফ্রান্সের দিকে তাকালেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এ-সাহিত্য ফরাশিদেশের জন-চিত্তকে বিকৃত ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছে। এ-সাহিত্য ফ্রান্সে বয়ে চলেছে ঝঞ্ঝার মতো, ধ্বংস করেছে স্বাভাবি-কতা, জন্ম দিয়েছে বিকার ও নৈতিক অবক্ষয়ের। তাঁর মতে, ফ্রান্স সিজারদের কালের রোমের মতো পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে কারনেই আজকের ফ্রান্সের দর্শন হচ্ছে, 'এসো যথেচ্ছ পানাহার করি, কেননা আগামীকালই আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।' তিনি দেখান ফ্রান্সের অনেকে এই অনিবার্য পতনকে নিশ্চুপে মেনে নেননি। স্মিথ উদাহরণ হিশেবে ফ্রান্সের <u>The Nineteenth Century</u> পত্রিকায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত ' The Disenchantment of France নামে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেন । ওই প্রবন্ধে দেখানো হয় যে এ সাহিত্য ফরাশি জনগণের সকল মহৎ আর্দশ ও শুদ্ধ বিশ্বাস নষ্ট করেছে । এ-সাহিত্য ফ্রান্সকে একনিষ্ঠচিত্তে ~~ফ্রান্সকে~~ যে দেবীপূজায় উদ্বুদ্ধ করছে ম্যাথু আর্ণল্ডের ভাষায় তাকে বলা যায় ' মহান লাম্পট্যের দেবীর পূজা'। ফ্রান্সের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে লাম্পট্যসাধনার সমপ্রসারণ ঘটেছে । স্মিথ ফরাশি অনৈতিক সাহিত্যকে আবর্জনা বলে অভিহিত করে বলেন যে এই আবর্জনা সাহিত্য জাতির জন্য মৃত্যু-স্বরূপ । তিনি জোলার উপন্যাস নিষিদ্ধ করার আবেদন জানান । স্মিথের বক্তব্যের সঙ্গে পার্লামেন্ট সদস্যরা ও পররাষ্ট্রসচিব একমত পোষণ করেন । নভেম্বর ১৮৮৮তে ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ফৌজদারি বিচারালয়ে জোলা প্রকাশক ভিজেটিলির বিরুদ্ধে অশ্লীল রচনা প্রকাশের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় । জোলার তিনটি উপন্যাস : Pot Bouill, Nana, La Terre' অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। এসব অশ্লীল উপন্যাস প্রকাশের জন্য প্রকাশক ভিজেটিলিকে জরিমানা করা হয়, পরে তাঁকে তিনমাসের কারাদন্ড দেয়া হয় । এ-ভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অনৈতিক সাহিত্য প্রকাশের মতো গর্হিত কর্মের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনগণের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শুচিতা রক্ষায় সমর্থ হয়েছে ভেবে তুষ্টি লাভ করে । এ-সময়ে "টাইমস্", "সেন্ট জেমস গেজেট", "হোয়াইট হল রিভিউ", "স্টার", " গ্লোব", " স্যাটারডে রিভিউ" প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে জোলার রচনাকে শুধুই অস্বাস্থ্যকর যৌনতার উপস্থাপনা ও অশুভ বলে নিন্দা করা হয়, এবং প্রকাশক ভিজেটিলিকে এসব জঘন্য উপন্যাস প্রকাশের জন্য তীব্র আক্রমণ করা হয় । সেইসঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ওই ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানানো হয় পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় স্তম্ভে ।[৩৪]

প্রাকৃতবাদ ইউরোপে যখন সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছে তখন তার আবির্ভাব ঘটে আমেরিকায় । ফ্রান্সের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে বাস্তবতাবাদ ও প্রাকৃতবাদকে দুটি ভিন্ন গোত্র ও নামে নির্দেশ

---

৩৪. Ibid, pp. 353 - 374.

Dhaka University Institutional Repository

প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে গোড়া থেকেই এই সাহিত্য ধারাদুটোকে স্বতন্ত্র নামে চিহ্নিত করা হয়। উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রাকৃতবাদের আগমনের পর মার্কিন সমালোচকেরা প্রাকৃতবাদ শব্দটি ব্যবহার করতেই বেশি পছন্দ করতেন।[৩৫] উনিশ শতকের শেষদশক থেকে মার্কিন প্রাকৃতবাদের প্রধান পুরুষ হয়ে ওঠেন স্টেফান্ ক্রেন (১৮৭১–১৯০০) ফ্র্যাংক নরিস (১৮৭০–১৯০২), থিওডোর ড্রেইসার (১৮৭১–১৯৪৫), জ্যাক লন্ডন (১৮৭৬–১৯১৬) প্রমুখ। মার্কিন প্রাকৃতবাদ ফরাশি প্রাকৃতবাদ, বিশেষ করে জোলার প্রভাবপ্রসূত। জোলার <u>Rougon Macquart</u> সিরিজ, বিশেষ করে "নানা" ও প্রাকৃতবাদীতত্ত্ব-মূলক প্রবন্ধ 'নিরীক্ষামূলক উপন্যাস' নির্ভর করে গড়ে ওঠে মার্কিন প্রাকৃতবাদী ধারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিক মন্দা ও অন্যান্য অবক্ষয় প্রাকৃতবাদী ধারার বিকাশের সহায়ক শক্তি হিশেবে কাজ করে। ওই সময়ের যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতিক মন্দা, সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা ছিলো সর্বব্যাপী; জীবনে তখন আশাবাদ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিলো। কৃষক, ভূমিশ্রমিক ও শিল্পকারখানার শ্রমিকদের নিদারুন দুর্দশা ও অভাব; বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যেকার তিক্ত সংঘাত ক্রমপ্রসারিত মন্দার তীব্রতা ও প্রচন্ডতা বাড়িয়ে দেয়। এভাবে মননগত বিভিন্ন প্রভাব ও আলোড়ন, আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (এর প্রধান হচ্ছে ডারুইনীয় তত্ত্ব) এ-সময় প্রথাগত ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিতে ক্ষয় ধরিয়ে দেয়। ~~মার্কিন~~ আর্থ-সামাজিক এই প্রেক্ষাপটটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতবাদের বিকাশে অত্যন্ত সহায়তা দেয়। এছাড়া সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনার ঐতিহ্য তৈরি করেন পূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদীরা। যদিও তাঁরা মামুলি বাস্তবতার চিত্রন করেছেন, তবে তাঁদের এই প্রয়াসও প্রাকৃত-বাদীদের অশোভন ও কুৎসিতের উপস্থাপনার পথটি সুগম করে দেয়।[৩৬] মার্কিন প্রাকৃতবাদীরা রূঢ়, পাশবিক

---

৩৫. Becker, George J. (ed.,) <u>DMLR</u>, P. 19

৩৬. Forester, Norman (ed.,) "American prose and poetry", (Houghton Mifflin Company U.S.A. 4th edition?) 1977) P. 1191.

Dhaka University Institutional Repository

ও অশ্লীল জীবনযাপন কারী অধঃপতিতদের দিকে মনোযোগ দেন এবং উপন্যাসে প্রয়োগ করেন নিয়ন্ত্রনবাদ ও নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি। ইউরোপের অন্যান্য অংশে জোলার নিয়ন্ত্রনবাদ ও নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি নিন্দিত ও বহুলাংশে বর্জিত হয়, তবে ফ্রান্সের পর শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই প্রাকৃতবাদ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে সমর্থ হয়।

১৮৯২-এ যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয় ~~স্টেফান~~ স্টেফান ক্রেনের Meggie: A Girl of the street উপন্যাসটি। ভয়াবহ ও কদর্যবাস্তবতার পরিচয়বহ এ-গ্রন্থটি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রকাশকই ছাপতে রাজি হননি, তাই ক্রেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটি প্রকাশ করেন। ক্রেন মার্কিন প্রাকৃতবাদী ধারার অন্যতম প্রধান পুরুষ রূপে গণ্য হন, তবে মার্কিন সমালোচকেরা নরিসকে অনেকটা জোলার মার্কিন রূপ বলে গণ্য করেন। নরিস ছিলেন জোলার উপন্যাসের একান্ত অনুরক্ত এবং তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে এমন একটা সময় গেছে যখন তাঁর হাতে সবসময়ই জোলার কোনো না কোনো গ্রন্থ থাকতো। সমালোচকেরা জোলা ও নরিসের সাদৃশ্য নির্দেশ প্রসঙ্গে দেখান যে জোলার L' Assommoir ও নরিসের Mc Teazue অনেকটা অভিন্ন, এবং জোলার "জারমিনাল" ও নরিসের "দি অক্টোপাস" প্রায় অভিন্ন রচনা। তবে কাহিনী বা পটভূমিগত মিল থাকলেও এ দুজন লেখকের প্রবণতাগত মিল নেই। যদিও নরিস প্রাকৃতবাদী উপন্যাসই রচনা করেন, তবু জোলা ও অন্যান্যের মতো প্রাকৃতবাদী উদ্দেশ্য বা পদ্ধতি তাঁর অধিগত ছিলো না। নরিস জোলা থেকে নিয়েছেন মূলতঃ জোলার রচনার অবাস্তবতাবাদী উপাদানগুলো, যেমন, প্রতীক, বিপুল ও বিশাল পটভূমি প্রভৃতি। তাঁর সমালোচনামূলক গ্রন্থ The responsibilities of the Novelist থেকে বোঝা যায় যে প্রাকৃতবাদী উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি তিনি খুব কমই বুঝতেন এবং এর প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতিও ছিলো না।[৩৭] ড্রেইসারকেও মনে করা হয় মার্কিন জোলা বলে। তাঁর শক্তি ও ও প্রয়াস যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে। যে-সব শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে, সে শক্তিগুলো জীবনের যে-বিন্যাস তৈরি করে তা বর্ণনা করাই ড্রেইসারের লক্ষ্য ছিলো। তাঁর রচনায় ফরাশি প্রাকৃতবাদীদের মতো কঠোর নিয়ন্ত্রনবাদ নেই। প্রাকৃতবাদী

---

৩৭. Becker, George J. (ed.,) DMLR, P. 19.

Dhaka University Institutional Repository

ঊপন্যাসিকদের যেমন সমাজের রসাতলের জীবনকথা বলার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়, ড্রেইসার তার অনেকখানি ব্যতিক্রম। তিনি সমাজের অতি নিচুস্তর বা রসাতলের দিকে ঝোঁকেন নি। তাঁর প্রথম উপন্যাস "Sister carrie" (১৯০০)। এ-গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক সাধারণ কৃষককণ্যা, সে শিকাগো শহরে আসে, ভ্রষ্ট জীবন যাপন করে। নিজে যদিও পণ্যে পরিণত হয়, তবু এই কৃষককণ্যা পতিতার জীবনযাপন করেই একসময় বিপুল বিত্তশালী হয়ে ওঠে। ড্রেইসার উপন্যাসে নিরপেক্ষভাবে তথ্য উপস্থাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। বিচার বিশ্লেষণ পরিহার করে তিনি শুধু তথ্য পরিবেশন করে যেতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো পাঠক এই তথ্য থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবে, তৈরি করে নিতে পারবে নিজস্ব অভিমত।

ড্রেইসার উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ ও আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়েও মার্কিনদেশের সংস্কৃতিহীনতা ও রক্ষণশীলতা দূর করতে সচেষ্ট হন। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত Life, Art and America শীর্ষকপুস্তিকায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিহীনতাকে আক্রমন করেন। তিনি বলেন, সংস্কৃতিহীন শক্তিগুলোর জন্য গভীর জীবনবোধ সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না। মার্কিন প্রাকৃতবাদীরা জোলার তত্ত্বানুসারী হলেও তাঁরা, বিশেষ করে ড্রেইসার, মনে করেন যে তাঁরা জোলার পরে একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃতবাদী ধারার প্রবর্তক। জোলার যেখানে শেষ, তাঁদের সেখানে শুরু।[৩৮] তবে ড্রেইসারও যে স্বদেশে পূর্ণ মর্যাদা পান এমন নয়। অনৈতিক বলে অভিযুক্ত হবার কারনে ড্রেইসারের প্রকাশক বাজার থেকে "Sister carrie" বইটি প্রত্যাহার করে নেয় এবং এরপর দশ বছর ধরে ড্রেইসার সাহিত্য সৃষ্টি থেকে বিরত থাকেন। তবে প্রাকৃতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সংগ্রাম চলতে থাকে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০-র দিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ড্রেইসারের পরবর্তী রচনাবলী এবং পুনঃপ্রকাশিত "Sister carrie" ক্রমশ জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯১৫ সালে ড্রেইসার তাঁর "The Genius" উপন্যাসের জন্য মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং জয়ী হন। মূলতঃ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে সমাজজীবনের দ্রুত পরিবর্তনের ফলেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃত-

---

৩৮. Dreiser. Theodore, 'True art speaks plainly', in Becker (ed.,) DMLR. P. 155.

Dhaka University Institutional Repository

বাদের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ১৯২০-এর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীলতার বাধ ভেঙে যায় এবং প্রকাশিত হয় বহু প্রাকৃতবাদী রচনা, যেমন- এন্ডারসনের Winesburg, Ohio; লেউসের Main Street, ডস পাসোসের Three soldier ইত্যাদি।

ফ্রান্সের পর একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই প্রাকৃতবাদীতত্ত্ব গৃহীত ও অনুশীলিত হলেও, সেখানে এ-তত্ত্ব গৃহীত হয় সংশোধিত রূপে। যুক্তরাষ্ট্রে জোলা ও তাঁর তত্ত্ব নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয় নি ঠিকই, তবে মার্কিন লেখকেরা ফরাশিদের মতো যথাযথভাবে জোলার প্রাকৃতবাদীতত্ত্বের উপস্থাপনা করতে সমর্থ হন নি। তাঁদের অনেকের পক্ষেই প্রাকৃতবাদীতত্ত্বটি আত্মস্থ করা ও তাকে শিল্পিতরূপ দেয়া সম্ভব হয় নি। আর যখনই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তত্ত্বটি রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁরা, তখনই তা হয়ে উঠেছে অসত্যের দোষে দুষ্ট, অতিরঞ্জনকিংবা প্রতীকী রচনা। অন্যদিকে ফরাশি সমাজ ব্যবস্থা ও মার্কিন সমাজব্যবস্থার ভিন্নতার কারণেও যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতবাদের বিকাশ ব্যাহত হয়। এছাড়া সময়ও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতবাদ যখন গিয়ে পৌঁছোয়, ফ্রান্সে তখন এ-আন্দোলনের অভিঘাত নিঃশেষিত। এমন সময়ে প্রাকৃতবাদ যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে অনেকখানি মার্কিনরূপ লাভ করে। যেমন, ফ্রান্সে প্রাকৃতবাদ নিয়ন্ত্রনবাদ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত ছিলো, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতবাদ নিয়ন্ত্রবাদের যান্ত্রিক বিধিবদ্ধতা থেকে অনেকখানি মুক্ত হয়ে পড়ে। মার্কিন লেখকেরা যে প্রতিবেশের (Milieu) বর্ণনা করেন তা ইউরোপীয় লেখকদের বর্ণনার চেয়ে অনেক বিস্তৃত। মার্কিন সমাজ যেমন ছিলো শিথিল, উপন্যাসেও তেমনি সামাজিক কার্যকারণের বিন্যাস হয় অনেকটা শিথিল।[৩৯]

৩.২ প্রাকৃতবাদী তত্ত্ব

প্রাকৃতবাদ (Naturalism) জীবন ও বাস্তবতাকে দেখে একটি তত্ত্বের আলোকে।

---

৩৯. Becker. George, J. (ed.,) Ibid, pp. 18 - 19.

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতবাদ 'প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রনবাদ' নামেও পরিচিত। প্রাকৃতবাদী ধারার দার্শনিক বিশ্বাস হচ্ছে মানুষ প্রাকৃতিক সূত্রনিয়ন্ত্রিত প্রাণী, এবং মানুষ বস্তু ও পশুরমতো একই রকম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়। প্রাকৃতবাদীদের কাছে মানুষ প্রতীয়মান হয় 'মানব-পশু' রূপে।[৪০] এ-তত্ত্বানুসারে মানুষের নৈতিক বা ঐচ্ছিক কোনো স্বাধীনতা নেই, নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কাজ করার স্বাধীনতা বা শক্তি মানুষের নেই। মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির ক্রীড়নকমাত্র, তাই মানুষ চাইলেও তার জীবন, মনোজগত ও কর্মজগত নিজে গড়ে নিতে পারে না, মানুষের পক্ষে তা কখনো করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ নিয়ন্ত্রিত দুটি শক্তির দ্বারা, শক্তি দুটি হচ্ছে বংশগতি (heridity) ও প্রতিবেশ (environment)। এ-তত্ত্বই 'প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রনবাদ' নামে পরিচিত।[৪১] মানুষ সম্পর্কে এর আগে যে ধারণাটি প্রচলিত ছিলো, তা হচ্ছে 'মানুষের চরিত্রই তার নিয়তি', প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকেরা মানুষ সম্পর্কে রচনা করেন একটি নতুন সূত্র। এ-সূত্রটি হচ্ছে, 'মানুষের বংশগতি ও প্রতিবেশই তার নিয়তি।' প্রাকৃতবাদী উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা প্রতিবেশ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ-উপন্যাসে পাত্রপাত্রী নয়, প্রতিবেশই নায়ক হয়ে থাকে।[৪২] প্রাকৃতবাদীরা বিশ্বাস করেন পশু ও বস্তুর মতো মানুষও প্রকৃতিরই অংশ, তাই পশু, বস্তু ও মানুষ অভিন্ন সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৪৩] তাঁদের কাছে মানুষ একরাশ

---

৪০. Stromberg, Roland N. (ed.,), Realism, Naturalism and symbalism (Macmillan London Melbourne 1968) P. XX.

৪১. Forester, Normann (ed.,) American Prose and Poetry (Houghton Mifflin Company New York Boston Chicago, 4th edition - ?) p. 1190.

৪২. Rahv, Philip, 'Notes on the Decline of Naturalism' in DMLR P. 584.

Dhaka University Institutional Repository

পাশবপ্রবৃত্তির সমষ্টি, তাই মানুষ হচ্ছে 'মানব-পশু', প্রাকৃতবাদীদের মতে এইই মানুষের প্রকৃত ও আদিম পরিচয়। তাঁদের মতে মানুষের এই আদিমরূপটি অবিকৃতভাবে পাওয়া যায় সমাজের 'রসাতল' বা সমাজের নিম্নতলের বাসিন্দাদের মধ্যে। এ-কারণেই প্রাকৃতবাদীরা সমাজের নিম্নতলের জীবনচিত্র অঙ্কনে উৎসাহ বোধ করেন। প্রাকৃতবাদীদের বিশ্ব নিরীশ্বর। তাঁদের জগতে বিধাতার কোনো ভূমিকা নেই। প্রাকৃতবাদ হতাশাবাদী। পৃথিবী সম্পর্কে আশা করার কিছু নেই, ঈশ্বর মৃত, শুভ-অশুভ বিষয়ক ধারণা-বিশ্বাস অর্থহীন এবং মানুষ কেবল প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত প্রাণীমাত্র-এই ধারণা তাঁদের মধ্যে গভীর হতাশা সঞ্চার করে। তাই প্রাকৃতবাদীরা রচনা করেছেন এক আশাহীন বিশ্ব, যা অন্ধ বা অশুভ শক্তিরাশিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর মানুষ ওই নৈরাশ্যগ্রস্ত নিরালোক বিশ্বে ট্র্যাজেডী ও যন্ত্রণার খাঁচায় বন্দী।[৪৪] তাই প্রাকৃতবাদকে বলা যায় 'নিরাশাবাদী নিয়ন্ত্রণ-বাদ' (Pessimistic determinism)। প্রথাগত নৈতিকতাও তাঁদের কাছে গুরুত্বহীন, তাঁরা মনে করেন নৈতিকতার কোনো পার্থিব কিংবা অপার্থিব পুরস্কার নেই।[৪৫] প্রথাগতভাবে যা কিছু 'আদর্শ' রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে, প্রাকৃতবাদী উপন্যাসে তার সবকিছুই বাদ দেয়া হয়। এটি প্রাকৃতবাদীদের আবর্জনা-প্রীতির ফল নয়। আদর্শকে তাঁরা পরিহার করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন 'আদর্শ' একটি বায়বীয় ধারণামাত্র, মানুষের বাস্তবজীবনে এর দৃঢ়ভিত্তি নেই। মানুষের বাস্তবজীবনে যেসব বিষয়ের দৃঢ়ভিত্তি নেই সে-সবই প্রাকৃতবাদ পরিত্যাগ করে, এ-কারণে আদর্শও পরিত্যক্ত।[৪৬]

সাহিত্যে নিয়ন্ত্রণবাদীতত্ত্ব প্রথম প্রস্তাব করেন হিপোলিত তেইন (১৮২৮-১৮৯৩)। প্রাকৃতবাদের প্রধান তাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক এমিলজোলা প্রাথমিকভাবে তেইনের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হন। যদিও প্রাকৃতবাদ তথা জোলা তেইনের তত্ত্বনির্ভর হয়ে থাকে নি, জোলা পরে ঝুঁকে পড়েন ক্লদ বার্নার্ডের নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির দিকে। যেহেতু তেইনই প্রথম সাহিত্যে নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্ব আলোচনা করেন, তাই প্রধান প্রাকৃতবাদী জোলা-

---

৪৪. Stronberg, Roland N. (ed.,) Ibid, P. XXI.

৪৫. Cowly, Malcolm, Ibid, pp. 429 - 430.

৪৬. Gosse, Edmund, 'The Limits of Realism in Fiction', in DMLR P. 387.

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তিত তত্ত্বের আলোচনার আগে তেইনের তত্ত্বের ওপরই আলোকপাত করা দরকার। তেইন নিয়ন্ত্রনবাদী তত্ত্ব প্রস্তাব করেন তাঁর "Histoire de la Anglaise" (১৮৬৩-৪) গ্রন্থের ভূমিকায়, তবে ১৮৫৮-এ মুদ্রিত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'Balzac; Nouveaux Essais de culture et de l' histoire' -তে তিনি নিয়ন্ত্রণবাদী লেখক হিসেবে ব্যালজাকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিয়ন্ত্রনবাদী রচনার বৈশিষ্ট্যও এ-শ্রেণীর লেখকের প্রবণতা নির্দেশ করেন। তেইনের তত্ত্বকে 'জড়বাদী নিয়ন্ত্রনবাদ' (Materialistic Determinism) বলে অভিহিত করা যায়। তেইনের মতে জড়জগৎ, প্রাণীজগৎ এবং মনুষ্যজগৎ নিয়ন্ত্রিত হয় একই সূত্র দ্বারা, সব কিছুই কারণ-নিয়ন্ত্রিত।[৪৭] তাঁর মতে, এই বিশ্বলোক একটি 'মহাযন্ত্র' (Great Mechanism) এবং এর অন্তর্গত সব কিছু- এমন কি মানুষ ও তার নিজস্ব নৈতিক জীবন ও তার সকল ক্রিয়াকর্ম এই অন্ধ যান্ত্রিক নিয়মের অন্তর্গত। সব কিছু কার্যকারণের যোগফল মাত্র। তেইনের জড়বাদী নিয়ন্ত্রনবাদের মূলকথা;

> The research into causes must come after the collection of facts, It doesn't matter whether the facts are physical or moral, they will still have causes; there are causes for ambition, courage and truthfulness as there are for digestion muscular movement and animal warmth. Vice and virtue are products like vertisl and sugar, and every complex element has its origins in the admixture of other, simpler, elements on which it depends.'[৪৮]

---

৪৭. Welleck, René, <u>A History of Modern Criticisn:</u> 1750 - 1950, P. 33.

৪৮. Grant, Damian, <u>Realism</u>, P. 36.

Dhaka University Institutional Repository

তেইন মানুষকে মনে করেন বিভিন্ন শক্তির ক্রীড়নক বলে, আর সাহিত্যকে গণ্য করেন সমকালীন জীবনপদ্ধতির অনুলিখন বলে। তাঁর মতে, 'সাহিত্যকর্ম শুধুমাত্র কল্পনারি খেলা নয় কিংবা নয় কোনো অস্থির মস্তিস্কের খেয়াল। সাহিত্য হচ্ছে সমকালীন রীতিনীতি ও প্রথার প্রতিলিপি এবং মননের এক বিশেষ অবস্থার স্মারক।'[৪৯] তাঁর মতে, মানুষ বহু শতাব্দী আগে কী অনুভব ও চিন্তা করেছে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তা উদঘাটন করা সম্ভব। সাহিত্যকে তিনি একটি বিশেষকালের দলিল বলে গণ্য করেন। তাঁর কাছে লেখকও নিয়ন্ত্রিত প্রাণী, তিনি দেবতাতুল্য কেউ নন কিংবা নিজের শক্তিতে একটি স্বায়ত্বশাসিত গ্রন্থরচয়িতাও নন তিনি। অন্য সব কিছুর মতো লেখককেও নিয়ন্ত্রন করে কতিপয় শক্তি।

তেইন সাহিত্যকে তিনটি শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখেছেন। এগুলো হচ্ছে: 'জাতি' (Race), 'প্রতিবেশ' (Milieu), 'গতি' বা 'অব্যবহিত পরিস্থিতি' (moment (um))।[৫০] সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এই জাতি, প্রতিবেশ ও গতি দ্বারা। তেইনের মতে পৃথিবীতে বহু জাতি আছে, তাদের দৈহিক কাঠামোয় যেমন ভিন্নতা রয়েছে তেমনি মেজাজ ও আচরণেও আছে পার্থক্য। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের মানুষ রয়েছে যেমন আছে বিভিন্ন ধরনের গরু ও ঘোড়া। এদের মধ্যে কেউ কেউ সাহসী ও বুদ্ধিমান, অন্যেরা ভীরু ও সীমিত সামর্থ্যের মানুষ। কারো মধ্যে থাকে অসামান্য সৃজনী প্রতিভা ও চিন্তাশক্তি, কেউ কেউ হয় চিন্তাশক্তিহীন নির্বোধ, যান্ত্রিকভাবে কাজ করে যায় তারা। কেউ কেউ থাকে বিশেষ কাজের জন্য অত্যন্ত যোগ্য। যেমন একটি বিশেষ জাতের কুকুরকে শুধুমাত্র দৌড়াবার কাজেই ব্যবহার করা হয়, আরেক শ্রেণীর কুকুরকে শুধু ব্যবহার করা হয় যুদ্ধের কাজে, কোনোটিকে ব্যবহার করা হয় শিকারের কাজে, কোনোটিকে ব্যবহার করা হয় ঘোড়া ও মেষ পাহারা দেবার জন্য। তেমনি মানুষেরাও সবাই একই কাজের যোগ্য নয়, শক্তি ও ক্ষমতার ভিন্নতা অনুসারে তাদের থাকে বিভিন্ন কাজ করার যোগ্যতা। এ-সব মিলিয়েই জাতি।[৫১] লেখকের দায়িত্ব হচ্ছে

---

৪৯. Ellmann, Richard & Feidelson, charler JR. (ed.,) The Modern Tradition (Oxford University press New York 1965 7th printing 1977) P. 254.

৫০. Welleck. Rene, A History of Modern criticism: 1750 - 1950, Ibid, P. 27.

৫১. Ellmann & Feidelson (ed.,), Ibid. P. 258.

Dhaka University Institutional Repository

'আন্তরসংগঠন' (internal structure) ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকল বৈশিষ্ট্যসহ একটি জাতিকে যাচাই করা। অন্যটি হচ্ছে 'প্রতিবেশ', যাতে লেখক বাস করেন। প্রতিবেশ বর্ণনার সময় লেখক শুধুমাত্র বাস্তব প্রতিবেশ-যেমন, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু ইত্যাদিই বর্ণনা করবেন না, তাঁর অঞ্চলের রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থাও পরিস্ফুট করে তুলবেন তিনি।[৫২] 'গতি' হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় অর্জিত বেগ। তেইন একটি যান্ত্রিক রূপকের সাহায্যে জাতি, প্রতিবেশ ও গতির ভূমিকা নির্দেশ করেন:

The race is an inner mainspring, the milieu is pressure from without, the moment(um) is the impulsion already acquired'[৫৩]।

উপন্যাসকে তেইন বৈজ্ঞানিক প্রণালী পদ্ধতিতে নির্মিত এক ধরণের উপাত্তসংগ্রহ বলে গণ্য করেন। তাঁর মতে, আবেগ অনুভূতি ও কল্পনার গল্পকথা বলা নয়, উপন্যাসের দায়িত্ব হচ্ছে আমরা ঠিক যা তা-ই প্রদর্শন করা, এবং সমালোচনার দায়িত্ব হচ্ছে আমরা যা ছিলাম ও আছি, তা প্রদর্শন করা।[৫৪] তাঁর মতে উপন্যাস রচিত হবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীপদ্ধতিতে, যেখানে থাকবে ' Calculation, simplefication, deduction [৫৫] কল্পনাসমৃদ্ধ সুপরিকল্পিত প্লটের একটি উপন্যাস রচনা একজন প্রকৃতবাদী ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য হবে না, তাঁর লক্ষ্য রচনাটিকে মনুষ্য প্রকৃতি বিষয়ক তথ্যরাশির সমষ্টি বা দলিল করে তোলা। একজন শরীরবিদকে (anatomist) যেমন সকল প্রাণীই সমান আকৃষ্ট করে, অক্টোপাস অথবা হাতি যা-ই হোক না কেনো, সবই তিনি সমান আগ্রহে ব্যবচ্ছেদ করেন, তেমনি

---

৫২. Welleck, Rene, H M C. P. 27

৫৩. Ellmann & Feidelson (ed.,) Ibid, P. 230.

৫৪. Taine, Hippolyle, ' The world of Balzac' in DMLR P. 105.

৫৫. Grant, Damian, Ibid, P. 37

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিকের ভূমিকাটিও হবে শরীরবিদের ই মতো। তিনি একজন প্রহরীকে যতখানি আগ্রহে বিশ্লেষণ করবেন, একজন প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্লেষণেও ততখানি আগ্রহই বোধ করবেন।[৫৬] তেইন স্তাঁদাল ও ব্যালজাককে চিহ্নিত করেন দুই প্রধান প্রকৃতবাদী ঔপন্যাসিক হিশেবে। তাঁর মতে স্তাঁদাল উপন্যাস গড়ে তুলেছেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে। স্তাঁদালের রচনারীতি সম্পর্কে তেইনের অভিমত এমন :

' he introduced scientific procedures into the history of the heart: Calculation, simplification, deduction; that he was the first to record the elementary causes... ... in short, that he dealt with the feeling as one should deal with them, that is to say as a naturalist and as a physicist,'[৫৭] তেইন ব্যালজাক সম্পর্কে বলেছেন যে ব্যালজাকও কল্পনা পরিহার করে চালিয়েছেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। কল্পনার অলীকভুবনে প্রবেশের বদলে তিনি বৈজ্ঞানিকের মতো পরীক্ষাগারে প্রবেশ করতেই পছন্দ করেছেন, গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে মানুষকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। তেইন ব্যালজাকের এই বৈশিষ্ট্যটিকে চিহ্নিত করেন এ-ভাবে :

We have seen that he has nothing of the quick and lively imagination by which Shakespeare tourches and handles the loosened threads which link beings together; he is heavy - handed, painfully and obstinately sunk into his dungheap of science, busy counting the fibres he is dessecting, with such a letter of tools and variety of repulsive proparations that when he emerges from his cellar and comes back to the light, he retains the smell of the laboratory in which he has been buried.'[৫৮]

---

৫৬. Taine, Hippolyte, Ibid, P. 106

৫৭. Grant, Damian, Ibid, P. 37.

৫৮. Taine. Hippolyle, Ibid, P. 107.

Dhaka University Institutional Repository

তেইনের মতে ব্যালজ্যাকের উপন্যাস হয়ে উঠেছে মনুষ্য প্রকৃতি বিষয়ক তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার।

সাহিত্যে নিয়ন্ত্রণবাদীতত্ত্ব সর্বপ্রথম তেইন প্রস্তাব করলেও তাঁর তত্ত্ব দ্বারা প্রাকৃতবাদীরা খুববেশি প্রভাবিত হন নি, তাঁর তত্ত্ব থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন সামান্য। তেইনের তত্ত্ব দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও জোলা শেষপর্যন্ত ঝুঁকে পড়েন অন্য আরেকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিকে, এবং তার আদলে গড়ে তোলেন সাহিত্যিক প্রাকৃতবাদ। জোলা হয়ে ওঠেন প্রাকৃতবাদের মহাপুরুষ, জোলা ও প্রাকৃতবাদ হয়ে ওঠেন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। তবে প্রাকৃতবাদের সূচনা ঘটে তেইনের তত্ত্বেই। প্রাকৃতবাদী তত্ত্বের মহাপুরুষ, সুনিপুণ তাত্ত্বিক ও প্রধান প্রাকৃতবাদী উপন্যাসিক এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) প্রাকৃতবাদী তত্ত্বকে বলতেন 'la formule naturaliste' জোলা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ক্লদ বার্নার্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রচনা করেন প্রাকৃতবাদী তত্ত্ব; তবে বার্নার্ডের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হবার আগেও উপন্যাসিক জোলার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার প্রবণতা ছিলো। তিনি উপন্যাসিককে একজন শল্যচিকিৎসক বলে গণ্য করেন, যিনি চালিত হন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য দ্বারা। উপন্যাসিক জীবন্ত মানুষকে ব্যবচ্ছেদ করেন ও তার ফলাফল উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তুলে ধরেন। জোলার মতে একজন শল্য চিকিৎসক ও একজন উপন্যাসিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শল্যচিকিৎসক ব্যবচ্ছেদ করেন শব আর উপন্যাসিক ব্যবচ্ছেদ করেন জীবন্ত মানুষ। জোলার প্রথম উপন্যাসেই তাঁর এই বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জোলার প্রথম উপন্যাস "Therese Requin" বেরোয় ১৮৬৭-তে। ১৮৬৮-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় জোলা ঘোষণা করেন যে তাঁর লক্ষ্য গল্প বলা নয়, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা চালানোই তাঁর উদ্দেশ্য। চরিত্র সৃষ্টিও তাঁর লক্ষ্য নয়, তাঁর লক্ষ্য মেজাজ অধ্যয়ন করা। তিনি বলেন, 'I chose character completely dominated by their nerves and their blood, deprived of free will, pushed to each action of their lives by the fatality of their flesh.'[৫৯]

---

৫৯. Grant, Damian, Ibid, P. 37.

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিক হিসেবে জোলা তাঁর ভূমিকা নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন, 'I have simply done on living bodies the work of analysis which surgeons perform on corpses,'[৬০] তাঁর এই ঘোষণায় ধ্বনিত হয়েছে পরবর্তীকালে প্রবর্তিত 'নিরীক্ষা-মূলক তত্ত্ব'-এর মূলসুর।

"Therese Requin" -এর ভূমিকায় জোলা রক্ষণশীলদের প্রথাগত নৈতিকতার ধারণাকেও আক্রমণ করেন। রক্ষণশীলেরা মনে করে উপন্যাসে জীবনের সকল বিষয়ের খোলামেলা অবিকল উপস্থাপন রচনাটিকে অনৈতিকতা বা অশ্লীলতাগ্রস্ত করে তোলে। জোলা এমন ধারণাকে অর্থহীন বলে মনে করেন। তাঁর মতে, লেখকবিজ্ঞানী দুটি উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হবেন। বিজ্ঞানী যেমন যে-কোনো বিষয় তাঁর নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেন, বিষয়টি নোংরা বা অতি বিরক্তিকর কিংবা অত্যন্ত নীচুমানের এমন কোনো অজুহাতে তিনি কোনো বিষয় বর্জন করেননা, অথবা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর দেখে কোনো বিষয়কে গ্রহণ করেন না। বিজ্ঞানী সকলই গ্রহণ করেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে, পরীক্ষানিরীক্ষাই তাঁর প্রধানলক্ষ্য। জোলা বিজ্ঞানীর এই নৈর্ব্যক্তিক বিষয়-গ্রহণ ও পরীক্ষা পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে চান। রক্ষণশীলদের অভিযোগ খন্ডন করে তিনি বলেন একজন চিকিৎসক যখন কোনো ঘৃণিত যৌন'ব্যাধির চিকিৎসা করেন, কিংবা সে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন, তখন সমাজে কেউ তাঁকে সমালোচনা করে না। তিনি যখন রোগীর রোগের কারণ ও রোগমুক্তির জন্য অনুসন্ধান করেন, তখনও তিনি অনৈতিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন না। ঔপন্যাসিকও পালন করেন সমাজ চিকিৎসকের ভূমিকা। তিনিও চিকিৎসকের মতোই সমাজদেহকে ব্যাধিমুক্ত করার জন্য রোগের কারণ ও রোগমুক্তির জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে যান। কাজেই তাঁকে অনৈতিক বলে আক্রমণ করা অর্থহীন।[৬১] এ-গ্রন্থের ভূমিকায়ই জোলা তাঁর ওপর তেইনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। Therese Requin -এর প্রথমসংস্করণের ভূমিকায়

---

৬০. Zola, Emile, 'On the Rougon - Macquart series', in DMLR, P. 159.

৬১. Welleck, Rene, <u>A History of Modern Criticism</u>: 1750 - 1950, P.16

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তেইনের একটি বাক্য উদ্ধৃত করেন : ' Le vice et le vertu sont des produits, Comme le vitriol et le sucre' (পাপপুণ্য গন্ধক আর চিনির মতো উৎপাদিত সামগ্রী-)। এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় জোলা জানান মানুষকে তিনি যে-বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার বিষয়রূপে গণ্য করেন, তার প্রেরণা তিনি পেয়েছেন তেইনের তত্ত্বে।[৬২] এছাড়া জোলা তাঁর বিখ্যাত "Rougon - Macquart series" -এ যে বংশগতি ও প্রতিবেশ তত্ত্ব প্রয়োগ করেন, তাতে তেইনের নিয়ন্ত্রনবাদীতত্ত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট।[৬৩] তবে জোলা ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্ম-প্রকাশের আগে থেকেই তাঁর মধ্যে নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান ছিলো। ১৮৬৬তে জোলা বাস্তবতাবাদী গঁকুরদের উপন্যাসের বৈজ্ঞানিক অবিকল উপস্থাপন প্রক্রিয়া দ্বারা গভীর ভাবে মোহিত হন। গঁকুরদের "Germinic Lacerteux" উপন্যাসের বৈজ্ঞানিক সততায় মুগ্ধ হয়ে জোলা গ্রন্থটির সমালোচনা করে লেখেন, ' The drama is terrific, it has the power but interest of a physiological and physiological problem, of a case of physical and moral illness, of story which has to be true '[৬৪] তিনি এ-উপন্যাসের নায়িকা সম্পর্কে বলেন, যদি এই নারীকে অন্য প্রতিবেশে স্থাপন করা যেতো, তবে তার জীবনে এমন অধঃপতন এবং মৃত্যু নেমে আসতো না। জোলা

---

৬২. Grant, Damian, Ibid, pp. 38 - 39.

৬৩. Zola, Emile, ' On the Rougon Macquart Series' in DMLR P. 159.

৬৪. উদ্ধৃত, Walcutt, charles child, American Literary Naturalism, A divided stream (University of Minnesata press, Minneapolis 1956) P. 31.

Dhaka University Institutional Repository

বলেন : Give her a husband and children to love, and she would be an excellent mother '.৬৫ ' ' জোলার এ-উক্তিতে তাঁর নিরীক্ষা-প্রবণতাই আভাসিত হতে দেখা যায়, যা তাঁকে তাড়িত করে কুড়ি বছরেরও অধিক সময় ধরে ।

জোলা তাঁর প্রাকৃতবাদীতত্ত্ব সুশৃঙ্খলরূপে প্রস্তাব করেন ' নিরীক্ষামূলক উপন্যাস ' (Le Roman Experimental ১৮৮০) প্রবন্ধে । জোলা এ-তত্ত্ব গড়ে তোলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ক্লদ বার্নার্ডের " Introduction a l'Etude de la Medecine experimentale " (১৮৬৫) গ্রন্থের কাঠামোতে । বার্নার্ড চিকিৎসাশাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রস্তাব করেন । উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রকে গণ্য করা হতো একধরনের কলাবিদ্যারূপে । একে নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান বলে গণ্য করা হতো না । বার্নার্ড তাঁর " Introduction to the study of Experimental medicine " গ্রন্থে দেখান যে যদি শারীরবিদ্যা অধ্যয়নে নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তবে তা অবশ্যই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হয়ে ওঠবে । বার্নার্ড তাঁর নিরীক্ষামূলকপদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখান যে রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় যে-পদ্ধতি জড়বস্তুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, সে-পদ্ধতিই প্রয়োগ-করা সম্ভব শরীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে, জীবন্তপ্রাণীদের ক্ষেত্রে । অর্থাৎ তিনি নির্দেশ করেন যে জড়বস্তু ও জীবন্তপ্রাণী একই সূত্রের অন্তর্গত । তিনি বিজ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করেন, একটিকে বলেন 'পর্যবেক্ষণাত্মক বিজ্ঞান ' (Observational Science), অন্যদিকে বলেন 'নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞান' (Experimental Science)। নিরীক্ষাই তাঁর লক্ষ্য । তাঁর মতে ' Experiment ' হচ্ছে ' forced observation '। নিরীক্ষাকারী কখনো পূর্বধারণা দ্বারা চালিত হন না । প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি কোনো পূর্বধারণা পোষণ না করে নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাওয়াসিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন । অর্থাৎ নিরীক্ষাকারী শুধু তা-ই গ্রহণ করেন যা তিনি নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন । বার্নার্ড মনে করেন জীবন্ত প্রাণীরাও এ-নিরীক্ষার

৬৫· Ibid pp - 31.

Dhaka University Institutional Repository

বাইরে নয়। জড়বস্তুর মতো জীবনু প্রাণীদেরও নিরীক্ষা সম্ভব। বার্নার্ড পর্যবেক্ষক ও নিরীক্ষকের পার্থক্য নির্দেশ করেন। পর্যবেক্ষক তিনি যিনি প্রপঞ্চ অধ্যয়নে কিছু প্রণালীপদ্ধতি ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি প্রপঞ্চরাশিকে পরিবর্তিত হতে বাধ্য করেন না, অর্থাৎ তিনি নিরীক্ষা করেন না। প্রকৃতিতে তিনি যা পান তিনি কেবল তা-ই সংগ্রহ করেন। নিরীক্ষক পর্যবেক্ষকের মতো নৈর্ব্যক্তিক ও নির্লিপ্ত নন। নিরীক্ষক অনুসন্ধানের সময় নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে পরিবর্তিত বা সংশোধিত করেন। নিরীক্ষক এ সব প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে এমন পরিস্থিতি ও অবস্থার মধ্যে আবির্ভূত করেন, যা প্রাকৃতিক নয়। বার্নার্ড এ-দু-পদ্ধতির উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণাত্মক বিজ্ঞান, কারণ কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীই গ্রহনক্ষত্রকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেননা, শুধু তার বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। অন্যদিকে রসায়নশাস্ত্র নিরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞান, কারণ রসায়নবিদ প্রকৃতির ওপর ক্রিয়া করে তাকে সংশোধিত করেন। নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি কোনো কিছুর 'কেন' নিয়ে ব্যাপৃত থাকে না, এটি ব্যাখ্যা করে 'কী-ভাবে' কিছু ঘটে। বার্নার্ডের নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণবাদী। নিয়ন্ত্রনবাদ বলতে তিনি বোঝান সেই কার্যকারণকে যা কোনো প্রপঞ্চের উদ্ভবকে নিয়ন্ত্রণ করে। বার্নার্ড মনে করেন জড়বস্তু ও জীবনুপ্রাণী একই রকম নিয়ন্ত্রনের অধীন। তাই নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ও সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য জীবনু প্রাণী ও জড়বস্তুর ক্ষেত্রে অভিন্ন। এপদ্ধতি কোনো প্রপঞ্চের সাথে তার অব্যবহিত কারণের সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করে। অর্থাৎ কোনো প্রপঞ্চের উদ্ভবের পেছনে অনিবার্য যেসব শর্ত, সেগুলো নির্দেশ করে। বার্নার্ড জীবনু প্রাণী ও জড়বস্তুকে একই রকম নিয়ন্ত্রনের অধীন বলে মনে করলেও তিনি বলেন, এ-দুয়ের ওপর নিরীক্ষাচালানাবার সময় বা প্রপঞ্চরাশির নিয়ন্ত্রন উদঘাটনের সময় একই সূত্র প্রযুক্ত হবে না। তাঁর মতে, জড়বস্তুর ওপর নিরীক্ষা চালাবার সময় বিবেচনা করতে হবে একটি 'প্রতিবেশ', অর্থাৎ তার বাহ্যিক প্রতিবেশ বিবেচনা করাই যথেষ্ট। কিন্তু জীবনু উচ্চতর প্রাণী অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে দুটি 'প্রতিবেশ', একটি বাহ্যিক বা শরীর বহির্ভূত, অন্যটি আভ্যন্তর বা শরীর অন্তর্গত। তিনি বাহ্যিক প্রতিবেশকে বলেন 'প্রতিবেশ' (environment), আভ্যন্তর প্রতিবেশকে বলেন 'বংশগতি' (heridity)[৬৬] এ-দুইই নিয়ন্ত্রন করে ব্যক্তিকে।

---

৬৬. Zola. Emile,'The experiemental Novel' in DMLR, pp.162-170.

Dhaka University Institutional Repository

বার্নার্ড যে-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রয়োগ করেন, জোলা উপন্যাস রচনার জন্য গ্রহণ করেন সে-পদ্ধতি। জোলারও লক্ষ্য ছিলো উপন্যাসকে কলাবিদ্যা থেকে বিজ্ঞানেউন্নীত করা। তাঁর কাছে উপন্যাস গণ্য হয় বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা রূপে। জোলা মনে করেন, মৌলিক সত্য উদঘাটনের জন্য শুধু পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহ যথেষ্ট নয়, তারজন্য প্রয়োজন নিরীক্ষার। জোলা বিশ্বাস করেন যে উপন্যাস হচ্ছে 'a controlled scientific experiment in human relation or in the psychological development of an individual.'[৬৭] নিরীক্ষামূলক উপন্যাস প্রবন্ধে জোলা একজন চিকিৎসাবিদের নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হবার কারণ ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠার কারণও নির্দেশ করেন। জোলা মনে করেন যদি কলাবিদ্যা হিসেবে চিহ্নিত চিকিৎসাশাস্ত্র নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগে বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারে, তবে একই পদ্ধতি প্রয়োগে কলাবিদ্যা রূপে চিহ্নিত উপন্যাসও বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারে। তিনি প্রমাণ করতে চান যে নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি যেমন শারীরবিদ্যায় প্রযুক্ত হতে পারে, তেমনি তা প্রযুক্ত হতে পারে মানুষের সংরাগ ও মননের ক্ষেত্রে।[৬৮] জোলার মতে,

It is merely a question of steps in the same direction - from chemistry to physiology, then to anthropolozy and sociology. The experiemental novel is the last step.'[৬৯] জোলা চিকিৎসক ও ঔপন্যাসিককে সমার্থক বলে মনে করেন। কারণ দুজনেরই নিরীক্ষার বিষয় উচ্চতর জীবনু প্রাণী। মানবদেহের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা এবং রোগাক্রান্ত অবস্থা দুইই চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার বিষয়; ঔপন্যাসিকও কাজ করে থাকেন মানুষের সুস্থ ও রুগ্ন অবস্থা নিয়ে।[৭০] ঔপন্যাসিকের বিজ্ঞান মনস্কতার আরো একটি কারণ জোলা নির্দেশ করেন। তিনি মনে করেন তাঁর যুগবিজ্ঞানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যুগ, আদর্শ ও আধ্যাত্মিক অলৌ-

---

৬৭. Walcutt. c c. Ibid, P. 30 - 31.

৬৮. Zola, Emile, 'the experiemental Novel' DMLR, pp 162 - 163.

৬৯. Walcutt, CC, Ibid, P. 32.

৭০. Zola, Emile, Ibid, P. 181.

Dhaka University Institutional Repository

কিকতার যুগ নয়। জোলা বলেন, 'আমরা ধ্রুপদী যুগের পরাবৈদিক মানুষ নই, আমাদের কাল প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে তৈরি করেছে নতুন ধারণা এবং আমাদের তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।' জোলা বলেন : 'The return to Nature, the naturalistic evolution, which is the main current of our age, is gradually drawing all manifestations of human intelligence into a single scientific course.'[৭১] জোলা যদিও নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শারীরবিদ্যার মতো উপন্যাসকেও বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে চান, তবে তিনি মনে করেন যে উপন্যাসের বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। জোলার মতে যেখানে চিকিৎসা-বিদ্যাকেই কলাবিদ্যা বলে গণ্য করা হয়, চিকিৎসককে গণ্য করা হয় কলাবিদ্যাধর বা শিল্পী, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ঔপন্যাসিককে আরোবেশি শিল্পী বলে গণ্য করা হবে। কারণ ঔপন্যাসিকের জগতে indeterminism এর প্রাধান্য অত্যন্ত বেশি। জোলা মনে করেন সে-কারণেই নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে, কারণ এর বিষয় চিকিৎসাশাস্ত্রের চেয়ে অনেকবেশি জটিল। তবে জোলা বিশ্বাস করেন খুববেশি সময় ধরে এ-অসুবিধা উপন্যাসকে বিজ্ঞানের সড়কে উঠতে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না।[৭২] তাঁর মতে, ক্রমশ উপন্যাস হবে পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষা ও দলিলধর্মিতার সমষ্টি।

ক্লদ বার্নার্ডের মতে শারীরবিদ বা চিকিৎসক হবেন একই সঙ্গে পর্যবেক্ষক ও নিরীক্ষক। জোলা মনে করেন প্রকৃতবাদী ঔপন্যাসিকের ভূমিকাও হবে একই রকম। ঔপন্যাসিক হবেন একই সঙ্গে পর্যবেক্ষক ও নিরীক্ষক। জোলা 'পর্যবেক্ষক' ও 'নিরীক্ষক'-এর সংজ্ঞা অবিকল গ্রহণ করেছেন বার্নার্ড থেকে। পর্যবেক্ষক তিনি, যিনি প্রপঞ্চের অনুসন্ধানের সময় প্রকৃতির সরবরাহকৃত তথ্যই শুধু সংকলন করেন, আর নিরীক্ষক তিনি, যিনি শুধু তথ্যসংকলন করেন না, যিনি প্রপঞ্চের ওপর নানা নিরীক্ষা করে, তার ফল কী দাঁড়ায়, তা পর্যবেক্ষণ করেন। নিরীক্ষক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের পরিবর্তন ও সংশোধন সাধন করেন। জোলার মতে, পর্যবেক্ষণকারী

---

৭১. Ibid, P. 162.

৭২. Ibid, P. 182.

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্রীর ভূমিকা পালন করেন, তিনি প্রকৃতির অনুলিপিকারমাত্র। জোলা বলেন, পর্যবেক্ষকের ভূমিকা যেখানে শেষ সেখানে শুরু হয় নিরীক্ষকের ভূমিকা। জোলার উক্তি:

> But once the fact is set down and the phenomenon is carefully observed, ideas come into play, reasoning intervenes, and the experimenter appears in order to interpret the phenomenon. The experiementer is the who, by virtue of a more or less probable but anticipatory interpretation of observed phenomena, institutes an experiment in such manner that in the logical framework of prevision, it furnishes a result which serves as a control for the hypothesis or preconceived idea............... From the moment that the result of the experiemnt is manifest, the experiementer confronts a true observation which he has induce, one which he must set down without preconceived idea like any other observation. The experiementer ought thus to disappear or rather transform himself instantly into observer, and it is only after he has set down the results of the experiment in absolutely the same fashion as he would an ordinary observation that his mind will once more proceed to reason, compare, and judge whether the experimental hypothesis has been varified or invalidated by these some results.'[৭৩]

৭৩. Ibid, P. 165 - 166.

Dhaka University Institutional Repository

জোলার মতে, প্রকৃতবাদী ঔপন্যাসিক বিজ্ঞানীর দুটি ভূমিকাই পালন করেন। তিনি পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণ শেষে গৃহীত উপাত্তরাশির নিরীক্ষক। পর্যবেক্ষক হিশেবে তিনি পর্যবেক্ষিত উপাত্ত উপস্থাপিত করেন, এমন ভূমি প্রস্তুত করেন যার ওপর পাত্রপাত্রীরা দাঁড়াতে পারে; একই সঙ্গে যেখানে সংঘটিত হতে পারে উপন্যাসের ঘটনাবলী। এরপর সক্রিয় হয় লেখকের নিরীক্ষক সত্তা। নিরীক্ষক হিশেবে তিনি সংগৃহীত উপাত্ত নিয়ে নিরীক্ষা শুরু করেন। নিরীক্ষক ' Sets the characters of a particular story in motion, in order to show that the series of events therein will be those demonded by the determinism of the phenomena under study'[৭৪] জোলার মতে প্রকৃতবাদী ঔপন্যাসিকের এই পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা হচ্ছে মূলতঃ সত্যানুসন্ধান।

জোলার মতে নিরীক্ষামূলক উপন্যাস হচ্ছে ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষার বিবরণ। ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

> The whole operation consists of taking facts from nature, then studying the mechanism of the data by acting on them through a modification of circumstances and environment without ever departing from the laws of nature. And the end there is knowledge, scientific knowledge, of man in his individual and social action.'[৭৫]

৭৪. Ibid, P. 166.

৭৫. Ibid, P. 167.

Dhaka University Institutional Repository

জোলা মনে করেন প্রাকৃতবাদী উপন্যাস হচ্ছে মানুষের ওপর পর্যবেক্ষণের সহায়তায় ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষা। প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক দেখতে চান এক বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ কী রকম আচরণ করে। জোলা মনে করেন এ-জন্যই নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োজন। ক্লদ বার্নার্ডের মতে নিরীক্ষক হচ্ছেন 'the examining magistrate of nature', আর জোলার মতে ঔপন্যাসিক হচ্ছেন 'the examining magistrate of men and their passions,'[৭৬] উপন্যাসে মানুষকে নিরীক্ষার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন জোলা এভাবে :

> When we reason about our own acts, we have a centain guide, for we have consciousness of what we think and what we feel. But if we wish to judge the acts of another man and know the motives of his action, it is quite a different thing. No doubt we have before our eyes the movements of such a man and his behaviour, which are, we are sure, mode of expression of his sensibility and will. In addition, we admit that there is a necessary rapport between his acts and their cause; but what is that cause? We do not feel it in ourselves; we are not conscious of it as in ourselves; we are thus obliged to interpret it, to suppose it on the basis of the movements we see and the words we hear. Thus we must use the acts of this man as controls one upon the other; we consider how he acts under a given condition, and in short we have recourse to the experimental method.[৭৭]

---

৭৬. Ibid, P. 167.

Dhaka University Institutional Repository

জোলার মতে প্রকৃতবাদী উপন্যাসিক শুধু তথ্যসংকলক নন, তিনি একজন প্রতিভাবান আবিষ্কারক। তাঁর মতে প্রকৃতবাদীরা যেহেতু সত্যতথ্য নিয়ে কাজ করে থাকে, তাই সত্যতথ্যের উপস্থিতিকে অনেকের কাছে আলোকচিত্র বলে মনে হতে পারে। এই তথ্য বা ঘটনারাশির ক্রিয়াকলাপ দেখানোর জন্য তাঁদের প্রপঞ্চরাশি সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। প্রপঞ্চরাশি সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের এই অংশকেই জোলা মনে করেন উপন্যাসিকের আবিষ্কার ও প্রতিভার অংশ। জোলা বলেন, প্রকৃতবাদী উপন্যাসিক যখন নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তখন তিনি প্রকৃতি থেকে সরে না গিয়েও প্রকৃতিকে সংশোধিত করেন।[৭৮] নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে চলতে হয়, তবে এতে প্রকৃতবাদী লেখক শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েন না এবং স্রষ্টা হিশেবে তাঁর ভূমিকাও গৌণ হয়ে যায় না, বরং অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। কেননা সরলতম নিরীক্ষাও কোনো-না-কোনো ভাবনাচিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতবাদী উপন্যাসিক শৃঙ্খলিত নন, কারণ তাঁর নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি তাঁকে চিন্তাবিদ হিশেবে সমস্ত প্রতিভা প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়। তাঁকে উপাত্তরাশি পর্যবেক্ষণ করতে হয়, অনুধাবন করতে হয় এবং আবিষ্কার করতে হয়। নিরীক্ষাবাদীকে একজন খাঁটি সংশয়বাদী হিশেবে চিহ্নিত করেছেন বার্নার্ড। নিরীক্ষক কোনো পূর্বধারণায় বিশ্বাস পোষণ করেন না, কোনো ভাষ্যেও তাঁর আস্থা নেই, তিনি আস্থা পোষণ করেন শুধু নিরীক্ষালব্ধ ফলাফলে। জোলাও মনে করেন যে প্রকৃতবাদী উপন্যাসিক হবেন সংশয়বাদী। তিনি পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করেন, এবং নিরীক্ষালব্ধ ফলাফলেই শুধু আস্থা পোষণ করেন। জোলা বলেন:

> '... their whole task begins in the doubt which they hold concerning obscure truths, inexplicable phenomena, untill on experiemental idea suddenly arouses their genius and imples them to make an experiment, in order to analyze the facts and become master of them.'[৭৯]

---

৭৮. Ibid, P. 168.

৭৯. Ibid, P. 169.

Dhaka University Institutional Repository

-জোলা নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে উপন্যাসকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে চাইলেও উপন্যাসে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন না। জোলা এমন সংশয়ও পোষণ করেন যে প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক বিজ্ঞানীর মতো নিরীক্ষার সাহায্যে সত্যসন্ধান করলেও পদার্থবিদ্যা রসায়নশাস্ত্র এমনকি চিকিৎসাবিদ্যায় নিরীক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে যতোটা নিশ্চিত হওয়া যায়, উপন্যাসে ততোটা হওয়া সম্ভব নয়। সর্বাংশে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার চেষ্টা চালালেও উপন্যাস যে সর্বাংশে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের মতো বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারবে এমন বিশ্বাসও জোলা পোষণ করেন নি। তিনি বলেন: 'আমরা রসায়নবিদ বা পদার্থবিদ কিংবা শারীরবিদ নই। আমরা সেই ঔপন্যাসিক যাঁরা বিজ্ঞানপ্রেমিক বা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের এমন কোনো ভান নেই যে আমরা শারীরবিদ্যার ক্ষেত্রে কিছু আবিষ্কার করব। কারণ আমরা এর চর্চা করিনা, আমাদের অধ্যয়নের বিষয় মানুষ। তবে আমরা এটুকু বলতে চাই যে মানুষ নিয়ে কাজ করার সময় আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা এই নতুন শারীরতাত্ত্বিক সত্যকে এড়াতে পারিনা।'[৮০] জোলা উপন্যাসে নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহারের কারণও ব্যাখ্যা করেন। উপন্যাসে এ-পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রার যুগে উপন্যাস আর সনাতন গল্প বর্ণনা মাত্র হয়ে নেই, এখন বিবিধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মতো উপন্যাসও হয়ে উঠেছে মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে একরকম অনুসন্ধান। নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি সে অনুসন্ধানের সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি। জোলার মতে উপন্যাসে নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ হচ্ছে যে এ পদ্ধতিটি মানুষ ও প্রকৃতি অনুসন্ধানের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। কোনো প্রপঞ্চ 'কেন' ঘটে আর 'কীভাবে' ঘটে, তার মধ্যে প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যা করেন 'কীভাবে' ঘটে সে-ব্যাপারটি। জোলার মতে প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক প্রপঞ্চের 'কেন' নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না, 'কী-ভাবে' নিয়ে ব্যাপৃত থাকবেন। তাঁর মতে, 'কেন' ব্যাখ্যার দায়িত্ব ঔপন্যাসিকের নয়, দার্শনিকের।

জোলার মতে নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিকতা। এখানে ব্যক্তিগত আবেগ-কল্পনার কোনো গুরুত্ব নেই, এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সূত্রাশি ও নিরীক্ষা। প্রাকৃতবাদী লেখক

---

৮০. Ibid, p. 167

Dhaka University Institutional Repository

নিরীক্ষক বিজ্ঞানীর মতো নৈর্ব্যক্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করেন প্রপঞ্চরাশিকে।[৮১] ঔপন্যাসিকের ভূমিকা এখানে একজন স্টেনোগ্রাফারের মতো, যিনি শুধু বিবরণ তৈরি করেন কিন্তু বিষয়টির ভালোমন্দ বিচার করেন না কিংবা কোনো উপসংহার টানেন না। কিংবা প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকের ভূমিকা হচ্ছে একজন বিজ্ঞানীর মতো যিনি ' Expose facts, goes clear to the end of an analysis without risking Synthesis ?[৮২] এখানে যেমন কল্পনার কোনো স্থান নেই, তেমনি ঘটনার চমৎকারিত্ব তৈরিও প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য বাস্তবতার উপস্থাপন। উপন্যাসে বাস্তবতার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিককে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার ভেজাল মেশাবার দরকার হয় না, তিনি বাস্তবতার সঙ্গে কিছু যোগ কিংবা বাস্তবতার কোনো উপাদান বিয়োগ করেন না। বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীর মতোই কোনো পূর্বধারণা দিয়ে পরিচালিত হন না প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক। পূর্বধারণাবশত তিনি কোনো কিছু তৈরি করেন না। জোলার মতে, প্রাকৃতবাদী লেখকের এসব কিছু করারই প্রয়োজন পড়ে না। কারণ বাস্তবতা নিজেই যথেষ্ট পরিমাণে সুন্দর ও মহৎ এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্ত সরবরাহ করার মতো সমৃদ্ধশালী। জোলা বলেন, ' Instead of imagining an adventure, complicating it , and arranging a series of Theatrical effects to lead to a final conclusion, we simply take from life the story of a being or group of beings whose acts we faithfully set down[৮৩] এ-কারণে প্রাকৃতবাদী রচনা হয়ে ওঠে একটি দলিল। জোলার মতে, যে-লেখক দলিল রচনায় নৈর্ব্যক্তিকতা ও বিবরণধর্মিতা যতোবেশি আয়ত্ত করতে সমর্থ হবেন তিনিই ততবেশি সফল প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকরূপে গণ্য হবেন। এ-শ্রেণীর রচনার সাফল্য নির্দেশিত হয় লেখক কতখানি যথাযথ পর্যবেক্ষণে সমর্থ হয়েছেন তার ওপর। প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক যথাযথ পর্যবেক্ষণ,

---

৮১. Ibid, pp. 185 - 188.

৮২. Zola. Emile, 'Naturalism in The Theatre' in DMLR, P. 208.

৮৩. Ibid, P. 207.

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ , ঘটনার যৌক্তিক শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সর্বদা যে সম্পূর্ণ জীবনকেই উপস্থাপিত করবেন এমন নয় , আদিঅন্ত সমন্বিত একটি গোটা জীবনের ইতিকথাই যে তাঁকে বলতে হবে এমনও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই , তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এশ্রেণীর রচনায় নরনারীর জীবনের কয়েকটি বছর বর্ণিত হয় । জোলা একে নির্দেশ করেছেন ' মানব ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ' বলে । একজন চিকিৎসক যেমন একটি শারীরকে বিশেষভাবে অধ্যয়নের সময় গভীর মনোযোগ দেন , তেমনি উপন্যাসিকও একই রকম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় পাত্রপাত্রীদের অধ্যয়ন করেন । তাই প্রাকৃতবাদী উপন্যাসিককে বিষয়বস্তুগত কোনো সীমা মেনে চলার দরকার পড়ে না । প্রাকৃতবাদী লেখক ইতিহাস রচনা করেন, শারীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব চর্চা করেন, কবিতার তুরীয় লোকে উত্তীর্ণ হন ; এবং বিচিত্র সব সমস্যা যেমন, রাজনীতিক-আর্থনীতিক-ধর্মীয় সমস্যাগুলো ও সামাজিক রীতি - নীতি ইত্যাদি অনুসন্ধান করেন । বলা যায় প্রকৃতি বা মানুষের সবকিছুই তাঁর ভূভাগ এবং জোলা মনে করেন এ-ভাবেই প্রাকৃতবাদী উপন্যাস বিজ্ঞানের মতো বিশ্বের প্রভু হয়ে উঠবে ।[৮৪]

জোলার প্রাকৃতবাদী তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণবাদী, আর এ-নিয়ন্ত্রণবাদও জোলা গ্রহণ করেন ক্লদ বার্নার্ডের তত্ত্ব থেকেই । জোলার মতে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে দুই শক্তি, একটি তার বংশগতি (heredity), অন্যটি তার প্রতিবেশ (environment)। বার্নার্ডের প্রভাবে জোলাও বিশ্বাস করেন যে মানুষ জড়বস্তু ও অন্যান্য প্রাণীদের মতোই প্রাকৃতিক সূত্রের অধীন । জোলার নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বের মূলকথা : মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির অধীন, স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা বা শক্তি তার নেই । নৈতিক বা ঐচ্ছিক কোনো স্বাধীনতাই তার নেই । মানুষ প্রকৃতির দুটি শক্তি- বংশগতি ও প্রতিবেশের ক্রীড়নক । তার নিজস্ব জীবন কিংবা মনোজগত ও কর্মজীবন কিছুই সে নিজে গড়ে নিতে পারে না , কারণ তার জীবন ও জগত নিয়ন্ত্রণ করে তার বংশগতি ও পরিবেশ ।[৮৫] জোলার আগে হিপোলিত তেইনও একই রকম নিয়ন্ত্রনবাদী-তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, যা আগেই আলোচিত হয়েছে । বার্নাড জড়বস্তু ও জীবন্ত প্রাণীকে একই প্রাকৃতিক

---

৮৪. Ibid, P. 207.

৮৫. Forester, Norman (ed.,) Ibid, P. 1190.

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রের অধীন বলে মনে করেন এবং মনে করেন যে এই দুয়ের ওপরই একই রকম নিরীক্ষা চালানো সম্ভব। তবে বার্নার্ডের মতে নিরীক্ষার সময় জড়বস্তু ও উচ্চতর জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে একই বিষয় বিবেচনা করা চলবে না। জড়বস্তু অচেতন পদার্থ; জড়বস্তুর নিরীক্ষার সময় তাই বিবেচনা করতে হয় তার একটি প্রতিবেশ। অর্থাৎ জড়বস্তুর ওপর নিরীক্ষা চালানোর সময় বিবেচনা করতে হয় তার বাহ্যিক প্রতিবেশ (external casmic miliea) । আর মানুষের ক্ষেত্রে বিবেচনার প্রয়োজন হয় দুটি প্রতিবেশ, একটি বাহ্যিক বা শরীর বহির্ভূত অন্যটি আভ্যন্তর বা শরীর অন্তর্গত।[৮৬] জোলা বার্নার্ডের এই নিয়ন্ত্রনবাদী তত্ত্ব গ্রহণ করেন। জোলা বলেন : 'All that we can say is that there is an absolute determinism for all human pnenomena. From that point of investigation is a duty.'[৮৭] জোলা মনে করেন মানুষের মননগত ও প্রবৃত্তিগত আচরণের ওপর বংশগতি বা উত্তরাধিকারের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি প্রতিবেশের প্রভাবকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কোনো ব্যক্তির ওপর প্রপঞ্চরাশির নিয়ন্ত্রন উদঘাটন করার সময় বার্নার্ড দেখিয়েছেন যে ব্যক্তির শরীর আভ্যন্তর প্রতিবেশ এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জোলা মনে করেন যে কোনো পরিবার বা একগোত্র মানুষকে বিচার করার জন্য তাদের শরীর আভ্যন্তর প্রতিবেশ (intra-organic environment) অধ্যয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক প্রতিবেশও (social envinonment) সমান গুরুত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হবে।[৮৮] জোলা বলেন:

> One day physiology will no doubt explain the mechanism of thought and the passions; We shall know now the individual machine of a man works, how he thinks, how he loves, how he goes from reason to passion to madness; but these phenomena, these data of the mechanism of the organs acting under the influence of the internal environment do not occur outside in isolation and in a vacuum.[89]

---

86. Zola. Emile, 'The Experimental Novel', DMLR, p. 170.
87. Ibid, p. 172.
88. Ibid, p. 173.
89. Ibid, pp. 173-174

Dhaka University Institutional Repository

জোলা মনে করেন সামাজিক প্রতিবেশকেও গুরুত্ব দিতে হবে, কারন মানুষ একাকী কিংবা স্বয়ম্ভূ নয়। সে সমাজে বাস করে, সমাজপরিবেশের মধ্যে থাকে। এই পরিবেশ তাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে নানা ভাবে। তাই ঔপন্যাসিকের কাছে সামাজিক প্রতিবেশ অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জোলা মনে করেন সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক প্রভাব অধ্যয়ন করা প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকের এক মহাকর্তব্য। জোলা বলেন, নিরীক্ষামূলক উপন্যাস হচ্ছে বংশানুক্রম ও সামাজিক প্রতিবেশে মানুষ অধ্যয়ন, এ-শ্রেণীর উপন্যাস দেখিয়ে দেয় মানুষ কীভাবে সামাজিক প্রতিবেশকে পরিবর্তিত করে এবং তার সঙ্গে নিজেও ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হয়।[১০] প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক বিমূর্ত পরাবৈদ্যিক মানুষের স্থলে প্রাকৃতমানুষ অধ্যয়নে আগ্রহী। এ-উপন্যাস শারীরিক ও রাসায়নিক সূত্রের বশবর্তী, ও প্রতিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃত মানুষকে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠতে চায় বিজ্ঞানমনস্ক।

জোলা তাঁর "Rougon - Macquart" উপন্যাসমালার ভূমিকায়ও এই বংশগতি ও পরিবেশের নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কাছে বংশগতি এমন এক অদৃশ্য সূত্র যা গাণিতিকভাবে একের পর অন্যকে গ্রথিত করে রাখে এবং প্রতিবেশ নিঃশব্দে ব্যক্তির ভেতর ঢুকিয়ে দেয় তার বিষ ওক্লেদ। এভাবে দুই পরাক্রমশালী শক্তি পুতুলের মতো নাচিয়ে চলে ব্যক্তিকে। সমাজের একটি পরিবার বা মানবশ্রেণীর একটি ছোটো গোষ্ঠী কী-ভাবে বংশপরম্পরায় সমাজে নিজেদের বিস্তৃত করে দিয়েছে জোলা এ-উপন্যাসমালায় তার ইতিকথা বলেছেন। এ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে কুড়িটি ব্যক্তি, যাদের আপাতদৃষ্টিতে খুবই বিসদৃশ বা সম্পর্কহীন বলে মনে হয়। মনে হয় এরা বিভিন্ন সময়ে জন্ম নেয়া ভিন্ন ও সম্পর্কহীন মানুষ, কিন্তু বিশ্লেষণের পর এ-সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এরা একে অন্যের সঙ্গে গভীর সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। জোলা দেখান বংশগতি হচ্ছে এই সম্পর্কসূত্র। তাঁর মতে ভরের মতো বংশগতিরও নিজস্ব সূত্র বা বিধি রয়েছে।[১১] জোলা মেজাজ ও প্রতিবেশ এ-দুটি বিষয়কে

---

১০. Ibid, pp. 174.

১১. Zola, Emile, 'On the Rougon Macquart series', in DMLR p. 160.

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষভাবে গ্রহণ করে বংশগতির সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা চালান; কেন না জোলার মতে এই সূত্রই আপাত-দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র এক পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মকে, পরস্পরের সঙ্গে গেঁথে রাখে। জোলা বলেন :'যখন আমি সম্পর্কের সবকটি সূত্র নিজের মুঠোয় পেয়েছি, যখন আমার হাতের মুঠোয় ধরা পড়েছে একটি সমগ্র সামাজিক জনগোষ্ঠী, তখন আমি দেখাতে চাই একটি ঐতিহাসিক যুগের পাত্রপাত্রী হিসেবে তারা কীভাবে ক্রিয়া করে।'[১২] জোলা একই সঙ্গে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের ব্যক্তিগত ঈপ্সা ও সমগ্র পরিবারটির সাধারণ চলিষ্ণুতা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, এবং দেখাতে চেয়েছেন এ-পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্ষুধা-অপরিসীম ক্ষুধা, যা সে যুগেরই সাধারণ প্রবণতা।

জোলার নিয়ন্ত্রণবাদীতত্ত্ব নিরাশাবাদী। তাই প্রকৃতবাদকে নিরাশাবাদী নিয়ন্ত্রণবাদ (Pessimistic determinism) বলা হয়। জোলা এবং অন্যান্য প্রাকৃতবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে মানুষ নিজের ভাগ্য গঠনে চরমভাবে বিফল। তাঁরা প্রতিটি ব্যক্তিকে গণ্য করতেন 'দাবার ঘুঁটি' হিসেবে। প্রাকৃতবাদী উপন্যাসে ' a Pawn on a chessboard ' পদটি বারবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। জোলা ও অন্যেরা বোধ করেছেন যে কোনো সচেতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে মানুষের পক্ষে সুখ অর্জন সম্ভব নয়, এবং নৈতিকতার কোনো পার্থিব বা অপার্থিব পুরস্কার নেই।[১৩] প্রাকৃতবাদীদের বিশ্ব নিরীশ্বর। তাঁরা বিশ্বাস করেন জড়-বস্তুর মতো মানুষও একই প্রাকৃতিক সূত্রের অধীন, তাই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকাই নেই। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে অন্ধ এক প্রাকৃতিক শক্তি এবং সবকিছুই কার্যকারণ সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের জন্য আছে এক অনৈতিক বিশ্ব, যেখানে শুভ নন্দিত হয় না বা অশুভ নিন্দিত ও দণ্ডিত হয় না, যেখানে ভালো কিংবা মন্দ কোনো কিছুরই মূল্য নেই। পৃথিবী সম্পর্কে আশা করার কিছু নেই, ঈশ্বর মৃত, মানুষ কেবল প্রবৃত্তির বশীভূত এবং প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র - এসবই প্রাকৃতবাদীদের নৈরাশ্যবাদী করে তোলে।[১৪]

---

১২. Ibid, p. 161.

১৩. Cowly, Malcolm, 'A Natural History of American Naturalism' in DMLR, p. 430.

১৪. Stormberg, Roland N. (ed.,) Realism Naturalism and symbolism, P. ?

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতবাদীর দৃষ্টিতে মানুষ একধরনের প্রাণী-যন্ত্র, যা চালিত হয় বংশগতি ও প্রতিবেশ নামক চালিকাশক্তি দ্বারা। প্রকৃতবাদী লেখক এক বিশেষ বংশগতি ও প্রতিবেশে তাঁর পাত্রপাত্রীদের স্থাপন করেন, নিরীক্ষা করেন পাত্রপাত্রীদের স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এবং বৈজ্ঞানিকের মতো নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার বিবরণ। এ-বিবরণই তাঁর উপন্যাস। জোলা মনে করেন বংশগতি ও প্রতিবেশের প্রভাব নির্দেশ কিংবা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ দিয়েই প্রাকৃতবাদী উপন্যাসিকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক একই সঙ্গে পালন করেন সংস্কারকের দায়িত্ব। জোলার মতে প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক একজন নিরীক্ষাবাদী নীতিবাদীও।[১৫] অর্থাৎ ব্যাধি নির্দেশ করেই তিনি দায়িত্ব শেষ করেন না, ব্যাধির কারণ অনুসন্ধানেও সচেষ্ট হন। এক্ষেত্রে তিনি একজন চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। শারীর-বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাকৃতিক প্রপঞ্চরাশিকে নিয়ন্ত্রণ ও তার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রপঞ্চ অধ্যয়ন করে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীর শুধু এটুকু জানলে চলে না যে কুইনিন জ্বর সারায়। তাঁকে জানতে হয় জ্বরটা কী আর কোন কুইনিনে তা সারবে? জোলা মনে করেন প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকের ভূমিকাও অনুরূপ। প্রাকৃতবাদী লেখকেরা নিরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়ে দেন বিশেষ সামাজিক প্রতিবেশে একটি বিশেষ প্রবৃত্তি কী-ভাবে কাজ করে। তাঁরা এই প্রবৃত্তিরূপী ব্যাধিটির কারণ অনুসন্ধান করেন, চিকিৎসার মাধ্যমে অন্তত এই ব্যাধির অপকারী ক্ষমতাটুকু নষ্ট করতে চান, ব্যাধি উপশমেরও চেষ্টা করেন। জোলা উপন্যাসের সামাজিক উপযোগিতায় বিশ্বাস করেন, শুধু বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য শিল্পসৃষ্টিতে তিনি বিশ্বাসী নন। জোলা বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকদের সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় স্থাপন করেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যেমন নানাক্ষেত্রে নানাভাবে কাজ করে সমাজের সেবা করে চলেছেন; জোলা মনে করেন ঔপন্যাসিকেরাও তেমনি তাঁদের মতোই সমাজকল্যাণে নিবেদিত সক্রিয় একশ্রেণীর বিজ্ঞানী। তিনি বলেন, যখন যথেষ্ট বিধি (Laws) জানা সম্ভব হবে তখন মানুষ আর তার পরিবেশকে ইচ্ছেমতো গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এভাবেই একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।[১৬]

---

১৫. Zola. Emile, 'The Experimental Novel' in DMLR, P. 179.

১৬. Walcutt, C.C, Ibid, P. 33.

Dhaka University Institutional Repository

জোলা মনে করেন পরিবেশকে যদি বদলে দেয়া যায় তবে মানুষকেও বদলে দেয়া সম্ভব হবে।[৯৭] জোলা মনে করেন এখানেই নিরীক্ষামূলক প্রাকৃতবাদী উপন্যাসের উপযোগিতা। জোলার মতে প্রাকৃতবাদী উপন্যাসিকেরা উপন্যাসে সমাজকল্যাণে নিবেদিত বিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেন বলেই তাঁদের সৃষ্টি অন্যান্যের রচনার মহৎ এবং এর উপযোগিতা অনেক বেশি। জোলা মনে করেন, যদি ভালো-মন্দের প্রভু হওয়া যায়, জীবন ও সমাজকে নিয়ন্ত্রন করা যায়, তাহলে এর মধ্য দিয়েই একদিন সমাজতন্ত্রের সকল সমস্যা সমাধান করা যাবে।[৯৮] জোলা প্রসঙ্গত প্রাকৃতবাদীদের নৈতিকতার সঙ্গে আদর্শবাদীদের নৈতিকতার পার্থক্য নির্দেশ করেন। এই দু-গোত্রের নৈতিকতার পার্থক্য নির্দেশ করে জোলা বলেন যে আদর্শবাদীরা নৈতিকতার খাতিরে মিথ্যাভাষণকে অপরিহার্য বলে জ্ঞানকরেন আর প্রাকৃতবাদীরা মনে করেন সত্যের অবিকল উপস্থাপনা ব্যতীত নীতিবাদী হওয়া অসম্ভব।[৯৯] মিথ্যে বলে পৃথিবীকে রঞ্জিত করার মতো ক্ষতিকর আর কিছুই নয় বলে জোলা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, প্রাকৃত-বাদী উপন্যাসিকেরা সাহিত্যকে আদর্শবাদী ও রোম্যান্টিকদের এই ভণ্ডামী থেকে মুক্ত করেছে। তিনি ঘোষণা করেন: 'আমরা জীবনের বিষাক্ত বিজ্ঞানশিক্ষা দিই, আমরা বাস্তবতার উন্নত পাঠ প্রদান করি। আমরা বৈজ্ঞানিক, বিশ্লেষণকারী এবং ব্যবচ্ছেদকারী।'[১০০]

প্রাকৃতবাদী লেখকদের অদৃষ্টবাদী বলেও অভিযুক্ত করা হয়। বিরুদ্ধবাদীরা অভিযোগ তোলেন যে প্রাকৃতবাদীরা যেহেতু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাসী নন, মানুষকে যেহেতু তাঁরা নিয়ন্ত্রিত প্রাণী বলে মনে করেন, তাই তাঁরা অদৃষ্টবাদী। বিরোধীপক্ষ আরো অভিযোগ করেন যে প্রাকৃতবাদীরা মানুষকে মানুষের স্তর থেকে পশুস্তরে নামিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের রচনায় মানুষ হয়ে ওঠে একগোত্র পশু, নিয়তি যাদের তাড়িয়ে

Wagenknecht, Edward. Cavalcade of American Novel

৯৭. (Original American publishers.(Holt, Rinehart and Winston Inc. U.S.A. 1952) p. 204.

৯৮. Zola, Emile, 'The Experimental Novel' in DMLR, p. 177

৯৯. Zola, Emile, 'Naturalism in the Theatre' in DMLR p. 209.

১০০. Ibid, p. 210.

Dhaka University Institutional Repository

ফিরে। জোলা এ-অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। জোলার মতে, প্রকৃতবাদীরা কোনোক্রমেই অদৃষ্টবাদী নন, তাঁরা নিয়ন্ত্রণবাদী। এ-দুটি এক ব্যাপার নয়।[১০১] বার্নার্ড অদৃষ্টবাদ ও নিয়ন্ত্রণবাদের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এ-ভাবে :

> Fatalism presupposes the necessary manifestation of a Phenomenon independent of its conditions, whereas determinism is the necessary condition of a phenomena, the manifestation of which is not forced. Once the search for the determinism of phenomena is posed as the fundamental principle of the experimental method, there is no more materialism, or spiritualism, or brute matter, or living matter; there are only phenomena whose conditions must be determined, that is, the circumstances which play the role of proximate cause in relation to the phenomena.[১০২]

জোলা গ্রহণ করেছেন এ-ব্যাখ্যা এবং এ ব্যাখ্যাটিই তিনি বিরোধীদের অভিযোগ খন্ডন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

---

১০১. Zola, Emile, 'The Experimental Novel' in DMLR, p. 179

১০২. Ibid, p. 180.

Dhaka University Institutional Repository

জোলা কী-ভাবে নিজের উপন্যাসে প্রাকৃতবাদী তত্ত্ব বাস্তবায়িত করেছেন, তা বিবেচনা করলে প্রাকৃতবাদের শিল্পরূপ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। জোলা প্রাকৃতবাদীতত্ত্বের বিস্ময়কর ব্যবহার করেছেন "Rougon-Macquart" উপন্যাস মালায়। এই উপন্যাসমালার অনেক আগে রচিত প্রথম উপন্যাস "Therese Raquin"-এও (১৮৬৭) জোলা নিরীক্ষাকারী বৈজ্ঞানিকের ভূমিকাই পালন করতে চেয়েছেন। Rougon-Macquart উপন্যাস মালার জোলা এবং "Therese Requin" -এর জোলার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে "Therese Raquin" রচনার সময় জোলার সামনে বার্নার্ডের নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির মতো কোনো পদ্ধতি ছিলো না, আর "Rougon - Macquart" উপন্যাসমালা রচিতই হয়েছে এ-তত্ত্ব প্রয়োগের উদ্দেশ্যে। তবে প্রথম উপন্যাসের ভূমিকায় জোলা একজন নিরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞানীর মতোই ব্যক্তির আচরণ অধ্যয়ন করার কথা ব্যক্ত করেন। জোলা বলেন :

> I have tried to study temperaments rather than characters. There is the whole book .... The loves of my two heroes are the satisfaction of a physical need; the murder they commit is a consequence of their adultry. Thus what I have been obliged to call their remorse is simply an organic disorder .... If one reads the novel with care he will see that each chapter is the study of an interesting physiological case.'১০৩

১০৩ . Walcutt. C.C. Ibid, pp 32 - 33.

Dhaka University Institutional Repository

জোলা মনে করেন মানসিক ব্যাপারগুলো প্রকৃতপক্ষে শারীর ব্যাপার বা ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। "Therese Raquin" উপন্যাসে যে-নিরীক্ষাপ্রবণ বিজ্ঞানী ঔপন্যাসিকের পরিচয় পাওয়া যায় তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে "Rougon - Macquart" উপন্যাসমালায়। জোলা এ-উপন্যাসমালায় লিপিবদ্ধ করেছেন ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অধীনে একটি পরিবারের ইতিবৃত্ত, যে পরিবারটি সেই ঐতিহাসিকযুগে সমাজের প্রতিস্তর এবং বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। কুড়িখণ্ডের এ-উপন্যাসমালায় বিধৃত হয়েছে Rougon-Macquart বংশের শক্তি ও ব্যাধির ইতিবৃত্ত। জোলা এ-উপন্যাসমালার প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এ-উপন্যাসমালায় তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র ও সম্পর্কহীন কুড়িজন ব্যক্তির গোপন সম্পর্কসূত্র উদ্‌ঘাটন। যে-পরিবারটিকে তিনি অধ্যয়ন করেছেন তার চারিত্র নির্দেশ করে তিনি বলেন যে এই পরিবারটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্ষুধা, যা ওই যুগেরই বৈশিষ্ট্য। জোলা শারীরতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক দু-দিকেই পরিবারটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, 'Physiologically the Rougon-Macquart revel the succession of maladies depending on disorders of nerve and blood which appear in a family as the result of an original organic "Lesion". Historically, then give a sort of cross section of the second empire.'[১০৪] কুড়িবছর পর এই গ্রন্থমালার শেষখণ্ডে কেন্দ্রীয় চরিত্র ডঃ পাস্কাল বংশগতিসূত্রটি নির্দেশ করেন এবং নির্দেশ করেন কীভাবে এই শক্তিটি বিচিত্ররূপে নিয়ন্ত্রণ করছে এই পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মকে। পাস্কাল এই বংশলতিকার বংশগতিসূত্রগুলোর তালিকা নির্দেশ করে কাজ শুরু করেন। পাস্কাল উপন্যাসগুলোর বর্ণনা শেষ করে উপসংহারে বলেন যে এই পরিবারটি বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার জন্য প্রচুর প্রামাণিক তথ্য জোগান দিতে সক্ষম।

তবে জোলা তাঁর এই উপন্যাসমালায় তত্ত্বপ্রয়োগে পুরো সফল হয়েছেন এমন নয়। জোলা মহান সংকল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা শুরু করলেও কুড়িখণ্ডের এই উপন্যাসমালা হয়ে উঠেছে একজন লেখকের

---

১০৪. Ibid, P. 34.

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনাপ্রতিভার চমৎকার নিদর্শন , তাতে নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-প্রবহমালা শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম হয়ে উঠেছে, বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ নয়। জোলা এ-উপন্যাসমালায় দেখাতে চেয়েছেন যে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে-সব ব্যাধি ও অসুস্থতা রয়েছে তা হচ্ছে ' merely the logical and inevitable results of their common ancestry', কিন্তু বিভিন্ন ব্যাধির প্রকৃত কারণ নির্দেশ ও ব্যাখ্যায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সমালোচকের মতে, ' Despite all the theory, such 'forces' simply do not exist in the Novel and so can not operate in their significant forms'.

জোলার সব উপন্যাসই যে বংশগতি তত্ত্ব শাসিত, তা নয়। জোলার <u>L' Assommoir</u> এবং <u>Germinal</u> উপন্যাসে বংশগতি তত্ত্বের উপস্থিতি সামান্য। Germinal উপন্যাসের প্রেক্ষাপট কয়লাখনি অঞ্চল। এ উপন্যাসের প্রধান এতিএন লাঁতিয়েরের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরাও কয়লাখনিতে প্রবেশ করে। সেখানে উৎপীড়ক স্বেচ্ছাচারী শাসক ও অবর্ণনীয় ক্ষুধার সঙ্গে ভয়াবহ দ্বন্দ্বরত খনি শ্রমিকদের জীবন দৃষ্টিগোচর হয়। দে দেখা যায় খনি শ্রমিকেরা মানবিকভাবে এতোই অবনতিগ্রস্ত যে তারা পশুর স্তরে নেমে গেছে, তাদের জীবনের ক্ষুধা ও বেঁচে থাকার জন্য কঠোর পরিশ্রম তাদের মন থেকে সকল মানবিক আবেগ শুষে নিয়েছে এবং পশু হয়ে উঠেছে তারা। এতিএন খনি শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে ধর্মঘট ডাকে, কিন্তু তাদের ধর্মঘট ব্যর্থ হয়। মালিকপক্ষ বর্ধিত বেতনের দাবি মেনে নেয়না। ক্ষুধার অসহনীয় পীড়ন নিয়ে পরাজিত শ্রমিকেরা খনিতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তাদের সামনে থাকে অন্ধকার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মাটি খুঁড়ে তারা যে কালো কয়লা তোলে তেমন কালো ও আশাহীন তাদের ভবিষ্যৎ। "জারমিনাল" একটি মহৎ উপন্যাস। তবে বংশগতিসূত্র নিয়ন্ত্রিত মানুষের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে বলে এটি মহান হয়ে ওঠেনি। প্রলেতারিয়দের প্রতিবেশ নিয়ন্ত্রিত জীবনের অসামান্য আলেখ্য হয়ে ওঠার কারণে এটি মহৎ। "জারমিনাল"কে গণ্য করা হয় এশতাব্দীর একটি প্রচন্ড ভয়াবহ ও অনুসন্ধানী উপন্যাস হিশেবে।[১০৫]

---

১০৫ . Ibid, pp. 35 - 37.

Dhaka University Institutional Repository

জোলা প্রবর্তিত প্রাকৃতবাদ তরুণ ফরাসি লেখকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বহু লেখক এ-ধারার সমর্থক হয়ে ওঠেন এবং রচনা করেন গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু প্রাকৃতবাদী উপন্যাস। জোলা পরবর্তী ফরাসি প্রাকৃতবাদী লেখকদের মধ্যে কার্ল উসমাঁ্যা (১৮৪৮-১৯০৭) ছিলেন একজন প্রধান লেখক। প্রথম জীবনে প্রাকৃতবাদের গভীর অনুরাগী উসমাঁ্যা জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে প্রাকৃতবাদে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। উনিশ শতকের আশির দশকে তিনি হয়ে ওঠেন প্রাকৃতবাদের প্রধান বিরোধী। উসমাঁ্যা প্রাকৃতবাদী তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা-ভাষ্য রচনা করেন তা জোলার মতামতেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। উসমাঁ্যা কিংবা অন্যান্যরা প্রাকৃতবাদী তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যাভাষ্য রচনায় উদ্যোগী হন নি, জোলা প্রবর্তিত তত্ত্বের অনুসরণে উপন্যাস রচনা করেছেন। উসমাঁ্যা প্রাকৃতবাদী লেখকের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন যে একজন প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক উপন্যাসে শবব্যবচ্ছেদকারীর ভূমিকা পালন করবেন। উসমাঁ্যা জোলার মতোই বিশ্বাস করেন যে প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক নর-নারীকে তার অধ্যয়নের বিষয় বলে গণ্য করবেন; তাদের সম্পর্ক, প্রেম ও ঘৃণা এবং বাস্তবতার ভালো ও মন্দ এ-দুটি মুখের দিকেই থাকবে প্রাকৃতবাদী লেখকের সমান দৃষ্টি। এসবের মধ্য দিয়ে তিনি সত্যকে প্রকাশ করবেন। তিনি মনে করেন অবিকৃত সত্য তুলে ধরার তাগিদেই ভালো-মন্দ সবকিছুর চিত্রনে একজন প্রাকৃতবাদী আগ্রহ লেখক বোধ করেন। প্রাকৃতবাদী লেখকের বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে উসমাঁ্যা বলেন, 'সবুজ ব্রন কিংবা গোলাপী-মাংসের মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য দেখি না। আমরা উভয়কেই স্পর্শ করি, কারণ এ-দুয়েরই অস্তিত্ব আছে। অতি উৎকৃষ্ট মানুষ যেমন প্রাকৃতবাদী লেখকের অধ্যয়নের বিষয়, তেমনি গেঁয়ো চাষাও তাঁর অধ্যয়নের বিষয়। ব্রন ও গোলাপী-মসৃন ত্বকের মতোই আমাদের সমাজে ছড়িয়ে আছে পতিতা রমণী ও সতী নারীরা। সতী নারীদের মতো এই পতিতা ভ্রষ্টা নারীও আমাদের অধ্যয়নের বিষয়। সমাজের যে-দুটি মুখ আছে, আমরা দুটিকেই দেখাই, কারণ আমরা বিশ্বাস করি দুটিই অধ্যয়নযোগ্য।'[১০৬] প্রাকৃতবাদী লেখকেরা পাপ, অশুভ ও কুৎসিতের উপস্থাপনাই অত্যানুআগ্রহী-বিরোধীদের এ-অভিযোগ খণ্ডন করেন উসমাঁ্যা। তিনি বলেন, প্রাকৃতবাদী লেখক কখনোই পুণ্যের চেয়ে পাপকে বেশি পছন্দ করে না, কিংবা নীতির চেয়ে দুর্নীতির প্রতি অধিক আকর্ষণবোধ করেন না। দুটোর প্রতিই রয়েছে তাঁর সমান আগ্রহ। উসমাঁ্যা রোম্যান্টিকদের ভাবালুতা ও অবাস্তব সৌন্দর্যবন্দনাকে আক্রমন করেন।

---

১০৬. Huysmans. J.-K, 'Emile Zola and L' Assommeir' in DMLR, p. 233.

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে, রোমান্টিকেরা যে-সব মানুষের উপস্থাপনা করে গেছেন তাদের রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। তাদের পুতুল বললেই বরং যথার্থ বলা হয়। অবাস্তব আবেগ এসব পুতুলকে চালিত করে এবং তারা এতোই সুন্দর যে কিছুতেই তাদের ওই সৌন্দর্যকে বাস্তব বলে মনে হয় না। উসমাঁ্যা বলেন, প্রাকৃতবাদ এইসব অবাস্তব অতিসৌন্দর্য ও ভাবালুতাকে অতিক্রম করতে চায়। রহস্যময় সুদূরে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষাও প্রাকৃতবাদীরা অর্থহীন গণ্য করেন। তাঁরা চান রূঢ় প্রাত্যহিক জীবনে জনতার ভীড়ে নেমে যেতে।

উসমাঁ্যা বলেন প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক সমাজসংস্কার বা সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য বিজ্ঞানীর মতোই সক্রিয় থাকেন। তিনি সমাজের কদর্য ও অন্ধকার দিকটিকে আলোতে নিয়ে আসেন, কারণ সমাজকে এই কদর্যব্যাধি থেকে তিনি মুক্ত করতে চান। জোলার মতো উসমাঁ্যাও মনে করেন যে এখানেই প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্ব। উসমাঁ্যা প্রাকৃতবাদ ও তারপূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদী ধারার তুলনামূলক আলোচনাও করেন। তিনি দেখান যে প্রাকৃতবাদ পূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদের চেয়ে অনেক বেশি সাহসী ও সৎ। কেননা বাস্তবতাবাদ সমাজের ঘা ও ব্যাধির কথা বললেও, তাকে তুলে ধরে ঔষধ ও ব্যান্ডেজ বাধা অবস্থায়, অর্থাৎ বীভৎস রূপকে জনগণের সামনে তুলে ধরে জনগণকে পীড়িত করতে চান না তাঁরা। কিন্তু প্রাকৃতবাদের লক্ষ্য হচ্ছে ওই ভয়ঙ্কর ঘা থেকে ঔষধ ও ব্যান্ডেজ সরিয়ে ফেলা এবং জনগণের কাছে তার ভয়াল গভীরতা প্রদর্শন করা। তিনি বলেন, এ-কারণেই তথাকথিত শোভনতার পক্ষপাতীদের কাছে প্রাকৃতবাদকে মনে হয় বিকর্ষণকারী ও অশ্লীল বর্ণনামাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতবাদীদের লক্ষ্য যে-কোনো মূল্যে সত্যকে তুলে ধরা। কিন্তু তাই বলে প্রাকৃতবাদ কোনো গোঁড়ামি কিংবা সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় না। জোলার মতো উসমাঁ্যাও মনে করেন প্রাকৃতবাদী লেখক বিজ্ঞানীরই সমগোত্রীয়। বিজ্ঞানী যেমন বিভিন্ন প্রপঞ্চ অধ্যয়ন করেন তেমনি প্রাকৃতবাদী লেখক নর-নারীকে বিষয় হিশেবে অধ্যয়ন করেন। যে-প্রবৃত্তি তাদের চালিত করে তারই ব্যাখ্যা করেন প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিক। প্রাকৃতবাদী রচনার নৈতিকতা প্রসঙ্গেও আলোকপাত করেন উসমাঁ্যা। তিনি বলেন, সৎ লেখাই হচ্ছে নৈতিক লেখা। প্রাকৃত-বাদী রচনা সৎ, কেননা তা সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত। প্রাকৃতবাদী উপন্যাস শুধুমাত্র সুদর্শন, যোগ্য তরুণ ও সনুত আঁখির ব্রীড়ানত আঙুল কামড়ানো রূপসী তরুণীর বিবাহের গল্প বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি বলেন,

---

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতবাদ হচ্ছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করা বাস্তবতার উপস্থাপন। এ-কারণেই তা নৈতিক রচনা। জোলা প্রদত্ত প্রকৃতবাদের সংজ্ঞার প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন যে প্রকৃতবাদ হচ্ছে 'the patient study of reality in which the whole is derived from the observation of details'[১০৭] যেহেতু সুপরিকল্পিত একটি কাহিনী বর্ণনা প্রকৃতবাদী লেখকের লক্ষ্য নয় তাই এ-উপন্যাস প্রথাগতভাবে সমাপ্ত হয় না। অন্যান্য বিনোদনমূলক উপন্যাসে বিবাহ অথবা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে উপন্যাস শেষ করার প্রথা প্রচলিত আছে, প্রকৃতবাদ এ-প্রথা অস্বীকার করে। কেন না বাস্তবতার বা সত্যের এমন পরিসমাপ্তি টানা যায় না। আবার উপন্যাসকে প্রচারধর্মী করে তোলারও বিরোধী। তিনি বলেন, 'art has nothing to do with political theories and social utopias; a novel is not a rostrum; a novel is not a sermon, and I think that an artist ought to avoid as the plague all such rubbishy verbiage'.[১০৮]

৩.৩ মার্কিন প্রকৃতবাদ

যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃতবাদী ধারার বিচিত্র বিকাশ ঘটে। ফরাসি প্রকৃতবাদীরা জোলাপ্রবর্তিত তত্ত্বের অনুসরণ করেন। তাঁরা এ ধারায় নতুন কোনো বিষয় বা নতুন কোনো তত্ত্ব যোগ করেন নি। জোলা নির্ধারিত পথ ধরেই তাঁরা চলেছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে জোলাপ্রবর্তিত ধারাটিতে নতুন নতুন উপাদান যোগ করেন মার্কিন লেখকেরা। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃতবাদের বিচিত্র বিকাশ ঘটে, তবে এর ভিত্তি এমিল জোলা প্রবর্তিত প্রকৃতবাদ।

---

১০৭. Ibid, pp. 232 - 235.

১০৮. Ibid, P. 234.

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব প্রবণতা অনুসারে মার্কিন লেখকেরা প্রাকৃতবাদকে দেন একটি মার্কিন রূপ। এখানে প্রাকৃতবাদের মার্কিন-রূপের পরিচয় দেয়া হলো।

মার্কিন প্রাকৃতবাদের ধারাটি ফ্র্যাংক নরিস (১৮৭০-১৯০২) হয়ে ড্রেইসারের প্রথমপর্বের রচনায় পরিপুষ্ট হয়, এবং তা ফারেলের মধ্য দিয়ে স্টেইনবেক পর্যন্ত প্রসারিত।[১০৯] নরিসের রচনায় প্রাকৃতবাদ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মূর্ত হয়ে ওঠে, তবে নরিসের আগে যে মার্কিন উপন্যাসিকের লেখায় প্রাকৃতবাদী প্রবণতা বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায় তিনি স্টেফান ক্রেন(১৮৭১-১৯০০)। ক্রেনের উপন্যাসে কিছু কিছু প্রাকৃতবাদী বৈশিষ্ট্য প্রথম প্রকাশ পায়। তবে তিনি পুরোপুরি প্রাকৃতবাদী নন। তাঁর রচনায় প্রাকৃতবাদী বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা বিশেষ এক সংকীর্ণ অর্থেই প্রাকৃতবাদ।[১১০] প্রথম গ্রন্থ "Maggie : A girl of the street" -এ ক্রেন প্রাকৃতবাদী নিয়ন্ত্রনবাদ ও জীবনের রূঢ় বাস্তবতার উপস্থাপক হলেও পরে তিনি প্রাকৃতবাদ থেকে দূরে সরে যান। তবে ক্রেনের রচনার মধ্যদিয়েই মার্কিন সাহিত্যে সর্বপ্রথম 'নিয়ন্ত্রনবাদী দর্শন' প্রবেশ করে। জোলা তাঁর উপন্যাসে যে নিয়ন্ত্রনবাদী তত্ত্ব রূপায়িত করেছেন তাকে ম্যালকম কাউলি 'নিরাশাবাদী নিয়ন্ত্রনবাদ' (Pessimistic Determinism) নামে অভিহিত করেন। এই নিরাশাবাদী নিয়ন্ত্রনবাদ মার্কিন প্রাকৃতবাদীরা গ্রহণ করেন। ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র এই দু- অঞ্চলের প্রাকৃতবাদীরাই মানুষকে গণ্য করেন 'দাবার ঘুঁটি, হিসেবে। তাঁদের উপন্যাসে' A Pawn on a chessboard ' এ-পদটি বারবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তাঁদের মতে, কোনো সচেতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে মানুষের পক্ষে সুখ অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রথাগত নৈতিকতাও তাঁরা ত্যাগ করেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে নৈতিকতার কোনো পার্থিব বা অপার্থিব পুরস্কার নেই।[১১১] মার্কিন প্রাকৃতবাদীদের রচনায় মানুষকে নির্দেশ করা হয় বিমূর্ত শক্তিরাশির অসহায় শিকাররূপে। ড্রেইসারের ভাষায় মানুষ হচ্ছে 'এমন শক্তির শিকার যার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রন নেই।'[১১২] মার্কিন প্রাকৃতবাদী উপন্যাসে বিমূর্ত শক্তিরাশির প্রচণ্ডতা, ব্যক্তির তুচ্ছতা ও অসহায়তার পরিচয় বিবৃত হয়েছে। মার্কিন প্রাকৃতবাদীরা নির্দেশ করেন যে বিমূর্ত শক্তিই (force)

---

১০৯. Cowley, Malcolm, 'A Natural History of American Naturalism' in <u>DMLR</u>, P. 429

১১০. Walcutt, C.C. Ibid, P. 66.

১১১. Cowley, Malcolm, Ibid, pp 429 - 430.

১১২. Ibid, P. 430.

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী এবং সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক, তার কাছে মানুষ তুচ্ছ, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিহীন পুতুল। মানুষ ওই বিমূর্ত শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই এখানে ব্যক্তির মানবিক দায়িত্ব বলে কিছু নেই। যে-কোনো পরিস্থিতিতে ব্যক্তির ভূমিকা নগণ্য। সকল মার্কিন প্রকৃতবাদীর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় যে তাঁরা সামাজিক বিধিবিধানকে গণ্য করতেন জৈবিক বা প্রাকৃতিক বিধান বলে। জ্যাক লণ্ডন (১৮৭৬-১৯১৬) বিশ্বাস করতেন যে মানবিক ঘটনারাশি বা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার চালিকা শক্তি হচ্ছে এই প্রাকৃতিক বিধিবিধান সমূহ। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি জগত যে জৈবিক সূত্রে শাসিত এবং প্রকৃতিজগতে যে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের বিধান রয়েছে, মানবসমাজেও সেই একই বিধান প্রচলিত। ফ্র্যাংক নরিস বিমূর্ত শক্তির প্রচণ্ডতা বর্ণনা করেছেন "MC Teague" (১৮৯৯), "The octopus" (১৯০১), "The Pit" (১৯০৩) ও অন্যান্য উপন্যাসে। নরিস তাঁর উপন্যাসে এই শক্তিরাশির প্রচণ্ডতা ও ব্যক্তির তুচ্ছতাকে চরমে নিয়ে যান। "MC Teague" উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ম্যাকটিগ। সে নিয়ন্ত্রিত বংশগতি ও পরিস্থিতিগত শক্তির দ্বারা। "The Octopus" ও "The Pit" উপন্যাসে মধ্যাকর্ষণ শক্তির মতোই বিমূর্ত ও অতিমানবিক শক্তির ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে। এই শক্তির প্রতীক হয়ে এসেছে 'গম' ও 'রেলপথ'। এখানে গম নিজেই একটি শক্তি (force)। মধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো গমও এখানে হয়ে উঠেছে 'an abstract and elemental force'।[১১৩] রেলপথ দেখা দিয়েছে নির্মম মহাশক্তিরূপে। এই রেলপথরূপ অক্টোপাস তার শুঁড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলে মানুষের জীবন ও তার ভাগ্যকে। এই সর্বশক্তিমানের ক্রীড়নক হয়ে ওঠে মানুষ। নরিস "অক্টোপাস" উপন্যাসের উপান্ত পরিচ্ছেদে বলেন, 'মানুষ কিছুই নয়, মানুষ পশুমাত্র এবং ক্ষণায়ু এক পশু। তারা প্রত্যুষ ও প্রদোষের মধ্যে ওঠে, পড়ে এবং বিলীন হয়ে যায়।' তিনি বলেন কিন্তু ওই বিমূর্ত শক্তিরাশি অবিনশ্বর। এই শক্তিই তার খেয়ালখুশিমতো মানুষকে পৃথিবীতে এনেছে এবং প্রয়োজনে সে তাকে উৎপাটিত করারও শক্তি রাখে। তিনি বলেন 'মানুষ ছিলো না, জীবন ছিলো না, শুধু ছিলো বিমূর্ত শক্তি। এই শক্তিই মানুষকে পৃথিবীতে এনেছে।'[১১৪] নরিস তাঁর এই ট্রিওলজিতে দেখান যে

---

১১৩. Ibid, pp. 433 - 434

১১৪. উদ্ধৃত, Cowley, Malcolm, Ibid, P. 430.

Dhaka University Institutional Repository

এমন কি রেলপথের প্রেসিডেন্ট শেলগ্রিমও আর ব্যক্তি বিশেষ থাকে না, হয়ে ওঠে অতিমানবিক শক্তির প্রতিনিধি। আর প্রকৃতি হয়ে ওঠে নির্মম মহাশক্তি :

> There was no malevolence in Nature, colossal indifference only, a vast trend toward appointed goals. Nature was, then, a gigantic engine, a vast, cyclopean power, huge, terrible, a liviathan with a heart of steel, knowing no compunction, no forgiveness, no tolerance; crushing out the human atom standing in its way, with nirvanic calm.[১১৫]

স্টেফেন ক্রেনও প্রকৃতি সম্পর্কে একই মনোভঙ্গী ব্যক্ত করেছেন। ক্রেনের "The open Boat" -এ জাহাজডুবির ফলে বিপন্ন চারজন মানুষ একটি ছোট নৌকায় করে মধ্যসমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে ভেসে আসে। কিন্তু তীরের কাছে এসেও তারা তীরভূমিতে নামতে পারে না। কারণ উইন্ডমিলের চূর্ণন যন্ত্রগুলো তাদের পথ-রোধ করে দাঁড়ায়। ওই অসহায় বিপন্ন মানুষের দৃষ্টিতে উইন্ডমিলটি প্রতীয়মান হয় :

> a giant standing with its back to the plight of the ants. It represented in a degree, to the correspondent, the serenity of nature amid the struggles of the individual — nature in the wind, and nature in the visions of men. She did not seem cruel to him, then, nor beneficent, nor treacherous, nor wise. But she was indifferent, flatly indifferent.[১১৬]

---

১১৫. উদ্ধৃত , Ibid, 435.
১১৬. উদ্ধৃত , Ibid, 435.

Dhaka University Institutional Repository

তবে মার্কিন প্রাকৃতবাদীরা ব্যক্তি সম্পর্কে হতাশাবাদী হলেও সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। নরিসও ছিলেন ব্যক্তি সম্পর্কে হতাশাবাদী কিন্তু মানবজাতি সম্পর্কে প্রবল আশাবাদী। জোলা মানবজাতির উৎকর্ষ-লাভে ও সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই উৎকর্ষ ও সম্ভাবনাকে জোলা বলেছেন 'সত্যের দিকে ধারাবাহিক অগ্রসরণ'।[১১৭] নরিসও একই বিশ্বাস পোষণ করেছেন। "অক্টোপাস" উপন্যাসের শেষে তাঁর এ-বিশ্বাসই ব্যক্ত হয়েছে :

> The individual suffers, but the race goese on, bad Annixter dies, but in a far distant corner of the world a thousand lives are saved. The larger view always and through all shams, all wickednesses, discovers the truth that will, in the end, prevail, and all things, surely, inevetably, resistlessly work together for good.'[১১৮]

---

১১৭. উদ্ধৃত, Ibid, P. 430.

১১৮. উদ্ধৃত, Ibid, P. 430.

Dhaka University Institutional Repository

নরিসের আশাবাদের মধ্যে মানবজাতির প্রগতি সম্পর্কে যেমন স্পেনসারের বিশ্বাস ও এমার্সনের আদর্শবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, তেমনি প্রতিফলিত হতে দেখা যায় মানবজাতি সম্পর্কে জোলার ধারণা ও বিশ্বাস।

মার্কিন প্রকৃতবাদীরা তাঁদের উপন্যাসে বংশগতি ও প্রতিবেশের প্রভাব তীব্রভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের অধিকাংশ চরিত্রই বর্বর, পাশবিক, এবং তাঁরা এর মূলে দেখিয়েছেন বংশগতিকে। যেমন, নরিস তাঁর "MC Teague" উপন্যাসের নায়ক ম্যাকটিগের বর্বরতা ব্যাখ্যা করেছেন এ-ভাবে:

> Below the fine fabric of all that was good in him, ran the foul stream of hereditary evil, like a sewer. The vices and sins of his father and of his father's father, to the third and fourth and five hundredth generation, tainted him. The evil of an entire race flowed in his veins, Why should it be ? He id not desire it. Was he to blame ?[১১৯]

মার্কিন প্রকৃতবাদীরা প্রতিবেশগত শক্তির ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্রেন এই প্রতিবেশ নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্তই বিবৃত করেছেন <u>Maggie : A Girl of the street</u> উপন্যাসে। ক্রেন বলেছেন, '..... it tries to show that environment is a tremendous thing and often shapes lives regardlessly. It I could prove that theory, I would make room in Heaven for all sorts of souls (Notably an occasional street girl) who are not confidently expected to be there by many excellent people.'[১২০]

---

১১৯. উদ্ধৃত, Ibid, P. 431.

১২০. উদ্ধৃত, Ibid, P. 431.

Dhaka University Institutional Repository

নরিসের ম্যাকটিগ্ অশুভ বংশগতির শিকার, আর ক্রেনের ম্যাগি শিকার প্রতিবেশের।

প্রাকৃতবাদী দৃষ্টিতে মানুষ 'মানব-পশু' মাত্র। প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য এ-মানবপশুর পরিচয় তুলে ধরা। মার্কিন প্রাকৃতবাদীরা দেখান অস্তিত্বের তীব্র সংকটকালে অনুর্নিহিত এইপশুটি নগ্ন ও আসলরূপে প্রকাশিত হয়। মার্কিন প্রাকৃতবাদী উপন্যাসে দেখা যায় মারামারি, জাহাজডুবি কিংবা মেরুঅঞ্চলে দুর্গম অভিযান ইত্যাদি সঙ্কটকালে ব্যক্তির ওপর থেকে সভ্যতার সকল খোলস খুলে পড়ে এবং বেরিয়ে আসে নগ্ন ও অসভ্য পশুসত্তা। নরিসের ভাষায় সংকটকালে মানুষের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে 'নিজের ও সন্তানের জীবনের জন্য পাশবসংগ্রামের আদিম প্রবৃত্তি।'[১২১] তাই প্রাকৃতবাদী উপন্যাসে পাত্রদের যে-বিবর্তন ঘটে তাতে তাদের ক্রমউৎকর্ষ সাধিত হয় না, বরং সাধিত হয় ক্রম-অপকর্ষ। প্রাকৃতবাদী উপন্যাসে মানুষের বিবর্তন ঘটে ডারুউইনীয় বিবর্তনের বিপরীত দিকে। জোলা তাঁর "L' Assommair" ও "La Bite humaine" উপন্যাসে এ-ক্রমঅপকর্ষ সাধনের ইতিহাস রচনা করেছেন। নরিসও দেখিয়েছেন মানুষের ক্রমঅপকর্ষ। তার "Vandover and the Brute" উপন্যাসে এ-ব্যাপারটি চিত্রিত হয়েছে। প্রতিভাবান চিত্রকর ভ্যানডোভারের পরিণতি এমন :

> Through yielding to his lower instincts, vandover loses his humanity; he tears off his clothes, paddles up and down the room on his hands and feet and snarls like a dog.'[১২২]

---

১২১. উদ্ধৃত, Ibid, P. 432.

১২২. উদ্ধৃত, Cowley, Malcolm, Ibid, P. 432.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভাবন শিল্পী ভ্যানডেভোর পরিণত হয় কুকুরে। নরিসের প্রথমদিকের গল্প ' Lauth '-এর প্রধান চরিত্রটিও ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে বানর থেকে কুকুরে ও শেষে পশুরও নিম্নস্তরে নেমে যায়। তার বিবর্তন এমন :

> Lauth sinks back rapidly through the verious stages of evalution : he is an ape, then a dog, then finally "a horrible shapeless mass lying upon the floor. It lived, but lived not as the animals or the trees, but as the protoza, thejellyfish, and those strange lowest forms of existence wherein the line between vegetable and animal cannot be drawn,".[১২৩]

জ্যাক লণ্ডন (১৮৭৬–১৯১৬) এই ক্রম অপকর্ষের প্রক্রিয়াটিকে চরমে নিয়ে যান। তার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস <u>Martin Eden</u> -এ (১৯০৯) তিনি একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা দেন, তাতে দ্বন্দ্বরত ব্যক্তি দুটিকে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত মনে হয় না। তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে আদিমতম প্রকৃতি। বর্ণনাটি এমন :

> Then they fell upon each other, like young bulls, in all the glory of youth, iwth naked fists, with hatred, with desire to hurt, to maim, to destroy. All the painful, thousand years' gains of man in his

---

১২৩. Ibid, p. 432.

Dhaka University Institutional Repository

upward climb through creation were lost. only the electric light remained, a milestone on the path of the great human adventure. Martin and cheese-Face were two savages, of the stone age, of the squatting place and the tree refuge, They sank lower and lower into the muddy abyss, back into the dregs of the raw beginings of life, striving blindly and chemically, as atoms strive, as the star-dust of the heavens strives, colliding, recoiling and colliding again and eternally again.[১২৪]

জ্যাক লণ্ডনের 'men were atoms and stardust' শুধু একটি অভিধা নয়, এটি তাঁর দর্শনের মুলকথাও। হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করতেন যে সবকিছু সরলতা থেকে জটিলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, প্রাকৃতবাদীদের ধারণা এর বিপরীত। তাঁরা দেখান যে সবকিছু জটিলতা থেকে ক্রমশ সরলতার দিকে ক্রমরসায়ন প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে আসে। তাই তাঁদের রচনায় জাতি হয়ে ওঠে 'গোত্র', গোত্র হয়েওঠে 'দল

---

১২৪. উদ্ধৃত, Ibid, pp. 432 - 433.

Dhaka University Institutional Repository

সভ্যমানুষ হয়ে ওঠে বর্বর, বর্বর হয়ে ওঠে পশু এবং পশু পরিণত হয় রাসায়নিক উপাদানে।[১২৫] মার্কিন প্রাকৃতবাদীদের উপন্যাসে এই ক্রমঅপকর্ষ লাভের ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে।

মার্কিন প্রাকৃতবাদীরা জোলার বংশগতি ও প্রতিবেশতত্ত্বের সাথে যোগ করেন একটি নতুন বৈশিষ্ট্য। তাঁরা মনে করেন মানুষ বংশগতি ও প্রতিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঠিকই, তবে তারা আরো একটি শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রাণী বা প্রকৃতি জগতের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বিধিটি মানুষের জীবন ও মানবসমাজেও প্রযোজ্য বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মতে শুধু যোগ্যতমই টিকে থাকে ও সমাজকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। এ- বিশ্বাস থেকেই মার্কিন প্রাকৃতবাদীরা শক্তিশালী ও হিংস্রমানব চরিত্র চিত্রন করা শুরু করেন। জ্যাক লণ্ডনের উপন্যাসে পশ্চিম উপকূল বা সুমেরীয় এলাকার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত হয় মহামানব, নরিসের উপন্যাসে বর্ণিত হয় শক্তিশালী মহামানবীর বৃত্তান্ত, ড্রেইসারের উপন্যাসে ওই মহামানব উপস্থাপিত হয় ' Super-tycoon' রূপে। মার্কিন প্রাকৃতবাদীরা বিমূর্ত বিশ্বজাগতিক শক্তিকেই উপন্যাসে বর্বরশক্তি বা পাশবপ্রবৃত্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন। প্রাকৃতবাদী ধারার সবচেয়ে বিষণ্ন বিশ্বাস হচ্ছে মানুষ তার ভাগ্যের প্রভু নয়, শিকারমাত্র। এই মহামানবেরাও অদৃশ্য শক্তিরাশি দিয়ে পরাভূত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। লক্ষণীয় এই যে এ-সব মহানায়কেরা যে-সব শক্তিদ্বারা পরাভূত হয়- তাঁরা সে শক্তির সমতুল্য।[১২৬] পৃথিবী ও মানুষ সম্পর্কে মার্কিন প্রাকৃতবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী এরকম :

> The world is a jungle, where men grapple with one another for life and its accessories, murder (and are in turn muddered), fly after pleasure,

---

১২৫. Cowly, Malcolm, Ibid, P. 433.

১২৬. Hoffman, Frederick J. The modern Novel in America (1900 - 1950), (Henry Regnery company, Chiecago, U.S.A.1951) P. 39.

Dhaka University Institutional Repository

> and resign themselves with stoic calm to whatever pain they can not elude. Man's only duty is to discharge his energies ~~and~~ and die, at the same time expressing his individuality as best he can.'[১২৭]

তাঁদের মতে মানুষ সভ্যতার লঘু এক আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে অনুর্গত আদিম বর্বরকে।[১২৮] যে-কোনো প্রতিকূলতায়, অস্তিত্বের সঙ্কটের সময়ে এই ক্ষীণ আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে তার পাশবসত্তা। ব্যক্তি তার অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। লণ্ডনের বিভিন্ন উপন্যাসে যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্বের অসামান্য প্রয়োগ দেখা যায়। "The call of the wild"(১৯০৩)," White Fang" (১৯০৬) উপন্যাস এ-তত্ত্বের শিল্পিত রূপ।

মার্কিন প্রকৃতবাদীদের উপন্যাসে যে-মহামানব চিত্রিত হয়েছে, তারা আদিম পাশব শক্তিধর ব্যক্তি। তাদের নিয়ন্ত্রন করে বংশগতি, প্রতিবেশ, আর তারা প্রতিকূল প্রতিবেশের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করে রক্ষা করে অস্তিত্ব । লণ্ডনের মহামানব অমিত শারীরিক শক্তিসম্পন্ন বর্বর, যে শারীরিক যোগ্যতা দিয়ে বিরুদ্ধ প্রতিবেশকে পদাপিত করে টিকে থাকে। এই আদিম বর্বরের বিচরণ স্থান হচ্ছে তুষারাচ্ছন্ন ভয়াল মেরুঅঞ্চল, কিংবা বিশাল সমুদ্রবক্ষ, সভ্যসমাজ নয়। লণ্ডন মনে করেন, মহামানব আধুনিক সভ্যসমাজজীবনের অনুপযুক্ত। এখানে তার কিছুই করণীয় নেই। <u>The Sea-wolf</u> (১৯০৪) উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেন,

'...... The superman cannot be successful in modern life. The super-man is antisocial in his tendencies, and in these days of our complex society and sociology he cannot be successful in his hostile <u>aloofness ... he ac</u>ts like an irritant in the social body'.[১২৯]

১২৭ উদ্ধৃত· Walcutt. C.C. P. 92 - 93

১২৮. Ibid, P. 96.

১২৯. উদ্ধৃত, Walcutt, C.C. P. 112.

Dhaka University Institutional Repository

"The Sea wolf"- এ-মহামানবরূপে উপস্থাপিত হয় আদিম বর্বর পাশবশক্তিই। এ-উপন্যাসের Wolf Larsen -এর মধ্যে মূর্ত হয়েছে মহামানব বিষয়ক ধারণা। লারসেন প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী। তার শক্তি 'savage. ferocious, alive in itself the essence of life, in that it is the potency of motion, the elemental staff intself out of which the many forms of life have been moulded ... লারসেনের মানসিক গড়নও তার এই শারীরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তার মন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, সঙ্কল্পদৃঢ়, নির্মম ও মোহহীন। সে যোগ্যতমের উদ্বর্তনে বিশ্বাস করে। তার বিশ্বাস: 'The big eat the little that they may continue to move, the strong eat the weak that they may retain strength.'১০০ সে আদিম মানুষ, যার জন্ম হয়েছে সহস্র প্রজন্ম বিলম্বে। ড্রেইসার সৃষ্টি করেছেন পুঁজিবাদী ব্যবসায়িক সমাজের 'মহামানব'। যে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের এক অপরিহার্য হাতিয়ার। এই মহামানবের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তিনি "The Financier" (১৯১২), "The Titan" (১৯১৪) এবং "The stoic" (১৯৪৭) উপন্যাসে। ড্রেইসারের 'আর্থনীতিক মহামানব' পশুদের মতোই জানে অস্তিত্বরক্ষার অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পাঠ সমূহ। সে একের পর এক ব্যবসায়ে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, সাময়িক ব্যর্থতা এলেও দমে যায় না সে। বরং প্রতিপক্ষদের সঙ্গে লিপ্ত হয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার তীব্র সংঘর্ষে, শেষপর্যন্ত জয়লাভ করে নিয়ন্ত্রণে আনে বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য। প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করে সাফল্য লাভ করে, এবং হয়ে ওঠে মহামানব।

মার্কিন প্রকৃতবাদী উপন্যাসে প্রকৃতি, প্রাকৃতিকশক্তিরাশি, নিয়তি ইত্যাদি সম্পর্কে একগুচ্ছ পদ ও শব্দ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতবাদী উপন্যাসে 'The irony of fate', 'the pity of it', 'pawns of circumstance' পদগুলো বারবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বারংবার পুন-

---

১০০. Ibid, P. 108.

Dhaka University Institutional Repository

রাবৃত্তি ঘটেছে এ-সব শব্দের : Primitive, primordial, apelike, wolflike, brute, brutal, Savage, driving, conquering, blood, master, slave, blind instinct, ancestor, huge, cyclopean, shapeless, abyss, biological, hypocrisy, taboo, unmoral ইত্যাদি। মার্কিন প্রকৃতবাদীরা বারবার ব্যবহার করেছেন ' The law of claw and fang', 'the struggle for existence', 'the blood of his viking ancestors', ' the foul stream of hereditary evil' প্রভৃতি প্রকাশরীতি। এ-সব উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনুষ্যত্বের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ও সাদৃশ্য লুপ্ত হয়ে যায়, তারা পরিণত হয় ' রসাতলের পশুতে'। কিন্তু যখন তারা ' নগ্ন বর্বরের মতো পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন সবসময়ই দেখা যায় নায়কই ' শক্তিশালী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে' এবং পর্যুদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে অবজ্ঞাভরে লাথি ছুঁড়ে দখল করতে ছুটে যায় প্রতিপক্ষের সঙ্গিনীটিকে। উপন্যাসিকেরা কখনো কখনো তাদের পাঠককে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন যে এরজন্য এই সবকিছুর জন্য দায়ী কে ? তাঁরা এর উত্তর হিসেবে উপন্যাসে দেখান যে দায়ী পরিস্থিতি, মানুষ নয়।[১৩১]

মার্কিন প্রকৃতবাদীরা মেজাজ ও রুচিতে ছিলেন রোম্যান্টিক। নরিস প্রকৃতবাদের চর্চা করতেন এক-ধরণের রোমান্স হিসেবে। তিনি বলেছেন , কঠোর, নিষ্প্রেম, বিবর্ণ ও ভোঁতা হাউয়েলসের মতো বাস্তবতা-বাদের বদলে তিনি প্রকৃতবাদকে একধরণের রোমান্স হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ড্রেইসার তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় নিজের রোম্যান্টিক মেজাজের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বাস্তবতাবাদী হিসেবে তাঁর খ্যাতি থাকলেও তাঁর নিজের চোখে নিজেকে একজন রোম্যান্টিক বলেই মনে হয়। তিনি নিজেকে 'half-baked poet, romancer, dreamer' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যান্য প্রকৃতবাদীরাও ছিলেন একইরকম

---

১৩১. Cowly, Malcolm. Ibid, pp. 435 - 436.

Dhaka University Institutional Repository

রোমান্সপ্রবণ ও হুপ্রিক। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ' men were subject to natural forces, but they felt those forces were best displayed when they led to ... unlimited wealth, utter squalor, collective orgies, flood, and sudden death.'[১৩২] তবে জোলার মতো মার্কিন প্রকৃতবাদীরাও বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'বিশালত্ব'কে প্রাধান্য দেন। জোলার উপন্যাসে যেমন বিশাল প্রেক্ষাপটে দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত বৃহৎ ঘটনারাশি উপস্থাপিত হয়েছে, মার্কিন লেখকেরাও এমন বৃহদায়তন উপন্যাস লেখার দিকে মনোযোগী হন। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, তাঁরা পৃথক উপন্যাস লেখার বদলে ট্রিওলজি লেখার দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েন।

৩.৪ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী ধারা

বিশশতকে বাস্তবতাবাদের একগুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ। এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর তাত্ত্বিক কাঠামো রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের উদ্ভব ঘটে মার্কসবাদ থেকে। এ - সাহিত্যধারার তত্ত্বরচনায় শুধু লেখক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকেরাই ভূমিকা গ্রহণ করেন নি, মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এঙ্গেলস থেকে শুরু করে সব মার্কসবাদী তাত্ত্বিকই সাহিত্য তাত্ত্বিকের ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেন। তাঁদের মতামত অনুসারে এবং রাষ্ট্রীয় নেতা ও পার্টির নির্দেশে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে লেখকেরা বিপুল পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী রচনা সৃষ্টি করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদী ধারাটির ভিন্নতা রয়েছে। উনিশ শতকের

---

১৩২. Ibid, P. 439- 440.

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের বাস্তবতাবাদীদের রচনায় সমাজবাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটে। তবে সমাজবাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনা না করে অনেক ঔপন্যাসিক ওই সমাজের ক্লেদাক্ত অন্ধকার অংশ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমাজসমালোচনা করেন। তাঁরা বুর্জোয়া সমাজের নানা ক্রিয়াকলাপ ও এর কুৎসিত পীড়নমূলক দিকটি তুলে ধরেন এবং ওই সমাজের একটি শ্রেণীর ওপর সমাজের পীড়ন ও শোষণের স্বরূপ নির্দেশ করেন। সমাজসমালোচনামূলক এ-বাস্তবতাকেই Critical realism নামে অভিহিত করা হয়। এই

critical Realism -এর উপস্থাপনা ঘটেছে ব্যালজাক, তুর্গেনিভ, তলস্তয়, ফ্লবেয়ার প্রমুখের রচনায়। ক্রিটিক্যাল বাস্তবতাবাদীরা সমাজসমালোচনা করেন, তবে সমাজ কোন্ পথে সুষ্ঠু সুন্দর হয়ে উঠবে তা নির্দেশ করেন না। তাঁরা জীবন যে-রকম শুধু তা-ই অবিকল তুলে ধরেন, সমাজবাস্তবতা ও জীবন উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্বশাসিত নন তাঁরা। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে দুঃখদুর্দশাপূর্ণ বর্তমান জীবনবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাই বড়ো কথা নয়। এখানে দেখাতে হয় জীবন কোন্‌দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাবী সুন্দর ভবিষ্যতের পরিচয় এখানে তুলে ধরতে হয়, সংগ্রামী সর্বহারা শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী বিজয় নির্দেশ করতে হয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীদের লক্ষ্য 'the truthful, historically concrete representation of reality in its revolutionary development'[১৩৩]

বিশশতকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের উদ্ভব কোনো আকস্মিক ব্যাপার ছিলো না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী ধারাকে চিহ্নিত করা যায় উনিশ শতকের সর্বহারা সাহিত্যের উত্তরসূরী রূপে। অনেকে উনিশ শতকের সর্বহারা সাহিত্যকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের প্রথম ধাপ রূপে নির্দেশ করেন। উনিশশতকের সর্বহারা সাহিত্যের প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীদের রচনায়ও লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকে সর্বহারাদের মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়। এ-আন্দোলন বিশ্বইতিহাসে একটি নতুন

---

১৩৩. Becker, George J. (ed.,) <u>Documents of Modern Literary Realism</u> P. 21.

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক প্রপঞ্চ উপস্থিত করে। বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক জীবনের সকল এলাকায়ও এই নতুন ভাবনাচিন্তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আলোড়ন ও চাপ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দল, প্রকাশিত হতে থাকে সমাজতান্ত্রিক সংবাদ-পত্র। এই পটভূমিতে বিকাশ ঘটে সর্বহারা সাহিত্যের। এ-শ্রেণীর সাহিত্যে ক্রমশ বাস্তবতা সম্পর্কে এমন এক ধারণা সৃষ্টি হয়, যা পরে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ নামে অভিহিত হয়ে থাকে।[১৩৪] পণ্ডিতদের অনেকে অবশ্য মনে করেন উনিশ শতকে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রথম ইশতেহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ নামক নতুন শৈল্পিক ধারাটির সূত্রপাত ঘটে। এ-ভাবে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদকে ১৮৪৮-এর ইউ-রোপের বিপ্লবপর্বের সর্বহারা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। তাঁরা প্যারিস কমিউনের কবিদের রচনা, চার্টিস্ট আন্দোলনকারীদের সাহিত্য-কর্মকে চিহ্নিত করেন প্রথম সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী রচনা রূপে। এই সর্বহারা সাহিত্যকে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের পূর্বরূপ বলে গণ্য করেন না, বরং গণ্য করেন আদি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী রচনারূপে। অর্থাৎ তাঁরা দাবি করেন এ-শ্রেণীর রচনার মধ্যদিয়েই সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী ধারার সূত্রপাত। মার্কসীয় ভাবাদর্শের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এর উন্মেষ এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ায় এ-ধারার পরিপূর্ণ বিকাশ। কিন্তু মার্কসবাদের উন্মেষের সঙ্গে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের উন্মেষকে জড়িত করা সঙ্গত নয়। সোভিয়েট সাহিত্য-তাত্ত্বিক ইয়াকভ এল্সবার্গ (Yakov Elsberg) বলেন, 'মার্কসবাদের উন্মেষের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের উন্মেষকে জড়িত করা ভুল। ..... সে সময় সর্বহারার ভবিষ্যৎ বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিলো, কিন্তু সম্ভব ছিলো না বাস্তবতার গভীর ও ব্যাপক বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন।'[১৩৫] মার্কসবাদী ভাবাদর্শের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপ্লবী সর্বহারা সাহিত্য ধারা গড়ে ওঠে তাকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী ধারার পূর্বসূরীরূপে নির্দেশ করাই সঙ্গত। কারণ এই সর্বহারা সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের বহু প্রবণতা অসংবদ্ধরূপে উপস্থিত। সর্বহারা সাহিত্যের উপজীব্য ছিলো সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ। এ-সাহিত্যে উপস্থাপিত হয় একজন নতুন নায়ক

---

১৩৪. Markov, Dimtry, <u>Socialist Literatures; Problems of Development</u> (Raduga Publishers, Moscow 1978, English Translation 1984) P. 16.

১৩৫. উক্ত, Ibid, P. 16.

Dhaka University Institutional Repository

যে বিপ্লবী ও Proletarian socialist সর্বহারা সাহিত্য বাস্তবতা সম্পর্কে নতুন মৌলিক চেতনাও তুলে ধরে। এ-ব্যাপারগুলোই পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে সুসংবদ্ধরূপে তুলে ধরা হয়। সর্বহারা সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের আগ্রহে রচিত নয়, কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে এর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিলো না। বহুদেশের বিপ্লবী লেখকেরা কবিতা-গান-নকশা-প্রবন্ধে শ্রমজীবী শ্রেণীর দুর্দশাপূর্ণ জীবন ও তাদের বিপ্লবের অগ্রযাত্রার কথা বর্ণনা করেন। উচ্চভাবসমৃদ্ধ এই সর্বহারা সাহিত্যের বিকশিতরূপ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যধারা। সর্বহারা সাহিত্য ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যকে সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য-ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, কারণ দুয়েরই লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রকাশ। দমিত্রি মারকভ এই সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের উদ্ভব-বিকাশের চারিত্র্য নির্দেশ করেন এ-ভাবে, 'উন্মেষকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে একটি একক, অখন্ড প্রক্রিয়ায়, যাতে নন্দনতাত্ত্বিক পদ্ধতি হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা একটি বিশেষ সময়ে রূপলাভ করে। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে যখন প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূরণ করা হয় তখনই রূপলাভ করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।'[১৩৬] তাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ওপর আলোকপাতের আগে সর্বহারা সাহিত্যের উদ্ভব বিকাশ স্তর নির্দেশ ও চারিত্র নির্দেশ করা প্রয়োজন।

সর্বহারা সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে পশ্চিম ইউরোপে, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রভৃতি দেশগুলোতে এবং রাশিয়ায়। উনিশ শতকে সর্বহারা সাহিত্যের সূত্রপাত হয় চার্টিস্ট আন্দোলন ও প্যারিস কমিউনের বিপ্লবী কবিদের হাতে। ব্রিটেনের ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর চার্টিস্ট আন্দোলন ছিলো সংঘবদ্ধ শ্রমজীবীদের 'a mass revolutionary movement.'[৭] এঙ্গেলস এ- আন্দোলনের চরিত্র নির্দেশ করে বলেন 'the

---

১৩৬. Ibid, P. 117.

Dhaka University Institutional Repository

compact form of their opposition to the bourgeoisie' ১৩৭

১৮৪৮-এ ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হয়, ফ্রান্সের সর্বহারা বিপ্লবী শ্রেণীটিকে' প্যারিসকমিউন ' নামে অভিহিত করা হয়। ব্রিটেনের উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের চার্টিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী কবি ও ফ্রান্সের প্যারিস কমিউনের বিপ্লবী কবিরা প্রচুর সর্বহারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সর্বহারা সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে কবিতা। এ-দুটি আন্দোলনের লেখকেরা শ্রমজীবীদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি করতে তৎপর হন। তাদের কাছে কবিতাকেই নিজেদের বিপ্লবী আবেগ ও উদ্দীপনা প্রকাশের যোগ্য মাধ্যম বলে প্রতীয়মান হয়। চার্টিস্ট আন্দোলন ও প্যারিস কমিউনের বিপ্লবী কবিরা রচনা করে চলেন বিপ্লবী উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা, তা স্বদেশের বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীকে যেমন উদ্দীপ্ত করে তেমনি বিশ্বের সংগ্রামী জনতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁরা তীব্র উদ্দীপনামূলক জ্বালাময়ী সঙ্গীত রচনার দিকেও মনোযোগী হন। শ্রমজীবীদের নিজস্ব সঙ্গীত রচনা করেন তারা। শুধু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সর্বহারা সাহিত্যেই কবিতা প্রাধান্য বিস্তার করে থাকেনি, রাশিয়ায় এবং অন্য দেশগুলোতেও কবিতা হয়ে ওঠে বিপ্লবী আবেগ প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। এসব কবিতায় কখনো শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব ও অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে, কখনো বিপ্লবের কঠিন পথে এগিয়ে যাবার সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে। চার্টিস্ট সাহিত্যের প্রধান স্রষ্টা হিসেবে গণ্য করা হয় আর্নেস্ট জোনসকে (Ernest Jones)। জোনসের কবিতা ও সঙ্গীতে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের গভীর প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জোনসকে গ্রেফতার করা হয়। কারাগারে বন্দী অবস্থায় নিজের রক্ত দিয়ে জোনস লেখেন তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা ' The New World '। জোনসের অন্যান্য রচনার মতো এ কবিতাটিতেও বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর বিজয় সম্পর্কে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। জোনস এবং অন্যান্য সর্বহারা সাহিত্যিকেরা ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবোধ করেছেন তাঁরা। বিশ্ব সর্বহারার অর্থনৈতিক মুক্তি ছিলো তাঁদের কাম্য। জোনসের কবিতায়ও এ-আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। চার্টিস্ট সাহিত্যের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি টমাস হুড (Tomas Hood)। টমাস হুড রচনা করেন বিপ্লবী শ্রমজীবীদের জাগরণ ও অগ্রযাত্রা সম্পর্কে তীব্র আবেগসমৃদ্ধ সঙ্গীত। হুড রচিত

---

১৩৭. উদ্ধৃত, Ibid, P. 18.

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমজীবী সঙ্গীত প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। সোভিয়েট বিপ্লবীরাও হুডের বিপ্লবী সঙ্গীত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, এমন কি প্রসিদ্ধ রুশ সাহিত্যতাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক চেরনিশেভস্কি তাঁর "What is to be done" -উপন্যাসেও হুডের কবিতার স্তবক উদ্ধৃত করেন। প্যারিস কমিউনের কবিদের মধ্যে Eugène pottier, jean clément, jules vallès প্রমুখ বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। Eugène Potlier রচিত 'The International ' শীর্ষক সঙ্গীতে শ্রমজীবী জনতার ' revolutionary solidarity ' বিলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়। এ- সঙ্গীতটি অচিরেই সমগ্র পৃথিবীর সর্বহারাদের সঙ্গীতে পরিণত হয়।[১৩৮] লেনিন Potlier -এর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন যে Potlier হচ্ছেন ' one of the greatest propagandists by song' ।'[১৩৯] জার্মানীতে George Herwegh, Ferdinand Freiligrath, George weerth প্রমুখ রচনা করেন উদ্দীপনামূলক বিপ্লবী কবিতা। দমিত্রি মারকভ জার্মান সর্বহারা সাহিত্যের চারিত্র্য নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন, ' This poetry filled with a sense of social commitment, rallied its readers to the struggle,' তবে জার্মান সর্বহারা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে প্রধানত weerth -এর কবিতাবলী। এঙ্গেলস এ কবিকে চিহ্নিত করেন ' the first and most significant poet of the German proletariat' বলে।[১৪০]

দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত দেশগুলোতে সর্বহারা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে উনিশ শতকের শেষ তিন দশক ও বিশ শতকের প্রথম বছর গুলোতে। বুলগেরিয়া, পোলান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে

---

১৩৮. Ibid, pp. 18 - 19.

১৩৯. উদ্ধৃত, Ibid, P. 19.

১৪০. উদ্ধৃত, Ibid, P. 19.

Dhaka University Institutional Repository

এ-সময় প্রগতিশীল Social Democratic পত্রিকাগুলো শ্রমজীবী শ্রেণীর ভাবাদর্শ প্রচার করা শুরু করে, লেখক ও সমালোচকেরাও এই ভাবাদর্শ প্রচারে এগিয়ে আসেন, এবং তাঁদের কর্মকাণ্ডের ফলে এ-সব অঞ্চলে একটি নতুন সাহিত্যিক প্রপঞ্চের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। এ-সব দেশের কবিরা রচনা করে চলেন চরম রাজনৈতিক কবিতা যাতে চড়াসুরে ঘোষিত হয় বিপ্লবী শ্রমজীবীদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের কথা। কবিতার পাশাপাশি রচিত হতে থাকে গল্প-নকশা-রাজনীতিক প্রবন্ধ। শ্রমজীবী শ্রেণীটিকে মার্কসীয়তত্ত্বে দীক্ষিত করার জন্য সাহিত্যের এই সবকটি মাধ্যমকে এসব অঞ্চলের লেখকেরা ব্যবহার করে চলেন। তবে পশ্চিম ইউরোপের মতো শ্লাভদেশগুলোতেও প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে কবিতা ও বিপ্লবী সঙ্গীত। কবিতা ও সঙ্গীতে মাধ্যমে কবিরা রাজনীতিক ভাবধারা প্রচারে সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহবানও উচ্চারণ করে চলেন। প্যারিস কমিউনের কবি Eugine Potlier -এর লেখা 'The Internationale' সঙ্গীতটি যেমন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করে, শ্লাভ দেশগুলোর বিপ্লবী সঙ্গীত গুলোও তেমন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পোলাণ্ডে রচিত হয় বহু বিপ্লবী সঙ্গীত। এগুলোর মধ্যে 'Warsaw song', Red Banner' Mazurka in China', 'To the Barricade', 'May March' অত্যন্ত নন্দিত হয়। এ-বিপ্লবী সঙ্গীতগুলো শুধু পোলিশ শ্রমজীবীদের কাছেই নন্দিত হয় নি, রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণীটির কাছেও সমান জনপ্রিয়তা লাভ করে। বুলগেরিয়ায় সর্বহারা কবি Georgi Kirkov -এর লেখা Workers songs', 'March of the workers' প্রভৃতি সঙ্গীত উদ্দীপনামূলক বিপ্লবীসঙ্গীত হিসেবে মর্যাদা পায়। চেক ও রুশ সর্বহারা কবিরাও রচনা করে চলেন উদ্দীপনামূলক ও অনুপ্রেরণাদায়ক গণসঙ্গীত। এ-সব সঙ্গীতে অন্যান্য দেশের গণ সঙ্গীতের মতোই শ্রমজীবীদের বৈপ্লবিক বিজয়ের বার্তা ঘোষিত হয়, এবং তা বিপ্লবী সর্বহারাদের মিছিল, জনসভায় গীত হতে থাকে।

এই সর্বহারা বিপ্লবী সাহিত্যের কবিদের মূল লক্ষ্য ছিলো কবিতা ও সঙ্গীতে Proletarian internationalism-এর মূল ভাবটি ফুটিয়ে তোলা। তাঁরা দুনিয়ার বিপ্লবী শ্রমজীবীশ্রেণীর ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দেন এবং দুনিয়ার সকল শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান। তাঁরা আহবান করেন সরল সংক্ষিপ্ত বাক্যে, কখনো মূলবক্তব্যকে তুলে ধরেন সংহত, সাদাসিদে একটি বাক্যে, যা দুনিয়ার সকল শ্রমজীবীর কাছে গৃহীত হয় বিপ্লবী আবেগজ্ঞাপক শ্লোগানরূপে। চেক কবি Krapka-Nachodsky-র কবিতার একটি পংক্তি "Workers of the world, unite !'

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত শ্লোগানে পরিণত হয়। আরেক চেক কবি Josef Boleslave peeka -র একটি কবিতার শিরোনাম ' Let the song of Brotherhood Strike fear into the rich' -ও এমন জনপ্রিয় শ্লোগান হয়ে ওঠে।[১৪১] এই কবিতা ও সঙ্গীতে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সর্বহারাদের অগ্রযাত্রা ও বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্পর্কে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত হয়। পোলিশ কবি Waclaw Swiecicki -র ' warsaw song' কবিতায় প্রকাশিত হয় গভীর আশাবাদ ও বিপ্লব সম্পর্কে প্রবল আবেগোচ্ছ্বাস :

> But we shall rally roung the red Banner
>
> Stunchly and proudly to go into battle,
>
> Fight for the great cause of all working people,
>
> A better world, brotherhood, holy Freedom.[১৪২]

অনুবাদের মাধ্যমে এই বিপ্লবী রচনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পৃথিবীতে এবং হয়ে ওঠে দেশ নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল শ্রমজীবীর বিপ্লবী সঙ্গীত। প্রাগুক্ত দেশগুলোর সর্বহারা লেখকেরা কবিতা ও সঙ্গীতের পাশাপাশি নকশা ও গল্পও লিখে চলেন। গল্প ও নকশায় তাঁরা তুলে ধরেন বুর্জোয়া সমাজের দুর্দশা ও গ্লানির চিত্র, সেইসঙ্গে একটি নতুন, উন্নত ও মুক্ত সর্বহারা বিশ্বের ছবিও আঁকেন তাঁরা। অধিকাংশ লেখক ঝুঁকে পড়েন সংবাদপত্রে সামাজিক ও রাজনীতিক সুমন্ত রচনার দিকে। এ-মাধ্যমটিকে তাঁদের অনেকে বিপ্লবী ধারনা ও রাজনীতিকতত্ত্ব ও আদর্শ প্রচারের প্রধান মাধ্যম বলেও গণ্য করেন। পোলান্ডে উনিশ শতকের নব্বই-এর দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত সুমন্তরচনাকে সর্বহারা সাহিত্যের প্রধান ধারা বলে গণ্য করা হয়। সংবাদপত্রে রাজনীতিক সুমন্ত লেখার মধ্যদিয়ে অনেক বিপ্লবী রাজনীতিবিদ বিপ্লবী লেখকে পরিণত হন। যেমন বুলগেরিয়ার Social-Democratic workers Party -র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা Georg Kirkov

---

১৪১. Ibid, P. 21 - 22.

১৪২. উদ্ধৃত, Ibid, P. 23

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিক সুস্ত লেখার মধ্যদিয়েই লেখক হয়ে ওঠেন ।

সর্বহারা সাহিত্য ছিলো প্রচারধর্মী । এ-ধারার কবিরা চরম রাজনীতিক কবিতা রচনা করেন । এ-শ্রেণীর কবিতায় কখনো শ্রেণীবিদ্বেষ জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কখনো কবিরা সংঘবদ্ধ বিপ্লবী সর্বহারাদের শক্তি ও অব্যাহত অগ্রযাত্রার কথা চড়াসুরে ব্যক্ত করেছেন, কখনো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করা হয়েছে । সর্বহারা সাহিত্য প্রচারধর্মী হবার কারণ এ-সাহিত্য উদ্ভূত হয় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের উন্মেষকালে । মার্কসীয় চিন্তাধারা ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিস্তারের ওই প্রথম পর্যায়ে সর্বহারা সাহিত্যের প্রধান কাজ ছিলো শ্রমজীবীশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে তোলা । এ-কারণেই এ-সাহিত্যকে হতে হয় উগ্র ও প্রচারধর্মী । বিভিন্ন দেশের সর্বহারা লেখকদের প্রত্যেকেই নিজের দেশের শ্রমিক সংগঠন ও Social-Democratic আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন । তাঁদের লেখায় আবির্ভূত হয় নতুন সর্বহারা নায়ক যাদের ভাবনা-মতাদর্শ-আবেগ-বেদনা নতুন । সর্বহারা সাহিত্যে জীবনের বিস্তৃত বাস্তবতা উপস্থাপিত হয় নি, শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জয়গান করা হয়েছে । তাই সর্বহারা সাহিত্যকে সাহিত্যের নতুন ধারা বিকাশের প্রথম ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় । S. M. Patrov -এর মতে ' বিভিন্ন দেশের এই সর্বহারা সাহিত্যই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ । '[১৪৩] এই সর্বহারা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীলতার নতুন ধারার বিকাশ ঘটে । এ-সাহিত্যে সমকালীন সমাজব্যবস্থার সমালোচনার পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার চিত্রন করা হয় । তবে বিষয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সর্বহারা সাহিত্য নতুন ধারার সূত্রপাত করে নি, এ-সাহিত্যে নতুন সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শ কামনা করা হয় । যদিও সেসময় এ-আদর্শ সুদূর ছিলো, তবে সমাজতান্ত্রিক

---

১৪৩ . উদ্ধৃত, Ibid, P. 19.

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ কামনার মধ্য দিয়েই এ-সাহিত্য নুতন ধারার সুত্রপাত করে। এ-সাহিত্যে 'আদর্শ'কে বিভিন্ন প্রতীক, রূপক ও কল্পিতার সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং এ-সবের সাহায্যে একপ্রবল বিপ্লবাত্মক ভাবালুতা- আবেগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবপূর্ব সর্বহারা সাহিত্য এই অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ভাবালুতা -উচ্ছ্বাস ধারণ করে আছে। রুশবিপ্লব পরবর্তী সর্বহারা সাহিত্যে যে এই ভাবালুতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত হয়ে যায় এমন নয়, তবে আবেগের তীব্র উচ্ছ্বাস কমে আসতে থাকে, এবং ক্রমশ দেখা যায় এ-সাহিত্য এক নতুন ধরণের বাস্তবতা উপস্থাপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বাস্তবতা উপস্থাপনার ব্যাপারটি বিশ শতকের ত্রিশের দশকের আগে ঘটেনি।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব ও বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর বিজয় শ্লাভ দেশগুলোতে গভীর প্রভাব ফেলে। রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণীর বিজয় তাদের নতুন বিপ্লবী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে, বিপ্লবী শ্রমজীবীদের অবশ্যম্ভাবী বিজয় ও সমাজ পরিবর্তনের শুভ পরিণাম সম্পর্কে আশাবাদী করে। এই দেশগুলো সামাজিক-রাজনীতিক - সাংস্কৃতিক সকল দিক দিয়েই সোভিয়েট দেশদ্বারা প্রভাবিত হয়। রাশিয়া তাদের কাছে গণ্য হতে থাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাতৃভূমিরূপে। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী বছরগুলোতে রাশিয়া ও অন্যান্য শ্লাভ দেশগুলো প্রবল আবেগসমৃদ্ধ বৈপ্লবিক সর্বহারা সাহিত্য রচিত হতে থাকে। এ-সময়ের সর্বহারা সাহিত্যেও প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে কবিতা ও কাব্যধর্মী রচনা। এ-সব কবিতায় বিধৃত হয় বিপ্লবের বিজয়োল্লাস ও বিপ্লব সম্পর্কে গভীর আবেগ। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব পূর্ববর্তী সর্বহারা সাহিত্যের বিষয় উপাদান ও বিপ্লব পরবর্তী সর্বহারা সাহিত্যের বিষয়বস্তু কিছুটা ভিন্ন ছিলো। বিপ্লব পূর্ববর্তী সর্বহারা কবিরা বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের পাশাপাশি মেহনতী শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান, বিপ্লবী সর্বহারাদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের কথাবলেন। বিপ্লবী পরবর্তী কবিরা মগ্ন হন বিপ্লবী বিজয়ী জনতার স্তব ও বিজয়োল্লাস প্রকাশে। সর্বহারাদের সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক বিজয় জনমনে তীব্র উদ্দীপনা জাগায়। সাহিত্যেও তারা আবেগ -উদ্দীপনা-বিজয়োল্লাসের প্রতিফলন দেখতে চায়। বিপ্লব পরবর্তী বছরগুলোতে একমাত্র কবিতার পক্ষেই সম্ভব হয় উল্লসিত আশাবাদী জনতার স্বপ্ন আবেগের যথাযথ উপস্থাপন; সুন্দর শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখানো ও বর্তমান ঐতিহাসিক সময়ের চেতনার উপস্থাপনা করায় সমর্থ হয় বলেই এ-সময় কবিতা প্রাধান্য বিস্তার করে। রাশিয়া ও শ্লাভ দেশগুলোতে এ-সময় কবিরা ঘুরে ফিরে প্রবল ভাবালুতাপূর্ণ তিনধরণের কবিতা রচনা করে চলেন; (ক) শাসক ও পরজীবীদের উদ্দেশ্য করে লেখা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, (খ) বিপ্লবী সর্বহারা বীরজনতার স্তব ও বন্দনামূলক কবিতা, (গ) রাজনীতিক ভাবাদর্শ

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার মূলক কবিতা।[১৪৪] এ- তিন শ্রেণীর কবিতার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে বিপ্লবী আবেগ সমৃদ্ধ বীরজনতার বন্দনামূলক কবিতাধারাটি। এসব কবিতায় কবিরা উপস্থাপন করেন এক নতুন নায়ককে। এ-নায়ক ব্যক্তি-বিশেষ নয়, সংঘবদ্ধ বিপ্লবীজনতা। সর্বহারা কবিরা শক্তিমান, সংঘবদ্ধ ও নবজাগ্রত শ্রেণীর মহত্ত্ব ও অপ্রতিরোধ্য অগ্রসরমানতার গাথা রচনা করে চলেন।

১৯১৭ সালের বিপ্লব পরবর্তী বছরগুলোতে রুশ বিপ্লবী সর্বহারা সাহিত্যের প্রধান কণ্ঠস্বর মায়াকোভস্কি। মায়াকোভস্কির কবিতায় বিপ্লবীসর্বহারাদের নতুন বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন, বিপ্লবী আবেগ ও সংঘবদ্ধ জনতার ঈপ্সা রূপায়িত হয়েছে। তাঁর কবিতায় নতুন সময়ের যে নতুন বীরের স্তব করা হয় সে একই সঙ্গে 'great, approachable, heroic and human' মায়াকোভস্কির চোখে এই মহানবীর রুশবিপ্লবী নেতা লেনিন। মায়াকোভস্কির পাশাপাশি রাশিয়ায় শক্তিমান দুর্নিবার বিপ্লবী জনতার বন্দনা করে চলেন আলেকজান্দার ব্লক (Alexander Blok), Valeri Bryusov, Demyon Bedny প্রমুখ কবি। স্লাভ দেশগুলোতেও এ-সময় রচিত হতে বিপ্লবী সংগ্রামী শ্রমজীবী জনতার বন্দনামূলক প্রচুর কবিতা। রাশিয়া এবং স্লাভ দেশগুলোর সর্বহারা কবিতায় এ-সময় প্রায় অভিন্ন চিত্রকল্প উপমা প্রতীক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সর্বত্রই বিপ্লবী জনতাকে চিহ্নিত করা হয় 'বিশাল' ও 'প্রচণ্ড' -এ-দুটি বিশেষণে। সর্বহারা কবিরা বিপ্লবী জনতাকে অভিহিত করেন 'Monolithic mass', 'Iron, radiant, resonant masses' প্রভৃতি অভিধায়। সংগ্রামী ও বিজয়ী বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীকে চিহ্নিত করার জন্য কবিরা ব্যবহার করেন প্রচুর 'বীরত্বব্যঞ্জক রোম্যানটিক বিষয়' ও চিত্রকল্প। এ-সময়ের কবিতায় ঝড়ের চিত্রকল্পটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীকে তুলনা করা হয়েছে উন্মত্ত ও অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের সঙ্গে। প্রায়শই সর্বহারা কবিরা চিত্রকল্প ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার জন্য প্রবেশ করেছেন পুরাণ ও ইতিহাসের জগতে। নানা রোম্যান্টিক চিত্রকল্প ও উপাদান গ্রহণের পাশাপাশি তাঁরা ধর্মীয় ও বাইবেল বর্ণিত চরিত্রদেরও নায়করূপে উপস্থাপিত করেন। তবে তাঁরা এসব চরিত্রের

---

১৪৪. Ibid, P. 123.

Dhaka University Institutional Repository

নবনির্মান করেন এবং চরিত্রগুলোকে করে তোলেন বিপ্লবী ভাবাদর্শের বাহক। রুশ বিপ্লবপরবর্তী সময়ে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্বহারা কবিরা ওই নতুন সম্পর্কের পরিচয়ও তুলে ধরেন। এই নতুন সময়ে ব্যক্তি শুধু একক ব্যক্তিসত্তারূপে গণ্য হয় না, ব্যক্তি ও সমষ্টি অচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। নতুন সময়ের এক নতুন নায়ককে উপস্থাপিত করেন তাঁরা। এই নায়ক সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রতীক। ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী জনতা ও এই নায়ক অভিন্ন। বিপ্লবী, অদম্য, অনমনীয় সর্বহারা জনতার বৈশিষ্ট্যগুলো তার মধ্যদিয়ে মূর্ত করে তোলা হয়। এখানে একটি দেহকাঠামোয় সমগ্র জনসত্তা উপস্থাপিত হয়। এ-প্রসঙ্গে মায়াকোভস্কি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'The whole of Russia is in one Ivan' তাঁর মতে সর্বহারা সাহিত্যের ব্যক্তিনায়ক মূলতঃ সমগ্রেরই 'প্রতীকী মূর্তরূপ'। এখানে 'আমি' প্রকৃতপক্ষে 'আমরা'রই সংহত রূপ।

সমালোচক দমিত্রি মারকভ এই সমাজতান্ত্রিক সর্বহারা সাহিত্যকে চিহ্নিত করেন 'Revolutionary Romanticism' বলে। এ-সাহিত্য বিপ্লবী সর্বহারাদের প্রথম বৈপ্লবিক পদক্ষেপের কথা বিধৃত করে, ঐক্যবদ্ধ সর্বহারা শ্রেণীর শক্তি ও অনমনীয়তার বন্দনা করে, বিপ্লবী শ্রমজীবীদের ভবিষ্যৎ বিজয় সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস ও আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং স্বপ্ন দেখে বৈপ্লবিক সমাজপরিবর্তন ও শোষণমুক্ত সুন্দর সমাজের। মারকভের মতে এই সর্বহারা সাহিত্যে আছে 'বীরত্বব্যঞ্জক রোম্যানটিক উদ্দীপনা' এবং ঐতিহাসিকভাবে নিয়ন্ত্রিত 'আশাবাদ'। তবে এই সর্বহারা সাহিত্যিকেরা আবেগ উচ্ছ্বাসেরই রূপায়ণ করে গেছেন। দমিত্রি মারকভ বলেন, 'Initially the writers grasped and sought to portray only the overall scale and range of the revolutionary struggle, the grandeur of the revolutionary movement, the new collective spirit'.[১৪৫] সমাজ ও জীবনবাস্তবতার বিস্তৃত চিত্র এখানে নেই, আছে ভাবালুতা, স্বপ্নচারিতা ও বিপ্লবী আবেগের উচ্চকণ্ঠ প্রকাশ।

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নেয় বিশের দশকে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরে বেশকিছু বছর ধরে সর্বহারা সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে কবিতা। ১৯২৩ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে সর্বহারা সাহিত্যে দেখা দেয় ব্যাপক বদল। এ-সময় ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে গদ্য সাহিত্য। এ-সময় বিপ্লবী লেখকেরা সমাজবাস্তবতার উপস্থাপনায় মনোযোগী হন এবং এ-সময় থেকেই সমাজতান্ত্রিক লেখকদের

---

১৪৫. Ibid, P. 140.

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গ্রহণ প্রবণতাটি বাঁক নিতে থাকে। তাঁরা ' actual incidents of the revolutionary situation ' -এর উপস্থাপনা শুরু করেন। এ-সময় গোর্কি, ফুরমানভ, সেরাফিমোভিচ, ফাদিয়েভ, শোলোকভ ও অন্যরা লিখতে থাকেন গুরুত্বপূর্ণ গদ্যসাহিত্য, আর মার্কসীয় তত্ত্বাদর্শের বাস্তবসম্মতরূপ মূর্তি লাভ করে। তাঁরা উপস্থাপিত করেন নতুন সময়ের একজন ' ধনাত্মক নায়ককে (Positive Hero)। এই গদ্যসাহিত্যের মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ বিকাশ লাভ করে। শ্লাভ দেশগুলোতেও ত্রিশের দশকে বিকাশ ঘটতে থাকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী গদ্য ধারার। ত্রিশের দশকে রাশিয়ায় যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের উদ্ভব ঘটে, তা ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবেরই ফলপরিণাম। ১৯১৭ -এর অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ছিলো মার্কসীয় -লেনিনীয় ভাবাদর্শের বিজয়। এ-বিজয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে উত্তীর্ণ করে দেয় নতুন যুগে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন মুক্তি পায় second International -এর সংস্কারবাদী ভাবাদর্শ (Reformist idea) থেকে; ক্রমশ রাশিয়ায় গৃহীত হয় লেনিনবাদী তত্ত্বাদর্শ। এ-সবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য পৌঁছে যায় নতুন সময়ে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখকেরা বাস্তবমনস্ক হলেও, রোম্যান্টিসিজম এ ধারার রচনা থেকে পরিত্যক্ত হয় নি। বরং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে রোম্যান্টিসিজম সংহত রূপে অবস্থান করতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে বৈপ্লবিক রোম্যান্টিসিজম ও বাস্তবতাবাদ এ-দুয়ের সহাবস্থান ঘটেছে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ সুগঠিত হয় ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট লেখকদের প্রথম কংগ্রেসের পর। এই প্রথম কংগ্রেস ছিলো সোভিয়েট লেখকদের একজাতীয় ঘটনা, একই সঙ্গে এই কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের চারিত্র্য নির্ধারণের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ও হয়ে উঠে। এই কংগ্রেসে একটি নতুন সাহিত্য ধারার নান্দনিক বিধিবিধানগুলো নির্ধারিত ও ঘোষিত হয়। ম্যাক্সিম গোর্কি ছিলেন এই ঐতিহাসিক বিধিবিধানের রচয়িতা। রাশিয়ায় ১৯৩৪ সালের সোভিয়েট লেখকদের প্রথম কংগ্রেস বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের বহু প্রতিনিধি যোগদান করে। এ-কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা লেখকদের সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বাদর্শ ভিত্তিক সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের বিপ্লবে ও বিপ্লবপরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দেয়, শ্লাভ দেশগুলোতেও কমিউনিস্ট পার্টিগুলোই বৈপ্লবিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে চলে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী ধারা পার্টির নির্দেশে ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে বিকশিত হতে থাকে। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে এ -সাহিত্য ধারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও (যেমন Socialist Realism, Social -

Dhaka University Institutional Repository

Realism, New Realism ইত্যাদি) এ-ধারার ভিত্তি ছিলো একই সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বাদর্শ। প্রথম কংগ্রেসের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ভিত্তি করে ও পার্টির নির্দেশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। সোভিয়েট লেখকদের প্রথম কংগ্রেস থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ বিধিবদ্ধ হতে থাকে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এর বিস্তার ঘটে।[১৪৫.ক] দমিত্রি মারকভের মতে, নন্দনতাত্ত্বিক পদ্ধতি হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ হঠাৎ জন্মায় নি, বরং বিশেষ একটি সময়ধরে এটি রূপ লাভ করেছে। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে এর উদ্ভব ঘটে।[১৪৬]

৩.৫ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী তত্ত্ব

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদকে এ-ধারার তাত্ত্বিক ও অনুসারীরা নতুন সময় ও সমাজের নিজস্ব সাহিত্যতত্ত্ব বলে নির্দেশ করে থাকেন। তাঁদের মতে সভ্যতার ইতিহাসের প্রতিটি স্তরের যেমন নিজস্ব সাহিত্য ছিলো, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ তেমনি নতুন সমাজতান্ত্রিক যুগের মুখপাত্র। বুলগেরীয় দার্শনিক টোডর পাভলভের (Todor Pavlov)মতে, 'প্রাচীন গ্রীসের ছিলো নিজস্ব ধ্রুপদী শিল্পকলা, মধ্যযুগেরও ছিলো নিজস্ব মধ্যযুগীয় শিল্পকলা, পুঁজিবাদী বুর্জোয়ারাও গ'ড়ে তোলে নিজস্ব শিল্পসংস্কৃতি, অতএব সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট সমাজব্যবস্থারও অবশ্যই থাকা প্রয়োজন নিজস্ব শিল্পকলা, যার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র মৌলিক প্রবণতা আছে।'[১৪৭] রুশ সমালোচক ভিকটর ভানস্লোভ (Victor Vanslov) সমাজতান্ত্রিক

১৪৫.ক. Ibid, pp. 122 - 140

১৪৬. Ibid, p. 17.

১৪৭. উদ্ধৃত Leizerov, N., 'The Birth of a New Art' in Markist-Leninist Aesthetics and life (Edited by Kulikova, J. & Zis, A, Progress publishers, Moscow, 1976, 1st English Translation 1976), P. 156.

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতাবাদকে চিহ্নিত করেন সমাজতান্ত্রিক যুগের বাস্তবতাবাদ রূপে, যাতে বাস্তবতাবাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয় সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ। তিনি বলেন :

> Socialist realism is the realism of the socialist era in mankind's historical development. The term "Socialist realism" itself contains an ... indication to its links with the traditions of classical realism; this term also designates its innovative nature, Socialist essence and aspirations. This term precisely expresses the very core of our art. It stands for a combination of realism with Socialist ideas, for raising the world realistic art to a historically new stage, and for for orientation of realistic art at assertion and development of socialism.[১৪৮]

---

১৪৮. Vanslov, Victor., 'on the Essence of Socialist Realism' in Problems of contemporary Aesthetics (edited by Zis. A., Lyuliemova, T. & Ovsyannikov, M. Raduga Publishers, Moscow 1984, English Translation 1984) P. 82.

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ সোভিয়েট ইউনিয়নে সরকারী কমিউনিস্ট শৈল্পিক পদ্ধতি হিশেবে গৃহীত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী ধারা সুসংবদ্ধরূপ নেয় ১৯৩৪-এর প্রথম কংগ্রেসের পর। মার্কসীয়তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিকবাস্তবতাবাদের মূল ভিত্তি এবং এ-ধারাটি সুসংবদ্ধরূপ নেয় লেনিনের সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক নীতি বা সূত্র অনুসারে।[১৪৯] মানুষের সামাজিকসত্তা সম্পর্কে মার্কসের ধারণা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ গভীরভাবে প্রভাবিত। রুশতাত্ত্বিক I. Kulikova সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের চারিত্র্য নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন :

> The nature of Socialist realist art is greatly influenced by the Marxist concept of man as above all a social being. As a result in socialist art which authentically reflects reality the personal and the -Social interact in dialectical unity. Both society and the individual are revealed in works of art in the process of their development, the process of their perfection in accordance with the social aesthetic ideal of building a communist society and moulding a harmoniously developed personality.[১৫০]

---

১৪৯. Selden. Reman. A Reder's Guide to contemporary literary Theory, (The Harvester press, sussex 1985, 1986), P. 25.

১৫০. Kulikova, I,, 'Socialist Realism: As the Leading Artistic Method of contemporary' in Morkist - Leninist Aesthelics and life, P. 189.

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ-ব্যক্তি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিক ও বিপ্লবীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে মার্কসের সিদ্ধান্ত হচ্ছে - (ক) তাত্ত্বিক ও দার্শনিকেরা এ-পর্যন্ত শুধু পৃথিবীকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন, কিন্তু মূল ব্যাপার হচ্ছে একে সম্পূর্ণ বদলে দেয়া। (খ) মানুষের চেতনা তার সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং মানুষের সামাজিক সত্তাই নিয়ন্ত্রন করে তার চেতনাকে।[১৩১]

মার্কস পূর্বতন নিরর্থক দার্শনিক বিতর্ক থেকে দর্শনকে মুক্তি দিয়ে তাকে বাস্তবতাসংলগ্ন ও জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলতে চেয়েছেন এবং হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনকে সম্পূর্ণ উল্টে দিতে চেয়েছেন। হেগেল ও তাঁর অনুসারীদের মতে এই বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত হয় চিন্তা দ্বারা এবং ইতিহাসের প্রক্রিয়া হচ্ছে যুক্তিবিধিরাশির ক্রমিক দ্বান্দ্বিক উন্মোচন। তাঁদের মতে জড়অস্তিত্ব হচ্ছে অজড় চৈতন্য সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই দার্শনিক গোত্রের মতে জনগনের সকল ভাবনা-ধারণা, সাংস্কৃতিক জীবন, আইনগত বিধি-বিধান ও ধর্ম-সবকিছুই মানবিক ও ঐশীযুক্তির সৃষ্টি, তাই এইসব বিষয় বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে এবং মানবজীবনের চালক হিশেবে গণ্য করতে হবে। মার্কস হেগেলীয় এই সূত্রকে উল্টে দেন। মার্কস নির্দেশ করেন যে সমস্ত মানসিক (আদর্শগত) পদ্ধতিই বাস্তব সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থার সৃষ্টি, আর আধিপত্যকারী সামাজিক শ্রেণীটিই নির্ধারণ করে দেয় কীভাবে মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অস্তিত্বকে দেখবে। এ-শ্রেণীটিই নির্ধারণ করে সাংস্কৃতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। মার্কস বলেন আইনগত বিধিবিধান মানবিক বা ঐশী যুক্তির প্রকাশ নয়, এগুলো বিশেষ একটি ঐতিহাসিক পর্বের আধিপত্যকারী শ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করে। মার্কসের মতে সাহিত্য-সংস্কৃতি কোনো স্বাধীন স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়। কোনো সময়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ওই সময়ের ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মার্কস এ-ব্যাপারটিকে স্থাপত্যগত রূপকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আদর্শ, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়কে নির্দেশ করেন ওপর কাঠামোরূপে, আর আর্থনীতিকেই নির্দেশ করেন অবকাঠামোরূপে। মার্কসের মতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ওপরকাঠামো। মার্কসের মতে আমরা যাকে সংস্কৃতি বলি, তা কোনো স্বাধীন বাস্তবতা নয়, বরং তা ওই সময়ের ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আধিপত্যকারী ও অধীনস্থদের সম্পর্কই নির্ধারন করে সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা, নিয়ন্ত্রন ও নির্ধারণ করে

---

১৩১. Selden, Reman. Ibid. P. 23.

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক জীবনকেও। মার্কস বলেন, মানবইতিহাসের কোনো বিশেষ স্তরের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা নির্ধারিত হয় আধিপত্যকারী ও অধীনস্থদের সম্পর্কের দ্বারা এবং এই সম্পর্ক ওই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনকেও নির্ধারিত করে। তবে মার্কস শিল্পকলা, দর্শন প্রভৃতিকে 'আপেক্ষিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত' বলেও গণ্য করেছেন। ১৮৯০-এর দশকে এঙ্গেলস তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে এ-তথ্য উল্লেখ করেছেন। এঙ্গেলস বলেন যে যদিও মার্কস এবং তিনি সর্বদা আর্থনীতিকবৈশিষ্ট্যকে সমাজের অন্যান্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্যগুলোর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক বলে গণ্য করেছেন, তবুও তাঁরা অনুধাবন করেন যে দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি আপেক্ষিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত এবং মানুষের অস্তিত্বকে বদলে দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা এদের আছে। তবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের তাত্ত্বিক ও লেখকেরা এ-ধারার অন্যতম ভিত্তিরূপে মার্কসীয় তত্ত্ব গ্রহণ করলেও, শিল্প সাহিত্যের স্বায়ত্তশাসনে তাঁরা বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব ভিত্তি করেই আদর্শগত দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয়। সাহিত্য ও শিল্পকলা আদর্শগত এলাকার অন্তর্গত। তাই এর লক্ষ্য হবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও বিপ্লবী সর্বহারাদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের কথা ঘোষণা করা।[১৫২]

সোভিয়েট লেখকসংঘ (১৯৩২-৩৪) সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের মূল ভিত্তিরূপে যদিও মার্কসীয় তত্ত্ব গ্রহণ করে তবে সাহিত্য ও সমাজসম্পর্কিত লেনিনের মন্তব্যগুলোকে সংহত করেই এ-সংঘ সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদকে বিধিবদ্ধ করে। সোভিয়েট তাত্ত্বিকেরা বিশেষভাবে লেনিনের 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' (১৯০৫) প্রবন্ধটির ওপর জোর দেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী তত্ত্বে সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, শ্রেণীসম্পর্ক, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই নন্দনতত্ত্বে অনেকগুলো নীতি বা বিধি গৃহীত হয়।[১৫৩] এ নন্দনতত্ত্বের 'পার্টির শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি অঙ্গীকার' নামক নীতিটি গৃহীত হয় লেনিনের 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে। এ-প্রবন্ধে লেনিন সাহিত্যসৃষ্টি

---

১৫২. Ibid, pp. 23 - 26.

১৫৩. Ibid, pp. 25 - 26

Dhaka University Institutional Repository

একটি স্বাধীন ব্যক্তিগত ব্যাপার-এই বুর্জোয়া ধারণাকে আক্রমণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাহিত্য ব্যক্তিগত সৃষ্টিমাত্র হবে না, সাহিত্য পালন করবে নতুন ভূমিকা। সাহিত্যকে হতে হবে বিপ্লবী সর্বহারাদের কর্মযোগের একটি অংশ। লেনিন বলেন, 'সাহিত্যের ব্যাপারটাকে হতে হবে সমগ্র প্রলেতারীয় কর্মযোগের একটা অংশ, হতে হবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত রাজনীতি সচেতন অগ্রবাহিনী দ্বারা চালানো একক ও অখন্ড সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক মহাযন্ত্র ব্যবস্থাটার 'চাকা ও ইস্কুপ'। সাহিত্যের ব্যাপার-টাকে হতে হতে সংগঠিত, পরিকল্পিত, সম্মিলিত সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কাজের অঙ্গাঙ্গী অংশ।'[১৫৪] লেনিন বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও পরম স্বাধীনতার ধারণাকে 'বুর্জোয়া ভণ্ডামি' আখ্যা দেন। কারণ লেনিনের মতে সমাজে বাস করে সমাজ থেকে স্বাধীন হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। লেনিন বলেন;

> বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মহোদয়েরা, আমরা বলতে বাধ্য যে আপনাদের পরম স্বাধীনতা কথাটা একেবারেই ভণ্ডামি। যে সমাজ অর্থাধিপত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মেহনতী জন-গণ দারিদ্র্যে ভোগে আর পরজীবী হয়ে দিনকাটায় মুষ্টিমেয় ধনী, সেখানে বাস্তব ও সত্যকার 'স্বাধীনতা' থাকতে পারে না। লেখক মহাশয়, আপনার বুর্জোয়া প্রকাশকের কাছ থেকে কি আপনি স্বাধীন? আপনার বুর্জোয়া পাঠকদের কাছ থেকে, যারা উপন্যাসে ও চিত্রে আপনার কাছ থেকে চায় যৌন কুরুচি, 'পবিত্র' অভিনয়কলার 'পরিপূরণ' হিসেবে চায় বেশ্যাবৃত্তি? এই পরম স্বাধীনতাটা হল বুর্জোয়া অথবা নৈরাজ্যবাদী বুলি (কেননা, বিশ্বধ্যান হিসেবে নৈরাজ্য-বাদ হল উলটিয়ে নেওয়া বুর্জোয়াপনা)। সমাজে থেকে সমাজ থেকে স্বাধীন হওয়া চলে না। বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী, অভিনেত্রীর স্বাধীনতা হল টাকার থলি, উৎকোচ, রক্ষিতাবৃত্তির ছদ্ম-বেশী (অথবা ভণ্ড ছদ্মবেশী) পরাধীনতা।[১৫৫]

লেনিন মনে করেন শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়ই স্বাধীন সাহিত্য রচনা করা সম্ভব। কারণ সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য স্বার্থসাধন বা পদান্বেষণের জন্য রচিত হবে না; এ-সাহিত্য সর্বহারারাদের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও বিপ্লবের বাণী রূপায়িত করবে, এর মধ্য দিয়েই এ-সাহিত্য হয়ে উঠবে স্বাধীন সাহিত্য। তিনি বলেন;

---

১৫৪. ভ,ই,লেনিন, 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য', সাহিত্য প্রসঙ্গে (প্রগতি প্রকাশন মস্কো ১৯৭৬) পৃঃ ৭

১৫৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০

Dhaka University Institutional Repository

আমরা সমাজতন্ত্রীরা এই ভণ্ডামির মুখোশ খুলি, মিথ্যা লেবেল ছিঁড়ি- শ্রেণীহীন সাহিত্য ও শিল্পকলা পাওয়ার জন্যে নয় (সেটা সম্ভব হবে কেবল সমাজতান্ত্রিক, শ্রেণীহীন সমাজে), ভণ্ড স্বাধীন ও আসলে বুর্জোয়ার সঙ্গে জড়িত সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় খোলাখুলি প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে জড়িত, সত্যিই স্বাধীন সাহিত্যের বৈপরীত্য দেখাবার জন্য। সেহবে স্বাধীন সাহিত্য, কারণ স্বার্থসাধন ও পদান্বেষণে নয়, সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ ও মেহনতীদের প্রতি সহানুভূতিতে নতুন নতুন শক্তি টেনে আনবে তা নিজ সারিতে। সে হবে স্বাধীন সাহিত্য, কারণ কোন অতিতৃপ্ত নায়িকা কিংবা বা বেজায় মেদপীড়িত 'উর্দ্ধতন দশসহস্রের' নয়, তা সেবা করবে দেশের যারা মুকুল, দেশের যারা শক্তি, দেশের যারা ভবিষ্যৎ সেই কোটি কোটি মেহনতীদের।[১৫৬]

সমাজতান্ত্রিক লেখকদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাহিত্যের চারিত্র্যও নির্দেশ করেন লেনিন। তাঁর মতে সমাজতান্ত্রিক লেখকেরা সূচনা করবে নুতন ধরণের বাস্তবতাবাদ, এই বাস্তব -তাবাদে বিপ্লবী সর্বহারাদের বিপ্লবীচেতনা ও মতাদর্শ উপস্থাপিত হবে। সমাজতান্ত্রিক লেখক নিজেও এই বিপ্লবী ভাবাদর্শে দীক্ষিত হবেন। স্বাধীনভাবে যা খুশি লেখার স্বেচ্ছাচার তাড়িত নন সমাজতান্ত্রিক লেখক, তিনি পার্টির রাজনৈতিক ভাবদর্শের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাহিত্য হবে পার্টিসাহিত্য। বিপ্লবী সর্বহারা আন্দোলনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত একটি সুপ্রসর, বহুমুখী ও বহুরূপী সাহিত্যধারা গড়ে তোলাই সমাজতান্ত্রিক লেখকের একমাত্র লক্ষ্য বলে লেনিন মনে করেন। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রসারই এ-সাহিত্যে প্রধান হয়ে ওঠে। মায়াকোভস্কিও সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের নীতি ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে মতামত দেন। সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের মুখপত্র " L E F " পত্রিকায় তিনি বলেন যে সমাজ-তান্ত্রিক লেখকদের তিনটি বিধি বা সূত্র অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এ-বিধি তিনটি হচ্ছে :

---

১৫৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০

Dhaka University Institutional Repository

(1) to promote the finding of a communist path for all genres of art; (2) to revise the ideology and practice of so-called leflist art by discarding individualistic affectations and developing its valuable communist features ....(3) to fight against decadence, against aesthetic mysticism, against self sufficing formalism, and against indifferent naturalism for the affirmation of tendentious realism based on the utilisation of the technical devices of all revolutionary schools in art'[১৫৭]

যদিও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের তাত্ত্বিকেরা দাবি করেন যে এ-সব বিধিবিধানের মধ্য দিয়ে সাহিত্য-শিল্পকলাকে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাপক, বিচিত্র, বহুমুখী করে তোলা, তাঁদের লক্ষ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ-সব বিধি বিধানের মধ্যদিয়ে সাহিত্যশিল্পকলাকে একধরণের নিয়ন্ত্রনবাদ দ্বারা শৃঙ্খলিত করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী তাত্ত্বিক ও লেখকেরা পূর্ববর্তী উনিশশতকী বাস্তবতাবাদকে সীমাবদ্ধ বলে নিন্দা করেন, তবে ওই বাস্তবতাবাদকে তাঁরা কিছুটা অনুরাগের দৃষ্টিতেও দেখে থাকেন। যেমন এঙ্গেলস সমকালীন ফরাশি সমাজবাস্তবতার অবিকল ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনাসমৃদ্ধ ব্যালজাকের উপন্যাসগুলো অত্যন্ত পছন্দ করতেন। ব্যালজাকের উপন্যাসে ফরাশি সমাজের আর্থনীতিক ও সামাজিক বিবরণ অনুপুঙ্খ বিধৃত হয়েছে। যদিও ব্যালজাক ছিলেন সামন্ত অভিজাত শ্রেণীর অনুরাগী এবং বুরবণ রাজবংশের একজন প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থক, কিন্তু তিনি উপন্যাসে ওই অভিজাত শ্রেণীর প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি। তিনি উপন্যাসে নিরপেক্ষভাবে নির্দেশ করেন সামন্তত্যন্ত্রের অনিবার্য পতন ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী উত্থানের ইতিহাস। এঙ্গেলস ব্যালজাকের এই অর্ন্তদৃষ্টি ও নিরপেক্ষতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে ব্যালজাকের অন্তর্দৃষ্টিই তাঁকে চালিত করে 'নিজের শ্রেণীগত সহানুভূতি ও রাজনৈতিক কুসংস্কারের' বিরুদ্ধে যেতে। ব্যালজাকের অনুপুঙ্খতায় মুগ্ধ এঙ্গেলস বলেন যে ব্যালজাকের রচনায় ফরাশি সমাজের যে অনুপুঙ্খ অর্থনীতিক বিবরণ পাওয়া যায় তা 'ওই সময়ের সমস্ত

১৫৭.. উদ্ধৃত, Leizenov. N., 'The birth of a New Art' Ibid, P. 158 - 159.

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদের রচনায়ও পাওয়া যায় না।[১৫৮] সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী তাত্ত্বিক ও লেখকেরা পূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদীদের পছন্দ করেন এ-কারণে যে তাঁরা ছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। তাঁরা উপন্যাসে তাঁদের সময়ের সামাজিক বিবর্তনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ব্যালজাক, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট ও অন্যরা তাঁদের উপন্যাসে দেখিয়েছেন ব্যক্তি কীভাবে সমগ্র সামাজিক সম্পর্কজালে জড়িয়ে পড়ে। পূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদী উপন্যাসে সমাজবাস্তবতাচিত্রনের প্রবণতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীদের পছন্দ হয়েছিলো, কিন্তু উনিশ শতকের বাস্তবতাবাদী লেখকেরা সমাজবাস্তবতার উপস্থাপনার চেয়ে ব্যক্তি জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনায়ই মনোযোগী ছিলেন। ওই বাস্তবতাবাদীদের ব্যক্তি জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাটি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীদের কাছে নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁরা মনে করেন ওই বাস্তবতাবাদীরা ব্যক্তি-জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনায় অধিক পরিমানে মনোযোগী ছিলেন বলেই তাঁরা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। ব্যক্তিজীবন বাস্তবতা উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে যে বাস্তবতাকে তুলে ধরা যায় তা খন্ডিত, শুধুমাত্র সমাজজীবনের উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই বাস্তবতার সামগ্রিক পরিচয় নির্দেশ করা সম্ভব।

উনিশ শতকের রুশ বাস্তবতাবাদীরা বেশ সমাজবাস্তবতা মনস্ক ছিলেন। তাঁদের গ্রন্থের নামকরণের মধ্যদিয়েও ওই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনো কোনো গ্রন্থের নামের মধ্য দিয়েও সমাজের অসঙ্গতি, কদর্যতা ও শ্রেণীসংঘাতের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, The Insulted and the Humiliated, Wolves and sheep, poor people, Messiears et Mesdames Pompadours ~~Pompadeurs~~ ইত্যাদি নাম। কোনো কোনো গ্রন্থের শিরোনামে বিশ্বজনীন মানবিক সংঘর্ষের ব্যাপার নির্দেশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখকেরা প্রতীকী নামকরণ করেছেন। যেমন: Wit works woe, Fathers and sons, crime and punishment ইত্যাদি। কখনও গ্রন্থের নামকরণ করা হয় প্রশ্নবোধক বাক্যে, যেমন: Who lives well in Rus?, Who is to Blame ?, What is to be done ?, ইত্যাদি। এ-সব উপন্যাসে সমাজের দুঃখক্লেদ দারিদ্র্য

---

১৫৮. Engles. Friedrich, 'On Socialist Realism' in DMLR , P. 485.

Dhaka University Institutional Repository

শোষণের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীরা মনে করেন ওই বাস্তবতাবাদীরা সীমাবদ্ধ। কারণ তাঁরা সমাজের অন্ধকার বাস্তবতার উপস্থাপনা করলেও, দুঃখ দুর্দশা ও শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন না। শুধু ক্লেদাক্ত সমাজবাস্তবতা ও ব্যক্তির দুর্দশাময় জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা করেই দায়িত্ব শেষ করেন, দুর্দশা মোচনের উপায় ও সুন্দর ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করেন না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীরা সীমাবদ্ধ নন। কারণ তাঁরা সকল দুর্দশার চিত্রনের সঙ্গেসঙ্গে সকল অব্যবস্থার জন্য দায়ী কে বা কী তাও নির্দেশ করেন। এ-প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের প্রধান পুরোহিত ম্যাক্সিম গোর্কি মন্তব্য করেন :

> 'While exposing the vices of society and portraying the "life and adventures" of the individual in the grips of family traditions, religious dogmas, and legal rule critical realism could not show the way out of captivity.[১৫৯]

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীরা পূর্ববর্তী ক্রিটিক্যাল বাস্তবতাবাদীদের আরো একটি কারণে সীমাবদ্ধ বলে নিন্দা করেন। তাঁদের মতে ওই বাস্তবতাবাদীরা সাহিত্যে সমাজের নিম্নস্তর বা শ্রমজীবী জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনায় ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের মতে ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাসেই প্রথম শ্রমজীবীদের জীবনবাস্তবতা ও শ্রমজীবী শ্রেণীর সমাজবাস্তবতা উপস্থাপিত হয়। বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের বদলে গোর্কি তাঁর রচনায় তুলে ধরেন নতুন সময়ের নতুন নায়ক শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবনবাস্তবতা। গোর্কির উপন্যাসের এই নতুন নায়ক পূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদী নায়কদের উত্তরসূরী নয়। তাঁরা কেউ ডিকেন্সের হতভাগ্য পরিশ্রমী নায়কের মতো নয়, যাদের জীবন করুণা জাগিয়ে তোলে। তাঁরা কেউ জর্জ সাঁ কিংবা জোলার উপন্যাসের নায়কদের মতো ঘৃণায় অন্ধ এবং জীবনদ্বারা পর্যুদস্ত রসাতলবাসী কীটমাত্র নয়। গোর্কির এই নায়কেরা জানে দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ ও জীবন কীভাবে বদলে দিতে হয়। তাদের অনুপ্রাণিত করে বিপ্লবী চেতনা এবং তারা নতুন পৃথিবী গড়তে চায়।[১৬০]

---

১৫৯. উদ্ধৃত, Leizerov. N, 'The Birth of a New Art', P. 157.

১৬০. Ibid, pp. 157 - 158.

Dhaka University Institutional Repository

এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী নায়কেরা বুর্জোয়া পুঁজিবাদী শিল্পকলার 'অতিমানব'নয়, বুর্জোয়া নায়কের মতো তাদের চরিত্রে নেই অসাধারণ টাইটানধর্মী ব্যক্তিত্ব। এ-ধারার লেখকেরা বলেন যে, তাঁদের এ-নায়ক তাঁদের সময় ও সমাজের একজন সাধারণ মানুষমাত্র, তবে এই মানুষটি 'Capable of waiving his personal interests, of performing great deeds and even of sacrificing his own life in the name of lofty ideals.'[১৬১] সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীরা পূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদকে সীমাবদ্ধ বলে সমালোচনা করলেও ওই বাস্তবতাবাদের প্রতি তাঁরা বেশ সহনশীল ছিলেন, কিন্তু আধুনিক ধারার ঔপন্যাসিকদের মন্ময় বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতা তাঁদের অত্যন্ত অপছন্দ ছিলো। আধুনিক ধারার লেখকেরা বাস্তবতার অনুপুঙ্খ অবিকল উপস্থাপনারীতি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা উপন্যাসে তুলে ধরেন বাস্তবতার চূর্ণবিচূর্ণ প্রতিচ্ছবি। ওই ঔপন্যাসিকেরা ছিলেন সাধারণতঃ অন্তর্মুখী ও হতাশাবাদী। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীরা লেখকের এমন দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করেন। সমাজতান্ত্রিক লেখক আশাবাদী ও বহির্মুখী। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখকের লক্ষ্য সাহিত্যে বীরত্বব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরা আর আধুনিক ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য 'ব্যক্তির অন্তর্জীবন' চিত্রন।[১৬২] সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখক মনে করেন ওই বীরত্বব্যঞ্জক চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক যুগের নতুন সাহিত্য যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীদের মতে সর্বহারা বিপ্লব নতুন যুগের সূচনা করে। এই বিপ্লব মানুষের সামনে খুলে দেয় উন্নত, সুন্দর ও নতুন এক সুষম সমাজ ও জীবনের দ্বাররাজ্য। তাই সর্বহারা বিপ্লব পরবর্তী সাহিত্যে উন্নত, সুন্দর, সুষম, নতুন সমাজ ও জীবনের ছবি আঁকাই লেখকেদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন। ১৯০০ সালে আন্তন চেখভকে লেখা চিঠিতে গোর্কি এ-প্রসঙ্গে বলেন :

---

১৬১. Kulikova.I, 'Socialist Realism as the leading artistic Method of contemporaneity' P. 190.

Dhaka University Institutional Repository

> Indeed, the time has arrived when the heroic is needed; all around people are eager for excitement, for the vivid, for things that are different from our life, better, more exalted and beautiful. It is essential that present day literature should begin to embellish life, for as as soon as it does that life will become beautified, that that is to say, people will live richer and more vigorous lives. Look at them as they are today, with eyes that are dull, glassy and dead.[১৬৩]

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ জীবনকে নতুন করে ব্যাখ্যা করে। এ-তত্ত্বানুসারে জীবন হচ্ছে ক্রিয়া ও সৃষ্টিশীলতা। এ-ধারার লেখকের লক্ষ্য সমাজের সঙ্গে জড়িত হওয়া বা শৈল্পিক উপায়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখকেরা সাহিত্যের উপযোগতাবাদে বিশ্বাসী। জড়জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন বলেন;

> .If the world is matter in motion, matter can and must be infinitely studied in the infinitely complex and detailed manifestations and ramifications of this motion, the motion of this matter; but beyond it, byond the 'physical', external world, with which every one is familiar, there can be nothing.'[১৬৪]

---

১৬৩ Gorky. Maxim, On Literature, (Progress Publishers, Moscow,??), P. 360.

১৬৪. উদ্ধৃত, Kulikova, I, Ibid, P. 186.

Dhaka University Institutional Repository

রুশ সমালোচক I. Kulikova বলেন যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে লেনিনের এই মতবাদের গভীর প্রভাব রয়েছে। বাহ্যজগতের প্রপঞ্চরাশিকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা এ- তত্ত্বের লক্ষ্য।[১৬৫] এ- ধারার সাহিত্যের লক্ষ্য সত্য বা প্রকৃত সামাজিক অবস্থা উপস্থাপন এবং সমকালের জনমনের বিপ্লবী অনুভূতি প্রকাশ করা। বর্তমানকে নির্ভর করে কীভাবে ভবিষ্যৎ উদ্ভূত হয় তা নির্দেশ করাও এ-সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখক শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজবিবর্তনের আদর্শসম্ভাবনাকে নির্দেশ করেন।[১৬৬] সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যে শুধুমাত্র বর্তমান সময়ের বিপ্লবী চেতনার রূপায়নই করা হয় না, অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এখানে মেলানো হয় বর্তমান অভিজ্ঞতাকে এবং নির্দেশ করা হয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ রূপ। এ-প্রসঙ্গে লেনিন বলেন, 'সে হবে স্বাধীন সাহিত্য, সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত কাজ দিয়ে যা ফলবান করে তুলবে মানবজাতির বিপ্লবী ভাবনার সর্বশেষ বাণীকে, অতীত অভিজ্ঞতা (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, প্রাথমিক ইউটোপীয়রূপ থেকে যাতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ সম্পূর্ণ হচ্ছে) ও বর্তমান অভিজ্ঞতার (কমরেড শ্রমিকদের বর্তমান সংগ্রাম) মধ্যে অবিরাম পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ঘটাবে।[১৬৭] গোর্কি বলেন :

> ' 'What we need to know is not only two realities - the past, and the present in which we participate to a certian extent. We also need to know a third reality, that of the future ..... we must somehow include this reality in our everyday life, and we should depict it. Without this reality cannot comprehend what the socialist realist method is[১৬৮]

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখক তাই বিপ্লবী সমাজের বর্তমান বাস্তবতা চিত্রনেই নিবিষ্ট থাকেন না, তিনি আঁকেন বিপ্লবোত্তর এক সমৃদ্ধ সুন্দর সমাজ ও ভবিষ্যতের ছবি। রুশ সমালোচক ভিক্টর ভালস্তুভ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন ;

---

১৬৫. Kulikova. I, Ibid, P. 186.

১৬৬. Selden. Reman, Ibid, P. 26.

১৬৭. ভ, ই, লেনিন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০

১৬৮. উদ্ধৃত, Kulikova, I, Ibid, P. 187.

Dhaka University Institutional Repository

> of fundamental significance for socialist realism are the concepts of the truth of life, reflection of reality in itsx revolutionary development, and the connections between art and the tasks of the ideological and aesthetic education of the people in the spirit of socialism and communism.[১৬৯]

লেনিন মনে করেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যে যে জীবন বাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটবে তা অবিকল নৈর্ব্যক্তিক প্রতিফলনমাত্র হবে না। এ-শ্রেণীর রচনায় সমাজের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সকল স্ববিরোধ এবং সমাজমানসের বৈপ্লবিক আবেগ তুলে ধরা হবে। একই সঙ্গে নির্দেশ করা হবে স্ববিরোধ ও দ্বন্দ্ব দূর করার উপায়। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখক বাস্তবতার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা রীতি প্রত্যাখ্যান করবেন। লেনিনের মতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখকের সৃষ্টিকর্ম শুধুমাত্র ' Simple, direct, "direct,"dead mirror" action' হবে না, বরং তা হয়ে উঠবে ' Complicated, dechotomous, Zig zag.' লেনিন তাঁর প্রতিফলনতত্ত্বে বলেন :

> Cognition is the eternal, endless approximation of thought to the object. The reflection of nature in man's thought must be understood not 'lifelessly' not 'abstractly', not devoid of movement, not without contradictions, but in the eternal process of movement, the arising of contradictions and their solution.'[১৭০]

---

১৬৯. Vanslov. Victor, Ibid, P. 85

১৭০. উদ্ধৃত, Kulikova.I, Ibid, P. 187.

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসও cognition বা অবধারণাকে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় চিন্তাভাবনা বলে মনে করেন নি। রুশতাত্ত্বিক-দের মতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে বাস্তবতার তন্ময় শৈল্পিক অবধারণার সঙ্গে মিলিত হয় শিল্পীর ঐতিহাসিক সচেতনতা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের তাত্ত্বিক ঝদানভ মনে করেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী রচনায় বাস্তবতার উপস্থাপনা পাণ্ডিত্যধর্মী ও নিষ্প্রাণ হওয়া অনুচিত। তিনি মনে করেন যা আছে তার সরল বিবরণ দানও এ-শ্রেণীর রচনার লক্ষ্য নয়। তিনি বলেন, 'কমরেড স্টালিন বলেছেন যে লেখকেরা মানবাত্মার প্রকৌশলী... এর অর্থ প্রথমতঃ জীবনকে জানা। শিল্পকলায় জীবনকে বিশ্বস্তভাবে চিত্রনের জন্যই জীবনকে জানা প্রয়োজন।'[১৭১] বাস্তবতা উপস্থাপনার রীতি নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এই চিত্রন নিষ্প্রাণ গবেষণাধর্মী হবে না কিংবা বাহ্য-বাস্তবতার সরল নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা মাত্র হবে না। এখানে বর্তমানের পাশাপাশি দেখাতে হবে সর্বহারা সমাজের বৈপ্লবিক অগ্রগতি ও উন্নতির চিত্র।[১৭২]

গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদকে সংজ্ঞায়িত করেন 'বৈপ্লবিক রোম্যান্টিসিজম' বলে। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে এ-তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ শুধু জীবন যেমন আছে তা-ই উপস্থাপনা করেনা, বা বর্তমান বাস্তবতার পরিচয় দেয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এ-শ্রেণীর সাহিত্যে যা আছে তার বদলে যা থাকা উচিত তা-ই তুলে ধরা হয়, নির্দেশ করা হয় সাম্যবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাবী সুন্দর ভবিষ্যতকে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখকেরা আশাবাদী। প্রাকৃতবাদীদের মতো তাঁরা জীবন সম্পর্কে গভীর নৈরাশ্য পোষণ করেন না, বরং গভীর আশাবাদ পোষণ করেন। তাঁরা স্বপ্ন দেখেন বিপ্লবের শুভ ও সুন্দর পরিণামের, এবং একটি সুন্দর সমাজের। গোর্কির মতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখককে হতে হবে একই সঙ্গে বাস্তবতাবাদী ও রোম্যান্টিক। তিনি বলেন, 'বৈপ্লবিক রোম্যান্টিসিজমের লক্ষ্য শুধুমাত্র সমালোচনামূলক ভঙ্গীতে অতীতকে চিত্রিত করা নয়, বরং প্রধানত বর্তমানের বৈপ্লবিক সাফল্য সমূহকে

---

১৭১. Garky, Maxim, and others, 'Comments on socialist Realism', in Documents of Modern Literary Realism, P. 487.

১৭২. Ibid, P. 487.

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরা এবং সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের উজ্জ্বলক্ষ্যসমূহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরাও এর লক্ষ্য।[১৭৩] সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের সক্রিয় সৃষ্টিশীল প্রকৃতি প্রসঙ্গে গোর্কি বলেন :

> Socialist realism proclaims that life is action, creativ-vity, whose aim is the unfettered development of man's most vaduable individual abilities for his victory over the forces of Nature, for his health and logevity, for the great happiness of living on earth, wheich he, in conformity with the constant growth of his requirements, wish to cultivat as a magnificent habitation of a mankind in one ~~family~~.[১৭৪]

জীবনকে নুতন করে সৃষ্টি ও জীবনের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা রচনাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী শিল্পীর লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী শিল্পকলার এই বিশেষবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মিখাইল শলোকভ বলেন, 'আমি সেই বাস্তবতাবাদের কথা বলি যা জীবনের পুনর্যৌবনলাভের কথা প্রকাশ করে, যা মানুষের কল্যানের জন্য জীবনকে নতুন করে সৃষ্টি করে। এই বাস্তবতাবাদের বিশেষবৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ভাবসর্বস্বতা ও বাস্তবতা থেকে পলায়নের মনোবৃত্তিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, এবং অগ্রগতির জন্য মানুষকে সংগ্রামে আহবান জানানো হয়।'[১৭৫] এ-ধারার তাত্ত্বিকদের মতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে সামাজিক প্রপঞ্চকে দেখা হয় সামাজিকভাবে পরস্পর সম্পর্কিত ও নিয়ন্ত্রিত বলে। এ-প্রপঞ্চরাশিকে দেখা হয় তাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের আলোকে, প্রতিটি স্বতন্ত্র উপাদান এখানে সমগ্রের অংশ হিসেবে গণ্য হয় এবং এ-ধারার সাহিত্যে তথ্যরাশির সামাজিক পটভূমি ও ঐতিহাসিকমাত্রা উদঘাটন করা হয়। সোভিয়েট লেখক জোলিগিন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের এ-বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে একজন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখক ' is always pulled in two directions, always

---

১৭৪. Garky. Maxim, on Literature , P. 264.

১৭৫. উদ্ধৃত, Yearmash, G, 'socialist Realism as a creative method', Marxist Lenenist Aesthetics and life, P. 262.

Dhaka University Institutional Repository

moves in two different orbits: the contemporary and the historical.'[১৭৬] এ-ধারার সাহিত্যে কোনো ঘটনা বা তথ্যকে জীবনের বিচ্ছিন্ন অংশ বা ব্যাপার রূপে নির্দেশ করা হয় না, বরং এখানে নির্দেশ করা হয় যে প্রতিটি ঘটনা ও প্রতিটি তথ্য এক ঐতিহাসিক সূত্রে গ্রথিত। প্রপঞ্চরাশির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক উদঘাটন করাও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখকের দায়িত্ব।[১৭৭] যদিও লেনিন এবং অন্যরা এ-ধারার সাহিত্যে জীবনবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার পরিবর্তে জীবনের সৃষ্টিশীল ভাষ্য রচনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু পার্টি ও শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত অবস্থান থেকে এ-ধারার লেখকেরা জীবনের সৃষ্টিশীল ভাষ্য রচনার পরিবর্তে বরং সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব ও আদর্শ প্রচারেই ব্যাপৃত হন। নিয়ন্ত্রিত অবস্থান থেকে রচিত এই রচনাগুলোতে যেহেতু জীবন সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেনা, ফলে ওই সাহিত্য হয়ে ওঠে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যহীন মতাদর্শের প্রচারমূলক রচনা।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের শ্রেণী আনুগত্য ও লেখকের অঙ্গীকার বিষয়টি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। এঙ্গেলস শিল্পকলায় শ্রেণী আনুগত্যের স্থূল প্রকাশ পছন্দ করেন নি। তিনি মনে করেন কোনো রচনায় সরাসরি ও খোলাখুলিভাবে উদ্দেশ্যবাদিতা প্রকাশিত হওয়া অনুচিত, বরং একটি রচনায় পরিস্থিতি ও কার্যকলাপ এমনভাবে বিন্যস্ত হওয়া উচিত, যার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্য মূর্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ লেখক যে সামাজিক দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা করতে চান, তা পাঠকের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব দেয়া উচিত পরিস্থিতি ও কার্যকলাপের ওপর, এবং ঘটনাপরম্পরায় ক্রমঅগ্রসর হয়ে এরা নিজেরাই উদ্দেশ্যকে মূর্ত করে তোলে। তিনি মনে করেন লেখকের উদ্দেশ্যবাদিতার স্পষ্ট প্রকাশের কারণে কোনো রচনার শিল্পমূল্য গৌণ হয়ে যায় এবং রচনাটি হয়ে ওঠে শিল্পগুণশূন্য প্রচারধর্মী রচনা। তাঁর মতে যে-উদ্দেশ্য লেখককে কলম ধরতে অনুপ্রাণিত করে তা থাকবে পরোক্ষে ও সংগোপনে। মিন্না কাউটাস্কিকে লেখা চিঠিতে (১৮৮৫) তিনি বলেন যে সরাসরি সমস্যার সমাধান না করে বা প্রকাশ্য পক্ষাবলম্বনে বিরত থেকেও 'সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস তার দায়িত্ব

---

১৭৬. উদ্ধৃত, Ibid, P. 266.

Dhaka University Institutional Repository

পুরোপুরি পালন করতে পারে .... প্রকৃত অবস্থা বিশুদ্ধভাবে অঙ্কনের মাধ্যমে যদি এ-বিষয়ে প্রভুত্ব বিস্তারকারী প্রচলিত বিভ্রমসমূহ দূর করে, বুর্জোয়া জগতের আশাবাদে ফাটল ধরায় এবং প্রচলিত সবকিছুর চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে।'[১৭৮] মার্গারেট হারকনেসকে লেখা চিঠিতেও (এপ্রিল ১৮৮৮) এঙ্গেলস লেখকের অঙ্গীকার বা মতাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রকাশের বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করেন বাস্তবতাবাদ শ্রেণী-সহানুভূতি অতিক্রম করে যায়, তার লক্ষ্য থাকে শুধু বাস্তবতা। মার্গারেট হারকনেসের "সিটি গার্ল" উপন্যাসটি একটি স্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি বলে তিনি লেখিকার শিল্পবোধের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'রচয়িতার মতামত যতবেশি গুপ্ত থাকে শিল্পসৃষ্টির জন্য তা ততবেশি মঙ্গলজনক হয়। যে বাস্তবতাবাদের প্রতি আমি ইঙ্গিত করেছি তা লেখকের মতামত বহির্ভূত হয়েও প্রকাশিত হতে পারে।'[১৭৯] তিনি নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিরপেক্ষতার অসামান্য উদাহরণ হিসেবে ব্যালজাকের উপন্যাসের উল্লেখ করেন। এঙ্গেলস অঙ্গীকারবদ্ধ বিশেষ মতাদর্শের প্রচারধর্মী সাহিত্যের শিল্পগুণ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও, পরবর্তী রুশ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী তাত্ত্বিকেরা সাহিত্যের শিল্পগুণের ব্যাপারে মোটেও ভাবিত হন নি। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রচারই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে তাঁরা ঘোষণা করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন যে, সাহিত্যে স্পষ্টভাবে লেখকের শ্রেণী আনুগত্য প্রকাশিত হবে। সামাজিক বাস্তবতার উপস্থাপন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখকের লক্ষ্য হলেও শুধুমাত্র শ্রমজীবী সর্বহারা সমাজবাস্তবতার উপস্থাপনায়ই তিনি মনোযোগী হবেন। লেনিন তাঁর 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' (১৯০৫) প্রবন্ধে বলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাহিত্যকে হতে হবে সমগ্র প্রলেতারিয় কর্মযোগের একটি অংশ। এ-সমাজের সাহিত্যকে আর ব্যক্তিক শিল্প-সৃষ্টি বলে গণ্য করা যাবে না এবং লেখককে অবশ্যই থাকতে হবে পার্টি সংগঠনের ভেতর। অর্থাৎ প্রতিটি লেখক হবেন পার্টির মতাদর্শে দীক্ষিত এবং সাহিত্যকে হতে হবে রাজনীতিক অঙ্গীকার প্রচারের মাধ্যম। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েট লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে ঝদানভ ঘোষণা করেন, 'হ্যাঁ, সোভিয়েট সাহিত্য উদ্দেশ্যপ্রবণ, কারণ শ্রেণীসংগ্রামের কালে এমন সাহিত্য হতেই পারে না যা শ্রেণী সাহিত্য নয়, যা উদ্দেশ্যপ্রবণ নয়,

---

১৭৮. Engles. Friedrich, Ibid, P. 493.

১৭৯. Ibid, P. 484.

Dhaka University Institutional Repository

যা রাজনীতিপ্রবণ নয়।'[১৮০] তিনি মনে করেন লেখকের রাজনীতিক অঙ্গীকার স্পষ্টভাবে প্রকাশের মধ্যদিয়ে এ-সাহিত্য দুটি ভূমিকা পালন করে। প্রথমত এটি আদর্শগত রূপান্তর সাধন করে এবং দ্বিতীয়ত সর্বহারা শ্রমজীবীদের সমাজতন্ত্রের চেতনা শিক্ষা দেয়। ঝদানভ বলেন, 'লেখকের বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা সাধন করবে আদর্শগত রূপান্তর এবং শ্রমজীবী মানুষকে সমাজতন্ত্রের চেতনা শিক্ষা দেবে।'[১৮১] সাহিত্য ও সাহিত্যসমালোচনার এ-পদ্ধতিকেই তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ বলে মনে করেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে বাস্তবতার নিরপেক্ষ অবিকল উপস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এখানে বাস্তবতার পাশাপাশি রোমান্টিক কল্পনাও পায় সমান গুরুত্ব। বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও অগ্রযাত্রার ইতিকথা বর্ণনাই এ-শ্রেণীর লেখকের একমাত্র লক্ষ্য, এ-কারনে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের বিষয় পরিধি সীমাবদ্ধ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখক কল্পনা করেন শুধু শোষণমুক্ত সুন্দর সর্বহারা সমাজের কথা, ব্যক্তি জীবন তাঁর বিবেচ্য নয়। এবং সেইসঙ্গে তিনি প্রচার করেন রাজনীতিক মতাদর্শ। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্য হয়ে ওঠে একটি রাজনীতিক মতাদর্শের যান্ত্রিক প্রচারমূলক রচনা মাত্র।

---

১৮০. উদ্ধৃত, Selden. Reman., Ibid, P. 28.

১৮১. Gorky. Maxim, and other. 'Comments on Socialist Realism'. P.487.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাঙলা সাহিত্যে বাস্তবতাবাদের স্বরূপ

৪·১ উনিশ শতকে বাস্তবতার ধারণা ।

বাঙলা সাহিত্যে আদিযুগ থেকেই বাস্তবতার উপস্থাপন ঘটেছে । তবে তা ছিলো বাস্তবতার অসচেতন ও অপরিহার্য উপস্থাপন । উনিশ শতকের সূচনা থেকে বিভিন্ন নকশায় কিছুটা সচেতনভাবে সমকালীন সমাজ ও জীবন বাস্তবতা চিত্রনের প্রক্রিয়া শুরু হয় । " কলিকাতা কমলালয় " (১৮২৩), "নববাবু বিলাস " (আনু ১৮২৫), "নববিবি বিলাস " (আনু ১৮৩১) " আলালের ঘরের দুলাল " (১৮৫৮), "হুতোম প্যাঁচার নকশা" (১৮৬২ ?) ইত্যাদি নকশাগুলোতে সমকালীন কলকাতার সমাজজীবনবাস্তবতার খণ্ডিত অংশের উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু বাস্তবতাসম্পর্কে বাঙালী লেখকদের কোনো ধারণা ও মতামত প্রাচীনকালে থেকে উনিশ শতকের প্রথম চারদশক পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য । বাস্তবতা সম্পর্কে বাঙালী লেখকেরা কী-ধারণা পোষণ করতেন, সাহিত্যে বাস্তবতার কোন অংশটুকু তাঁরা উপস্থাপনা যোগ্য বলে মনে করেছেন এবং বাস্তবতা বলতে তাঁরা কী বুঝতেন—এ-সম্পর্কে বাঙালী লেখকদের কোনো উক্তি বা মতামত প্রাচীন ও মধ্যযুগে যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি উনিশ শতকের প্রথম চারদশকের সাহিত্যেও পাওয়া যায় না । বাস্তবতাসম্পর্কে কোনো লেখকের প্রথম ধারণা বা মতামত পাওয়া যায় উনিশশতকের পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে । ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে " বিবিধার্থ সংগ্রহ"পত্রিকায় বিভিন্ন নকশার সমালোচনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বাস্তবতাবিষয়ক ধারণা অনেকটা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায় । মে-জুন ১৮৫৮ -এর "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকায় টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষাভঙ্গীর প্রশংসার মধ্য দিয়ে তাঁর বাস্তবতাবিষয়ক মতামত প্রকাশিত হয় । বাহ্যবাস্তবতা বা সমকালীন সমাজজীবনের কোনো কোনো বিষয়ের অবিকল উপস্থাপনের একটি রচনাকে ' সর্বতোভাবে সুন্দর ' করে বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র ।[১] " আলালের

১· ভূমিকা, টেকচাঁদ ঠাকুর, "আলালের ঘরের দুলাল", (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্তদাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) পৃঃ ।। ০

Dhaka University Institutional Repository

ঘরের দুলাল " প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '...... তাঁহার কল্পিত নায়কেরা যে যাহা কহিয়াছে তাহা অবিকল ও সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে। কি ইতর লোকের অশ্লীল শ্লেষোক্তি, কি পণ্ডিতের অসাবধান সময়ের সামান্য-কথা, কিছুরই কোন অংশে অন্যথা হয় নাই।'[২] অর্থাৎ কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার সংশ্লেষসাধনের মধ্য দিয়ে কোনো শিল্পসৃষ্টিকে বাস্তবতার প্রতিলিপিসদৃশ এবং 'সর্ব্বতোভাবে সুন্দর' করে তোলা হয় বলে তিনি মনে করেন। তবে স্লেষোক্তি ও রূঢ় বাস্তবতা উপস্থাপনার ব্যাপারটিকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নি। " নববাবু বিলাস " ও " নববিবি বিলাস " নকশার সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বাস্তবতাবিষয়ক এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রকাশ পায়। তিনি মনে করেন পীড়াদায়ক বাস্তবতা বা সত্যের অবিকল উপস্থাপনা অনুচিত, তাতে বাস্তবতার প্রতিরূপ নির্মান করা হয় বটে কিন্তু ওই বাস্তবতা পাঠকদের ব্যথিত করে। অর্থাৎ সহৃদয় পাঠকের নীতিবোধে আঘাত করে এমন অনৈতিক, পীড়াদায়ক বাস্তবতার উপস্থাপনা না করারই পক্ষপাতী রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি বলেন, 'তদনন্তর যথার্থ ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে 'নববাবুবিলাস' নামক গদ্যপুস্তকের উল্লেখ করা কর্তব্য। তাহা ত্রিংশতধিক বর্ষ হইল একজন সুচতুর ব্যক্তি প্রস্তুত করেন। তাহাতে পিতার অমনোযোগে বালকের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইলে স্ত্রৈণ্যতা ও পানদোষে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রজ্জ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে-সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিলো না। অল্পকালে হতপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত। এই পুস্তকের আদর্শে অপর কোন রসোল্লাসি ব্যক্তি 'নববিবি বিলাস' নামক ব্যঙ্গ্য প্রস্তুত করেন। ভদ্র স্ত্রী কুলটা হইলে যে দুর্গতি হয় তাহারই বর্ণন করা তাঁহার অভিপ্রেত, এবং সে উদ্দেশ্য গ্রন্থে উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে উভয় গ্রন্থকার কিয়দ্দ্যা উদ্দেশ্যের অনুরোধে এবং কিয়দ্দ্যা সহৃদয়তার অভাবে আপন২ গ্রন্থ অশ্লীলতায় লিপ্ত করিয়াছেন। যদিচ বর্ণিত বিষয় সত্য বটে, তথাপি তাহার পাঠে সহৃদয়দিগকে ব্যথিত হইতে হয়।'[৩] বাস্তবতার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নৈতিকতা-অনৈতিকতার বিষয়টি

---

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ।। ০

৩. ভূমিকা, ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, " নববাবু বিলাস", (ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা- ৭,' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪), পৃঃ ৵০-। ০

Dhaka University Institutional Repository

তাকে ভাবিত করেছে, সাহিত্যে বাস্তবতার সকল অংশের নিরপেক্ষ উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন তিনি।

এ-সময়ের বিভিন্ন গ্রন্থের নামকরণ ও রচনার ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখকদের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বাস্তবতাবিষয়ক ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায়। এ সময় লেখকদের অনেকে তাঁদের রচনাকে গণ্য করতে থাকেন 'দর্পণ'রূপে, যে দর্পণ তাঁরা সমাজের একটি বিশেষ অংশের পরিচয় তুলে ধরার কাজে ব্যবহার করেছেন। "নীলদর্পন", "জমিদার দর্পণ" ইত্যাদি নামকরণ এবং গ্রন্থে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু লেখকদের লেখকদের এই প্রবণতাকে নির্দেশ করে। কালীপ্রসন্নসিংহ "হুতোম প্যাঁচার নকশা-"র(১৮৬১)ভূমিকায় তাঁর রচনার লক্ষ্য বা ভূমিকা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তাতে তাঁর বাস্তবতা বিষয়ক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায়। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি জানান যে তাঁর গ্রন্থের কোনো কাহিনী অলীক কিংবা কাল্পনিক নয়। দর্পণে যেমন বাহ্যজগত অবিকল প্রতিবিম্বিত হয়, তাঁর গ্রন্থেও তেমনি সমাজবাস্তবতার অবিকল প্রতিফলন ঘটেছে। এ-কারণে তিনি তাঁর নকশাটিকে শুধু 'আরসি' বলে আখ্যা দেবার কথাও ভেবেছিলেন। তিনি ভূমিকায় বলেন, '........ নকশায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই - সত্য বটে অনেকে নকশা-খানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এইমাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, ...নকশা-খানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেশ কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হাঙ্গাম দেখেশুনে- ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধরতে আর সাহস হয় না, ...।'[৪] অর্থাৎ সমাজবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনের পক্ষপাতী কালী-প্রসন্ন সিংহ; যদিও তাঁর রচনায় সমাজের একটি খণ্ডাংশের জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে, সমগ্র

---

৪. কালিপ্রসন্ন সিংহ, ভূমিকা, হুতোম প্যাঁচার নকশা (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা-৯, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ।।০।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজজীবন বাস্তবতা নয়। লেখকের বাস্তবতা উপস্থাপনার এই প্রবণতাকে 'দর্পণতত্ত্বের' বা 'অবিকল উপস্থাপবাদের' অন্তর্গত বলে নির্দেশ করা যায়। বাস্তবতা উপস্থাপনার এই প্রবণতাটি খুব সামান্য হলেও লক্ষ্য করা যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ববর্তী বিভিন্ন নকশাকারের মধ্যেও, যদিও তাঁরা তাঁদের রচনায় বাস্তবতা বিষয়ক কোনো মতামত বা ধারণা ব্যক্ত করেন নি। উনিশ শতকের প্রথম বাঙালী নকশাকার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) "নববাবুবিলাস" "নববিবিবিলাস"-এও সমকালীন কলকাতার বাবু-জীবনের অবিকল প্রতিরূপই তুলে ধরা হয়। সমকালীন সমালোচক রাজেন্দ্রলাল মিত্র "নববাবুবিলাস" এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে নকশায় বর্ণিত 'বাবুর আদর্শ' সমকালীন কলকাতায় 'অপ্রাপ্য' ছিলো না, বরং অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন অনেক ধনাঢ্য অপরিণামদর্শী বাবুকে "অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত।'[৫] "আলালের ঘরের দুলাল"-এও সমকালীন কলকাতার বাবুজীবনেরই উপস্থাপনা ঘটেছে। যদিও সমাজবাস্তবতার সকল অংশের উপস্থাপনা এই নকশাকারদের লক্ষ্য ছিলো না, তাঁরা সমাজজীবনের একটি অংশের ক্লেদ বিকার উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতেই আগ্রহী ছিলেন।

বাস্তবতা বিষয়ক ধারণা বা মতামতের প্রত্যক্ষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের শেষাংশে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থসমালোচনা ও নানা আলোচনায়। প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪) উনিশ শতকের আশির দশকে একটি সংস্কৃত গ্রন্থের সমালোচনামূলক প্রবন্ধে সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন কল্পনাই কাব্যের প্রাণ, তবে বাস্তবউপাদানের ওপর ভিত্তি করেই লেখক সৃষ্টি করবেন কাল্পনিক সুন্দর ভুবন। অর্থাৎ বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণে এক আদর্শায়িত বাস্তবতার উপস্থাপনার পক্ষপাতী তিনি। তিনি বলেন, "সকল কাব্যেরই সারাংশ কবির কল্পিত বস্তু বই আর কিছুই নহে, তবে কোন কবির কোন কল্পিত বস্তু কোন কালে বাস্তব উপাদানের বিনাভাবে সংঘটিত হয় নাই- হইতেও পারে না।'[৬] অন্যত্র তিনি সাহিত্যে সমাজবাস্তবতার বিশ্বস্ত উপস্থাপনার কথা বলেছেন, তিনি মনে করেন

---

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "নববাবু বিলাস", পৃঃ ৵০,- ০

৬. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'উত্তর চরিত' গ্রন্থের সমালোচনা, বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথমভাগ), (চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ) পৃঃ - ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা উপস্থাপনা কালে লেখক থাকবেন নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিক । সমাজবাস্তবতার ভালো ও সুন্দর অংশের চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অসুন্দর ও দারিদ্র্যাবস্থার চিত্রণও আবশ্যক বলে মনে করেন তিনি । কারণ এর মধ্য দিয়েই বাস্তবতার বিশুদ্ধ উপস্থাপনা সম্ভব । সমাজজীবনের দারিদ্র্যাবস্থাকে কুৎসিত ও হতশ্রী মনে করে-কোনো লেখক যদি তাঁর রচনায় শুধু সমাজজীবনের সুন্দর ও ঐশ্বর্যময় অংশেরই উপস্থাপনা করেন, তবে ওই রচনা হয়ে উঠবে অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব । তিনি বলেন, ' সমাজ চিত্রনে যে দারিদ্র্যাবস্থার চিত্রন অত্যাবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই । কারণ সকল সমাজেই দারিদ্র্যের অতিবিপুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । এবং কোন বস্তুর বৃহত্তম ভাগের অনুরূপ চিত্র না হইলে, সে চিত্র সে বস্তুরই হইতে পারে না ।'[৭]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) বাস্তবতা বলে গণ্য করেছেন আমাদের চারপাশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতকে, যে সমাজপ্রতিবেশে আমরা দৈনন্দিন জীবন যাপন করি ওই প্রতিবেশ, পুনরাবৃত্তি - ময় প্রাত্যহিক জীবন, সংস্কার ইত্যাদি সবকিছুই ওই বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু তিনি সাহিত্যে এই বাস্তবতার অবিকল অনুপুঙ্খ উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন । তিনি চান বাস্তবউপাদান ও কল্পনার মিশ্রনে সৃষ্ট আদর্শায়িত সুন্দর বাস্তবতা । নানা প্রবন্ধ, সমালোচনায় বঙ্কিমের বাস্তবতা বিষয়ক ধারণা ও মতামত প্রকাশ পেয়েছে, সাহিত্যে বঙ্কিম কোন্ ধরনের বাস্তবতার পক্ষপাতী তাও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন । তবে বাস্তবতাবাদী রচনার প্রতি বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা একইরকম থাকেনি । উনিশ শতকের সত্তরের দশকে বঙ্কিম বাস্তবতার প্রতিলিপি রচনাকে অবজ্ঞার দৃষ্টি দেখেছেন । এ-সময় তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির পক্ষপাতী । কিন্তু উনিশ শতকের আশির দশকের শেষভাগে তিনি বাস্তবতার প্রতিলিপিমূলক রচনার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেননি । বরং এ-সময় দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব ও ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যপ্রতিভার আলোচনা, বঙ্গদর্শনে বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে স্বভাবানুকারী রচনা বা বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনধর্মী রচনাও মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টি বলে গণ্য হতে পারে, প্রশংসিতও হতে পারে । "বিবিধ সমালোচনা" (১৮৭৬) গ্রন্থের অন্তর্গত ' উত্তরচরিত ' প্রবন্ধে বাস্তবতাবাদী রচনা সম্পর্কে বঙ্কিম বলেন যে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন

---

৭. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ' মৃচ্ছকটিক ' গ্রন্থের সমালোচনা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে অনুলিপি করা মাত্র। রচনায় বাহ্যবাস্তবতার প্রতিকৃতি নির্মাণকে বা অনুলিপি মাত্রকে তিনি 'সৃষ্টি' বলে গণ্য করেন নি।[৮] তিনি মনে করেন বাহ্যবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা কোনো কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। এশ্রেণীর রচনায় লেখকের অনুলিপি করার ক্ষমতার প্রশংসা করা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। বাহ্যবাস্তবতার অবিকল প্রতিলিপি করাকে বঙ্কিম এ-প্রবন্ধে 'স্বভাবানুকারিতা' বলে আখ্যা দেন এবং এ-শ্রেণীর রচনাকে চিহ্নিত করেন 'স্বভাবানুকারিনী সৃষ্টি' বলে।[৯] বঙ্কিমের মতে আমাদের বাস্তবজগত ও জীবন হচ্ছে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও অসুন্দর। যে রচনায় এই অসুন্দর ও খণ্ডিত বাস্তবতার উপস্থাপনাই থাকে লেখকের লক্ষ্য, সে রচনা কখনোই 'সৃষ্টি' বলে গণ্য হতে পারে না, তাকে শুধু অনুলিপি বলে গণ্য করা যায়। তিনি মনে করেন 'অনুলিপি' ও 'সৃষ্টি' দুটি ভিন্ন ব্যাপার। শুধুমাত্র প্রতিভাশালী কবিই 'সৃষ্টি' করতে পারেন, অনুলিপি কবির অনুলিপিপ্রতিভা নির্দেশ করে মাত্র। তাঁর মতে অনুলিপি অগৌরবজনক। তিনি বলেন,'এই জগৎ ত সৌন্দর্যময়-তাহার প্রতিকৃতিমাত্রই সৌন্দর্যময়। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতিমাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি-অনুলিপিমাত্র-তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতিমাত্র নহে-তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না।'[১০] বাহ্যবাস্তবতা ও কবির সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বঙ্কিম বলেন যে প্রকৃতি বা বাহ্যবাস্তবতা 'অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পৃষ্ট, পুরাতন এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন- সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।'[১১] বঙ্কিমের মতে প্রকৃতি বা

৮· বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'উত্তর চরিত' "বিবিধ প্রবন্ধ"(প্রথমখণ্ড), বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয়খণ্ড) সাহিত্যসংসদ কলিকাতা, পৃঃ ১৩৬১, ১৩৯০) পৃঃ ১৮৪।

৯· পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২।

১০· পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৪।

১১· পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি স্বভাবানুকারী রচনাও অসম্পূর্ণ । কারণ এ-শ্রেণীর রচনা সৌন্দর্যের 'চরমোৎকর্ষ সৃজনে ' ব্যর্থ । শুধু বাহ্যবাস্তবতার প্রতিলিপি তুলে ধরে পাঠককে ক্ষণকালের জন্য চমৎকৃত করে মাত্র । স্বভাবানুকারী রচনা পাঠককে ক্ষণস্থায়ী সামান্য আমোদ দেয় । বঙ্কিমের মতে সামান্য আনন্দদান কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, কবি ' সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষে সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন । যেহেতু স্বভাবানুকারী রচনার লেখক এই ভূমিকা পালনে ব্যর্থ, তাই বঙ্কিমের মতে স্বভাবানুকারী রচনা অসম্পূর্ণ । তিনি বলেন, ' কেবল . স্বভাবানুকারিনী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই । যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল ; যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম, তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে-কেবল স্বভাবসঙ্গত গুণবিশিষ্ট সৃষ্টিতে সেই আমোদমাত্র জন্মিয়া থাকে । কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়'।[১২] তবে বঙ্কিম বিশুদ্ধ কাল্পনিক সৃষ্টির পক্ষপাতী নন । তিনি মনে করেন বাস্তবতা হবে শিল্পীর প্রাথমিক ভিত্তি । লেখক কল্পনার মিশ্রনে অমার্জিত, অসম্পূর্ণ বাস্তবতাকে মহীয়ান, সুসম্পূর্ণ, নিখুঁত ও নতুন করে তোলেন। সৃষ্টি করেন আদর্শ সুন্দর । তাঁর মতে ' সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।'[১৩] এই আদর্শ-সুন্দর সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাস্তবতা উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে । তাঁর মতে সাহিত্য বাস্তবতানির্ভর হবে, বাস্তবতাসর্বস্ব হবে না । কিন্তু কোনো সাহিত্য বাস্তবভিত্তিহীন হবেনা । কারণ বাস্তবভিত্তিহীন সাহিত্য উৎকৃষ্ট রচনা হলেও তা হবে অসম্পূর্ণ ও অবাস্তব রচনা । তাই তাঁর মতে কবির সৃষ্টিকে একই সঙ্গে হতে হবে 'স্বভাবানু-কারী' ও ' সৌন্দর্যবিশিষ্ট।' তিনি বলেন, 'কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই । .... আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরবগ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সৃষ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকায় "আলেফলয়লা" পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে।'[১৪]

---

১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশশতকের আশির দশকে বঙ্কিম যখন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির বদলে ধর্মতত্ত্বমুখী, ওই সময়ে প্রকাশিত রচনায় দেখা যায় বাস্তবতা ও 'স্বভাবানুকারিনী' রচনার ব্যাপারে তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিপূর্বে বাহ্যবাস্তবতা বা 'প্রকৃতি'কে বঙ্কিম গণ্য করেছেন অসম্পূর্ণ, অমার্জিত ও 'দোষসংস্পৃষ্ট' বলে এবং 'স্বভাবানুকারিনী' রচনা-কে গণ্য করেছেন অসম্পূর্ণ ও সামান্য বলে। তাঁর নানা মন্তব্যে এ-শ্রেণীর রচনার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য গোপন থাকে নি। কিন্তু আশির দশকে বঙ্কিম 'স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত 'সৌন্দর্য' বিশিষ্ট সৃষ্টির প্রশংসার পাশাপাশি 'স্বভাবানুকারী' রচনারও প্রশংসা করেন। ইতিপূর্বে বাস্তবতার প্রতিলিপি অঙ্কনকে 'সৃষ্টি'র মর্যাদা দেননি, নকলনবীশী বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ-পর্যায়ে বাস্তবতার প্রতিলিপি রচনাকে সৃষ্টিশীলতার একটি ধারা বলে গণ্য করেন। দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন স্বভাবাতিরিক্ত রচনার পাশাপাশি বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা-বাদী রচনা বা স্বভাবানুকারী রচনাও সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে মর্যাদা পেতে পারে। তবে বঙ্কিমের এই স্বীকৃতি তাঁর 'সৃষ্টি' ও 'প্রতিকৃতি' বিষয়ক ধারণা পরিবর্তনের ফল নয়। বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর এই সহিষ্ণুতা এবং স্বভাবানুকারী রচনাকে 'সৃষ্টি' বলে অনুমোদন দেয়া-এ-সবই হচ্ছে দীনবন্ধু ও ঈশ্বরগুপ্তের প্রতি প্রীতিবশে। বঙ্কিম এ-সময়ও মৌলিকভাবে বিশুদ্ধ শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি, বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণের নীতিতেই বিশ্বাসী; তবে এ-দুই লেখকের প্রতি প্রীতিবশত প্রতিকৃতিনির্মানমূলক রচনাকে স্বীকৃতি দেন এবং সৃষ্টি'র মর্যাদা দেন। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' শীর্ষক আলোচনায়ই ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এ-আলোচনায় ঈশ্বরগুপ্তের কবিপ্রতিভার প্রকৃতি নির্ণয় প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেন, 'সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এতভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সে উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুটরকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এইজন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল ? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না ?'[১৫] এমন প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহারের মধ্যদিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বঙ্কিম প্রায় অনুকম্পাবশে সাহিত্যের উপাদানরূপে অনুমোদন করতে চেয়েছেন এমনসব বিষয়, যা তিনি উচ্চমানের সাহিত্যসামগ্রী বলে মনে করেন না। তাঁর এ-মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরবর্তী মন্তব্যে। তিনি বলেন,

---

১৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', <u>(বঙ্কিম রচনাবলী)</u> (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ ৮৫০।

Dhaka University Institutional Repository

' রহিল বৈকি । যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী । কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন ? তাহাতে কি কিছু রস নাই ? কিছু সৌন্দর্য্য নাই ? আছে বৈ কি ? ঈশ্বরগুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বরগুপ্ত তাহার কবি । তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি ।'[১৬] অর্থাৎ বঙ্কিমের মতে আদর্শ ও সৌন্দর্য নিয়ে কাব্যরচনা করেন মহৎপ্রতিভারা । আরেক শ্রেণীর কবি আছেন যারা মগ্ন থাকতে চান প্রাত্যহিক বাস্তবতার দুঃখসুখময় সাদাসিদে আটপৌড়ে জীবন গাথা রচনায় । তারা তুচ্ছতার মধ্যেও সৌন্দর্য অন্বেষণ করেন,তাদের এই দৈনন্দিন বাস্তবতামগ্নতাও প্রশংসার দাবীদার । তাঁরা মহৎ না হলেও অবশ্যই তাঁদের অসম্পূর্ণ বাস্তবতায় সৌন্দর্য অন্বেষণের এই প্রবণতা প্রশংসার দাবীদার । বঙ্কিম মনে করেন তাঁরা প্রশংসিত হবেন সামান্য বাস্তবতার সৌন্দর্য অন্বেষণকারীরূপে । এ-শ্রেণীর কবিদের বাস্তবতার প্রতিমূর্তি নির্মান প্রবণতা বা স্বভাবানুকারিতাকে বঙ্কিমের কাছে মনে হয়েছে বাস্তবসৌন্দর্যসৃষ্টি বলে । তাই এসময় স্বভাবানুকারী রচনাকে 'সম্পূর্ণ সাহিত্য' বলেই গণ্য করেন তিনি । সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা বিষয়ে বঙ্কিমের সহিষ্ণু ও নমনীয় মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া-যায় নানা গ্রন্থ সমালোচনায়ও । যেমন ১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় ' বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় "ঋতুবর্ণন" গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ' কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য; বর্ণন ও শোধন ········কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হয় না- এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলে সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম । অতএব কেবল বর্ণনামাত্রই কাব্য।'[১৭]

বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনধর্মী সাহিত্যকে নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিম নানা পরিভাষা ব্যবহার করেন । কখনো বাস্তবতার অবিকল প্রতিলিপিকরণের প্রবণতাকে চিহ্নিত করেন ' স্বভাবানুকারিতা' বলে এবং অবিকল উপস্থাপনবাদী সাহিত্যকে অভিহিত করেন'স্বভাবানুকারিনী' রচনা বলে ।[১৮] কখনো

১৬· পূর্বোক্ত, পৃঃ, ৮৫০

১৭· বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ঋতুবর্ণন' , ঐ, পৃঃ ৯০৬

১৮· বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'উত্তরচরিত' , ঐ,পৃঃ ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতার প্রতিকৃতিমূলক রচনা ও বাস্তবতাবাদী লেখককে নির্দেশে তিনি 'Realism', 'Realist' ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করেন,[১৯] কখনো এ-শ্রেণীর রচনাকে অভিহিত করেন 'বর্ণনা' বলে। বাহ্যবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাকেই বঙ্কিম Realism বলে নির্দেশ করেন, এবং বঙ্কিমের মতে যিনি তুচ্ছ, সামান্য, স্থূল প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক বাস্তবতার অশোধিত প্রতিকৃতি তুলে ধরেন তিনিই Realist। বাস্তবতাবাদী রচনার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেন, 'যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল "যথা দৃষ্টংতথা লিখিতং" তাহাকেই আমরা 'বর্ণনা' বলিয়াছি।'[২০] বঙ্কিমের মতে সৌন্দর্য সৃষ্টি এ-শ্রেণীর কবিদের লক্ষ্য নয়, তাঁদের লক্ষ্য বাস্তবতার যথাযথ চিত্রন। তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।'[২১] বঙ্কিম মনে করেন স্বভাবানুকারী রচনায় বা বর্ণনামূলক কাব্যে জীবন ও বাস্তবতার সুন্দর-অসুন্দর দুটি অংশই সমান গুরুত্ব পাবে। এ-শ্রেণীর সাহিত্যে মনুষ্যস্বভাবের মহৎদিকটি যেমন গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হবে, তেমনই গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হবে অসুন্দর ও কুৎসিত'দিকটি। অর্থাৎ বাস্তবতার সামান্য অসামান্য- দুঅংশকেই এশ্রেণীর সাহিত্যে সমানগুরুত্ব দেয়া হবে। বঙ্কিমের মতে সম্পূর্ণ বর্ণনা কাব্য তাকেই বলা হয়, যাতে মনুষ্যচরিত্রের দুভাগই নিরপেক্ষভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা প্রমুখের রচনাকে বঙ্কিম অসম্পূর্ণ স্বভাবানুকারী রচনা বলে মনে করেন, কারণ এ-সব রচনায় মনুষ্যচরিত্রের মহৎগুণগুলো হয়েছে উপেক্ষিত। বঙ্কিমের মতে বর্ণনামূলক কাব্যে সুশ্রী ও সহনীয় বাস্তবতার সঙ্গে অসুন্দর বা কুৎসিৎ বাস্তবতা উপস্থাপিত হবে এ-কারণে যে 'জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত, অনেক সুন্দরে বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময় আনুষাঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে।'[২২]

---

১৯. বঙ্কিমচন্দ্র, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', পৃ. ৮৫০,

২০. বঙ্কিমচন্দ্র, "ঋতুবর্ণনা", ঐ, পৃঃ ৯০৭,

২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০৬,

২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০৬।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিম ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের কাব্যকে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্বভাবানুকারী রচনা বলে গণ্য করেন । কারণ ঈশ্বরগুপ্ত কাব্যে তুচ্ছ, সামান্য, অসুন্দর জীবন ও সমাজ বাস্তবতার যথাযথ প্রতিকৃতি তুলে ধরায় সফল হয়েছেন । তিনি বলেন ঈশ্বরগুপ্ত গতানুগতিক কবিদের মতো সকল বিষয়ের সৌন্দর্যটুকু মাত্র খোঁজেন নি, তিনি মনোযোগী ছিলেন বাস্তবতার প্রতিলিপি রচনায় । বঙ্কিম ঈশ্বরগুপ্তকে ' Realist ' অভিধায় অভিহিত করেন । ঈশ্বরগুপ্তের বাস্তবতার স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেন, ' দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দু শ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও—তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান । .... তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুনগোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া সত্যের সংসারের একরকম খাঁটি কাব্যরস বাহির করেন । .... ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায় । ...... তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া, বলিবে, "ধন্য স্বামিপুত্র সেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য !" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাঁহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বনেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাঁধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ডভোজন হইল এবং কুটুম্ব ভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল ।'[২৩] দীনবন্ধু মিত্রের রচনায়ও বঙ্কিম সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত স্বভাবানুকারিতার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন । দীনবন্ধুমিত্র প্রাত্যহিক বাস্তবতার সাধারণ মানুষদের জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা করেছেন, তাঁর রচনায় এই সাধারণেরা তাদের সকল বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিক সাদৃশ্য ও ভিন্নতাসহ উপস্থাপিত হয়েছে । বঙ্কিমের মতে সাধারণ মানুষের যথাযথ প্রতিকৃতি অঙ্কনের মধ্য দিয়েই দীনবন্ধুর রচনা সম্পূর্ণতা পেয়েছে । বঙ্কিম বলেন,' তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি- তাহারা ঠিক আদুরী । নদের চাঁদ হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা

---

২৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', ঐ, পৃঃ ৮৫০-৮৫১,

Dhaka University Institutional Repository

হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে—ঠিক অমনি কুটনু মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এইটুকু গেল তাঁহার Realism।'[২৪] অর্থাৎ সামান্য, অসম্পূর্ণ বাস্তবতা ও তুচ্ছতাপরিপূর্ণ অসুন্দর দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন, ভালো-মন্দে গড়া সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনই বাস্তবতাবাদী রচনার বৈশিষ্ট্য বলে বঙ্কিম মনে করেন। তাঁর মতে ভালো ও মন্দে মেশানো সাধারণ বাস্তবজীবনই এ-শ্রেণীর রচনার উপজীব্য।

তবে বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসে স্বভাবানুকারিতার উপস্থিতি দেখা যায় না। সমকালীন সমাজজীবন নির্ভর "বিষবৃক্ষ"(১৮৭৩) ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" (১৮৭৮) উপন্যাসে বঙ্কিম বাস্তবতার প্রতিকৃতি রচনা করেন নি, বরং এ-উপন্যাস দুটিতে বঙ্কিম সাধারণ বাস্তবতাকে দেখেছেন পরিহাসের দৃষ্টিতে। এখানে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বজনিত সঙ্কটের উপস্থাপনাই তাঁর লক্ষ্য। সামান্য, সাধারণ, প্রাত্যহিকতার বর্ণনার সময় তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা পালন করেন নি; নানা পরিহাসের মধ্যদিয়ে ওই বাস্তবতার সামান্যতা প্রকট করে তোলেন, কখনো ওই বাস্তবতাকে উপহাসও করেন। উপন্যাসের বাস্তবতা চিত্রণ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য করেননি, তবে "সমাজ" উপন্যাসে নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তার মধ্য দিয়ে বাস্তবতাউপস্থাপনা বিষয়ক মতামতের পরোক্ষ প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলেন, 'সংসার ও সমাজ দোষ ও গুণে গঠিত-যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।'[২৫] ভালো-মন্দ মিশ্রিত যে সংসার ও সমাজে তিনি বাস করেন তার অবিকল চিত্রনেরই

---

২৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রায় দীনবন্ধুমিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা', ঐ, পৃঃ ৮৩২।

২৫. রমেশচন্দ্র দত্ত, "সমাজ", রমেশরচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস), সাহিত্য সংসদ কলকাতা প্রপ্র, ১৯৬০, দ্বিমুং ১৯৭০, পৃঃ ৫১১।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষপাতী রমেশচন্দ্র দত্ত। সামাজিক উপন্যাস "সংসার কথা" (১৮৮৬),"সমাজ" (১৮৯৪)-এ রমেশ-চন্দ্র সংসার ও সমাজবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা করেছেন। তবে তাঁর বাস্তবতা চিত্রনের পেছনে ছিলো উদ্দেশ্যবাদ। বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা তাঁর লক্ষ্য নয়, তাঁর লক্ষ্য মতবাদপ্রচার। "সমাজ" উপন্যা-সের শেষপরিচ্ছেদে তিনি বলেন, 'সমাজে দোষ অনেক আছে, কিন্তু আমি দোষ অপেক্ষা সদগুণই অধিক দেখি, সুতরাং আমাদের ভবিষ্যতের উন্নতির আশা রাখি।'[২৬] বাস্তবতাবাদী উপন্যাস রচনার অভিপ্রায়ে রমেশচন্দ্র সংসার ও সমাজ বাস্তবতার উপস্থাপনা করেন নি। ভালো-মন্দ মিশ্রিত সমাজবাস্তবতার অবি-কল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পাঠককে সমাজের স্বরূপ জানতে দেয়া ও সমাজের উন্নতির পথ নির্দেশই রমে-শচন্দ্রের লক্ষ্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত হয় নানা গ্রন্থ সমালোচনা ও প্রকাশিত বিভিন্ন উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের সমালোচনামূলক নানা রচনা। কিন্তু এসব রচনায় সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গ প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, এসব রচনায় লেখকদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিলো নৈতিকতা প্রসঙ্গে বা নৈতিকতা রক্ষায় সাহিত্যের ভূমিকা প্রসঙ্গে। প্রধান লেখকদের উপন্যাস ও উপন্যাসের চরিত্রদের বিচার করা হয় নৈতিকতার মানদণ্ডে, এমন কী-গৌণ লেখকদের গ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রেও নৈতিকতার মান-দণ্ড ব্যবহার করা হয়। সমালোচনামূলক কোনো কোনো লেখা ওই সময় নৈতিকতা বিষয়ক বিতর্কও তৈরি করে, এ-সব রচনায় সাহিত্য সমালোচনা গৌণ হয়ে সাহিত্যের নৈতিকতা প্রসঙ্গ প্রধান হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের নৈতিকতা বিষয়ক এসব রচনা ও বিতর্কে বাস্তবতা উপস্থাপনা প্রসঙ্গটি প্রায় উপেক্ষিত হয়, তবে লেখক ও বিতর্ককারীদের দৃষ্টিভঙ্গী, বক্তব্য, অন্যের মত খণ্ডন ও নিজের মত প্রতিষ্ঠার নানা যুক্তিতর্ক মন্তব্য থেকে সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে তাঁদের মনোভাব এবং তাঁদের বাস্তবতাধারণার আভাস পাওয়া

---

২৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১১

Dhaka University Institutional Repository

যায়। এই লেখকেরা বাস্তবতা ও মনুষ্যচরিত্রের নিরপেক্ষ অবিকল উপস্থাপনার বিরোধী। তাঁরা মনে করেন সাহিত্যে শুধুমাত্র বাস্তবতার সুন্দর দিকটি ও মনুষ্যস্বভাবের ভালো দিকটির উপস্থাপিত হবে। তাঁরা রূঢ় ও কদর্যবাস্তবতা এবং মনুষ্যহৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির চিত্রনের বিরোধী। তাঁদের মতে সাহিত্যে কদর্যবাস্তবতা ও কুপ্রবৃত্তির চিত্রনের পরিণাম শুভ হতে পারে না। কারণ ওই চিত্র মানুষকে পাপের প্রতি অনুরক্ত করে তুলবে। তাঁরা মনে করেন 'পাপের ক্ষয় পুণ্যের জয়' দেখানোই হবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং এমন সাহিত্যই হবে মানুষের জন্য কল্যাণকর ও শুভ। কারণ তা মানুষকে পাপের পথ পরিহার করতে ও সংযমসাধনা করার প্রেরণা দেবে। এই নীতিবাদী লেখকেরা অবশ্য একটি শর্তে সাহিত্যে কদর্যবাস্তবতা ও পাপের চিত্রন অনুমোদন করেন। তাঁদের মতে সাহিত্যে কুৎসিত, অন্ধকার পাপময় বাস্তবতার উপস্থাপনা করা যাবে, যদি ওই পাপময় জীবনের বীভৎস পরিণাম নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ এই নীতিবাদীরা সাহিত্যকে ব্যবহার করতে চান একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ওই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে মানুষকে পাপের পথ থেকে দূরে রাখা ও মানুষকে কুপ্রবৃত্তি দমনের শিক্ষা দান। সাহিত্যে উপস্থাপিত বাস্তবতা ওই উদ্দেশ্যসাধনের মাধ্যমরূপে গণ্য হয় তাঁদের কাছে।

১২৮০ বঙ্গাব্দের "বঙ্গদর্শনে" অজ্ঞাতনামা সমালোচককৃত শ্রীরাধানাথ বর্দ্ধন প্রণীত "সরোজিনী" নাটকের সমালোচনায় নৈতিকতার মানদণ্ড ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই সমালোচক প্রবল নীতি - বাদী ও বাস্তবতাবিমুখ। বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনার বিরোধী তিনি, "সরোজিনী" নাটকে রূঢ় বাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে বলে তিনি লেখককে নিন্দা করেন। তাঁর মতে সংসার ও ব্যক্তিচরিত্রে যদিও ভালো-মন্দ দুয়েরই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং সুন্দর সহনীয় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে কদর্য বাস্তবতা ও হৃদয়ের নিকৃষ্টবৃত্তিগুলোও কাব্যের সামগ্রী হতে পারেঠিকই, কিন্তু সাহিত্যে কুৎসিৎ রূঢ় বাস্তবতা ও নিকৃষ্ট হৃদয়বৃত্তির অবিকল প্রতিফলন অনুচিত। তিনি মনে করেন কদর্য ও কুৎসিতের উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট, অনুপুঙ্খ হুবহু চিত্রন স্বাস্থ্যকর নয়। তিনি বলেন, 'স্থানে স্থানে অত্যন্ত কদর্য্য রুচির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। গঙ্গাধরের কথাবার্ত্তা সকল অত্যন্ত নীচ প্রবৃত্তির উদ্দীপক। সত্যবটে সংসারে তাদৃশলোক অনেক আছে, এবং মনুষ্য-হৃদয়ের চিত্রই কাব্যের উদ্দেশ্য। মনুষ্যহৃদয়ের উৎকৃষ্টবৃত্তি যেমন কাব্যের সামগ্রী, নিকৃষ্ট বৃত্তিও তদ্রূপ। রাবন ব্যতীত রামায়ন হইত না। দুর্য্যোধন ব্যতীত মহাভারত হইত না। কিন্তু নিকৃষ্টবৃত্তি সকলের কোন্ ভাগ বর্জ্জনীয়, কোন ভাগ অবলম্বনীয় তাহা যিনি বুঝিতে না পারেন তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।'[২৭] লেখক মনে করেন সংসার ও হৃদয়বৃত্তির সকল অন্ধকার কাব্যের বিষয় হতে পারে-না। ভালোমন্দের নির্বিশেষ অবিকল উপস্থাপনা তাঁর কাছে কুরুচির পরিচায়ক। তিনি মনে করেন কুৎসিত বাস্তবতার চিত্রন জনমনে কদর্য্য ও কুৎসিতের প্রতি আসক্তি জাগাতে সাহায্য করবে এবং সমাজে এর পরিণাম হবে অশুভ। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষণশীল নীতিবাদীর। "সরোজিনী" নাটকে উপস্থাপিত আকাঁড়া-বাস্তবতা তাঁকে পীড়িত করে। এ-গ্রন্থে বাস্তবতার অবিকৃত উপস্থাপনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেন, 'বোধহয়, এই শ্রেণীর ভণ্ডদিগকে ঘৃণিত করানই লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য জন্য এ-প্রকার উপায় অবলম্বনীয় নহে। স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষাইবার জন্য কাহাকেও নরকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কাদা ছানিতে গেলেই কিছু গায়ে লাগে। যে নাটকের কোন নায়কের দ্বারা এই সকল কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা কাহারও পঠনীয় বা দর্শনীয় নহে।'[২৮] এ-আলোচনায় লেখকের বাস্তববিমুখতা ও রক্ষণশীল মানসিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার নিরপেক্ষ অবিকল উপস্থাপনা চান না, চান বাস্তবতার আংশিক চিত্রন। নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলোর উল্লেখমাত্র করে উৎকৃষ্ট ব্যাপারগুলোর বিশদ চিত্রনই সৎলেখকের কাজ বলে মনে করেন তিনি। যে-রচনায় আকাঁড়া বাস্তবতা অনুপুঙ্খ উপস্থাপিত হয় তাকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলেও মনে করেন তিনি।

বাস্তবতা সম্পর্কে একই রকম অতি রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় "আর্য্যদর্শনে" প্রকাশিত আলোচনা- সমালোচনায়। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পৌষসংখ্যা "আর্য্যদর্শন" পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" (১৮৭৫) উপন্যাসের শৈবলিনী চরিত্রের সমালোচনামূলক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে নৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। 'শৈবলিনী' শীর্ষক এই সমালোচনামূলক রচনার লেখক ছিলেন পূর্ণচন্দ্রবসু। বিতর্কের একদিকে ছিলেন বাস্তবতার আংশিক উপস্থাপনার পক্ষপাতী নীতিবাদী রক্ষণশীলেরা, অন্যদিকে সাহিত্যে বাস্তবতার সকল অংশের উপস্থাপনার পক্ষপাতীরা। পূর্ণচন্দ্রবসু, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রমুখ রক্ষণশীলতার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী পক্ষ নেন বাস্তবসম্মত সাহিত্য সৃষ্টির। নীতিবাদী রক্ষণশীলেরা বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনার বিরোধী। তাঁদের মতে, মানুষের মধ্যে সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি এ-দুয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা

---

২৭. অজ্ঞাতনাম, 'প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন, সরোজিনী নাটক', "বঙ্গদর্শন", ? ১২৮০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৬১।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

গেলেও, সাহিত্যে মনুষ্যহৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির চিত্রন না করাই সঙ্গত। কারণ এ-সব 'পাপচিত্রের ধর্মনৈতিক ফল কখনও সাধু হইতে পারে না।[২৭] সাধুচিত্র উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সৎ উপদেশ প্রদান ও ব্যক্তিকে উন্নতনৈতিক জীবনগঠনে সাহায্য করাই লেখকের উদ্দেশ্য বলে রক্ষণশীল নীতিবাদীরা মনে করেন। অন্যদিকে বাস্তবতাঘনিষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষপাতীরা রক্ষণশীলদের উদ্দেশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন। তাঁরা মনে করেন সাহিত্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম নয়। সাহিত্যের লক্ষ্য মানবপ্রকৃতি ও বাস্তবতা যথাযথ চিত্রন। বাস্তবতাও মনুষ্যপ্রকৃতির যথাযথ চিত্রনের মধ্য দিয়েই সাহিত্য সম্পূর্ণতা লাভ করে। তাই কুপ্রবৃত্তির চিত্রনকে সমাজস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করে এড়িয়ে গিয়ে শুধু উন্নতবিষয়ের চিত্রন করা হলে সাহিত্য হবে একদেশদর্শী ও অবাস্তব ও অস্বাভাবিক। সাহিত্যকে স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত করার প্রয়োজনেই মনুষ্য স্বভাবের সু ও কুপ্রবৃত্তির অবিকল উপস্থাপনা করতে হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

পূর্ণচন্দ্রবসু তাঁর 'শৈবলিনী' শীর্ষক সমালোচনামূলক প্রবন্ধে বলেন যে বাস্তবতার নিরপেক্ষ ও অবিকল উপস্থাপন লেখকের লক্ষ্য নয়, লেখকের উদ্দেশ্য সমাজ ও ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি সাধন ও পাপের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করা। অর্থাৎ লেখক শুধু নীতিপ্রচারক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র। পূর্ণচন্দ্রবসু মনুষ্যচরিত্রের সাধুভাবরাশির ও সুন্দর বাস্তবতার চিত্রনের পক্ষপাতী, রূঢ় কুৎসিত অসাধু ভাবরাশি ও বাস্তবতার চিত্রনের বিরোধী তিনি। তাঁর মতে সাহিত্য মানবচরিত্রের সাধুভাবের সঙ্গে অসাধুভাবের একত্র চিত্রন অনুচিত। কারন পাপ চিত্র স্বভাবতই উজ্জ্বল ও প্রলোভনময় হয়ে থাকে, এবং পাপ চিত্রের উজ্জ্বলতার কাছে পুণ্য চিত্র ম্লান হয়ে যায়, পরিণামে তা পাঠককে পাপের পথে অগ্রসর হতেই প্রলুব্ধ করে। তিনি বলেন,

> 'অনেক উপন্যাস লেখক মনে করেন, যে মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দেখাইতে হইলে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র দেখান উচিত নহে। এইজন্য যাহারা সেই মানবপ্রকৃতির দোষগুণ উভয়ই একদা প্রদর্শন করেন। তাহারা যে ঔপন্যাসিক পাত্র ও পাত্রিগণের চরিত্র চিত্র

---

২৭. শ্রীপূর্ণচন্দ্রবসু, 'শৈবলিনী', "আর্য্যদর্শন" (চতুর্থখণ্ড), ভাদ্র ১২৮৪, পৃঃ ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

করেন, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে সাধু ভাব এবং কিয়ৎ পরিমাণে অসাধুভাব প্রদান করেন। প্রদান করিয়া এই দোষগুণ উভয়ই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করেন। কিন্তু ইহাতে এই দোষ ঘটে, যে, পাঠক সেই চিত্রকে এতদূর প্রশংসা করিতে শিখে, যে তজ্জন্য তাহার দোষাংশ অনেক পরিমাণে ভুলিয়া যায়। হয়ত সেই দোষ সমুদায়কে নিন্দা ও ঘৃণা না করিয়া অনেকে তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

একপৃষ্ঠায় আমরা দেখি, নায়ক অথবা নায়িকাকে, সমাজের অতি পবিত্র নিয়ম সকল ভগ্ন করিয়া যথেচ্ছা কার্য্য করিতে দেন; কিন্তু পর পৃষ্ঠায় আবার সেই নায়ক বা নায়িকাকে এরূপ সদগুণে বিভূষিত করা হয়, যে তাহাকে না ভাল বাসিয়া এবং তাহার চরিত্রের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তিনি হয় তো এরূপ কোন সাধুকার্য্য করিলেন যাহাতে মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি হইল, এরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিলেন, যাহাতে হৃদয় আপনি সাধুবাদে উৎসাহিত হইল। এরূপ চরিত্রপাঠের সংস্কার কখন সাধু হয় না। যে পাপচিত্র দর্শনে পাপের প্রতি অপরিতৃপ্তি এবং ঘৃণা না জন্মায় সে পাপচিত্র অঙ্কিত না করাই ভাল। এ-রূপ পাপচিত্রের ধর্ম্মনৈতিক ফল কখন সাধু বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা বলেন ইহা চিত্রের দোষ নহে মানব প্রকৃতির দোষ, তাহারা ঔপন্যাসিককাব্য এবং প্রকৃত ইতিহাসের প্রভেদ জানেন না। রামায়ণের পাত্র এবং পাত্রীগণের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগের মর্ম্ম প্রকাশিত হইবে।'[২৮]

পাশাপাশি ভালো ও মন্দবাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনাকে পূর্ণচন্দ্রবসু ক্ষতিকর বলে গণ্য করেন। কারণ সংসারে মানুষের মধ্যে সুপ্রবৃত্তি অপেক্ষা কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্যই অধিক এবং ভালোপ্রবৃত্তির চাইতে মন্দেরই প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা বেশি। ভালো মন্দকে পাশাপাশি নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করা হলে ভালোর মহিমা হ্রাস পাবে বলে তিনি আশঙ্কা করেন। তাঁর মতে ভালোর পাশে যদি একান্তই মন্দকেও তুলে ধরতে হয়, তবে ওই মন্দকে চিত্রিত করতে হবে অত্যন্ত ঘৃণিত ভাবে, যা পাঠককে লুব্ধ না করে তার মনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলবে।

---

২৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণচন্দ্রবসুর নীতিবাদী রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে "আর্য্যদর্শন" পত্রিকায় লোকনাথ চক্রবর্তী লেখেন 'শৈবলিনী চরিত্র মানস' নামক প্রবন্ধ। তিনি পূর্ণচন্দ্রবসুর উদ্দেশ্যবাদী উন্নত-নৈতিক আদর্শ সমন্বিত সাহিত্য সৃষ্টি বিষয়ক মতবাদের বিরোধিতা করেন। লোকনাথ চক্রবর্তী সাহিত্যে বাস্তবতা ও স্বাভাবিক সত্যের যথাযথ উপস্থাপনার পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন ভালোমন্দ মেশানো প্রাত্যহিক বাস্তবতায়ই আমরা বাস করি। ওই বাস্তবতার কদর্য ও মন্দ অংশটুকু পরিহার করে সাহিত্যে শুধু ভালোর চিত্রন কপটাচার মাত্র। সমাজবাস্তবতার উন্নতনৈতিক অংশের উপস্থাপন ও শুধুমাত্র মনুষ্যপ্রকৃতির সদগুণেরই উপস্থাপন করা হলে সাহিত্য অস্বাভাবিক অবিশ্বাস্য কল্পকথা হয়ে উঠবে। সাহিত্যকে স্বাভাবিক ও বাস্তবঘনিষ্ঠ করার জন্যই বাস্তবতা ও জীবনের ভালোমন্দের নিরপেক্ষ চিত্রন আবশ্যক। তিনি বলেন,

> "আমরা স্বীকার করি যে কলুষিত চিত্র পাপউত্তেজক, যাহার ধর্ম্মনৈতিক কোন ফল নাই, অথচ যাহা অধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে পারে, কাব্য নাটকাদিতে সেরূপ চিত্রের অবতারণা না করাই ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র না দেখাইয়া কাব্যোপন্যাসাদির পাত্র মাত্রকেই সৎগুণে বিভূষিত করা আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উপন্যাসাদির পাত্রপাত্রীগণকে স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবার জন্য আমরা মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে-রূপ দেখিয়া থাকি বা সম্ভব বিবেচনা করি সেইরূপ করিয়া তাহাদিগকে চিত্র করিতে হয়। পৃথিবী দেখিয়া আমাদের যেরূপ জ্ঞানজন্মে, তাহাতে সৎগুণের, সাধুভাবের নিরবচ্ছিন্নতায় আমাদিগের বিশ্বাস থাকে না। অসংখ্য মানবমধ্যে দুইএকজন সম্পূর্ণ সাধুহৃদয় অপরিবিদ্ধ হইতে পারেন এবং পাপস্পর্শশূণ্য আজীবন সাধুতার দুই একটি চিত্রে আমাদের বিশ্বাসও হইতে পারে, কিন্তু উপন্যাস সংসৃষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই অথবা উপন্যাস মাত্রেরই নায়কনায়িকা সাধু কলঙ্কশূণ্য পাপভাববিরহিত সমস্ত সৎগুণের আধার বলিয়া বর্ণিত সেই সকল চিত্র আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"[২৯]

পূর্ণচন্দ্রবসু যেখানে কদর্যবাস্তবতা ও কুপ্রবৃত্তির চিত্রনের সম্পূর্ন বিরোধী লোকনাথ চক্রবর্তী সেখানে প্রকৃতির যথাযথ উপস্থাপনার পক্ষপাতী। তবে লোকনাথ চক্রবর্তীও সাহিত্যে মানবপ্রকৃতি ও বাস্তবতার যথাযথ চিত্রন

---

২৯. লোকনাথ চক্রবর্তী, 'শৈবলিনী চরিত সমালোচনা', আর্য্যদর্শন ১২৮৪, ?
পৃঃ ২৪৯-২৫০ ?

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন করেন নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। তিনি মনে করেন বাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করা হলে সাহিত্য যেমন স্বাভাবিক ও বাস্তবঘনিষ্ঠ হবে, তেমনি এভাবে পাঠকের নৈতিক উন্নতিসাধন হবে সহজ ও সুফল ফলবে অনেক বেশি। তিনি বলেন, 'মুরের ইউটোপিয়া বা তদ্রূপ অন্যকোন কাল্পনিকসৃষ্টি পৃথিবীর প্রতিকৃতি-রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় না। যাহা স্বাভাবিক ও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস না জন্মে তৎপাঠে মনের ততসুখ নাই। তাহার অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মে না, সুতরাং সহস্র ধর্ম্মভাব সন্নিবিষ্ট থাকিলেও মনুষ্যমনে তাহাতে কোন ধর্ম্মনৈতিক ফল ফলে না। এই জন্য মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্রেরই আমরা অনুমোদন করি।'[৩০] ভালো-মন্দের নিরপেক্ষ ও অনুপুঙ্খ উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই পাঠককে নীতিশিক্ষা দেবার পক্ষপাতী লোকনাথ চক্রবর্তী। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রবসু লোকনাথ চক্রবর্তীর এ-অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। লোকনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধের পাদটীকারূপে মুদ্রিত হয় তাঁর এই অভিমত। তাঁর মতে বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপন কাব্যের লক্ষ্য নয়, জনগনের নৈতিক উন্নতিসাধনই কাব্যের লক্ষ্য। কাব্যে বাস্তবতার চিত্রনকে তিনি 'প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন সদৃশ বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে আদর্শ ও নীতিকথার সমন্বয়ে লেখক যে 'উৎকৃষ্ট ভাবময়-চিত্র' রচনা করেন তাকেই সাহিত্য পদবাচ্য বলে অভিহিত করা যায়; 'প্রতিমূর্তি অঙ্কন' সাহিত্য নয়। তিনি লোকনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য খন্ডন করে বলেন,'এ-প্রকার চিত্রে বোধহয় ততদূর ফল দর্শে না। এরূপ চিত্র প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন সদৃশ। প্রতিমূর্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবময়-চিত্রে কি অধিকতর ফল দর্শে না? বোধহয় উৎকৃষ্ট ভাবময় চিত্র মানব হৃদয়কে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এরূপ চিত্র একবার হৃদয়স্পর্শ হইলে তাহা শীঘ্র ভুলা যায় না। অন্যবিধ চিত্র তত অধিককাল স্থায়ী নহে।'[৩১]

"আর্য্যদর্শনে" সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ক এ-বিতর্ক দীর্ঘসময় ধরে চলে। লোকনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধের পাদটীকারূপে দেয়া পূর্ণচন্দ্রবসুর বক্তব্যের বিরোধিতা করে লোকনাথ চক্রবর্তী ১২৮৪ বঙ্গাব্দের

৩০· পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫০

৩১· ঐ, ঐ, পৃঃ ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

পৌষসংখ্যা "আর্য্যদর্শনে" লেখেন 'আনুষঙ্গিকপত্র' নামক প্রবন্ধ।[৩২] লোকনাথ চক্রবর্তী এ-প্রবন্ধেও বলেন যেপ্রকৃতির নিরপেক্ষ চিত্রনই সাহিত্যের লক্ষ্য, নীতিশিক্ষাদান নয়। বাস্তবতার অনুপুঙ্খ অবিকল উপস্থাপনার বদলে কোনো লেখক যদি নীতিশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন তবে তিনি 'স্বধর্ম্মভ্রষ্টত্ব' অপবাদের উপযুক্ত। যুক্তি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি তার বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। তিনি বলেন,

> ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্য কবিত্বশক্তির সৃষ্টি হইয়াছে আমি এরূপ মনে করি না। কবি প্রকৃতির চিত্রকর, প্রকৃতিই তাঁহার উপাস্য দেবতা। প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি নীতি বা অন্য দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি, আমার মতে স্বধর্ম্মভ্রষ্টত্ব অপবাদের উপযুক্ত।
>
> প্রকৃতির বিকৃতি আছে, এই বিকৃতির আবার ভয়ানক ফলও আছে। বিকৃতির এবং বিকৃতির ফল এতদুভয়ই কবির বর্ণনীয়। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কদর্য্যরুচির পরিপোষক বিকৃত প্রকৃতির চিত্র ভিন্ন অন্য চিত্র যিনি অঙ্কিত করিতে জানেন না, তিনি কবি নামের যোগ্য নহেন। স্বভাবের বিকারহেতু যেসকল আপাতমনোরম শোচনীয় পরিণাম দৃশ্যের উৎপত্তি, সেইসকল দৃশ্য দেখাইয়া যিনি তৎপ্রতি দুর্ব্বল চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারেন, অথচ এরূপ পাপ-দৃশ্যে আসক্তির বিষময় ফল প্রদর্শনে অসমর্থ-প্রকৃতপক্ষে তিনি পাপের দূত।'[৩৩]

যদিও লোকনাথ চক্রবর্তী বাস্তবতা বা প্রকৃতির প্রতিকৃতি উপস্থাপনার কথা বলেছেন, তবে তাঁর মধ্যেও স্ববিরোধী বিশ্বাস প্রকট। সাহিত্যে প্রকৃতির নিরপেক্ষ উপস্থাপনা তাঁর কাম্য হলেও শেষপর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করেন যে লেখক বাস্তবউপাদান ভিত্তি করে আদর্শবাস্তবতা সৃষ্টি করবেন। তিনি বলেন,

> ' পূর্ণবাবু সম্পূর্ণ সাধুচিত্রের পক্ষপাতী। মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র তাঁহার মতে "প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন" সদৃশ। মনুষ্যজীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর অবিকল চিত্র প্রতিমূর্ত্তি

---

৩২. লোকনাথ চক্রবর্তী, 'আনুষঙ্গিকপত্র', "আর্য্যদর্শন" পৌষ ১২৮৪, পৃঃ ৪১৪-৪২৩

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্কন সদৃশ বটে, কিন্তু মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র বলিলে যে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণন বুঝায়- আবার এরূপ বোধ হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে কয়টি আয়েসা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ? পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্যন্ত প্রতাপের ন্যায় কয়টি মহাপুরুষ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? মনুষ্যসমাজের প্রথমগঠনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের মত উন্নতমনা উদারচিত্ত কয়টি সাধু মনুষ্যসমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ? এইসকল চিত্রকে কি তবে মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র বলিব না ? মানজীবনের যথাযথ চিত্র আর মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র এদুইটি এককথা নহে। যেশৈবলিনীর চিত্র লইয়া এত বিতণ্ডা সেইশৈবলিনী কি মানবজীবনের যথাযথ চিত্র, না শৈবলিনী মানব প্রকৃতিতে কি সম্ভবে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত ? '৩৪

শেষপর্যায়ে এসে তাঁর সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী ও বাস্তবতাবোধ অস্পষ্ট ও কপট হয়ে উঠেছে। মানবজীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর অবিকল চিত্রন পদ্ধতি তাঁর কাছেও গণ্য হয় 'প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন সদৃশ' রূপে, এবং তিনি প্রবন্ধে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা ও মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র- এদুটি বিষয়ের ভিন্নতা নির্দেশের জন্য অর্থহীন ব্যাখ্যাভাষ্যের কসরত চালাতে থাকেন। সাহিত্যে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার পক্ষপাতী প্রাবন্ধিক শেষ পর্যন্ত পরিণত হন ভাববাদী নীতিবাদীতে। তিনি মনে করেন মনুষ্যস্বভাবের ও বাস্তবতার ভালো-মন্দ এ-দুঅংশের নিরপেক্ষ উপস্থাপনা না হলে সাহিত্য হয়ে উঠবে অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য কল্পকথা, এবং তাঁর মতে এই স্বাভাবিক বাস্তবঘনিষ্ট সাহিত্যই পাঠকের নৈতিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে 'নিরবচ্ছিন্ন সাধু' চিত্র সমন্বিত সাহিত্যের চাইতে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ লোকনাথ চক্রবর্তী পাঠকের নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যই বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার পক্ষপাতী।

---

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

১২৮৪ বঙ্গাব্দের পৌষসংখ্যা "আর্য্যদর্শনে" লোকনাথ চক্রবর্তীর আলোচনার সঙ্গে মুদ্রিত হয় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রচিত 'চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী' নামক রচনা। এপ্রবন্ধে লেখক পূর্ণচন্দ্রবসুর নীতিবাদী রক্ষণশীলতাকে সমর্থন দেন। এ-আলোচনায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের রক্ষণশীল মনোভাব অত্যন্ত প্রকট। তিনি মনে করেন সাহিত্যে ভালোর পাশাপাশি মন্দ বা কদর্যের চিত্রন হতে পারে, তবে ওই কদর্যের চিত্রন করা হবে ভালোর মহিমা বোঝাবার জন্য। ধর্মের মাহাত্ম্য নির্দেশের জন্যই অধর্মের উপস্থাপনা করা দরকার। লক্ষ্মীনারায়ণ ভালো ও মন্দ বাস্তবতা এবং মনুষ্যস্বভাবের সু ও কুপ্রবৃত্তির উপস্থাপনা অনুমোদন করেন, তবে তা বাস্তবঘনিষ্ঠ স্বাভাবিক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নয় একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাঁর মতে সাহিত্য ভালোর পাশে মন্দকে ঘৃণিত করে আঁকবে এবং এর মধ্য দিয়ে পাঠককে উন্নতনৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে তোলার দায়িত্ব পালন করবে। তিনি বলেন,

> 'শৈবলিনীর দুশ্চরিত জন্য আমরা শৈবলিনীচিত্রের দোষ দিই না, কারণ কাব্যে সুচরিত্র ও কুচরিত্র উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে-ঔজ্জ্বল্য ও মালিন্য না থাকিলে আলোকের উপযোগিতা তত বুঝিতে পারিতাম না এবং অধর্ম্ম না থাকিলে ধর্ম্মের গৌরবও আমরা তত অনুভব করিতাম না। ইয়াগো কল্পিত না হইলে ওথেলোর সৃষ্টি হইত না। রাবন, রাবনরূপে কল্পিত না হইলে, রাম রাবনের যুদ্ধ ঘটিত না। পৃথিবীর অদ্বিতীয় কাব্য রামায়ন জন্মিত না, এবং যে রাম নামের আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালে আজি সহস্র বৎসর সমস্ত ভারত মোহিত হইয়া আছে সেই অশেষ গুণালঙ্কৃত রামচন্দ্রকেও চিনিত না। লেডি ম্যাকবেথ না থাকিলে ম্যাকবেথ কি? দুর্য্যোধন না থাকিলে মহাভারত কি? এবং সয়তানের সৃষ্টিতেই মিল্টন মহাকবি। কিন্তু রাবণের সহিত কাহার সহানুভূতি হয়, দুর্য্যোধনের সহিত কাহার সহানুভূতি হয়, সয়তানের কাহার সহানুভূতি হয়? ইয়াগোকে কে না ঘৃণা করে, ম্যাকবেথ মহিলাকে কে না ঘৃণা করে? প্রত্যুত শৈবলিনীর কুচরিত্র এরূপ প্রলোভন বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহার পাপকার্য্যের সহিত পাঠকের সহানভূতি জন্মে বলিয়াই, সে চরিত আলোচনায় কুফল আছে বলিয়া পূর্ণবাবু বলিয়াছেন যে, "শৈবলিনীর ন্যায় কোন চিত্র আমাদিগের তরুণীগণের সমক্ষে ধরিতে আমরা সাহস করি না"।[৩৫]

৩৫। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, 'চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী', "আর্য্যদর্শন" পৌষ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪১২

Dhaka University Institutional Repository

এই বিতর্ক-আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় এ-সময় সাহিত্যে বাস্তবতার নিরপেক্ষ অবিকল চিত্রন দূষণীয় বলে গণ্য হয়েছে। বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বাস্তবঘনিষ্ঠ স্বাভাবিক সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষপাতী নন অনেকে। তাঁরা সাহিত্যে শুধুমাত্র বাস্তবতার সুন্দর অংশটুকু ও মনুষ্যস্বভাবের সুপ্রবৃত্তির উপস্থাপনার পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন বাস্তবতার ভালো অংশের চিত্রন করা হলেই শুধুমাত্র পাঠককে নীতিশিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে। কারো কারো অভিমত হচ্ছে শুধু ভালোর চিত্রণ হবে একদেশদর্শিতা, বরং ভালোমন্দ নির্বিশেষ বাস্তবতার উপস্থাপন করা হলেই সাহিত্য হবে স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য।এবং এমন সাহিত্যই নীতিশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভূমিকা পালন করতে পারবে। কেউ কেউ মনে করেন সাহিত্যে ভালো ও সুন্দর বাস্তবতার পাশে কদর্য ও পঙ্কিল বাস্তবতার উপস্থাপনা করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে লেখককে একটি শর্ত পালন করতে হবে। লেখক-কে অবশ্যই পাপের বীভৎস পরিণাম দেখাতে হবে। পাপপঙ্কিল জীবনের ভয়াবহ পরিণাম দেখে পাঠক পাপের পথ থেকে দূরে থাকবে, শুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবে। অর্থাৎ বাস্তবতা এপর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে।

৪.২ রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতাবোধ ও বাস্তবতা বিষয়ক বিতর্ক।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রসাহিত্য কেন্দ্র করে শুরু হয় বাস্তবতাবাদী বিতর্ক। বিরোধী সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথকে 'বস্তুতন্ত্রতা'শূণ্য ও কাল্পনিক সাহিত্যসৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এই সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের বাস্তববিমুখতা ও কল্পনাসর্বস্বতা নিয়ে ইংরেজি বিশশতকের দ্বিতীয়দশকে যে-বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে, তা-ই বাঙলা সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনার মাণদন্ডে সাহিত্যের মূল্য যাচাইয়ের প্রথম প্রয়াস। মোটামুটিভাবে ১৩১৮ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময় রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতাবিষয়ক এই বিতর্কের স্থায়ীত্বকাল। এ-পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিপাদন করতে হয় যে তিনি বাস্তবতার উপস্থাপক। তবে ওই বাস্তবতা বাহ্যবাস্তবতার অনুলিপিমাত্র নয়, তা কবিহৃদয়ের উপলব্ধিজাত সত্য বা বাস্তবতা। তিনি বলেন বস্তুজগতের অনুলিপি করায় উৎসাহী নন তিনি। কবির অন্তর্দৃষ্টিতে বস্তুজগত যে-ভাবে ধরাপড়ে, কবির মন যে-সত্য উপলব্ধি করে, কবি চিত্রন করেন সেই সত্য বা বাস্তবতাকে। তাঁর মতে কবির উপলব্ধিজাত সত্য ও বাস্তবতার চাইতে সত্য ও বাস্তব আর কিছুই হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিতর্ক-আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় এ-সময় সাহিত্যে বাস্তবতার নিরপেক্ষ অবিকল চিত্রন দূষণীয় বলে গণ্য হয়েছে। বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বাস্তবঘনিষ্ঠ স্বাভাবিক সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষপাতী নন অনেকে। তাঁরা সাহিত্যে শুধুমাত্র বাস্তবতার সুন্দর অংশটুকু ও মনুষ্যস্বভাবের সুপ্রবৃত্তির উপস্থাপনার পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন বাস্তবতার ভালো অংশের চিত্রন করা হলেই শুধুমাত্র পাঠককে নীতিশিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে। কারো কারো অভিমত হচ্ছে শুধু ভালোর চিত্রণ হবে একদেশদর্শিতা, বরং ভালোমন্দ নির্বিশেষ বাস্তবতার উপস্থাপন করা হলেই সাহিত্য হবে স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য।এবং এমন সাহিত্যই নীতিশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভূমিকা পালন করতে পারবে। কেউ কেউ মনে করেন সাহিত্যে ভালো ও সুন্দর বাস্তবতার পাশে কদর্য ও পঙ্কিল বাস্তবতার উপস্থাপনা করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে লেখককে একটি শর্ত পালন করতে হবে। লেখক-কে অবশ্যই পাপের বীভৎস পরিণাম দেখাতে হবে। পাপপঙ্কিল জীবনের ভয়াবহ পরিণাম দেখে পাঠক পাপের পথ থেকে দূরে থাকবে, শুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবে। অর্থাৎ বাস্তবতা এপর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে।

৪.২ রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতাবোধ ও বাস্তবতা বিষয়ক বিতর্ক।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রসাহিত্য কেন্দ্র করে শুরু হয় বাস্তবতাবাদী বিতর্ক। বিরোধী সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথকে 'বস্তুতন্ত্রতা'শূণ্য ও কাল্পনিক সাহিত্যসৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এই সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের বাস্তববিমুখতা ও কল্পনাসর্বস্বতা নিয়ে ইংরেজি বিশশতকের দ্বিতীয়দশকে যে-বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে, তা-ই বাঙলা সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনার মানদন্ডে সাহিত্যের মূল্য যাচাইয়ের প্রথম প্রয়াস। মোটামুটিভাবে ১৩১৮ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময় রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতাবিষয়ক এই বিতর্কের স্থায়ীত্বকাল। এ-পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিপাদন করতে হয় যে তিনি বাস্তবতার উপস্থাপক। তবে ওই বাস্তবতা বাহ্যবাস্তবতার অনুলিপিমাত্র নয়, তা কবিহৃদয়ের উপলব্ধিজাত সত্য বা বাস্তবতা। তিনি বলেন বস্তুজগতের অনুলিপি করায় উৎসাহী নন তিনি। কবির অন্তর্দৃষ্টিতে বস্তুজগত যে-ভাবে ধরাপড়ে, কবির মন যে-সত্য উপলব্ধি করে, কবি চিত্রন করেন সেই সত্য বা বাস্তবতাকে। তাঁর মতে কবির উপলব্ধিজাত সত্য ও বাস্তবতার চাইতে সত্য ও বাস্তব আর কিছুই হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ হচ্ছে অসম্পূর্ণ ও অমার্জিত। সাহিত্যে এই অমার্জিত বাস্তবতা প্রাথমিক উপাদানরূপে গ্রহণ করা হলে, তবে কল্পনা সহযোগে এ-কে সম্পূর্ণ বা আদর্শায়িত করে কাব্যে উপস্থাপিত করতে হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে সাহিত্যের প্রাথমিক উপাদান বলে মনে করেন এবং তাঁরমতে এই বাস্তবতাকে কল্পনার মিশ্রনে নতুন করে সৃষ্টি করতে হয়, তাকেকরে তুলতে হয় সম্পূর্ণ সৃষ্টি। তিনি বলেন,'········ কোন রিয়াল মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যেরকম প্রতীয়মান সেরকমভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ রিয়াল মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে প্রতিদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেকসময় পূর্বাপর বিরোধীভাবে না দেখে উপায় পাইনে- কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং কাব্যে যদিচ কোন কোন রিয়াল লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানাদিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়।'[৩৭] 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'সত্য' সম্পর্কে যা বলেছেন, তাই তাঁর বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা । তিনি লিখেছেন, সেই সত্য যা রচিবে তুমি,

ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তবমনোভূমি
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

অন্য একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে নগ্ন বাহ্য বাস্তবতার উন্মুক্ত উপস্থাপনা সাহিত্য অবশ্যই ঘটতে পারে। তিনি বাহ্যবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাকে ' ' বলে অভিহিত করেন। তিনি চিঠিতে তৎকালীন উপন্যাসিক নগেন্দ্র গুপ্তের একটি উপন্যাস আলোচনাকালে এ-মন্তব্য করেন। নগেন্দ্রগুপ্তের ওই উপন্যাসে বাস্তবতার নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ প্রকাশ ঘটেনি বলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন, 'নগেন্দ্রগুপ্তর তপস্বিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয় নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাঙলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এরকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না।

৩৭· প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি, "চিঠিপত্র" (অষ্টমখণ্ড), (বিশ্বভারতী ১৩৭০ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্থূল আবরণ রাখতে গেলেই অশ্লীলনষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সবকথা পরিষ্কারভাবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেননি, সেইজন্য তার self conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটিকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনাবিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্ব্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করে করেছেন। ফর ইনস্ট্যান্স, সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোকরার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার না করে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে যা হতে পারে সেটাকে সরলভাবে তার সম্পূর্ণ বাস্তবমূর্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এসব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেনঅথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্য সবকথা ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেননি, ভাল করে গোপন করতেও পারেন নি।[৩৮]

অর্থাৎ এসময় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে দু'রকম ধারনা পোষণ করছেন। তিনি মনে করেন বাস্তবতা প্রাথমিক উপাদানরূপে গৃহীত হতে পারেন, কবি কল্পনা সহযোগে তাকে করে তুলবেন সুন্দর ও সম্পূর্ণ বাস্তবতা। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তাঁরও বিশ্বাস বাস্তবতা অসম্পূর্ণ ও সামান্য। শুধুমাত্র কল্পনার মিশ্রনেই তাকে সম্পূর্ণ করে তোলা সম্ভব। আবার সাহিত্যে বাস্তবতার নিঃসঙ্কোচ নিবারণ উপস্থাপনার অনুমোদনও করেন তিনি। তিনি মনে করেন 'নির্ভীক নগ্নতা ভাল'। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা বিষয়ক এই ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরে সম্পূর্ণ বদলে যায়। বাস্তবতার নগ্ন নিবারণ অসঙ্কোচ প্রকাশকে তখন তিনি অশিল্পিত ব্যাপার বলে নিন্দা করেন।

চৈত্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় মুদ্রিত হয় বিপিনচন্দ্রপালের প্রবন্ধ 'চরিতচিত্র: রবীন্দ্রনাথ'। বিপিনচন্দ্র এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যকে 'বস্তুতন্ত্রহীন' বলে অভিযুক্ত করেন এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের বস্তুতন্ত্রহীনতা নির্দেশে ব্যাপৃত হন। তাঁর মতে রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন এ-কারণে যে তাতে বাস্তবতার ব্যাপক চিত্রন ঘটেনি। এর জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ ও ওই প্রতিবেশের গন্ডিতে আবদ্ধ থাকার সংকীর্ণ মানসিকতাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও

---

৩৮. ওই, ওই, পৃঃ ১৩৮-১৩৯,

Dhaka University Institutional Repository

গভীর পরিচয় ছিলো না। সাধারণত সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় তাদের উঁচু প্রাসাদের ছাদ থেকে দরিদ্র জীবনকে দেখে থাকে। সুউচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে বস্তিবাসীদরিদ্রের খোলার চাল ও মাটির দেয়ালটুকু মাত্র তাদের চোখে পড়ে। ওই চালার নীচে এবং জঞ্জালপূর্ণ ক্ষুদ্রকুটির প্রাঙ্গনে যে আশা-ভয়, অনটন-ক্লেশ, লোভ-ত্যাগের স্রোত বয়ে চলে তা তাদের চোখে পড়ে না। তা দেখার অনুর্দৃষ্টি ও অবকাশও তাদের থাকেনা। নিজেদের ভোগবিলাসপূর্ণ সখ্য ও সৌখিনতার জগৎই তাদের কাছে প্রত্যক্ষ ও সত্য, এবং ওই জীবনের বৃত্তেই তারা বন্দী হয়ে থাকে। তাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাধারণ জীবন তাদের কাছে থাকে অজ্ঞাত ও অপ্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। অভিজাত জীবন ও প্রতিবেশে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনবাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক পরিচয়ের সুযোগ যেমন হয় নি, তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও ইচ্ছে ছিলোনা ওই বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করার। রবীন্দ্রনাথ তাই সাধারণ জীবনবাস্তবতাকে দেখেছেন দূর থেকে, আবেগ ও কল্পনার দৃষ্টিতে। বিপিনচন্দ্র মনে করেন যেহেতু সাধারণ জীবনবাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতা সামান্য, তাই তাঁর রচনা বাস্তবঘনিষ্ঠ নয়, তাঁর সকল রচনাই কাল্পনিক সৃষ্টি। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় বাস্তবতা প্রাথমিক উপাদানরূপে গ্রহণ করেন এবং কল্পনার মিশ্রনে ওই বাস্তবতার পুনঃসৃষ্টি করেন, তাই ওই সাধারণ জীবনবাস্তবতা তাঁর কাব্যে এমন মধুর ও স্বপ্নময় বলে বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র বলেন, : 'রবীন্দ্রনাথ শতরঞ্জ গালিচামন্ডিত ত্রিতলপ্রাসাদকক্ষে বসিয়া, মানসচক্ষে কর্দ্দমমর্দ্দিত পিচ্ছল পল্লীপথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুচিক্কনবপু, সুমার্জ্জিত রুচি সুজনবর্গে পরিবৃত থাকিয়া, সুদূর দরিদ্রপল্লীর শুষ্কদেহ রুক্ষকেশ নরনারী সকলের অপূর্ব্ব তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।'[৩৯] রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে তিনি 'মায়িক' বলে অভিহিত করেন,[৪০] কারণ তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ শুধু সাধারণ মানুষের আবেগগত জীবনের চিত্রন করেন, তাদের হৃদয় সঙ্কট ও টানাপোড়েনের পরিচয় তুলে ধরেন, কিন্তু ওই 'পর্ণকুটিরের জীর্ণকন্থার কীটানুলীলা ও শীর্ণদেহ, দীর্ণপ্রাণ কুটিরবাসীদিগের কলহ-কোলাহল' বা প্রাত্যহিক জীবন বাস্তবতার

---

৩৯. বিপিনচন্দ্রপাল, 'চরিত-চিত্র রবীন্দ্রনাথ', "বঙ্গদর্শন" (১১শবর্ষ : ১২শ সংখ্যা), চৈত্র ১৩১৮, পৃঃ ৬৮৯।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯১।

Dhaka University Institutional Repository

নগ্ন নিরপেক্ষ উপস্থাপন করেন নি ।[৪১] ফলে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য যেমন কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেকসময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।'[৪২] তবে বিপিনচন্দ্রের মতে রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বা নিজের শ্রেণীচরিত্রের চিত্রন করেছেন, সেখানে তাঁর রচনা 'অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে।'[৪৩], কিন্তু সাধারণ জীবনবাস্তবতা ও লোকচরিত্রের উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন ।

রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতাবিষয়ক এই আলোচনায় বিপিনচন্দ্র পালের বাস্তবতাধারণা ও সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক মতামতও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । বিপিনচন্দ্র সমাজবাস্তবতার সকল অংশের ও জীবনের সকল দিকের যথাযথ ও অনুপুঙ্খ উপস্থাপনার পক্ষপাতী । বাস্তবতাকে কল্পনার মিশ্রনে নতুন করে সৃষ্টি করা হলে বাস্তবতার মহিমা ও চরিত্র নষ্ট হয় বলে তিনি মনে করেন । তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ সাধারণজীবন বাস্তবতার উপস্থাপনাসমৃদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ ওই জীবনবাস্তবতার সঙ্গে তাঁর গভীর ব্যাপক-অনুরঙ্গ পরিচয় ছিলো না । রবীন্দ্রনাথ ওই দরিদ্রসাধারণের হৃদয়াবেগ ও মনোগত সঙ্কটের কাল্পনিক গাথা রচনা করেছেন মাত্র । রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা বিষয়ক বিপিনচন্দ্রের এই অভিমতের প্রতিধ্বনি শোনা যায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'লোক শিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধে । তিনিও রবীন্দ্রসাহিত্যকে 'বস্তুতন্ত্রহীন' বলে নির্দেশ করেন এবং ঘোষণা করেন যে 'বস্তুতন্ত্রহীন' বলেই এ-সাহিত্য' সার্বজনীন নহে'। বিরোধী এই সমালোচকদের অভিযোগ খণ্ডনের দায়িত্ব শুধু একা -রবীন্দ্রনাথ পালন করেন নি, রবীন্দ্রানুরাগী বিভিন্ন সমালোচক- প্রাবন্ধিক যেমন, প্রমথ চৌধুরী, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখও পালন করেন ।

বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে 'বস্তুতন্ত্রহীনতা'র যে অভিযোগ আনেন, তা খণ্ডনে তৎপর হন অজিতকুমার চক্রবর্তী । আষাঢ় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি 'বস্তুতন্ত্রহীন'? প্রবন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী বিপিনচন্দ্রের অভিযোগ খণ্ডনের

---

৪১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯০।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯১।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯২।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা নির্দেশ করেন। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গেও অভিমত জ্ঞাপন করেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যে সমাজবাস্তবতার অবিকল ও ব্যাপক উপস্থাপনা ঘটেনি বলেই ওই সাহিত্যকে বস্তুতন্ত্রহীন বলা যাবে না। রবীন্দ্রসাহিত্যে আছে আদর্শবাস্তবতার উপস্থিতি। তিনি বলেন যে সাহিত্যজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এ-অর্থে যে সাহিত্য জীবন বাস্তবতা থেকে উপাদান গ্রহণ করে। কিন্তু ওই উপাদানরাশি হুবহু আদিরূপে সাহিত্যে উপস্থাপিত হতে পারে না, কারণ অবিকল উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে কখনো শিল্পগুণ সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়না। বাস্তবতাকে সাহিত্যে তুলে ধরতে হয় পরিশোধিত রূপে, তবেই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। সাহিত্য জীবনবাস্তবতার পরিশোধিত, পরিমার্জিত ও আদর্শায়িতরূপ বলে লেখক মনে করেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে বাস্তবতার আদর্শায়িতরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেই রবীন্দ্র সাহিত্যের অনন্যতা। অজিতকুমার চক্রবর্তী সাহিত্যে শিল্পিত বাস্তবতা বা মহৎ আদর্শের উপস্থাপনায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'জীবন আপনাকে সাধারণত যেমনভাবে প্রকাশ করে, সাহিত্যের প্রকাশ তাহার অনুরূপ হয় না। সাহিত্যে জীবনচিত্রনে সুখে হউক দুঃখে হউক পরিণামে একটি বৃহৎ শান্তির আদর্শ থাকা চাই।..... একটা বড় পরিণামের মধ্যে মেশা চাই-কিন্তু মানবজীবনে সংসারের ক্ষেত্রে মানুষের মনের এই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিটি কি সকল সময় দেখা যায়? না-সেইজন্যই তো জীবন এবং সাহিত্য এক জিনিস নয়- জীবনের বাস্তবিকতা সাহিত্যে নাই এবং সাহিত্যের ভাবসম্পূর্ণতা জীবনে নাই- অথচ সেইজন্যই আবার পরস্পরকে পরস্পরের এতো প্রয়োজন।'[৪৪] তিনি মনে করেন জীবনের 'বাস্তবিকতা' ও সাহিত্যের 'ভাবসম্পূর্ণতা' মিশ্রণই সাহিত্যের লক্ষ্য। রবীন্দ্রসাহিত্যে এ-দুয়ের মিশ্রন ঘটেছে এবং ওই সাহিত্যে জীবনের 'মহৎ আদর্শ-'এ'র কথা আছে। বিপিনচন্দ্র অভিযোগ করেন যে পল্লীজীবন ও সাধারণ জীবন বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিলো না বলেই রবীন্দ্র সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন, এবং রবীন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতার মধুর অংশটুকুর

---

৪৪. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রহীন?', "প্রবাসী" আষাঢ় ১৩১৯, পৃঃ ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রন ঘটেছে মাত্র। অজিতকুমার এই অভিযোগ খণ্ডন প্রসঙ্গে যেযুক্তি প্রদর্শন করেন তাতে তাঁর ভাববাদী মানসিকতার পরিচয় ধরা পড়ে। তাঁর মতে বাস্তবতার দারিদ্রদুঃখ রূঢ়তা বা হুলটুকু সত্য নয়, জীবনের মধু বা স্বপ্ন কল্পনা হৃদয়াবেগই সত্য বা আসল। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের গল্পে সাধারণ জীবনের মধু বা হৃদয়াবেগ চিত্রিত করা হয়েছে বলেই ওই রচনাকে 'অসম্ভব ও মায়িক বলিবার কোন হেতু নাই। " ঘটে যা তা সব সত্য নহে।" সুতরাং প্রত্যক্ষ সংসারে যে হুলটুকু পাওয়া যায়, সাহিত্যে সে হুলটুকুই ঢাকা পড়ে এবং দেখান হয় যে হুল আছে বটে কিন্তু মধুটাই আসল। সাহিত্যে যদি সেই সম্পূর্ণতার আদর্শ না থাকিত, তবে সংসার তাহাকে এত আদর করিত না।'[৪৫] অর্থাৎ অজয়কুমার চক্রবর্তী সাহিত্যে বাস্তবতার নগ্ন নিরাবরণ উপস্থাপনার বিরোধী। তাঁর মতে বাস্তবতার নিরপেক্ষ চিত্রন য়, 'সম্পূর্ণতার আদর্শ'তুলে ধরাই সাহিত্যের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গল্পে পাওয়া যায় ওই সম্পূর্ণতার আদর্শ। এখানেই ওই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

"প্রবাসী" (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) পত্রিকায় মুদ্রিত হয় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক'। রাধাকমল এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ তোলেন; প্রথমতঃ রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন, দ্বিতীয়তঃ এ-সাহিত্য জনসাধারণের উপযোগী নয়, তৃতীয়ঃ এ-সাহিত্যকে লোকশিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। রাধাকমল সাহিত্যে সমাজবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা পক্ষপাতী এবং সাহিত্যের উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যদিয়ে লেখক মূলতঃ লোকশিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করবেন এবং লোকশিক্ষক হয়ে ওঠাই হবে একজন লেখকের লক্ষ্য। তাঁরমতে রবীন্দ্র-সাহিত্য সার্বজনীন নয়, কারণ এ-সাহিত্যে এ-দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা সঙ্কটের উপস্থাপনা ঘটেনি। ওই সঙ্কট সমস্যা সমাধানের কোনো পথও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন নি। এ-কারনেই এসাহিত্য

---

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

অসম্পূর্ণ ও অবাস্তব বস্তুতন্ত্রহীন; এবং এ-কারণেই এ-সাহিত্য লোকশিক্ষার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে না। রবীন্দ্রসাহিত্যের বস্তুতন্ত্রহীনতার স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ গড়িয়াছেন তাহা ভাবের রাজ্য, তাহার সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্য নাই। ········· তাঁহার সবই সুন্দর, সবই-মহৎ, শুধু তাহা সজীব নহে। রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। ··········· বস্তুর জগত গড়িতে পারেন নাই, তাঁহার জগৎ স্বপ্নের জগৎ, তাহা তাঁহার কল্পনায় ধারণা হইয়াছে মাত্র, জাতির হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কারণ প্রকৃত জাতি তো কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত উকিল ব্যারিস্টার মাস্টার কেরাণী সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙালী জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণ কুটীরবাসী অশিক্ষিত কৃষক তাঁতি জোলা মজুর কামার তেলি ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ আশা আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে।'[৪৬] রাধাকমলের মতে যেহেতু রবীন্দ্রসাহিত্যে অশিক্ষিত দরিদ্র সাধারণের জীবনবাস্তবতার চিত্রন ঘটে নি এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সমাজের একটি ক্ষুদ্রঅংশের বৃত্তান্ত রচনায় মনোযোগী ছিলেন তাই রবীন্দ্রসাহিত্য হয়ে উঠেছে বস্তুতন্ত্রহীন, অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

রাধাকমলের এ-প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা ও সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা বিষয়ক বিতর্ক প্রবল হয়ে ওঠে, এবং বাস্তবতাবিষয়ক এ-বিতর্ক একসময় হয়ে ওঠে সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ক বিতর্ক। বিরোধী সমালোচকের অভিযোগ খণ্ডন করে রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। এসব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার বিরুদ্ধে আনীত বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ খণ্ডনের পাশাপাশি সাহিত্যের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। একই রকম ভূমিকা পালন করেন রবীন্দ্রানুরাগী প্রমথ চৌধুরীও। রাধাকমলের 'লোক-শিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তররূপে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'বাস্তব' নামক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি শ্রাবণ ১৩২১ বঙ্গাব্দের "সবুজপত্রে" প্রকাশিত হয়। এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রতা বা বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন এবং লেখকের ভূমিকা সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন। রবীন্দ্রনাথের মতে স্রষ্টা বেদনাময়-চৈতন্য দিয়ে যে সত্য উপলব্ধি করেন এবং কাব্যে যে-সত্য বিধৃত করেন তা-ই হচ্ছে চরম বাস্তব। তিনি মনে

---

৪৬. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক', বর্তমান বাঙালা সাহিত্য (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কলিকাতা, প্রকাশকাল অজ্ঞাত), পৃঃ ৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

করেন নানা প্রয়োজনের কোলাহলপূর্ণ প্রাত্যহিক বাস্তবতার চিত্রন কখনো সাহিত্যসৃষ্টিরূপে গণ্য হতে পারে না, তাকে বলা যায় কোলাহলের গাথা মাত্র, সাহিত্য নয়। প্রাত্যহিক বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাই কাব্যকে বাস্তবঘনিষ্ঠ করে তোলার উপায় নয়। কাব্যের বাস্তবতা ভিন্ন ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন কবি তাঁর বেদনাময় চৈতন্য দিয়ে বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে নিজের জীবনে যেভাবে উপলব্ধি করে থাকেন, নিখিলের সংস্রবে এসে যে-ভাবে জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করে থাকেন, তা-ই চরম ও একান্ত বাস্তব। এই বাস্তবতা নিত্যকালের ও চিরন্তন। কিন্তু বাইরের বস্তুর হাটের বাস্তবতায় নিত্যতা নেই, বরং বাস্তবতা সম্পর্কিত ধারণা ও বস্তুর মূল্য নিয়ত পরিবর্তনশীল। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথাশাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিত-ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর। ······· বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে- সেখানে নানামুনির নানামত, নানা লোকের নানা ফরমাশ, নানা কালের নানা ফ্যাশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। যে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাস্টারির আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময়, সুতরাং অনির্বচনীয়। কবি জানেন, যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারো কাছে মিথ্যা নহে। ············· কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই- সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুশি বসিয়া যেমন-খুশি রায় দিতে পারেন, কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা ঘটিবেই এমন কোনো কথা নাই।[৪৭]

---

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাস্তব', 'সাহিত্যের পথে", (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, প্রথমপ্রকাশ: আশ্বিন ১৩৪৩, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৩৮৮), পৃঃ ২৪,

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনা নয়, রসসৃষ্টিই সাহিত্যের লক্ষ্য। রসের মধ্যেই নিত্যতা আছে, কিন্তু বস্তুর মধ্যে নিত্যতা নেই। তাঁর মতে লোকশিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ ও কবির দায়িত্ব নয়, কারণ লোকশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। সাহিত্য আনন্দের সৃষ্টি এবং সাহিত্যের কাজ আনন্দদান। 'লোকহিত' প্রবন্ধেও ("সবুজপত্র," ভাদ্র ১৩২১) রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উপযোগিতাবাদ তথা রাধাকমলের উপযোগিতাবাদী-দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে লোকহিত সাধনের সঙ্কল্প নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে তা হবে সাহিত্যের নামে জঞ্জাল সৃষ্টি করা মাত্র।[৪৮]

রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব'শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা ও প্রত্যুত্তর হিসেবে রাধাকমল লেখেন 'সাহিত্যে বাস্তবতা'নামক প্রবন্ধ। মাঘ ১৩২১-এর "সবুজপত্রে" মুদ্রিত এ-প্রবন্ধে রাধাকমল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ক মতের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সাহিত্য শুধু নিত্যরসের গুণেই টেকে না, কাব্য স্থায়ীত্ব পায় নিত্যরস ও নিত্যবস্তুর গুণে। তাঁর মতে সাহিত্য বিশুদ্ধ আনন্দের সৃষ্টি নয়, সমাজ ও মানুষের হিত সাধনের জন্য এর সৃষ্টি এবং যুগধর্ম প্রকাশেই এর সার্থকতা। তাই সাহিত্যকে হতে হবে বাস্তবঘনিষ্ঠ। সাধারণ জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনার মধ্যদিয়েই সাহিত্য হবে বাস্তব ঘনিষ্ঠ এবং বাস্তবতা অবলম্বন করেই সাহিত্য রসসৃষ্টি করবে, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসাধনা সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। তাঁর মতে, 'রস জিনিসটার একটা আধার থাকা চাই- সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্তন হইতেছে -যুগে যুগে বাস্তব বিভিন্ন হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসও বিভিন্ন হইতেছে। তবুও বাস্তবের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, আর ঐ নিত্যতা আছে বলিয়া আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যরসের আস্বাদন করিতে পারি।'[৪৯] রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ রসসৃষ্টি বিষয়ক অভিমতের বিরোধিতা করে তিনি বলেন বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে যে রসসৃষ্টি করা হয়, তা অলীক ও আবেদনশূন্য হতে বাধ্য। তিনি বলেন, সাহিত্যকে যদিপদ্ম ধরা যায় তবে বাস্তবতা হচ্ছে ওই পদ্মের মৃণাল। এই বাস্তব অবলম্বন না থাকলে সাহিত্যরূপী সৌন্দর্য

৪৮· রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লোকহিত', "কালান্তর", (রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪শ খণ্ড বিশ্বভারতী কালকাতা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ২৬৬।

৪৯· রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে বাস্তবতা', "বর্তমান বাঙালা সাহিত্য", পৃঃ ১৭৬,

Dhaka University Institutional Repository

ফুটতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'বাস্তবকে হট্টগোল বলিয়া উড়াইয়া দিলে সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ বিকাশ লাভ করিবে না।'[৫০] কারণ 'লতাকে উপেক্ষা করিয়া ত ফুল ফুটে না। সাহিত্য যদি বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া রসসৃষ্টি করিতে চাহে, তবে সে রস কাগজের ফুলের মত অলীক ও কৃত্রিম হইবে - সে রস হইতে কেহ তৃপ্তি পাইবে না, জীবন পাইবেনা।'[৫১] রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির পক্ষপাতী, রাধাকমল তেমনি সাহিত্যের উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন লোকহিত সাধনের জন্যই সাহিত্য বাস্তবঘনিষ্ঠ হবে।

রাধাকমলের উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্যের বাস্তবঘনিষ্ঠতাবিষয়ক মতামতের বিরোধিতা করে প্রমথ চৌধুরী। মাঘ ১৩২১ বঙ্গাব্দের "সবুজপত্রে" মুদ্রিত হয় তাঁর 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' শিরোনামের প্রবন্ধ। প্রমথ চৌধুরীর এ-প্রবন্ধটি শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতাবিষয়ক বিতর্কের একটি উল্লেখযোগ্য রচনাই নয়, আরো একটি কারনে প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। এ-প্রবন্ধে ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী আন্দোলন, দর্শনে বাস্তবতাবাদের উদ্ভব, রূপান্তরের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ও ভাববাদের সঙ্গে বিরোধের কারণ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। ওই আলোচনা ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে পাঠকের মনে স্পষ্ট একটি ধারণা জাগাতে সক্ষম। এ-কারণেই এ-প্রবন্ধটির একটি স্বতন্ত্র মর্যাদাও প্রাপ্য। প্রমথ চৌধুরী রিয়ালিজমের বাঙলা পরিভাষা করেন 'বস্তুতন্ত্রতা' এবং বাস্তবতাবাদী সাহিত্যকে অভিহিত করেন 'বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য' বলে।[৫২] এ-প্রবন্ধে তিনি দার্শনিক বাস্তবতাবাদ ও সাহিত্যিক বাস্তবতাবাদের ভিন্নতা ও সাদৃশ্য নির্দেশ করেন, তবে বাস্তবতাবাদ ও পরবর্তী প্রাকৃতবাদকে তিনি গণ্য করেন একই সাহিত্য আন্দোলনরূপে। তাই ফ্লবেয়ারের সঙ্গে জোলাকেও তিনি 'রিয়ালিষ্ট' বলে অভিহিত করেন। তবে অন্যান্য ভাববাদীর মতো প্রমথ চৌধুরীও সাহিত্যিক বাস্তবতাবাদে অস্বস্তিবোধ করেন এবং শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেন ভাববাদকে। ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদীদের বাস্তবমনস্কতাকে তিনি দেখেন অবজ্ঞা ও উপহাসের দৃষ্টিতে। তিনি বলেন, 'জোলা প্রভৃতি রিয়ালিজমের দলবল

---

৫০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭ - ১৭৮।

৫২. প্রমথ চৌধুরী, 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি', "প্রবন্ধসংগ্রহ" (বিশ্বভারতী গ্রন্থ ১৯৫২ পুনর্মুদ্রন, ১৯৬১), পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সরস্বতীকে আকাশপুরী হতে শুধু নামিয়েই সন্তুষ্ট হননি, তাকে জোর করে মর্ত্যের ব্যাধিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। কারণ রোগ যে বাস্তব, সে কথা আমরা চীৎকার করে মানতে বাধ্য।'[৫৩] প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন এবং সাহিত্যের উপযোগিতাবাদেও বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে কবির-সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি। কবিপ্রতিভা সামাজিক মনের অধীন নয়। বাস্তবমনস্কতা সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান শর্ত হতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। সাহিত্যের বাস্তবঘনিষ্ঠতার পক্ষপাতী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'পঙ্কজ অপেক্ষা পঙ্কে যে অধিক পরিমাণে বাস্তবতা আছে, এই বিশ্বাসে জোলা প্রভৃতি বস্তুতান্ত্রিকেরা মানবমনের এবং মানবসমাজের পঙ্কোদ্ধার করে সরস্বতীর মন্দিরে জড়ো করেছিলেন। রাধাকমল বাবু কি চান যে আমরাও তাই করি? '[৫৪] প্রমথ চৌধুরী বাহ্যবাস্তবতার অনুলিপিকার 'বিশ্বের রিপোর্টার' মাত্র, স্রষ্টা নয়। তিনি বলেন, 'আমরা যখন বহির্জগতের সত্যসুন্দর মঙ্গলের কেবলমাত্র দ্রষ্টা, তখন আমরা বদ্ধজীব, এবং আমরা যখন নূতন সত্য সুন্দরমঙ্গলের স্রষ্টা তখন আমরা মুক্তজীব। যাঁর স্বাধীনতা নেই তাঁর সাহিত্যে কোনো কিছুরই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই। তিনি বড় জোর বিশ্বের রিপোর্টার হতে পারেন, তার বেশি নয়।'[৫৫] তিনি মনে করেন যথার্থ কবি সমাজের ফরমাশ খাটেন না, বরং তিনি মানব সমাজে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। তাই সাহিত্যকে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় করে তোলাও সঙ্গত নয়। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের মিশ্রণ ঘটাবার পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন বাস্তবতা স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের প্রাথমিক উপাদান, স্রষ্টা তাকে পরিশোধিত ও সুসম্পূর্ণ করে সাহিত্য উপস্থাপিত করেন।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রাধাকমল লেখেন 'সাহিত্য ও স্বদেশ' ("সাহিত্য" বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধেও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের পূর্বেকার বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য

---

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যকে তিনি বস্তুতন্ত্রহীন বলে অভিযুক্ত করেন এবং লোকশিক্ষকের ভূমিকা পালনই সাহিত্যিকের দায়িত্ব বলে দাবি করেন। তবে সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেন তার মধ্যে বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নয়, বরং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'কবির সাহিত্যের সাধনা-আপনার জীবনের দ্বারা বাস্তবকে নবজীবন দেওয়া, বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া বাস্তবের অতীত হওয়া।'[৫৬] অর্থাৎ তাঁর বাস্তবতা বিষয়ক ধারনার সঙ্গে ভাববাদীদের বাস্তবতা উপস্থাপন বিষয়ক ধারনার ভিন্নতা নেই। তিনিও মনে করেন বাস্তবতা হবে স্রষ্টার প্রাথমিক উপাদান, লেখক তাকে পরিশোধিত করে সৃষ্টি করবেন এক আদর্শ বাস্তব। "সবুজপত্র"-এ (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২) মুদ্রিত 'কবির কৈফিয়ত' প্রবন্ধে বিরোধীদের অভিযোগ খণ্ডনের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনায় তাঁর অনীহার কারণ, এবং নির্দেশ করেন বাস্তবতা ও স্রষ্টার চৈতন্যের সম্পর্ক। তিনি বলেন, বাস্তবতায় জীবনসংগ্রাম যত কঠোর তীব্র নিরানন্দই হোক, কবি কখনো ওই বাস্তবতার চাপে মৃতপ্রায় হন না। বা বাস্তবতার ধুলিক্লেদ তাঁকে তাপিত করে না। কবির বীণায় বাজে বিশ্বপ্রকৃতির ~~প্রকৃতির~~ প্রকৃত সুর, সে সুর আনন্দের। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন দুঃখদৈন্য সংগ্রাম সন্তাপের মধ্যেও প্রকৃতিতে বেজে চলে পূর্ণতা ও আনন্দের বাণী; কবিও প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেই পরম সত্যেরস্তোত্রই উচ্চারণ করবেন মাত্র, আর কিছু নয়। কবির এই সৌন্দর্যবন্দনাই রবীন্দ্রনাথের কাছে চরম সত্য, আর তিনি বাস্তবতার গাথা রচনাকেগণ্য করেন অসুন্দর কর্মরূপে। বাস্তবতাবাদীদের বাস্তবমনস্কতাকে উপহাস করে তিনি বলেন, 'বড়াই করিতে হইবে যে আনন্দকে অবজ্ঞা করি আমরা এমনি বাহাদুর। চন্দন রাখিতে লজ্জা, তাই রাইসরিষার বেলেস্তারা মাখিয়া দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা এই বেলেস্তারাটাকে।'[৫৭]

রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা বিষয়ক এ-বিতর্কে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন জনবাস্তবতাকে দেখেছেন

৫৬· রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য ও স্বদেশ', "বর্তমান বাঙালাসাহিত্য" (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, প্রকাশকাল ?) পৃঃ ১৮৭।

৫৭· রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবির কৈফিয়ত', 'সাহিত্যেরপথে", পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দৃষ্টিতে এবং বাস্তবতার বিভিন্ন অঙ্গলকে গণ্য করেছেন বাস্তবতা বলে। বিপিনচন্দ্র পালের কাছে বাস্তবতাবলে গণ্য হয়েছে সাধারণ প্রাত্যহিক সুখদুঃখ রিরংসা ঈর্ষাভরা জীবনকে। তিনি মনে করেন মধু ও হুল ভরা সাধারণ জীবনের নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ পরিচয় তুলে ধরেই একজন লেখক বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেন।[৫৮] মধু ও হুলভরা সাধারণ জীবনের নিরপেক্ষ চিত্রন না করে রবীন্দ্রনাথ শুধু জীবনের মধুর অংশের চিত্রন করেছেন বলে রবীন্দ্রসাহিত্য তাঁর কাছে বস্তুতন্ত্রহীন রূপে প্রতিভাত হয়। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। সুধীন্দ্র নাথ রবীন্দ্রকাব্যের জগতকে 'পরীররাজ্য' বলে অভিহিত করেন। কারণ রবীন্দ্রসাহিত্যে যে দেশকালের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তা প্রাচীন; রহস্য ও সৌন্দর্য-মণ্ডিত। প্রাত্যহিক তিক্ত বাস্তবতাকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না, হৃদয়ের মহত্তম আবেগ বা গভীর আনন্দ বেদনা-নিবেদনই ওই পৃথিবীতে চরম বাস্তব। সৌন্দর্যই ওই পৃথিবীতে পরম সত্য। সুধীন্দ্রনাথ বলেন, ''...... প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর, এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায়, তাহলে বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।''[৫৯] রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছে বাস্তবতা বলে গণ্য হয়েছে এ-দেশের শ্রমজীবীদের জীবন ও তাদের সঙ্কটকে। দেশের এই বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনীতিক-পারিবারিক-সামাজিক জীবন সঙ্কটের ব্যাপক পরিচয় ও সঙ্কটের সমাধান নির্দেশ করা হয়নি বলে রবীন্দ্রসাহিত্যকে তিনি বস্তুতন্ত্রহীন বলে অভিযুক্ত করেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের কাছে বাহ্যবাস্তবতা গণ্য হয়েছে অসম্পূর্ণ ও অসুন্দররূপে। তাঁরা সাহিত্যে সম্পূর্ণ, সুন্দর ও আদর্শায়িত বাস্তবতার উপস্থাপনা দেখতে চান। তাঁরা মনে করেন বাহ্যবাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রনে কবি সৃষ্টি করবেন আদর্শায়িত বাস্তবজগৎ। প্রমথচৌধুরী সাহিত্যে বাস্তবতার নগ্ন চিত্রনকে গণ্য করেন 'পঙ্কোদ্ধার' বলে।[৬০] রবীন্দ্রনাথের কাছে বাস্তবতা বা সত্য

৫৮· বিপিনচন্দ্র পাল, 'চরিতচিত্র রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ৬৮৯।

৫৯· সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সূর্যাবর্ত', ''সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ'' (হীরেন্দ্রনাথদত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা, কার্তিক ১৩৯০), পৃঃ ২৬৫।

৬০· প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

বলে গণ্য হয়েছে আত্মোপলব্ধি। স্রষ্টা তাঁর চৈতন্য দিয়ে যে সত্য উপলব্ধি করেন তা-ই চরম সত্য বা বাস্তব। কাব্যে বাহ্যবাস্তবতার চিত্রন করা হলে ওই কাব্য হয়ে উঠবে হাটের কাব্য মাত্র, শিল্প নয়। বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাকে তিনি 'কবির কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধে 'রাইসরিষার বেলেস্তারা মাখিয়া দাপাদাপি বলেও উপহাস করেন।[৬১]

৪.৩ আধুনিক উপন্যাসিকদের বাস্তবতার বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ

ভাববাদীরোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ লেখকের বাস্তবমনস্কতা ও সাহিত্যে প্রাত্যহিক বাস্তবতার চিত্রনের প্রবণতাকে মহৎ-ব্যাপাররূপে গণ্য করেন নি। পাশ্চাত্য বাস্তবতাবাদী বা প্রকৃতবাদী উপন্যাসিকদের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাকে তিনি উপহাস ও তাচ্ছিল্য করেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'মানব প্রকাশ' প্রবন্ধে তিনি জোলাকে 'অশ্লীল' বলে অভিহিত করেন।[৬২] কারন জোলার উপন্যাসে শুধুমাত্র বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে, মহ্য হৃদয়বৃত্তি উপেক্ষিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে 'জোলা অশ্লীল, কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ।'[৬৩] বাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা রীতি তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছে। ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে (৮এপ্রিল-১৮৯২) তিনি বলেন যে ইংরেজি উপন্যাস পড়তে তাঁর অস্বস্তি হয়, কারন সেখানে 'প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস।'[৬৪] ক্লেদাক্ত ও অসুন্দর বাস্তবতার কারনে 'এ্যানা কারেনিনা' ও তাঁর কাছে 'Sickly' মনে হয়েছে বলে ইন্দিরা দেবীকে (১৮৮৯) তিনি জানান।[৬৫] রবীন্দ্র পরবর্তী তিরিশ আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাও রবীন্দ্রনাথকে

---

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবির কৈফিয়ত', পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানবপ্রকাশ', "সাহিত্য", (বিশ্বভারতী, প্রপ্র-১৩১৪, পুনর্মুদ্রন, আষাঢ় ১৩৮১), পৃঃ ২২৪।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৪।

৬৪. ছিন্নপত্রাবলী (বিশ্বভারতী ১৯৬০), পৃঃ ৯৪।

৬৫. ওই, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুব্ধ করে। বাঙলা সাহিত্যে বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকে আবির্ভূত হয় একগোত্র তরুণ লেখক, তাঁরা ত্রিশের দশকে বিকাশ বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সাধারণভাবে এই লেখকেরা তিরিশি আধুনিক লেখকগোত্ররূপে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। এই লেখকেরা বাঙলা কথাসাহিত্যকে নানাভাবে বাস্তবতাঘনিষ্ঠ করে তোলার প্রয়াস চালান। তাঁদের এই প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কাছে অসুন্দর বলে গণ্য হয়। আধুনিকদের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতা ও বাস্তবতামুখী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে এতো ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে যে নানাভাবে তিনি আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের উপহাস ও আক্রমণ করে চলেন। তরুণ কথাসাহিত্যিকেরা যে তাঁর সঙ্গে মতাদর্শগত এক ব্যাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথঅনেকটাএকতরফাভাবেই নানাচিঠিপত্র, প্রবন্ধ, নাটক-কাব্য-নাট্য-উপন্যাস প্রভৃতিতে তীব্রভাবে আধুনিক কথাসাহিত্য ও সাহিত্যিকদের আক্রমণ করে চলেন এবং আধুনিকদের বাস্তবতাঘনিষ্ঠ রচনাকে অশিল্প প্রতিপাদনে তৎপর হন।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামুখিতা বা আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রতি প্রথম আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন সজনীকান্ত দাসকে লেখা চিঠিতে। সজনীকান্ত দাস বাঙালী সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে আধুনিক-সাহিত্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করে ২৩ ফাল্গুন, ১৩৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠিতে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে এর প্রতিকারও প্রার্থনা করেন। সজনীকান্তের চিঠির অংশবিশেষ এ-রকম : 'লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধবাঁধন হারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরণের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Letirature -এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি পড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণপ্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য বলে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রীপুরুষের যে সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান করে থাকি এই সব লেখাতে সেইসব সম্পর্ক বিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের ধারনাকে কুসংস্কারশ্রেণীভুক্ত বলে প্রচার করবার একটা চেষ্টা দেখি। ······ Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। ········ কোনো প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলাসাহিত্যকে রূপে-রসে পুষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্যপথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি। ··········· বাঙলা সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার পূর্বেই এই ধরণের লেখার মোহে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে,

Dhaka University Institutional Repository

আমার এই ধারণা। সেইজন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি।'[৬৬] রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে ২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩-এ লেখা চিঠিতে আধুনিকদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আধুনিকদের 'কলম'কে 'বেআব্রু' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়েনা। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি যেটাকে সুশ্রী বলি এমনতুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। .... সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলবার বলব।'[৬৭] দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের বাস্তবতার চিত্রণ প্রবণতাকে সুশ্রী বলে গণ্য করেন নি, বরং এ-ব্যাপারটি তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে কলমের আব্রু ঘুচে যাওয়া বলে। আর সজনীকান্তের কাছে বাস্তবতার নিরাবেগ চিত্রণ অনৈতিক কাজ রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিলেন। তবে অমলহোমের আধুনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও রবীন্দ্রনাথকে বেশ প্ররোচিত করে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অমলহোম দিল্লীর প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে 'অতিআধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন। এ-প্রবন্ধে তিনি তরুণ লেখকদের 'অতিআধুনিক' বলে অভিহিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর কাছে আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের অভীষ্ট রিয়ালিজমকে মনে হয়েছে ইউরোপীয় সাহিত্যের যৌনতার অন্ধনকলরূপে।[৬৮] রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করেন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে, 'সাহিত্যধর্ম (১৩৩৪) ও 'সাহিত্যে নবত্ব' (১৩৩৪) প্রবন্ধ দুটির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যকে আক্রমণে অগ্রসর হন অমলহোম নির্দেশিত পথ ধরে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথও আধুনিক সাহিত্যকে অভিযুক্ত করেন ইউরোপীয় যৌনতার অন্ধ-অনুকরণ বলে। বলা যায় আধুনিকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা আধুনিক সাহিত্যকে আক্রমণমূলক প্রবন্ধাবলীর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন সজনীকান্ত অমলহোমের মতো রক্ষণশীল সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরাগীরা।[৬৯] ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

---

৬৬. উদ্ধৃত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, "কল্লোলযুগ" (ডি, এম, লাইব্রেরী কলকাতা প্রপ্র ১৩৫৭ ব্যবহৃত হয়েছে চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৬), ১২৬-১২৭।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৭।

৬৮. অমলহোম, 'অতিআধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' ("ভারতবর্ষ" ১৪:২:২, মাঘ ১৩৩৩) পৃঃ ২৯২।

৬৯. শঙ্খঘোষ, "নির্মাণ আর সৃষ্টি" (বিশ্বভারতী, শান্তি নিকেতন, ১৩৮৯), পৃঃ ১০৪-১০৫,

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শুরু করে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা রচনায় আধুনিক কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু ও লেখকদের বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর নিন্দা সমালোচনা করে চলেন। 'বিচিত্রা''-য় (শ্রাবণ, ১৩৩৪) মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধটি; এবং ''প্রবাসী''-তে (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) প্রকাশিত হয় 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ। সজনীকান্ত দাস তাঁর ''আত্মস্মৃতি''-তে বলেন যে তাঁর 'ব্যাকুলপত্র আবেদনের ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ''সাহিত্যধর্ম'' প্রবন্ধে ''আধুনিকসাহিত্যে''র বিরুদ্ধে লেখেন।'[৭০] এ-দুটি প্রবন্ধে-রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবমনস্কতাকে আক্রমণ করেন। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে তিনি আধুনিক লেখকদের বাস্তবতার নগ্ন নিরাবরণ চিত্রণ প্রবণতাকে 'বেআব্রুতা' বলে চিহ্নিত করেন, তার 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে আধুনিক কথা সাহিত্যকে শিল্পসৃষ্টিরূপে গণ্য করার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এই রচনাগুলো অপটু লেখকদের পাকশালায় 'রিয়ালিটির কারিপাউডার' সহযোগে প্রস্তুত সস্তা, উত্তেজক রচনা মাত্র, মহৎ শিল্প নয়।

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতাকে আক্রমণ করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ে নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্রপাল প্রমুখের আনীত বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ খণ্ডন প্রসঙ্গে যে মতামত ব্যক্ত করেন, এ পর্যায়েও বাস্তবতাবিষয়ক ওই একই ধারণা ও বিশ্বাসই ব্যক্ত করেছেন। তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা তাঁর কাছে শিল্পসৃষ্টি বলে গণ্য হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বাহ্যবাস্তবতার সত্যকে এ-প্রবন্ধে বলেন 'সাধারণ সত্য' আর সাহিত্যের সত্যকে বলেন 'সার্থকসত্য।' তাঁর মতে, 'সাধারণ সত্যে একেবারে বাছবিছার নেই, সার্থকসত্য আমাদের বাছাই করা।'[৭১] তিনি মনে করেন শিল্পকলা সার্থক সত্যের উপস্থাপনা করে, সাধারণ সত্য তুলে ধরা তার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর মতে যে জিনিসকে আমরা প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করি, সেজিনিসটি প্রয়োজনের ছায়াতে রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ-কারণেই সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও সজনে ফুল, গোলাপজাম,

---

৭০. সজনীকান্ত দাস, ''আত্মস্মৃতি'' (প্রথমখণ্ড), ডি,এম লাইব্রেরী কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৬১) পৃঃ ২৩৬

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যধর্ম', ''সাহিত্যের পথে'', পৃঃ ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সর্ষে ফুল বা রুই মাছের সৌন্দর্য বর্ণনা কাব্যের বিষয় হতে পারে না। কারণ এরা আমাদের জীবনের স্থূল প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। কাব্যে এদের উল্লেখমাত্রই এদের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথাই সর্বাগ্রে আমাদের মনে পড়ে। এরা তাই কোনো সুদূর অথবা সৌন্দর্যের আভাস আমাদের মনে জাগাতে সমর্থ হয় না।[৭২] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ব্যবহারিক জীবন ও প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত উপকরণ, পুষ্প ইত্যাদি কাব্যের উপকরণ হতে পারে না। কারণ ওই স্থূল প্রয়োজনে ব্যবহৃত উপকরণাদি কখনো বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও সুদূরতার আভাস সঞ্চারে সমর্থ হবে না। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবন্ধে আধুনিক কথাসাহিত্যের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাকে নানা বিদ্রূপাত্মক অভিধায় অভিহিত করেন। কখনো এ-প্রবণতাকে নির্দেশ করেন 'সাহিত্যের হোলি খেলায় কাদা মাখামাখির উৎসব' বলে, কখনো কথাসাহিত্যের বাস্তবতামনস্কতাকে অভিহিত করেন 'বিদেশের আমদানি বেআব্রুতা', "পালোয়ানির মাতামাতি', 'ধারকরা নকল নির্লজ্জতা,'' সাহিত্য রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখি' বলে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে "বিদেশের আমদানি' এই বেআব্রুতা ' সাহিত্যের নিত্য পদার্থ নয়, ' মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য।'[৭৩] আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে আক্রমণ করে তিনি বলেন ;

> এই ন্যাংটি-পরা গুলি পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবীর নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চীৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্তউৎসব বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলিনে। অতএব সাইকো- অ্যানালিসিসে এর কার্যকারণ

---

৭২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬-৭৭।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

> বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূলপ্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মালিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দ প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এক্ষেত্রে অসংগত বলেই আপত্তি করব, অসত্য বলে নয়।'[৭৪]

রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতা হচ্ছে একধরণের অসুন্দর উন্মত্ততা। সাহিত্যে এই উন্মত্ততা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে শক্তির দম্ভ প্রকাশ করা যায়, কিন্তু 'মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তা' দিয়ে হৃদয়কে মুগ্ধ ও প্রশান্ত করে দেয়া যায় না। তাই শক্তির দম্ভকে বাহাদুরি দেবার কিছু নেই। তিনি বলেন :

> সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদামাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি। এপ্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাতলামির ভূতে পাওয়া মাদলী করতালের খচোখচোখচকার-যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্তব্যক্তিকে এপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কিনা; যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে, এটা সঙ্গীত কিনা, মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়, ………… মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ বলে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে সেকথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম। এপৌরুষ চিৎপুরের রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়।'[৭৫]

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে মানুষের প্রবৃত্তিগত জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনারও বিরোধী। তাঁরমতে মানুষের প্রবৃত্তিগত জীবন সত্য হলেও, ওই স্থূল প্রবৃত্তিই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। তা মানুষের জীবনের একটি গৌণ অংশ মাত্র। তাই প্রবৃত্তিগত জীবন চিত্রন কখনো সাহিত্য বা শিল্পের লক্ষ্য হতে পারে না। আধুনিক সাহিত্যে ইন্দ্রিয় বিরংসাপুঅনুপুঙ্খ চিত্রনের প্রবণতাকে তিনি নির্দেশ করেন যুগের হুজুগরূপে।[৭৬] প্রবৃত্তিগত

৭৪· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১ - ৮২।

৭৫· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২।

৭৬· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনরীতিরও নিন্দা করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে এ-দেশে অনুপুঙ্খ নির্লজ্জ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মিতা কখনোই মর্যাদা পাবে না এবং এই রীতির উদ্ভবও এদেশে স্বাভাবিক ভাবে ঘটে নি, এটি ইউরোপ থেকে ধার করা। আধুনিক কথাসাহিত্যিকেরা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সম্প্রতি যে দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে সেদেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি সে দেশের সাহিত্যে ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে।'[৭৭] অর্থাৎ 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যকে সমাজনীতি বিরুদ্ধ এবং এ-দেশের আবহাওয়া ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে অভিযুক্ত করেন।

আধুনিক সাহিত্যের প্রতি আক্রমণাত্মক ও বাস্তবতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক রবীন্দ্রনাথের এ-প্রবন্ধটি "বিচিত্রা"য় (শ্রাবণ, ১৩৩৪) মুদ্রিত হবার পর আলোড়ন ও বিতর্ক শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করতেও আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনে অগ্রসর হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে এগিয়ে আসেন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী। "বিচিত্রা"য় (ভাদ্র, ১৩৩৪) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করে লেখেন 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নামক প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের পক্ষাবলম্বন করে আধুনিকদের বিরুদ্ধে আনীত রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ খণ্ডনেই ব্যাপৃত ছিলেন, তবে এই সমালোচনা, যুক্তিখণ্ডন ইত্যাদি মধ্য দিয়ে তাঁর বাস্তবতা-ধারণাও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার সকল অংশের নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের

---

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২ - ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবৃত্তিগত জীবন চিত্রণের প্রবণতাকে 'বেআব্রুতা' বলে নির্দেশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে আধুনিক সাহিত্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বেআব্রুতায় পরিপূর্ণ। নরেশচন্দ্র এই অভিযোগ খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন যে আব্রু-বেআব্রু ধারনা আপেক্ষিক ধারনামাত্র। তাই দেখা যায় ভিন্ন ভিন্নদেশে ভিন্ন মানুষের কাছে 'আব্রু' বলে গণ্য হয়েছে বিভিন্ন ব্যাপার। সাহিত্যেও বেআব্রুতা যাচাইয়ের কোনো নিত্য বা সনাতন মাপকাঠি নেই। তিনি বলেন যৌনসম্পর্কের রূপায়ন আধুনিক সাহিত্যেই প্রথম ঘটেনি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের সাহিত্যেই ওই সম্পর্কের রূপায়ন লক্ষ্য করা যায় এবং সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রসাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধিতা ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে তিনি বলেন :

> কবির কতক কথায় মনে হয় যে, যতক্ষণ লেখক কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন ততক্ষণ তিনি শ্লীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন তখনই তিনি বেআব্রু। কিন্তু তাহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শারীর ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাশ করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে। তা'-ছাড়া "হৃদয়যমুনা," "স্তন," "বিজয়িনী," "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটা সীমা-রেখা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বেআব্রু পদবাচ্য হইতে পারে। সে সীমারেখা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তার বাহিরে কোন বই, ভিতরেই বা কোন বই,- তাহা নির্ণয় করিবার কোনও নির্দ্দেশই কবি দেন নাই।[৭৮]

নরেশচন্দ্র আধুনিক লেখকদের পাশ্চাত্য থেকে ঋণগ্রহণ করার ব্যাপারটিকে দূষণীয় বলে মনে করেন না। তিনি মনে করেন 'আজ বিশ্বব্যাপী ভাববিনিময়ের দিনে বিলেতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে পারি না।[৭৯] তবে পাশ্চাত্য থেকে আধুনিক লেখকেরাই প্রথম ঋণ গ্রহণ করেননি। পাশ্চাত্যের ভাবশ্রিরা আত্মস্থ

---

৭৮. নরেশচন্দ্রসেনগুপ্ত, 'সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা', যুগপরিক্রমা (সেনগুপ্ত ট্রাস্ট, কলিকাতা, প্রপ্র ১৯৬১) পৃঃ ১৫০।

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

করেন রবীন্দ্রনাথও । রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও যে ইবসেন বা স্ট্রিন্ডবার্গের অনস্বীকার্য প্রভাব আছে, তাকেও বিদেশের আমদানি বলা করে কিনা- নরেশচন্দ্র এ-প্রশ্নও উত্থাপন করেন ।

আধুনিকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ও রবীন্দ্রনাথের বাস্তববিমুখতার সমালোচনা করে শরৎচন্দ্র লেখেন ' সাহিত্যের রীতি ও নীতি' ("বঙ্গবাণী", আশ্বিন ১৩৩৪) শীর্ষক প্রবন্ধ । শরৎচন্দ্র অভিযোগ করেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যধর্ম,' প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যকে নিরপেক্ষ মানদণ্ডে মূল্যায়ন করেন নি । শরৎচন্দ্রের মতে আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র পরিচয় থাকলে তাঁর পক্ষে এমন একদেশদর্শী মূল্যায়নকরা সম্ভব হতো না । তিনি মনে করেন সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল ভক্তদের উস্কানীতে প্ররোচিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে এমন আক্রমণাত্মক সমালোচনা করেন ।[৮০] রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মিতা এ-দেশের জন্য অনাবশ্যক বলে ঘোষণা করেন, কারণ তাঁর মতে এই দেশ বিজ্ঞানমনস্ক নয় । শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এ-মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না । তিনি বলেন এ-দেশ বিজ্ঞানমনস্ক নয় বলে চিরদিন ওই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মিতাকে উপেক্ষা করতে হবে এমন যুক্তি মেনে নেয়া যায়না । শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য তত্ত্বেরও সমালোচনা করেন । তিনি মনে করেন কাব্যের জগত ও কথাসাহিত্যের জগত অভিন্ন নয় । কাব্যের জগতে কবি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে সৌন্দর্যের সাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন, কিন্তু কথাসাহিত্যে লেখককে অবশ্যই বাস্তবতা নির্ভর হতে হবে । তিনি বলেন, 'কাব্য সাহিত্য ও কথাসাহিত্য একবস্তু নয় । আধুনিক উপন্যাস সাহিত্য ত নয়ই । ' সোনার তরী'র যা লইয়া চলে, ' চোখের বালি'র তাহাতে কুলায় না । সজিনা ফুলে , বক ফুলে ' সোনার তরী'র প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয় । তেপান্তর মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যের চলে না । এখানে

৮০· শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি', "শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ" (অষ্টম সম্ভার) (এম, সি, সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লি , প্রকাশকাল, অনুল্লেখিত), পৃঃ ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোড়ার চারপায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষবিস্তার করিয়া উড়ার সুবিধা হয় না।'[৮১] শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনার পক্ষপাতী হলেও, রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও সাহিত্যে যৌনজীবনের বিস্তৃত বিবরণ দেয়াকে অরুচিকর ব্যাপার বলে গণ্য করেন। সাহিত্যে এই বাস্তবসত্যের উপস্থাপনা করতে গিয়ে তিনি নিজে ও অস্বস্তি বোধ করেন বলে উল্লেখ করেন, এবং রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বিশ্বাস করেন যে ভিত্তি যেমন গুপ্ত থাকে তেমনি সাহিত্যে যৌনজীবনও প্রচ্ছন্ন থাকবে। শরৎচন্দ্রের মতে, 'বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়, ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড়, গাছের জীবন ও ফুলফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হৌক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্য্যও যায়, প্রাণও শুকায়। এ-সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না।'[৮২] শরৎচন্দ্রের এ-মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে সাহিত্যে বাস্তবতার সমগ্র অংশের উপস্থাপনায় তিনি উৎসাহী নন। যৌনজীবন বাস্তবমানুষের জীবনের একটি প্রধান অংশ, শরৎচন্দ্র ওই বাস্তবতার উপস্থাপনায় কুণ্ঠা ও অস্বস্তি বোধ করেন।

সাহিত্যে নবত্ব '("প্রবাসী", অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যকে তীব্র আক্রমণ করেন। এ-প্রবন্ধে শিল্পগুণ সম্বন্ধ প্রকৃত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন আধুনিক সাহিত্যের তুচ্ছতা ও নোংরা চারিত্র্য। রবীন্দ্রনাথ আধুনিককাল রূপে চিহ্নিত সময়কে সাহিত্যের সায়াহ্নকাল বলে নির্দেশ করেন। আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতাকে অভিহিত করেন 'পাঁকের মাতুনি' বলে এবং আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতাবাদকে চিহ্নিত করেন 'তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি' অভিধায়।[৮৩] তাঁর মতে সাহিত্য যখন শক্তিমান থাকে তখন সে চিরনূতনকেই নবরূপে প্রকাশ করে। এইই হচ্ছে তার অপূর্বতা ও 'ওরিজিন্যালিটি'। কিন্তু কখনো কখনো সাহিত্যের এই শক্তি ফুরোয়, তখন সাহিত্য পৌঁছোয় শেষদশায়।

---

৮১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৭।

৮২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮০।

৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে নবত্ব', "সাহিত্যের পথে", পৃঃ ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

তখন সাহিত্যে শুরু হয় বিকৃতির কাল। এই আধুনিক কাল হচ্ছে সেই শেষদশার পরিচায়ক এবং আধুনিক লেখকেরা সেই শেষ দশার সাক্ষীকার। এই বিকৃতির কালে অসংযমও মাতলামিই গণ্য হয় পৌরুষ বলে। আধুনিকদের বাস্তবতার সকলস্তর উপস্থাপনার প্রবণতা অসংযম ও মাতলামিরই নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে বিদ্রূপ করে বলেন, 'জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্য ধারায় নৌকো চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে, আধুনিক উদভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি–এতে মাঝিগিরির দরকার নেই– এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি।'[৮৪] আধুনিক লেখকদের বাস্তবজীবন থেকে নির্বিচারে বিষয় উপাদান গ্রহনের প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কাছে দূষনীয় বলে মনে হয়েছে। সাহিত্যে দারিদ্র্য ও যৌনজীবনবাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ গণ্য করেন পাশ্চাত্যের অন্ধঅনুকরণরূপে। তাঁর মতে এই আধুনিক লেখকেরা প্রতিভাহীন ও অপটু। প্রতিভাহীনতা ও অপটুত্বের কারণেই এই লেখকেরা নোংরা ও কুৎসিতকে দেখিয়ে বাজার মাত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। তিনি আধুনিকদের রচনাকে সাহিত্যসৃষ্টি বলে গণ্য করেন না; কারণ এসব রচনায় চিরন্তন সুন্দর ভাবের দ্যোতনা নেই। এতে আছে শুধু বিলেতী ভাবধারার অনুকরণে লালসা, অসংযম ও দারিদ্র্যকে চড়া রঙে চিত্রিত করার ঝোঁক। তিনি বলেন:

> বিলিতি পাকশালায় ভারতীয়কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি–পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি করে রাখে; যাতে তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে – লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈণ্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে– অপটু লেখকের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারিপাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর–একটা লালসার অসংযম।[৮৫]

এ–সব মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ জীবনবাস্তবতার সামগ্রিক চিত্রনের পক্ষপাতী নন। তাঁর ভাববাদী রোমান্টিক দৃষ্টিতে বাস্তবতার নিরাবরণ নগ্ন রূপ কুৎসিত ও অসহনীয় বলে বোধ হয়েছে।

---

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬।

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকেরা বাস্তবঘনিষ্ঠ হবার তাগিদে তাঁদের রচনায় উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন জীবনবাস্তবতার সকল সুর। আধুনিকদের এই রোমান্টিকতা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত ও ক্ষুব্ধ করেছে এবং তিনি নানাভাবে আধুনিকদের এই প্রবণতার তুচ্ছতা প্রতিপাদনে তৎপর হয়েছেন। তিনি এ-প্রবন্ধে দারিদ্র্য ও যৌনজীবন উপস্থাপনার প্রবণতাকে 'সস্তা সাহিত্য সৃষ্টির মোহ' বলেও অভিহিত করেন। তাঁর মতে ঃ

> দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই মাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারিপাউডরের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্পশক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।'[৮৬]

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যে কুৎসিত ও স্থূলবাস্তবতা উপস্থাপনা করা অনুচিত, কারণ সাহিত্যে ভালোমন্দ, তুচ্ছতা-মহত্ত্বের মূল্যভেদ আছে। তিনি বলেন ঃ

> '.......... কিছুর সঙ্গে কিছুরই মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তা হলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো সমান দামের হয়ে ওঠে। কেননা অসীমের মধ্যে নিঃসন্দেহই তাদের সকলেরই এক অবস্থা-খণ্ড দেশকালপাত্রের মধ্যেই তাদের মূল্যভেদ। আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যেই একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ।'[৮৭]

বাস্তবঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার জন্য সাহিত্যে লালসার চিত্রনও বিপদজনক বলে মনে করেন তিনি। কারণ 'পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়'[৮৮] বলে এ-পথে সহজেই খ্যাতি মেলে। সস্তাখ্যাতির মোহগ্রস্ত লেখকের পক্ষে শিল্পসৃষ্টি করা সম্ভব নয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। লক্ষণীয় যে বিপিনচন্দ্র পাল

---

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮-৮৯।

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০।

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ এনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও আধুনিক লেখকদের বিরুদ্ধে আনেন একই -ধরণের অভিযোগ। রক্ষণশীলেরা রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিদেশী প্রভাবজাত বলে নিন্দা ও সমালোচনা করেন। 'বাস্তব' প্রবন্ধে রক্ষণশীলদের উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধ এই যে আমরা ইংরেজি পড়েছি।'[৮৯] 'সাহিত্যবিচার' "প্রবাসী"(কার্তিক, ১৩৩৬) প্রবন্ধে তিনি বলেন আমাদের সাহিত্য যে ইউরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত সেটা গৌরবের কথা, এবং বলেন : 'সাহিত্য বিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির গোঁড়ামিদুর্বল সংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।'[৯০] আবার রবীন্দ্রনাথই আধুনিকদের পাশ্চাত্যপ্রভাবকে অন্ধ অনুকরণ বলে নিন্দা করেন। নবীন সাহিত্যকে তিনি 'বেআব্রু' বলে অভিযুক্ত করেন, দেশকালের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে অভিযুক্ত করেন এবং নবীন সাহিত্যের 'বেআব্রুতা'কে বিদেশের আমদানি বলে নির্দেশ করেন।[৯১]

আধুনিক লেখকদের বাস্তবতাঘনিষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কাছে বাস্তবতা উপস্থাপনার নামে অনাচার বলে প্রতীয়মান হয়। এই অনাচারের প্রতিকার সাধনের জন্য সজনীকান্তের প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ এক সাহিত্যসভা আহ্বান করেন। যদিও প্রকাশ্যে এ-সভাকে নির্দেশ করা হয় আধুনিক লেখকগোত্র ও "শনিবারেরচিঠি" গোত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রয়াসরূপ, তবে তরুণ লেখকদের সামনে তাঁদের অনাচার ও সস্তাসাহিত্য সৃষ্টির ~~অপ্র-~~অপ্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরার তাগিদও রবীন্দ্রনাথকে এ-সভা আহ্বানে অনুপ্রাণিত করে। "শনিবারেরচিঠি" প্রথম থেকেই আধুনিক সাহিত্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও আক্রমন করে চলে। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ও আক্রমনাত্মক এ- মনোভাবের কারনে আধুনিক লেখকগোত্রের সঙ্গে "শনিবারেরচিঠি"র সম্পর্ক ছিলো তিক্ত। উল্লেখযোগ্য যে, "শনিবারের চিঠি"র সংকীর্ণ রক্ষণশীল আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ বেশপছন্দই করেছেন। আধুনিকদের প্রতি ওই পত্রিকার বিদ্রূপআক্রমণকে তিনি একটি চিঠিতে 'আর্ট' বলে প্রশংসা করেন।[৯২] অর্থাৎ আধুনিক লেখকদের

---

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাস্তব', 'সাহিত্যেরপথে", পৃঃ ২০

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সাহিত্যবিচার "সাহিত্যেরপথে" পৃঃ ৯৭

৯১. রবীন্দ্রনাথঠাকুর , 'সাহিত্যধর্ম,' "সাহিত্যেরপথে ", পৃঃ ৭৫

৯২. সজনীকান্তদাস, "আত্মস্মৃতি" (প্রথমখণ্ড), ওই, পৃঃ ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষিপ-আক্রমণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ "শনিবারের চিঠি"কে একরকম অনুপ্রেরণাই দিয়েছেন । সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠিতে (২৩পৌষ ১৩৩৪) তিনি বলেন,' "শনিবারের চিঠি"তে ব্যঙ্গ করবার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি । বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেছে ।'[১৩] রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আহূত সাহিত্যসভা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রাভবনে" রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় । ৪ঠা চৈত্রের সভায় "শনিবারের চিঠি " গোত্র উপস্থিত থাকেনি । ওই সভার ওপর লেখা একটি প্রতিবেদন "বাংলারকথা"নামক পত্রিকায় (৬ চৈত্র ১৩৩৪)আধুনিক লেখকদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হলে, ওই বিবরণ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হন । সজনীকান্তের ভাষ্য থেকে জানা যায় 'অতিআধুনিকদের' লেখা ওই প্রতিবেদন ছিলো 'প্রথমদিনের সভার একসম্পূর্ণ কল্পিত মিথ্যা বিবরণী', যা প্রকাশিত হলে' রবীন্দ্রনাথ উত্তেজিত হইয়া ওঠেন' এবং পরদিন ৭ই চৈত্র পুনরায় সভা আহবান করেন।[১৪] এ-সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিনের ভাষণ 'সাহিত্যরূপ' নামে "প্রবাসী"পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৩৫)মুদ্রিত হয় এবং দ্বিতীয়দিনের আলোচনা- ব্যাখ্যা-প্রশ্নোত্তর' সাহিত্যসমালোচনা' শিরোণামে' প্রবাসী"তেই (জ্যৈষ্ঠ১৩৩৫) প্রকাশিত হয় ।

'সাহিত্যরূপ (১৩৩৫)প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের নবযুগ প্রবর্তনের দাবির অসারতা প্রতিপাদনে তৎপর হন । আধুনিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, সাহিত্যে তিনি কোন নবরূপের অবতারণা করেছেন ।'[১৫] প্রসঙ্গত আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতাকে বিদ্রূপ করে বলেন, 'কয়লাখনির খনি বা পানওয়ালীর কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ - আসে ।'[১৬] আধুনিকদের 'বিষয়-প্রধান' সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতাকে তিনি 'অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ ' বলেও অভিহিত করেন ।[১৭] রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে বলেন, 'বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তাহলে বলতেই

১৩· উদ্ধৃত, ওই, পৃঃ ২৫৭

১৪· পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬২

১৫· রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যরূ', 'সাহিত্যেরপথে", পৃঃ ২০১

১৬· পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৩

১৭· পূর্বোক্ত , পৃঃ ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

হবে, এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।'[৯৮] 'সাহিত্যসমালোচনা'(১৩৩৫), রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ তরুণ লেখকদের ভগবানপ্রেম মহত্ত্ব প্রভৃতি উন্নত আদর্শ-বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতাকে আক্রমণ করেন। তাঁর মতে এ-প্রবণতা সুস্থতার পরিচায়ক নয়, এটি অসুস্থতা ও বিকারের লক্ষণমাত্র। তিনি তরুণ লেখকদের এ-প্রবণতাকে 'স্রোতক্ষীণ হয়ে পাঁক' প্রধান হয়ে ওঠা বলে অভিহিত করেন।[৯৯]আধুনিক সাহিত্যের তুচ্ছতা নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> "যে জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো একশ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটাকে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ-সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়, তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থামাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হতে পারে না। যেমনতরো কোনোসময় বাতাস গরম হয়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না, এরপর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।"[১০০]

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস"(চতুর্থ খন্ড)গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকদের বিরোধপ্রসঙ্গে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের প্রতি কোনো বিরোধ বা বিরূপতা প্রদর্শন করেননি, বরং একতরফা আধুনিকেরাই নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে উত্যক্ত ও আক্রমণ করে চলে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের অন্যায়-অশোভন আচরণ ও আক্রমণ সহ্য করেন। আধুনিকদের নোংরা সাহিত্যসৃষ্টির অনাচারও রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দেই সয়ে গিয়েছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, '·····"অতিআধুনিক" সাহিত্যের নামে যে কাদাখেড়ু চলিতেছিল তাহা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার কিছু করিবার ছিল না। তাঁহার

---

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৮।

৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যসমালোচনা', "সাহিত্যের পথে", পৃঃ ২২০।

১০০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২১-২২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি "অতিআধুনিকদের" অপ্রসন্নতা একরকম স্বতঃসিদ্ধ ছিল,[১০১] কিন্তু প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ও রবীন্দ্রনাথের আধুনিক বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক নানাপ্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে আধুনিক লেখকেরা নয়, বরং রবীন্দ্রনাথই তাঁর রক্ষণশীল ভক্তদের প্ররোচনায় আধুনিক লেখকদের নানাভাবে বিদ্রূপ-আক্রমণ ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলেন। আধুনিকেরাই এসব বিদ্রূপ উপেক্ষা প্রায় নিঃশব্দে সয়ে চলেন। সুকুমার সেন "বিচিত্রা-ভবনে" রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আহূত সাহিত্যসভা প্রসঙ্গেও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন আধুনিকেরা রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে আক্রমণ করেছেন আবার নিজেদের দুঃসময়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, প্রতিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত আধুনিকেরা মুক্তি ও ত্রাণের জন্য রবীন্দ্রনাথেরই দ্বারস্থ হন। তিনি জানিয়েছেন, ' "অতিআধুনিক"সাহিত্যের অনুরাগী অথচ রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন দুই চারিজন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিলেন অতি আধুনিক ও অনতি-আধুনিক সাহিত্যের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থতা করিতে রাজি হইলেন।'[১০২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সজনীকান্তের প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথই এ-সভা আহ্বান করেন। বাহ্যত এ-সভা ছিলো "শনিবারেরচিঠি" ও আধুনিকদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা, তবে মূলতঃ এ-সভাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন তরুণ লেখকদের রচনার প্রতি তাঁর মনোভাব জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। আধুনিক লেখকদের কিছু প্রবণতা তাঁর কাছে অনাচার বলে মনে হয় এবং এ-সাহিত্য তার কাছে প্রতীয়মান হয় সস্তাসাহিত্যরূপে। এ-সভায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের সস্তা-সাহিত্যসৃষ্টির অপ্রয়োজনীয়তা নির্দেশে তৎপর হন। আর এই সভা 'অতিআধুনিক সাহিত্যের অনুরাগী অথচ রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন' কারো অনুরোধেও আহূত হয়নি। "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ সজনীকান্ত দাসের প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ এ-সভা আহ্বান করেন।[১০৩] সজনীকান্ত ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী, আধুনিক সাহিত্যের ঘোর বিরোধী। সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর সঠিক প্রকাশ কালও দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বলেন যে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের "প্রবাসী" পত্রিকায় এবং 'সাহিত্যধর্ম'প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় "বিচিত্রা"য়, শ্রাবণ ১৩৩৫

---

১০১. সুকুমার সেন "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"(চতুর্থখণ্ড), (বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রথম প্রকাশ ও ব্যবহৃত সংস্করণ ১৩৬৫ (১৯৫৮) পৃঃ ২৩০

১০২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩০-২৩১

১০৩. সজনীকান্তদাস "আত্মস্মৃতি" প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গাব্দে। প্রকৃতপক্ষে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি 'সাহিত্যরূপ'-এর পূর্ববর্তী রচনা। এটি "বিচিত্রা"য় শ্রাবণ - ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয় আর 'সাহিত্যরূপ' মুদ্রিত হয় "প্রবাসী" বৈশাখ ১৩৩৫-এ। 'সাহিত্যধর্মে'র প্রতিক্রিয়া হিসেবে রচিত বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধাবলীর সঠিক প্রকাশকাল নির্দেশেও ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

আধুনিক লেখকেরা বাস্তবতার নানাস্তর, বিশেষ করে যৌনজীবনের নগ্ননিরাবরণ উপস্থাপনা করেন। তাদের এ-প্রবণতা রবীন্দ্রনাথকে পীড়ন করেছে। আধুনিক লেখকের গ্রন্থসমালোচনা কালে কিংবা বিভিন্ন লেখকের কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবণতার নিন্দা-সমালোচনা করেন। অর্থাৎ সাহিত্যে প্রবৃত্তিগত জীবনবাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তি-বোধ করেন। আধুনিক লেখকদের এ-প্রবণতাকে তিনি ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদের নকল ও বিজাতীয় বলে নির্দেশ করেন। তিনি মনে করেন এ-প্রবণতা এ-দেশী নয়, কারণ এ-দেশের মানুষের জীবনে মৈথুনাসক্তি তীব্র নয়, দেহভোগের বুভুক্ষা তাদের মধ্যে নেই। তাই সাহিত্যে দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপার আভাসে ব্যক্ত করার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা চিঠিতে (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের ক্ষীণজীবীর দেশে মদ খেতে গেলেই মানুষ একান্ত মাৎলামিতে গিয়ে পৌঁছয়-এইজন্য নরোয়েতে যেটা দৃষ্টিকটু নয় আমাদের দেশে সেটা কুৎসিত।'[১০৪] সাহিত্যকে বাস্তবতাঘনিষ্ঠ করে তোলার প্রয়োজনে যৌনজীবনবাস্তবতার উপস্থাপনার প্রবণতাকে কখনো রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে বিদেশী রচনার উগ্র-যৌনতার নকল করে সহজে পাঠককে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা বলে। তিনি বলেন, এদেশের হিন্দু জনসাধারণ 'মিথুনাসক্তি সম্বন্ধে .... এত বুভুক্ষু নয়', যে ওইসব নকল রচনার যৌন উগ্রতা কোনো আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ হবে। তাই তিনি মনে করেন উগ্র-যৌনতাপূর্ণ সাহিত্য রচনার দরকারই নেই। তাঁর মতে, 'নরোয়ে প্রভৃতি দেশের লোকের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির মধ্যে প্রকৃতির যে সহজ উত্তাপ আছে' এবং 'উত্তর য়ুরোপের দানবতুল্য দেহে মদের পিপাসা' যেমন সহজেই সহ্য হয়, ওই পটভূমিকা উগ্রযৌনতাপূর্ণ সাহিত্যচর্চাও তাঁদের মানিয়ে যায়, কিন্তু এ-দেশে তা একেবারেই বেমানান। তাই তিনি মনে করেন আমাদের সাহিত্যে ওই প্রসঙ্গ যদি আসে তবে 'আভাসে প্রকাশ' ঘটুক।[১০৫]

---

১০৪. উদ্ধৃত:, শঙ্খঘোষ, "নির্মাণ আর সৃষ্টি", পৃঃ ১১৭

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক সাহিত্যে উপস্থাপিত যৌনজীবন বাস্তবতা ও জীবনের কলুষময় দিক রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করে সবচেয়ে বেশি। বাস্তবতার কলুষময় অন্ধকার অংশকে প্রাধান্য দেয়ার কারনে তিনি "পরিচয়" পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৩৮) জগদীশগুপ্তের "লঘুগুরু" (১৩৩৮) উপন্যাসের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন। এ-উপন্যাসটিকেও সহজে পাঠক ভোলাবার সস্তা প্রয়াস বলে মনে হয় তাঁরকাছে। এ-উপন্যাসেও তিনি দেখেন 'আধুনিক রিয়ালিজমের সেন্টিমেন্টালিটি।'[১০৬] কেননা 'বেশ্যাবৃত্তিতে যে- মেয়ে অভ্যস্ত, সেও একটা যে-কোনো ঘরে ঢুকেই সদ্যগৃহিনীর জায়গা নিতে পারে'-এই শৌখিন কথাটিই ' সেনিটমেনেটর রসপ্রলেপে"। এ-উপন্যাসে বলার চেষ্টা হয়েছে।[১০৭] রবীন্দ্রনাথ এ-উপন্যাসে বর্ণিত জীবন ও লোকযাত্রার বাস্তবতা সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে, আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। .... এদেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির, অর্থাৎ কাটালুম, এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাতসমুদ্রপারের বিদেশ বললেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।'[১০৮] তাই তাঁর মতে "লঘুগুরু "উপন্যাসে 'নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের'উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায় না,[১০৯] এ-লেখায় লেখক শুধু 'রিয়ালিজমের পালা সস্তায়' জমিয়েছেন।[১১০] এবং 'রিয়ালিজমের নাম দিয়ে একালের সৌখীন আধুনিকতাকে খুসি করা'র চেষ্টাই করেছেন।[১১১] রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা জগদীশ গুপ্তকে ক্ষুব্ধ করে। "উদয়লেখা"গল্পগ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের সংশয় বিদ্রূপাত্মক জিজ্ঞাসা-অভিযোগের জবাব দেন। তিনি বলেন,[৫] " লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল" আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে "সুতাবসিদ্ধ ইতর"এবং " কোমর বাঁধা

১০৬· 'তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয়" অংশ', "জগদীশগুপ্ত রচনাবলী" (প্রথমখণ্ড) গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৫), ৬৩৯।

১০৭· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩৮।

১০৮· উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ ৬৩৭।

১০৯· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪০।

১১০· ঐ, পৃঃ ৬৩৯।

১১১· ঐ, পৃঃ ৬৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

শয়তান"নিশ্চয়ই আছে, এবং বোলপুরের টাউন প্লানিং-এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, "ওস্তাগর" আপনি চোখে পড়িয়াছে।'[১১২]

"লঘুগুরু"র সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের 'রিয়ালিজম'মনস্কতাকেও বিদ্রূপ ও আক্রমণ করেন। তাঁর মতে সেন্টিমেন্টাল লেখকদের মধ্যে যেমন তীব্র সাধুতাপ্রীতি লক্ষ্য করা যায় তেমনি আধুনিক লেখকদের মধ্যে অসাধুতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। তীব্র সাধুতাপ্রীতির মতো তীব্র অসাধুতাপ্রীতিও অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য। কিন্তু মোহগ্রস্ত আধুনিকেরা অসাধুতার উজ্জ্বল চিত্রনকেই রিয়ালিজম বলে মনে করে তৃপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'সাধুতাকে ভাবরসের বর্ণবাহুল্যে অতিমাত্রায় রাঙিয়ে তোলায় যতবড়ো অবাস্তবতা, লোকে যেটাকে অসাধু বলে, তাকে সেন্টিমেন্টের রসপ্রলেপে, ~~[illegible]~~ অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল করে তুললে অবাস্তবতা তার চেয়ে বেশি বই কম হয় না। অথচ শেষোক্তটাকে রিয়ালিজমের নাম দিয়ে একালের সৌখীন আধুনিকতাকে খুসি করা অত্যন্ত সহজ।'[১১৩] আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতাকে তিনি চিহ্নিত করেন 'পঙ্কের তিলক' কাটার প্রবণতা রূপে,[১১৪] এবং অনায়াসে সস্তা জনপ্রিয়তা পাবার মোহেই আধুনিকেরা পাঁকঘাটায় নিবিষ্ট বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেন, 'চন্দনের তিলক যখন চলতি ছিল, তখন অধিকাংশ লেখা চন্দনের তিলকধারী হয়ে সাহিত্যে মান পেতে চাইত। পঙ্কের তিলকই যদি সাহিত্য সমাজে চলতি হয়ে ওঠে, তা হলে পঙ্কের বাজারেও দেখতে দেখতে চড়ে যায়।'[১১৫] যৌনজীবন চিত্রনের প্রবণতাকে গ্রন্থবিক্রীর করার নতুনতর কায়দা বলে মনে হয় তাঁর কাছে, তিনি এ-প্রবণতাকে 'রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে ব্যবসা চালানো' বলে নির্দেশ করেন।[১১৬] কারণ তাঁর মতে, 'মানুষের এমনসব প্রবৃত্তি আছে, যার উত্তেজনার জন্য গুণপনার দরকার করে না। অত্যন্ত সহজ বলেই মানুষ সেগুলোকে নানাশিক্ষায়, অভ্যাসে, লজ্জায়, সঙ্কোচে সরিয়ে রেখে দিতে চায়, নইলে বিনা-চাষেই যে-সব আগাছা ক্ষেত ছেয়ে ফেলতে পারে, তাদের মতোই এরা

---

১১২. উদ্ধৃত, ওই, পৃঃ ৬৪১।

১১৩. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩৮।

১১৪. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, ৬৩৯।

১১৫. উদ্ধৃত, ওই, ওই।

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪০।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের দুর্মূল্য ফসলকে চেপে দিয়ে জীবনকে জর্জর করে তোলে। এই অভিজ্ঞতা মানুষের বহুযুগের।······ আমার বলবার কথা এই যে, যে সকল তাড়িখানায় সাহিত্যকে শস্তা করে তোলে, রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে তার ব্যবসা চালানোয় কল্পনার দুর্বলতা ঘটবে।'[১১৭] রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের এই প্রবণতাকে 'শস্তামাদকতা' বলেও অভিহিত করেন; তিনি বলেন যে 'এরকম শস্তামাদকতা সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও এবং তাৎক্ষণিক ভাবে প্রচুর বাহবা পাওয়া গেলেও, তা কখনোই চিরস্থায়ী হবার মর্যাদা লাভ করে নি।[১১৮]

রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতেও (১৩৩৪) আধুনিক লেখকদের বাস্তবতা-মনস্কতা তথা প্রবৃত্তিগত জীবনচিত্রণ প্রবণতাকে শস্তা ও সহজে চোখ ভোলাবার কায়দা বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'গেল শনিবারে এবং কাল মঙ্গলবারে বিচিত্রায় বাদীপ্রতিবাদী দুদলই উপস্থিত ছিলেন। আমার যা বলবার ছিল আমি দুপক্ষকেই স্পষ্ট করে বলেছি। নবীন সাহিত্যিকদের মঙ্গলবারের কোঠায় ফেলা যেতে পারে- তারা ঐ গ্রহটার মতোই অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে-ভারতীর আসন যে শ্বেতবর্ণের-যারমধ্যে সকল রঙ মিশে আছে, সেটার প্রতি ওদের বড়ো অবজ্ঞা-সব বাদ দিয়ে একেবারে টকটকে রঙের পরেই ওদের বিলাস। তারকারণ ওটা শস্তা আর সহজেই চোখ ভোলায়।'[১১৯] ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা আরেকটি চিঠিতে (বৈশাখ ১৩৪১) তিনি লেখেন আধুনিক লেখকদের গরজ হলো মানুষকে কেবল এইই দেখিয়ে দেয়া যে 'নোংরা তোমার মগজ, তোমার হৃৎপিন্ড, তোমার পাকযন্ত্র, তোমার চেহারাটা উপরের খোলসমাত্র, সেই চেহারার বড়াই কোরোনা।'[১২০] তিনি বলেন আধুনিক লেখকেরা গল্প শোনাতে চাননা, পাঠকের সামনে তুলে ধরেন 'মনস্তত্ত্বের তথ্যতালিকা,' তাঁরা সৃষ্টি করছেন একধরণের 'ছেলে ভোলানো সাহিত্য' এবং মাছ ফেলে দিয়ে 'শুধুমাত্র কাঁটার চচ্চড়ি রাঁধাকেই' তাঁরা 'ওস্তাদি' বলে ঘোষণা করে চলেছেন।[১২১] সাহিত্যে শুধুমাত্র বাস্তবতার উপস্থাপনাকে তিনি অভিহিত করেন 'অদ্ভুত ও অসত্য' বলে,।[১২২] এবং বলেন, 'মানুষ দুর্বৃত্ত হতে পারে স্বভাবতই, কিন্তু মানুষ রিয়ালিস্ট হবার জন্য কোমর বাঁধলে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই। অর্থাৎ সেও হয় *unreal* ,········

---

১১৭. পূর্বোক্ত, ৬৩৯ - ৬৪০।

১১৮. ঐ, পৃঃ ৬৪০।

১১৯. 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি ধূর্জটিপ্রসাদকে', "দেশ" সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮০।

১২০. 'রিয়ালিস্ট' (ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠি) "পরিচয়" ৩য়বর্ষঃ ৪র্থসংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪১; পৃঃ ৪৭৬।

১২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭৬।

১২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

তারা নিজেও ভুলতে পারে না তারা রিয়ালিস্ট, অন্যকেও ভুলতে দিতে চায় না, – তারা রিয়ালিজমের পুতুলবাজি করে ।'[১২৩] "রিয়ালিস্ট"নামক গ্রন্থে ধূর্জটিপ্রসাদ আধুনিক সাহিত্যের রিয়ালিজমকে বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ধূর্জটিপ্রসাদের গ্রন্থটি'পড়তে পড়তে মনে হয়েছে "বাঁশরি" নামক আমার নূতন লিখিত নাটকের ভিতরে ভিতরেও অবাস্তব রিয়ালিজমের প্রতি এই রকমেরই একটা হাসির আমেজ আছে।'[১২৪] শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শুধুমাত্র আধুনিক সাহিত্যিকদের বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হবার প্রবণতার প্রতিই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের প্রতিই প্রবল বিরাগ বোধ করেছেন । আধুনিক সাহিত্য তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে ' যা কিছু বিকলাঙ্গ বিকৃত, যা কিছু প্রকৃতির আবর্জনা'তার সমাবেশরূপে;[১২৫] তাঁর মতে এ-সাহিত্যে মানুষের সুন্দরের তৃষ্ণা উপেক্ষিত হয়, বিকৃতি ও কুৎসিতকেই সত্য বলে ঘোষণা করে এ-সাহিত্য । আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা"(১৩৪৬)গ্রন্থ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠিতে (২০-৮-৪০ই) রবীন্দ্রনাথ এমন মন্তব্য করেন । ধূর্জটি প্রসাদকে লেখা চিঠিতে (২১ভাদ্র ১৩৩৮) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকে নির্দেশ করেন'যৌনবৃত্তির বিকারজনিত অসংযত প্রলাপ'রূপে ।[১২৬] 'আধুনিক কাব্য'প্রবন্ধে (বৈশাখ১৩৩৯)আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকে 'পচাঁমাংসের বিলাস'বলে অভিহিত করেন ।[১২৭] তিনি বলেন, 'এযুগ বাস্তবকে অপমানিত করে সমস্ত ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় বলে মনে করে ।'[১২৮] অমিয়-চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে (চৈত্র ১৩৪৫)ওই পশ্চিমী সাহিত্যের অস্থিরতা, যৌনতার চিত্রণ এ-দেশের জন্য জরুরী নয় বলেই ঘোষণা করেন ।[১২৯]

রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রেই আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে আক্রমণ করেননি, তাঁর গল্প উপন্যাস নাটক ইত্যাদিতেও বিদ্রূপবর্ষী আক্রমণ অব্যাহত ছিলো । "সে"(বৈশাখ, ১৩৩৪) থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পনের বছরের গল্পে নাটকে উপন্যাসে কবিতায় তৈরি করেছেন কোনো-না-কোনো চরিত্র এবং কোনো না কোনো সুযোগ, যার সাহায্যে আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে আঘাত করেছেন । আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামুখিতার ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'অবসেশন'হয়ে পড়ে । এ-সব রচনায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের প্রতি তীব্র তাচ্ছিল্য ও আধুনিক লেখ-

---

১২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭৬-৪৭৭ ।
১২৪. ওই , পৃঃ ৪৭৭ ।
১২৫. 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি বুদ্ধদেববসুকে' "দেশ," সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮১ ।
১২৬. 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি ধূর্জটিপ্রসাদকে', "দেশ"সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮০ ।
১২৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯ ।
১২৯. 'পত্রালাপ', "প্রবাসী"চৈত্র ১৩৪৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

কদের বাস্তবতাবাদিতার প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, একইসঙ্গে ব্যক্ত করেন বাস্তবতা সম্পর্কে ভাববাদী-বিশ্বাস। তিনি মনে করেন কলুষকুশ্রীতা-পূর্ণ স্থূলবাস্তব সত্য হলেও তা অবিকল সাহিত্যে বিধৃত হতে পারে না, কবির লক্ষ্য সৌন্দর্য ও আনন্দময় জগৎ সৃষ্টি। "সে" গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নতুন যুগের স্থূলসাহিত্যের প্রতি বিরূপ মনুষ্য এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দময় পুরোনো কাব্যধারার জন্য খেদ। "সে" গ্রন্থের আগে "ঘরেবাইরে" (১৩২৩) উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের স্থূলতা ও বাস্তবতামুখিতাকে বিদ্রূপ-উপহাস করেন। এ-উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সন্দীপের জবানীতে তিনি আধুনিকতা ও বাস্তবতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। ওই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বাস্তবতা ও আধুনিকতাকে সুন্দর ও শ্রদ্ধেয় বলে মনে হয় না, বরং অসুন্দর স্থূল ও অশ্রদ্ধেয় বলে মনে হয়। সন্দীপের ব্যাখ্যায় বাস্তবতা হচ্ছে প্রবৃত্তির উচ্চকণ্ঠ নির্লজ্জ জয়গান, স্থূল ও অসুন্দর। আর আধুনিক যুগ হচ্ছে এই প্রবৃত্তির আরাধনার যুগ। সুন্দরকে ধ্বংস করে অসুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করাই এ যুগের প্রবণতা। সন্দীপ নিজেকে 'বস্তুতন্ত্রী' আখ্যা দেয় এবং নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলে, 'আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতে ছাড়বনা-মাঝখানে যা কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটোবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডব নৃত্য।'[১৩০] সন্দীপের উচ্চকণ্ঠ আস্ফালনে বাস্তবতার যে-চারিত্র্য নির্দেশিত হয় তাতে দেখা যায় প্রবৃত্তির উদ্দাম স্তব ও চর্চাই বাস্তবতা। এ-বাস্তবতার জগতে সুন্দর ও মহৎ স্বপ্নকে আঘাত ও প্রত্যাখ্যান করা হয়, স্থূলতাই একমাত্র সত্যরূপে গৃহীত হয় এখানে।

রবীন্দ্রনাথ স্থূল বাস্তবতার আস্ফালন সন্দীপের জবানীতে বিধৃত করেন এ-ভাবে: "...... আমি স্থূল, কেন না আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি আমি ক্ষুধা নির্লজ্জ নির্দয়, যেমন নির্লজ্জ নির্দয় সেই প্রচণ্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে—

---

১৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ঘরে বাইরে" (রবীন্দ্ররচনাবলী অষ্টমখণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৪৮) রচনাবলী পৃঃ ১৮৫ - ১৮৬,

Dhaka University Institutional Repository

তারপরে যে বাঁচুক আর যে মরুক'।[১৩১] সন্দীপের এই আস্ফালনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন আধুনিক সাহিত্য ও বাস্তবতার স্থূলতা, অসুন্দর নির্লজ্জতা। এবং এ-সবের মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়ে যায় আধুনিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা। তিনি নানাভাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন আধুনিক সাহিত্য অনুঃসারশূণ্য। আধুনিককালরূপে চিহ্নিত সময়ও স্থূল বাস্তবতা নিয়ে মত্ততার সময়, এ-সময়ে সনাতন মহৎ বিশ্বাস ও আদর্শ উপেক্ষিত-ও লাঞ্ছিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাবাদী সন্দীপকে দিয়ে আধুনিকতার যে-ব্যাখ্যা করিয়েছেন তাতে তাঁর ওই প্রবণতাই পরিস্ফুট। সন্দীপ আধুনিকতার ব্যাখ্যা করে এভাবে:'প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডারণ্। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা 'মডারন্ নয়।'[১৩২] "শেষের কবিতা"(১৩৩৬)উপন্যাসেও আধুনিক প্রবণতাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা হয়। অমিত রায় নতুন কালের নতুন সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছে, তাতে ওই সাহিত্যের স্থূলতা ও অনুঃসারশূণ্যতাই প্রকটিত হয়ে উঠেছে। অমিতরায় নতুন কালের জন্য চায় 'কড়ার্থলাইনের, খাড়া লাইনের রচনাতীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়; বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুরালজিয়ার ব্যথার মতো- খোঁচাওয়ালা, কোনওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন-কি যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট -বিলডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই। .... এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল।'[১৩৩]

আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতা সম্পর্কে বিরূপতা ও অবজ্ঞা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে "বাঁশরি"(১৩৪০)নাটকে। এ-নাটকে আধুনিক লেখকদের প্রতিনিধিত্ব করে ক্ষিতীশ। আর বাঁশরি প্রতিনিধিত্ব

১৩১• পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৫।

১৩২• পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৪।

১৩৩• রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শেষের কবিতা" (বিশ্বভারতী কলকাতা প্রথ-ভাদ্র ১৩৩৬ পুনর্মুদ্রন, বৈশাখ ১৩৭৪), ২০।

Dhaka University Institutional Repository

করে রক্ষণশীল ভাববাদী রবীন্দ্রনাথের। ক্ষিতীশকে এ-নাটকে আনাই হয়েছে উপহাস কুড়োবার জন্য, তাকে তুচ্ছ, নির্বোধ ও উপহাসাস্পদ রূপে দেখানোই ছিলো রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। নাটকের প্রধান চরিত্র বাঁশরি তাকে সর্বক্ষণ কারনে অকারণে বিদ্রূপ উপহাস করেছে, নাটকের অন্যান্য গৌণচরিত্রেরাও তাকে অবাধে উপহাস-ব্যঙ্গ করে চলে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, গ্রন্থসমালোচনায় আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেসব মন্তব্য করেন, বাস্তবতাকে যেসব বিদ্রূপউপহাস করেন, এ-নাটকের পাত্রপাত্রীরা তারই পুনরাবৃত্তি করেছে মাত্র। বাঁশরি আধুনিক লেখক ক্ষিতীশকে বলে, 'লেখবার শক্তি আছে তোমার কিন্তু নেই সত্যের পরিচয়'। বাঁশরি ও অন্যান্যের কাছে আধুনিক লেখকদের রচনা প্রতীয়মান হয়েছে 'সেন্টিমেন্টালিটির তরলরস', 'সস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ,' 'গেঁজিয়ে ওঠা রসের ফেনা,' 'রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে,' খেলো আধুনিকতা,' 'যাত্রাদলের কাঠের ছুরি রাংতা মাখানো', 'পিটুলিগোলাজল' রূপে। আধুনিক লেখকদের নতুন চেতনা ও প্রবণতাকে তাদের কখনো মনে হয় 'ভূতের পায়ের মতো উল্টো দিকে চোখ,' কখনো মনে হয় 'সস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ' বলে। আধুনিক লেখকদের লক্ষ্য করে উপহাস-বিদ্রূপাত্মক এ-সব মন্তব্যকে, জগদীশগুপ্তের "লঘুগুরু" উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য-পরিহাস-বিদ্রূপের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। এ-নাটকে পাওয়া যায় বাস্তবতা ও আধুনিক লেখকের বাস্তবতামনস্কতাকে বিদ্রূপ করে লেখা এমন সংলাপ :

ক. 'ঐ কালির দাগেই তোমার অসাধারণতা তুমি রিয়ালিস্ট, নির্মলতা তোমাকে মানায় না। তুমি মসীধ্বজ।'[১৩৪]

---

১৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বাঁশরি," প্রথমঅঙ্ক : প্রথমদৃশ্য, রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্বিংশখণ্ড বিশ্বভারতী, প্র., পৌষ ১৩৫৪, পুনর্মুদ্রন ১৩৮৪) পৃ: ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

খ. 'রঙের যোগ না থাকলে এমন অদ্ভুত সৃষ্টি বানানো যায় না। ঐ- যে, যে জায়গাটাতে মিস্টার কিষেণ গাপ্টা বি,এ ক্যান্টার, মিস্ লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আঙটি ফেলে দিয়ে খানা-তাল্লাসির দাবি করে হো হো বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে, ম্যাচলেস - বঙ্গসাহিত্যে এ-জায়গাটার দেশলাই মেলে না, একটু পোড়াকাঠিও না। আপনার লেখা ভয়ানক রিয়ালিস্টিক ক্ষিতীশ-বাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।'[১৩৫]

গ. '..........মোস্ট ইন্টারেস্টিং আপনার বইখানা। এমনসব মানুষ কোথাও দেখা যায় না। ঐ যে মেয়েটা কী-তার নাম- কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে, মাইআইজ, ও গড। লাজুক ছেলে স্যান্ডেলের সংকোচ ভাঙবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেললে খাদে, মতলব ছিল স্যান্ডেলকে দুই হাতে তুলে পতিতোদ্ধার করবে। হবি তো হ স্যান্ডেলের হাতে হল কম্পাউণ্ড ফ্রাকচার। কী ড্রামাটিক, রিয়ালিজমের চূড়ান্ত। ভালোবাসার এতবড়ো আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিলনা।[১৩৬]

আধুনিক 'রিয়ালিস্ট' লেখক সম্পর্কে পাওয়া যায় এমন উপহাস বিদ্রুপাত্মক সংলাপ:

ক. 'যা চোখে দেখা যায় তা উনি দেখেন না। ভূতের পায়ের মতো ওর চোখ উলটো দিকে।[১৩৭]

খ. 'বাংলা উপন্যাসে নিয়ুমার্কেটের রাস্তা খুলেছ নিজের জোরে আলকাতরা ঢেলে।'[১৩৮]

গ. ক্ষিতীশবাবু ন্যাচারল হিস্ট্রী লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রঙ লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে।[১৩৯]

---

১৩৫. "বাঁশরি" প্রথমঅঙ্ক: দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃঃ ১৫৭।
১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৭।
১৩৭. ওই, প্রথমঅঙ্ক: দ্বিতীয়দৃশ্য, পৃঃ ১৫৯।
১৩৮. ওই ওই, পৃঃ ১৬১।
১৩৯. ও ওই, পৃঃ ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ওর লেখবার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো, কিন্তু যতই চেষ্টা করা গেল ভিতরে পোকা হতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে।[১৪০]

আধুনিক লেখকদের বাস্তবতার সকলসুর উপস্থাপনার প্রবণতা যেমন রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে, ক্ষিতীশের লেখায় উপস্থাপিত 'রিয়ালিজম'ও বাঁশরিকে পীড়িত করেছে। "সস্তায় পাঠক ভোলাবার লেভেল"ই।[১৪১] ক্ষিতীশ 'চিটেগুড় মাখিয়ে কথাগুলোকে চটচটে করে-[১৪২] তুলেছে বলে মনে করে বাঁশরি। তারমতে ক্ষিতীশ- 'খেলো আধুনিকতার'র ঃ[১৪৩] ধারক এবং ক্ষিতীশের লেখা ' বানিয়ে তোলা লেখা ······ , বইপড়ে লেখা।'[১৪৪] ক্ষিতীশের রিয়ালিজমকে সে যথার্থ রিয়ালিজম বলে গণ্য করে না। গণ্য করে অসম্পূর্ণ, স্থূল, নোঙরামি বলে। ক্ষিতীশের বাস্তবতামনস্কতা বাঁশরির কাছে শুধুমাত্র উপহাসের সামগ্রী। সে মনেকরে ওই সব খেলো নোঙরামিপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির ঝোঁক ত্যাগ করে প্রতিভাবান তরুণদের সৃষ্টি করতে হবে সৌন্দর্য ও আনন্দগাথা। বাঁশরির মতে শুধু বেদনা, বিফলতা ও মহৎ ভাবাদর্শপূর্ণ রচনাতেই প্রকৃত রিয়ালিজম পাওয়া যায়। বাঁশরির রিয়ালিজিমের রূপ এমন ঃ ' প্রকৃতিসেই বিদ্রুপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানব প্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম , নোঙরামিকে নয়।'[১৪৫] এভাবে "বাঁশরি"নাটকের পাত্রপাত্রীদের সংলাপে রবীন্দ্রনাথ ঢুকিয়ে দেন আধুনিক লেখকদের বাস্তবতা-

---

১৪০. ওই , তৃতীয়অঙ্ক ঃ শেষ দৃশ্য , পৃঃ ১৮৯-১৯০।

১৪১. ওই , প্রথমঅঙ্ক ঃ প্রথম দৃশ্য , পৃঃ ১৪৭।

১৪২. ওই ওই , পৃঃ ১৫০।

১৪৩. ওই ওই , পৃঃ ১৪৭।

১৪৪. ওই ওই , পৃ ১৫০।

১৪৫. ওই , দ্বিতীয়অঙ্ক ঃ প্রথমদৃশ্য, পৃঃ ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

মনস্কতার বিরুদ্ধে ও আধুনিক লেখকদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ -উপহাস ও অভিযোগ-উপদেশ। এ-নাটকের পাত্রপাত্রীদের আধুনিক লেখক ও আধুনিক সাহিত্যের রিয়ালিজম নিয়ে প্রবল ও অশোভন ব্যঙ্গ তাচ্ছিল্য পরিহাসকেই রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠিতে অভিহিত করেন 'অবাস্তব রিয়ালিজমের প্রতি হাসির আমেজ' বলে।[১৪৬]

"শ্রাবণগাথা"(১৩৪১)নামক কাব্যনাট্যেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখক ও তাঁর প্রবণতা নিয়ে বিদ্রূপ উপহাস করেন। ক্ষিতীশের মতো এ-কাব্যনাট্যে আধুনিক সভাকবিকেও আনা হয় বিদ্রূপ উপহাস কুড়োবার জন্য। "শ্রাবণ-গাথা"র রাজা সভাকবিকে উপহাস করে বলে: 'আমাদের সভাকবি দুঃগ্রহ আধুনিক। হাড়িভাঙা পায়েসের রস যাঁকে গড়ালে উনি সেটাকে নিয়ে চৌরপঞ্চাশতক রচনা করতে পারেন, কিন্তু তৃপ্তি পান না সেইরসে যার সঙ্গে না আছে জঠরের যোগ, না আছে ভাণ্ডারের।'[১৪৭] কখনো রাজা সভাকবিকে 'তোমাদের নিমন্ত্রণে আছে আমিষের প্রাচুর্য' বলে কটাক্ষও করেন।[১৪৮] নিজের গোত্রকে স্থূলতা ও অসুন্দরের উপাসক বলে স্বীকার করে নিয়েছে সভাকবিও। তার স্বীকারোক্তি এমন: 'আমরা আধুনিক, আমরা আমিষ লোলুপ।'[১৪৯] কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের বাস্তবতাবাদী প্রবণতাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন। "পরিশেষ"(১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের 'নূতন শ্রোতা-২' কবিতায় আধুনিকদের তীব্র বিদ্রূপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ;

গোপনে তার মুখের পানে চাহি
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।

---

১৪৬. 'রিয়ালিস্ট' (রবীন্দ্রনাথের চিঠি ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭৭।

১৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শ্রাবণ-গাথা", (রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চবিংশ খণ্ড, প্রথ-বৈশাখ ১৩৫৫), ১১১,

১৪৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩।

১৪৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন কালের শাণ দেওয়া তার ললাটখানি খরখড়গসম,
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার-প্রতি নির্মম।
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি
সংসারেতে গর্তগুহা যেখানে যা সবখানে দেয় উঁকি,
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি।
তীব্র তাহার হাস্য
বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষ্য।[১৫০]

৪.৪ শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাবোধ ও রক্ষণশীলদের সঙ্গে নৈতিকতা বিতর্ক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) বাস্তবতাধারণা ও সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক মতামতে স্ববিরোধ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্র, প্রবন্ধে বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন এবং প্রায়শই তাঁর এক মন্তব্যের সঙ্গে আরেক মন্তব্যের বেশ বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র জড়িয়ে পড়েন সাহিত্যের নৈতিকতা- অনৈতিকতা বিষয়ক বিতর্কে। সাহিত্যের নৈতিকতা বিষয়ক প্রশ্ন ও মীমাংসাপূর্ণ নানা প্রবন্ধ, চিঠিপত্রে শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাধারণা প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র এক পর্যায়ে (১৯১৩) বলেন সাহিত্যে নিরপেক্ষ সত্য বা বাস্তবতা উপস্থাপিত হবে। লেখক হিসেবে তার লক্ষ্যও নিরপেক্ষ সত্য বা বাস্তবতার উপস্থাপনা বলে তিনি ঘোষণা করেন। বাস্তবতার শোভনসুন্দর অংশের উপস্থাপনার পাশাপাশি বাস্তবতার

---

১৫০. রবীন্দ্রনাথঠাকুর, 'নূতন শ্রোতা-২', "পরিশেষ" (রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চবিংশ খণ্ড ৩ই) পৃঃ ১৯০ - ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষত, কদর্যতা ও অন্ধকার অংশের নিরাবরণ উপস্থাপনার-র মধ্যদিয়েই তিনি নিরপেক্ষ সমাজচিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতে চেয়েছেন পরবর্তী পর্যায়ে (১৩৩১) লক্ষ্য করা যায় তাঁর বাস্তবতা ধারণার ব্যাপক বদল ঘটেছে। জীবন ও সমাজবাস্তবতার সকল এলাকা সাহিত্যের বিষয়উপাদান রূপে গৃহীত হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন তিতিনি, বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাও সাহিত্যসৃষ্টি বলে গণ্য হয় নি তাঁর কাছে। কোনো লেখক কিংবা সাহিত্যকর্মকে বাস্তবতাবাদী অভিধায় চিহ্নিত করার প্রবণতাটিও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি তিনি।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত চিঠিতে(১৭এপ্রিল ১৯১৩) শরৎচন্দ্র বলেন, 'নিরপেক্ষ সত্য-এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এরমধ্যে খাতির চাই না'।[১৫১] নিরপেক্ষ সত্য উদ্ঘাটনে লেখকের ভূমিকা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে-বিশ্বাস পোষণ করেন তার সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রকৃতবাদী লেখকদের মিল রয়েছে। শরৎচন্দ্র মনে করেন লেখক হচ্ছেন সমাজদেহের চিকিৎসক। সমাজদেহের আরোগ্যের জন্যই গোপন ক্ষতকে ব্যান্ডেজ বেঁধে লুকিয়ে না রেখে, ক্ষত উন্মোচন করেন তিনি এবং সারিয়ে তোলেন। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা আরেকটি চিঠিতে(২২মে ১৯১৩) তিনি বলেন:

> 'অঙ্গবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাইতে নাই জানি না। .... সমাজের যদি কেহ ডাক্তার থাকে, যার কাজ ক্ষত চিকিৎসা করা, সে কে শুনি? যাহা পঁচিয়া উঠে তাহাকে তুলা বাঁধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত যে-লোকটার গায়ে তার পক্ষে বড় সুবিধা হয় না। শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস। লেখকের আরো একটা গভীর কায আছে। সে কাযটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়- তাই করিতে হইবে। Austin, Mary Corelli

১৫১. শ্রীগোপালচন্দ্ররায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), "শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৫৪) পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি এবং Sarah Grand সমাজের অনেক ক্ষত উদঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়।'[১৫২]

শরৎচন্দ্র এ-সময় (১৯১৩-১৯১৪) সাহিত্যে সমাজবাস্তবতার সকল দিকের নিরাবরণ ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনার পক্ষপাতী। তবে তাঁর বাস্তবতা উপস্থাপনার এই প্রবণতার পেছনে ছিলো উদ্দেশ্যবাদিতা। তিনি ক্লেদ ও ক্ষতের উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ সমাজদেহ ব্যাধিমুক্ত করার জন্যই চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতে চেয়েছেন তিনি।

একদশক পরে প্রকাশিত 'সাহিত্য ও নীতি'(১৩৩১)প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেন সংসার ও সমাজবাস্তবতার সকল অংশ বা সবকিছুই সাহিত্যে উপস্থাপিত হতে পারে না। কারণ সংসার ও সমাজে অনেক 'নোঙরা' ব্যাপারও ঘটে, ওই 'নোঙরা'ব্যাপারগুলো সাহিত্যের উপজীব্য হলে সাহিত্যের মহিমা ক্ষুন্ন হওয়ার শঙ্কা বোধ করেন তিনি। বাস্তবতার অনুপুঙ্খ অবিকল চিত্রন পদ্ধতিও অসাহিত্যিক কর্মরূপে গণ্য করেন শরৎচন্দ্র। তিনি বলেন, 'সংসারে যা কিছু ঘটে এবং অনেক নোঙরা জিনিসই ঘটে-তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে- কিন্তু সে কি সাহিত্য হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য?[১৫৩] তিনি সাহিত্যে উপস্থাপিত 'সত্য' বা বাস্তবতা এবং 'সত্যসাহিত্যে'র পার্থক্য নির্দেশের কূটতর্কেও লিপ্ত হন। তাঁর মতে বাস্তবতার উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কোনো সাহিত্যে শুধু সত্য বা বাস্তবতার বর্ণনা দেয়া হয় মাত্র, কিন্তু 'সত্যসাহিত্য' রচিত হয় না। তিনি বলেন, 'ভালমন্দ সংসারে চিরদিনই আছে, ভালকে ভাল মন্দকে মন্দ বলায় কোন artই কোনদিন আপত্তি করে না, কিন্তু দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে, নির্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্যসাহিত্য হয় না। অর্থাৎ যা কিছু ঘটে তাঁর নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্যবস্তু বলিনে,

---

১৫২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭-২৮।

১৫৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য ও নীতি' "শরৎসাহিত্য সম্ভার" -(অষ্টম সম্ভার) (এম,সি সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ?), পৃঃ ৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি যা-ঘটে না, অথচ সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বিড়ম্বনা ঘটে।'[১৫৪] সংসারে সকল সত্য বা বাস্তবতা সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না বলে বিশ্বাস করলেও, শরৎচন্দ্র মনে করেন বাস্তবউপাদান হবে সাহিত্যসৃষ্টির প্রাথমিক ভিত্তি। সংসারের সকল সত্য যেমন সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না তেমনি শুধু বাস্তবউপাদান নির্ভর চরিত্র সৃষ্টিও সম্ভবনয় বলে তিনি মনে করেন। বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রনে তিনি চরিত্র সৃষ্টির পক্ষপাতী। তাঁর ব্যাখ্যা এমন : 'সংসারে অদ্ভুত কিছু একটা জানাই সাহিত্যিকের বড় উপকরণ নয়। আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তবঅভিজ্ঞতাকেআমি উপেক্ষা করচি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রনে কতব্যথা কত সহানুভূতি, কত খানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।'[১৫৫] অন্যদিকে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'(১৩৩৪) প্রবন্ধে তিনি বলেন যে অবাধ কল্পনা স্রোতে ভেসে চলা কাব্যের জন্য সম্মানসই হলেও, কথাসাহিত্যে অবাধকল্পনার কোনো সুযোগ নেই। কথাসাহিত্যের জগতে স্রষ্টাকে বাস্তবউপাদান নির্ভর করেই তার জগতটি সৃষ্টি করতে হয়। নতুবা স্রষ্টার চরিত্র ও জগৎটি গণ্য হবে অবাস্তব কল্পনা রূপে। এ-কারণেই লেখককে দেখাতে হয় চরিত্রদের উদ্ভবের বাস্তবপ্রেক্ষাপট, উপস্থাপন করতে হয় তাদের বাস্তব জীবনাচরণ। তিনি বলেন, ' সজিনাফুলে, বকফুলে সোনারতরীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়।'[১৫৬] বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রনে তিনি চরিত্র সৃষ্টির পক্ষপাতী শরৎচন্দ্র। শুধুই বাস্তবতার অনুলিপি রচনা যেমন তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তেমনি শুধুই কল্পনামনস্ক থাকাও তাঁর লক্ষ্য নয়। তিনি এমনকী- সাহিত্যসৃষ্টিতে 'ভাববাদী' ও 'বাস্তবতাবাদী'- এ-দুটি ভিন্ন ধারায় বিভক্ত করারও

---

১৫৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৮ - ৩৫৯।

১৫৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৭।

১৫৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি', " ঐ, পৃঃ ৩৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষপাতী নন । তাঁর মতে বিশুদ্ধ ভাববাদী বা বিশুদ্ধ বাস্তবতাবাদী বলে কোনো সাহিত্য নেই, সাহিত্য হচ্ছে এ-দুয়ের মিশ্রণ । তাঁকে 'রিয়ালিস্টিক' লেখকরূপে অভিহিত করার ব্যাপারটিও তাঁকে তৃপ্তি দেয় নি । শুধুই 'রিয়া-লিস্টিক' লেখকরূপে চিহ্নিত হতেও তিনি অস্বস্তিবোধ করেছেন । তিনি মনে করেন একজন লেখক একইসঙ্গে হতে পারেন ভাববাদী ও বাস্তবতাবাদী । তাঁর রচনায় ওই দুই প্রকারেরই মিশ্রণ ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেন । তিনি বলেন, 'গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি নাকি ওই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক । এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশি । অথচ, কি করে যে ওই দুটোকে ভাগ করে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত । Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয় ।'[১৫৭] সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' (১৩৩৬) প্রবন্ধেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেন : 'ইংরাজীতে idealistic ও realistic বলে দুটো বাক্য আছে । সম্প্রতি কেউকেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হয়ে চলেচে । একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না, অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না।'[১৫৮]

শরৎচন্দ্র সমাজবাস্তবতার সহজ, সাধারণ অংশের উপস্থাপনার পক্ষপাতী । বাস্তবতার ক্লেদ ও রূঢ়তা, ও ব্যক্তির যৌনজীবন বাস্তবতার উপস্থাপনার বিরোধী তিনি । তবে সাহিত্যে সাধারণ দুঃখসুখময় প্রাত্যহিক বাস্তবতার উপস্থাপনাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন ।'সাহিত্য ও নীতি' (১৩৩১) প্রবন্ধে যদিও তিনি অনুপুঙ্খ উপস্থাপনরীতিকে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেন, তবে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'(১৩৩৪)প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ রীতি সাহিত্যের জন্য দরকারি বলে ঘোষণা করেন । তবে তিনি এই রীতিতে সাধারণ দৈনন্দিন বাস্তবতার উপস্থাপনাই অনুমোদন করেন, সাহিত্যে ক্লেদাক্ত বাস্তবতা বা যৌনজীবন-বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রতি তাঁর অনীহা নানা প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন শরৎচন্দ্র । তিনি বলেন, 'বিজ্ঞানবলিতে

---

১৫৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য ও নীতি' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৬

১৫৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি', ওই, পৃঃ ৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

যদি শুধু *sex psychology* , *anatomy* অথবা *gynaecology* বুঝাইত, তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম । .... পৃথিবী সূর্য্যের চারিপাশে ঘোরে, ইহা যত বড় কথাই হউক, সাহিত্যের মন্দিরে ইহার প্রয়োজন গৌণ, কিন্তু যে সুবিন্যস্ত, সংযত চিন্তা-ধারার ফল এই জিনিসটি, সে চিন্তা নহিলে কাব্যের চলে চলুক, উপন্যাসের চলে না । বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়,কার্য্যকারণের সত্যকার সম্বন্ধ বিচার । চার এবং চারে আট হয়, এবং আট হইতে চার বাদ দিলে চার থাকে ইহাই বিজ্ঞান। এ মনোভাবকে কিসের ভয় ? কিন্তু তাই বলিয়া নোঙরামি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয় একথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি । বিজ্ঞান হইলেও নয় অবিজ্ঞান হইলেও নয়; সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয় । গল্পের ছলে ধাত্রীবিদ্যা শিখানকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচার-কেও আমি সাহিত্য বলি না ।'[১৫৯] অর্থাৎ যৌনজীবনের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা তাঁর কাছে অরুচিকর মনে হয়েছে । তাই বাস্তবঘনিষ্ঠ হবার প্রয়োজনেও সাহিত্যে ওই বাস্তবতার উপস্থাপনার অনুমোদন করেন না তিনি, কারন জীবনবাস্তবতার ওই অংশটিই তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয় 'নোঙরামি'রূপে । দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০)তিনি বলেন, '......... যারা নির্বিচারে স্ত্রীজাতির গ্লানি প্রচার করাকেই *realism* ভাবে তাদের *idealism* ত নেইই *realism*ও নেই ।'[১৬০] সাহিত্যের রীতি ও নীতি' (১৩৩৪) প্রবন্ধেও তিনি বলেন যে যৌনজীবনের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি অস্বস্তিবোধ করেন । এবং ওই ব্যাপারটি তিনি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করতেই পছন্দ করেন ।[১৬১] অর্থাৎ তিনি মগ্ন থাকতে চান দুঃখসুখময় সাদাসিদে সামাজিক জীবন বাস্তবতায় । শরৎচন্দ্র তাঁর পরবর্তী লেখকদের রচনায় সমাজের সাধারণ জনজীবনের এমন চিত্রন ঘটেছে বলে, ওই লেখকদের প্রশংসা করেন । তাঁর মতে এমন বিষয়উপাদান নির্ভর রচনাই আমাদের সাহিত্যকে ক্রমশ সমৃদ্ধ ও মহৎ সাহিত্যে পরিণত করবে । তিনি বলেন, '....... পূর্বের রাজা-রাজড়া, জমিদারদের দুঃখদৈন্য দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর আর মনে ভরে না । তা

---

১৫৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি', ওই, পৃঃ ৩৭৭ –৩৭৮

১৬০. শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৩৪২

১৬১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৩৮০ ?

Dhaka University Institutional Repository

নীচের সুরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের সুরে নেমে তাদের সুখদুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্যসাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।'[১৬২] তবে সমাজের নীচুসুরের জীবনচিত্রন বলতে তিনি কুসংস্কার অন্ধতা রূঢ়তাপূর্ণ সমাজজীবন ও ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনকেই বুঝিয়েছেন, প্রবৃত্তিগত জীবনকে নয়। শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায়ও অন্ত্যজ জীবন, পতিতা মদ্যপ পদস্খলিতের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন, তবে ওই জীবনবাস্তবতার সকল দিকের নগ্ন নিরাবরণ উপস্থাপনা তিনি করেননি। রসাতলের ওই মানুষদের হৃদয় বেদনা, নিগূঢ় মনস্তাপ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বিবরণ দিয়েছেন তিনি। তাঁর ভাষ্যানুসারে তিনি রচনা করেছেন 'মানবের সুগভীর বাসনা, নরনারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ'[১৬৩] এবং 'মানবের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই' পৌঁছে দেবার তাগিদ বোধ করেছেন।[১৬৪]

শরৎচন্দ্র অনৈতিক সাহিত্যসৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত হন। রক্ষণশীল নীতিবাদীরা অভিযোগ করেন যে শরৎচন্দ্র অনৈতিক ব্যাপারের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলছেন। এমনকি শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসের বিরুদ্ধে অনৈতিকতার অভিযোগ এনে অনেক পত্রিকা তা প্রকাশে অস্বীকৃত হয়। ফলে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের নৈতিকতা বিষয়ক বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়েন। বাংলাসাহিত্যের নৈতিকতা বিষয়ক বিতর্ক প্রায় নিয়মিত একটি ব্যাপার। এই নৈতিকতাবিতর্কের মূলে থাকে প্রধানত সাহিত্যে উপস্থাপিত সুনীতি দুর্নীতি, শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গ, তবে পরোক্ষে বাস্তবতা উপস্থাপনা প্রসঙ্গটিও এর সঙ্গে জড়িত। রক্ষণশীল নীতিবাদীরা বাস্তবতার সকল অংশের উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন। সমাজঅনুমোদিত শোভন শালীন ও

---

১৬২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য আর্ট ও দুর্নীতি', "শরৎসাহিত্যসংগ্রহ" (অষ্টম সম্ভার), ওই, পৃঃ ৩৬৬

১৬৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৩

১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৩-৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সাধুচিত্র উপস্থাপনার পক্ষপাতী তাঁরা। কারণ তাঁরা মনে করেন বাস্তবতার ঐরূপ লোকচিত্তকে পাপকলুষ ও লালসার পথ থেকে দূরে রাখবে, আকৃষ্ট করবে পুণ্যময় জীবন যাপনে। যে-সাহিত্যে পাপকলুষের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হয় ও সাধুচিত্রকে উজ্জ্বল বর্ণে তুলে ধরা হয় তা-ই নৈতিক সাহিত্য। আর অন্ধকার কলুষময় জীবন-বাস্তবতা যে-সাহিত্যের উপজীব্য তা-ই অনৈতিক সাহিত্য। নীতিবাদীরা চান বাস্তবতার শালীন ও সৎ অংশের চিত্রন অর্থাৎ খণ্ডিত বিশেষ বাস্তবতা। শরৎচন্দ্র সুনীতিদুর্নীতি প্রসঙ্গে চিঠিপত্র-প্রবন্ধ যে অভিমত জ্ঞাপন করেন তাতে সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক মতামতও ব্যক্ত হয়েছে। তবে নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনায়ও তাঁর বাস্তবতাবিষয়ক ধারণা একই রকম থাকেনি।

শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" উপন্যাসটিকে *immoral* আখ্যা দিয়ে "ভারতবর্ষ" পত্রিকা তা প্রকাশে অসম্মত হয়। এই নীতিবাগীশদের রক্ষণশীলতায় ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত চিঠিতে (১৭এপ্রিল ১৯১৩) বলেন, 'আমি একজন *Ethics* -এর *student*, সত্য *student*। *Ethics* বুঝি এবং কাহারো চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না।'[১৬৫] প্রমথনাথকে লেখা আরেক চিঠিতে তিনি বলেন, 'আমি উলঙ্গ বলিয়া *art* কে ঘৃণা করিতে পারিবনা।'[১৬৬] (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) অর্থাৎ তিনি আর্টে নিরপেক্ষ সত্য চিত্রনের পক্ষপাতী। লেখককে তিনি গণ্য করেন সমাজদেহের চিকিৎসকরূপে, শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি' করা তাঁর কাজ নয়, ক্ষত চিকিৎসার জন্য তিনি ক্ষত উন্মোচনের কাজটিও সম্পন্ন করেন।[১৬৭] প্রকৃতবাদী জোলাও লেখককে সেলা সমাজ চিকিৎসকরূপে গণ্য করেছেন। জোলার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য হচ্ছে জোলা বাস্তবতাকে দেখেছেন একটি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে এবং জোলা বাস্তবতার সকল অংশের নগ্ন নিরাবরণ উপস্থাপনা করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র কোনো তত্ত্বশাসিত নন, বাস্তবতার সকল অংশের, যেমন প্রবৃত্তিগত জীবন, নরনারীর সম্পর্কের নগ্ন নিরাবরণ উপস্থাপনার পক্ষপাতী তিনি নন। তিনি সমাজের নানা কুপ্রথা, কুসংস্কার, অমানবিকতা, ক্ষুদ্রতা নিষ্ঠুরতা নামক ক্ষতিগুলো উন্মোচনেই ছিলেন মনোযোগী।

---

১৬৫. শ্রীগোপালচন্দ্র রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত) "শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫

১৬৬. ঐ, পৃঃ ২৪-২৫

১৬৭. ঐ, পৃঃ ২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

"চরিত্রহীন"কে শরৎচন্দ্র গণ্য করেন একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসরূপে যা অপ্রথাগত ও গভীর নৈতিক রচনা। তিনি জানিয়েছেন এ-উপন্যাসে তিনি পালন করেছেন নির্মোহ চিকিৎসকের ভূমিকা, শোভনতার খাতিরে সমাজ-দেহের কুৎসিত ক্ষত তিনি ব্যান্ডেজে আবৃত করে রাখেননি, বরং সমাজদেহকে আরোগ্য করার জন্য ক্ষতস্থান অনাবৃত করেছেন।[১৬৮] অন্য একটি চিঠিতে ক্ষোভে প্রকাশ করেন এ-ভাবে: 'তাছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? "চরিত্রহীন"এর নাম। তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্নেই আভাস দিয়াছি-এটা সুনীতিসঞ্চারিনী সভার জন্যও নয়, স্কুল পাঠ্যও নয়। টলস্টয়ের 'রিসারেকশন' তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকিবে না। তাছাড়া ভাল বই, যাহা *art* হিসাবে *Psychology* হিসাবে বড় বই তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে।'[১৬৯] শরৎচন্দ্রের এ-মন্তব্য থেকে সাহিত্যে বাস্তবতা-উপস্থাপনা বিষয়ে তাঁর যে অভিমত পাওয়া যায় তা হচ্ছে বাস্তবতার অন্ধকার অংশের নিরাবরণ উপস্থাপনার মধ্যদিয়েই স্বাস্থ্য গ্রন্থ রচনা সম্ভব। লেখক প্রথাগত নীতিশাসিত নন, তিনি নিরপেক্ষ সমাজচিকিৎসক। তাই ক্ষত উন্মোচনের কঠিন কাজটি তিনি সম্পন্ন করে থাকেন। এ-দেশের পাঠকের রোমান্সি ও অবাস্তবতা ও ভাবালুতাপ্রীতিকে কটাক্ষ করে শরৎচন্দ্র বলেন যে এ-অঞ্চলের মানুষের স্বভাব হচ্ছে 'হরিণাম যৈ করুক, লজ্জার খাতিরেও ভাল বলতে হবে।'[১৭০] তিনি বলেন, '..কতকগুলো পাঠকে মনে করে, যেখানে সেখানে জপতপ আর সন্ন্যাসী আর হিন্দু ধর্ম্মের বড়বড় কথা না থাকিলে সে গল্প বা উপন্যাস কোন মতেই ভাল হইতে পারে না। আপনি লিখুন দেখি কোন বিধবার বিবাহ হইয়াছে- আপনার আর রক্ষা থাকিবে না- মারমার শব্দ করিয়া সব ছুটিয়া আসিবে।'[১৭১] তাই ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র এমনও স্থির করেন যে, 'আমি 'হরিণাম'গাইব। দেখি এতে কি হয়।'[১৭২]

---

১৬৮. ঐ, পৃঃ ২৭ - ২৮

১৬৯. ফনীন্দ্রপালকে লেখা চিঠি (১৪-৯-১৯১৩), পূর্বোক্ত, ১১৪

১৭০. প্রমথনাথকে লেখা চিঠি (১৩-৩-১৯১৪) পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩-৭৪

১৭১. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি (৭-১-১৯১৪), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৪

১৭২. প্রমথনাথকে লেখা (১৩-৩-১৯১৪), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

যে-সব রক্ষণশীল নীতিবাদী সমালোচক শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সিংহ উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রমোহন সিংহ এবং অন্যান্যেরা অভিযোগ করেন যে অবাধপ্রেমের বিবরণ সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্র সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। হিন্দুনারীর সতীত্বের মহিমা প্রচার না করে শরৎচন্দ্র পতিতার হৃদয়বৃত্তির বর্ণনা দিতেই অধিক আগ্রহী বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। তাঁরা একই অভিযোগ শরৎচন্দ্র পরবর্তী আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধেও উত্থাপন করেন এবং বলেন যে সাহিত্যে এমন দুর্নীতিপ্রচার করে এইলেখকেরা সাহিত্যকে যেমন কলুষিত করছেন, তেমনি সমাজকে অসুস্থ ও অনৈতিকতাদুষ্ট করে তুলছেন। শরৎচন্দ্র এ-অভিযোগ খণ্ডণ করে লেখেন একাধিক প্রবন্ধ। এ-সব প্রবন্ধে তাঁর মূলবক্তব্য এই যে নীতিপ্রচার সাহিত্যের উদ্দেশ্যনয়। সমাজঅনুশাসন কিংবা সতীত্বের মহিমা প্রচারের মধ্য দিয়ে 'নীতি-পুস্তক' রচনা করা সম্ভব, 'কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্য-সৃষ্টি হবে না।'[১৭৩] শরৎচন্দ্র এ-দেশের প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন ও সমাজকে মিথ্যে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন উৎপীড়ক ও ভণ্ড বলে মনে করেন। তাই তাঁর রচনায় সমাজ ও সামাজিক অনুশাসনাদিকে অত্যন্ত পূত পবিত্র ও সুন্দর করে দেখাবার মিথ্যাচার তিনি করেন নি। ~~বলে মনে করেন~~। তিনি সমাজকে সমাজ বলেই মনে করেন, দেবতা বলে মনে করেন না, তাই সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচারের পরিচয় তুলে ধরায় তিনি অকুণ্ঠিত। তিনি মনে করেন এইসমাজ মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ। সুবিধা ও প্রয়োজনের জন্য সমাজ ও সংসারে মিথ্যার বেসাতি চললেও সাহিত্যে ওই মিথ্যাকেই মহিমময়রূপে দেখানো হবে অপরাধ। তাঁর মতে, 'সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে চালাতে হয়। কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে তোলার মত পাপ অল্পই আছে। ······· বর্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে না, একথা কোনমতেই ভোলা উচিত নয়।'[১৭৪] শরৎচন্দ্র সাহিত্যে সতীত্বের মহিমা প্রচারকে ভণ্ডামো বলে মনে করেন। শরৎচন্দ্র বলেন, 'সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি কিন্তু দেবতা বলে মানিনে।

১৭৩· শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য ও নীতি' (শরৎসাহিত্যসংগ্রহ (অষ্টম সম্ভার), পূর্বোক্ত, ৩৫৭

১৭৪· শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি', ওই, পৃঃ ৩৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বহুদিনের পুঞ্জীভূত নরনারীর বহুমিথ্যা বহু কুসংস্কার বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়াপরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয় কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নরনারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে বেশি সইতে হয় এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্ত ভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তুপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে উঠে, এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে। কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই। সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য।'[১৭৫] শরৎচন্দ্র সাহিত্যে 'এই *propaganda* চালানোর কাজটাকেই' 'সর্বপ্রথম কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে' ইচ্ছুক নন।[১৭৬] তিনি চান নিরপেক্ষ সমাজসত্য ও হৃদয়সত্যের উদ্ঘাটন। শরৎচন্দ্র বলেন তিনি এবং তাঁর পরবর্তী লেখকেরা 'মানবের সুগভীর বাসনা, নরনারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ' লিখতে চান। তিনি মনে করেন নতুন কালের এই 'তরুণ সাহিত্য' এই বেদনার বিবরণ' প্রকাশ করবে না ত করবে কে? মানুষ মানুষকে চিনবে কোথা দিয়ে?'[১৭৭]

শরৎচন্দ্র মনুষ্যত্বকে সতীত্বের চেয়ে বড় বলে মনে করেন। তিনি বলেন সতীত্বের বদলে নারীর মনুষ্যত্ব, গূঢ় হৃদয়বেদনা ও বিরুদ্ধ সমাজের হীনতাকে নির্দেশই নবীন সাহিত্যের উদ্দেশ্য, তাঁর মতে নবীন সাহিত্যের এই প্রবণতা ও উদ্দেশ্য সমাজপতিদের মনঃপূত নয় বলেই নবীন সাহিত্যকে দুর্নীতি প্রচারক বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। আধুনিক লেখকদের পক্ষ ও আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি বলেন:

যেখানে ভালবাসা উচিত নয়, সেখানে ভালবাসার অপরাধ যতই হউক, — বিশ্বাসহন্ত্রীর ঢের বড় অপরাধ মৃত্যুকালে হতভাগিনীর কপালে বঙ্কিমচন্দ্রকে দাগিয়া দিতেই

---

১৭৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৪ – ৩৬৫

১৭৬. ঐ ঐ, পৃঃ ৩৬৫ (?)

১৭৭. ঐ ঐ, পৃঃ ৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হইল। এই অসঙ্গত জবরদস্তিই আধুনিক সাহিত্যিক স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। ভালমন্দ সংসারে চিরদিন আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালকে ভাল মন্দকে মন্দ সেও বলে, মন্দের ওকালতি করিতে কোন সাহিত্যিকই কোনদিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।'[১৭৮]

শরৎচন্দ্র সুনীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে একটি তত্ত্ব তৈরি করেন। তাঁর মতে, নীতি ও সমাজের হিতের কথা ভেবে কাব্যের সত্যকে হত্যাই হচ্ছে প্রকৃত দুর্নীতি। এ-মানদণ্ডে শরৎচন্দ্র দেখান যে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্নীতিগ্রস্ত। শরৎচন্দ্র "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এ রোহিনীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণেই বঙ্কিমকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযুক্ত করেন। তাঁর মতে, 'হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠকপাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির *convention* সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু ম'ল সে আর তার সঙ্গে সত্য সুন্দর *Art*। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানীতে তার মরা চলে না।'[১৭৯] তাঁর মতে রোহিনীকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে স্রষ্টা বঙ্কিম সংকীর্ণ সমাজ ও নৈতিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। বঙ্কিমের রোহিনীহত্যা শরৎচন্দ্রের কাছে 'দায়িত্বহীন কল্পনার অবিচার' বলেও মনে হয়,[১৮০] এবং একেই কাব্যের সবচেয়ে বড় দুর্নীতি বলে অভিহিত করেন তিনি।

---

১৭৮. শরৎচন্দ্র, 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত' (১৩৩০), ওই, পৃঃ ৩৭১-৩৭২

১৭৯. শরৎচন্দ্র, 'সাহিত্য ও নীতি', ওই, পৃঃ ৩৫৮

১৮০. 'মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে কথোপকথন', (শরৎসাহিত্যসংগ্রহ (ত্রয়োদশ সম্ভার), ?) পৃঃ ৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ ১৩২১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বাস্তবতাবাদী বিতর্ক ।

১৩২০ বঙ্গাব্দের দিকে "ভারতী" পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ওই সময়ের তরুণ লেখকদের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে । এই লেখকেরা রবীন্দ্রানুরাগী হলেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ধারার বাইরে একটি নতুন ধারা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন । তাঁদের প্রধান দুটি লক্ষ্য ছিলো; (ক) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় সাধন; (খ) তাঁদের সমকালীন বাঙালী সমাজের গ্লানিকর অন্ধকার অংশের রূপ ও পতিতা নারীর প্রতি এ-সমাজের অবিচারের পরিচয় তুলে ধরা ।'[১৮১] এ-সবের মধ্য দিয়ে তাঁরা বাঙলাসাহিত্যে প্রবর্তন করতে চান অব্যবহিত বাস্তবতানির্ভর সাহিত্যধারা । প্রথম উদ্দেশ্য-টি সাধনের জন্য "ভারতী গোষ্ঠী"র চারজন লেখক-মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯), সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়(১৮৮৬-?), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) সমকালীন ইউরোপীয় উপন্যাস অনুবাদে অগ্রসর হন । ওলন্দাজ থেকে মণিলাল অনুবাদ করেন "ভাগ্যচক্র" (১৯১১), সৌরীন্দ্রমোহন ফরাশি উপন্যাসের অনুবাদ করেন "মাতৃঋণ"(ভারতী,১৩১৮) নামে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নরওয়েজীয় উপন্যাসের অনুবাদ করেন "জন্মঃ দুঃখী"(১৯২২)নামে এবং চারুচন্দ্র জার্মান থেকে অনুবাদ করেন "আগুন ফুলকি"(১৩২১)নামক গ্রন্থ । এ-সব উপন্যাসে ইউরোপীয় সমাজের দরিদ্র, কুৎসিত অন্ধকার ও অবজ্ঞাত অংশের পরিচয় বিধৃত হয়েছিলো বলেই ভারতীয়গোষ্ঠীর লেখকেরা অনুবাদে উৎসাহী হয়েছিলেন । ভারতীয় গোষ্ঠীর লেখকেরা তাঁদের মৌলিক-উপন্যাসেও সমকালীন সমাজজীবনের উপস্থাপনা করেন । তবে বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিলো না, এবং তাঁদের মধ্যে রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণতাই ছিলো বেশি । তাঁরা অব্যবহিত বাস্তবতা নির্ভর সাহিত্যধারা সৃষ্টির কথা ভাবলেও ওই নতুনধারা প্রবর্তনের শক্তি ও প্রতিভা তাঁদের ছিলো না ।

---

১৮১. সুকুমার সেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (চতুর্থখণ্ড) (বর্ধমান সাহিত্য সভা১৯৫৮/১৩৬৫) পৃঃ ১৫৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সুকুমার সেনের মতে সাহিত্যে 'বাস্তবদৃষ্টির প্রথম উন্মোচন ভারতীর আসরে' হলেও এ- ধারার প্রাথমিক বিকাশ ও লালন ভারতীগোষ্ঠীর লেখকদের হাতে হয়নি । এ-ধারার প্রাথমিক 'লালন খানকিটা নারায়ণ 'পত্রিকায় সম্পন্ন হয় ।[১৮২] "নারায়ন" পত্রিকার প্রকাশ ঘটে অগ্রহায়ণ ১৩২১ বঙ্গাব্দে । রবীন্দ্রবিরোধীতা "নারায়ণ"-এর প্রধান লক্ষ্য ছিলো । এদিক থেকে "নারায়ণ"রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ ও প্রথাগত মানসিকতার পরিচয় দিলেও, এ-পত্রিকার পৃষ্ঠায়ই আধুনিক কালের নতুন সাহিত্যের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায় । ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'সবুজপত্রের শত্রু সনাতনীদের মিত্র নারায়ণের কোলেই কিন্তু ঈষৎ পরিবর্তনের আভাষ'[১৮৩] "নারায়ণ"-এ আবির্ভূত হন এমন কিছু লেখক যাঁরা বাস্তবউপাদান ও যৌনজীবন নির্ভর উপন্যাস গল্প রচনার মধ্য ওই সময়ে ব্যাপক আলোড়ন তোলেন । ওই সময়ের আলোড়নসৃষ্টিকারী কথাসাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের আত্মপ্রকাশ ঘটে "নারায়ণ" পত্রিকাতেই । এ-পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণগুপ্ত, হরিদাস হালদার প্রমুখ । নরেশচন্দ্র 'স্পষ্ট যৌনআবেগ মূলক" ও বাস্তবতার অন্ধকার অংশের উপস্থাপনা মূলক সাহিত্য সৃষ্টি করেন ।[১৮৪] সত্যেন্দ্রকৃষ্ণগুপ্ত, হরিদাস হালদার প্রমুখেরও লক্ষ্য ছিলো' বাস্তব ' গল্পরচনা করা । হরিদাস হালদার তাঁর "কর্মের পথে " (১৯১৭) উপন্যাসের ভূমিকায় তাঁর এই লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, ' এই উপন্যাসের সকল ঘটনার উপর বাস্তবের আবরণ দিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইয়াছে ।[১৮৫] "নারায়ণ" -এ প্রকাশিত 'বাস্তব' গল্প উপন্যাসগুলো নীতিবাগীশ রক্ষণশীল সমাজপতিদের ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে । নারায়ণে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা ও পূর্ববর্তী লেখকদের গল্প-উপন্যাসের অনৈতিকতা ও কুফল ব্যাখ্যা করে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "- নারায়ণ"-এ লেখেন 'গণিকাতন্ত্রসাহিত্য' (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩২৬) শীর্ষক প্রবন্ধ । এ- সকল রচনায় গণিকাদের মহীয়সীরূপে তুলে ধরার মধ্যদিয়ে এবং গণিকাদের প্রণয়বৃত্তান্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখকেরা সমাজকে কলুষিত করে তুলছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন । এবং সমকালীন কথাসাহিত্যকেই তিনি 'গণিকাতন্ত্রসাহিত্য' বলে অভিহিত করেন । তাঁর এ-রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'সাহিত্যে বাস্তবতা' (মানসী ও মর্মবাণী " পৌষ ১৩২৬) নামক প্রবন্ধ ।

---

১৮২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৭ ।

১৮৩. ওই,ওই, পৃঃ ২২০ ।

১৮৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৭ ।

১৮৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

"সবুজপত্র"-এ ১৩২২ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের "ঘরেবাইরে" উপন্যাসটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কাছাকাছি সময়ে "সবুজপত্র"-এ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীরপত্র' গল্পটি। শরৎচন্দ্রের "বিরাজবৌ"(১৯১৪), "পল্লীসমাজ"(১৯১৬), "চরিত্রহীন"(১৯১৭), "গৃহ-দাহ"(১৯২০)"শ্রীকান্ত"(দুপর্বঃ ১৯১৭, ১৯১৮), "দেবদাস"(১৯১৭)ইত্যাদিও প্রকাশিত হয় এ-দশকেই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও "নারায়ণ" পত্রিকার অন্যান্য লেখকদের রচনাবলী নীতিবাদী রক্ষণশীলদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। সমাজ ও সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষায় উদ্বিগ্ন এই নীতিবাগীশেরা কামকলুষময় অনৈতিক 'নব্য' সাহিত্যের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। "মানসী ও মর্মবাণী," "বঙ্গবাণী" প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকায় রক্ষণশীল সমালোচকদের বিদ্রূপ ও আক্রমণ প্রকাশিত হতে থাকে। ওই নীতিবাগীশদের কেউকেউ জড়িয়ে পড়েন সাহিত্যের নৈতিকতা বিষয়ক বিতর্কে। এ-সময় প্রধান নীতিবাদীদের পাশে দেখাদেন অখ্যাত সাহিত্যবোধ শূণ্য বহুনীতিবাদী যাঁরা প্রথাগত নৈতিকতার সপক্ষে সোচ্চার হন। কোনো কোনো পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ওই সাহিত্যের লেখকদের সঙ্গেসঙ্গে ওই সাহিত্যের অনুরাগীদেরও ধিক্কার ও বিদ্রূপ করা হয়। সাহিত্যসম্মেলনের সভাপতির অভিভাষনেও এই সাহিত্যের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার উচ্চারিত হয়। এ-সাহিত্যকে বিদ্রূপ করে লেখা হয় বিদ্রূপাত্মক নানা রচনা। মোটামুটিভাবে ১৩২১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময় কে এ-বিতর্ক আলোড়ন বিক্ষোভের কাল বলে নির্দেশ করা যায়। এই রক্ষণশীল সমাজপতিদের নীতিবোধ প্রথাগত, রক্ষণশীল, অন্তঃসারশূণ্য ও কপট। বাস্তব জীবনে কলুষক্লেদ থাকলেও সাহিত্যে ওই ক্লেদকলুষের পরিচয় প্রকাশ করা যায় না বলেই তাঁদের বিশ্বাস। সাহিত্য উন্নতনৈতিক আদর্শ, সৎজীবন ও সাধুচিত্রের উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে মানুষকে শুদ্ধ উন্নত নৈতিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করবে বলে তাঁরা মনে করেন। বাস্তবতার ক্লেদ কলুষকে আড়ালে রাখার পক্ষপাতী তাঁরা। কারণ ক্লেদকলুষপূর্ণ পাপ জীবন অত্যন্ত প্রলোভনময়। সাহিত্যে ওই বাস্তবতা উপস্থাপিত হলে মানুষকে উন্নতনৈতিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এই রক্ষণশীল নীতিবাদীরা সাহিত্যকে প্রথাগত সুনীতি-দুর্নীতির মানদণ্ডে যাচাই করেছেন। শিল্পসৃষ্টি হিশেবে কোনোরচনার সার্থকতা তাঁরা যাচাই করেন নি, কিংবা বাস্তবতার প্রতিভাস রচনায় কোনো গ্রন্থের সাফল্য ব্যর্থতা নির্দেশও তাঁদের লক্ষ্য ছিলোনা। সাহিত্য তাঁদের কাছে সনাতন, পুণ্যময় হিন্দু সমাজের নৈতিকআদর্শের বাহনরূপে গণ্য হয়েছে। তাঁদের কাছে যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর বা হিতকর বলে মনে হয়েছে, সমকালীন সাহিত্যে তাঁরা ওই নীতি অনুশাসনেরই উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি তদন্ত করেছেন। এ-সবের মধ্যদিয়ে তাঁদের বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক যে-দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে-তা সংকীর্ণ, একদেশদর্শী। তাঁরা শুধু সমাজ ও ধর্ম অনুমোদিত তথাকথিত পুণ্যময়, নৈতিক জীবনবাস্তবতার রূপায়ণের পক্ষপাতী। তবে ওই খণ্ডিত বাস্তবতাকেও উজ্জ্বল বর্ণে আদর্শায়িত করে উপস্থাপনার

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষপাতী তারা, যাতে পুণ্যময় সাধু জীবনের দিকে পাঠকচিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ এই রক্ষণশীল গোত্রই বাস্তবতাবিমুখ, বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা মগ্ন থাকতে চান কপট নৈতিকতায়। তারা সনাতন হিন্দুসমাজের উন্নত অনুশাসনের মহিমা প্রচারকেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে মনে করেন।

সমাজ ও সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন গোঁড়া রক্ষণশীল যতীন্দ্র মোহন সিংহ। তিনি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও "নারায়ণ"পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর রচনাকে দুর্নীতি প্রচারক বলে অভিযুক্ত করেন। তিনি 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রবন্ধে এই লেখকদের রচনার দুর্নীতির ব্যাপক পরিচয় নির্দেশ করেন। 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রবন্ধটি "সাহিত্য"পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। লেখকের নীতিবোধ কপট। সাহিত্যকে তিনি গণ্য করেন সমাজমানসের নৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমরূপে। কোনো রচনার বাস্তবঘনিষ্ঠতা ও লেখকের বাস্তবমনস্কতা এ-সমালোচকের বিবেচ্য বিষয় নয়, কোনো রচনা কতখানি নৈতিক ও সমাজবিধির বিশুদ্ধ উপস্থাপনাকারী তা-ই তিনি যাচাই করেন। তাঁরমতে কোনো আখ্যায়িকায় সমাজ-সত্য উপস্থাপনাই প্রধান ব্যাপার নয়, সমাজমানসের সামনে প্রথাগত কল্যানময় নৈতিকজীবন বা সুফলের পথ-নির্দেশই স্রষ্টার কর্তব্য। তিনি বলেন, 'কবির আর্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার করি, ... কিন্তু জগতে যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহার সঙ্গে মঙ্গলেরও সম্বন্ধ আছে। কারণ জগৎস্রষ্টা যিনি, সত্য শিবসুন্দরই হইতেছে তাহার স্বরূপ। .... কবির সৃষ্টিও যদি সেই বিশ্বসৃষ্টির অনুকরণ করে, তবে তাহাতে আমরা সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিব বা মঙ্গলকেও দেখিতে আশা করি।'[১৮৬] অপ্রিয় ও অসুন্দর সত্য বা বাস্তবতা সর্বসমক্ষে তুলে ধরার বিরোধী তিনি। তাঁর মতে যাঁরা মনে করেন সমাজের ব্যাধি বা ক্ষত উন্মোচন করে সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করা সম্ভব, তাঁরা ভ্রান্ত। অস্ত্রপ্রয়োগে ব্যক্তিদেহকে রোগমুক্ত করা সম্ভব হলেও, সমাজদেহকে ওই প্রক্রিয়ায় রোগমুক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন কলুষ ও অন্ধকার বাস্তবতার বিবরণ রচনা করে সমাজদেহের ক্ষত সারিয়ে তোলার চেয়ে

---

১৮৬. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা', "সাহিত্য", (৩০বর্ষঃ ৯ম ও ১০ম- সংখ্যা, পৌষ ও মাঘ ১৩২৭), পৃঃ ৬৪৫ - ৬৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

বরং আরো বিস্তার করা হবে। তাঁর মতে পাপের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সদা তীব্র, এবং প্রলোভনময় পাপের নিরাবরণ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পাপের প্রতি অনুরক্তিই বাড়িয়ে তোলা হবে। তিনি বলেন, '........ মানব শরীরের ক্ষত অস্ত্রচিকিৎসায় আরাম হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজশরীরের ক্ষত কখনও আরাম হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যসমাজে পাপপুণ্য একইভাবে রহিয়াছে। ..... পাপ পুণ্যের মিশ্রণ যদি মনুষ্যজাতির স্বভাব হয়, তবে মনুষ্যসমাজের অস্ত্রচিকিৎসা বা যে কোন চিকিৎসাই কর না কেন, তাহাকে কখনও পাপমুক্ত করিতে পারিবে না। বরং অনেক কুচিকিৎসক যেমন মনুষ্যশরীরে অস্ত্র করিয়া ক্ষতবাড়াইয়া নালি ঘা করিয়া বসেন, এইসকল সমাজ চিকিৎসকও তাঁহাদের আর্টের দ্বারা প্রলোভনময় পাপচিত্রকে অধিকতর মনোরম করিয়া সমাজের ক্ষত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন।'[১৮৭] অর্থাৎ তিনি মনে করেন কলুষ ও বীভৎসতা বাস্তবজীবনে ভালো ও সুভাবিবেকের সঙ্গে চিরকালই পাশাপাশি অবস্থান করেছে, এবং চিরদিনই তা থাকিবে। কোনো ভাবেই জীবন থেকে জীবনের অন্ধকার অংশকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তাই তাঁর মতে সাহিত্যে ওই অন্ধকার বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে হবে। পাঠকের সামনে কদর্য্য বাস্তবতাকে গোপন রেখে পুণ্যময় ও সুন্দর বাস্তবতাকে তুলে ধরতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, 'সমাজে অনেক বিনোদিনী, কিরণময়ী অপেক্ষাও খারাপ লোক আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের কে খোঁজ রাখে? কবি তাঁহার আর্টের দ্বারা তাহাদের প্রলোভনময় পাপচিত্র অধিকতর প্রলোভনীয় করিয়া ধরাতে, তাহারা আমাদের পরিচিত হইয়াছে, এমন কি অনেকের অনুকরণীয়ও হইতে পারে।'[১৮৮] পাঠককে পাপের পথ থেকে সরিয়ে রাখার জন্যই বাস্তবতার ভালো ও পুণ্যময় দিক চিত্রণের পক্ষপাতী যতীন্দ্রমোহন। বাস্তবতার সকল অংশের অবিকলচিত্রনমূলক সাহিত্যকে তিনি অভিহিত করেন 'কামকলুষময় সাহিত্য' বলে।[১৮৯] এমন্তব্যের মধ্য দিয়ে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের প্রতি তার বিদ্বেষ ঘৃণাই পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাস্তব নামধারী কামকলুষময় সাহিত্য যদি আর্টের পুষ্টির জন্য লালসার ইন্ধন যোগাইতে আরম্ভ করে, তবে সমাজকে কিসে রক্ষা করিবে?'[১৯০]

---

১৮৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪৬।

১৮৮. ওই, পৃঃ ৬৪৬।

১৮৯. ওই, ওই, ৩০ঃ ১১ ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুণ-চৈত্র ১৩২৭, পৃঃ ৭০৫।

১৯০. ওই, পৃঃ ৭০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে বাস্তবতার বিশেষ কিছু অংশের , যেমন নরনারীর প্রণয়, হৃদয়সঙ্কট,প্রণয়জনিত সমস্যা-এ-সবের উপস্থাপনা অত্যন্ত গর্হিত বলে গণ্য করেন যতীন্দ্রমোহন । তাঁর মতে প্রলোভনময় ওই পাপ-জীবন সত্য হলেও সাহিত্যে তার উপস্থাপনা করা অনুচিত । তাতে সমাজসদস্যরা পাপের পথে যেতে প্রলুব্ধ হবে । তাঁর মতে অবৈধপ্রেম বাস্তবসত্য হলেও সাহিত্যে ওই সত্য তুলে ধরা হবে সমাজের ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করা । পাঠককে উন্নত নৈতিক আদর্শ শিক্ষা দেবার জন্য বাস্তবতাবিরোধী যেকোনো কপট মিথ্যাচারের পক্ষপাতী যতীন্দ্রমোহন। যতীন্দ্রমোহন অভিযোগ করেন যে ''কামকলুষময় 'সাহিত্য'সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র প্রমুখ পাঠককে 'লালসার ইন্ধন'জুগিয়ে চলেছেন । এই লেখকেরা অবৈধপ্রেমের উপাখ্যান রচনা করে সমাজের কোমলমতি বালকবালিকা ও গৃহস্থ অন্তঃপুরবধূদের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে চলেছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন । তাঁর মতে এই লেখকেরা চারধরনের অবৈধ প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে সাহিত্যিক পরিমণ্ডলকে বিষাক্ত করে তুলেছেন । এগুলো হচ্ছে :(১) বিধবার প্রেমনির্ভর আখ্যান, (২) সধবার প্রেমনির্ভর আখ্যান (এসব গল্পে প্রেম বিবাহপূর্ব কুমারী অবস্থায় সঞ্চারিত হয় এবং বিবাহের পরেও তা বিদ্যমান থাকে), (৩) বিবাহ পরবর্তী কালে অন্যপুরুষের প্রতি সধবানারীর পাপাসক্তির কাহিনী, (৪) গণিকার প্রেমরূপ পাপচিত্র সমৃদ্ধ উপাখ্যান । যতীন্দ্রমোহনের মতে এসব অবৈধপ্রেম ও পাপচিত্রসমৃদ্ধ 'নবেল ও গল্পের বই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেখানে যে একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার (unhealthy atmosphere) সৃষ্টি করিতেছে , আমাদের সমাজের বায়ু দূষিত করিতেছে ।'[১১১] এ-ছাড়াও এ-সব আখ্যান 'অপরিণতবয়স্ক ও অগঠিত চরিত্র বালকবালিকাদিগের মধ্যে' বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন । অসামাজিক ও অবৈধ প্রণয়নির্ভর এ-সব রচনা সমাজস্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ বলেও তিনি নির্দেশ করেন । তিনি বলেন, '...... কলেরা, প্লেগ, বসন্তের বীজ অপেক্ষাও এই প্রেমের বীজ সমাজশরীরে অধিকতর মারাত্মক।'[১১২] যতীন্দ্রমোহন এ-সব রচনায়

---

১১১. ওই , ৩০ : ১, বৈশাখ ১২৭ , পৃঃ ৭ ।

১১২. ওই , ওই , পৃঃ ৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণিত নারীর হৃদয়বৃত্তির জটিলতা ও বিচিত্রগতি প্রণয়কে বিদেশের আমদানি বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে এ-প্রণয় বাঙালী সমাজ ও জীবনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়, বাঙালী জীবনেও এমন আবেগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর এ-অভিমতের মধ্য দিয়ে তাঁর গোঁড়া, সংকীর্ণ, রক্ষণশীল ও বাস্তবতাবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন, 'ইংরেজী Love জিনিসটা, যাহাকে আমরা প্রেম নাম দিয়া তরজমা করিয়া থাকি, তাহা বাঙালী জীবনে সত্য নহে, উহা বাঙালীর সমাজে ছিল না, এবং এখনও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ ভিন্ন বাঙালী সমাজে নাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা বা স্নেহ, তাহা স্বতন্ত্র জিনিষ, তাহা এই love নহে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বিবাহের পূর্বে জন্মে না, বিবাহের দ্বারা তাহার উৎপত্তি হয় .... Love -এর মধ্যে জোয়ার ভাটা খেলে, ভালবাসা যেন স্তিমিতপ্রবাহা নদী, তাহা একবার জন্মিলে আর তাহার তেমন হ্রাসবৃদ্ধি নাই।'[১৯৩] অর্থাৎ তাঁর কাছে প্রথাগত নৈতিকতাই সত্য। সনাতন হিন্দুসমাজের জীবন-ধারা বা প্রথারাশিই সত্য, জীবনের বিচিত্রগতি ও হৃদয়ের স্বাভাবিক টানাপোড়েন তাঁর কাছে বাস্তবতা বা সত্য নয়। সনাতন শুদ্ধ নৈতিক জীবন যাপনের জন্য স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিকে দমন এবং অস্বীকারের পক্ষপাতী তিনি। অর্থাৎ এই সমালোচক কপট ও বিশুদ্ধ প্রথানুসারী। তিনি অভিযোগ করেন, 'আমাদের উপন্যাস লেখকগণ আর্টের সাহায্যে এই বিলাতী প্রেমকে আমাদের সমাজে আমদানি করিতেছেন। বিলাতী আলু বিলাতী বেগুন প্রভৃতির ন্যায় এই বিলাতী প্রেমেরও চাষ এখন আমাদের সমাজে তাঁহারা চালাইতে চান।'[১৯৪]

"সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" গ্রন্থাকারে (১৩২৯) মুদ্রিত হবার পর যতীন্দ্রমোহনের রক্ষণশীল সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন সরলা দেবী। 'সিংহের বিবরে' ("বঙ্গবাণী", ফাল্গুণ ১৩৩০) শিরোনামের এ-প্রবন্ধে সরলাদেবী এই নীতিবাগীশ সমাজপতিকে 'সেনেটারি ইন্সপেক্টার' বলে অভিহিত করেন।

---

১৯৩. ঐ, ৩০ঃ ১২ ও ১২, পৃঃ ৭০০।

১৯৪. ঐ, ঐ, পৃঃ ৭০১।

Dhaka University Institutional Repository

সরলাদেবী সাহিত্যে সমাজবাস্তবতার সকল অংশের অবিকল উপস্থাপনার পক্ষপাতী। সমাজবাস্তবতার সকল অংশের চিত্রনকে সাহিত্যের ধর্ম বলে মনে করেন তিনি। তিনি রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত কথা সাহিত্যিকদের পক্ষাবলম্বন করে বলেন যে, আমাদের কথাসাহিত্যে চিত্রিত প্রণয়আখ্যান বিলেতিপ্রেমের অন্ধঅনুকরণ নয়, পরকীয়া ও অবৈধ প্রেম হিন্দুসমাজে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। তাঁর মতে হিন্দুসমাজ বিকারগ্রস্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত, ওই ব্যাধি ও বিকার লুকিয়ে রেখে নীতিবাগীশেরা সমাজের আরো ক্ষতিসাধন করছেন। আর কথাসাহিত্যিকেরা সমাজদেহ রোগমুক্ত করার তাগিদেই ক্ষতস্থান উনমুক্ত করছেন। তিনি বলেন, 'সত্যকথা এই–'সধবার প্রেম' ও 'বিধবার প্রেম' অর্থাৎ দুয়েরই 'পরকীয়প্রেম', এ–দেশে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। পুরাকালে পুরাতন বিধায় চলিত, নুতনকালে নব্যবিধায় চলিতেছে–এই 'প্রেম' বস্তু হিন্দুর ঘরে ঘরে সিন্দুকে প্যাটরায় লুকান। উপন্যাসে কাব্যে শুধু "হাঁড়ি হাটে ভাঙ্গাঁ" হইয়েছে। কবিরা তাঁহাদের পাপকলুষিত হৃদয় হইতে পাপচিত্র উদ্ভাবন করিয়া সমাজকে কলুষিত করিতে বসেন নাই, কিন্তু যেসকল পাপ সমাজের বর্তমান বিকৃত অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী তাহার চিত্র উদঘাটন করিয়া সমাজ সংস্কারের ইঙ্গিত করিতেছেন।'[১৯৫] বাস্তবতা বা সত্যের মুখোমুখি হতে অস্বস্তি-বোধ করছে বলেই সমাজপতিরা সমকালীন কথাসাহিত্যের নিন্দায় মুখর বলে তিনি মনে করেন।

সমকালীন কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত বাস্তবতা ও হৃদয়সঙ্কট নামক নৈতিকতার কুফল নির্দেশ করে এবং সরলাদেবীকে আক্রমনকে যতীন্দ্রমোহন লেখেন 'সাহিত্যে সু ও কু' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১) শীর্ষক প্রবন্ধ। তাঁর এ–প্রবন্ধের বক্তব্য 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা'র বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি। তিনি এ–প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র ও অন্যান্য সমকালীন কথাসাহিত্যকদের 'নব্যতন্ত্রের লেখক' বলে অভিহিত করেন এবং সাহিত্যে এই লেখকদের বিভিন্নস্তরের নারীহৃদয়ের বিচিত্র সঙ্কট ও প্রণয় জটিলতা উপস্থাপনাকে 'বিষ্ঠার হাঁড়ি হাটে ভাঙ্গাঁ' বলে নির্দেশ করেন।[১৯৬] তিনি বলেন এই লেখকেরা প্রেমের পাশবিক ভাবকে সাহিত্যে তুলে ধরে সমাজ ও সাহিত্যের-

---

১৯৫. উদ্ধৃত, যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'সাহিত্যে সু ও কু', "মানসী ও মর্মবাণী", ১৬বর্ষ: ১খণ্ড: ৪ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, পৃঃ ৩২০।

১৯৬. যতীন্দ্রমোহন সিং, 'সাহিত্যে সু ও কু', ওই, পৃঃ ৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতি করছে। তাঁরা যে-প্রেমের চিত্র আঁকছেন তা ভারতীয় জীবনের পবিত্র ভালোবাসার চিত্র নয়, তা একান্তই ব্যভিচারমূলক বিলেতী নভেল অন্ধ অনুকরণ মাত্র। সুতরাং এ-দেশের পটভূমিতে এই ব্যভিচারমূলক প্রেমচিত্রকে কিছুতেই সত্য বা বাস্তব বলা যায় না। তাঁরমতে এদেশে বাস্তব বা সত্যপ্রেম হচ্ছে ভারতীয় নরনারীর দাম্পত্য-জীবনের ভালোবাসা। তিনি বলেন এই নব্যতন্ত্রের লেখকদের লেখায় এ-দেশের নরনারীর জীবনের প্রকৃত সত্য উপস্থাপিত হয় কি। ওই প্রকৃতসত্য বলতে তিনি প্রণয়ময় দাম্পত্যজীবনকে নির্দেশ করেছেন। তিনি উপহাস করে বলেন যে ভবিষ্যতে এ-দেশের নরনারী বিলেতি আদর্শে গড়ে উঠলে যেমন প্রেমের খেলা খেলবে, 'যেরূপ- *Court ship*, *Coquetry*, *flirtation*, *jilting* ইত্যাদি করিবে', নব্যতন্ত্রের লেখকেরা তার আগাম বর্ণনা করে যাচ্ছেন মাত্র।[১১৭] তাই তাঁর কাছে নব্যতন্ত্রের লেখকেরা প্রতীয়মান হয়েছে 'তথাকথিত *realistic* নভেল' রচয়িতারূপে, এ-সাহিত্যে উপস্থাপিত প্রণয়কে তিনি নির্দেশ করেছেন 'অসত্য' বলে। এবং তাঁর মতে, 'সেই কারণেই তাহা সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে দূষণীয়।'[১১৮] তিনি নব্যতন্ত্রের লেখকদের প্রতি সরলাদেবীর পক্ষপাতেরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন নব্যতন্ত্রের লেখকেরা সমাজজীবনের নানা ব্যভিচার ও অবৈধ প্রেমের যে মিথ্যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তাকে যদি তর্কের খাতিরে সত্য বলে মেনেও নেয়া যায়, তাহলে বলতে হয় যে সমাজজীবনের ওই ব্যাধি ও ব্যভিচারের পরিচয় কিছুতেই সর্বসমক্ষে তুলে ধরা উচিত নয়। কারণ তা ব্যক্তিকে ব্যভিচারী হতে প্ররোচিত করবে। পরকীয়া প্রেমের অস্তিত্ব সমাজে থাকলেও ওই ক্লেদাক্ত বাস্তবতা তুলে ধরা অনুচিত বলে তিনি মনে করেন। কারণ তাঁর মতে এই ক্লেদাক্ত ব্যাপারগুলোর প্রকাশ ও খোলামেলা বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমাজকে স্বর্গে পরিণত করা যাবে না, তবে এটি সহজে নরকে পরিণত করার পথ তৈরি হবে।[১১৯] তাঁর এ- মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ভণ্ড ও কপট রক্ষণশীলতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্যে প্রকৃত সত্য বা বাস্তবতার উপস্থাপনা তাঁর কাছে কুৎসিত ও সমাজস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে হয়। তাই সাহিত্যে তিনি চান কৃত্রিম সুন্দর ও বানোয়াট আদর্শের ছবি, যা দিয়ে জনগণকে পুণ্যচিন্তা ও উন্নতনৈতিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা যাবে। ধর্মের

---

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২২।

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২২।

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

অনুশাসন ও নৈতিকতাই তাঁর কাছে চরম বাস্তবতা রূপে গণ্য হয়েছে। 'নব্যতন্ত্রে'র লেখকেরা প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই সমকালের সাহিত্য দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে বলে যতীন্দ্রমোহন আক্ষেপ করেন 'সাহিত্য-চর্চা' (কার্তিক ১৩৩১) প্রবন্ধে। এ-প্রবন্ধেও নব্যতন্ত্রের সাহিত্যকে পাপকলুষময় বলে নির্দেশ করেন। পাপকলুষময় এ-সাহিত্য সমাজকে কলুষিত করছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, '...... তাঁহাদের অনেকগ্রন্থে পাপের চিত্র নিতান্ত উলঙ্গভাবে উদঘাটিত হইয়া পাঠকপাঠিকার মন কলুষিত করিতেছে। অপরিণতবয়স্ক পাঠক-পাঠিকার উপর ও সমস্ত সমাজের উপর এই সকল কাব্যপাঠের পরিণাম যে কতদূর বিষময়, ইহা তাঁহারা ভাবিবারও অবসর পান না।'[২০০] নব্যতন্ত্রের লেখকদের প্রতি তাঁর প্রশ্ন: '........ সমাজের জন্য সাহিত্য, সাহিত্যের জন্য সমাজ নহে। যে সাহিত্যের দ্বারা মানব সমাজের কোন প্রকার উপকার না হইয়া বরং অপকার হয় তাহার সার্থকতা কি?'[২০১]

যতীন্দ্রমোহন সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও সাংঘাতিক বিতর্কে লিপ্ত হন। শরৎচন্দ্র "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" নদীয়াশাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে যতীন্দ্রমোহনের গোঁড়া নৈতিকতার সমালোচনা করেন। অভিভাষণটি 'সাহিত্য ও নীতি' নামে "বঙ্গবাণী"তে (পৌষ ১৩৩১) মুদ্রিত হয়। এ-প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেন লেখক প্রথাগত নৈতিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। সামাজিক সুনীতিদুর্নীতি বিষয়ক অনুশাসন লেখককে নিয়ন্ত্রণ করে না, লেখক নিয়ন্ত্রিত হন আর্টের অনুশাসনে। যেখানে লেখক আর্টের অনুশাসন লঙ্ঘন করে নীতির অনুশাসন পালনে তৎপর হন, সেখানেই তিনি শিল্পসৃষ্টিতে ব্যর্থ হন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের উল্লেখ করেন। এ-উপন্যাসে বঙ্কিম রোহিণীকে হত্যা করে আর্টেরই অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন বলে মনে করে শরৎচন্দ্র। তিনি বলেন, এ-উপন্যাসে বঙ্কিমের 'কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক

---

২০০. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'সাহিত্যবিচার', "মানসী ও মর্মবাণী", (১৬ : ২ : ৩, কার্তিক ১৩৩১), পৃঃ ২৩১ - ২৩২।

২০১. ঐ, ঐ, পৃঃ ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।'[২০২] যদিও রোহিনীর '······অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির *convention* সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু ম'ল সে আর তার সঙ্গে সত্যসুন্দর *art*.'[২০৩] শরৎচন্দ্রের মতে, 'উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানীতে তার মরা চলে না।'[২০৪] শরৎচন্দ্রকে আক্রমন করে যতীন্দ্রমোহন লেখেন 'আর্টের অনুশাসন' ("মানসী ও মর্মবাণী" চৈত্র ১৩৩১) নামক প্রবন্ধ। তিনি বলেন 'আর্ট' ও 'মোরালিটি'র নিত্য সম্বন্ধ আছে। তাই আর্টের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধিত না হয়ে পারে না। সে কারণেই লেখক ইচ্ছা না থাকলেও লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়ে যান।[২০৫] সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, '······জগতের *moral law* অনুসারে অবশেষে পাপ বিধ্বস্ত হইয়া-পুণ্যের জয় অর্থাৎ *harmony* পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। জগতের এই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন। এই *Cosmic Law* দেবাসুর সংগ্রাম নামে কীর্তিত হইয়াছে। বিশ্বজগতে যাহা সত্য মানবজীবনেও সেই একই নিয়মে দেবাসুরের সংগ্রাম হইয়া থাকে। "সত্যং শিবং সুন্দরং" মতে উপাসক কবিকে এই একই আইন মানিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিতে হইবে নচেৎ সেসাহিত্য কিছুতেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না।'[২০৬] সাহিত্যের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিষয়ক এ-বিতর্কে সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পায় নি, এখানে নৈতিকতা প্রসঙ্গই প্রধান। রক্ষণশীল নীতিবাগীশ যতীন্দ্রমোহনের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনার ব্যাপারটি তিনি বিবেচনার মধ্যে আনেন না। তাঁর কাছে সত্য বা বাস্তব হচ্ছে বিমূর্ত ও ধর্ম্মীয় বিধিঅনুশাসন। সাহিত্যে এই অনুশাসনের উপস্থাপনা হলেই কোনো রচনা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

---

২০২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য ও নীতি', ঐ, পৃঃ ৩৫৭।

২০৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৮।

২০৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৮।

২০৫. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'আর্টের অনুশাসন', "মানসী ও মর্মবাণী" ১৭ বর্ষ ঃ ১ খণ্ড, চৈত্র ১৩৩১, পৃঃ ১০৮।

২০৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

চৈত্র ১৩৩১ বঙ্গাব্দে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্যসভায় সভাপতির অভিভাষণরূপে পঠিত 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র রক্ষণশীল নৈতিকতাপন্থীদের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজকে তুষ্ট করা লেখকের দায়িত্ব নয়। সামাজিক বিধিবিধান প্রচার ও রক্ষণাবেক্ষণ সমাজপতিদের কাজ, এবং সমাজনির্দেশিত পথ ধরে সমাজপতিরা হাঁটলেও, লেখক কোনো সামাজিক নিয়ন্ত্রনের অধীন নন। শরৎচন্দ্র আরো বলেন যে সমাজকে তিনি দেবতা বলে গণ্য করেন না। সুবিধা ও প্রয়োজনের অজুহাতে সমাজ-সংসারে অনেক মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে হয়, একই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও মিথ্যা দিয়ে কলুষিত করে তোলা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।[২০৭] যতীন্দ্রমোহন তাঁর 'সাহিত্য ও সত্য' ("মানসী ও মর্মবাণী" পৌষ ১৩৩২) প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের এ- বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। এ-প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেশ্য নির্দেশের পাশাপাশি যতীন্দ্রমোহন নব্যতন্ত্রের লেখকদের দুর্নীতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরেন। সাহিত্যে জীবনবাস্তবতার অবিকল চিত্রন অপেক্ষা কাল্পনিক মিথ্যা সৃষ্টির পক্ষপাতী যতীন্দ্রমোহন। তাঁর মতে লেখক প্রয়োজনে অসত্যের উপস্থাপনা অবশ্যই করতে পারেন। অসত্যের উপস্থাপনা সাহিত্যকে কলুষিত করেনা বরং নব্যতন্ত্রের লেখকেরা যে তথাকথিত সত্য বা বাস্তবতার উপস্থাপনা করে চলেছেন তা-ই বঙ্গসাহিত্য ও সমাজকে কলুষিত করে চলেছে। তিনি বলেন আর্টমাত্রই মায়ামরীচিকা সৃষ্টি করে। লেখক স্বভাব বা প্রকৃতিজগতের সাধারণ বস্তুর ওপর অসত্যের রঙ ফেলেই ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করেন এবং পাঠক চিত্তকে মোহিত করেন। তাতে সাহিত্য কলুষিত না হয়ে বরং রমণীয় হয়ে ওঠে। কল্পনা বা সৌন্দর্য সৃষ্টিকেই যতীন্দ্রমোহন 'অসত্য' বলে অভিহিত করেছেন। ব্যভিচার, অবৈধ প্রণয়ের গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে পাপের ভয়াবহ পরিণাম নির্দেশের পক্ষপাতী তিনি। তাঁর মতে নব্যতন্ত্রের লেখকেরা শুধুমাত্র ব্যভিচারের চিত্রই আঁকছে, পাপ ও ব্যভিচারের ভয়ঙ্কর পরিণাম নির্দেশ করছে না। এরফলে সমাজের মানুষ পাপে উৎসাহী হয়ে উঠছে। তিনি বলেন পূর্ববর্তী লেখকেরা পাপ ও ব্যভিচারের চিত্র আঁকার পাশাপাশি পাপের পরিণামও উজ্জ্বল বর্ণে এঁকেছেন এবং পাপের ভয়াবহ পরিণাম নির্দেশ করে তাঁরা পাঠকের মনে পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নব্যতন্ত্রের লেখকেরা সত্যপ্রচারের অজুহাতে পাপ-ব্যভিচারের মনোরম ছবি এঁকে মানুষকে পাপের প্রতি আকৃষ্ট করছে মাত্র।[২০৮] বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন প্রক্রিয়াও তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি কাল্পনিক সৃষ্টিকেই

---

২০৭. শরৎচন্দ্র, 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি', পূর্বোক্ত ৩৬৪ - ৩৬৫।

২০৮. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'সাহিত্য ও সত্য', "মানসী ও মর্মবাণী" (১৭ঃ২ঃ৫, পৌষ ১৩৩২), পৃঃ ৪১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনি বলেন, 'ফটোগ্রাফ তোলা একজন আর্টিস্টের প্রশংসনীয় গুণ নহে। স্বহস্তে নিজের মনের ভাব প্রতিবিম্বিত করিয়া যে চিত্র অঙ্কিত করা হয় তাহার দ্বারাই আর্টিস্টের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। সেইরূপ *realistic art* -এর সাহায্যে হুবহু সমাজের চিত্র অঙ্কিত করা কবির প্রকৃত বাহাদুরি নহে।'[২০৯] দৈনন্দিন তুচ্ছ বাস্তবতা সাহিত্যে উপস্থাপিত হতে পারে না বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মতে কবি একটি প্রসন্ন-প্রভাতের বর্ণনাকালে শান্ত আকাশ-পাখির কাকলি-মৃদু হাওয়ার বর্ণনার সঙ্গে যদি রাজপথে চলমান ময়লাবাহী-গাড়ির বর্ণনা জুড়ে দেন তবে ওই রচনা অনবদ্য শিল্প হতে ব্যর্থ হবে। কারণ শান্ত সৌন্দর্যের পাশে কুৎসিত-বাস্তবতার উপস্থিতি হবে পীড়াদায়ক। এক্ষেত্রে কবির কুৎসিত বাস্তবতার দিকে লক্ষ্যকরার ফটোগ্রাফার সুলভ মনোভাবেরপ্রশংসা করা গেলেও, স্রষ্টারূপে তিনি প্রশংসার দাবীদার নন। তাঁর মতে তুচ্ছ ও কদর্য বাস্তবতার ঠাঁই সাহিত্যে নেই, সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টির মধ্যদিয়ে পাঠককে উন্নত নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দেয়াই সাহিত্যের লক্ষ্য।[২১০]

নব্যতন্ত্রের লেখকেরা প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই সমকালের সাহিত্যের এতো দুর্গতি বলে আক্ষেপ করেন যতীন্দ্রমোহন 'সাহিত্যেচর্চা' প্রবন্ধে। যতীন্দ্রমোহন কিছু ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক রচনায়ও 'নব্যতন্ত্রের' লেখকদের বিদ্রুপ আক্রমণ করেন। 'বঙ্গে শারদীয় সাহিত্যসম্মেলন'(১৩৩১)শীর্ষক ব্যঙ্গ রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ও অন্যান্যদের আখ্যা দেন 'নবযৌবনের দল' বলে, তাঁদের সংঘকে অভিহিত করেন 'সবুজসংঘ'নামে, এ-দল রচিত সাহিত্যকে চিহ্নিত করেন ''সবুজসাহিত্য' অভিধায়।[২১১] এ-রচনায়ও যতীন্দ্র-মোহন 'নব্যতন্ত্রের' লেখকদের 'বিলেতীচমকে' বিভ্রান্ত, উত্তেজিত ও বিকারগ্রস্ত রূপে প্রতিপাদনে তৎপর হন এবং লেখকদের বাস্তবতামনস্কতা সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে নির্দেশ করেন। বাস্তবতামনস্ক এ-লেখক গোত্রকে ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন যে ইঁদুরের মতো এইলেখকেরা ও সমাজের ভিত্তি খুঁড়ে লুকোনো সমাজসমস্যা দেখার

---

২০৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৪।

২১০. ওই, পৃঃ ৪১৫।

২১১. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বঙ্গেশারদীয়াসাহিত্য সম্মেলন "মাসী ও মর্মবাণী," ১৬ঃ২ঃ২, আশ্বিন ১৩৩১ পৃঃ ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

অপপ্রয়াস করছেন। তিনি বলেন এতে যে সমাজের ভিত্তি টলমল হয়ে উঠেছে সে-সত্য বোঝার মতো দূর দৃষ্টিও এ-লেখকদের নেই।[২১২] একই সঙ্গে এই লেখকেরা পরকীয়া প্রণয়আখ্যান রচনা করে বালকবালিকাদের পাপাসক্ত করে তুলছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।[২১৩] 'সাহিত্যিক গবেষণা'(অগ্রহায়ণ ১৩৩৩)শীর্ষক রচনায় যতীন্দ্রমোহন আক্রমন করেন নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তকে। শিক্ষক ও ছাত্রের কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত এ-ব্যঙ্গ রচনাটির উদ্দেশ্য নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের উপন্যাসের তুচ্ছতা প্রদর্শন। এখানে নরেশচন্দ্রের কটি গ্রন্থে স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচার বর্ণিত হয়েছে ও কটি গ্রন্থে এই ব্যভিচার প্রশংসিত হয়েছে তা উদঘাটন করার জন্য শিক্ষক গবেষণাচ্ছু ছাত্রকে নির্দেশ দেন।

তেরোশো বঙ্গাব্দের বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র ও "নারায়ণ" গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের রচনার নিন্দা-সমালোচনা করে লিখিত হয় আক্রমণাত্মক বহু প্রবন্ধ-ব্যঙ্গ রচনা। উগ্র নীতিবাদী এ-সব সমালোচক ওই কথাসাহিত্যিকদের রচনায় উপস্থাপিত বাস্তবতাকে আক্রমন করেন। ওই কথাসাহিত্যিকদের রচনায় উপস্থাপিত বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁরা প্রত্যেকে অভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে এ-সব গল্প উপন্যাসে বাঙালিজীবন বাস্তবতা উপস্থাপিত হয় নি। এ-সব রচনার জীবন, সমস্যা ও পাত্রপাত্রী বিলেতী, আর এই লেখকদের একমাত্র লক্ষ্য পাপজীবনের চিত্র তুলে ধরা। বিজাতীয় জীবন ও পাপজীবনের অবাধ উপস্থাপনার মধ্য এই লেখকেরা সমাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে বলে তাঁরা মনে করেন। এ-সময় "সাহিত্য" পত্রিকা শ্রী কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গল্পসাহিত্যে তত্ত্বের খিচুড়ী'প্রবন্ধে("সাহিত্য", আষাঢ় ১৩৩৫)রবীন্দ্রনাথের " ঘরে বাইরে"(১৩২৩) উপন্যাসকে বিজাতীয় ও বিলেতী বলে নির্দেশ করেন এবং উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদেরও একই দোষেদুষ্ট বলে অভিযুক্ত করেন। এ-উপন্যাসের জীবনবাস্তবতা ও পাত্রপাত্রদের মধ্যে বিজাতীয়তার ছাপ অত্যন্ত প্রকট বলে তিনি নির্দেশ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালি ব্যক্তিজীবনের যে সঙ্কটের পরিচয় তুলে ধরেছেন এই গোঁড়া রক্ষণশীলদের কাছে তা বিজাতীয় বলে বোধ হয়েছে। এ-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা হিন্দুধর্মের আজ্ঞাবহ, গার্হস্থ্য-ধর্মপালনে নিবেদিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শূণ্য, সমাজনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের চেয়ে ভিন্ন ও আধুনিক, এরা নতুন সময়ের

---

২১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৩।

২১৩. যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'সাহিত্যিক গবেষণা' " মানসী ও মর্মবাণী ", অগ্রহায়ণ ১৩৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি। অতীতমুখী রক্ষণশীল সমাজপতিদের কাছে নতুন সময়ের জীবনবাস্তবতা ও বাঙালি নরনারীদের বিজাতীয় অবাস্তব ও বিলেতী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীকালীপদ "ঘরেবাইরে"র পাত্রপাত্রীদের অবাস্তব ও বিলেতী বলে নিন্দা করে বলেন, 'বিমলা ও বিনোদিনীর চরিত্রে যদি ঔপন্যাসিক আমাদিগকে ব্যক্তিত্বের আত্মবিকাশ দেখাইবার প্রয়াসী হইয়া থাকেন তবে বাঙালী অবশ্যই বলিবে, 'উহা আমার ঘরের ছবি নহে, উহা অননুকাল বিলাতী ফ্রেমে বাঁধা থাকুক, আমি উহা চাইনা।'[২১৪] রবীন্দ্রনাথ খণ্ডিত জীবনবাস্তবতার চিত্রন করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর মতে পুণ্যময় সমাজবিধি অনুমোদিত হিন্দুজীবনের উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ অনীহ, কিন্তু পাপ ও ব্যভিচারময় অন্ধকার জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনায় তার আগ্রহ প্রবল। তিনি বলেন, '......রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে জীবনের বিশ্লেষণ চাহেন, জীবনের সৃষ্টি চাহেন না। আবার পাপজীবনের বিশ্লেষণেই তাহার দক্ষতা অপার।'[২১৫]

'ন্যাসপাতি ও নবন্যাস'নামক ব্যঙ্গরচনায় ওই সময়ের কথাসাহিত্যিকদের উপন্যাসে খণ্ডিত জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতার সমালোচনা করা হয়। এই ব্যঙ্গ রচনার লেখক ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ওইসময়ের উপন্যাসকে ন্যাসপাতির সঙ্গে তুলনা করেন এবং এইসময়ের উপন্যাসের নতুন নামকরণ করেন 'নবন্যাস'। তাঁর মতে এই 'নবন্যাসে' ন্যাসপাতিরই সবকয়টি গুণ বিদ্যমান, প্রকৃত উপন্যাসের গুণাবলী 'নবন্যাসে' প্রায় নেইই। তিনি বলেন, 'নবন্যাসে নাসপাতির সবকয়টি গুণই বিদ্যমান– মধুর, মোলায়েম, জলে ও অম্লে ভরা, ... জ্বর-বেতার জিহবপীড়িত জনের নিকট ন্যাসপাতির যেরূপ আদর, যৌবন জোয়ারের তরঙ্গাসে ভাসন্তরী ও উড়ন্তপাল যুবকযুবতীর কাছে নবন্যাস "নির্ব্বানমুক্তি"। ন্যাসপাতিতে রসের ন্যায় কষও আছে, নবন্যাসে "রসকষ" অবশ্য দুইই আছে।'[২১৬] লেখকের মতে এই 'নবন্যাসে' জীবনবাস্তবতার খণ্ডাংশের মাত্র চিত্রন ঘটে থাকে। 'নবন্যাস' লেখকেরা নারীহৃদয়ের প্রণয়বিষয়ক জটিলতারই শুধুমাত্র উপস্থাপনা করে থাকেন। জীবনের অন্যান্য ব্যাপার ও বাস্তবতার অন্যান্য সুর এ-সব রচনায় উপেক্ষিত হয়ে থাকে। ফলে এ-সব

---

২১৪. শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সল্পসাহিত্যে তত্ত্বের খিচুড়ী', "সাহিত্য", (২৮শ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা) আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ২৩২।

২১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৩।

২১৬. ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ন্যাসপতি ও নবন্যাস', "সাহিত্য" ২৮ ঃ ৩, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

রচনা প্রণয়চিত্র সর্বস্ব, ভাবালুতাপূর্ণ, মুখরোচক রচনামাত্র হয়ে থাকে, বাস্তবতাঘনিষ্ঠ সাধুচিত্র সমৃদ্ধ রচনার স্তরে উন্নীত হয় না। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন সাহিত্যে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত গার্হস্থ্য জীবনের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দেয়ার মধ্য দিয়েই সমগ্রজীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা করা সম্ভব। সনাতন হিন্দুনারীর পবিত্র তপস্যাপূর্ণ জীবনচিত্র তুলে ধরাই তাঁর কাছে সাহিত্যে প্রকৃত বাস্তবতার উপস্থাপনারূপে হয়েছে। তিনি বলেন, 'সাধারণত নবন্যাস নিঙড়াইয়া ·········· পাওয়া যায় রমণীহৃদয়। রমনীহৃদয় নিশ্চয়ই অতিউত্তম পদার্থ। কেবল হৃদয়ই রমণীর যথাসর্ব্বস্ব নয়। পরন্তু নবন্যাসে অখণ্ডভাবে রমণীহৃদয়ের সবখানিও পাওয়া যায়না, পাওয়া যায় কেবল সেই অংশটি, যে অংশটি দিয়া প্রেম করিতে হয়। রমণীহৃদয়ের এই অংশ নবন্যাসের অধিনায়ক, উপপাদ্য ও একানু বিষয়ীভূত। ······· কেবল প্রেম ও পরিণয়ে মনুষ্যজীবনের সব লেঠা চুকিয়া যায় না, লেঠা সবে আরম্ভ হয়। অথচ নবন্যাসের কথা সেইখানেই শেষ। প্রথমতঃ প্রণয়, তাহার পর পরিণয়, ব্যস। নিশ্চিন্ত। কিন্তু প্রণয় ও পরিণয় ব্যতীত প্রকৃত জীবনে আরও অসংখ্য ব্যাপার আছে, তাহা নবেলিষ্টির নিকট অতিসাধারণ, অতএব উপেক্ষিত। কর্তব্যনিষ্ঠা, সংযম, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, ব্রত, নিয়ম, বিনয় নম্রতা, দৃঢ়তা, দয়াদাক্ষিণ্য, সম্ভ্রমজ্ঞান, এসবই নবন্যাসিকের হিসাবে রমণীজীবনে অতিতুচ্ছ, সাধারণ, সুতরাং সহজসাধ্য, তৃণাপেক্ষাও লঘু। নবেলী নায়ক নায়িকার যাহা কিছু কঠোর কর্তব্য ও জীবনের কার্য্য, তাহা ভালবাসা (Sexual love) ················· । বিদেশীয়, বিজাতীয় ও বীভৎসভাবে ভোর হইয়া, দুদশবার "হরিবোল" দিলে, বা "গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গ" বলিলেই কিস্তিমাৎ। কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই।'[২১৭] অর্থাৎ নারীহৃদয়ের জটিলতা চিত্রনের প্রবণতা তাঁর কাছে 'বিদেশীয়' 'বিজাতীয়' ও 'বীভৎস' বলে মনে হয়েছে। এ ব্যাপারটিকে অসত্য বা বা অবাস্তব বলে মনে হয়েছে এ-কারণে যে ভারতীয় হিন্দুনারীর মধ্যে এমন অসংযম নেই, তারা সংযমী, সাধ্বী ও আত্মোৎসর্গকারী। ওই সংযমী, কর্তব্যনিষ্ঠ হিন্দু নরনারীর জীবনের ধর্মীয় ও নৈতিক বিধিপালনের ইতিবৃত্ত রচনায় কথাসাহিত্যিকেরা অনাগ্রহী বলে তাঁদের রচনাকে পরিহাস ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন।

---

২১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৪ - ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময়ের কথাসাহিত্যকে "সাহিত্য" পত্রিকার সাহিত্যসমালোচনা বিষয়ক স্তম্ভে 'লালসা ও রিরংসাসৃষ্টি' বলে অভিহিত করা হয়, এ-সাহিত্যের নামকরণ করা হয় 'কামায়ণ'।'[২১৮] কথাসাহিত্যে প্রবৃত্তিগত জীবনবাস্তবতার চিত্রন ওই সমালোচককে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে। কথাসাহিত্যের বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা তাঁর কাছে প্রশংসাযোগ্য কোনো ব্যাপার বলে গণ্য হয় নি, বরং কুৎসিত বাস্তবতার উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে সমাজের 'নীতি' ও 'সদাচার' ধ্বংসহয়ে যাচ্ছে বলে তিনি আক্ষেপ করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সাহিত্যে কামের-দুর্ব্বল রুগ্ন, কুৎসিত কামের ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ হইতেছে। কামায়ণে বাঙালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে। নীতি মুমূর্ষ। সদাচার পৈশাচিক তান্ডবে পিষ্ট। লালসা ও রিরংসার সৃষ্টিই 'আর্ট' হইয়া উঠিয়াছে।'[২১৯] এই সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্তেরও সমালোচনা করেন। কোনোএক সাহিত্যসভার সভাপতির অভিভাষণে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও "নারায়ণ"পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর কথাসাহিত্যসম্পর্কে কোনো আক্রমণাত্মক মন্তব্য ও নিন্দা করেননি বলে এই স্তম্ভকার ক্ষুব্ধ হন। হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'যিনি এই নূতনপূজার বড় যজমান, যিনি তাঁহার 'নারায়ণে'র মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের সিংহাসনে রতি ও মদনের যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের আস্তাকুঁড় ঘাঁটিয়া পুরোহিত খুঁজিয়া আনিতেছেন, এবং 'ঘনপিশিতপিন্ড' ও 'মাসবচষক'তুল্য'নানাক্লিন্ন মুখে' ঠাকুর-ঠাকুরুণের জন্য তথাকথিত 'আর্টে'র নৈবেদ্য রচনা করাইতেছেন, সেই চিত্তরঞ্জনযে সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সেই সম্মিলনের সভাপতি বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে সাহিত্যের এই ভীষণ, ভয়াবহ, কুৎসিত কুষ্ঠের কথা তুলিলেন না। .... যে কামের কলুষবন্যায় বঙ্গসাহিত্য ডুবুডুবু, বাঙালা ভেসে যায়, তাহাও বেদান্তরত্নের দার্শনিক দৃষ্টি অতিক্রম করিল।'[২২০] আরেক রক্ষণশীল সমালোচক মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 'সাহিত্যে ভাববিপর্যয়'প্রবন্ধে("সাহিত্য", ফাল্গুণ ১৩২৫)'আধুনিক বাঙালা সাহিত্য ·· য়ুরোপীয়ভাবে দুষ্ট হইতেছে' বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন।[২২১] তাঁর মতে 'আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খল য়ুরোপীয় ভাবের প্রবর্ত্তন দ্বারা' সমাজের অনিষ্ট করছেন, অপরিণতবয়স্ক পাঠকপাঠিকার চরিত্রহানি করছেন। তাঁর

---

২১৮. অজ্ঞাতনাম, 'মাসিক সাহিত্যসমালোচনা', "সাহিত্য", (২৮ঃ৩, আষাঢ় ১৩২৫), পৃঃ ২৩৫।

২১৯. ওই, পৃঃ ২৩৫।

২২০. ওই, পৃঃ ২৩৫।

২২১. মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, 'সাহিত্যে ভাববিপর্যয়', "সাহিত্য" ২৮ঃ১১, ফাল্গুণ ১৩২৫, ৭৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মতে এই সাহিত্য 'আবর্জনা মাত্র,' আর্ট নয়। তিনি বলেন, 'কয়েকজন বর্ণনাকুশল লেখক তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কুলভুক্ত নারীগণের চরিত্র এমনই চিত্তাকর্ষকভাবে চিত্রিত করিতেছেন যে, অনেক অপরিণত বয়স্ক পাঠকপাঠিকা তাহা পাঠ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এ-সাহিত্য চিরস্থায়ী হইবে, সে আশা অনেকেরই নাই। কিন্তু উহার অস্থায়ী জীবিতকালের মধ্যে উহা দ্বারা যে কতদূর অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহাকে বলিতে পারে ? এইরূপ সাহিত্য সাহিত্যকাননের আবর্জনামাত্র। ইহার উচ্ছেদসাধনে সমাজ ও সাহিত্যের মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত।'[২২২]

দীনেশচন্দ্রসেনও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র ও অন্যান্যের রচনায় বিজাতীয় সমাজ বাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেন। মেদেনীপুর সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি ওই লেখকদের রচনার অসারতাও নির্দেশ করেন। তাঁর মতে এ-লেখকেরা যে -সমাজ -সামাজিক সমস্যা ও নর-নারীর উপস্থাপনা করছেন তা স্বদেশী নয়। তাঁদের রচনায় সমাজবাস্তবতার যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাকে দীনেশ-চন্দ্র সেন বিলেতী প্রভাবজাত ও বানোয়াট বলে নির্দেশ করেন।[২২৩] তিনি তলস্তয়, ওয়েলস, বার্ণার্ডশ, ইবসেন প্রমুখের সাহিত্যকর্মের উল্লেখ করে বলেন যে এই লেখকদের সমাজে যেসব সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছিলো এবং নরনারীর সম্পর্কের যে প্রবৃত্তি তাঁদের সমাজে জটিলরূপে দেখা দিয়েছিলো, তাঁরা উপন্যাসে সমাজের সেই সমস্যাবলীরই উপস্থাপনা করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে আমাদের কথাসাহিত্যিকেরা ভারতীয় সমাজজীবন সমস্যা উপেক্ষা করে ওই বিলাতী সমাজজীবনের সমস্যার অনুকরণে বানোয়াট কাহিনী রচনা করে চলেছেন। তাঁর মতে বাঙালী স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কের সমস্যা আর ইবসেনের সমাজের স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাঙালী নারীচরিত্রে ইবসেনের সমাজের নারীদের মতো উচ্চকণ্ঠ নির্লজ্জতা নেই, বাঙালী নারীরা লজ্জাশীলা অন্তঃপুরবাসিনী। তাঁরমতে বিলেতী নারীদের ছাঁচে বাঙালীনারী নামক যে-সব চরিত্র আমাদের লেখকেরা তৈরি করেছেন, ওই চরিত্রগুলো অবাঙালী ও অবাস্তব। তিনি বলেন, "আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির যে একটা স্বাভাবিক লজ্জা ও সংযম আছে, তাকি আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি না ? যেসকল প্রেমসমস্যার সন্ধিস্থলে কোনো কোনো লেখক তাঁদেরকে এনে দাঁড় করাচ্ছেন, তার বীভৎসতা কি আপনারা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন না ? আমাদের পারিবারিক জীবন কি সত্যই এই উৎকট প্রেমলীলার অভিনয় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ? এই যে শতশত হিন্দু গৃহস্থ চারিদিকে আছেন, তাঁদের কোনো বাড়ীতে কি এই সকল দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে ? না, বিলাতী সাহিত্যে যা কিছু পেয়েছি, আমাদের এখানে দেশের নাম কোরে যেমন কোরে হোক তার লীলাটা দেখাতে হবে-এইনকলবাজী না করলে আমাদের লেখকজীবন মিথ্যা হোয়ে যাবে ?'[২২৪] মানবজীবনে স্বাভাবিক আবেগ ও প্রণয়জনিত সমস্যা গোঁড়া, রক্ষণশীল, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে অবাস্তব ও বিলেতী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। লেখকদের হৃদয়সমস্যা চিত্রনের প্রবণতা তাঁর কাছে শুধুই 'নকল-

---

২২২. ওই, পৃঃ ৭১৪।

২২৩. দীনেশচন্দ্র সেন, 'দেশী ও বিদেশী', "প্রবাসী" (২০ঃ ১ঃ ১, বৈশাখ ১৩২৭) পৃঃ ৭৯,

২২৪. পূর্বোক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

বাজী'বলে মনে হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, এই লেখকেরা বিলেতী গ্রন্থের অনুকরণে যে আখ্যান রচনা করছেন তাতে হিন্দু সমাজের ছবি থাকছে না, হিন্দু গৃহস্থের সমস্যার পরিচয় তাতে নেই। তাতে আছে বিলেতী সমাজ ও সমস্যার পরিচয়।[২২৫] তিনি মনে করেন বিলেতী অনুকরণে 'এইসকল লেখক এ-দেশীয় নারীপ্রকৃতিতে এরূপকল্পিত অসংযম আরোপ কোরে তাঁদের মাবোনদের অপমানিত করছেন।'[২২৬] অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল নীতিবাদী কোনো সমালোচকের আলোচনাই কথাসাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীভূত থাকছেনা সমাজে; সাহিত্যের সুফল ও কুফল নির্দেশেই তাঁরা মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁরা প্রত্যেকেই ওই সময়ের কথাসাহিত্যে চিত্রিত সমাজজীবন সমস্যা ও পাত্রপাত্রীদের বিদেশী ও অবাস্তব বলে নির্দেশ করেছেন, এবং বিলেতী অনুকরণে পাপচিত্র উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে লেখকেরা সমাজের মহাসর্বনাশ সাধন করছেন বলে রক্ষণশীলেরা অভিযোগ করেন।

অন্যান্য রক্ষণশীল আলোচকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রবীন্দ্র শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অন্যান্যের রচনার মূল্যায়নে অগ্রসর হন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর আলোচনায়ও রক্ষণশীল সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকট হয়ে ওঠে। ওই কথাসাহিত্যের বাস্তবতাকে তিনিও বিদেশ থেকে আমদানি বলে মনে করেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ ("বঙ্গবাণী," আশ্বিন ১৩৩৩) শীর্ষক প্রবন্ধে বাস্তবতার বিভিন্ন শ্রেণীকরণ করেন। এ-প্রবন্ধের প্রথম অংশে ইউরোপীয় 'বাস্তবতা প্রধান' উপন্যাসগুলো আলোচনা করা হয়, দ্বিতীয় অংশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র ও অন্যান্যের রচনায় উপস্থাপিত বাস্তবতার স্বরূপ নির্দেশ করা হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বাস্তবতাকে 'পরিশোধিত বাস্তবতা' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাস্তবতার সকল স্তরের নগ্ন নিরাবরণ প্রকাশ ঘটেনি; রবীন্দ্রনাথ মনুষ্য-হৃদয়ের রহস্য উদঘাটনেই বেশিমনোযোগী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাকে তিনি অভিহিত করেন 'অনাবৃত বাস্তবতা' অভিধায়।[২২৭] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, শরৎচন্দ্র 'সমাজের সমস্ত নীচাশয়তা, হৃদয়হীনতা এবং ক্ষুদ্রতার' অনুপুঙ্খ ও নিরাবেগ বর্ণনা করেছেন।[২২৮] শ্রীকুমার মনে করেন শরৎচন্দ্র পরবর্তী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অন্যান্যের রচনায় বাস্তবতার শোচনীয় পরিণাম ঘটেছে। রক্ষণশীল অন্যান্য সমালোচকের মতো তাঁরও বিশ্বাস এই লেখকেরা পাশ্চাত্যভাবধারা, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও সমাজ সংকটের অন্ধঅনুকরণ করে চলেছেন। এ-কারণেই এই লেখকদের রচনার বাস্তবতা উৎকট বীভৎসতায় পরিণত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন,

> 'তাঁহার (শরৎচন্দ্র) পরবর্তী লেখক ও অনুকরণকারীদের হাতে বাস্তবতা আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কতকগুলি কাল্পনিক ও অনুমানসিদ্ধ অবস্থার বিরক্তিজনক বিশ্লেষণে পরিণত হইয়াছে ও কুৎসিত প্রসঙ্গ অবতারণার উপায় মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। যে সব সমস্যা আমাদের নিজের নয়, বিদেশ ও ভিন্ন সমাজ হইতে আমদানী, যে

---

২২৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

২২৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯-৮০।

২২৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ', "বঙ্গবাণী" (৫ঃ দ্বিতীয়ার্ধঃ২, আশ্বিন ১৩৩৩), পৃঃ ১৪৪।

২২৮ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৫।

বিদ্রোহ আমাদের গৃহকোণে ও পারিবারিক জীবনে ধূমায়িত হয় নাই, কিন্তু জাহাজ বোঝাই হইয়া সদ্যবন্দরে অবতরণ করিয়াছে, যে আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের সামাজিক জীবনে মুকুলিত হয় নাই কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেগুলির উপর বাস্তব উপন্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে যে তাহার ভিত্তি বিশেষ দৃঢ় ও প্রশস্ত হইবেনা ইহা নিশ্চিত।'[২২৯]

রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত কথাসাহিত্যিকদের পক্ষসমর্থন করে প্রবন্ধ লেখেন অনেকে। তাঁরা কখনো বিরোধীসমালোচকদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন, কখনো কথাসাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করেন, কখনো নতুন সময় ও সমাজব্যবস্থায় ওই সাহিত্যের বাস্তবতা ও যাথার্থ্য নির্দেশ করেন। এই সমালোচকেরা মুক্তদৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ও নীতিনিষ্ঠার ভণ্ডামিমুক্ত। জীবনবাস্তবতার সকল অংশই সাহিত্যে উপস্থাপিত হতে পারে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন এবং নীতিশিক্ষকের ভূমিকা পালন সাহিত্যিকের দায়িত্ব নয় বলেই তাঁর মনে করেন। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পুরাতন বনাম নূতন বাঙালা সাহিত্য' ("প্রবাসী", মাঘ ১৩২৫) প্রবন্ধে সমকালীন কথাসাহিত্যকে নতুন সময়ের সমাজজীবনবাস্তবতার ধারক বলে নির্দেশ করেন।[২৩০] তিনি বলেন নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এ-দেশে জীবনযাপনের ধারা যখন পরিবর্তিত হয়েছে, যখন গ্রামকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব অন্ধ-অলস জীবনযাপন প্রক্রিয়া থেকে বাঙালীর মুক্তি ঘটেছে, এই নতুন সময়ের সাহিত্যই হচ্ছে সমকালীন সাহিত্য। এই নতুন সময়ের সাহিত্যকে প্রথাগতদের পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এ-সাহিত্য বাস্তবতা ও সত্যের নগ্ন উপস্থাপনা করে এবং এইনগ্ন সত্যের মুখোমুখি হবার সৎসাহস রক্ষণশীলদের নেই। তিনি সমকালীন লেখকদের বাস্তবতামনস্কতার প্রশংসা করে বলেন, 'যে যুগ গিয়াছে তাহাতে বেশীরভাগ মানুষ ছিল অলস, জড়, অশিক্ষিত, সাধারণ উদ্দেশ্যহীন, সুতরাং অন্ধ সংস্কারের ক্রীতদাস, লোকাচারের অনুগামী এবং ধর্ম্মভাণের ভণ্ড। এ যুগ যে আসিয়াছে ইহাতে মানুষ-কর্ম্মী, বাতাসের মত চঞ্চল, বিদ্যদগ্নিরমত চেতন।····· সাহিত্য জাতীয় মনের ছায়া। আজ আমাদের মনও যেমন নানা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভরা, সাহিত্যেও সেইসব বিচিত্র আশাভরসার সুখ-দুখ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইতেছে। নাড়ীর যোগ এইখানেই।······ সাহিত্য যে জাতির বাহিক ও আন্তরিক পরিবর্তনের দ্রুত পদক্ষেপের সহিত চলিতে পারিয়াছে ও পারিতেছে, ইহা আমাদের জাতীয় শুভ লক্ষন, সন্দেহ নাই।'[২৩১] "প্রবাসী"তে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের 'দেশী ও বিদেশী'(বৈশাখ ১৩২৭) প্রবন্ধের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। "প্রবাসী"তে প্রকাশিত 'বাংলার নতুন সাহিত্য ও তরুণ সম্প্রদায়' (শ্রাবণ ১৩২৭) প্রবন্ধে তিনি বলেন যে দীনেশচন্দ্র সেন ও অন্যান্য রক্ষণশীলেরা যে পূতপবিত্র বাঙালি হিন্দু সমাজ ও গার্হস্থ্যজীবনের মাহাত্ম্যকীর্তন করেছেন, বাঙালি হিন্দুসমাজও গার্হস্থ্যজীবন প্রকৃতপক্ষে পূতপবিত্র নয়। ওই সমাজ নানাপঙ্কিলতাপূর্ণ ও দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন। হিন্দু অন্তঃপুরও পঙ্কিলতা

২২৯· পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৭।

২৩০· বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'পুরাতন বনাম নূতন বাঙালা সাহিত্য', "প্রবাসী" (১৮ঃ ২ ঃ ৪, মাঘ ১৩২৫) পৃঃ ৩৩৮।

২৩১· পূর্বোক্ত, ৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত নয়, সেখানে আছে নানাক্লেদ, দুর্নীতি,পাপ ও মিথ্যাচার। সমকালীন কথাসাহিত্যিকেরা ওই সমাজসত্য ও জীবনবাস্তবতাকে অনাবৃত করে দেখাচ্ছেন মাত্র। অর্থাৎ সমকালীন কথাসাহিত্যিক রচনায় উপস্থাপিত বাস্তবতা তাঁর মতে বিজাতীয় বাস্তবতা নয় তা হিন্দু বাঙালি সমাজেরই বাস্তবতা। তিনি আর্ট ও নৈতিকতার সম্পর্কে প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করেন এ-ভাবে : 'আর্ট সূর্য্যেরই মত। সূর্য্য morals নয়, immorals নয়। সূর্য্য আছে- এইটেই সত্য। সূর্য্য অন্ধকার দূর করে-এইটেই সত্য। আর্টের কাজও তাই।'[২৩২]

মহীতোষকুমার রায়চৌধুরী 'সাহিত্যে পতিত'("ভারতী"আষাঢ় ১৩২৭)প্রবন্ধে সমাজ ও জীবনের ভালো-মন্দ দু-অংশের উপস্থাপনাই সাহিত্যের জন্য অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন। তিনি বলেন উন্নত-নৈতিকতার আদর্শ প্রচার সাহিত্যের লক্ষ্য হতে পারে না কিংবা বিধিবিধান অনুশাসন দ্বারাও সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হবে না। বিধিঅনুশাসন নিয়ন্ত্রিতসাহিত্য হবে পঙ্গু ও অলীক, আর জীবনের প্রকৃত সত্যের উপস্থাপনা না করে মেকী আদর্শের বুলি প্রচারের মধ্য দিয়ে সাহিত্য হয়ে ওঠে অবাস্তব ও অশিল্পিত। তাঁর মতে সাহিত্যে পাপ-পুণ্যের নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপিত হবে। রক্ষণশীল সমালোচকেরা poetic justice -এর জন্য সাহিত্যে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় দেখাবার পক্ষপাতী। মহীতোষকুমার রক্ষণশীলদের এ-মতবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে এ-ভাবে সাহিত্য অবাস্তব বা কৃত্রিম হতে বাধ্য। সাহিত্যে পুণ্যের জয় ও পাপের ভয়াবহ পরিণাম আঁকা গেলেও বাস্তবজীবনে সবকিছু এইভাবে ঘটে না। তিনি সাহিত্যে একই সঙ্গে মনুষ্যস্বভাবের দেবভাব ও নারকীয় প্রবৃত্তির পরিচয় তুলে ধরার পক্ষপাতী। তাঁরমতে সাহিত্যে বাস্তবতার যে-কোনো একটি অংশের উপস্থাপন করা হলে তা হবে একদেশদর্শিতা। নিরপেক্ষভাবে বাস্তবতার সকল অংশের উপস্থাপনার মধ্যদিয়েই লেখক সততার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন।[২৩৩] তিনি বলেন, 'ইহাতে যদি সমাজের কোন বিধানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা

---

২৩২. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলার নতুনসাহিত্য ও তরুণ সম্প্রদায়', "প্রবাসী" ২০ :১: ৪, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃঃ ৩৭৭।

২৩৩. মহীতোষকুমার রায়চৌধুরী, 'সাহিত্যে পতিত', "ভারতী"(৪৪:৩ আষাঢ় ১৩২৭) পৃঃ ২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

কমিয়া যায়, অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে পতিতের জীবনের প্রতি আকর্ষণজাগিয়ে ওঠে তাহাতে উপায় নাই। তাই বলিয়া সংসারে যেব্যক্তি পাপের পিচ্ছিল পথে নরকের দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা হইবেনা অথবা করিলেই তাহাকে জীবনে পরাভূত করিয়াই বর্ণনা করিতে হইবে এমন কোন দুর্লঙ্ঘ্য বিধান সাহিত্য মানিতে পারে না। কারণ জীবনে প্রকৃতির রাজ্যে এমনকিছু কঠোর নিয়মের আমরা পরিচয় পাই না।[২৩৪]

উপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তাঁরা সমাজবাস্তবতার সকল অংশের পরিচয় তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত 'বাঙ্গালার কথার আভিজাত্য' ("বঙ্গবাণী", ১৩৩১-৩২)প্রবন্ধে নির্দেশ করেন যে সমকালীন কথাসাহিত্যিকেরা শুধু অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনবাস্তবতা বর্ণনা করে চলেছেন মাত্র, সমাজের বৃহত্তর নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবনবাস্তবতার ঠিক পরিচয় তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বলেন যে এ-ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ , প্রভাতকুমার, জলধরসেন, শরৎচন্দ্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রমুখের রচনায়। এ-লেখকেরা শুধু নিজের শ্রেণীর বৃত্তান্ত বর্ণনায় মনোযোগী, দরিদ্র জীবনের দিকে দৃষ্টিপাতের আগ্রহ তাঁদের নেই। আগ্রহ নেই বলেই নিম্নশ্রেণীর জীবনের স্বরূপ তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি, এ-কারণেই সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের রচনায় দরিদ্রশ্রেণীটি উপজীব্য হয়ে এলেও দেখা যায় ওই চরিত্রগুলোতে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও চেতনা আরোপিত করা হয়। ফলে ওই চরিত্রগুলো হয়ে ওঠে নিম্নশ্রেণীর পোশাকপরা সচেতন মূল্যবোধসম্পন্ন মধ্যবিত্ত নরনারী। অনুচ্চ জীবনবাস্তবতার যথাযথ চিত্রনে লেখকদের ব্যর্থতার দুটি কারণ নরেশচন্দ্র নির্দেশ করেন। তিনি মনে করেন প্রথমত, আমাদের লেখকদের 'অনুরূপ অভিজ্ঞতার অভাব' ও দ্বিতীয়ত'আমাদের সাহিত্যের সুকঠিন ভব্যতা ও নীতিনিষ্ঠা'ই সমকালীন কথাসাহিত্যের বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার অন্তরায় হয়ে আছে।[২৩৫] নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বাস্তবতামনস্কতার

---

২৩৪. পূর্বোক্ত , পৃঃ ২৬৩ - ২৬৪।

২৩৫. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'বাঙ্গালার কথার আভিজাত্য', "বঙ্গবাণী" (৪ঃ প্রথমার্ধ ঃ ৫ ১৩৩১-৩২), পৃঃ ৫৪২।

Dhaka University Institutional Repository

কঠোর সমালোচনা করা হয় "মানসী ও মর্মবাণী"(ভাদ্র ১৩৩২)পত্রিকায়। এই সমালোচক সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা বিরোধী, রক্ষণশীল। তাঁর সমকালীন সমাজ জরাগ্রস্ত বলেই লেখকেরা আর্টের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, 'আজিকালকার উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে সমাজে যাহার যাহা ইচ্ছা অক্লেশে অবাধে করিতেছেন। মুমূর্ষু সমাজের হস্তে কোনরূপ শক্তি নাই। থাকিলে উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হইতে পারিত। সাহিত্যেও আজকাল বাস্তবতা ও আর্টের অজুহাতে যে-সকল চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল চিত্র অঙ্কনকারী লেখকদের 'ভব্যতা ও নীতিনিষ্ঠার পরিচয় ত বড় পাওয়া যায় না।'[২৩৬] এই সমাজপতির মতে সাহিত্যে নিম্ন-শ্রেণীর জীবন বাস্তবতা ও মনোজগতের পরিচয় দেয়া সমীচীন নয়, কারণ ওই জীবন পাপপূর্ণ। পাপ ওই জীবনে নানারূপে বীভৎসভাবে অবস্থান করে। ওই শ্রেণীর ভাষা রূঢ় অশ্লীল, অশ্রাব্য। নিম্ন শ্রেণীর পাপপূর্ণ অশোভন জীবনের উপস্থাপনা অরুচিকর ও নীতিহীনতারই নামান্তর হবে বলে তিনি মনে করেন। এই পাপচিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সমাজের 'অল্পমতি' পাঠকেরা পাপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়বে বলেও তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের শাস্ত্রের শাসন 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যম প্রিয়ম্' একথাটা ভুলিলে ত চলিবে না। বাস্তবচিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্য কি চিন্তা করিলে একথা মনে হয় যে, ঐ চিত্র দেখিয়া যদি চিত্রিত ব্যক্তিদের চরিত্রের পরিবর্তন সম্ভবপর হয়। কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐ চিত্র পাঠ করিতে পারিবে না-উপকারও পাইবে না। অধিকন্তু অল্পমতি বালকবালিকারা উহা পাঠ করিয়া পাপের আপাত মনোরম চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে মাত্র। সমাজের কল্যাণ কামনায় বাস্তবচিত্রের দোহাই দিয়া এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা কোনমতেই উচিত নয়।'[২৩৭]

৪.৬ বাঙালি আলোচকদের দৃষ্টিতে ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদ ও প্রকৃতবাদ

১৩০০বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময়ের পত্রপত্রিকায় সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের

২৩৬. অজ্ঞাতনাম, 'মাসিক সাহিত্যসমালোচনা', "মানসী ও মর্মবাণী" (১৭ঃ ২ঃ ১ ভাদ্র ১৩৩২) পৃঃ ৮০।

২৩৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

রচনায় উপস্থাপিত বাস্তবতা ও অনৈতিকতা প্রসঙ্গে রক্ষণশীল সমালোচকদের তর্কবিতর্কের পাশাপাশি ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদ ও প্রকৃতবাদ প্রসঙ্গে নানা আলোচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ-সব রচনায় লেখকদের বাস্তবতা-বিরোধী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রকট। সমালোচকদের প্রত্যেকে ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদ ও বাস্তবতাবাদী রচনাকে অনৈতিক ও সমাজের জন্য অনিষ্টকর বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন। তাঁরা বাস্তবতাবাদী আন্দোলন ও বাস্তবতাবাদী সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এ-ধারার তুচ্ছতা ও ক্ষতিকর প্রভাব নির্দেশের জন্য। এই নীতিবাদী সমালোচকদের কাছে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার ব্যাপারটি অসহনীয় অনৈতিক কাজরূপে গণ্য হয়েছে। তাঁরা বাস্তবতাঘনিষ্ঠ সাহিত্য চান না, তাঁদের কাম্য বাস্তবতার সঙ্গে তথাকথিত উচ্চআদর্শ ও ভাবের মিশ্রণে রচিত সাহিত্য যা সমাজের জন্য হবে হিতকর। এই সমালোচকেরা ইউরোপীয় 'রিয়ালিজম', 'ন্যাচারালিজম'-এর বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করেন; তবে তাঁদের অনেকের কাছেই এ দুটি ভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলন গণ্য হয়েছে অভিন্ন আন্দোলন রূপে। একজন অজ্ঞাতনাম সমালোচক "সাহিত্য" (জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) পত্রিকায় 'রিয়ালিজম'-এর বাঙলা পরিভাষা করেন 'বাস্তববাদ'।[২৩৮] কেউ কেউ এ-ধারার সাহিত্যকে 'বস্তুতন্ত্রসাহিত্য' বলে অভিহিত করেন,[২৩৯] কেউ কেউ রিয়লিস্টিক রচনার পরিভাষা করেছেন 'বস্তুগতিক'।[২৪০] কখনো '*Realistic art*'-এর পরিভাষা করা হয়েছে 'বাস্তবাত্মককলা'।[২৪১], কখনো 'রিয়ালিজম'-এর পরিভাষা করা হয়েছে 'বস্তুতন্ত্রতা',[২৪২]

এবং ন্যাচারালিজম-'এর পরিভাষা করা হয়েছে 'প্রকৃতিতন্ত্রতা'।[২৪৩] রিয়ালিজম'কে কেউ কেউ অভিহিত করেন 'বস্তুতান্ত্রিকতা' অভিধায় এবং এ-শ্রেণীর সাহিত্যকে অভিহিত করেছেন 'বস্তুতান্ত্রিকসাহিত্য' নামে।[২৪৪]

---

২৩৮. অজ্ঞাতনাম, 'সহযোগী সাহিত্য' "সাহিত্য" (৫বর্ষ : ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) পৃঃ ১৫৭।

২৩৯. রমাপ্রসাদচন্দ 'সবুজসাহিত্য' "সাহিত্য" (২৫ : ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) পৃঃ ১৯২।

২৪০. অজ্ঞাতনাম, 'সহযোগীসাহিত্য' "সাহিত্য" (২৪ : ৫, ভাদ্র ১৩২০) পৃঃ ৪৬১।

২৪১. অতুলচন্দ্র দত্ত, 'আমাদের জাতীয় শিল্প ও সাহিত্য সাধনা কোন্ পথে যাইবে', "প্রবাসী" (১৪ : ২ : ৪ মাঘ ১৩২১) পৃঃ ৪৫৩।

২৪২. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'ভাবীসাহিত্য সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা' "প্রবাসী" (১৭ :২ : ১, কার্তিক ১৩২৪) পৃঃ ১৯।

২৪৩. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'আধুনিক বাঙলাসাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যসাহিত্যের সম্বন্ধ' "প্রবাসী" (১৮:২:১, কার্তিক ১৩২৫) পৃঃ ৪৯।

২৪৪. নলিনীকান্তগুপ্ত, 'বিশ্বসাহিত্য' "প্রবাসী" (১৯ : ১ : ১, বৈশাখ ১৩২৬), পৃঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক পরে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের দিকে লক্ষ্য করা যায় 'ন্যাচারালিজম'-এর পরিভাষা করা হয়েছে 'প্রকৃতিপন্থা'[২৪৫] 'রিয়ালিজম' ও 'ন্যাচারালিজম'কে এতো বিভিন্ন পরিভাষায় চিহ্নিত করার প্রবণতা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই বিষয়টি নিয়ে এ-দেশী রক্ষণশীল সাহিত্যসমালোচকেরা বরাবরই এতো অস্বস্তি বোধ করেছেন যে একটি সুস্থিত পরিভাষা তৈরিতেও তাঁরা আগ্রহবোধ করেন নি। "সাহিত্য"(জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)পত্রিকায় অজ্ঞাতনামা লেখক 'সহযোগীসাহিত্য'শীর্ষক প্রবন্ধে ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী তত্ত্ব সীমাবদ্ধ এবং সমাজের জন্য অনিষ্টকর বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন। তিনি মনে করেন বাস্তবতাবাদী লেখকেরা সমাজের মানুষকে পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করছেন। তাঁর মতে, 'বাস্তববাদের এমনই মোহ যে, লোকে পরিণাম গণনা না করিয়া দলে দলে উহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। আর লোকের মতিগতি বুঝিয়া বাস্তববাদী লেখকেরাও পদ্ধতিটাকে দিনদিন নিতান্ত হীন ও জঘন্য করিয়া তুলিতেছেন। যাঁহারা পবিত্র শিল্প সৌন্দর্য এবং আদর্শের উপাসক ও মনুষ্যসমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের বাস্তবিকই একটা বিষম ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে।'[২৪৬] বাস্তবতাবাদী লেখকেদের প্রবণতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'ইঁহাদের বিশ্বাস যাহা আদর্শ, তাহা সুন্দর হইতে পারে; কিন্তু সত্যের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। এইরূপে বাস্তব ও আদর্শের সামঞ্জস্য বিধান ইঁহাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং Realistic - এর নাম শুনিলেই আজকাল আমাদের মনে অতিভীষণ একটা বীভৎস ভাবের উদয় হয়। ইহা সমাজের পক্ষে বড় শুভকর নহে।'[২৪৭] প্রাবন্ধিকের মতে বাস্তব ও আদর্শের মিশ্রণ ঘটানো হয়নি বলেই জোলার উপন্যাস পাপাচারের এক দেশদর্শী বিবরণ মাত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে জোলার উপন্যাস পাঠ করে তাই নরনারীর কোন উপকার সাধিত হয় না, শুধু নতুন নতুন পাপাচার সম্বন্ধে তারা জ্ঞানলাভ করে। তিনি বলেন, 'স্ত্রীপুরুষকে অতি কদর্য্য অবস্থায় স্থাপিত করিয়া তিনি তাহাদের কদর্য্য পাশবলালসার এরূপ জীবন্ত ও রসভঙ্গময়ী বর্ণনা প্রদান করেন।

---

২৪৫. অজ্ঞাতনাম, 'কথাসাহিত্যে প্রকৃতিপন্থা', 'মাধুকরী', "বঙ্গদর্শন" (২:১ খণ্ড, আশ্বিন ফাল্গুণ ১৩৫৫) পৃঃ ২২৩।

২৪৬. অজ্ঞাতনাম, 'সহযোগীসাহিত্য' "সাহিত্য" (৫ : ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১), পৃঃ ১৫৭,

২৪৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

যে তাহাতে পাঠকের অবৈধ ইন্দ্রিয় বৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন, আর কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না।'[২৪৮] তিনি মনে করেন সাহিত্যে 'রিয়েল-'এর প্রয়োজন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তিনি বলেন, 'আদর্শ-উন্নতির পথে মনুষ্য সমাজকে সাহায্য করাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের অভাব কি বুঝিতে হইলে, কি আছে, তাহারও কতকটা জ্ঞানথাকা চাই। এইখানেই Real এর আবশ্যকতা। তবে মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনার্থ যতটুকুর প্রয়োজন, কাব্যগত Realism যেন তাহাকে অতিক্রম করিয়া না ওঠে। অশ্লীলতায় কুৎসিত, কদর্য্য দৃশ্যে যে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।'[২৪৯] বাস্তবতাবাদীদের বাস্তবতামনস্কতা সমাজের জন্য অহিতকর বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। তিনি বাস্তবতার উপস্থাপনাকে গণ্য করেন অশ্লীল কুৎসিত পাপাচারের বর্ণনারূপে। বাস্তবতা ও আদর্শের মিশ্রনে রচিত সাহিত্য সমাজের জন্য হিতকর বলে তিনি দাবি করেন। অজ্ঞাতনাম এ-প্রাবন্ধিকের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করে কামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ' ("সাহিত্য" আষাঢ় ১৩০১) নামক প্রবন্ধ। লেখক এ-প্রবন্ধে সাহিত্যে বাস্তবতাবাদের গুরুত্ব ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে আদর্শবাদ বাস্তবতার প্রকৃত পরিচয় গোপন করে সুশোভন বাস্তবতা আমাদের সামনে তুলে ধরে। এর ফলে অর্ধসত্য সুশোভন বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, প্রকৃতসত্য রয়ে যায় অন্তরালবর্তী। অন্যদিকে বাস্তবতাবাদ বাস্তবতা বা সত্যের প্রকৃত ও স্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ করে, এ-কারনেই এটি মুল্যবান।[২৫০] তিনি বলেন 'দর্শন মানুষকে মূল পদার্থ দেখাইতে চেষ্টা করে। তার উপর যে একটা বিকৃত আবরণ থাকে, সেটা নষ্ট করিয়া দেয়। বাস্তববাদ যদি তাহাই হয়, তাহাতে দোষ কি? আদর্শবাদ মানে বুঝাইতেছে যে সত্যের উপরে একটা

---

২৪৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৮।

২৪৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৯।

২৫০. কামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ', "সাহিত্য" (৫ঃ৩, আষাঢ় ১৩০১) পৃঃ ২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জ্বল আবরণ দেওয়া এবং তাহার অনুসরণ করা। ইহা ঠিকে কি? ঘেঁটু ফুলকে কুৎসিত বলিলে পাছে মন্দ শুনায়, এইজন্য তাহার উপর মল্লিকার সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের আরোপ করা চলে কি? ....আদর্শচিত্র যতই উন্নত হউক না কেন, বাস্তব চিত্রের কাছে তাহার মূল্য অনেক কম।'[২৫১] এ-সময় বাস্তবতাবাদের পক্ষসমর্থন একটি অত্যন্ত বিরল ঘটনা। বিরোধীদের উচ্চকণ্ঠ বিরোধিতার পাশে এই পক্ষসমর্থন বেশ দুর্বল।

"সাহিত্যে"পত্রিকায় ১৩১০ বঙ্গাব্দ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী'শীর্ষক রচনায় বাস্তবতাবাদকে নিন্দা করা হয়। নিত্যকৃষ্ণ বসু বাস্তবতাবাদী ইংরেজী উপন্যাস ও বাঙলা উপন্যাসেরও নিন্দা করেন। তাঁর কাছে বাস্তবতারূপে গণ্য হয়েছে এই দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগতকে। তিনি বলেন, 'জগতে আমরা প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতে পাই, তাহাই real ।'[২৫২] বাস্তবতাবাদীদের অবিকল ও নিরপেক্ষ বাস্তবতা চিত্রণের প্রবণতা তাঁর কাছে নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে। তাঁর মতে বাস্তব ও আদর্শের মিলিত রূপসৃষ্টিই প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি রূপে গণ্য হতে পারে। তিনি বলেন, 'আদর্শবাদী লেখক সেই প্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি করিয়া আপনার বুদ্ধিবৃত্তি এবং কল্পনার সাহায্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন।'[২৫৩] তাঁর মতে, 'বর্তমান সময়ের বাস্তববাদিগণ তাহাদের শাস্ত্রের এই প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গিয়াছেন। ....আজকাল বাস্তববাদিগণ real অর্থে কেবল কদর্য্য, কুৎসিৎ, অশ্লীল ভিন্ন আর কিছুই বুঝেন না। ......বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। কাব্যগ্রন্থে এতদুভয়েরই প্রয়োজন। কাব্যের মুখ্যউদ্দেশ্য আদর্শসৌন্দর্য বটে; কিন্তু আমাদের

---

২৫১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩০ – ২৩১।

২৫২. নিত্যকৃষ্ণবসু 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' "সাহিত্য", (১৪ঃ ১০, মাঘ ১৩১০) পৃঃ ৬২৪।

২৫৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২৪।

Dhaka University Institutional Repository

অভাব কি, জানিতে হইলে, আমাদের কি আছে, তাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান নইলে ত চলে না। তাই *real* -এরও আবশ্যক।'[২৫৪] প্রাত্যহিক বাস্তবতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা নিত্যকৃষ্ণ বসুর কাছে 'অপ্রীতিকর' বলে মনে হয়। জর্জ এলিয়টের "*Daniel Deronda*" উপন্যাসের প্রাত্যহিক বাস্তবতার খুঁটিনাটির বর্ণনায় তিনি বিরক্ত হন। ইংরেজ উপন্যাসিকেদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, '······উপন্যাসে তাঁহারা খুঁটিনাটির', সাধারণ কথোপকথনের কিছু বেশী পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয়। আমার কিন্তু ইহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হয়। মানবহৃদয়ের যাহা শ্রেষ্ঠ মহত্তমজিনিস তাহাই কাব্যের একমাত্র বিষয়।'[২৫৫] "জন্মভূমি" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত নগেন্দ্র গুপ্তের "তমস্বিনী" উপন্যাস পাঠ করে নিত্যকৃষ্ণবসু সমাজের শ্লীলতাহানির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর মতে ওই উপন্যাসিক তাঁর রচনায় 'শ্লীলতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অন্ধ হইয়া পড়িতেছেন।' এবং তিনি যেরূপে করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের মনে তাহার প্রতি আদৌ কোনও ঘৃণা বা বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয় না। উহা পাপের ও কদাচারের প্রমোদক হইয়া পড়িয়াছে।'[২৫৫খ]

এ-সময় প্রকৃতবাদী উপন্যাসিক এমিল জোলার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় বিপিনবিহারী-গুপ্তের প্রবন্ধে।[২৫৬] 'সাহিত্যে সুরুচি' প্রবন্ধে বিপিন বিহারী সাহিত্যে সুরুচিকুরুচির আপেক্ষিকতা বোঝাতে গিয়ে জোলার উদাহরণ এনে বলেন, 'পুরিট্যান ইংলণ্ড *zola* -র নামে শিহরিয়া উঠেন, কিন্তু একটা বিচার করিয়া দেখিলে কি দেখিতে পাই? পঁচিশ বৎসরের অধিক ব্যাপিয়া ফরাশি লেখক *Emile Zola* যে *Rougon-Macquart* পরিবারদ্বয়ের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, তাহাতে যে *principle of heredity* -র তত্ত্বটি গল্পের সাহায্যে সম্যকভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ঠিক সেই তত্ত্বটি পুরিট্যান ইংলণ্ডে *Dr. Galton* তাঁহার *Hereditary Genius* প্রভৃতি পুস্তকে কঠিন কঠোর বৈজ্ঞানিক মতে বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই কি? আলাদা আলাদা বিশিষ্টভাবে *Zola* -র গ্রন্থ পাঠ করিলে সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, তা সৌন্দর্য জিনিসটা কি বিশ্লেষণে ধরা দেয়? তবে *zola* -র কুরুচি *Galton* -এর সুরুচি হয় কেন?'[২৫৭] প্রাবন্ধিকের সুরুচি কুরুচি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে অগ্রসর হন "প্রবাসী" সম্পাদক নিজেই।

২৫৪· ওই, "সাহিত্য" (১৭ঃ ৭ কার্তিক ১৩১৩) পৃঃ ৪২১ - ৪২২।

২৫৫· ওই, ওই (১৯ঃ ৫ ভাদ্র ১৩১৫), পৃঃ ২৬৩।

২৫৫খ ওই, ওই, পৃঃ ২৬৩।

২৫৬· বিপিনবিহারীগুপ্ত, 'সাহিত্যে সুরুচি' "প্রবাসী" (১০ঃ১ঃ ৪, শ্রাবণ ১৩১৭)।

২৫৭· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ-প্রবন্ধের পাদটীকায় "প্রবাসী" সম্পাদক বলেন, 'বড়ই দুঃখের বিষয় যে লেখক মহাশয় ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই যে বিজ্ঞানের নীরসভাবে যাহা বলা চলে, কাব্যের সরস ভাষায় তাহার চিত্তহারী ছবি আঁকা অনিষ্টকর হইতে পারে।'[২৫৮] অর্থাৎ সাহিত্যে বাস্তবতার নিরাবরণ ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনা সমাজের জন্য অনিষ্টকর বলে গণ্য করেছেন এই রক্ষণশীল সমাজপতিরা।

রক্ষণশীল সমালোচক রমাপ্রসাদ চন্দের মতে 'বস্তুতন্ত্র সাহিত্য' হচ্ছে 'বাহ্যবস্তুর অবিকল বর্ণনা।'[২৫৯] তবে তিনি বাহ্যবস্তুর অবিকল বর্ণনাকে সাহিত্য বলে গণ্য করেন না। কল্পনা দিয়ে রচিত সাহিত্যই তাঁর কাছে প্রকৃত সাহিত্য। কল্পনা ও বাস্তবতার মিশ্রনে রচিত সাহিত্যকে তিনি অভিহিত করেন 'আত্মশক্তিতন্ত্র সাহিত্য' রূপে। তাঁর মতে এই 'আত্মশক্তিতন্ত্র সাহিত্যই' হচ্ছে প্রকৃত সাহিত্য, বস্তুতন্ত্র সাহিত্য, বিজ্ঞান।'[২৬০] অতুলচন্দ্র দত্ত ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী রচনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেন, 'বাস্তবাত্মক বলা অনুকরণাত্মক (*imitative*) প্রকৃতিবাদ পূর্ণ (*Naturalistic*)। ইহার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়রঞ্জন। .... ইন্দ্রিয়সুত্রে যাহা দেখা যায় তাহারই অনুকরণ, বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার রূপ প্রকাশের চেষ্টা। এ-জাতীয় কলায় শিখিবার কিছু নাই, দেখিবার অনেক আছে। এই বিদ্যায় পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতিশক্তির সহায়তা দরকার আছে।'[২৬১] তাঁর মতে বাস্তবতাবাদ একটি নিকৃষ্ট পন্থা। পাশ্চাত্যের এই নিকৃষ্ট ভাবধারার অনুকরণ করে সমকালীন লেখকেরা বাঙলা সাহিত্যকে দুষিত করছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'বাঙালা শিল্প ও সাহিত্য পাশ্চাত্য শিল্প ও সাহিত্যের সংঘর্ষে আসিয়া প্রাচীন আদর্শবাদ ত্যাগ করিয়া বাস্তববাদে দুষিত হইয়া পড়িয়াছে।'[২৬২] তাঁর মতে এদেশের সাহিত্যে সর্বকালেই প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো ভাববাদ। ইউরোপীয়

---

২৫৮. পাদটীকা, ঐ, পৃঃ ৩৭৮।

২৫৯. রমাপ্রসাদচন্দ্র 'সবুজসাহিত্য', "সাহিত্য" (২৫ঃ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) পৃঃ ১১২-১১৩।

২৬০. ঐ, ঐ, পৃঃ ১১৩।

২৬১. অতুলচন্দ্র দত্ত, 'আমাদের জাতীয় শিল্প ও সাহিত্যসাধনা কোন পথে যাইবে' "প্রবাসী" (১৪ঃ১ঃ৪, মাঘ ১৩২১) পৃঃ ৪৫৩।

২৬২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫৩-৪৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

'রিয়ালিজম' ও 'ন্যাচারালিজম' আমাদের শিল্পসাহিত্যের 'স্বধর্ম'নয় বলে তিনি মনে করেন । তিনি বলেন, 'প্রাচীন *ideal* পথই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত । ········ কেননা *Idealism* আমাদের জীবনের সনাতন *goal*— উহাই ভারতীয়দের স্বভাব-ধর্ম্ম- উহাতেই চলিতে হইবে । *Realism or Naturalism* কোন যুগে আমাদের সাহিত্য বা শিল্প সাধনার 'স্ব-ধর্ম্ম'ছিলনা । এখনও হইবেনা । আর শেষ কথা এই যে *idealism* -এর ভিতর দিয়া শিল্প ও সাহিত্য সাধনা করিয়াই আমরা বিশ্বমানবের পাদপীঠ তলে আমাদের নিজস্ব কিছু দিয়া যাইতে পারিব- যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণ দিয়াছিলেন ।'[২৬৩] নলিনীকান্ত গুপ্ত 'বস্তুতান্ত্রিক-সাহিত্য'কে মহৎসাহিত্য বলে গণ্য করেন না, কারণ তাঁর মতে এ-সাহিত্য শুধুমাত্র সামান্য বাস্তবতা নিয়ে মগ্ন থাকে ।[২৬৪] সাহিত্যে শুধুমাত্র বাস্তবতার উপস্থাপনা করা অনুচিত বলে তিনি মনে করেন কারণ তাতে বিশ্ব বা সমগ্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় খন্ডের পরিচয় । তাঁর মতে, 'একান্ত বাহির যেটি যাহা শুধু দেহ সেটি ভেদের দ্বন্দ্বের খন্ডের সংকীর্ণ ক্ষেত্র ।'[২৬৫] বস্তুতান্ত্রিক লেখক সংকীর্ণক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন বলেই তাঁর পক্ষে গভীর সত্যের উপস্থাপনা করা সম্ভব হয়না বলে নলিনীকান্ত গুপ্ত মনে করেন । তিনি বলেন, 'যে শিল্পী শুধু বাহির লইয়া আছেন, তাহাকে বাধ্য হইয়া বিশেষ দেশে বিশেষ কালের মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়-সে শিল্পের অপর নাম প্রত্নতাত্ত্বিক । ··· ········ রবিবর্ম্মার চিত্র কোনদিন বিশ্ব সভায় স্থান পাইবে না; কারণ সেখানে পাই শুধু খোলস, প্রাণ নাই, তাই সে খোলস কিম্ভুতকিমার বলিয়া অনেকের কৌতূহলটুকু উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু হৃদয় কখন স্পর্শ করে না । জোলা (*Zola*) বা গঁকুর (*Goncourt*) যদি সে সভায় স্থান পান তবে বস্তুতান্ত্রিকতার জন্য নয় । বস্তুতান্ত্রিকতা সত্ত্বেও স্থূলের ওপর জোর দিলেও, তাঁহারা স্থূল ছাড়া আর একটা জিনিসের কিছু সন্ধান পাইয়াছেন যাহা বিশ্বের কিছু আপনার, কিছু নিকটতর ।'[২৬৬]

২৬৩· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫৪।

২৬৪· নলিনীকান্তগুপ্ত, 'বিশ্বসাহিত্য' ''প্রবাসী'' (১৯ ঃ১ঃ ১, বৈশাখ ১৩২৬), পৃঃ ২৯।

২৬৫· পূর্বোক্ত, ২৯।

২৬৬· পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ দেশকালের বাস্তবতা উপস্থাপনা যে শিল্পীর লক্ষ্য প্রাবন্ধিক তাঁকে উপহাস করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক বলে। তাঁর মতে মহৎ ও আদর্শ হৃদয়ভাব যে-সাহিত্যের উপজীব্য তা-ই প্রকৃত ও মহৎ সাহিত্য, বাস্তবতানির্ভর সাহিত্য ওই মর্যাদালাভের যোগ্য নয়।

কয়েকজন আলোচক বাস্তবতাবাদ সম্পর্কে নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন। এই আলোচকেরা রক্ষণশীলদের মতো বাস্তবতাবাদের নামউল্লেখ করা মাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেননি। তাঁরা বাস্তবতাবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের অনেকেরই বাস্তবতাবাদীতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট ছিলো। অজ্ঞাতনাম একজন আলোচক "সাহিত্য"(১৩২০) পত্রিকায় বাস্তবতাবাদ সম্পর্কে নিরপেক্ষ সাধারণ আলোচনা করেন। তিনি 'রিয়ালিস্ট' লেখকের বৈশিষ্ট্য এবং 'রিয়ালিস্টিক' রচনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন। তিনি বলেন :

> সংসারে যাহা নিত্য যেমনভাবে ঘটিতেছে ঠিক তেমনইভাবে যে লেখক তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তিনিই *Realist*, বলিতে পার যে, তাহা হইলে উপন্যাস লেখক ত ইতিহাস লেখকে পরিণত হইলেন। কতকটা তাহা বটে, পরন্তু ইতিহাস লেখক ব্যক্তি-বিশেষ বা জাতিবিশেষের নামধাম উল্লেখ করিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, ঔপন্যাসিক কোনও পরিচিত বা জ্ঞাত ব্যক্তি বা বস্তুষ্টির নামধামেরও প্রকৃত উল্লেখ করিয়া বিবরণ লেখেন না। তিনি যাহা নিত্য দেখেন, শুনেন ও বুঝেন, তাহাই কতকটা নাটকের আকারে এমনভাবে ফুটাইয়া তোলেন, যাহা দেখিলে বা পাঠ করিলে মনে হয়, এমন বুঝি কোথায় দেখিয়াছি। এমন কি, উপন্যাস পড়িতে পড়িতে অনেক সময় এমন সকল পরিচিত লোকের নাম বা জীবনকথা মনে পড়ে, যে সকল মানুষকে বা সম্প্রদায়ের লোককে অনেকেই দেখিয়াছেন অনেকেই তাহাদের রীতিপদ্ধতির, আবার ব্যবহারের বিশিষ্টতার কথা জানেন। যাঁহার উপন্যাস পাঠ করিলে এমন সকল বাস্তব ঘটনার বাস্তব চিত্রের প্রতিচ্ছবি মানসপটে অঙ্কিত হয়, তাঁহারই উপন্যাস সকলকে *Realistic* বা বস্তুগতিক বলা যায়। এমিলজোলা এই শ্রেণীর প্রধান লেখক। আমাদের রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর বস্তুগতিক লেখক শ্রেণীর প্রধান।'[২৬৭]

২৬৭· অজ্ঞাতনাম, 'সহযোগীসাহিত্য', "সাহিত্য" (২৪ঃ ৫, ভাদ্র ১৩২০)পৃঃ ৪৬০-৪৬১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বাহ্যবাস্তবতা ও প্রাত্যহিক জীবনের অনুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনাকে বাস্তবতাবাদের বৈশিষ্ট বলে নির্দেশ করেন। অন্যদিকে অজিতকুমার চক্রবর্তী মনে করেন বাস্তবতা ও 'আর্টের বস্তুতন্ত্র' ভিন্ন ব্যাপার।[২৬৮] তাঁর মতে সমাজে নানা সমস্যা থাকে। সৃষ্টিশীল লেখকেরা তাঁদের রচনার প্রাথমিক উপকরণরূপে এসব সমস্যা গ্রহণ করেন এবং কল্পনার মিশ্রণে ওই বাস্তবতার নবরূপ দিয়ে থাকেন। ইবসেন প্রমুখ বাস্তবতাবাদীও একই কাজ করেছেন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, 'আর্টের রিয়ালিজম বা বস্তুতন্ত্রতা সমাজের বাস্তবতার সমিল নয়।'[২৬৯] তিনি মনে করেন 'আদর্শানুগত যে বাস্তবতা' তা-ই প্রকৃত বাস্তবতা। তিনি বাস্তবতাবাদকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। একটি হচ্ছে আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিজম বা আদর্শানুগত বাস্তবতা, অন্যটি হচ্ছে বিশুদ্ধ বাস্তবতা।[২৭০] মহীতোষ কুমার রায় চৌধুরীর মতে বাস্তবতাবাদী রচনায় সমাজের সকল স্তরের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনা ঘটে। তিনি বাস্তবতাবাদী ধারার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। বাস্তবতাবাদী ধারার লেখকেরা উচ্চ বিত্তের জীবনবাস্তবতার পাশাপাশি পতিত ও ঘৃণ্যদের জীবনবাস্তবতা উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে এ-শ্রেণীর লেখকেরা কল্পনাকে সম্পূর্ণ পরিহার করেন এবং প্রাত্যহিক বাস্তবতা নির্ভর করে সৃষ্টি করেন অসামান্য সাহিত্য। তিনি এ-ধারার প্রধান লেখকরূপে ব্যালজাককে নির্দেশ করেন।[২৭১]

১৩০০ (১৮৯৩) থেকে ১৩৩৩ (১৯২৬) পর্যন্ত সময়ে বাঙলা সাহিত্যে বাস্তবতাবাদের ভাগ্যে জুটেছে প্রবল ধিক্কার। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন এ-ধারার রচনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, তবে রক্ষণশীলদের উচ্চকণ্ঠ বিরোধিতার পাশে তা ছিলো দুর্বল। ওই সময়ের বাঙলাসাহিত্যে যা চলে তা হচ্ছে প্রথাগত জীর্ণ ভাববাদ ও বাস্তবতাবাদের দ্বন্দ্ব। ঔপন্যাসিকেরা বাস্তবতামনস্ক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন, আর প্রথাগত রক্ষণশীলেরা প্রবন্ধ ব্যঙ্গরচনার মধ্য দিয়ে আক্রমণ করতে থাকেন। ওই সময়ে বাস্তবতাবাদ যে-ভাবে আক্রান্ত হয়, তাতে এ-দেশে প্রথাগত ভাববাদের শেকড় কতো গভীর, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাববাদ এখানে দেখা দেয় নৈতিকতার মুখোশ পরে। এই ভাববাদীরা কপট ও বাস্তবতাবিরোধী। অকপটতা তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কথা-সাহিত্যিকেরা যৌনজীবন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে যখন বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চেয়েছেন, ভাববাদী রক্ষণশীলেরা তখন সমাজের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে বিভিন্ন

---

২৭০. ওই, পৃঃ ২১।

২৭১. মহীতোষকুমার রায় চৌধুরী, 'সাহিত্যে পতিত', "ভারতী" (৪০:৩, আষাঢ় ১৩২৭), পৃঃ ২৬২।

২৬৮. অজিতকুমার চক্রবর্তী, '[illegible] সাহিত্য সম্পর্কে [illegible]', "প্রবাসী" (১৭:২:১, কার্তিক ১৩২৪), পৃ. ১৯।

২৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচক এ-সব সত্য লুকিয়ে রাখার জন্য উপন্যাসিকদের পরামর্শদেন। একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীকালেও। ইংরেজি বিশ শতকের তৃতীয় দশকে আবির্ভূত নতুন প্রজন্মের কথাসাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম দিয়েও রক্ষণশীল ভাববাদীরা একইরকম আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের রচনায় উপস্থাপিত বাস্তবতা বিলাত থেকে আমদানীকৃত বলে ঘোষণা করা হয়, তাঁদের বাস্তবতামনস্কতাকে নানাভাবে আক্রমণ উপহাস করা হয়। এই কথাসাহিত্যিকদের আক্রমণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। বিস্ময়কর এই যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমালোচকেরা যেসব অভিযোগ এনেছিলেন, আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথও একই রকম অভিযোগ তোলেন।

৪.৭ আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বাস্তবতাবোধ ও বাস্তবতাবাদী বিতর্ক

বিশশতকের তৃতীয় দশকে একগোত্র তরুণ লেখকের হাতে আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের সূচনা ঘটে। "কল্লোল"(১৯২৩-২৭) পত্রিকা এই লেখকদের রচনা প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া "কালিকলম" (১৯২৬)"প্রগতি"(১৯২৭), "সংহতি"(১৯২৪)"উত্তরা"(১৯২৫)প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁদের লেখা প্রকাশিত হয়। এই তরুণ লেখকেরা বাস্তবতাঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোযোগী হন। তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রথাগত রক্ষণশীলদের কাছে অনৈতিক বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নতুন প্রজন্মের কথা সাহিত্যিকদের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে ওই সময়ের বাঙলা সাহিত্যের প্রধান অপ্রধান লেখক-সমালোচক-কবি প্রমুখেরা দুটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একগোত্র ওই নতুন ধারাকে অনৈতিক ও অবাস্তব বলে আক্রমণ করেন, অন্যগোত্র নতুন প্রজন্মের লেখকদের পক্ষে কথা বলেন। এক্ষেত্রে কথাসাহিত্য ও কবিতা দুইই উদ্দীপকের কাজ করে। এই নতুন প্রজন্মের লেখকেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যে আর্থ-সামাজিক রাজনীতিক প্রেক্ষাপটে বেড়ে উঠেছিলেন সেখানে প্রাচীন মূল্যবোধের জগতকে সত্য বা ধ্রুব বলে মেনে নেয়া সম্ভব ছিলোনা। তাছাড়া ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও তাদের চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বদল ঘটায়। এ-সময় ফরাসি, স্ক্যান্ডিনেভীয়, নরুইজীয়, হ্যাম্বেরীয়, রুশ প্রভৃতি সাহিত্য ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে থাকে এবং বাঙলাদেশেও তা সুলভ হয়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু"কল্লোল" (কার্তিক১৩৩৬) পত্রিকায় যে মন্তব্য করেন তা উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন, 'ফরাসি-রুশ-নরোয়েজীয় উপন্যাসগুলোর ইংরেজী তর্জমা বাঙলা দেশে যদি না ছড়াতো তবে একা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

Dhaka University Institutional Repository

সাধ্যি ছিলো না, দেশের তরুণতরুণীদের এমন *universal* প্রেমের মন্ত্রনা দেন।[২৭২] ওই তরুণ সৃষ্টিশীল লেখকেরা ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে আহরণ করেন বাস্তবতাবোধ ও মনস্তাত্ত্বিক চেতনা, তাঁরা লাভ করেন নতুন মূল্যবোধ, মিথুনমত্তি, বিবাহবোধ ইত্যাদি। এছাড়া রুশবিপ্লব, বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কারও এই তরুণদের চেতনা ও মূল্যবোধের বদল ঘটায়। তাঁরা সাহিত্যে ওই নতুন চেতনা ও মূল্যবোধের উপস্থাপনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন, আগ্রহী হন কথাসাহিত্যে বাস্তবতার সকল স্তরের উপস্থাপনায়। তাঁদের এই লক্ষ্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে "কল্লোলে"র (আষাঢ় ১৩৩৪) 'ডাকঘর' শীর্ষক প্রতিবেদনে; 'যে অবস্থায় দেশের সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহারই সূচনামাত্র আজ বাঙলাদেশে। দেশের ও সমাজের অবস্থাই তরুণের দলকে জর্জরিত করিতেছে, (যাঁহাদের মুখচাহিয়া তাহারা এ যন্ত্রনা ভুলিতে পারে) তাঁহাদের মুখেও কোনও উচ্চ আদর্শের জ্যোতি দেখিতে পায় না, আজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াই তাহারা এই নিষ্ঠুর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহাতে যদি গুরুজনদের মনকষ্ট হয়, বা কাহারও অপমানও হয় তাহাও তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত। তবু তাহারা তাহাদের সামর্থ্যমত এই অপকৃষ্ট রচনার ভিতর দিয়াই বাঙলার মুখ ফিরাইবে, যশোজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।'[২৭৩]

যদিও এই নতুন প্রজন্মের লেখকগোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিলো একটি নতুন সাহিত্য ধারার প্রবর্তন করা, কিন্তু এই নতুন সাহিত্য ধারার কোনো ইশতেহার তাঁরা তৈরি করেন নি। এদিকে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেই অন্নদাশঙ্কর রায় "কালিকলম" সম্পাদক মুরলীধর বসুর কাছে নতুন লেখকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন-' আমাদের সাহিত্যিকদের ম্যানিফেস্টো কই?'[২৭৪] তা সত্ত্বেও এই লেখকেরা ইশতেহার রচনার কোনো তাগিদ বোধ করেন নি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়(১৯০০-৭৫), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত(১৯০৩-৭৬) প্রেমেন্দ্র মিত্র(১৯০৪-৭৮) বুদ্ধদেব

---

২৭২. উদ্ধৃত, জীবেন্দ্রসিংহ রায় <u>আধুনিককবিতার মানচিত্র</u>, দে'জ পাবলিশিং (প্রথমপ্রকাশ: বৈশাখ ১৩৯৩) পৃঃ ১৩।

২৭৩. উদ্ধৃত, রবিন পাল, <u>"কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ,"</u> (গ্রন্থভূমি পাবলিশিং কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮০) পৃঃ ৩৭।

২৭৪. উদ্ধৃত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, "কল্লোলযুগ", (ডি,এম,লাইব্রেরী কলিকাতা (১৩৫৭, ব্যবহৃত সংস্করণ: চতুর্থ প্রকাশ ১৩৬৬) পৃঃ ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

বসু(১৯০৮-৭৪)প্রমুখকে আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের লেখক বলে অভিহিত করা যায়। আধুনিক কথাসাহিত্যের উন্মেষ ও প্রাথমিক পরিচর্যা ঘটে তাঁদের হাতে। আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮-৫৭)কে আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করা যায়। কথাসাহিত্যে তাঁদের আবির্ভাব ঘটে একটু দেরিতে এবং বাঙলা কথাসাহিত্য তাঁদের হাতে পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে। আধুনিক কথাসাহিত্যের সূচনাকারী শৈলজানন্দ অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র বুদ্ধদেব বসু ও অন্যান্যদের রচনায় উপস্থাপিত বাস্তবতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ রক্ষণশীলদের বিচলিত করে তোলে। ফলে এই লেখকগোত্রের রচনাবলী নিয়ে ১৩৩৩(১৯২৭)বঙ্গাব্দের শেষ পর্যায়ে শুরু হয় বিতর্ক-নিন্দা-সমালোচনা। আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের সূচনাকারী লেখকগোত্র তাত্ত্বিক ছিলেন না। কোনো প্রবন্ধ-আলোচনা-সমালোচনায় তাঁদের বাস্তবতামুখী দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন নি তাঁরা, এমন কী রক্ষণশীল প্রতিপক্ষের সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিতর্কেও জড়িত হয়ে পড়েন নি তাঁরা। তাঁরা সৃষ্টিশীল ছিলেন। এবং তাঁদের সাহিত্য-কর্মই যেন তাঁদের প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় জ্ঞাপন করে। তবে তাঁদের অনেকে নানাপ্রসঙ্গে নানামন্তব্য করতে গিয়ে সাহিত্যের বাস্তবতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। সব মন্তব্য থেকেই এই লেখকদের বাস্তবতা ধারণা ও সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে যে-মন্তব্য করেন তা উন্মেষকালের কথাসাহিত্যিকদের বাস্তবতাধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি বলেন যে আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের সূচনা-কারী লেখকেরা অভিজাত জীবনবাস্তবতার গণ্ডির বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়েছেন, তাঁরা উপস্থাপনা করতে চেয়ে-ছেন 'অপজাত'দের জীবনবাস্তবতা।[২৭৫] কারণ তাঁদের লক্ষ্য ও 'সাধনাই ছিলো নবীনতার, অনন্যতার সাধনা। যেমনটি আছে ঠিক তেমনটিই ঠিক আছে এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি'[২৭৬] এ- কারণেই 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল "কল্লোল"। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলেকায়।'[২৭৭] সমাজের অন্তঃজ রসাতলের বাসিন্দাদের

---

২৭৫. অচিন্ত্যকুমারসেনগুপ্ত, <u>কল্লোলযুগ</u>, পৃঃ ৫১।

২৭৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫০।

২৭৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনবাস্তবতা যেমন তাঁদের সাহিত্যে উপজীব্য হয়েছে, দারিদ্র্য ও কায়ক্লেশপূর্ণ নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনবাস্তবতার রূপায়ণেও তাঁরা মনোযোগী হন। অর্থাৎ বাস্তবতার সকলস্তরের উপস্থাপনা তাঁদের লক্ষ্য ছিলো। নিজেদের প্রবণতা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার বলেন,'কল্লোলে এই দুইটি বিচিছন্ন ধারা ছিল। একদিকে রূক্ষ-শুষ্ক শহুরে কৃত্রিমতা, অন্যদিকে অনাঢ্য গ্রাম্য জীবনের সারল্য। বস্তি বা ধাওড়া, কুঁড়েঘর বা কারখানা, ধানখেত বা ড্রইংরুম। সমস্ত দিক থেকে একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ। যতটা শক্তিসাধ্য, শুধু ভবিষ্যতের ফটকের দিকে এগিয়ে দেওয়া।'[২৭৮] সমাজদেহের ক্ষতস্থান অনাবৃত করে সমাজকে ক্ষতমুক্ত করার পক্ষপাতী তাঁরা। অচিন্ত্যকুমার এ-প্রবণতাকে নির্দেশ করেন এ-ভাবেঃ 'মিথ্যার পাশকাটিয়ে নয়। মিথ্যার মূলোচ্ছেদ করে সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াও। শাখায় না গিয়ে শিকড়ে যাও, কৃত্রিম ছেড়ে আদিমে; সমাজের গায়ে যেখানে যেখানে সিল্কের ব্যান্ডেজ আছে তার পরিহাসটা প্রকট করো। যারা পতিত, পীড়িত, দরিদ্রিত, তাদেরকে বাঙ্ময় করে তোলো। নতুনের নামজারি করো চারিদিকে।'[২৭৯] আধুনিক কথাসাহিত্যের এই সূচনাকারীরা বাস্তবতাবাদী উপন্যাসেরধারা সৃষ্টির তাগিদে অভিজাত জীবনবাস্তবতার গন্ডির বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেন নি; তাঁরা 'অপজাত',নিম্নমধ্যবিত্ত, 'বস্তি ধাওড়া'র জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা করেন অনন্য ও অগ্রগামী হয়ে ওঠার তাগিদে, বাস্তবতাবাদী হয়ে ওঠার তাগিদে নয়। অনন্য ও অগ্রগামী হয়ে ওঠার তাগিদেই তাঁরা সরে আসতে চেয়েছেন ভাববাদ - রোমান্টিকতা থেকে, প্রবেশ করতে চেয়েছেন নগ্ন বাস্তবতায়। তাই বাস্তবতার সকল অক্ষেত্র উপস্থাপনা তাঁদের লক্ষ্য ছিলো। কৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্মনামে প্রেমেন্দ্র মিত্র "কল্লোল" পত্রিকায় এই লেখকদের বাস্তবতামনস্কতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে তাঁরা পূর্বসূরীদের মতো সাহিত্যে অভিজাতদের কাহিনী বর্ণনাতে মগ্ন থাকতে চান না। দারিদ্র ক্লেদ কলুষময় বস্তিজীবনের উপস্থাপনাকেও তাঁরা অকুণ্ঠ। তাঁরা সমাজের অস্বস্তিকর সত্যকে এড়িয়ে যেতে রাজি নন। দারিদ্র্যনামক সত্য সম্পর্কে ভাবালুতাপূর্ণ কবিত্ব না করে তাঁরা চেয়েছেন দারিদ্র্যকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে। তাঁরা বিশ্বাস করেন অনুর্গত

---

২৭৮. পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৩।

২৭৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ঐশ্বর্যে এই দরিদ্র শ্রেণীটি অভিজাত সম্প্রদায়ের সমতুল্য। তিনি বলেন :

'সবচেয়ে তাদের বড় অপরাধ, তারা নাকি সাহিত্যে আভিজাত্য মানে না। মুটে মজুর কুলি খালাসী দারিদ্র্য বস্তি ইত্যাদি যেসব অস্বস্তিকর সত্যকে সর্দি, বাত, স্থূলতা ইত্যাদির মতন অনাবশ্যক অথচ অপরিহার্য বলে জীবনেই কোনরকমে ক্ষমা করা যায় – এবং বড়জোর কবিতায় একবার-'অন্নচাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু' ইত্যাদি বলে আলগোছে হা হুতাশ করে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তারা সাহিত্যের স্বপ্নবিলাসের মধ্যে সে সবও নাকি টেনে আনতে চায়।

শুধু তাই। বস্তির অন্দরের জীবনধারাকে তারা প্রায় 'গ্যারেজ'ওয়ালা প্রাসাদের অন্দরালের জীবনধারার মত সমান পঙ্কিল মনে করে। এমন কি, তারা মানে যে প্রাসাদপুষ্ট জীবনের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য সময়ে সময়ে বস্তির জীবনকে ধরি-ধরিও করে।'[২৮০]

কথাসাহিত্যে রসাতলের জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনাকে এই আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের কাছে গণ্য হয়েছে 'বাস্তবতা সম্বন্ধে সরল নির্ভীকতা ও অপধ্বস্ত জীবনের প্রতি সশ্রদ্ধ সহানুভূতি' রূপে।[২৮১]

তবে এই লেখকেরা যতোটা বাস্তবতাবাদী, তারো চেয়ে বেশি তাঁরা ভাবালুতাবাদী। বাস্তবতার সকলস্তর নির্ভর সাহিত্যসৃষ্টির কথা বললেও, তাঁরা নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ ভাবে বাস্তবতার উপস্থাপনায় ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষাপ্রবণ মন তাঁদের ছিলো না। এই সূচনাকারী কথাসাহিত্যিকেরা ছিলেন প্রবল ভাবালুতাগ্রস্ত রোম্যান্টিক। তাঁরা বাস্তবতাবাদী সাহিত্যধারা সৃষ্টির তাগিদে বাস্তবতামনস্ক হয়ে ওঠেননি, পূর্ববর্তী প্রজন্মের লেখকদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও অনন্য রূপে চিহ্নিত করার রোম্যান্টিক প্রেরণাই তাঁদের বাস্তবতামনস্ক করে তোলে। তাঁদের এই উদ্যোগের ফলে বাঙলা কথাসাহিত্যের বিষয়সীমা বিস্তৃত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়নির্ভর আধুনিক কথাসাহিত্যের সূচনাকারীর মর্যাদা তাঁদের প্রাপ্য, কিন্তু বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের সূচনাকারীর মর্যাদা তাঁদের প্রাপ্য নয়। আধুনিক কথাসাহিত্যের সূচনাকারী এই লেখকেরা চেয়েছেন একই সঙ্গে রসাতলের বাস্তবতার চিত্রন এবং রসাতলের মানুষের অন্তর্গত উন্নতমানবিক বোধ ও মহিমা

---

২৮০. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৭।

২৮১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ, পৃঃ ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশ করতে। বাস্তবতার সকল স্তরের অনুপুঙ্খ নিরাবরণ উপস্থাপনা নয়, তাঁদের মূল লক্ষ্য ওই রসাতলের পশু-মানুষদের অন্তর্গত মানবিক মহিমা নির্দেশ। ওই পর্যায়ের গল্পকার যুবনাশ্ব-এর গল্পে উপস্থাপিত রূঢ়-বাস্তবতা পশুমানুষদের বৃত্তান্ত ও তাদের অন্তর্গতমাহাত্ম্য অচিন্ত্যকুমারের কাছে প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। যুবনাশ্বের প্রশংসা করে অচিন্ত্যকুমার বলেন, 'যে জীবন ভগ্ন, রুগ্ন, পর্যুদস্ত, তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিলে, জায়গা দিলে প্রথম শ্রেণীতে। তাদের নিজেদের ভাষায় বললে তাদের যত দগদগে অভিযোগ, জীবনের এই খলতা এই পঙ্গুতার বিরুদ্ধে কশায়িত তিরস্কার। দেখালে তাদের ঘা, তাদের পাপ, তাদের নির্লজ্জতা। সমস্ত কিছুর। সমস্ত কিছুর পেছনে দয়াহীন দারিদ্র। আর সমস্ত কিছু সত্ত্বেও একটি নিষ্কলঙ্ক ও নীরোগ জীবনের হাতছানি।'[২৮২] এ-মন্তব্য থেকে সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ে অচিন্ত্যকুমারের যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তা হচ্ছে -(ক) সাহিত্যে ক্লেদাক্ত জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা হতে পারে; (খ) কিন্তু ওই ঘা ও পাপময় বাস্তবতার উপস্থাপনাতেই 'সীমাবদ্ধ থাকবেন না লেখক। তাঁর লক্ষ্য হবে পাপী ও পশুমানুষদের অন্তর্গত মহিমা নির্দেশ করা। প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁর "কুয়াশা"(প্রথম প্রকাশ, "মাসিক প্রবর্তক," ১৯৩০-৩২)উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে উপন্যাসে বাস্তবতার উপস্থাপন সম্পর্কে একই রকম ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি সাহিত্যে 'ভাবসমৃদ্ধ বাস্তবতা'-য় বিশ্বাসী। তিনি আকঁড়া বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন, তিনি পছন্দ করেন বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণ। প্রেমেন্দ্র মিত্রবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার প্রবণতাকে অভিহিত করেন'নীরস কট্টর বাস্তবতাবাদী' প্রবণতা বলে।[২৮৩] তিনি বলেন, 'ভাবসমৃদ্ধ বাস্তবতাই জীবনের কথা নয় কি? ভাবনা থাকলে বাস্তব ফুটে উঠতে পারে কি? সস্তা ভাবালুতাকে অবশ্যই সমর্থন করা যায়না। নীরস কট্টর বাস্তববাদী বোধ হয় কেউই নয়। জীবনকে গভীরভাবে ভালো না বাসলে তাকে জানা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং ও-দুটি বিরোধী ভাব নয়।'[২৮৪] বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রনকে তিনি নির্দেশ করেছেন 'ভাবসমৃদ্ধ বাস্তবতা' বলে

---

২৮২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০।

২৮৩. উদ্ধৃত, 'তথ্যপঞ্জি ও গ্রন্থপরিচয়', প্রেমেন্দ্ররচনাবলী(দ্বিতীয়খণ্ড), (গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ কলিকাতা, প্রথমপ্রকাশ ১৩৮৩) পৃঃ ১৪৬,

২৮৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

এবং ভাববাদ ও বাস্তবতাবাদ পরস্পর বিরোধী ভাব নয় বলেই তিনি মনে করেন। তাঁর এ-দৃষ্টিভঙ্গী ভাববাদী।

বুদ্ধদেববসুর 'অতিআধুনিক বাঙলা সাহিত্য'("প্রগতি"১৩৩৪)প্রবন্ধেও একইরকম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এ-প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু রসাতলের বাসিন্দারে 'পাঁকের পোকা' বলে অভিহিত করেন। বুদ্ধদেবের মতে এই পাঁকের পোকাদের ক্লেদাক্ত জীবনবাস্তবতা নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টি আধুনিক লেখকদের লক্ষ্য হলেও, লালসা, হীনতা ও ক্লেদপূর্ণ ওই জীবন বাস্তবতার পরিচয় দেয়াই এই লেখকদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। এই পশুমানুষদের অন্তর্গত হৃদয়াবেগ বা মহিমা নির্দেশই তাঁদের লক্ষ্য।[২৮৫] বুদ্ধদেব যুবনাশ্বের "পটল ডাঙাঁর পাঁচালী" গ্রন্থটিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে ওই গ্রন্থে কুৎসিত ও পাপময় জীবনের উপস্থাপনা লেখকের গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য ওই পাপীদের অন্তর্গত সৌন্দর্য নির্দেশ। তিনি বলেন যে 'আগাগোড়া কৃমিসংকুল পাঁকে' যুবনাশ্ব স্নেহের বৃন্তের ওপর মানবিক কোমলতার পদ্ম ফুটিয়েছেন।[২৮৬] বুদ্ধদেব আধুনিক লেখকদের প্রবণতা ব্যাখ্যা করে বলেন, 'অত্যন্ত নীচ ও পতিত যারা তাদের সহস্র কুশ্রীতা অতিক্রম করেও যে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দরের জন্য অভিলাষ ব্যাকুল হয়ে উঠতে পারে, এই কথাটি অনেকআধুনিক লেখকই নানাভাবে বলতে চাচ্ছেন, দেখতে পাই। সকল অ:পতন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমস্ত অত্যাচার সত্ত্বেও যে তারা মানুষ, একথা স্বীকার করবার মত উদারতা তাঁদের আছে।'[২৮৭] বুদ্ধদেব বসুর এমন্তব্যে আধুনিক সাহিত্যের সূচনাকারী লেখকগোষ্ঠের রোম্যান্টিক ভাববাদী প্রবণতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু মনে করেন সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন না করাই হচ্ছে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম শর্ত। দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে(১৯৩৩)বুদ্ধদেব শিল্পকলার বাস্তবতা প্রসঙ্গে এ-মন্তব্য করেন। তিনি মনে করেন আর্টের জাদুতে যে কোনো সাধারণ অসাধারণে রূপান্তরিত হতে পারে কিন্তু লেখককে অবশ্যই সম্ভাব্যতার সীমানার মধ্যে অবস্থান করতে হবে। নতুবা ওই রচনা ও চরিত্র হয়ে উঠবে বানোয়াট ও অবিশ্বাস্য। বুদ্দদেব বলেন, 'কথাটা হচ্ছে এই যে কোন চরিত্রকে যেভাবে কল্পনা করবো, তার অনুযায়ী রচনা করবো সেই কল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে। এটা আর্টের অত্যন্ত... গোড়াকার কথা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জীবনরীতি ...

২৮৫. বুদ্ধদেববসু 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', বুদ্ধদেববসুর রচনাসংগ্রহ (তৃতীয়খণ্ড), পৃ. ৫৫৬।

২৮৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৭।

২৮৭. পূর্বোক্ত , পৃঃ ৫৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন চিন্তাধারা,ভাষার বিভিন্ন ভঙ্গি। বালিগঞ্জ নিবাসী কোনো ব্যারিস্টার পত্নীকে ব্যঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে তার মুখে আমি গ্রাম্য স্ত্রীলোকের শপথ বুলি বসাবো না। কোনো খোলার ঘরের গণিকার অন্তরের গোপন নারীত্ব উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তাকে দিয়ে ভালোবাসার গূঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করাবো না। মাত্রজ্ঞান যদি কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত না করে, তাহলেই পাগলামিতে গিয়ে পৌঁছবার আশঙ্কা থাকে।'[২৮৮]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন বাহ্যবাস্তবতা ও প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার অবিকল অনুপুঙ্খ বিবরন রচনাই বাস্তবতাবাদী সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র শর্ত নয়। প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার বিবরণ রচনার পাশাপাশি লেখককে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে সমসাময়িক সমাজ-রাজনীতি-প্রতিবেশ এবং জীবনের সঙ্কটকে। তবেই কোনো রচনা প্রকৃত বাস্তবতাবাদী রচনা হয়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, 'কথাসাহিত্যে, গল্প-উপন্যাস নাটকে জীবন লীলাই প্রধান মুখ্য বস্তু। ····· কিন্তু জীবনের পশ্চাতে তো স্থান ও কাল আছে। রাজনীতি সমাজনীতির সঙ্গে স্থানকালের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সূর্য্যস্থির আছে, গতিশীল পৃথিবী বিবর্ত্তিত, হচ্ছে, চলছে; ফলে বর্ণ ও উত্তাপের বিভিন্নতায় প্রভাত ও সন্ধ্যার লীলা রূপান্তরিত হচ্ছে - কালোজলের বুকে পদ্মের পাপড়ি খুলে যাওয়া এবং মুদ্রিত হওয়ার মধ্যে। মানুষের জীবন লীলাও তো তেমনি ধারা সাময়িক রাজনীতি সমাজনীতির সঙ্গে আপেক্ষিক। বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ যেমন বেদনা পেয়েছে, তেমনি বেদনা সে পেয়েছে রাজনীতি ও সমাজনীতিনিয়ন্ত্রিত তার স্বজন তার প্রতিবেশী তার দেশবাসী এবং অন্য দেশবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে। বরং এ-বেদনা আরও প্রগাঢ় আর গভীর। কারণ, মানুষের যে কল্পলোক তার সঙ্গে তার কালের ও দেশের সর্ব্ববিধ নীতি বা বাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। একটা অপরটার প্রতিফলন। আত্মিক বহিঃপ্রকাশ। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই মানুষের বিকাশ ঘটে।'[২৮৯] অর্থাৎ তিনি শুধু জীবন বাস্তবতার বিবরণ রচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান না, তিনি সমকালের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থারও অনুপুঙ্খ বিবরণ রচনার পক্ষপাতী। বাস্তবতাবাদী রচনায় উপস্থাপনা ঘটে বলে তিনি মনে করেন। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতা নিয়ে স্বস্তিবোধ করেন নি।

---

২৮৮. বুদ্ধদেববসু 'আর্টে রিয়ালিজম', বুদ্ধদেববসুর রচনাসংগ্রহ (পঞ্চমখণ্ড), (গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ প্রপ্র মাঘ ১৩৮৪) পৃঃ ৪৮৩-৪৮৪।

২৮৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ', "বসুমতী" (২৩:২:৫, ফাল্গুণ ১৩৫১) পৃঃ ৩৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে ক্লেদাক্ত বাস্তবতার নগ্ন উপস্থাপনাকে তিনি হীন কর্মরূপে গণ্য করেন। অশোধিত বাস্তবতার উপস্থাপনামূলক রচনাকে তিনি মহৎসাহিত্য বলে গণ্য করেন নি, ওই শ্রেণীর রচনাকে তিনি এমন কী সাহিত্যসৃষ্টি বলেও মনে করেন না। তিনি বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রনে সাহিত্যসৃষ্টিকরার পক্ষপাতী। সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সাহিত্য সমাজের মাপকাঠি। সমাজের বাস্তবপটভূমিতে যে রসশিল্প রচিত হয়, শিল্পী মানসের প্রকাশভূমি যাহা, তাহাই সাহিত্য। রাজনীতি আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র সবচেয়ে বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। সমাজের বেশীর ভাগ লোক সকালে উঠে পড়েন দৈনিক খবরের কাগজ। তাতে যে আস্বাদ পান, সাহিত্যের মধ্যেও কি তাকেই খুঁজতে হবে?'[২১০] তিনি মনে করেন দুঃখকষ্ট, দারিদ্রক্লেদপূর্ণ বাস্তবতার বিবরণ দেয়া মহৎসাহিত্যের কাজ নয়, সাহিত্য মহাবেদনা ও মহৎ আনন্দের বাণী বহন করবে। প্রাত্যহিক বাস্তব উপাদান নির্ভর করেই কোনো রচনা গড়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন, তবে বাস্তবতার বৃত্তান্ত বর্ণনাই ওই রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, ওই রচনা জীবনে ধ্রুব আদর্শ ও মহৎ আনন্দের বাণী বহন করে আনবে। তিনি বলেন, 'সাহিত্য আমাদের মনকে অমৃত রসদ্বারা বলবান করচে। ...... সাহিত্য আমাদের পরিচিত করবে জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গে, দেবে আমাদের উদার মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি, সকল সুখদুঃখের উর্দ্ধে যে অসীমঅবকাশ ও তৃপ্তি, আমাদের পরিচিত করবে সেই অবকাশ ও তৃপ্তির সঙ্গে। .... যে জ্যোতির মধ্যে বিশ্বদেবের কল্যাণতমমূর্তি অধিষ্ঠিত, আমরা যেন দেবতার সেই জ্যোতিকে – দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহত্তর অনুভূতি ও ভাবকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শন করি।'[২১১] এমন ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী অন্নদাশঙ্কর রায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। "বিনুরবই"(১৯৪৪)নামক আত্মচরিতমূলক গ্রন্থে বাস্তবতাসম্পর্কে তাঁর ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিনু জানেনা বাস্তবজগৎ আসলেই অপূর্ণ ও খণ্ডিত কিনা, তবে সে বিশ্বাস করে বাহ্যবাস্তবতা খণ্ড ও অপূর্ণ। 'সাধারণ বাস্তবসত্য বলে যা বিকোয় তা বিনুর মতে অপূর্ণ সত্য।'[২১২] বিনু পরম ও পূর্ণ বলে গণ্য করে দর্শনের 'রিয়ালিটি'কে।[২১৩] বিনু সাধারণ বাস্তবতাকে গণ্য করে 'গুড়'রূপে

---

২১০. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে বাস্তবতা', বিভূতিরচনাবলী (দ্বাদশখণ্ড), (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রথ, ফাল্গুন ১৩৭৯) পৃঃ ৩৫৯।

২১১. ওই, পৃঃ ৩৫৯,

২১২. অন্নদাশঙ্কর রায়, 'বিনুরবই', প্রবন্ধ (ডি,এম,লাইব্রেরী কলিকাতা, প্রথ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪/১৩৭১) পৃঃ ৫৫৮।

২১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

আর পরম ধ্রুব অমৃতময় 'রিয়ালিটি'কে গণ্য করে 'মধু'রূপে। বাস্তবতা সম্পর্কে বিনুর এই ধারণার মধ্যদিয়ে বাস্তবতার প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিনু বলে, '........ রিয়ালিটিকে তার দরকার বলে রিয়ালিজমে অনাস্থা, মধু চায় বলেই সে গুড় দিয়ে কাজ সারে না। তবে পৃথিবীতে গুড়ও থাকবে গুড়ের চাহিদাও থাকবে, এমন মানুষও থাকবে যারা গুড় পেলে মধুচাইবে না।'[২১৪]

আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের সূচনাকারী লেখকগোষ্ঠের বিচিত্র বাস্তবতানির্ভর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রবণতা রক্ষণশীলদের ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে তোলে। ওই লেখকদের রচনার বিষয়বস্তু ও রচনারীতি রক্ষণশীলদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর বলে প্রতিভাত হয়। ওই সময়ের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আধুনিকদের আক্রমণ করে রচিত অসংখ্য প্রবন্ধ-ব্যঙ্গ রচনা মুদ্রিত হয়। প্রবল রক্ষণশীল পত্রিকা "শনিবারের চিঠি"এ-ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আধুনিক কথা সাহিত্যিকদের পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে প্রথাগত রক্ষণশীলেরা যে-ভাবে আক্রমণ ও বিষোদ্গার করেছেন, আধুনিকদের ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটেছে। আমাদের কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় এক প্রজন্মের পর নতুন আরেক প্রজন্মের লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু বরাবরই রক্ষণশীল সমালোচকদের অভিযোগ ও আক্রমণের ধরন থেকেছে একই রকম। তবে এ-পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথও রক্ষণশীল সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পৌষ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে অমল হোম 'অতি আধুনিক কথাসাহিত্য'নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ-প্রবন্ধটির মধ্য দিয়েই আধুনিকদের বিরুদ্ধে নিন্দা-আক্রমণ-বিষোদগারের সূচনা ঘটে। সজনীকান্ত দাসের মতে অমলহোমের আগে "শনিবারের চিঠি"ই আধুনিকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায়ই এই পত্রিকা 'অতিআধুনিক সাহিত্যের ন্যাকামি ও সম্পর্ক বিরুদ্ধ যৌন আবেদনের বিরুদ্ধে' প্রথম অভি-যান চালায়।[২১৫] সজনী-কান্তের মতে এ-অভিযান শুধু আধুনিকদের বিরুদ্ধে "শনিবারের চিঠি"-রই প্রথম অভিযান নয়, ~~বাঙলাসাহিত্যেরও প্রথম আধুনিকদের বিরুদ্ধে "শনিবারের চিঠি"-রই প্রথম অভিযান নয়~~, বাঙলা সাহিত্যেরও প্রথম প্রকাশ্য অভিযান এটি।[২১৬] আধুনিক কথাসাহিত্যকে নিন্দা করে রচিত নানা সমালো-

---

২১৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৮।

২১৫. সজনীকান্ত দাস আত্মস্মৃতি (১মখণ্ড), ডি,এম, লাইব্রেরী কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ২২৮।

২১৬. ওই, পৃঃ ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

চনাপ্রবন্ধ-ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রভৃতির বক্তব্য ও আক্রমনের ধরণ প্রায় অভিন্ন। আধুনিকসাহিত্যকে রক্ষণশীলেরা অশুচি, অনৈতিক, অশ্লীল ও নকল বলে মনে করেন। তাঁদের মতে এ-সাহিত্য বিজাতীয়, তাই অবাস্তব। রক্ষণশীল গোত্র সমাজে আধুনিক সাহিত্যের কুপ্রভাব লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং আধুনিকসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যেকের ধারণা হচ্ছে এ-সাহিত্য বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ মাত্র। তাঁদের মতে আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতা স্বপ্নবিলাস এবং বাস্তবতা উপস্থাপনার নামে তাঁরা নোংরা ও কদর্যের উপস্থাপনা করেছেন মাত্র। রক্ষণশীলেরা মনে করেন নগ্ন নিরাবরণ বাস্তবতানির্ভর সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যই নয়। রক্ষণশীল আলোচকদের অনেকে পাশ্চাত্য রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম-এর আলোচনা করে এ-ধারা দুটির সংকীর্ণতা ও সমাজে এর কুপ্রভাব নির্দেশেও তৎপর হয়েছেন।

রক্ষণশীলেরা আধুনিকসাহিত্যকে নানা কুঅভিধায় অভিহিত করেন। আধুনিকসাহিত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই তাঁরা এই কুঅভিধা প্রয়োগ করেন। আধুনিক কথা সাহিত্যিকদের অমলহোম প্রথম ("ভারতবর্ষ" মাঘ ১৩৩৩) অভিহিত করেন 'অতিআধুনিক' বলে। 'অতিআধুনিক'দের সাহিত্যসৃষ্টিকে তিনি অভিহিত করেন 'কৃত্রিম ভাববিলাস', 'ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম', 'যৌন সম্বন্ধীয় বাস্তবতা' ও 'নবকামায়ন' বলে। কারো মতে আধুনিক সাহিত্য 'স্থূল ইন্দ্রি-বাদ' ও 'প্রাণহীন উগ্র-বাস্তবতাবাদ'-এর সমষ্টিমাত্র ("ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) আধুনিক কথাসাহিত্য হচ্ছে শুধুই 'একপ্রকার খিচুড়ি সাহিত্য' এবং 'কামেশ্বরমার্কা' সাহিত্য। ("ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৪২) অনেকে এ-সাহিত্যকে অভিহিত করেন 'তামাসিক সাহিত্য' ("ভারতবর্ষ," আশ্বিণ ১৩৫২) ও 'তরল-সাহিত্য' ("বঙ্গবাণী", অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) বলে। আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের 'ছাগসাহিত্যিক' ("বসুমতী", আষাঢ় ১৩৩৬) ('কালের হাওয়ায় মাটি ফুঁড়িয়া গজানো প্রতিভা', ভুঁইফোঁড় প্রতিভাধর (ওই, চৈত্র ১৩৩৬), 'কালাপাহাড়' (ওই মাঘ ১৩৩৯), "ছাগতন্ত্রী" (ওই, শ্রাবণ ১৩৪৩), 'যৌনবিকারগ্রস্থ, (ওই ফাল্গুন ১৩৪৩), 'সবজান্তা' (ওই, আশ্বিণ ১৩৫১), 'আরশোলার দাপাদাপি' ("বিচিত্রা" শ্রাবণ ১৩৫২), 'বস্তুহীন বস্তুতন্ত্রতার পরিপোষক', 'হীনবার্ণা সম্প্রদায়', 'মিথ্যাচারী ও মিথ্যাভাষী, (বঙ্গশ্রী বৈশাখ ১৩৪১), 'নর্দ্দমা ইন্সপেক্টার', 'পাগলা গারদের পরিদর্শক' ("প্রবাসী", মাঘ ১৩৪১) প্রভৃতি কুঅভিধায় অভিহিত করা হয়। কারো মতে আধুনিক কথাসাহিত্য রচিত হচ্ছে 'সস্তায় নাম কেনা আর অভিনবত্বের প্রলোভনে।' ("বিচিত্রা" আষাঢ় ১৩৩৫) কারো মতে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের পরিমণ্ডল পরিণত হয়েছে 'কামবিলাসের প্রেতলোক-'এ ("বিচিত্রা" শ্রাবণ ১৩৩৫)। রক্ষণশীলদের কারো কারো মতে আধুনিক কথাসাহিত্য 'অস্বাস্থ্যকর সাহিত্য' (বিচিত্রা", আষাঢ় ১৩৩৫) ও 'কুৎসিৎ' (ওই শ্রাবণ ১৩৩৫)। অনেকে এ-সাহিত্যকে 'ছাগসাহিত্য' (বসুমতী আষাঢ় ১৩৩৬) 'বামরুম বা অসংযত সাহিত্য', 'আবর্জ্জনাময় সাহিত্য', 'জঘন্য ও অমেধ্য রচনা, 'পঙ্কিল কুৎসিত প্রবৃত্তির উদ্দীপক' (ওই, মাঘ ১৩৩৯); 'পুতিগন্ধময় আবর্জ্জনারূপী', উচ্ছৃঙ্খল, 'বস্তিসাহিত্য', 'আবর্জ্জনাময় নর্দ্দমা', 'যৌন জঞ্জাল' (ওই ফাল্গুন ১৩৪৩) 'প্রলাপ ও বিলাপের সমষ্টি' (ওই, বৈশাখ ১৩৪৯), 'পদ্যভুক সাহিত্য' ("বিচিত্রা" শ্রাবণ ১৩৪০)

Dhaka University Institutional Repository

'অপক্ক ও অকালপক্ক'("বঙ্গশ্রী"বৈশাখ ১৩৪১) বলে চিহ্নিত করেন। কেউ কেউ আধুনিক সাহিত্যের কালকে চিহ্নিত করেন 'অর্বাচীন যুগ'রূপে ("বসুমতীফাল্গুন ১৩৪৩)। আধুনিক কথাসাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে কেউ তুলনা করেন 'সরস্বতীর কমলবনে পাশব বপ্রক্রীড়া (ঐ, ওই)-র সঙ্গে। কারো মতে আধুনিক লেখকেরা 'পারস্পরিক স্তুতিবাদসংঘ 'প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের সাহিত্যকর্মকে'ঢাকের পাবলিসিটি' বলে অভিহিত করা যায়, তুলনা করা হয় 'জেলে পাড়ার সং-এর সঙ্গে। (ওই, আশ্বিন ১৩৩১)আধুনিকদের রচনায় বাস্তবতার সকল সুরের নগ্ন নিরাবরণ উপস্থাপনা ঘটেছে বলে রক্ষণশীলেরা আধুনিক লেখকদের তীব্র তিরস্কারও করেন।

অমলহোম আধুনিক কথাসাহিত্যের সূচনাকারী লেখক গোত্রকে বিদ্রুপ করে 'অতি আধুনিক' আখ্যা দেন। তিনি 'অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' ("ভারতবর্ষ" মাঘ১৩৩৩)প্রবন্ধে আধুনিক কথাসাহিত্যকে "কৃত্রিম ভাববিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলা-কৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন অনুভূতির মায়াকান্না' বলে মনে করেন।[২১৭] তাঁর মতে আধুনিক লেখকেরা বাস্তবতা উপস্থাপনার নামে 'কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রেমবিলাস' করছেন মাত্র, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিচিত্র সমস্যা ও নিগূঢ় রসরহস্য এ-সাহিত্যে রূপায়িত হয় নি। আধুনিকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে ওই লেখকেরা বাস্তবতার নামে রসরহস্যবিহীন কতগুলো সত্যঘটনার বিবরণ রচনা করছেন।[২১৮]তিনি বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষপাতী। তাঁর মতে ওই লেখকেরা স্থূল প্রেমকাহিনী লিখেছেন মাত্র, বাস্তব প্রণয়কাহিনীর মধ্যে চিরন্তন আনন্দবেদনার আভাস সঞ্চারিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি মনে করেন ওই লেখকেরা বিকৃত প্রেমের গল্প বলেছেন। আধুনিকদের প্রণয়বোধকে বিকৃত, অসুস্থ ও অস্বাস্থ্যকর বলে তিনি মনে করেন, কারণ এখানে কাম ও দেহবাসনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এই লেখকদের রচনায় প্রেমকে তপস্যার আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হতে দেখা যায় না। তারমতে আধুনিকেরা বাস্তবতাউপস্থাপনার নামে ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্ধ-অনুকরণ করছেন। তাঁদের রচনায় যে হৃদয় সঙ্কট, দরিদ্রজীবন ও সমস্যার রূপায়ণ দেখা যায় তা ইউরোপীয় বাস্তবতা ও সমাজসমস্যার অন্ধ-অনুকরণমাত্র। তাঁরমতে আধুনিকদের এই বাস্তবতাবোধ

---

২১৭. অমলহোম, 'অতিআধুনিকবাংলা কথাসাহিত্য' "ভারতবর্ষ" (১৪:২:২, মাঘ১৩৩৩)পৃঃ ২৮৭।

২১৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

দুঃসহসাধনা ও দুঃখের নিদারুন দহনের মধ্য দিয়ে জন্মে নি। এই বাস্তবতাবোধ ইউরোপ থেকে ধার করা বলেই এর শক্তিক্ষয় ও গতি আড়ষ্ট। তিনি বলেন যে বাঙালী তরুনেরা সমাজের নিম্নতলের সমস্যাকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে হৃদয় দিয়ে দেখেননি, দেখেছেন বুদ্ধি দিয়ে, ফলে তাঁদের রচনার বাস্তবতা শুধুমাত্র বাহ্যবাস্তবতার কুশ্রী ও কদর্য দিকের বর্ণনামাত্র হয়ে আছে। তাতে মানবাত্মার মহিমা ও অনন্যতা ফুটে ওঠেনি।[২৯৯] এখানেই বাস্তবতা-সৃষ্টিতে আধুনিকদের ব্যর্থতা বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ বাহ্যবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা তাঁর কাছে বাস্তবতা বলে গণ্য হয়নি। বাহ্যবাস্তবতার পাশাপাশি অনুর্গত আবেগ উপলব্ধি রূপায়িত হলেই কোনো রচনা বাস্তবতাবাদী রচনা হয়ে ওঠে বলে তিনি মনে করেন। আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতার সমালোচনা করে তিনি বলেন, '...... এক ধরণের বাস্তব গল্পে শুধু বাহিরের জিনিস-কুলী, ধাওড়া, কামিনদের বস্তী, ছেঁড়াচট্, দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা পঙ্কিল পথ, অসহ্যকলহ লইয়াই আরম্ভ ও শেষ হইল। ইহাদের অন্তরালে মানবমনের ও প্রাণের যে শাশ্বত লীলা সকল দৈন্য ও কুশ্রীতার উপরে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহার কোন সন্ধানই দিতে পারিল না ......।'[৩০০] আধুনিকেরা বাস্তবতার প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়সম্ভোগে চিত্র এঁকেছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি মনে করেন পাশ্চাত্যে অনুকরণ ছাড়াও এর পেছনে রয়েছে ওই তরুণদের অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়লালসা। তিনি বলেন যে তা-ই যদি না হবে 'তবে হঠাৎ রজনী' যখন তখন '"উতলা" হইয়া উঠিবে কেন, অথবা দেহের জন্য দেহ এমন করিয়া আকুল হইয়া ছুটিবে কেন ?'[৩০১] তাঁরমতে 'অতিআধুনিকেরা' যা সৃষ্টি করছেন তা হচ্ছে কলুষ ও 'যৌনসম্বন্ধীয় বাস্তবতা', এবং আধুনিকদের হাতে 'অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়বুভুক্ষার বিস্তৃত বিবরণে নবকামায়ন বিরচিত হইতেছে' বলে মনে করেন তিনি।[৩০২] তিনি মনে করেন সমাজজীবনের আনাচেকানাচে নিত্য অভিনীত পাপ ও অন্যায়ের হুবহু চিত্রন করলেই বাস্তবতাবাদী সাহিত্যসৃষ্টি করা যায় না, বরং তাতে আর্টের মর্যাদা নষ্ট হয়। আধুনিকদের রচনা তাই সাহিত্যসৃষ্টি না হয়ে হয়ে উঠেছে কামলালসার বিবরণ মাত্র।[৩০৩] অর্থাৎ ভাববাদী এই সমালোচকের কাছে বাস্তবতার নগ্ন নিরাবরণ উপস্থাপনা অসহ্য মনে হয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রেমের গল্প মাত্রই হইয়াছে একশ্রেণীর তরুণতরুণীর প্রেমবিলাসের অথবা দৈহিক বুভুক্ষার প্রতিবিম্ব মাত্র; তাহার মধ্যে না আছে কোন কল্পনা

---

২৯৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯১।

৩০০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯১।

৩০১. ওই, পৃঃ ২৯২।

৩০২. ওই, পৃঃ ২৯৩।

৩০৩. ওই, পৃঃ ২৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

না আছে কোন সত্যানুভূতি, না আছে সুস্থ ও শক্তিমান প্রকাশ। প্রেম কি শুধু মানুষকে বিলাসের মধ্যভূমিতে ডাকিয়া আনিয়া লালসার যূপকাষ্ঠে তাহাকে বলি দিবার জন্যই আধুনিক বাংলার কথাসাহিত্যের সিংহাসনে আসিয়া আসন লইয়াছে? একেই তো দুর্ব্বল, শক্তিহীন বাংলা- তাহাকে আরো দুর্ব্বল, আরোশক্তিহীন করিয়া তুলিবার জন্যই কি বাংলার 'তরুণ'লেখকেরা জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছেন?'[৩০৪] আধুনিক লেখকগোষ্ঠের রচনার বিষয়বস্তু ও বাস্তবতার সকলস্তরের উপস্থাপনার প্রবণতাকে অনুরূপভাবে আক্রমণ করেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিকদের বিরুদ্ধে তিনি অক্ষয়হোমের অভিযোগগুলোরই পুনরাবৃত্তি করেন বিভিন্ন প্রবন্ধে ওই লেখকদের বাস্তবতার নিরাবরণ উপস্থাপনাকে তিনি 'বেআব্রুতা' বলে অভিহিত করেন। আধুনিকেরা বাস্তবতার উপস্থাপনার নামে 'দারিদ্রের আস্ফালন' ও 'লালসার অসংযম'সহযোগে সস্তা সাহিত্য সৃষ্টি করছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতাধারনা বিষয়ক উপপরিচ্ছেদে এ-বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী রক্ষণশীল সমালোচকদের মতো এ-পর্যায়ের রক্ষণশীলেরাও আধুনিক কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত প্রণয়চিত্র সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং বিভিন্ন আধুনিক রচনায় উপস্থাপিত প্রেমের কুপ্রভাব নির্দেশে ব্যাপৃত হন। এসব আলোচনায় নৈতিকতা প্রসঙ্গই প্রধান, বাস্তবতার স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস যৎসামান্য লক্ষ করা যায়। পূর্ববর্তীদের মতো এ-পর্যায়ের রক্ষণশীলেরাও প্রবল নীতিবাদী ও সংকীর্ণ। আধুনিক লেখকদের রচনায় নরনারীর বিচিত্র ধরনের প্রেমের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। ওই প্রেম কামবাসনাহীন, প্লেটোনিক, 'নিকষিত প্রেম'মাত্র নয়। ওই প্রেমের সঙ্গে সংরাগ বা দেহসম্ভোগ বাসনাও জড়িয়ে আছে। লেখকেরা অনুপুঙ্খভাবে জীবনের ওই অংশের রূপায়ন করেন। এবং প্রবৃত্তির টানাপোড়েনের বিশদ উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার প্রয়াস করেন তাঁরা। ব্রজদুর্ল্লভ হাজরা 'রস ও রুচি' প্রবন্ধে("প্রবাসী",আশ্বিন ১৩৩৪) আধুনিক কথাসাহিত্যের রুচিহীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আজকাল অসংখ্য উপন্যাস ও অভাবনীয় গল্পকথার অজস্র বর্ষন হইতেছে। ····কিন্তু অধিক স্থলেই সদুদ্দেশ্য বা সুরুচির লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। সেগুলি পাঠ করিলে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপভ্রংশ আধুনিক বৈষ্ণববৈষ্ণবীর রীতিনীতির কথা মনে পড়িয়া যায়। ········· ভাবের সাধুতা, ভাষার সৌন্দর্য এবং কথার সুরুচি বড় বিরল হইয়া পড়িয়াছে।[৩০৫]

৩০৪· ওই, পৃঃ ২৮৮।

৩০৫· ব্রজদুর্ল্লভ হাজরা, 'রস ও রুচি', "প্রবাসী", (২৭ ঃ১ঃ ৬, আশ্বিন ১৩৩৪), পৃঃ ৭১৮।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ নগ্ন বাস্তবতার উপস্থাপনার প্রবণতা পীড়িত করেছে,দেহনির্ভর প্রেমকে এ-সমালোচকের কাছে কদর্য ও কুরুচিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বাস্তব এমন প্রেমের অস্তিত্ব থাকলেও তিনি সাহিত্যে উন্নত সাধুচিত্রের পক্ষপাতী। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার মতে আধুনিক লেখকেরা কথাসাহিত্যে বাস্তবতামনস্ক হয়ে ওঠার নামে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা নিয়ে শখের খেলায় মত্ত: 'আধুনিক সাহিত্যে বাস্তব লইয়া খেলা-ঐ সহরের ছেলেদের *village- reorganisation* -এ যাওয়ার মত, মনের মধ্যে ইচ্ছা আছে অনেক, কিন্তু সে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করিয়া তুলিবার সামর্থ্যেরও অভাব, পথও জানা নাই,'[৩০৬] আধুনিকেরা প্রণয়বৃত্তান্ত বর্ণনার নামে দেহসম্ভোগ বাসনার বিবরণ লিখে চলেছেন বলে তিনি মনে করেন। এর ফলে সাহিত্য বাস্তবতাঘনিষ্ঠ না হয়ে পরিণত হয়েছে 'কামবিলাসের প্রেতলোকে।' মানুষের মধ্যে পশুপ্রবৃত্তি থাকলেও ওই প্রবৃত্তিই একমাত্র সত্য নয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতা প্রকৃতপক্ষে 'ক্লিন্ন কামনার কুৎসিৎ মূর্ত্তি আবরণহীন বীভৎস কদর্য্যতা, স্নেহ মোহের উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস, শারীর অতৃপ্তির রুদ্ধজ্বালা, দৈহিক দুষ্ট আকাঙ্ক্ষার রুদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস, উলঙ্গ লালসার নির্লজ্জ অভিব্যক্তি, রক্তশিরাসঙ্কুল চর্ম্মাবরণের অনুর্বিপর্য্যাস, সাহিত্যের রসলোককে আজ কামবিলাসের প্রেতলোকে পরিণত করিয়াছে।'[৩০৭] তাঁর মতে এই আধুনিকেরা বাস্তবতা উপস্থাপনার নামে 'সাহিত্যের পদ্মবনে ময়লার প্রবাহ' বইয়ে দিয়েছেন।[৩০৮] সাহিত্যে বাস্তবতার নগ্ননিরাবরণ উপস্থাপনা তাঁর কাছে কুৎসিত ব্যাপার রূপে গণ্য হয়। আধুনিক বাস্তবতার নিরাবরণ উপস্থাপনার প্রবণতাকে বিদ্রূপ করে তিনি বলেন, 'সাহিত্যের মৎস্যহট্টে সাড়া পড়িয়া গেছে, আমিষের তীব্রগন্ধ, ক্রেতা বিক্রেতার দ্বন্দ্ব কোলাহল এবং আবিল জলের অজস্র প্রক্ষেপে সেহাট মৎস্যজীবীর বাস্তব স্বর্গে পরিণত।'[৩০৯]

বিভূতিভূষণ ঘোষাল আধুনিক কথাসাহিত্যকে 'অস্বাস্থ্যকর সাহিত্য' বলে অভিহিত করেন।[৩১০] আধুনিক লেখকের বাস্তবতামনস্কতাকে তিনি পাশ্চাত্যের ন্যাচারালিজমের অন্ধ অনুকরণ বলে মনে করেন। তাঁর মতে এই কথাসাহিত্যিকেরা খণ্ডিত বাস্তবতার উপস্থাপন করছেন মাত্র। বাস্তবতায় ভালো ও মন্দ এ-দুইই রয়েছে। এই লেখকেরা বাস্তবতার শোভন সুন্দর অংশটুকু উপেক্ষা করে কেবল ক্লেদ ও ব্যাধির চিত্রন করছেন বলে

---

৩০৬. শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, 'সাহিত্যে আধুনিকতা', "বিচিত্রা" (শ্রাবণ ১৩৩৫) পৃঃ ২৫৮।

৩০৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৮।

৩০৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৮।

৩০৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৮।

৩১০. বিভূতিভূষণ ঘোষাল 'সাহিত্য ও আর্ট' "বিচিত্রা" (আষাঢ় ১৩৩৫) পৃঃ ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর মতে এই লেখকেরা নিকৃষ্ট রুচির অধিকারী বলেই তাঁরা তিলোত্তমা আয়েষার বদলে মেসের ঝি-এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। এই লেখকেরা বিকারগ্রস্ত বলে দেশ ও সমাজের ব্যাধিই শুধু তাঁদের চোখের পড়ে, স্বাস্থ্য নয়। আধুনিক লেখকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'বিষই কি একমাত্র সত্য ? রোগই কি সমাজদেহের সাধারণ অবস্থা ? অমৃতের পুত্র আমরা- আমাদের জীবনে কি অমৃত নাই ? মানসিক স্বাস্থ্য কি এখানে মরীচিকার মতো দুর্লভ ? পাঁক গায়ে মাখা সেইকি ভালো-চন্দনের চেয়ে স্নিগ্ধ ?'[৩১১] রাধারাণীদত্ত মনে করেন আধুনিকদের বাস্তবতাবোধ কৃত্রিম। ওই লেখকেরা বানোয়াট দুঃখসুখের গল্প রচনা করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন যে বর্তমান কালের তরুণ সাহিত্যে কৃত্রিম দরদ, কৃত্রিম অনুভূতি ও কৃত্রিম সুখ-দুঃখের বাস্তব স্বপ্ন রচনার প্রাবল্য দেখা দিয়েছে।[৩১২] সত্যেন্দ্রকুমার বসু আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে বিকার ও পাশ্চাত্যে ভাবধারার নকল বলে মনে করেন। তাঁর মতে আধুনিকেরা সাহিত্যসৃষ্টির নামে যা করছেন তা হচ্ছে' '.....নরনারীর স্বাভাবিক নগ্নমূর্ত্তি, সভ্যতা ও সংযমের আবরণ না দিয়া প্রকৃতিমত অঙ্কিত করিতে গিয়া অক্ষমতাজনিত ব্যর্থতার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়ে আপনাদিগকেও পঙ্কিল আবর্ত্তে নিমজ্জিত করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নকলের আমদানীতে আসলটাকে আচ্ছন্ন করিয়া সাহিত্যমোদীকে অযথা কষ্ট দিতেছেন, অথচ এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন যে তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছেন- মৃতকল্পা বাঙ্গালাভাষাকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করাইয়া পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন। কিন্তু সে সুধা যে কদর্য্যসুরার নামান্তর তাহা বুঝিবারও বুঝি তাহাদের সামর্থ্য নাই।'[৩১৩] আধুনিক কথাসাহিত্যিকেরা বাস্তবতা উপস্থাপনার নামে কাম ক্লেদ কলুষের বিবরণ রচনা করছেন বলে অভিযোগ করেন তারকনাথ সাধু। এরফলে বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হবার পরিবর্তে ওই সাহিত্য হয়ে উঠেছে অসাহিত্য এবং 'কুৎসিত প্রবৃত্তির উদ্দীপক'।[৩১৪] তিনি বলেন, 'আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় এক নূতন সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাকে বাথরুম বা অসংযত সাহিত্য বলা যাইতে পারে। ...... ইহা আবর্জ্জনা পূর্ণ, পঙ্কিল, কুৎসিত প্রবৃত্তির উদ্দীপক। ইহা যে কলা সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ কল্পে রচিত হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এই শ্রেণীর সাহিত্য নীচ মনোবৃত্তির উদ্দীপন করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। .... মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লাপোঁতা জমির নিকট দিয়া চলাফেরার পীড়া সহ্য করা বরং সম্ভবপর, কিন্তু এইরূপ সাহিত্যপাঠের কষ্ট অ

---

৩১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৫।

৩১২. রাধারাণীদত্ত, 'আমাদের সমাজ ও সাহিত্য' "ভারতবর্ষ" (১৬ঃ২ঃ৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬), পৃঃ ৯২৬।

৩১৩. সত্যেন্দ্রকুমারবসু, 'সাহিত্য ও সমাজ', "বসুমতী" (৮ঃ১ঃ৩, আষাঢ় ১৩৩৬), পৃঃ৪৭৫।

৩১৪. তারকনাথ সাধু, 'বাথরুম বা অসংযত সাহিত্য' "বসুমতী" (১১ঃ২ঃ৪, মাঘ ১৩৩৯) পৃঃ ৫৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব।[৩১৫] অর্থাৎ আধুনিকদের সাহিত্যে বাস্তবতার ক্লেদ কলুষময় অংশের উপস্থাপনার প্রবণতা এই রক্ষণশীল নীতিবাদীর কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। তাই আধুনিকদের ওই প্রবণতাটি এই সমালোচকের কাছে এতো তিরস্কৃত হয়েছে।

সুশীলকুমার দে আধুনিক সাহিত্যকে 'কুলশীলহীন' বলে নির্দেশ করেন। তিনি আধুনিক লেখকদের প্রবৃত্তিগত জীবনের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা প্রবণতার নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে আধুনিক লেখকেরা বিশুদ্ধ প্রণয় ও সৌন্দর্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করে পশু প্রবৃত্তি ও নগ্নতাকে একমাত্র পুরুষার্থ বলে প্রচার করছেন।[৩১৬] তিনি আধুনিকদের বাস্তবতাকে 'বস্তুহীন বস্তুতন্ত্রতা' বলে অভিহিত করেন। কারন তাঁদের রচনায় যে সমাজ প্রতিবেশ ও সমস্যা সঙ্কটের উপস্থাপনা ঘটছে, তা ভারতীয় সমাজ ও সমাজসমস্যা নয়। এ-সমাজ বিলাতী এবং সমস্যা সঙ্কট অনুকরণের ফলমাত্র।[৩১৭] তাঁর মতে আধুনিক লেখকেরা পশুপ্রবৃত্তি ও নগ্নতাকে রিয়ালিজম বলে চালাতে চেষ্টা করছে এবং সমাজে যা-ঘটেনি, রিয়ালিজমের নামে তা-ই ঘটাতে তৎপর হয়েছেন। আধুনিকদের বাস্তবতাবাদী প্রবণতাকে তিনি 'লেখনী-বিলাস' বলে অভিহিত করেন।[৩১৮] আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে তিরস্কার করে তিনি বলেন, 'তাঁহাদের যে ক্ষুধা জীবনে নিবৃত্তি করিবার উপায় ও সামর্থ নাই, তাঁহারা সেই ক্ষুধাকে একমাত্র বাস্তবসত্য ও পরম তত্ত্ব বলিয়া আধুনিকতার নামে এক অপরূপ আদর্শের ঘোষণা করিয়াছেন।'[৩১৯] সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র আধুনিক সাহিত্যকে গণ্য করেন 'অতিবৃষ্টির সাময়িক বন্যা'রূপে।[৩২০] তাঁর মতে এ-সাহিত্য বিজাতীয় তাই অবাস্তব, আধুনিক লেখকদের মনুষ্য হৃদয়ের নানাদ্বন্দ্ব টানাপোড়েন-সঙ্কটের উপস্থাপনার প্রবণতা তাঁর কাছে বিজাতীয় বাস্তবতার অনুকরণ বলে মনে হয়েছে। তিনি মনেকরেন বিলাতী সমস্যা সঙ্কটের অনুকরণে এইলেখকেরা সমস্যার গল্প লিখে চলেছেন। এ-সাহিত্যের সঙ্গে এ-দেশী জীবনধারা ও জীবনের মহৎ আদর্শের কিছুমাত্র যোগ নেই।[৩২১] আধুনিকেরা বাস্তবতার দুঃখদারিদ্রপূর্ণ, ক্লেদাক্ত, অন্ধকার অংশের অনুপঙ্খ উপস্থাপনা করেন। আধুনিক লেখকদের ~~বাস্তবতার~~ বাস্তবতার ক্লেদাক্ত দিক উপস্থাপনার এই প্রবণতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে গর্হিত বলে বোধ হয়। ক্লেদাক্ত-বাস্তবতা নির্ভর আধুনিক সাহিত্যকে তিনি 'তামসিকসাহিত্য' বলে অভিহিত করেন।[৩২২] আধুনিক লেখকেরা বাস্তবতার

৩১৫• পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৮৮।

৩১৬• সুশীলকুমার দে, 'বর্তমানসাহিত্য সঙ্কট' "বঙ্গশ্রী", (২ঃ১ঃ৪, বৈশাখ ১৩৪১) পৃঃ ৪৩৩,

৩১৭• পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩২।

৩১৮• পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৩।

৩১৯• পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৩।

৩২০• সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, 'আধুনিক সাহিত্যের উৎসমূল', "প্রবাসী" (৩৮ঃ১, ভাদ্র ১৩৪৫) পৃঃ ৬৪৭,

৩২১• পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪৭।

৩২২• নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বাংলার তামসিকসাহিত্য', "ভারতবর্ষ" (৩৩ঃ১ঃ৪, আশ্বিন১৩৫২) পৃঃ ২৮৩,

Dhaka University Institutional Repository

অকপট চিত্রনের মধ্য দিয়ে সমাজবাস্তবতার স্বরূপ নির্দেশ করেন। তাঁরা উপন্যাসে কোনো সুখসম্ভাবনাপূর্ণ কল্পলোকের গল্প বলেন না, বা গভীর আশাবাদও ব্যক্ত করেন না। বাস্তবে যা আছে তারা শুধুমাত্র তা-ই দেখাতে চেয়েছেন। আধুনিক লেখকদের এ-প্রবনতাও সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে এ-সাহিত্য মোহদুঃখদৈন্য বিষাদ ও রোগের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয় ঘটিয়ে সমাজের মানুষের 'কর্ম্মপ্রবৃত্তি' ও 'জ্ঞানপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ' করছে।[৩২৩] আধুনিকদের বাস্তবতা উপস্থাপনার এ-প্রবণতাকে দেবপ্রসাদ ঘোষ উন্মাদের 'প্রলাপ ও বিলাপ' বলে নির্দেশ করেন।[৩২৪] তাঁর মতে আধুনিক সাহিত্য অবক্ষয় বা অধোগতির সমুদয় লক্ষণযুক্ত। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'রচনার ভিতরে সংযমের অভাব, শৃঙ্খলার অভাব, শালীনতার অভাব, নিষ্ঠার অভাব- Decadence বা অধোগতির এই সমুদায় লক্ষণই এখনকার সাহিত্যে অতিমাত্রায় প্রকটিত হইতেছে।'[৩২]

রক্ষণশীল এই সমালোচকগোষ্ঠীর কেউই বাহ্যবাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না। আধুনিকেরা সমাজের রসাতলের যে জীবনবাস্তবতা ও প্রবৃত্তিগত জীবনবাস্তবতার চিত্রন করেছেন, ওই বাস্তবতাও তাঁদের মতে অবাস্তব। তাঁরা বাস্তবতা বলে গণ্য করে ভিন্ন বিষয়কে দৈনন্দিনজীবনের স্থিত অংশটুকু চিত্রনের সঙ্গেসঙ্গে মানিমহৎ ভাবাদর্শের চিত্রনের মধ্য দিয়েই কোনো রচনাকে বাস্তবতানিষ্ঠ করে তোলা যায় বলে রক্ষণশীলেরা মনে করেন। আধুনিক লেখকদের রচনায় এই উন্নত ভাবাদর্শের উপস্থিতি নেই বলে ওই রচনাকে তাঁরা বাহ্যবাস্তবতার বিবরণমাত্র বলে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাঁরা প্রায়শই বাস্তবতার ভাববাদী ভাষ্যও রচনা করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস আধুনিকদের বাস্তবতাবাদী সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতাকে "ক্ষণিকের আমোদ' বলে অভিহিত করেন। বাহ্যবাস্তবতা ও নরনারীর সম্পর্ক নির্ভর উপন্যাসকে তিনি বাস্তবতাবাদী উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি দিলেও এ-সাহিত্যকে মহৎসাহিত্য বলে গণ্য করেন না। চারপাশের বাহ্যবাস্তবতাকেই তিনি বাস্তবতা বলে গণ্য করেন। তবে ওই বাস্তবতাকেই সাহিত্যের একমাত্র উপকরণরূপে তিনি পছন্দ করেননি। আধুনিকসাহিত্যের বাস্তবতাবাদী প্রবণতার সমালোচনা করে তিনি বলেন,'আধুনিক কথাসাহিত্যের একাংশে নরনারীর হৃদয়গত আকর্ষণ ও সম্বন্ধ লইয়া যে, তথা-

---

৩২৩· পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৩।

৩২৪· দেবপ্রসাদ ঘোষ 'সাহিত্যে প্রলাপ ও বিলাপ', "বসুমতী" (২১ : ১ : ১, বৈশাখ ১৩৪৯) পৃঃ ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

কথিত বাস্তবতার সৃষ্টি হইতেছে তাহা ক্ষণিকের জন্য উত্তেজনা ও আমোদ দান করিতে পারে, ... তাহা বাস্তব-জগতের নিখুঁত ছবি হইতে পারে কিন্তু সেই বাস্তবতা প্রকৃত সাহিত্যের আদর্শ বলিয়া মনে হয় না।'[৩২৬] সত্যেন্দ্র-কৃষ্ণগুপ্তও বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাবাদী রচনাকে শিল্পকর্ম বলে স্বীকার করেননি। এ-শ্রেণীর রচনাকে তিনি 'রিপোর্ট' বলে গণ্য করেন। অন্যান্যের মতো তাঁরও কাম্য সাহিত্যে বাস্তবতার আদর্শায়িত রূপায়ন। আধুনিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'তোমরা যাহাকে সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়া এত তড় পাইতেছ, তাহা সৃষ্টি নয়। পুলিশ আদালতের খবর, যাহা খবরের কাগজে বাহির হয়, তাহার বিশ্লেষণ আর্ট নয়।'[৩২৭] আধুনিক সাহিত্যে উপস্থাপিত জীবনবাস্তবতা ও প্রতিবেশ-দ্বন্দ্বসঙ্কট ইত্যাদিকে তিনিও কৃত্রিম, অবাস্তব ও ইউরোপীয় সাহিত্যের নকল বলে তিরস্কার করেন। লক্ষণীয়, রক্ষণশীল সমালোচকেরা প্রত্যেকেই প্রভাবকে অনুকরণ বা নকল বলে গণ্য করেছেন। তিনি মনে করেন ভারতীয় হিন্দুজীবনের প্রকৃত বাস্তবতাকে আধুনিকেরা উপেক্ষা করে রোম্যান্টিক কল্পনা বিলাসের বশবর্তী হয়ে কাল্পনিক বাস্তবতা সৃষ্টিতে তৎপর। ভারতীয় জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা বলতে তিনি ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত রক্ষণশীল হিন্দুজীবন বুঝিয়েছেন। আধুনিকেরা যে-রসাতলের জীবনবাস্তবতা ও চরিত্র উপস্থাপনা করেছেন নিজের দেশ-কাল পাত্রের মধ্যে তার স্থিতি নেই বলে মনে করেন। আধুনিকদের বাস্তবতাবাদী প্রবণতাকে তিরস্কার করে তিনি বলেন, 'কবে দেখিয়াছ পানওয়ালী পড়ার খরচ জোগায়, আর তোমার টুকটুকে বউয়ের কল্পনা করে? সত্যকে অস্বীকার করিয়ো না -পানওয়ালী মায়ের জাত, পড়ার খরচ জোগাইতে পারে, কিন্তু সেও স্ত্রী জাতি, টুকটুকে বউ সে তোমাকে দিবার আশা রাখে না, তার পায়ে তৈল দিবে এ-কল্পনাও তার হয় না। সত্যকে অস্বীকার করিলে আর্ট হয় না।'[৩২৮]

সীতাদেবী, প্রমথনাথ বিশী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, "শনিবারের চিঠি"গোত্র, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, কামিনীরায় প্রমুখও আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতা ও আধুনিক সাহিত্যে উপস্থাপিত বাস্তবতাকে অশ্লীল, বস্তু-বিলাস, বিকৃত, 'পশ্চিম হইতে আমদানী', অবাস্তব ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করেন। সাহিত্যে বাস্তবতার ক্লেদাক্ত অন্ধকার অংশের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনায় এই সমালোচকেরা ক্ষুব্ধ। তাঁরা মনে করেন বাস্তবতার অন্ধকার অংশকে

---

৩২৬. ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, 'বাঙালার কথাসাহিত্য', "বসুমতী" (৭:২:৩, পৌষ ১৩৩৫), ৩৯৫।

৩২৭. সত্যেন্দ্রকৃষ্ণগুপ্ত, 'সাহিত্যের আবহাওয়া', "বঙ্গশ্রী" (২:১:১, মাঘ ১৩৪০), ১৩৬।

৩২৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

গোপন করে শোভন-সুন্দর অংশের উপস্থাপনার মধ্যদিয়েও বাস্তবতাবাদী সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব। ক্লেদকলুষময় সুরকে বাস্তবতার অংশ বলে গণ্য করলেও তাকে গোপন রাখার পক্ষপাতী তাঁরা। তাঁরা সকলেই ওই সাহিত্যে উপস্থাপিত যৌনজীবনের বর্ণনার মুখোমুখি অস্বস্তিবোধ করেছেন। তাঁরা কপট শুদ্ধাচার ও সুন্দর বাস্তবতার উপস্থাপনার পক্ষপাতী। ব্যাধিকে ব্যাণ্ডেজে ঢেকে রাখার পক্ষপাতী তাঁরা, কারণ তা মনকে পীড়িত করে না, বরং চোখ স্বস্তি পায়। এই সমালোচকেরা কপট নীতিবাদী, নগ্নবাস্তবতা তাঁদের পীড়িত করে বলে নৈতিকতার অজুহাতে তাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন আর আধুনিকেরা ওই বাস্তবতা উপস্থাপনের ব্রত গ্রহণ করেছেন। সীতাদেবীর মতে আধুনিকেরা বাস্তবতার নোংরা ও অশ্লীল অংশের উপস্থাপনায়ই শুধু আগ্রহবোধ করে, বাস্তবতার শোভন অংশটুকু তাঁদের চোখে পড়েনা। তিনি আধুনিকদের 'নর্দমার ইন্সপেক্টর' বলে অভিহিত করেন।[৩২৯] কারণ তাঁরা শুধুই নোংরা-ক্লেদের সন্ধানেরত এবং তাঁদের সাহিত্য ওই নোংরামোর বিবরণে পূর্ণ। তিনি বলেন, 'বাস্তবে অনেক জিনিসই। ভদ্র, শ্লীল, ও সৎ হইলেই সে জিনিসগুলির বাস্তবতা কিছু নষ্ট হইয়া যায় না। তবে সেগুলি বাদ দিয়া যতঅভদ্র ও অশ্লীল বাস্তবের প্রতি এত পক্ষপাত কেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিনা।'[৩৩০] প্রমথনাথ বিশী "শনিবারের চিঠি" পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৪৬) প্র. না. বি ছদ্মনামে লেখেন 'স্বপ্নবাদ বনাম বাস্তববাদ' নামক প্রবন্ধ। আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতাকে তিনি এ-প্রবন্ধে স্বপ্নবিলাস ও বস্তুবিলাস বলে অভিহিত করেন। তিনি রিয়ালিজম বা বাস্তবতাবাদের পরিভাষা করেন 'বাস্তববাদ'। তাঁর মতে আধুনিকসাহিত্যের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতা বিদেশ থেকে ধার করা, এ-প্রবণতা বাঙালীর নিজস্ব নয়, কখনো এ-প্রবণতা এ-জাতির মধ্যে ছিলও না। এই বাস্তবতামনস্কতা লেখকদের বস্তুবিলাস মাত্র।[৩৩১] তাঁর মতে আধুনিকদের আগমনে 'স্বপ্নবিলাসী' বাঙালী চরিত্রের কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই। বাঙালীর পুরাতন স্বপ্নবিলাসই সম্প্রতি বস্তুবাদ নাম ধরিয়া আসিয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে ইহা বস্তুবিলাস।'[৩৩২] আধুনিক লেখকদের এই 'বস্তুবিলাস'কে তিনি 'বিকৃত বাস্তববাদ' বলেও আখ্যা দেন। এই 'বাস্তববাদ' শুধু কলুষ ও বিকারের উপস্থাপনায়ই উৎসাহী বলে তিনি এই অভিধা প্রয়োগ করেন। সাহিত্যে কাম-কলুষ-বিকারের উপস্থাপনার এই প্রবণতার মধ্যে বাঙালি তরুণশ্রেণীর নৈতিক অধঃপতনেরই পরিচয় মুদ্রিত

৩২৯. সীতাদেবী, 'সাহিত্যের ভাষা ও বস্তু', "প্রবাসী" (৩৪:২, মাঘ ১৩৪১), পৃঃ ৫২০।

৩৩০. পূর্বোক্ত, ৫২০।

৩৩১. প্র না, বি, 'স্বপ্নবাদ বনাম বাস্তববাদ', "শনিবারের চিঠি" (১১:১, বৈশাখ ১৩৪৬), পৃঃ ১।

৩৩২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে আছে বলে তিনি মনে করেন ।[৩৩৩]

এই রক্ষণশীলদের কাম্য ছিলো আদর্শায়িত বাস্তবতা । কালিদাস রায়ের মতে সাহিত্যের সত্য ও বাস্তবসত্য অভিন্ন ব্যাপার নয় । বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাকে তিনি সাহিত্যসৃষ্টি বলেও গণ্য করেন না । তাঁর মতে যৌনজীবন বাস্তবসত্য হলেও সাহিত্যে ওই সত্যের উপস্থাপনা অনুচিত, কারণ সবসত্য সাহিত্যের বি - ষয় হতে পারে না । বাস্তবউপাদানের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রনে সাহিত্যের সত্যসৃষ্টি হয় বলে তিনি মনে করেন । তাঁ- র মতে আধুনিকেরা যৌনজীবনের অনুপুঙ্খ অবিকল উপস্থাপনার মূলে রয়েছে সস্তায় বাজীমাৎ করার মোহ । তিনি আধুনিকদের 'কামসাহিত্যিক'আখ্যা দেন ।[৩৩৪] তিনি বলেন, 'তাঁহারা ভুলিয়া যান- তাঁহাদের প্রচারিত সত্য - সাহিত্যের সত্য নয়- কারণ উহা রসোত্তীর্ণ নয়- বাস্তবসত্যকেই তাঁহারা আরও লোভনীয় করিয়া বর্ণনা করিতেছেন মাত্র।'[৩৩৫] ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদ ও প্রাকৃতবাদের আলোচনার ক্ষেত্রেও এই রক্ষণশীলদের একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে । পাশ্চাত্যের এই ধারাদুটিতে মানুষের অনুচিত পাশবসত্তার যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে তাকে বিভূতি- ভূষণ ঘোষাল অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে মনে করেন । তিনি মনে করেন প্রাকৃতবাদী লেখকদের মানুষের পশুত্বকে বড়ো করে দেখাবার ঝোঁকটি 'বিকারগ্রস্ত রোগীর হাত পা ছোঁড়া ছাড়া আর কিছু নয়।' তিনি বলেন, '····· জীবনের যে-দিকটা মানুষের পাশবিক ভাবকে প্রকাশ করছে, সেই দিকটাই দেখবো অপরকোনো দিকে নজর দেবো না, এ নিছক বাতুলতা ছাড়া আর কি হতে পারে ?'[৩৩৬] অর্থাৎ সাহিত্যে মানুষের দেবত্বকে বড়ো করে দেখতে চান এই রক্ষণশীলেরা, ইবসেন তাঁর রচনায় রূঢ় ও কদর্য বাস্তবতার উপস্থাপনা করেছেন বলে তাঁরা ইবসেনকেও আক্রমণ করেন । সত্যসুন্দর দাশ (মোহিতলাল মজুমদারের ছদ্মনাম) ইবসেনকে দুর্নীতিপ্রচারক বলে অভিযুক্ত করেন । তিনি ইবসেনের নিন্দা করে বলেন যে ইবসেনের রচনায় শুধু ব্যক্তিস্বার্থপ্রণোদিত অতি সংকীর্ণ বিবেকবুদ্ধির জয়োল্লাস ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু মানুষের 'স্পিরিচুয়ালিটি', 'আত্মবিসর্জনের দ্বারা আত্মোপলব্ধির সাত্ত্বিক

৩৩৩· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬।

৩৩৪· কালিদাসরায়, 'বাস্তবসত্য ও সাহিত্যের সত্য' "সাহিত্য প্রসঙ্গ"(দ্বিতীয়খণ্ড) (রসচক্র সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, প্রকাশকাল : অনুল্লেখিত) পৃঃ ৩০ ।

৩৩৫· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১-৩২ ।

৩৩৬· বিভূতিভূষণ ঘোষাল, 'পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

আকাঙ্ক্ষা' ইত্যাদি এখানে অশ্রদ্ধেয়রূপে গণ্য হয়েছে।[৩৩৭] তিনি ইবসেনের "এডলস্ হাউস" উপন্যাসের উল্লেখ করে বলেন যে এ-উপন্যাসে জীবনের যে-আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে তা একদেশদর্শী, স্বার্থপরতার আদর্শ। এখানে প্রেম নেই, স্নেহ নেই, কর্তব্য নেই, মাতৃধর্ম নেই, 'মর্ম্মানুদাহী বেদনার আধ্যাত্মিক তপশ্চরণ নাই, প্রাণের গভীরতম উৎকণ্ঠার ব্রণশবিদ্ধদেহের অপূর্ব্ব *passion* নাই।'[৩৩৮] অর্থাৎ ত্যাগ, অনুতাপবেদনার দহন ইত্যাদি উন্নত ভাবরাশির চিত্রণ করা হলেই কোনোরচনা মানবজীবনের প্রকৃতবাস্তবতার উপস্থাপনকারী রচনা হয়ে ওঠে বলে ভাববাদী রক্ষণশীল গোত্রটি মনে করেন। তাঁদের মতে শুধু বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনা করা হলে ওই রচনা হয় অনুলিপিমাত্র, মানবজীবনের উন্নত আদর্শগুলো উপস্থাপনা করা হলেই কোনো রচনা সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে ওঠে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবতাবিমুখ ভাববাদীর।

"শনিবারেরচিঠি" গোত্র মনে করে আধুনিক সাহিত্যে উপস্থাপিত বাস্তবতা বা সমাজ সমস্যা এ-দেশীয় নয়, আধুনিক লেখকেরা ইউরোপের উৎকট সামাজিক সমস্যার অন্ধ অনুকরণ করে চলেছেন মাত্র। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'ইউরোপের উৎকট সামাজিক সমস্যাগুলি এ-দেশের একদল নব্যসাহিত্যিককে ভাববিলাসী করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের সাহিত্য অনাসৃষ্টির মধ্যে সেই সমস্যাগুলিকেই উৎকটতর করিয়া রিয়্যালিস্টিক বলিয়া বাহবা লইতেছে।'[৩৩৯] বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যও একই ধারণা পোষণ করেন। তিনি বলেন, 'এখন পশ্চিম হইতে যে তরল জিনিষের আমদানী হইতেছে এবং আমাদের অনেক নকলনবীশ ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক বিনা-ওজরে গলাধঃকরণ করিয়া সাহিত্যের বাজারে উদগিরন করিতেছেন, তাহাতে না আছে ধর্ম্ম, না আছে তাহার ভান। আছে স্বাধীনতার নামে খানিকটা হলাহল।'[৩৪০] সত্যেন্দ্রকুমার বসু বলেন, 'অধুনা বিদেশী রসসাহিত্যের ব্যর্থ অনুকরণ প্রবৃত্তি আমাদের দেশে এই ভাবের বিকৃত সাহিত্য ও চিন্তাধারা আমদানী করিয়াছে।'[৩৪১] তিনি মনে

---

৩৩৭. সত্যসুন্দরদাশ 'সাহিত্যে অশ্লীলতা', "বঙ্গশ্রী" (১ঃ১, ১৩৩৯), পৃঃ ১৯।

৩৩৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

৩৩৯. 'ভূমিকা' অংশ, "শনিবারের চিঠি", পৌষ ১৩৩৫, পৃঃ ৯২৭।

৩৪০. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 'সাহিত্য ও রস', "বঙ্গবাণী" (৬ঃ দ্বিতীয়ার্ধঃ ৪, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) পৃঃ ৪৪৯-৪৫০।

৩৪১. সত্যেন্দ্রকুমার বসু, 'সাহিত্য ও সমাজ', "বসুমতী" (৮ঃ ১ঃ ৩, আষাঢ় ১৩৩৬), ৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

করেন এই অনুকরণকারী বাঙালী লেখকগোষ্ঠি পাশ্চাত্যের সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি পান করে'অজীর্ণরোগাক্রান্ত' হয়েছেন, তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টি 'উদগারণ'রূপ 'অনাসৃষ্টি' মাত্র।[৩৪২] কামিনী রায়ও মনে করেন আধুনিকসাহিত্যে উপস্থাপিত সমাজসমস্যা ও আধুনিক আচরণ বর্ণনার প্রবণতা বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবজাত। তাঁর মতে বিদেশী-প্রভাবজাত এই আধুনিকসাহিত্যসমাজদেহকে বিষাক্ত করে তুলেছে।[৩৪৩] বসন্তকুমার ভৌমিকের মতে, 'আজকাল দেখিতে পাই দেশীয় উপাদানের সহিত বিদেশী ধার করা ভাব বা সমস্যার মিশ্রনে একপ্রকার অপক্ক দুষ্পাচ্য খিচুড়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, যাহাতে প্রাণের খিঁচুনী বা Intellectual Dyspepsia ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশী। ······· তাহা হ্যাটকোটনেকটাইএর সহিত তুলসীমালা ও টিকি সমাবেশের ন্যায়, অথবা বিলাতী বিস্কুটের হরিলুটের ন্যায় অতিমাত্রায় বেখাপ্পা।'[৩৪৪] এই সমালোচক সাহিত্যে আধুনিক চেতনার উপস্থাপনাকেই দুষণীয় মনে করছেন। সাহিত্যে সনাতন রীতিনিয়ম এবং জীবনের ও সমাজের স্নিগ্ধ বাস্তবতার উপস্থাপনাকেই তিনি দেশীয় উন্নত আদর্শরূপে গণ্য করছেন, আর বাস্তবতার অন্ধকার অংশ বা প্রবৃত্তিগতজীবনের উপস্থাপনা রীতি তাঁর কাছে গণ্য হয়েছে 'ধার করা বিদেশীভাব'।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র আধুনিক সাহিত্যকে অবাস্তব সাহিত্য বলে গণ্য করেন। এ-সাহিত্য অবাস্তব কারণ এতে বিলাতী সমাজের বাস্তবতাকে ভারতীয় সমাজবাস্তবতা রূপে দেখানো হয়েছে। তিনি বলেন যে এ-সাহিত্য পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় ঠিকই তবে এ-সাহিত্যের অবাস্তবতা সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকে না। তিনি অন্যান্য রক্ষণশীল সমালোচকের তুলনায় উদার। অন্যেরা যেখানে এ-সাহিত্যপাঠের কুফলের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, তিনি সেখানে এ-সাহিত্য পাঠ করে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। তবে এ-সাহিত্যের বাস্তবতা যে বিজাতীয় তাতে তিনি নিঃসংশয়। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে প্রেমই সব, তাই কাব্যসর্ব্বত্র আদিরস প্রধান। উহাদের দেশেও প্রেম মধুর, কিন্তু তা বলিয়া জীবনের অন্যসব values উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? যুবকযুবতীর বিবাহ আগে প্রেম হইয়াইয়, কিন্তু সে প্রেমের পশ্চাতে উঁকি দেয় পাউন্ড শিলিং পেনস। এমনি করিয়া যাহাদের প্রকৃতি তিক্ত এবং প্রবৃত্তি রিক্ত হইয়াছে, আমরা তাহাদের অনুকরণ করিতে চেষ্টিত হইলাম। এমনি করিয়া আমাদের উপন্যাস সাহিত্য বিদেশীয় রুচির বিদেশীয় সংস্কৃতির নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে। ইহাতে ফল হইয়াছে

৩৪২· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭৫।

৩৪৩· কামিনীরায়, 'সাহিত্য ও সুনীতি, "প্রবাসী" (৩২ ঃ২, ১৩৩৯) পৃঃ ৩৮।

৩৪৪· বসন্তকুমার ভৌমিক, 'উপন্যাসের উপদান', "ভারতবর্ষ" (২৩ঃ১ঃ৬, অগ্রহায়ণ ১৩৪২)পৃঃ ?

Dhaka University Institutional Repository

এই যে পড়িতে যতই ভাল লাগুক, বাস্তবের সঙ্গে তাহা কোথাও মিলে না।'[৩৪৫] পাশ্চাত্যের অর্থনীতিক টানাপোড়েন নিয়ন্ত্রিত জীবনবাস্তবতাকে তিনি অবজ্ঞা করেন। ভক্তিস্বর্গ ভারতীয় প্রথাগত জীবনবাস্তবতার বদলে আধুনিক মানুষের নানা সঙ্কটপীড়িত যে জীবনবাস্তবতা আধুনিক লেখকেরা উপস্থাপনা করেন, তাকে খগেন্দ্রনাথের কাছে পাশ্চাত্যের নকল বলে মনে হয়েছে। নতুন সময়ের নতুন জীবনবাস্তবতা ও চেতনাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি বলেই ওই বাস্তবতানির্ভর আধুনিক সাহিত্যকে বিদেশী-সংস্কৃতির নকল বলে মনে হয়েছে। আধুনিক কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত বাস্তবতাকে বিজাতীয়, তাই অবাস্তব বলে মনে করেন সজনীকান্ত দাসও। তিনি বলেন, 'আমাদের ঘরের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবনা সত্ত্বেও আমরা তাহাদের ভাবেই ভাবিত হইয়া আমাদের পক্ষে নানা অপ্রাকৃত সমস্যা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছি। এ সমস্যার কথা আমাদের জনসাধারণ অবগত নয়। আমাদের দেশের মাটির সহিত এগুলির যোগ নাই। মাটির অন্ধকারে শিকড় প্রবেশ করে নাই বলিয়া সাধনা ফলপ্রসূ হয় নাই। ·······পাশ্চাত্য ভূখন্ডের কয়েকজন চটকদার ইংরেজী লেখকের নিকৃষ্ট অনুকরণ ছাড়া আমরা সাময়িক সাহিত্যেও বিশেষ কি করিতে পরিয়াছি ?'[৩৪৬]

আধুনিক কথাসাহিত্যকে বিজাতীয়, নকল, অবাস্তব বলে অভিযোগ তোলার পাশাপাশি এ-সাহিত্য সমাজের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। অধিকাংশ সমালোচকই এ-সাহিত্যকে ব্যাধি ও বিষের সঙ্গে তুলনা করেন এবং তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। "শনিবারের চিঠি"র মতে 'অর্বাচীন মনের উৎকট কামনার উগ্রপ্রকাশ' এই আধুনিক সাহিত্য অন্তঃপুরবাসিনীদের মনে যেমন বিকারের জন্ম দিচ্ছে, তেমনি অল্পবয়স্ক তরুণদের মনও কলুষিত করে তুলছে।[৩৪৭] আধুনিক লেখকদের "শনিবারের চিঠি" 'কদাচারের স্রষ্টা-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি' বলে অভিহিত করে। এই লেখকেরা সমাজদেহে ব্যাধি সংক্রামিত করে চলেছেন বলে "শনিবারের চিঠি" মনে করে। "শনিবারের চিঠি" মনে করে আধুনিক সাহিত্যকে আক্রমনের মধ্য দিয়ে এই সাহিত্যনামী ভয়ঙ্কর ব্যাধির বীভৎসতা সম্পর্কে তারা জনগণকে অবহিত করার দায়িত্ব পালন করছে। "শনিবারের চিঠি"র মতে, 'সেই ব্যাধি যাহাতে আর বেশী সংক্রামিত না হয় এজন্য ইহাদিগকে

৩৪৫· খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'বঙ্গসাহিত্যের বাণী', "ভারতবর্ষ" (২৩:১:৬, অগ্রহায়ণ ১৩৪২), ৮৪৫-৮৪৬।

৩৪৬· সজনীকান্ত দাস, 'যুগসাহিত্য' "শনিবারের চিঠি" (১২বর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭), পৃঃ ৯৫।

৩৪৭· 'ভূমিকা' অংশ, "শনিবারের চিঠি", (পৌষ ১৩৩৫), পৃঃ ৯২৮।

Dhaka University Institutional Repository

Segregate করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ...... যাহারা এখনও রোগাক্রান্ত হয় নাই বা যাহাদের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে মাত্র, তাহাদের ইহাতে প্রভূত উপকার সাধন হইবে–অমৃতভ্রমে কেহ আর বিষ পান করিবে না।'[৩৪৮] সত্যেন্দ্রকুমার বসুর মতে, 'এই বিষময় সাহিত্যের প্রভাব অতিসূক্ষ্ম সর্ব্বনাশকর ধীর সঞ্চারী বিষের ন্যায় 'তরুণ সমাজ' শরীরে বিসর্পিত হইতেছে। .... পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের সংস্পর্শের প্রভাব হইতে দূরে হোস্টেলে মেসে অবস্থিত অথবা অসতর্ক অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকিয়া নিষিদ্ধ না হইয়া নিশ্চিন্ত তরুণতরুণী এই বিষ নিত্য গলাধঃকরণ করিতেছে আর তাহাতে জর্জরিত হইতেছে।'[৩৪৯] আধুনিকেরা প্রেম ও নীতির যে–আদর্শ গড়ে তুলেছেন তাকে শোচনীয় ও অশ্লীল বলে মনে করেন কামিনী রায়। তাই এ–সাহিত্য 'অল্পবয়স্ক বালকবালিকার হাতে' 'দেওয়া বিধেয় নয়' বলে তিনি মনে করেন।[৩৫০] আধুনিক সাহিত্য হীনমনোবিলাসের উপস্থাপনা করে জাতির মহাঅপকার সাধন করছে বলে মনে করেন সুশীলকুমার দে। তাঁর মতে এ–সাহিত্য জাতির পৌরুষ ও চরিত্রশক্তি নষ্ট করছে। তাঁর মতে আধুনিকেরা সাহিত্যে যে–সমাজবাস্তবতা ও যৌনজীবনের মিথ্যে সমস্যা তুলে ধরেছে তা সাহিত্য সমস্যা নয়, বরং তাকে 'মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা' বলা যেতে পারে। তিনি বলেন, এ–সাহিত্য 'কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তা ও কুপ্রথার বিজৃম্ভন মাত্র', তাই এ–সাহিত্য মানুষের শ্রেষ্ঠবৃত্তির পুষ্টি সাধন করেনা, নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিকে উত্তেজিত করে মাত্র।[৩৫১] তাই আধুনিক কথাসাহিত্যের সকল গ্রন্থ নষ্ট করে ফেলাই সঙ্গত হবে বলে মনে করেন দেবপ্রসাদ ঘোষ। তিনি মনে করেন শুধুমাত্র বহ্নুৎসবের মধ্যদিয়েই এই যৌনজঞ্জাল থেকে পরিত্রান পাওয়া সম্ভব, নতুবা এ–সাহিত্য সুকুমার বালকবালিকাদের অধঃপতনের পথে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'জার্ম্মান ডিক্টেটর হিটলার একমুহূর্তে এই যৌনজঞ্জাল সাফ করিয়াছিলেন, বার্লিন নগরে প্রকাশ্য ময়দানে এই যৌনসাহিত্যের বহ্নুৎসব বা *Bonfire* করিয়া, আমাদের দেশে ত ডিক্টেটর হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, আমাদের জননায়ক ও সাহিত্যরথীদিগের এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বাঙালীর পরিবারের সুকুমারমতি বালকবালিকার এবং অকুমারমতি যুবক যুবতী উভয়েরই ভবিষ্যৎ ভয়াবহ।'[৩৫২] এ–উক্তিতে রক্ষণশীলতা ব্যক্তি–

---

৩৪৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯২৫।

৩৪৯. সত্যেন্দ্রকুমার বসু, 'সাহিত্য ও সমাজ' "বসুমতী" (৮ঃ১ঃ৩, আষাঢ় ১৩৩৫) পৃঃ ৪৭৬।

৩৫০. কামিনীরায়, 'সাহিত্য ও সুনীতি, "প্রবাসী" (৩২ঃ২ ১৩৩৯) পৃঃ ৩৭।

৩৫১. সুশীলকুমার দে, 'বর্ত্তমানসাহিত্য সঙ্কট', "বঙ্গশ্রী" (২ঃ১ঃ৪, বৈশাখ ১৩৪১), ৪৩৫।

৩৫২. দেবপ্রসাদ ঘোষ, 'বঙ্গসাহিত্যে অর্বাচীন যুগ', "বসুমতী" (১৫ঃ২ঃ৫ ফাল্গুন ১৩৪৩), পৃঃ ৭৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাদে পরিণত হয়েছে।

আরেকগোত্র রক্ষণশীল সমালোচক ভিন্নধরনের উদ্বেগবোধ করেন। তাঁরা মনে করেন বিজাতীয়-বাস্তবতানির্ভর আধুনিকসাহিত্যে যে-সব নীতিহীন, বিজাতীয় চরিত্র দেখা যায় তারা চিরকাল গ্রন্থের পৃষ্ঠায়ই থাকবেনা। এ-সাহিত্যের প্রভাবে সমাজেও ওই রকম নীতিহীন ও ধর্মবোধহীন উচ্ছৃঙ্খল নরনারী দেখা দেবে। ফলে সনাতন পবিত্র হিন্দুসমাজ নানা অরাজকতা ও পাপে পূর্ণ হবে। নানা সঙ্কটপীড়িত, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে ক্ষতিবিক্ষত আধুনিক চেতনার ধারক ওই পাত্রপাত্রীদের তাঁরা গণ্য করেছেন বিজাতীয়, উচ্ছৃঙ্খল ও অবাস্তব বলে। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বলেন, 'সমাজ ওলটপালট হইয়া গেলেও কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সমাজ হইতে পারে নাই। বিদেশী নভেলে যেসকল স্ত্রী-পুরুষের উদ্দামভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা দেশেরই প্রকৃতি হইতে গৃহীত। এখানে যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশৃঙ্খল সমাজের বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ, হয়ত পরে এই সাহিত্যের প্রভাবে দেশেও উহার বাস্তব মূর্ত্তি দেখা দিবে।'[৩৫৩] সীতাদেবী উদ্বিগ্ন হয়েছেন এই ভেবে যে 'ইংরেজীতে প্রবাদ আছে 'Talk of the Devil and he appears.' শয়তানের কথা বলিতে না বলিতে শয়তানের আবির্ভাব হয়। আমাদেরও অবস্থা হইয়াছে তাই। ক্রমাগত শয়তানের কাহিনী বর্ণনা করিয়া করিয়া আমরা আজ শয়তানকে মর্ত্ত্যলোকে সশরীরেই [illegible]িয়া আনিয়াছি। ইহার জন্য ঐ অসৎ ও অসার সাহিত্য একেবারেই যে দায়ী নয়, তাহা কোনক্রমেই বলা যায় না।'[৩৫৪] আধুনিক কথাসাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট পীড়িত পাত্রপাত্রীদের তাঁর কাছে বিকারগ্রস্ত পাত্রপাত্রী বলে মনে হয়েছে। তিনি যে বাস্তবতায় বাস করেন ওই আধুনিক নাগরিক পাত্রপাত্রীদের বাস্তবতা তা থেকে ভিন্ন। তাই এই সমালোচকের কাছে ওই বাস্তবতা স্বস্তিকর নয়। আধুনিক কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত বিকারগ্রস্ত নরনারীর প্রভাবে সমাজেও একগোত্র বিকারগ্রস্ত নরনারী দেখা দিয়েছে এবং ওই বিকার গ্রস্ত নরনারীরা সমাজকে রসাতলের দিকে নিয়ে যাবে ভেবে তিনিও উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, 'সংসারে ভাল জিনিসের অনুকরণে বহুপূর্ব্বেই মন্দ জিনিসের অনুকরণটা আরম্ভ হয়। তাই আধুনিকতম লেখকদের একদল যে অতিবিকৃত ও অতিঅসার কতকগুলি নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহাদেরও অনুকরণে ঐরূপ স্ত্রী-পুরুষ গড়িয়া উঠিয়াছে ও দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এদিক ওদিক দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গল্পের পাতায় যখন এইসব অতি আধুনিক ছেলেমেয়ের সাক্ষাৎ -

---

৩৫৩. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, 'সাহিত্য ও রস', "বঙ্গবাণী", ৬ঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধ ঃ৪; অগ্রঃ ১৩৩৪) পৃঃ ৪৫০।

৩৫৪. সীতাদেবী, 'সাহিত্যের ভাষা ও বস্তু', "প্রবাসী" (৩৪ ঃ২, মাঘ ১৩৪১), পৃঃ ৫২০।

Dhaka University Institutional Repository

পাইতাম, তখন হাসিয়াই উড়াইয়া দিতাম যে এরকম জীবের আবির্ভাব আমাদের দেশে অসম্ভব।'[৩৫৫]

প্রবন্ধের পাশাপাশি আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বাস্তবতামনস্কতা, রচনারীতি, উপন্যাস ও গল্পের পাত্রপাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, চরিত্র ও গল্প উপন্যাসের নাম ইত্যাদিকে বিদ্রূপ সমালোচনা-আক্রমণ করে রক্ষণশীলেরা লেখেন বহু কবিতা-ব্যঙ্গাত্মক রম্যরচনা-গল্প-নকশা প্রভৃতি। "শনিবারের চিঠি"তে এ-ধরনের লেখা মুদ্রিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। প্রতিটি লেখকের লক্ষ্য ছিলো আধুনিকদের বাস্তবতাবাদী প্রবণতাকে হাস্যকর ও নকল বলে নির্দেশ করা এবং আধুনিকদের হেয় প্রতিপন্ন করা। "শনিবারের চিঠি" পত্রিকায় (পৌষ ১৩৩৫) অজ্ঞাত-নাম কবি রচিত 'মদনের পুনর্জন্ম' কবিতাটি আধুনিক লেখকদের হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে লিখিত। অজ্ঞাতনাম এই কবি আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে বলেন-

যেদিন বেদনাহীন, বর্ব্বর সন্ন্যাসী
মদন করিল ভস্ম, উঠিল উচ্ছ্বাসি
রতির বিলাপধ্বনি, চরাচর ভরি,
সেদিন, সে আর্ত্তস্বরে উঠিল শিহরি
স্বর্গের প্রথমতম তরুণ-দেবতা,
বুকে লয়ে, মুখে লয়ে, তীব্রতম ব্যথা।
দীপ্ত নেত্রে কহে, "তোর একি দুঃসাহস!
মদন করিলি ভস্ম, রে ভণ্ড তাপস।
আমার তরুণভক্ত ঐ মর্ত্ত্য-লোকে।
অভিভূত, অবসন্ন এ দারুণ শোকে।
পঞ্চশরদগ্ধ হয়ে ফিরিবে না তারা
পল্লীপথে বাপীতটে, হয়ে আত্মহারা,
খুঁজে খুঁজে, পল্লীবধূ স্নানসিক্ত-বাস,
যৌবন নিটোল দেহে জাগায় পিয়াস।
আর দেখিবে না তারা রভস লালসে

---

৩৫৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২০।

Dhaka University Institutional Repository

কোথায় গাগ্রী ভাসে হৃদয় সরসে।[৩৫৬]

'অনুর্ব্বিহারী' নামক গল্পে গল্পকার আধুনিক লেখকদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নির্দেশের প্রবণতাকে হাস্যকর খেয়াল রূপে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হন।[৩৫৭] 'অতিআধুনিক স্টাইল' গল্পে আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতা ও রচনারীতি-কে উপহাস করা হয়,।[৩৫৮]এবং 'কখগ (জ্যামিতিক গল্প)' শীর্ষক রচনায় 'বস্তুতান্ত্রিক' আধুনিক লেখকদের অন্তঃসারশূন্যতা ও শোচনীয় পরিণাম নির্দেশ করা হয়।[৩৫৯] 'অতি আধুনিক উপন্যাস' নামক ব্যঙ্গ রচনায় আ-ধুনিক কথাসাহিত্যের বাস্তবতা ও রচনারীতিকে বিদ্রূপ করা হয়,।[৩৬০]এবং'বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম বিবরণ'-এ আধুনিক কথাসাহিত্যের তুচ্ছতা নির্দেশ করা হয়।[৩৬১]উপরিউক্ত সবকটি রচনার লেখকই অজ্ঞাতনাম। কিংবা ছদ্মনামধারী। সীতাদেবীর 'বাস্তব'শীর্ষক ব্যঙ্গগল্প মুদ্রিত হয় "প্রবাসী" পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৪০)। এ-গল্পে লে-খকের লক্ষ্য আধুনিকদের বাস্তবতাবাদী প্রবণতাকে ব্যঙ্গ-উপহাস করা। এ-লেখক আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতা-কে ফ্যাশান বলে নির্দেশ করেন। এ-গল্পে দেখানো হয় সম্পাদকেরা পাঠকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে লেখকদের বাস্তবতাবাদী সাহিত্যসৃষ্টির জন্য চাপ দেন আর লেখকেরা বাস্তবতাবাদী হয়ে ওঠার জন্য নানা হাস্যকর প্রয়াস চালান। সীতাদেবী দেখিয়েছেন আধুনিকদের বাস্তবতাবাদী সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতা হাস্যকর অপপ্রয়াস মাত্র।[৩৬২] আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতার সমালোচনা করে আশালতা সিংহ লেখেন 'বাস্তব ও কল্পনা' শীর্ষক গল্পধর্মী রচনা।[৩৬৩] অন্যান্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনার মতো এ-রচনাটিও শুধুই বিদ্রূপাত্মক রচনা নয়। এতে লেখ-খকের বাস্তবতা বিষয়ক ধারনাও প্রকাশ পেয়েছে। লেখক মনে করেন আমাদের জীবনে রূঢ় কঠোর বাস্তবতা যেমন

---

৩৫৬. অজ্ঞাতনাম, 'মদনের পুণর্জ্জন্ম' "শনিবারের চিঠি" (পৌষ ১৩৩৫), পৃঃ ১০০৫-১০০৬।

৩৫৭. অজ্ঞাতনাম, 'অনুর্ব্বিহারী', ঐ, (ভাদ্র ১৩৩৬)।

৩৫৮. অজ্ঞাতনাম, 'অতিআধুনিকস্টাইল', ঐ (বৈশাখ ১৩৪৬)।

৩৫৯. অজ্ঞাতনাম, 'কখগ (জ্যামিতিকগল্প)', ঐ (কার্তিক ১৩৪৭)।

৩৬০. কলমবাজকালিরত্ন, 'অতিআধুনিক উপন্যাস', "বসুমতী" (৮ঃ২ঃ৬, চৈত্র, ১৩৩৬)।

৩৬১. অজ্ঞাতনাম, 'বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম বিবরণ', "বসুমতী" (২০ঃ১ঃ৬ আশ্বিন ১৩৫১)।

৩৬২. সীতাদেবী, 'বাস্তব', "প্রবাসী" (৩৩ঃ১, ভাদ্র ১৩৪০)।

৩৬৩. আশালতাসিংহ, 'বাস্তব ও কল্পনা', "পরিচয়" (কার্তিক ১৩৪৪)।

Dhaka University Institutional Repository

সত্য, তেমনি স্বপ্ন-আবেগ-বিষন্নতা ও মধুরকল্পনাও সত্য। ওই মধুর মুহূর্তগুলোকে তিনি জীবনের আলো বলে গণ্য করেন আর বাস্তবতাকে গণ্য করেন অন্ধকার বলে।[৩৬৪] তাঁর মতে আধুনিকলেখকদের জীবনের ওই অন্ধকার-কে একমাত্র সত্য বলে গণ্য করার প্রবণতাটি একদেশদর্শিতা মাত্র।[৩৬৫] বাহ্যবাস্তবতাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিলেও তিনি মনে করেন মানুষের 'সংগুপ্ত সুষমা ও সামঞ্জস্য'ই গভীর বাস্তব।[৩৬৬] অর্থাৎ তাঁর কাছে বাহ্যবাস্তবতার চেয়ে হৃদয়ের স্বপ্নবেদনাই গভীর বাস্তবতার মর্যাদা পেয়েছে। 'সাহিত্যিক প্রশ্নোত্তর' শীর্ষক রম্যরচনায়ও লেখকের বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক ভোলানাথ ঘোষ পরিহাসছলে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন এ-ভাবে : 'এই সাহিত্য মুকুরোপম। ইহার সম্মুখে দাঁড়াইলে আমরা আমাদের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। ললাটে আমাদের পুণ্যতিলক থাকিলে তাহার ছবি এই মুকুরে ফোটে, গন্ডে আমাদের চুনকালী থাকিলে তাহার-ও প্রতিকৃতি ইহাতে প্রতিফলিত হয়।'[৩৬৭] তিনি পরিহাস করেছেন, কিন্তু তাতেই প্রকাশ পেয়েছে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের প্রকৃতি।

৪.৮ রক্ষণশীল সমালোচকদের বাস্তবতা ধারণা ও সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক মতামত

এ-পর্যায়ের রক্ষণশীল সমালোচকদের মধ্যে একধরণের নিজস্ব বাস্তবতাধারনাও লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়েও তাঁরা মত প্রকাশ করেন। তবে তাঁরা প্রত্যেকেই বাস্তবতাবিরোধী, প্রবল ভাববাদী ও কপট। বাস্তবতা তাঁদের কাছে গণ্য হয় কুৎসিত ও অস্বস্তিকর বিষয়রূপে; ওই কদর্যকে এড়িয়ে গিয়ে সাহিত্যে শুধু সুন্দর ও ভালোর উপস্থাপনা করা উচিত বলে মনে করেন তাঁরা। তাঁরা সাহিত্যে বাস্তবতার নগ্ন নিরাবরণ উপস্থাপনার বিরোধী এবং সাহিত্যের নৈতিক উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের কারো মতে সাহিত্য উন্নত নৈতিক আদর্শের বাণী বহন করবে এবং মানুষকে শুদ্ধ পুণ্যময় জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করবে। কারো মতে সাহিত্য মানুষকে দেবে শান্তি ও শুশ্রূষা। কারো মতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টিই সাহিত্যের লক্ষ্য। তবে তাঁরা সবাই সাহিত্যে বাস্তবতার

---

৩৬৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮২।

৩৬৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮২।

৩৬৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮৩।

৩৬৭. ভোলানাথ ঘোষ, 'সাহিত্যিক প্রশ্নোত্তর', "ভারতবর্ষ" (২৬ : ১ : ৪, আশ্বিন ১৩৪৫), পৃঃ ৫১১,

Dhaka University Institutional Repository

অবিকল উপস্থাপনার বিরোধী। তাঁদের কেউকেউ মনে করেন বাস্তবজীবন সংগ্রামসংকুল, এখানে অহরহ অশান্তি বিরাজ করে। তাঁদের মতে সাহিত্য মানুষের দুদণ্ড জিরোবার আশ্রয়। ওই জগতেও যদি তিক্ত ও রূঢ় বাস্তবতাই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে তবে মানুষের আশ্রয় নেবার কোনো জায়গা থাকবে না। রক্ষণশীল সমালোচকদের প্রায় প্রত্যেকে মনে করেন সাহিত্যের বাস্তবতা ও জীবনের বাস্তবতা এক নয়। বাস্তবতা সাহিত্যসৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হিশেবে গৃহীত হবে এবং কল্পনার মিশ্রনে কবি সৃষ্টি করবেন কাব্যিক বা আদর্শায়িত বাস্তবতা। তাঁদের মতে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা ফটোগ্রাফি হতে পারে কিন্তু তাকে সাহিত্যসৃষ্টি বলে গণ্য করা যায়না। অমল হোমের মতে সাহিত্যে বাস্তবতার 'হুবহু নিখুঁত চিত্রাঙ্কন'কে সাহিত্যিক বাস্তবতারূপে গণ্য করা যায় না, যে-সাহিত্যে মানুষের মহৎ উন্নত ভাবরাশির রূপায়ন ঘটে, তাঁর মতে ওই সাহিত্যই প্রকৃত বাস্তবতাবাদী সাহিত্য।[৩৬৮] তিনি বলেন, 'আমরা দশজনে প্রতিদিন ঘরেবাইরে যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সঠিক বিবরণই যদি সাহিত্য হইত তবে তো আমাদের প্রায় সকলেরই সাহিত্যিক বলিয়া মান্য না হউক অন্তত: গণ্য হইবার পক্ষে কোন বাধাই থাকিত না। সুখের বিষয় সাহিত্যে যাহাকে বাস্তবতা (Realism) বলা হয়, তাহার অর্থ ইহা নয়।'[৩৬৯] তিনি বলেন, 'বাস্তবসাহিত্য বলিব তাহাকেই, যাহা আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের, প্রতিদিনের ঘটনার ছায়াচিত্রকে প্রতিবিম্বিত করে না, সেই ঘটনার অন্তরালে, সেই ছায়াচিত্রের পশ্চাতে মানবজীবনের সুখদু:খের বিচিত্র ইতিহাসের মর্মকথা, বিপুল সমস্যার অভিব্যক্তি- ব্যক্তিসমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাহার যোগসূত্রের সন্ধান - এ সমস্তকে কল্পনা, সত্যঅনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে।'[৩৭০] তিনি মনে করেন বাস্তবতাবাদী সাহিত্য বাহ্যবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন করবে না, প্রকৃত বাস্তবতাবাদী সাহিত্যে জীবনের পরম সত্য ও রহস্য, সামান্য বাস্তব ঘটনার অন্তরালের গূঢ়সত্য ইত্যাদি উপস্থাপিত হবে। তাঁর কাছে প্রকৃত ও মহৎবাস্তবতা হচ্ছে ওই পরম ও গূঢ় সত্য, রহস্য, হৃদয়বেদনা ইত্যাদি বিষয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা বিমুখ, ভাববাদী। ভাববাদী দার্শনিকেরা যেমন কল্পিত আদর্শলোকের ধ্রুবভাবরাশিকে বাস্তব বলে গণ্য করেন এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাস্তবতাকে ভ্রম বা প্রতিভাস বলে মনে করেন, অমল হোমও তেমনি বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে জীবনের চরম সত্য রহস্য ইত্যাদি বিমূর্ত ব্যাপারকে দিয়েছেন বাস্তবতার মর্যাদা।

---

৩৬৮. অমলহোম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯০।

৩৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯০।

৩৭০. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

একই রকম ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় অন্যদের মধ্যেও। বিভূতিভূষণ ঘোষাল মনে করেন সাহিত্যে বাহ্যবাস্তবতা অবিকল উপস্থাপিত হতে পারে না, কারণ সাহিত্যের ভুবন বাস্তবতার প্রাত্যহিক জগৎ থেকে ভিন্ন। ওই ভুবন বাস্তবজগতের মতো ক্লেদ-রূঢ়তায় পরিপূর্ণ নয়, বরং তা চিরসুন্দর। তিনি বলেন, 'মানবের দৈনন্দিন জীবন কঠোর তীব্র সত্য বটে কিন্তু তা আর্টের সত্য নয়।'[৩৭১] তাঁর মতে আর্টের সত্যে থাকে চিরন্তন সত্য ও পূর্ণতার আভাস, আর দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতা রূঢ়তা-দুঃখ-ক্লেদ পরিপূর্ণ। তাই প্রাত্যহিক বাস্তবতা সাহিত্যের বাস্তবতা হতে পারে না। তিনি বলেন, 'মানুষ যেখানে পশু—সাহিত্য, অন্ততঃ সৎ সাহিত্য, সেই দুর্ব্বলতাটুকু বড়ো করে এঁকে তাকে অপমান করে না। মানুষ যেখানে পশুত্ব থেকে দেবত্বে উপনীত হচ্ছে, প্রতি-যুগের খাঁটি সাহিত্যিক তার সেই বিজয় যাত্রার নূতন রূপ সৃষ্টি করে।'[৩৭২] সাহিত্যে বাস্তবতা ও মানবজীবনের অন্ধকার অংশকে পরিহার করার পক্ষপাতী তিনি, বাস্তবতার সুন্দর শোভন অংশটুকুই সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে বলে মনে করেন। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যে বাস্তবতার সকল অংশের নিরপেক্ষ উপস্থাপনার বিরোধী। তাঁর মতে জীবনে যা ঘটে তার বিবৃতিমাত্রই সাহিত্য নয়, সাহিত্য সুন্দর ও পরমের পরিচয় পরিস্ফুট করে বলে তিনি মনে করেন। সাহিত্যে বাস্তবতার নিরপেক্ষ নিরাবরণ উপস্থাপনাকে তিনি গণ্য করেন 'আবর্জ্জনার স্তূপ' জড়ো করা রূপে।[৩৭৩] তিনি বলেন, 'জীবনে যাহা ঘটে সেই ঘটনার বিবৃতিমাত্র সাহিত্য নহে। সাহিত্যে তাহার সামান্য কিছু স্থান হয়তো আছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ফুটাইয়া তুলিতে হয়তো অনেক সময় নিখুঁত বর্ণনা প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু শুধু লালসা অথবা কেবল বীভৎস ক্ষুধার চিত্র সাহিত্য হইতে পারে না, যদি না এই ক্ষুধা অথবা লালসার তাড়নায় যাহারা ঘুরিয়া মরিতেছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও চিত্তে মুহূর্ত্তের জন্যও একটা *Supreme moment of spiritual height* দেখা গিয়াছে এইটাই অঙ্কিত চিত্রে ফুটিয়া উঠে। .... সত্যই কি যাহা কিছু ঘটে সেই সবই সাহিত্যের বস্তু? কখনোই না। যাহা অসুন্দর, যাহা বীভৎস, যাহা কেবলই ক্লেদ পঙ্কিল তাহা সাহিত্যের বস্তু হইতে পারে না। সেই সমস্ত আবর্জ্জনার স্তূপ যাঁহারা জড় করেন তাঁহাদের হয়ত সাহস ও ধৃষ্টতা অসামান্য, কিন্তু তাহা যে বস্তুর সৃষ্টি করে তাহাতে রসবস্তুর সন্ধান মেলে না বলিয়াই তাহা সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে না।'[৩৭৪] বাস্তবতার সকল বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না বলে তাঁর বিশ্বাস।

---

৩৭১. বিভূতিভূষণ ঘোষাল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৭।

৩৭২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।

৩৭৩. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে যুগ প্রবর্তন', "মানসী ও মর্মবাণী" (২০ : ১ : ৫, আষাঢ় ১৩৩৫) পৃঃ ৪৬৯।

৩৭৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬৮-৪৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

তবে একটি শর্তে সাহিত্যে বাস্তবতার অন্ধকার অংশের উপস্থাপনা তিনি অনুমোদন করেন । রসাতলের পশুমানুষদের অন্তর্গত মহত্ত্ব নির্দেশ করা যদি কোনো লেখকের লক্ষ্য থাকে তবে তিনি রসাতলের জীবনবাস্তবতার চিত্রন করতে পারবে-ন বলে মনে করেন এই সমালোচক ।

সাহিত্যে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাকে অশৈল্পিক কাজ বলে গণ্য করেন অনিল বরণ রায় । তাঁর মতে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে রসসৃষ্টি করা যায়না । তিনি বলেন, 'মানবজীবনের সঠিক বাস্তবচিত্র দেওয়া শিল্পীর কাজ নহে, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকের কাজ ।'[৩৭৫] তাঁর মতে শিল্পীর দায়িত্ব রসসৃষ্টি করা, বাস্তবতার অনুলিপি করা নয় । শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ রাহা বাস্তবতাকে সাহিত্যসৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান বলে মনে করেন ; বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রনেই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় বলে তাঁর বিশ্বাস । তিনি বলেন, 'সত্যকথা বলিতে গেলে জীবন ও সংসার সাহিত্যের উপাদান মাত্র । সংসারের একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে । ঠিক যেমন একেবারে তেমনটি করিয়া সংসারকে আঁকা বাস্তববাদীদের একান্ত কাম্য হইলেও, তাহা সম্ভবও নয় সাধ্যও নয় । বাহিরের জিনিষ কবির মনের ভিতর দিয়া যাত্রাকালে রূপান্তর গ্রহণ করে । এই রূপান্তরিত বস্তুই সাহিত্যে বাস্তব হইয়া আমাদের আনন্দের কারণ হইয়া ওঠে ।'[৩৭৬] সাহিত্যকে বাস্তবতার প্রতিলিপিরূপে দেখতে চান না তিনি । সাহিত্য তাঁর কাছে আনন্দলাভের একটি মাধ্যম । সত্যসুন্দর দাশ মনে করেন বাস্তবসত্য ও কাব্যের সত্য দুটো ভিন্ন ব্যাপার । তাঁর মতে কাব্য যদি বাস্তবতারই পুনরাবৃত্তিমাত্র হয় তবে তা বিশুদ্ধ আনন্দ দিতে ব্যর্থ হবে । তিনি বলেন, 'জীবনের সমস্যা সমাধান, প্রেমধর্ম্ম বা লালসার লালিত্যের মূল্য বিচার সাহিত্যের কাজ নয় । সাহিত্য জীবনকে বর্জ্জন করে না সত্য, কিন্তু গভীর ভাবে গ্রহণ করে । কাব্যলোক ও বাস্তবজীবন ক্ষেত্র কখনো এক নহে; কাব্য যদি বাস্তব জীবনের পুনরাবৃত্তি মাত্র হইত তবে কাব্যের অস্তিত্বই ঘটিত না । জীবনকে যদি বলা যায় *experience*, তবে কাব্যের নাম *perfection of experience*.'[৩৭৭]

৩৭৫· অনিলবরণরায়, 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ', "বিচিত্রা" (ভাদ্র, ১৩৩৬), পৃঃ ৩৬৪।

৩৭৬· শৈলেন্দ্রকৃষ্ণরাহা, 'সাহিত্য ও জীবন', "প্রবাসী" (৩১ঃ ২ঃ ১, কার্তিক ১৩৩৮), পৃঃ ৫।

৩৭৭· সত্যসুন্দরদাশ, 'সাহিত্যে অশ্লীলতা', "বঙ্গশ্রী" (১ঃ ১ আষাঢ় ১৩৩৯), পৃঃ ২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে বাস্তবতা সাহিত্যসৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান মাত্র, ওই উপাদানরাশি পরিশোধিত হয়েই সাহিত্যিক বাস্তবতার জন্ম। সাহিত্য বাস্তবতার প্রতিলিপি মাত্র নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য 'অন্তরের অন্তরতম অনুভূতি' ও 'পূর্ণ সত্যের সৌন্দর্য'কে উপস্থাপিত করা।[৩৭৮] যে-সাহিত্যে এর উপস্থাপনা ঘটে তা-ই সাহিত্যিকবাস্তবতাসমৃদ্ধ সাহিত্য। সত্যসুন্দর দাশের বিমূর্ত ভাবরাশিকে বাস্তবতারূপে গণ্য করার প্রবণতা তাঁর চরম ভাববাদী মানসিকতারই পরিচয়বাহী।

বাস্তবসত্য ও সাহিত্যের সত্য অভিন্ন নয় বলে মনে করেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, মাখনলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখও। তাঁরা মনে করেন বাস্তবসত্য সাহিত্যে সর্বত্রগ্রাহ্য নয়। সত্যসুন্দরদাশের মতো তাঁরাও সাহিত্যিক বাস্তবতা বা সত্যের সূত্র তৈরি করেন। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে সাহিত্যের সত্য হচ্ছে সুমার্জিত সম্ভাব্য সত্য। তিনি বলেন, 'সাহিত্যে সত্যের প্রসার অর্থ এই নয় যে জীবনে যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তাহাই সাহিত্যে দেখাইতে হইবে। সাহিত্য জীবনের দর্পন হইলেও দর্পণে সুমার্জিত সুন্দর মুখখানিই দেখিতে সুন্দর; কিন্তু পূয়স্রাবী কদর্য্য ব্রনাদি দর্পণ সাহায্যে দেখিতে পাওয়া গেলেও তাহা দেখান সুরুচির কার্য্য নহে।'[৩৭৯] সাহিত্যকে তিনি গণ্য করেন দর্পণ-রূপে, তবে ওই দর্পণে কুৎসিত রূঢ় বাস্তবতার প্রতিফলন তিনি সুরুচির পরিচায়ক বলে মনে করেন না। তিনি সাহিত্যে শোভন সুন্দর বাস্তবতা উপস্থাপনার পক্ষপাতী। রূঢ় ও নোংরা বাস্তবতা যেহেতু মনকে পীড়িত করে তাই সাহিত্যে বাস্তবতার ভালো ও সুন্দর অংশের চিত্রনেরই পক্ষপাতী তিনি। তিনি বলেন, 'বাস্তবসত্য সাহিত্যের সর্ব্বত্রগ্রাহ্য নহে। সম্ভাব্য সত্যই সাহিত্যের সত্য। নিরবচ্ছিন্ন বস্তুতান্ত্রিককতা সাহিত্যকে তিক্ত করিয়া তুলে। 'কলরবে' অব্যক্ত মধুরধ্বনি নাই, তাহা কচকচিমাত্র। সাহিত্যের রসাল উদ্যানে ঢেঁকির কচকচি, ভাইভাই-এ কলহ, জন্ম জাত্র কোলাহল, কুলীদের মাতলামি বা কল লইয়া ঝিএদের কলহ, ডাক্তার আসিলে ভিজিট জুটে না, ভিজিট জুটে ত ঔষধের খরচ নাই, ছেলেটা বখাটে হইয়া যাইতেছে, মেয়েটার বিবাহের টাকা নাই, শাশুড়ী বধূ নির্যাতন করিতেছেন, কদর্য্য ভাষায় বধূর বাপান্ত করিতেছেন- এ-সকল দৃশ্য অসহ্য।'[৩৮০] মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের মতে জীবনের বাস্তবতা ও সাহিত্যের বাস্তবতা এক নয়। তাঁরমতে সাহিত্যের সত্য হচ্ছে সম্ভাব্য সত্য। তিনি বলেন, 'বস্তুর বা জীবনের সত্য বস্তু বা জীবনকে অনুভব করিয়া; কিন্তু সাহিত্যের সত্য বস্তু বা জীবনের সেই অনুভূত

---

৩৭৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২।

৩৭৯. ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'উপন্যাসপাঠ', ''বসুমতী'' (২৫ : ১ : ৪ শ্রাবণ ১৩৪৩), পৃঃ ৬২২।

৩৮০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২২।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যকে প্রকাশ করিয়া। সাহিত্য মুখ্যত প্রকাশধর্মী। তাই সাহিত্যের সত্য চিরকালই সম্ভাব্য সত্য (probable or poetic truth)।[৩৮১] তিনি সাহিত্যিক বাস্তবতার এমন সংজ্ঞা দেন : 'একটি চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যকে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে যে ঘটনা পরম্পরার ঔচিত্য (orderliness)সাহিত্যে স্বীকার করা হইয়াছে, অপরাপর চরিত্রের সংঘাত ও আপেক্ষিকতার ফলে সেই চরিত্রটি যেরূপে বিকশিত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, চরিত্র পরিণতির সেই আবেগ বা স্পন্দনই সাহিত্যের বাস্তবতা।'[৩৮২] তিনি বিমূর্ত আবেগরাশিকেই চরম বাস্তব বলে মনে করেন। চরিত্রের আবেগের ওঠানামা বা বৈচিত্র্যের রূপায়নের মধ্যদিয়েই একটি রচনাকে সাহিত্যিক বাস্তবতাসমৃদ্ধ করা সম্ভব। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শুধু বাস্তবতার সুন্দর অংশের উপস্থাপনার পক্ষপাতী। অসুন্দর বাস্তবতা পীড়াদায়ক বলে সাহিত্যে ক্লেদাক্ত বাস্তবতাকে পরিহারের পক্ষপাতী তিনি। তিনি চান শুধু শোভন ও সুন্দর বাস্তবতার গল্পকথা।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার বাহ্যবাস্তবতা ও বাস্তবজীবনকে অসম্পূর্ণ, অমার্জিত ও অসুন্দর বলে মনে করেন। বাস্তবতা অসম্পূর্ণ ও অসুন্দর বলেই সাহিত্যে অবিকল উপস্থাপিত হতে পারে না। তাঁর মতে বাস্তবতাকে কাব্যের প্রাথমিক উপকরণরূপে ব্যবহার করা চলে এবং কল্পনার মিশ্রনে ওই বাস্তবতাকে করে তুলতে হয় সুসম্পূর্ণ ও সুন্দর। বাস্তবতার সকল সুর বা অংশও সাহিত্যে উপস্থাপিত করা অনুচিত বলে তিনি মনে করেন, কারণ ওই বাস্তবতা এতোই কদর্য ও তুচ্ছ যে তা সাহিত্যে ঠাঁই পেতে পারে না। অর্থাৎ তিনি চান বাস্তবতার শোভন সুন্দর দিকগুলোই শুধু সাহিত্যে তুলে ধরা হবে। তিনি বলেন, 'ভ্রান্ত বুদ্ধির সাহিত্যিকদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, জীবনে যাহা প্রাকৃতিক, তাহা জুগুপ্সাব্যঞ্জক হইলেও সাহিত্যে চিত্রিত হইতে পারে। .... মলমূত্র ত্যাগ করা শরীরের অবস্থায় নিতান্ত প্রাকৃতিক; তাই বলিয়া উহার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা চলে না—বিষ্ঠা : সাহিত্য রচনা করা চলে না। .... যে সাহিত্যে যে জীবনে অনন্তের দৃষ্টি ফোটে না, তাহা ধন্যজীবন নয়—স্থায়ী সাহিত্য নয়।'[৩৮৩] সাহিত্যকে বাহ্যবাস্তবতার ফটোগ্রাফি করে তোলা নিন্দনীয় বলে গণ্য করেন আশীষগুপ্ত। কারণ তাঁর

---

৩৮১. মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, 'শরৎসাহিত্যে বাস্তবতার শৈলী', "ভারতবর্ষ" (আষাঢ় ১৩৫০), পৃঃ ৪৪।

৩৮২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪।

৩৮৩. বিজয়চন্দ্র মজুমদার, 'আদর্শসাহিত্য', জীবনবাণী (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, প্রকাশকাল : ১৩৪০), পৃঃ ২৩-২৪)।

Dhaka University Institutional Repository

শুধুমাত্র সত্যভাষণ শিল্পের লক্ষ্য নয়; শিল্পের লক্ষ্য অনির্বচনীয় আনন্দ ও জীবনের গূঢ়তম রহস্য নামক গভীর বাস্তবতার উপস্থাপনা।[৩৮৪] বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং আশীষগুপ্ত বাস্তবতা বলে গণ্য করছেন বিমূর্ত আবেগ বা ভাবরাশিকে। একই ধারণা পোষণ করেন সুধীরচন্দ্র কর। তিনি মনে করেন প্রত্যক্ষজগতের বাস্তবতা ও সাহিত্যের বাস্তবতা এক নয়। বস্তু ও বাস্তবতা অসম্পূর্ণ। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়েই বাস্তবতার ওই অসম্পূর্ণতা পূরণ করতে হয়। তিনি বলেন, 'কল্পনা থেকে লুঠে আনা আশ্চর্যকে দিয়ে বস্তুর অসম্পূর্ণতা টুকু পূরণ করে নিয়েই সে হয়েছে পরিতৃপ্ত এবং সেই সম্পূর্ণতর সত্তাকেই সে জেনেছে সাহিত্যের খাঁটি বাস্তবতা বলে। সাহিত্যে যখন বাস্তবতা-র কথা ওঠে তখন সংসারের হুবহু বাস্তবকে সেখানে নিয়ে দাঁড় করালে চলবেনা।'[৩৮৫] তিনি মনে করেন বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে লেখক মনের মতো বাস্তবতা সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, 'বস্তুর এই মনের মতো পরমসত্তা আছে লেখকের কল্পনায়, আর বস্তর এইমনের মতো রূপচিত্রই হচ্ছে সাহিত্যের বাস্তবতা।'[৩৮৬] তবে তিনি মনে করেন অপেক্ষাকৃত পরিশীলিতভাবে বাস্তবতার ক্লেদ-কলুষময় অংশের উপস্থাপনা করা যেতে পারে। যেমন, রসাতলের বাস্তবতাবাসী কোনো ভিক্ষুকের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনার সময় ওই রসাতলের উপস্থাপনা করা যেতে পারে, তবে এ-ক্ষেত্রে রসাতলবাসী ওই ভিক্ষুকের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব নির্দেশই হবে লেখকের প্রধান লক্ষ্য। দেখাতে হবে কলুষময় জীবন যাপন করলেও ওই ভিক্ষুক অন্তরলোকে মহৎ। তিনি বলেন, 'পঙ্কজকেই লোকে চায়- চায় না কেউ পঙ্ককে। তবু পঙ্কজের কথায় সময়ে সময়ে পঙ্কের কথাও এসে পড়ে বটে। .... পঙ্কজের আপেক্ষিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবেই ঐ পঙ্কের কথা হয় আলোচিত, এবং তাও মাত্রা রেখেই। তেমনি মাত্রা রেখে শুধু গৌনভাবেই নোংরা-মির কথা বর্ণনীয়।'[৩৮৭] বাস্তবতার ভালোঅংশকে উজ্জ্বলতর করে তোলার জন্য সাহিত্যে বাস্তবতার মন্দ অংশের কিছুটা চিত্রন তিনি অনুমোদন করেন। তবে ওই অন্ধকার অংশের নিরপেক্ষ চিত্রন তাঁর কাম্য নয়, তিনি মাত্রা-রেখে "গৌণভাবে' উপস্থাপনার পক্ষপাতী।

বাস্তবতার অন্ধকার অংশের উপস্থাপনা প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের মনোভাবও অনুরূপ। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে সাহিত্যে অন্ধকার বাস্তবতার চিত্রন তিনি অনুমোদন করেন, বাস্তব-তাঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে নয়। তিনি বলেন, 'পাপের প্রতিকৃতি যে গল্প উপন্যাসে স্থান পাইবে না

---

৩৮৪. আশীষগুপ্ত, 'আধুনিক সাহিত্য', "বিচিত্রা" (শ্রাবণ ১৩৪০) পৃঃ ৮৩।

৩৮৫. সুধীরচন্দ্রকর, 'আধুনিক বাস্তবসাহিত্য', "প্রবাসী" (৪৫:১, ১৩৫২), পৃঃ ২২৯।

৩৮৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯।

৩৮৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ-কথা আমরা বলি না। জীবনের ঘটনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা লইয়াই গল্প ও উপন্যাস। তাহা বাদদিলে ভাল-উপন্যাসই বা জমিবে কেন ? কিন্তু পাপের চিত্র অঙ্কিত করিতে গেলেই যে পাপের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে হইবে এমন কোন কথা নেই। চিত্রটী ফুটিয়া উঠিবে অথচ এমনভাবে ফুটিবে যে পাঠকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, সহানুভূতির স্থান না পায়।'[৩৮৮] কলুষময় বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনা তাঁর কাছে দূষনীয় বলে গণ্য হয়েছে, কারণ তাতে পাপের প্রতি ঘৃণা জাগবেনা। ওই বাস্তবতাকে চড়ারঙে ঘৃণ্যরূপে উপস্থাপনার পক্ষপাতী তিনি। কালিদাস রায় সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর কাছে বাস্তবতা গণ্য হয়েছে কঙ্কালরূপে, লেখক কল্পনা দিয়ে তাতে স্বাস্থ্য আর লাবণ্য যোগ করেন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, 'উপাদান ও সৃষ্টি যেমন এক নহে, বাস্তবসত্য ও সাহিত্যের সত্য তেমনি এক নহে।'[৩৮৯] তিনি বলেন, 'বাস্তবজগতে এমন বহুসত্যই আছে যাহাকে কিছুতেই মাধুর্য্যের আবেষ্টনীর মধ্যে সুন্দর করিয়া তোলা যায় না। সেজন্য বলা হয়, অনেক সত্যেরই সাহিত্যে প্রবেশাধিকার নাই।'[৩৯০] অর্থাৎ তিনি মনে করেন বাস্তবতার সকল অংশই সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না, শুধুমাত্র সুন্দর বাস্তবতাই সাহিত্যের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য উপযোগিতাবাদী, তাই সাহিত্যে 'পাপের ক্ষয় পুণ্যের জয়' নির্দেশের প্রয়োজনে ক্লেদাক্ত বাস্তবতা উপস্থাপিত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। কালিদাস রায় কলাকৈবল্যবাদী, কাব্য বা সাহিত্যে তিনিপেতে চান বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে। তাই সাহিত্যে বাস্তবতার নিরপেক্ষ অবিকল উপস্থাপনা তাঁর কাম্য নয়। তাই তিনি মনে করেন বাস্তবতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আর্টের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, আর্টের বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য সৃষ্টি।[৩৯১] সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জীবন-বাস্তবতা উপস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তাহাদের জীবনের ন্যক্কারজনক চিত্র ত তাহাদের পল্লীতে বেড়াইয়া আসিলেই দেখা যায়। সাহিত্যিককে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া সেখানেও সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে হইবে। সাহিত্যিক Municiple Inspector নহেন, - সমস্ত গলিঘুঁজি গুহা কোটর তন্নতন্ন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে বা দেখাইতে হইবে না। ...... সাহিত্যিককে মনে রাখিতে হইবে, পতিত অধমের জীবনচিত্র দেখানোই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে- তাহাদের জীবন লইয়া সাহিত্যসৃষ্টিই উদ্দেশ্য।'[৩৯২]

---

৩৮৮. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫৪।

৩৮৯. কালিদাসরায়, 'বাস্তবসত্য ও সাহিত্যের সত্য', পৃঃ ২৯।

৩৯০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।

৩৯১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।

৩৯২. কালিদাসরায়, 'বর্তমান সাহিত্য', <u>সাহিত্য প্রসঙ্গ</u> (দ্বিতীয়খণ্ড), পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করে ও আধুনিকদের পক্ষ সমর্থন করে অনেকে প্রবন্ধ লেখেন। পূর্ববর্তী লেখকদের কেউ কেউ, যেমন শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র প্রমুখ আধুনিকদের পক্ষ নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন; অখ্যাত সাধারণ অনেক প্রাবন্ধিকও আধুনিকদের পক্ষে প্রবন্ধ লেখেন, আধুনিকদের কেউ কেউও আত্মপক্ষ সমর্থন করে রক্ষণশীলদের অভিযোগ খণ্ডনে তৎপর হন। এ-সবরচনায় রক্ষণশীলদের অভিযোগ খণ্ডনের পাশাপাশি আধুনিক কথাসাহিত্যের বাস্তবতার স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। তবে বিরোধী রক্ষণশীল গোত্র ও তাঁদের উচ্চকণ্ঠ আক্রমণের পাশে আধুনিক সাহিত্যের পক্ষঅবলম্বনকারীরা ছিলেন স্বল্পসংখ্যক ও অপেক্ষাকৃত-মৃদুকণ্ঠ। রক্ষণশীলদের তুলনায় তাঁদের বক্তব্যভঙ্গী মার্জিত। তাঁরা বাস্তবতাকে সাহিত্য সৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেন। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী আধুনিকদের পক্ষ নিয়ে লেখেন 'সাহিত্য ধর্ম্ম' ("বঙ্গবাণী", ভাদ্র ১৩৩৪) শীর্ষক প্রবন্ধ। কদর্যবাস্তবতার উপস্থাপনা সুরুচির পরিচায়ক নয় বলে বাস্তবতার ওই অন্ধকার অংশকে গোপন করে সাহিত্যে শুধু ভালো বা সুন্দরের উপস্থাপনা করা উচিত বলে রক্ষণশীলেরা মনে করেন। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী রক্ষণশীলদের এই কপটতার সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন মৃত্তিকা যেমন বৃক্ষলতাগুল্মের জন্য অপরিহার্য তেমনি সৎসাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখকের সমাজ ও বাস্তবতাসংলগ্ন হওয়াও অত্যন্ত জরুরি। তিনি বাস্তবতাকে গণ্য করে সৎসাহিত্যের অপরিহার্য অবলম্বন রূপে। তিনি মনে করেন বাস্তবতার সংস্পর্শহীন সাহিত্য কাগজে ফুলের মতোনিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম। তিনি বলেন, 'মানব মনে এমন কি মানব মনের পঙ্কে যে সাহিত্যের শিকড় নাই, সে সাহিত্য যে "পদ্ম" ফোটায় সে পদ্ম রঙীন হইতে পারে কিন্তু তাহা কাগজের – তাহার গন্ধ নাই।'[৩১৩] আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে তিনি গণ্য করেন সংস্কারের শৃঙ্খলমুক্তিস্বরূপে। তাঁর মতে আমাদের সভ্যতা ও সমাজ মানুষকে এবং মানুষের মনকে নানা সংস্কার-রীতিনীতি ও কৃত্রিমতার বন্ধনে শৃঙ্খলিত করেছে, আধুনিক কথাসাহিত্যিকেরা প্রকৃত সত্য বা বাস্তবতাকে সাহিত্যে তুলে ধরে মানবমনকে ওই সংস্কারের বন্ধন--শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চায়। আধুনিকদের শৃঙ্খল ভাঙার এ-প্রয়াস তাই রক্ষণশীলদের ভীত করে তুলেছে বলে তিনি মনে করেন।[৩১৪] হেমচন্দ্র রায় আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতাকে শুধুই পাশ্চাত্যের অনুকরণজাত নয় বলে মনে করেন।[৩১৫] আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতা নতুন সময় ও জীবনবোধের অনিবার্য পরিণাম বলে মনে করেন

---

৩১৩. গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, 'সাহিত্যধর্ম্ম', "বঙ্গবাণী" (৬ঃ দ্বিতীয়ার্ধ ঃ ১, ভাদ্র ১৩৩৪), পৃঃ ৮৫,

৩১৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬।

৩১৫. হেমচন্দ্র রায়, 'নাগরিক সাহিত্য', "বিচিত্রা" (২ঃ ১ ভাদ্র ১৩৩৫), পৃঃ ৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি। তিনি বলেন, 'বর্তমানকালে সমগ্র জগতের উপর দিয়ে Industrialism -এর একটা বিপুল বন্যা বয়ে চলেছে। মানবজীবনে যন্ত্রদানবের প্রভুত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকালীন সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক জীবনের নিয়ন্ত্রিত গতিবিধির লোপ হতে লাগল। আজকাল তাই নগরে নগরে একটা যাযাবরপন্থী জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। এই যাযাবর মানবেরা ঘর বাঁধাকে এবং ঘর বাঁধার সঙ্গে যে স্থিতিশীল মনোভাব আছে সে মনোভাবকে মোটেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। এই কারনেই বর্তমান বাঙলাসাহিত্যে- যা নাগরিক জীবনের মাঝ থেকেই উদ্ভূত হচ্ছে বলতে হবে- এই যাযাবর মানবের জীবন প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়, একে শুধু পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ বলতে গেলে অবিচার করা হয়।'[৩১৬]

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক সাহিত্যের রক্ষণশীল বিরোধীরা অভিযোগ করেন যে আধুনিক লেখকেরা সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনার নামে সাহিত্যকে কলুষিত করছে। শরৎচন্দ্র বিভিন্ন প্রবন্ধে আধুনিকদের পক্ষ সমর্থন করেন, আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও ব্যাখ্যা করেন। রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় দেন, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতার সমালোচনা করেন। 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' ("বঙ্গবাণী" ১৩৩৪) প্রবন্ধে বলেন যে 'আধুনিক সাহিত্যের প্রতি কবির এতবড় অবিচার'- এ তাঁর 'বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।'[৩১৭] 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত' (১৩৩০) প্রবন্ধে তিনি আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতার কারণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে আধুনিক লেখকেরা হীন বিষয় উপাদান গ্রহণ করেছেন সাহিত্যের আভিজাত্য নষ্ট করার জন্য নয়, বিরুদ্ধ ও বিকৃত সমাজের হীনতা নির্দেশ করার জন্য। আধুনিক লেখক সমাজের নিম্নতলের মানুষদের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনার পক্ষপাতী, কারণ এর মধ্যদিয়ে ওই সাহিত্য 'মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।'[৩১৮] শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাবোধ আলোচনাকালে এ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও একাধিক প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডনের পাশাপাশি আধুনিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। "নবযুগের কথাসাহিত্য' (?) প্রবন্ধে তিনি বলেন যে আধুনিক লেখকেরা নতুনযুগের নাগরিক চেতনা ও নতুন সমাজবাস্তবতার উপস্থাপন করেছেন। সনাতন-

---

৩১৬· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৫।

৩১৭· শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি', পৃঃ ৩৭৪।

৩১৮· শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত', পৃঃ ৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

পনহীরা সাহিত্যে যে পুরাতন, অনাধুনিক, গ্রাম্য ভারতীয় জীবন বাস্তবতা ও সামস্তচেতনার উপস্থাপনা দেখতে চান, বিদেশী শাসক শাসিত বর্তমান বাঙালী জীবন তা থেকে ভিন্ন, বাঙালীর চেতনা লোকেও ঘটেছে ব্যাপক বদল। আধুনিক লেখকেরা গভীর অনুর্দৃষ্টিসম্পন্ন সৃষ্টিশীল প্রতিভা বলেই তাঁরা সাহিত্যে রূপান্তরিত এই জীবনধারা ও চেতনার উপস্থাপনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। রক্ষণশীলেরা কুসংস্কারআচ্ছন্ন, অন্ধ ও কূপমন্ডূক বলেই ওই চেতনা ও জীবন-বাস্তবতাকে বিজাতীয় ও অবাস্তব বলে গণ্য করেছেন। নতুন সময়ের আধুনিক বাঙালী নরনারী চিন্তাচেতনা কথা ও আচরণে পুরোনো বাঙালী নরনারী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আধুনিক লেখকেরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক চেতনাসম্পন্ন নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে দীর্ণ ওই নরনারীর ছাঁচে সৃষ্টি করেছেন তাঁদের পাত্রপাত্রীদের। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে এ-চরিত্রগুলো সাহেবমেম কিনা তা বিচার্য বিষয় নয়, বিচার্য বিষয় হচ্ছে আধুনিক লেখকেরা নতুনসময়ের মানুষের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনা কতোটা সমর্থ হয়েছে। তিনি বলেন যে এখন সাহিত্যে একমাত্র বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত আধুনিক সাহিত্যে উপস্থাপিত ওই পাত্রপাত্রীরা বাস্তবিকই সমকালের সংসার ও সমাজের পাত্রপাত্রী কিনা এবং যে-আবেষ্টনের ভেতর পাত্রপাত্রীদের জীবন অঙ্কিত হয়েছে তাতে ঠিক ওভাবেই চরিত্র গড়ে ওঠা সম্ভব কিনা যা যাচাই করা। অর্থাৎ বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ও চরিত্রসৃষ্টিতে আধুনিকেরা কতোখানি সফল তা-নির্ণয়ই সমকালের সাহিত্যসমালোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। [৩৯৯] রক্ষণশীলেরা আধুনিক লেখকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিপ্রচারের যে-অভিযোগ তোলেন নরেশচন্দ্র তা খণ্ডন করে বলেন নীতবোধ সর্বযুগে একই রকম নয়। একযুগে যা মহৎব্যাপাররূপে গণ্য হয় পরবর্তীযুগে তা অপ্রয়োজনীয় ভাবালুতারূপেও গণ্য হতে পারে। আধুনিকদের নীতিবোধের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটেছে। আধুনিক লেখকেরা প্রথাগত পুরোনো হিন্দুজীবনের নীতির অনুসারী নন। তাঁরা নতুন সময়ের নতুন ধরনের নীতিবোধ শাসিত। তাঁদের নীতিবোধ পুরোনো নীতিবোধ থেকে ভিন্ন। পুরোনো প্রথার অন্ধ অনুকরণই তাঁদের লক্ষ্য নয়। তাঁরা সত্যানুসন্ধানী, তাঁদের লক্ষ্য সত্য ও প্রকৃত বাস্তবতা চিত্রন। এ-কারণেই সমাজকে পরমপূজনীয় না মনে করে তাঁরা সাহিত্যে ওই পুরোনো ক্ষতগ্রস্ত সমাজের অসঙ্গতি ও নানাত্রুটিপূর্ণ নীতির চিত্র উপস্থাপনা করেছেন এবং প্রচলিত নীতি-সংস্কার সম্পর্কে লোকের প্রশান্তু তুষ্টির বিনাশ ঘটিয়েছেন। তাঁরা এ-সব নীতি-সংস্কারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন।

৩৯৯° নরেশচন্দ্রসেনগুপ্ত, 'নবযুগের কথাসাহিত্য', "যুগপরিক্রমা" (সেনগুপ্ত ট্রাস্ট কলিকাতা প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬৮) পৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মনে করেন আধুনিকেরা প্রথাগত নীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে তাকে যাচাই ও বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয়েছেন বলেই রক্ষণশীলেরা তাঁদের ওপর এমন কুপিত হয়েছেন। নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত 'সাহিত্যধর্মের সীমানা', 'সাহিত্যসংগ্রাম' প্রভৃতি প্রবন্ধেও আধুনিকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করেন।

বুদ্ধদেব বসুর 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' ("প্রগতি," মাঘ ১৩৩৪) প্রবন্ধটি প্রথম পর্যায়ের আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের ভাষ্য। এ-প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কথাসাহিত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পাশাপাশি আধুনিকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত রক্ষণশীলদের অভিযোগগুলো খণ্ডণ করেন। বুদ্ধদেব বসু রক্ষণশীলদের উচ্চকণ্ঠ আক্রমণকে 'মেছো বাজারের চ্যাঁচামি'র সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'বর্তমান বচসা যে সুরে উঠেছে, তাকে অনায়াসে মেছোবাজারের চ্যাঁচামির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।'[৪০০] রক্ষণশীলেরা অভিযোগ করেন যে নরনারীর কামজ সম্পর্কের বর্ণনাই আধুনিক লেখকদের বুদ্ধদেব বসু এ-অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন যে, বাস্তবতার উপস্থাপনাই আধুনিকদের লক্ষ্য। আমাদের জীবনে দেহসম্ভোগ বাসনা বা কাম ও প্রেম এ-দুই-ই স্বাভাবিক সত্য। তাঁর মতে আধুনিকেরা ভণ্ডামি না করে মানুষের যে একটি দেহ আছে এই 'অশ্লীল কিংবদন্তী'তে বিশ্বাস করেছেন মাত্র। তিনি মনে করেন সাহিত্যে লালসার স্থান আছে, তবে নির্জলা লালসার বর্ণনাও সাহিত্য নয়। তাঁর মতে নির্জলা লালসার উপস্থাপনা আধুনিকদের লক্ষ্য নয়। অন্যসব বিষয়ের চেয়ে নরনারীর সম্পর্কের নানা জটিলতাই আধুনিকদের কল্পনাকে বেশি উত্তেজিত করে। তাঁরা সাহিত্যে বিচিত্র জটিলতার পরিচয় নির্দেশের তাড়নাতেই নরনারীর সম্পর্কবিষয়ক অধিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তবে বুদ্ধদেব বলেন নরনারীর ওই সম্পর্কের প্রতি আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও ওই লেখকেরা তাঁদের সাহিত্যে 'হৃদয়বৃত্তির সৌন্দর্য্য ও মহিমাকেও যথেষ্ট সম্মান সহকারে স্থান দিয়েছেন।'[৪০১] এ-মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রথম পর্যায়ের আধুনিকেরা বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার কথা বললেও, নিরপেক্ষ বাস্তবতাবাদী লেখক হয়ে ওঠাকে তাঁরা শ্রদ্ধেয় বলে গণ্য করেননি। তাই শেষপর্যন্ত তাঁরা বাস্তবতাবাদী লেখক না হয়ে তাঁরা হয়ে ওঠেন রোম্যান্টিক ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রিত লেখক। তাঁরা বাস্তবতাকে দেখেন রোম্যান্টিক ভাবানুতাময়

---

৪০০. বুদ্ধদেববসু, 'অতিআধুনিক বাঙলা সাহিত্য', বুদ্ধদেববসুর রচনাসংগ্রহ(৩য়খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা প্রপ্রঃ ভাদ্র ১৩৮৩), পৃঃ ৫৫৪,

৪০১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক নির্মোহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নয়।

রক্ষণশীলেরা অভিযোগ করেন যে নিম্নতলের নোংরা জীবন ও প্রতিবেশের বর্ণনার মধ্য দিয়ে আধুনিকেরা পাপ ও কলুষের প্রতি পাঠককে অনুরক্ত করে তুলেছেন। বুদ্ধদেব বসু এ-অভিযোগ খণ্ডন করে যে-বক্তব্য পেশ করেন তাতে তাঁর বাস্তবতাবিমুখ ভাববাদী রোমান্টিক মানসিকতাই প্রকাশ পায়। এতে প্রথম পর্যায়ের আধুনিক লেখকদের ভাববাদী রোম্যান্টিক চারিত্র্যটিও প্রকাশ পেয়েছে। রসাতলের প্রতিবেশ ও পশুমানুষদের জীবন-বাস্তবতা উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সমাজের ভাগ্যবান শ্রেণীটিকে ওই বাস্তবতা সম্পর্কে সজ্ঞানকরা কিংবা বাস্তবতাবাদী সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদে তাঁরা ওই জীবনের চিত্রন করেন নি। ওই রসাতলের মানুষদের হৃদয়ের উচ্চভাব ও সুন্দরের জন্য অভিলাষের পরিচয় দেয়াই তাঁদের লক্ষ্য ছিলো। বুদ্ধদেব বসু যুবনাশ্বের "পটলডাঙ্গার পাঁচালী" গ্রন্থের কথা উদাহরণ হিশেবে উল্লেখ করেন। এ-গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে "কুৎসিত ও পাপের চিত্রে বোঝাই' এ-রচনাটি শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্য ও সার্থকতায় ভরে উঠেছে এ-কারনে যে 'আগাগোড়া কৃমিসংকুল পাঁকে' লেখক 'স্নেহের বৃন্তে' মানবিক কোমলতার 'পদ্মফুল' ফুটিয়েছেন।[৪০২] তিনি বলেন, 'অত্যন্ত নীচ ও পতিত যারা - তাদের সহস্র কুশ্রীতা অতিক্রম করেও যে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দরের জন্য অভিলাষ ব্যাকুল হয়ে উঠতে পারে, এই কথাটি অনেক আধুনিক লেখকই নানাভাবে বলতে চাচ্ছেন, দেখতে পাই।'[৪০৩] তিনি বলেন, 'বিগতযৌবনা পানওয়ালী রুকমিনীর অন্তরেও আধুনিক লেখক প্রেমের ফল্গুকে আবিষ্কার করেছেন। অতিসাধারণ পুতলির মধ্যেও কল্যাণী, প্রেমার্দ্রহৃদয়া চির মহিমাময়ী নারীকে দেখতে পেয়েছেন।'[৪০৪] সমাজের নিম্নতবাসীর জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা ওই লেখকদের লক্ষ্য নয়, তাঁদের মূললক্ষ্য নিম্নতলবাসী নরনারীর মানবিক মহত্ত্ব, প্রেমাবেগ ইত্যাদি প্রদর্শন। 'পানওয়ালী রুকমিনীর অন্তরে'র 'প্রেমের ফল্গু' বা 'অতিসাধারণ পুতলির মধ্যে' 'চিরমহিমাময়ী' নির্দেশ করার তাগিদেই আধুনিক লেখকেরা সমাজের নিম্নতলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এমন প্রবণতা বাস্তবতাবাদী লেখকের নয়, ভাববাদী রোম্যান্টিক লেখকের। আধুনিক লেখকেরা একনিষ্ঠ প্রেমে বিশ্বাসী নন বলে

---

৪০২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫৮।

৪০৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬৪।

৪০৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬০।

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষণশীলেরা অভিযোগ করেন । এরমধ্য দিয়ে আধুনিকেরা পাঠককে বহুচারিতারূপ অনৈতিকতা শিক্ষা দিচ্ছেন বলে রক্ষণশীলেরা যে-অভিযোগ করেন, তার উত্তরে বুদ্ধদেব বলেন, 'মানুষের মনোজগত এত বিরাট ও গভীর যে একটিমাত্র মানুষের সাহচর্যে তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হওয়া অসম্ভব বললেই চলে । বিভিন্ন মানুষ মনের বিভিন্ন দিকের তৃষ্ণা-নিবৃত্তি করে, সেইজন্য বহুর সংস্পর্শে এলে তবে অন্তরের পরিপূর্ণতা ঘটে ।'[৪০৫] বুদ্ধদেবের মতে তাঁর সমকালীন আধুনিকেরা তাঁরে রচনায় এ-সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন । অর্থাৎ রোম্যান্টিকদের মতোই এই লেখকরা চির অধরা অথচ চিরকাম্য চিরন্তনীকে খুঁজে চলেছেন নানা মানবীর মধ্যে । তাঁদের বহুচারিতা তাঁদের রোম্যান্টিক অস্থিরতারই ফল, ইউরোপীয় প্রকৃতবাদীদের মতো মানুষের পাশব প্রবৃত্তিকে নির্দেশের মধ্য দিয়ে বাস্তবতার প্রতিলিপি রচনা করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয় ।

আধুনিক লেখকদের পক্ষথেকে "কল্লোল"পত্রিকায় একটি আত্মপক্ষসমর্থনকারী জবানবন্দী ও মুদ্রিত হয় । এতে সমাজপতি ও আর্টের ত্রানকর্তা রক্ষণশীল গোত্রকে তীব্র শ্লেষ-বর্ষণ করা হয় । এটি রচনা করেন কৃত্তিকমভদ্রের ছদ্মনামে প্রেমেন্দ্র মিত্র ।[৪০৬] তিনি বলেন,

> এইসব সুস্থ সরল নীতিবলে বলীয়ান মানবজাতির সুনিযুক্ত ত্রাতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাধ ও ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে আমাদের ঘোরতর আস্থা আছে । মানুষের এই সামান্য তিনচার হাজার বছরের ইতিহাসেই তাঁদের হিতৈষী হাতের চিহ্ন বহুজায়গায় সুস্পষ্ট । ~~সুস্পষ্ট~~ । 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' দুটি ক্ষীণপ্রাণ কাগজের কণ্ঠদলন ত সামান্য কথা । কালে হয়ত তারা পৃথিবীর সমস্ত বিদ্রোহী ও বেসুরো কণ্ঠকেই একেবারে স্তব্ধ করে ~~ধরনীকে~~ ধরিত্রীকে শ্লীলতা ও ভব্যতার এমন দুর্গ করে তুলতে পারেন যে, অতিবড় নিন্দুকের প্রমান করতে সাধ্য হবে না, রামের জ্যামিতিক জীবন থেকে শ্যামের জ্যামিতিক জীবন বিন্দুমাত্র তফাৎ; এবং মাতা ধরিত্রী এতগুলি ছাঁচে-কাটা সুসন্তান ধারণ করবার পরম আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে সূর্যের অগ্নিজঠরে পুনঃপ্রবেশ করে আত্মহত্যা করতে চাইবেন । এতদূর বিশ্বাসও আমাদের আছে । তবে মানুষ আসলে সমস্ত শ্লীলতার চেয়ে পবিত্র ও সমস্ত ভব্যতার চেয়ে মহৎ- এই যা ভরসা ।[৪০৭]

---

৪০৫. ওই, পৃঃ ৫৬০।

৪০৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ, পৃঃ ১৬৬।

৪০৭. উদ্ধৃত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগপৃঃ ১৬৭-১৬৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী বিতর্ক

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে রক্ষণশীল সমালোচকগোত্রের পাশে দেখা দেন নতুন একগোত্র সমালোচক, যাঁরা সাহিত্যে নতুন ধরণের বাস্তবতা উপস্থাপনার কথা বলেন । এই সমালোচকেরা ছিলেন মার্কসীয় তত্ত্বশাসিত । রক্ষণশীলগোত্রের মতো তাঁদের কাছে আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতা সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ বলে গণ্য হয় নি ; তবে আধুনিক কথাসাহিত্যের বাস্তবতা তাঁদের কাছে অসম্পূর্ণ, স্বপ্নবিলাস, ভাবালুতা বলে মনে হয় । কারণ এ-সাহিত্য গণমানুষের প্রকৃত দুর্দশা, সমাজবদলের পরিচয় বা রাজনীতিক বাস্তবতাউপস্থাপনায় ব্যর্থ । এই সমালোচক-প্রাবন্ধিকেরা আধুনিক কথাসাহিত্যের সমালোচনা পাশাপাশি মার্কসীয় নন্দতত্ত্বেরও ব্যাখ্যা-ভাষ্য রচনা করেন, এবং এর মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যসৃষ্টির পরিমণ্ডল প্রস্তুত করেন । রাশিয়া ও অন্যান্য শ্রান্ত দেশগুলোতে যেমন সর্বহারা সাহিত্যের পরবর্তী স্তরে দেখা দেয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী ধারা, বাঙলা সাহিত্যে তেমন ঘটে নি । এখানে প্রথমে দেখা দেন তাত্ত্বিক-আলোচকেরা । তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির প্রাথমিক পরিমণ্ডল প্রস্তুত করেন এবং তারপর দেখা দেন সৃষ্টিশীল লেখকেরা । বিশ শতকের বিশের দশকে (১৯২৫) এ-দেশে রাজনীতিকভাবে মার্কসবাদের চর্চা শুরু হয় । তবে ওই সময়ে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আলোকে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যাচাই-এর যেমন কোনো প্রয়াস দেখা যায় নি, তেমনি মার্কসীয় তত্ত্বশাসিত সৃষ্টিশীল লেখকগোত্রেরও আবির্ভাব ঘটে নি । তবে বিশের দশকে আবির্ভূত আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের অনেকে এবং তাঁদের পূর্ববর্তী কোনো কোনো লেখক মার্কসীয় তত্ত্বশাসিত না হলেও গোর্কি দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত ছিলেন । গোর্কি প্রভাবিত এই লেখকেরা তাঁদের রচনায় উপস্থাপিত করেন নিম্নতলের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবন-চিত্র । এই লেখকগোত্রে ছিলেন জগদীশগুপ্ত, মণীন্দ্রলালবসু , নৃপেন্দ্রকৃষ্ণচট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ । কিন্তু ওই সময়ে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাসী এমন কোনো লেখকগোত্র দেখা দেননি যাদের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের সূচনাকারী বলে চিহ্নিত করা যায় । বিশের দশকের শেষদিকে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাসী দুএকজন সমালোচক আধুনিক লেখকদের বাস্তবতা উপস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা নির্দেশের পাশাপাশি মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যায়ও প্রবৃত্ত হন, তবে ত্রিশের দশকেই তাঁদের ব্যাপক আবির্ভাব ঘটে । এ-দেশের মার্কসবাদী সমালোচক ও লেখকেরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের একটি সুস্থির পরিভাষা তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছেন । সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যকে এ-দেশে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ একে বলেছেন 'গণসাহিত্য'[৪০৮], কারো মতে এটি 'প্রোলেটারীয় সাহিত্য'।[৪০৯] একে 'সংগ্রামীসাহিত্য',[৪১০] 'প্রতিবিপ্লবীসাহিত্য'[৪১১] 'প্রচারবাদী সাহিত্য',[৪১৩] প্রগতিসাহিত্য'[৪১৪] বলেও অভিহিত করা হয়। তবে অধিকাংশ আলোচক-প্রাবন্ধিকই 'প্রগতিসাহিত্য পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ'(Socialist Realism)-এরও কোনো সুনির্দিষ্ট পরিভাষা তৈরি করা হয়নি। অধিকাংশ প্রাবন্ধিক-আলোচকই এপ্রসঙ্গে কোনো কথা বলেন নি, নয়তো ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। একজন এর পরিভাষা করেন 'সাম্যতান্ত্রিক বস্তুবাদ'[৪১৫] তবে এ-পরিভাষার অন্যত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। এ-দেশে মার্কসবাদী সৃষ্টিশীল রচনার চাইতে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আলোচনা-বিতর্ক-মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে শিল্পসাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণই হয়েছে বেশি। ওই বিতর্ক- আলোচনা-সমালোচনায় মার্কসীয় তত্ত্বশাসিত সমালোচক গোত্রের বাস্তবতাবোধ ও সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক মতামত মুদ্রিত হয়ে আছে।

১৩৩৫-বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজধর্ম ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন যে আধুনিক কথাসাহিত্য সমকালীন সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ নির্দেশে নেই। শুধুমাত্র সমাজপরিবর্তনের ধারাগুলো নির্দিষ্ট করার মতো অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তি আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের নেই। শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসীরাই প্রকৃত বাস্তবতাবাদী হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন :

এই যে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের লোকেরা গ্রাম ছেড়ে ছোট ছোট শহরে বাস

---

৪০৮. প্রমথনাথবিশী, 'গণসাহিত্য', ''বঙ্গদর্শন'' (১:১:২, ভাদ্র ১৩৫৪) পৃ: ১৪০।

৪০৯. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'প্রোলেটারীয় সাহিত্যের স্বরূপ' '' মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক'' (দ্বিতীয়খণ্ড, ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত নতুন পরিবেশ প্রকাশনী কলিকাতা প্রপ্র, ১৩৮৫ দ্বিসং ১৩৮৭), ২১।

৪১০. শান্তি বসু, সংগ্রামী-সাহিত্য' মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (দ্বিতীয়খণ্ড, ধনঞ্জয়দাশ সম্পাদিত, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী কলিকাতা, প্রপ্র চৈত্র ১৩৮২ দ্বিসং শ্রাবণ ১৩৮৮) পৃ: ১৭২।

৪১১. নারায়ণগঙ্গোপাধ্যায় 'প্রতিবিপ্লবীসাহিত্য' মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (তৃতীয়খণ্ড), পৃ: ১৫১।

৪১২. চিদানন্দ দাশগুপ্ত, 'প্রচারবাদীসাহিত্য' '' পরিচয় '' (১৫:২: ৬ আষাঢ় ১৩৫৩)পৃ: ৭৯৩।

৪১৩. মানিকবন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা' '' মার্কসবাদী বিতর্ক '' দ্বিতীয়খণ্ড, প্র:৪২।

৪১৪. সুদেশবসু, 'প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা' মার্কসবাদীবিতর্ক(দ্বিতীয়খণ্ড), পৃ:১।

৪১৫. নারায়ণগঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রতিবিপ্লবীসাহিত্য', মার্কসবাদীসাহিত্য বিতর্ক(তৃতীয়খণ্ড), ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

করছে, এই যে লোকেরা ব্যবসা শুরু করেছে, ধান ডাল যবের ক্ষেত না করে পাট এবং রপ্তানী-র উপযোগী শস্যের চাষ আরম্ভ করেছে, এই যে টাকার আধিপত্য শুরু হয়েছে, যেখানে কলকারখানা সেখানে মুটেমজুরের দল ঝুঁকে পড়েছে অথচ স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘরকন্না করতে পারছে না, কিংবা যেঘরে ঘরকন্না করছে সেটি বাসের উপযুক্ত মোটেই নয়, এই যে মধ্যবিত্ত ও ভদ্রসম্প্রদায় শহরের মেসে বাস করছে, এর ফলে কি ধর্ম, সমাজ এবং গোষ্ঠী ভেঙে যাচ্ছে না—এবং সেই ভাঙনের ফলে মানুষের আচরণ ব্যবহারগুলি কি বদলে যাচ্ছে না? মুটেমজুর, চাকরবাকর, বাড়ীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চাষী ও গরীব কেরাণীর দল সকলেই অত্যাচারের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সঙ্ঘ বাঁধছে, ধর্মঘট করছে, টাকা দিয়ে মানুষের মূল্য ঠিক করছে, এককথায় 'জড়বাদী' হয়ে উঠেছে। .... মানুষের মনোবৃত্তিগুলি এবং আচারব্যবহার এমনিভাবে বদলাচ্ছে যে সেগুলি সকলেরই নজরে পড়া উচিত। নজরে পড়লে অনেকে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে ফেলেন। মনের মধ্যে একধারে ঐতিহ্যরূপ চেড়ীরদল চাবুক নিয়ে শাসাচ্ছে, অন্যধারে গালফুলো ভুঁড়িওয়ালা, গগণঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের ভট্টাচার্য্যি মশাই-এর মতন আত্মপ্রসন্ন দেশাত্মবোধ সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা সব আধ্যাত্মিক, ফলে মন কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। বস্তুতন্ত্রবাদীদের সোশিয়ালিস্ট হবার সাহস আছে কি?'[৪১৬]

আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতা তাঁর কাছে ভাবালুতা বলে মনে হয়, কারণ মুটেমজুরদের জীবনবাস্তবতা তাঁরা কোনো তত্ত্বের আলোকে দেখেননি। আধুনিকলেখকেরা ওই দরিদ্রজীবন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে দরিদ্র মানুষদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে চেয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে আধুনিক লেখকদের ওই প্রবণতা দুঃখ-বিলাস বা 'রোম্যান্টিসিজম'। তিনি বলেন, 'যেমন প্রেম শেষহবার সময় সাহিত্য সম্ভব হয়, রাগ থামলে ব্যঙ্গ রচনা সার্থক হয়, তেমনি পরের দুঃখে কান্না বন্ধ হলেই ব্যথার সাহিত্য সম্ভব হয়। আমার মনে হয় মুটেমজুর বেশ্যাকে দেখবামাত্রই যে কান্না আসে, সে কান্না চোখের দোষেই। সত্যকারের দরদ আনবার জন্য সহানুভূতি ছাড়া কার্লমার্কসের বই পড়তে হয়, তার মত এদেশে কতখানি খাটে ভেবে দেখতে হয়, এককথায় কিছু বুদ্ধি খরচ করতে হয়। দেখেশুনেও যদি দুঃখ ঘোচাবার প্রবৃত্তি থাকে তাহলে পুরোপুরি সোশিয়ালিস্ট হতে হয়।

---

৪১৬. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'সমাজধর্ম ও সাহিত্য', ওই, পৃঃ ১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রীতিও উড়ে যাবে জেনে রাখা ভালো। দরিদ্র-নারায়ণ দেশমাতার ভীষণ শত্রু। দুটোর একটিকে ছাড়তেই হবে – না একটিকে রাখা চলে? মাসিক পত্রিকা পড়ে মনে হয় যে, নব্য-সাহিত্যিকবৃন্দ দুই-ই রাখতে চান। ভাবপ্রবণতার সরুগলিতে জুড়ী হাঁকানো অসম্ভব।'[৪১৭] তিনি সাহিত্যে শুধুই নিম্নতলের দুস্থ-মানুষদের জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা চান না, তিনি চান ওই বাস্তবতার উপস্থাপনার পাশাপাশি সাহিত্য দুঃখমোচনের উপায়ও নির্দেশ করবে। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি-কর্মীর ভূমিকা পালন করবেন লেখক। তবেই লেখকের পক্ষে দরিদ্রশ্রেণীর প্রতি খাঁটি সহানুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন তিনি। তিনিও রক্ষণশীলদের মতোই সাহিত্যের উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী। রক্ষণশীলেরা মনে করেন সাহিত্য নীতিশিক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। রক্ষণশীলেরা সাহিত্যে উন্নতনৈতিক আদর্শ ও বাস্তবতার ভালো অংশের চিত্রনের পক্ষপাতী। অন্যদিকে ধূর্জটিপ্রসাদ মনে করেন সাহিত্য পালন করবে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি কর্মীর ভূমিকা, তবে তিনি দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ রসাতলের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনার বিরোধী নন। তিনি মনে করেন লেখক শুধুই ওই বাস্তবতার নিরপেক্ষ চিত্রকর হবেন না, তিনি দুঃখমোচনের সমাজতান্ত্রিক উপায়ও নির্দেশ করবেন। সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেন মার্কসবাদী সমালোচক-প্রাবন্ধিকদের প্রত্যেকে।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের "পরিচয়" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় হুমায়ুন কবীরের 'সাহিত্যে বাস্তবতা' নামক প্রবন্ধ। লেখক এ-প্রবন্ধে আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও স্বপ্নবিলাসী বলে অভিযোগ করেন। তিনি মনে করেন স্বপ্নবিলাসী বাস্তবতাবিচ্ছিন্ন আধুনিক লেখকেরা সাহিত্যে অবাস্তব স্বপ্নঘোরের উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে জাতিকে পলায়নবাদী করে তুলেছে। এ-সাহিত্যে দেশের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃত অবস্থা বলতে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন, পরাধীন জাতির অন্তরের গ্লানি-আলোড়ন, দরিদ্র-নিপীড়িত শ্রেণীর দৈন্য-ক্ষুধা-হাহাকার ইত্যাদি বুঝিয়েছেন। আধুনিকেরা সমকালীন সমস্যা বা বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে হৃদয়াবেগের চর্চায় মত্ত বলে তিনি মনে করেন।[৪১৮] তিনি আধুনিকদের সংরাগমনস্কতাকে 'রোম্যান্টিকদের কেতকীবনের স্বপ্নবিলাস' বলে অভিহিত করেন। আধুনিকেরা জীবন ও সমাজ বিচ্ছিন্ন আত্মপরায়ণ বলেই তাঁদের রচনা সংরাগনির্ভর। ওই লেখকেরা বাস্তবতাবিমুখ ও সমাজ বিচ্ছিন্ন বলেই তাঁদের সাহিত্যে সামাজিক ও রাজনীতিক

---

৪১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

৪১৮. হুমায়ুনকবীর, 'সাহিত্যেবাস্তবতা', "পরিচয়" (কার্তিক ১৩৩৯) পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা উপেক্ষিত, এমন কী তাঁদের নিজস্ব কোনো রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীও নেই। তিনি বলেন :

> ' সকল সাহিত্যই যে প্রপাগান্ডা বা কেবলমাত্র মতামতপ্রকাশমূলক হবে এমনকথা কেউই বলে না। কিন্তু কোন কথা বলতে গেলেই তাতে কোন না-কোন মতপ্রকাশ পায়, এবং সে-ভাবে সাহিত্যে যদি মতামত প্রকাশ না থাকে তবে সে সাহিত্যের জীবনের সঙ্গে যোগ শিথিল হয়ে আসে। এ স্বপ্নবিলাস কেবলমাত্র কেতকী ছায়ায় চন্দ্রালোকে মেঘআলোতে হাসিকান্নার লীলা দিয়েই প্রকাশ পায় না- তথাকথিত অতিআধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয়, তার উগ্র জোর করা বাস্তবতার মধ্যেও এর লক্ষণ দেখেছি বলে মনে হয়। জীবনে যে সেক্সের স্থান আছে একথা অস্বীকার করা যেমন বাতুলতা, জীবনে সেক্স ছাড়া আর কিছুরই স্থান নাই সেকথা বলাও ঠিক সমানই বাতুলতা। .... দেহের মিলনই যেমন ভালবাসার সমস্তখানি নয়, ঠিক তেমনি ভালবাসাও জীবনের সমস্ত প্রান্তিকে জুড়ে নাই। এখানেই দেশের দারিদ্র্য, দেশের ক্ষুধা, দেশের জনসাধারণের অন্নচিন্তার কথা ওঠে। জীবনের ভিত্তিতে ক্ষুধা এবং সেক্সের মধ্যে কোনটা যে গভীরতর, সেবিষয়ে হয়তো তর্ক চললেও চলতে পারে, কিন্তু দুটোই যে জীবনের একান্ত মূলে, সেকথা অস্বীকার করবার তো উপায় নাই।'[৪১৯]

ইন্দ্রিয়গত জীবনকে তিনি জীবন বাস্তবতার গৌণ ব্যাপার রূপে গণ্য করেন। সাহিত্যে ইন্দ্রিয়জীবনের উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে আধুনিক লেখকদের বাস্তবতাবাদী হয়ে ওঠার প্রবণতা তাঁর কাছে গণ্য হয় একদেশদর্শী ব্যাপার বলে এবং ওই সাহিত্যের বাস্তবতা গণ্য হয় 'জোর করা বাস্তবতা'রূপে।

ত্রিশের দশকের শেষভাগে ' প্রগতি লেখক সংঘে'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "প্রগতি"(১৯৩৭)শীর্ষক সংকলনগ্রন্থ। এ-গ্রন্থে সাহিত্যবিষয়ক চারটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রচিত এই প্রবন্ধগুলোতে আধুনিক কথাসাহিত্যের সমালোচনার পাশাপাশি প্রগতিসাহিত্যের স্বরূপ নির্দেশ করা হয়। এই প্রাবন্ধিকেরা আধুনিক কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত বাস্তবতাকে খণ্ডিত, কল্পিত, বন্ধনহীন অসুস্থকল্পনা বলে

---

৪১৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

মনে করেন। সাহিত্যে ব্যক্তিজীবনবাস্তবতার উপস্থাপনার বিরোধী তাঁরা, রাজনীতি ও সমষ্টি জীবনবাস্তবতা নির্ভর সাহিত্যকেই মহৎ রচনার মর্যাদা দেন তাঁরা। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাহিত্যে প্রগতি' প্রবন্ধে–বলেন যে আধুনিক কথাসাহিত্যিকেরা সমকালীন বাস্তবতার উপস্থাপনায় ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি সাহিত্যে অরাজনীতিক বাস্তবতার পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন :

> .... বর্তমানের বাংলাসাহিত্যে একটা *anachronism* (কালব্যতিক্রম) রয়েছে। আমরা আছি একযুগে, কিন্তু সাহিত্যের চিত্র হইতেছে আর একযুগের। ইহা সত্যবটে যে, ভারতীয় সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু ইংরেজশাসনের জন্য এবং কলকারখানার জন্য যে মধ্যশ্রেণী বা বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বত্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহারা ভারত-শাসনে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন আমাদের সাহিত্যে কোথায়? তৎপর, আজকাল যে ভারতের সর্বত্র শ্রমিক ও কৃষক জাগরণ হইতেছে, তাহারাই যে স্বরাজশাসনের ভার লইবার অধিকারী বলিয়া দাবী করিতেছে তাহারও নিদর্শন সাহিত্যকৈ?'[৪২০]

মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনীতিক জীবন ও সমকালীন শ্রমজীবী আন্দোলনের উপস্থাপনা ঘটেনি বলেই আধুনিক কথাসাহিত্যকে, সমকালীন বাস্তবতাবিমুখ বলে মনে হয়েছে। বিপ্লব ও আন্দোলনের জীবনকেই তিনি গণ্য করেন বাস্তবতা বলে, নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা বা রাজনীতিক আন্দোলনের সংস্পর্শশূণ্য সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন তাঁর কাছে বাস্তবতারূপে গণ্য হয় না। আধুনিক সাহিত্যের নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা তাঁর কাছে বিজাতীয় সমস্যার অনুকরণ বলে মনে হয়। তিনি বলেন, '....... হালে যে এক প্রকার নূতন সাহিত্যের উদয় হইয়াছে, ... ইহা যেন কেবল "এডিপুস কমপ্লেক্সের" অনুসরণ করেই পরিশ্রান্ত হইতেছে। ইহাতে সমাজকে আধুনিক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার কোনো আদর্শই প্রদত্ত হইতেছে না। ইহাতে জনের সন্ধান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না – গণের তো নয়ই। কেবল পাওয়া যায় যৌন সম্বন্ধের কাহিনী। কিন্তু যৌন সম্বন্ধই সমাজের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়। এই সাহিত্যে সমাজের বর্তমান সমস্যাগুলির আলোচনা হইতেছে না। অনুমান হয় একপ্রকারের ইউরোপীয় ভাবধারা বাঙালী সমাজে আরোপিত করিয়া একটা অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন করা হইতেছে।'[৪২১]

৪২০• ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাহিত্যে প্রগতি, <u>মার্কসবাদীসাহিত্য বিতর্ক</u>(তৃতীয় খণ্ড), পৃঃ ৫২।

৪২১• পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যকে তিনি গণ্য করেন সমাজসমস্যা আলোচনার একটি মাধ্যম রূপে। প্রতিটি যুগের সাহিত্য সমকালীন সমাজের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম সঙ্কটের চিত্রনের মধ্যদিয়েই শুধু যথার্থ 'রিয়েলিস্টিক' হতে পারে বলে মনে করেন। তাই রাজনীতিসংস্পর্শশূন্য মধ্যবিত্ত জীবনবাস্তবতা নির্ভর আধুনিক কথাসাহিত্য তাঁর কাছে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের মর্যাদা পায় না, কারণ তাঁরমতে ওই সাহিত্য" Space and time "কে ঠিকভাবে ধরিয়া চলিতেছে না।'[৪২২] তিনি বলেন, 'তাই একদল নূতন শ্রেণীর লেখকের প্রয়োজন, ... যাঁহারা সমাজ ও সাহিত্যকে সনাতন গণ্ডী হইতে বাহির করিবেন এবং কালব্যতিক্রমের অসামঞ্জস্যের কবল হইতে রক্ষা করিবেন।'[৪২৩] তিনি মনে করেন গণসাহিত্য রচনার মধ্য দিয়েই সমকালীন বাস্তবতার যথাযথ উপস্থাপনা করা সম্ভব। গণসাহিত্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গণশ্রেণীর দুঃখ ও দারিদ্র্য, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা, হৃদয়ের বেদনা ও সুখেচ্ছার কথা লইয়া এবং তাহাকে সমাজের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার world-view নিয়ে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহাকে গণসাহিত্য বলা যায়।'[৪২৪]

বিজয় চট্টোপাধ্যায়ও সাহিত্যের উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী। তিনি 'প্রগতি সাহিত্যেররূপ' প্রবন্ধে শিল্প-সাহিত্যকে বুর্জোয়া সমাজ চূর্ণ করার হাতিয়ার রূপে নির্দেশ করেন। তাঁর মতে লেখক তাঁর রচনায় দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্রমানুষের দারিদ্র্য ও সংগ্রামপূর্ণ জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে শ্রেণীহীন সমাজসৃষ্টির জন্য কাজ করবেন। তাঁর মতে সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটবে একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তিনি বলেন, 'কি হবে আর্টের কল্পলোকে বিচরণ করে যদি কোটী কোটী মানুষের জীবনের উপরে দুঃসহ দুঃখ জগদ্দল পাথরের মতই চেপে থাকে? সেআর্টের মূল্য কি যা পুরাতন বুর্জোয়া সমাজকে চূর্ণ করতে করে না সাহায্য? সে সাহিত্যের দাম কি যা শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টির পথে হয় না সহায়?'[৪২৫] সমাজবদলই তাঁর কাছে গণ্য হয়েছে বাস্তবতারূপে। ধূর্জটিপ্রসাদও মনে করেন সাহিত্যে সমষ্টির জীবনবাস্তবতারই উপস্থাপনা হওয়া উচিত। তাঁর কাছেও

---

৪২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫।

৪২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫।

৪২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫।

৪২৫. উদ্ধৃত, মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক (প্রথমখণ্ড), পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবদলই গণ্য হয় বাস্তবতারূপে, এবং যে-সাহিত্যে সমাজ বদলের কারণ, প্রক্রিয়া, ধারার পরিচয় তুলে ধরা হয় ও সমষ্টির জীবনচিত্রন করা হয় তাকেই তিনি গণ্য করেন প্রগতিশীল বাস্তবতাবাদী সাহিত্যরূপে। আধুনিক কথাসাহিত্যের ব্যক্তিস্বাদ তাঁর কাছে নিন্দনীয়, কারণ তাঁর মতে তা শুধু ব্যক্তির বিলাপ-প্রলাপের উপস্থাপনা করে; সমাজসমস্যা, সমস্যার কারণ ও সমাধান নির্দেশিত হয় না। এ-কারণেই এ-সাহিত্যকে তাঁর কাছে বাস্তবতাবাদী সাহিত্য বলে মনে হয় না। তিনি বলেন, 'এখন সমাজ বদলেছে। নতুন সাহিত্যিকের লেখায় পরিবর্তন সম্বন্ধে সন্দেহের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু কেন হল, কিভাবে হল, এই জ্ঞানের কোনো পরিচয় পাই না। ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখে খেতে পাচ্ছে না, তাই কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টের কারণ সে নিজে ফুটতে পারছে-না- মাত্র এইটুকু কথাসাহিত্যে ফুটেছে। কবিতায় বিষাদের ছায়া দেখেছি, কিন্তু কিসের বিষাদ? সেই একই কারণে, অর্থাৎ কবি নিজে ভালোভাবে থাকতে পারছেন না। এঁরা যেন সকলেই ভালো চাকরী খুঁজছেন। বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্য বড় চাকরীর দরখাস্ত লেখার সামিল হয়েছে। যাঁরা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হা-হুতাশ করেন তাঁরা লোক ভালো, কিন্তু রোম্যান্টিক।'[৪২৬] তাঁর মতে আধুনিক কথাসাহিত্য প্রগতিশীল সাহিত্য নয়, কারণ তাতে সমাজপরিবর্তনের কারণ নির্দেশিত হয় না। তিনি বলেন, 'আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোনো যথার্থ তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ঝুটো মনে হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানআসুক, তার ওপর রূপসৃষ্টি হোক, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে। .... সমাজজীবনের রূপপরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায় তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অতিনবত্ব বলে আমি আর ভুল করতে রাজী নই,'[৪২৭] সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী 'সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা' প্রবন্ধে সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তব ও কল্পনার সম্বন্ধ নিরূপণে তৎপর হন। তিনি মনে করেন সাহিত্যে বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রনে রচিত হয়ে থাকে। তাঁরমতে, 'কল্পনার সঙ্গে সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য যোগ' রয়েছে।[৪২৮] তিনি বলেন, 'বাস্তবজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, সাহিত্যকে তার পরিচয় দিতে হয় বলেই, সাহিত্যিক কেবলমাত্র অবাস্তবকে বর্জন করেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার সাহায্যে সে সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও তাঁকে করতে হয়। কারণ, যত সমস্যার সৃষ্টি হয়, তত সমস্যার

---

৪২৬. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'প্রগতি', মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (তৃতীয়খণ্ড), পৃঃ ৪৬।

৪২৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬।

৪২৮. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, 'সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা', ওই, পৃঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

সমাধান ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের আসরে উপস্থাপিত করা লোকোত্তর সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব। সুতরাং কল্পনার সঙ্গে সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য যোগ অবশ্যম্ভাবী।'[৪২৯] তিনি মনে করেন লেখক বাস্তবতার নানা সঙ্কট এবং পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনের নানা সমস্যার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করবেন। তবে ওই বাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনাতেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হবে না, তাঁকে সমস্যার সমাধানও নির্দেশ করতে হবে। তিনি সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে যে শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করবেন এমন নয়, কল্পনার সাহায্যেও সম্ভাব্য সমাধান তিনি নির্দেশ করবেন। সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক লেখকের এই মন্তব্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীদের বাস্তবতা বিষয়ক অভিমতই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীরা শুধু বিপ্লবী শ্রমজীবীদের বর্তমান জীবনবাস্তবতারই রূপায়ন করেন না, তাঁরা কল্পনার সাহায্যে বিপ্লবের সুন্দর ও শুভ পরিণামও নির্দেশ করেন। তাঁরমতে সমাজ ও ব্যক্তির সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ধনোৎপাদন ও ধনবন্টন পদ্ধতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বাস্তবতাকে তিনি বিচ্ছিন্ন বাস্তবতা রূপে দেখেন না। তাঁর কাছে বাস্তবতা ও ব্যক্তিজীবন অর্থনীতিনিয়ন্ত্রিত। তিনি বলেন, 'সমাজের পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক জীবনের ধারা অতীন্দ্রিয় অদৃষ্ট শক্তির লীলাক্ষেত্র নয়, ধনোৎপাদন ও ধনবন্টন পদ্ধতি ঐতিহাসিক ধারার নিয়ামকরূপে সর্বদাই বর্তমান থাকে। সুতরাং সমাজের মানুষের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির রূপায়িত সমস্যা, তার সমাধানের জন্য কল্পনার অঙ্গুলি নির্দেশ ঐতিহাসিক অগ্রগতির পূর্বসঙ্কেতরূপে গ্রহণ করা যায়।'[৪৩০] এ-সংকলনগ্রন্থটি তথা প্রগতিসাহিত্যবাদীদের মতাদর্শ রক্ষণশীল সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। 'বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি প্রগতি সাহিত্যবাদীদের কঠোর সমালোচনা করেন। প্রগতিবাদী সাহিত্যকে তিনি 'শিশ্নোদর সর্ব্বস্ব' সাহিত্য বলে অভিহিত করেন।[৪৩১] প্রগতিবাদীদের পূর্ববর্তী সাহিত্যকে বাতিল করে দেবার প্রবণতার সমালোচনা করে তিনি বলেন, '.........সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া, 'প্রগতি' নামক একটি অনার্য্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া, ভদ্রবেশী বর্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর চত্বরের পণ্য বীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে।'[৪৩২] প্রগতিবাদী লেখক ও প্রাবন্ধিকদের

---

৪২৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭-৪৮।

৪৩০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯।

৪৩১. মোহিতলাল মজুমদার, 'বাংলার প্রগতিবাদীসাহিত্যিক', সাহিত্যবিতান (বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৪৯), পৃঃ ১৯৭।

৪৩২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সাহিত্যের 'হরিজন' বলে মনে করেন এবং প্রগতিআন্দোলনকে তাঁর কাছে সাহিত্যের জগতে ওঠার প্রানান্ত প্রয়াস বলে মনে হয়।[৪৩৩] তিনি বলেন, '········এই 'প্রগতি'র ধ্বজাধারিগণ এতদিন এই ভূমণ্ডলেই অ-ন্যনামে পরিচিত ছিলেন; বিদগ্ধ রসিক সমাজও যেমন সকলদেশে সকলকালেই ছিল ও আছে, এই পণ্ডিতম্মন্য অসভ্যবর্বরেরাও তেমনই সকল যুগে সকল সমাজে বিদ্যমান ছিল। আজ যুগধর্মের সুযোগে-মানবসভ্যতার এই অতিশয় সঙ্কটময় দুর্দিনে, ইহারা, এই রস অধিকার বঞ্চিত হরিজনেরা, জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল সুরু করিয়াছে।'[৪৩৪]

আধুনিক কথাসাহিত্যে গণজীবনের প্রকৃত অবস্থা বিধৃত হয় নি বলে মনে করেন বসুধা চক্রবর্তী। 'সাহিত্যের দিগদর্শন' ("পরিচয়," আশ্বিন ১৩৪৮) প্রবন্ধে তিনি বলেন যে আধুনিক সাহিত্যে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে, শ্রমজীবী সর্বহারা জীবনের উপস্থিতি তাতে লক্ষ্য করা যায় না। অর্থনীতিক টানাপোড়েন ও ব্যর্থতায় ওই মধ্যবিত্ত জীবন বিক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, 'আপন শ্রেণীর ব্যর্থতা দিয়ে মধ্যবিত্ত সাহিত্যিক জনজীবনের হাহাকার উপলব্ধি করতে চাইছেন।'[৪৩৫] বৃহত্তর গণজীবন সম্পর্কে আধুনিকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, তাঁদের মধ্যে নেই বিপ্লবী হয়ে ওঠার শক্তি ও বিপ্লবের অংশগ্রহণের সাহস। আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতা-কে তাই তিনি শ্রদ্ধাযোগ্য বলে গণ্য করেন না। তিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক অবস্থাচক্রে পায়ের তলার মাটি সরে যা-বার দরুণ সববিষয়ে আস্থাহীনতার যে "সিনিসিজম" মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করেছে আধুনিক সাহিত্য তারই প্রকাশ।'[৪৩৬] আধুনিক সাহিত্যকে তিনি ব্যক্তিস্বাদী সাহিত্য বলে নিন্দা করেন। তাঁরমতে পৃথিবীব্যাপী যে অর্থনী-তিক-রাজনীতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তাতে ব্যক্তির পক্ষে আর বিচ্ছিন্ন ও আত্মমগ্ন জীবনযাপন সম্ভব নয়, অ-স্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনের ব্যক্তির নিজেকে সমষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে নিতে হবে। মধ্যবিত্ত লেখকেরা ওই সমষ্টির জী-বনবাস্তবতার স্বরূপ নির্দেশে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে করেন তিনি এবং এ-কারণে ওই সাহিত্যকে তিনি অসম্পূর্ণ সা-হিত্য বলে গণ্য করেন।[৪৩৭] তিনি সাহিত্যে শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবনবাস্তবতার পরিচয় পেতে চান এবং শুধুমাত্র ওই জীবনকেই বাস্তবতারূপে গণ্য করেন। বাস্তবতা সম্পর্কে একই মনোভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য প্রগতিবাদী সমালো-

---

৪৩৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৯।

৪৩৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৮-১৮৯।

৪৩৫. বসুধা চক্রবর্তী, 'সাহিত্যের দিগদর্শন', "পরিচয়" (আশ্বিন ১৩৪৮), পৃঃ ২৬৩।

৪৩৬. ওই, পৃঃ ২৬৪।

৪৩৭. ওই, পৃঃ ২৬৪-২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

চকদের মধ্যেও। পুলকেশ দে সরকার আধুনিক লেখকদের ইংরেজ প্রবর্তিত 'পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের ভ্রষ্ট সংস্করণ' বলে অভিহিত করেন।[৪৩৮] কারণ এই লেখকেরা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতোই প্রথাগত সমাজকে শ্রদ্ধা করে চলেছেন, কিন্তু কখনো এর বদল ঘটাবার কথা বলেননি। আধুনিকেরা আত্মসর্বস্ব প্রগতিবিমুখ। তাই তাঁরা শহরের দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের ঘরোয়া জীবনবাস্তবতা ও মানসিক দুঃখকষ্টের গল্প লিখেছেন। আধুনিকদের যৌনজীবন চিত্রনের প্রবণতাকেও বাস্তবতামনস্কতা বলে গণ্য করেন নি তিনি। তাঁর মতে আধুনিকদের যৌনবিপ্লব পিউরিটানিজমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ামাত্র। ওই সবই ন্যুট হামসুন থেকে ধার করা এবং নিছকই পর্ণোগ্রাফি।[৪৩৯] আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে তিনি অর্থহীন বলে গণ্য করেন; কারণ জীবন ও বাস্তবতা সম্পর্কে ওই লেখকদের কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই এবং বর্তমান দুরবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো পথ নির্দেশ তাঁরা করতে ব্যর্থ। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এদের মধ্যে ঢুকলে কেমন একটা নিউরোটিক আত্মহত্যার ভাবোদ্রেকে গা ছমছম করে। ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে বড়জোর এঁরা কিছু হঠাৎ বাবু বা upstart -এর সৃষ্টি করেছেন ....।'[৪৪০]

আধুনিক সাহিত্যে সমাজের বৃহত্তর অংশের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপিত হয় নি বলে অভিযোগ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন এ-সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী জীবনের উপস্থাপনা ঘটেছে মাত্র, অশিক্ষিত অন্ত্যজের জীবন এ-সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হয়ে আসে নি। তাই এ-সাহিত্যকে তিনি গণ্য করেন জনবিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্য রূপে।[৪৪১] আধুনিকদের মনস্তত্ত্বপরায়ণতা প্রগতিবাদী সমালোচকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে গণ্য হয় নি। অচ্যুত গোস্বামী মনে করেন আধুনিকদের মনস্তত্ত্ব পরায়ণতা তাঁদের পলায়ণবাদী চারিত্র্যেরই পরিচয়বাহী। আধুনিকেরা বিপ্লব ও প্রগতিবিমুখ। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবল বিরুদ্ধশক্তির কাছে পরাজয়ই ওই লেখকদের মধ্যে এমন পলায়ণমুখী মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। বিপ্লবী হবার সাহস ও শক্তির অভাবেই তাঁরা সমাজের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর সংগ্রামকে উপেক্ষা করে মনস্তত্ত্বমনস্ক হয়ে উঠেছেন।[৪৪২] সাহিত্যকে

---

৪৩৮. পুলকেশদে সরকার, 'আমাদের সাহিত্য', "পরিচয়" (চৈত্র ১৩৪৯) পৃঃ ৬৪২।

৪৩৯. ঐ, পৃঃ ৬৪৩।
~~(তৃতীয়খণ্ড), পৃঃ ৩৭–৩৮~~

৪৪০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪৯।

৪৪১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মন্বন্তর ও সাহিত্য', "ভারতবর্ষ" (৩২ঃ২ঃ৪, চৈত্র ১৩৫১), পৃঃ ১৮৭।

৪৪২. অচ্যুত গোস্বামী, 'বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ততম অধ্যায়', "পরিচয়" (পৌষ ১৩৫৩), পৃঃ৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

এই সমালোচকেরা গণ্য করেছেন বিপ্লবের হাতিয়ার রূপে। ওই সাহিত্যে তাঁরা পেতে চান শ্রমজীবীদের বিপ্লবী জীবনের পরিচয় এবং দেখতে চান বিপ্লব পরবর্তী এক সমৃদ্ধ সর্বহারা সমাজের ছবি। সমাজের অন্যকোন স্তরের জীবননির্ভর সাহিত্যকে তাঁরা বাস্তবতাবাদী ও প্রগতিবাদী সাহিত্যের মর্যাদা দেন নি। এর মধ্য দিয়ে বিচিত্র বিষয় নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টির পরিধিকে তাঁরা করে তোলেন সঙ্কীর্ণ। পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যের সমালোচনার পাশাপাশি প্রগতিবাদী সমালোচকেরা ফরাশি বাস্তবতাবাদী ধারাকেও আক্রমণ-সমালোচনা করেন। রণেন মজুমদার 'শ্রান্ত রিয়ালিজম' ("পরিচয়", আষাঢ় ১৩৪৭) প্রবন্ধে ফরাশি বাস্তবতাবাদী সাহিত্যধারাকে 'নোংরামিতে পরিপূর্ণ' বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন।[৪৪৩] এ-প্রবন্ধে বিপ্লবপূর্ব ও বিপ্লবপরবর্তী রুশসাহিত্যের বাস্তবতার প্রতি লেখকের অন্ধ পক্ষপাত প্রকট। এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ফরাশি বাস্তবতাবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াসও গোপন থাকে না। ফরাশি বাস্তবতাবাদীদের বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনার প্রবণতা তাঁর কাছে নিন্দনীয় মনে হয়, ওই সাহিত্যে উপস্থাপিত বাস্তবতাকেও তিনি ঘৃণ্য মনে করেন। তিনি বলেন ফরাশিরা 'ব্যাধিগ্রস্ত' ও নোংরামিতে ভরা বিকৃত জীবনের সৃষ্টি করেছে।'[৪৪৪] তাঁর মতে মপাসাঁ 'বস্তুতান্ত্রিকতাকে একটা দুরারোগ্য যৌনব্যাধিতে পরিণত করেছেন, জোলা পাগলা কুকুরের মত ক্ষিপ্ত হয়ে যাকেতাকে আক্রমণ করেছেন .... ফ্লবেয়ার মানসিক রুগ্নতায় নিমগ্ন হয়ে আফিঙ খোরের মত ঝিমিয়ে পড়েছেন, ... এককথায় ফরাশি সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি বিকৃত জীবনের ইতিহাস।'[৪৪৫] তাঁর মতে ফরাশি ওই 'বস্তুতান্ত্রিকতায় *Soul Force* '-এর কোনো উপস্থিতি নেই। অন্যদিকে শ্রান্ত রিয়ালিজম বিকৃত জীবন সৃষ্টি করে নি, ওই 'রিয়ালিজম যে শুদ্ধমাত্র একটা থিওরী নয়, অক্সিজেনের মত একটা অপরিহার্য্য বস্তু, রুশসাহিত্যিকেরা সেটা প্রমাণ করেছেন।'[৪৪৬] ফরাশি বাস্তবতাবাদকে তাঁর মনে হয়েছে এক কৃত্রিম বস্তুপিণ্ড বলে আর রুশ বাস্তবতাবাদের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন 'একটা *elan vital* বা আদিম জীবনী শক্তির বেগ।'[৪৪৭] রুশ বাস্তবতাবাদের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ এই আলোচক ওই বাস্তবতাবাদের চারিত্র্য নির্দেশ প্রসঙ্গে

---

৪৪৩. রণেন মজুমদার, 'শ্রান্ত রিয়ালিজম', "পরিচয়" (আষাঢ় ১৩৪৭), পৃঃ ৫৫৩।

৪৪৪. ওই, পৃঃ ৫৫২।

৪৪৫. ওই, পৃঃ ৫৫২।

৪৪৬. ওই, পৃঃ ৫৫৬।

৪৪৭. ওই, পৃঃ ৫৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, 'এঁদের বস্তুতান্ত্রিকতায় 'সমাজের Surface study 'বা 'দৃশ্যমান বস্তুজগতকে পর্যবেক্ষণ করবার' সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে একটা fundamental uneasiness জাগে এবং এই uneasiness -এর দরুণ সর্ব্বাঙ্গীময় একটা প্রবল অথচ বিষন্ন বিদ্রোহের সুরও পাঠকের সমস্ত তন্ত্রীতে নাড়া দিয়ে যায়। এই ক্ষমতার নাম হচ্ছে Soul force'।[৪৪৮] নিরপেক্ষ বাস্তবতার চিত্রন তাঁর কাম্য নয়, ভাববাদীদের মতো তিনিও সাহিত্যে একধরণের আদর্শবাদের উপস্থিতি প্রত্যাশা করেন।

প্রগতিসাহিত্যের লক্ষ্য নিয়ে দশকে দশকে বিতর্ক দেখা দেয়। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে প্রগতিলেখকসংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসু 'Bengali literature Today: position of Modern writer' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বুদ্ধদেববসু মনে করেন বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত সমকালীন বাঙালি লেখকদের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনবাস্তবতা নির্ভর প্রকৃত গণসাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়, কারণ শ্রমিকজীবনের সঙ্গে ওই লেখকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সামান্য। প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া ওই জীবনবাস্তবতার যে ছবি আঁকা, তা হবে অবিশ্বাস্য ও বানোয়াট কাহিনীমাত্র। মধ্যবিত্ত জীবনবাস্তবতার পাশাপাশি শ্রমজীবীদের ক্লেদাক্ত অন্ধকার জীবনবাস্তবতাও সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তবে তিনি সাহিত্যের উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী নন। তিনি মনে করেন কাব্য কখনো সমাজবদলের হাতিয়ার হতে পারে না। সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা কর্মকান্ডের মধ্যদিয়েই সমাজ পরিবর্তন করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন শ্রমজীবীদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টি করতে হলে, রচনা করতে হবে শিল্পগুণশূণ্য উগ্র প্রচারবাদীসাহিত্য, কারণ উন্নত শিল্পগুণ সমৃদ্ধ সাহিত্য অনুধাবনের শিক্ষা ও রসবোধ তাঁদের নেই। ফলে নিম্নমানের শিল্পগুণশূণ্য রচনার জঞ্জালে সাহিত্যাঙ্গন ভরে উঠবে। তিনি বলেন,

> আজ একথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে এই মূষিকবিবর থেকে জোর করে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের নূতন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই, গণ-সংযোগ (mass - contact) অর্থে এখানে কৃষক ও কলকারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কথাই বলা হচ্ছে। কেন-ই বা তাদের সম্পর্কে না-লিখব? - নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কেনই বা চিন্তা করব না? সত্যিকথা, প্রকৃত জনসংযোগ স্থাপিত হলে পরে

---

৪৪৮. ঐ, পৃঃ ৫৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

> আমাদের সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হবে। কিন্তু সত্যিকারের অভিজ্ঞতা আর তত্ত্বগত অনুভূতি-এ দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। .... আমাদের সাহিত্যিকী ভাবাবেগগুলির সম্পর্কে লেখাটা সহজ হলেও, মূলত তা ভুল পথ হবে। কেননা এখনো পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক লেখকদেরই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, কারণটা স্পষ্ট। আজ যদি আমরা ওদের সম্পর্কে লিখি তাহলে আমাদের নীচে তাঁদের সুরে দাঁড়িয়েই তাঁদের মতো করে লিখতে হবে, কেননা আমাদের মতো দেশে যেখানে অক্ষরজ্ঞানের সংখ্যাই অতীব নগন্য, সেখানে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে আছে। আর এই নীচে তাদের সুরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে আমরা তাদের প্রতি এবং সেই সঙ্গে নিজেদের প্রতিও সুবিচার করব না। সে যাইই হোক, কাব্য লিখে কিন্তু আমরা সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারব না; - তারজন্য আমাদের 'কাজ' করতে হবে।[৪৪৯]

বুদ্ধদেব বসু মনে করেন সাহিত্য সমাজ ও ব্যক্তিজীবন বাস্তবতার সকল অংশের উপস্থাপনা করে মাত্র, কোনো সমস্যাসমাধান করা বা পথ নির্দেশ করা তার দায়িত্ব নয়। তিনি মনে করেন দারিদ্র্য ও দুর্দশাময় পুরোনো সমাজ একদিন বদলে যাবে। কিন্তু কীভাবে ওই বদল ঘটবে তা তিনি নির্দেশ করেন নি। তিনি মনে করেন শোষণমুক্ত সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বপর্যন্ত সমাজে অসঙ্গতি শোষণ, দুঃখদুর্দশা থাকবেই এবং সাহিত্যেও ওই দুর্দশা ও ক্লেদাক্ত বাস্তবতা উপস্থাপিত হবে। তিনি বলেন :

> We have the great virtue of not having any illuscon. We feel in our bones that the present state of things is intolerable and a new social order must come in its time. And meanwhile? Suffering, boredom and horror in life and so in literature'[৪৫০]

---

৪৪৯. বুদ্ধদেববসু, 'সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য : আধুনিক লেখকদের অবস্থা', মার্কসবাদীসাহিত্য বিতর্ক (তৃতীয়খণ্ড), পৃঃ ৫৭-৫৮।

৪৫০. উদ্ধৃত, সরোজকুমার দত্ত, 'ছিন্নকর ছদ্মবেশ', ওই, পৃঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন প্রগতিবাদী সমালোচক সরোজকুমার দত্ত। তিনি 'ছিন্ন কর ছদ্মবেশ' (ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯)প্রবন্ধে বলেন যে বুদ্ধদেববসুর প্রবন্ধে 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।'[৪৫১] তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন। তিনি মনে করেন দুর্দশাময় বাস্তবতা উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে লেখক সামাজিক দায়িত্বই পালন করে থাকেন। তাঁরমতে সমাজের বদল ঘটানোই সাহিত্যের লক্ষ্য, ওই লক্ষ্যেই লেখক সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা করে থাকেন। বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'অর্থাৎ সাহিত্যের কোনো দায়িত্ব নাই, কাজ নাই – সমাজে যাহা ঘটিতেছে সাহিত্য *machanically* তাহাই প্রতিফলিত করিয়া যাইবে এই ধারণা যেমন অবৈজ্ঞানিক আত্মপ্রতারণা মাত্র, তেমনই বিপ্লবোত্তর সমাজ এই সাহিত্যের রক্ষণভার গ্রহণ করিবে ইহাও শিশুসুলভ দুরাশা ভিন্ন আর কিছুই নহে। .... বিরক্তি ও বিভীষিকার সাহিত্য প্রগতি সাহিত্য নহে,'[৪৫২] শুধুমাত্র ক্লেদাক্ত বিভীষিকাপূর্ণ বাস্তবতার উপস্থাপনা তাঁর কাছে অসহ্যবোধ হয়েছে। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন, বরং তিনি সাহিত্যে বিপ্লব বা রাজনীতিক বাস্তবতার উপস্থাপনার পক্ষপাতী। সেই সঙ্গে তিনি সাহিত্যে প্রবল আশাবাদের কথাও শুনতে চান। যে-সাহিত্য রাজনীতিক বাস্তবতার চিত্রন ও আশাবাদের কথা বলতে ব্যর্থ, সে-সাহিত্যকে তিনি মহৎ সাহিত্য বলে গণ্য করেন না। সমর সেনের '*In defence of the decadents*' (১৯৩৮)প্রবন্ধও প্রগতিবাদীদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে। তবে এ-বিতর্কটি ছিলো কবিতায় বাস্তবতা উপস্থাপনা প্রসঙ্গে, কথাসাহিত্যের বাস্তবতা প্রসঙ্গে নয়। তবে কবিতার বাস্তবতা বিষয়ক এ-আলোচনায় লেখকদের বাস্তবতাবোধ ও সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক অভিমতের প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। লক্ষণীয়, প্রগতিবাদীদের বিতর্কে সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পায় না, সাহিত্যের উদ্দেশ্যবাদিতার ব্যাপারটিই এখানে গুরুত্ব পায়। সমরসেন তাঁর প্রবন্ধে ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজের সাহিত্যকে আসুরিক সাহিত্য বলে অভিহিত করেন। কারণ ওই সাহিত্য ওই সমাজের অন্তঃসারশূণ্যতা, দুর্দশা ক্লেদময় সমাজ ও জীবন বাস্তবতার অকপট উপস্থাপনা করে থাকে।[৪৫৩] সমর সেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সৎসাহিত্য

---

৪৫১. সরোজকুমার দত্ত, 'ছিন্ন কর ছদ্মবেশ', ওই, পৃঃ ৬৩।

৪৫২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩।

৪৫৩. উদ্ধৃত, সরোজকুমার দত্ত, 'অতিআধুনিক বাংলা কবিতা', ওই, পৃঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

রচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে থাকেন। মার্কসবাদীরা কিষাণ-মজদুর-লালঝাণ্ডা-ব্যারিকেড সংঘর্ষ নির্ভর যে-সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলেন তাকে তিনি ফরমাইশী সাহিত্য বলে মনে করেন। তিনি বলেন যে ওই সব ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই বলেই তিনি ওই বিষয় নির্ভর সাহিত্য রচনায় উৎসাহী নন। সমর সেন বাস্তবতা বলে গণ্য করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে। তিনি মনে করেন শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যেই বাস্তবতাবাদী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাহীন কোনো রচনাকে কাল্পনিক রোম্যান্টিক রচনা বলে মনে করেন।[৪৫৪] সরোজকুমার দত্ত 'অতিআধুনিক বাংলা কবিতা' ("অগ্রণী", ১৩৪০) শীর্ষক প্রবন্ধে সমরসেনের মত ও বিশ্বাসকে অবক্ষয়ী, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া মতবাদ বলে আখ্যা দেন। তাঁর মতে সমর সেনের 'অভিমতে কর্মভীরু বুদ্ধিজীবীর চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।'[৪৫৫] তাঁরমতে সাহিত্যে ভাবাদর্শের প্রচারই লেখকের লক্ষ্য হওয়া উচিত, বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা মাত্র নয়। সাহিত্যে উদ্দেশ্যবিহীন বাস্তবতার উপস্থাপনা তাঁর কাছে 'যান্ত্রিক' ও 'জড়ের জঞ্জাল' বলে মনে হয়। তিনি বলেন, 'কোনো সাহিত্য যদি ক্ষয়িষ্ণু গলিত সমাজের উপদংশ ক্ষতগুলিকে যথাসম্ভব যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে, এবং তথাপি উদ্দেশ্যবিহীন হয় কিংবা কোনো ভাবাদর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট না হয় তবে উহা যান্ত্রিক ও জড়ের জঞ্জাল হইতে বাধ্য এবং সাহিত্যিকের পক্ষে উহা এক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লালসা নিবৃত্তির উপায়ও বটে। উপায় ও ভাবাদর্শই সাহিত্যের অন্তর, ইহাদেরই যুগল নিকষে সাহিত্যের আন্তরিকতার পরীক্ষা হয়।'[৪৫৬] সরোজকুমার দত্তের অভিযোগ খণ্ডন করে সমরসেন লেখেন 'অতিআধুনিক বাংলা কবিতা' ("অগ্রণী" মে ১৩৪০) নামক প্রবন্ধ। তিনি এ-প্রবন্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত কবিদের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁরমতে মধ্যবিত্ত ওই কবিদের কবিতায় 'নিপীড়িত শ্রেণীর আশাভরসা' কিংবা 'সংগ্রামের সংযম' বা নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রামী জীবনবাস্তবতা উপস্থাপিত না হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই বাস্তবতার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই। ওই কবিরা তাঁদের কাব্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগতকেই বিধৃত করেন, কাল্পনিক কোনো জগত নয়। তাই তাঁদের রচনায় 'মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি এবং বহুমুখী ব্যর্থতা'র ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৫৭] সমর সেনের এই মনোভাবকে প্রগতিবিরোধী বলে মনে করেন সরোজকুমার দত্ত। একই

---

৪৫৪. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫।

৪৫৫. সরোজকুমার দত্ত, 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা', ওই, পৃঃ ৬৬।

৪৫৬. পূর্বোক্ত, ৬৬।

৪৫৭. সমরসেন, 'অতিআধুনিক বাংলা কবিতা', ওই, পৃঃ ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনামের প্রবন্ধে ("অগ্রণী", মে১৯৪০) তিনি বলেন, 'নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের শ্রেণীবিচ্যুত দুর্গতগণের দুর্গতির বাস্তব ইতিহাস রচনা কিংবা শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর বাহিরে শ্রীযুত সেনের নিজের শ্রেণীর যে অংশ নানা কারণে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য aesthetic medium -এর সাহায্যে " Literature of exposure" (Lenin) রচনা, তাহাদিগকে গণ-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলা, এককথায় যে সাহিত্যিক-ঐতিহ্যের তাঁহারা উত্তরাধিকারী তাহার নিঃস্বার্থ সামাজিক সদ্ব্যবহার- তাঁহাদের আয়ত্তাধীন এইটুকুই যদি তাঁহারা করিতেন তবে নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদিগকে আমরা প্রগতিক ও বিপ্লবী বলিতাম।'[৪৫৮]

চল্লিশের দশকে প্রগতিবাদী লেখকদের চেতনায় প্রগতিশীলতা ও প্রগতিসাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়। এ-বিতর্কের সূত্রপাত করেন সুবোধ দাশগুপ্ত 'নূতন সাহিত্য'("প্রভাতী" অগ্রহায়ণ১৩৫৩) প্রবন্ধে। তিনি প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের চেতনার প্রগতিশীলতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন এবং সমকালীন প্রগতিসাহিত্য লক্ষ্যভ্রষ্ট বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রগতি সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গ তাঁর প্রবন্ধে আলোচিত হয় নি; তবে প্রগতিসাহিত্যের লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি যে-মন্তব্য করেন তাতে সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা বিষয়ে তাঁর বিশ্বাসও প্রতিফলিত হয়। তিনি মনে করেন প্রগতিশীল সাহিত্য হবে প্রতিবাদের সাহিত্য। প্রচলিত সমাজের প্রথাবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করবেন প্রগতিবাদী লেখক। তিনি সমাজের কোনো নীতি না মানাকেই গণ্য করছেন বাস্তবতারূপে। তিনি বলেন, 'আমরা কোনো প্রভুত্ব মানব না। আইনের প্রভুত্ব বা নীতির প্রভুত্ব বা ধর্মের প্রভুত্ব। কারণ প্রভুত্ব মেনে নিলেই আইন নীতি বা ধর্ম এগুলো যে ভালো তাও মেনে নিতে হবে এবং এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করলেই তাকে অন্যায় বলতে হবে এবং শাস্তি পেতে হবে। তা থেকে দাঁড়াবে যে সমাজটা মোটামুটি ভালই শুধু কতকগুলি খারাপ লোক তাকে খারাপ করে তুলেছে।'[৪৫৯] সুবোধ দাশগুপ্তের পক্ষ সমর্থন করে "পরিচয়"পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩৫৩)চিঠি লেখেন ধীরেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর মতে সমকালীন প্রগতিবাদী বিপ্লবীদের লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা। প্রগতিসাহিত্য সেই ভাঙনেরই সপক্ষে কথা বলবে, তুলে ধরবে বিপ্লবীদের সমাজ ভাঙার প্রক্রিয়া ও রূপ। তিনি বিপ্লবীদের সমাজ ভাঙার ব্যাপারটিকেই গণ্য করেন বাস্তবতা রূপে এবং সাহিত্যে ওই বাস্তবতারই প্রতিফলন দেখতে চান। এ শ্রেণীর সাহিত্যকে তিনি বিপ্লবী সাহিত্য বলে গণ্য করেন। তিনি বলেন,

---

৪৫৮· সরোজকুমার দত্ত, 'অতিআধুনিক বাংলাকবিতা', ওই, পৃঃ ৮১।

৪৫৯· উদ্ধৃত, হিরণকুমার সান্যাল, 'পত্রিকা প্রসঙ্গ', "পরিচয়" (পৌষ ১৩৫৩), পৃঃ ৪৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

'সুবোধবাবু সাহিত্য থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিতে ঠিকই বলেছেন এবং ভগবানকে মেনে নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকেও বাতিল করতে হবে। বিপ্লব ভেঙে ফেলতে চায় বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে, সংস্কার করতে নয়। যা আছে, তাতে ভালমন্দ দুই-ই আছে। ভালকে রেখে মন্দকে বিনাশ করার প্রয়াসকে সংস্কার পন্থীরা মানতে পারেন, কিন্তু বিপ্লবী জানে একটাকে রেখে আর একটাকে ভাঙা যায় না- দুটোই যে অবিচ্ছেদ্য- অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে-জটছাড়ানো শক্ত। এতে ভয়ের নেই এইজন্যে, যেটা সত্যিকারের ভাল এবং সেই হিশেবে মানুষকে অনেকখানি গ্রাস করে রেখেছে, নতুন সমাজব্যবস্থায় সেটা প্রকাশ পাবেই- নতুনতর রূপে।'[৪৬০] ধীরেন্দ্রনাথ রায় মনে করেন 'প্রগতিশীল" সাহিত্যিকের কর্ম নয় ঈশ্বর বা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার শ্মশান যাত্রা করা। তাঁরা 'ঈশ্বর', 'ভাল', 'নীতি'- সবই মানবেন। খালি, তাদের মাঝে যেটুকু মন্দ তাকে বাদদিয়ে।'[৪৬১] তিনি মনে করেন শুধুমাত্র বিপ্লবী সাহিত্যিকের পক্ষেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার শ্মশান যাত্রা করানো সম্ভব। অর্থাৎ তিনি মনে করেন সাহিত্য প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভাঙার দায়িত্ব পালন করবে।

সুবোধ দাশগুপ্তের অভিমতের বিরোধিতা করেন প্রভাতকুমার দত্ত। "পরিচয়"(ফাল্গুন ১৩৫৩) পত্রিকায় লেখা চিঠিতে তিনি প্রগতিবাদী লেখকদের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে ওই লেখকদের সকল সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পেছনেই বিপ্লবী তাগিদ রয়েছে। ওই লেখকেরা সমাজজীবনের অর্থনীতিক বৈষম্য সম্পর্কে সজ্ঞান এবং ওই বৈষম্যের অবসানের জন্যই তাঁরা কাজ করে চলেছেন। তিনি বলেন, 'প্রগতিশীল সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেছেন বা করছেন তাঁদের যে কেবলমাত্র এক বিশেষ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তা নয়। আসলে তাঁদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে আধুনিক সমাজজীবনের মূলে। ধনী দরিদ্রের এই বৈষম্যমূলক অবস্থায় সাধারণ মানুষের অপমান তাঁদের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব নয়। ....আধুনিক প্রগতিবাদী লেখকরা যখন প্রচলিত সমাজব্যবস্থা রীতিনীতিকে কাটিয়ে নূতন পথের নূতনতার অভিজ্ঞতার সন্ধানী হচ্ছেন তখন তাঁদের এই প্রচেষ্টার পেছনে বিপ্লবী প্রয়োজন বা তাগিদ যে নেই তা কি করে বলা সম্ভব?'[৪৬২] এই আলোচকের কাছে সমাজজীবনের অর্থনীতিক সমস্যাই বাস্তবতার মর্যাদা পেয়েছে, এবং তাঁরমতে প্রগতিবাদী কথাসাহিত্যিকেরা ওই বাস্তবতার উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী ভূমিকাই পালন করছেন। সাহিত্যে নিপীড়িত মানুষের হৃদস্পন্দনের পরিচয় তুলে ধরাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, 'তারাশঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,

---

৪৬০· ধীরেন্দ্রনাথ রায়, 'পাঠকগোষ্ঠী', "পরিচয়" (ফাল্গুন ১৩৫৩), পৃঃ ৬১২।

৪৬১· পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১৩।

৪৬২· প্রভাতকুমার দত্ত, 'পাঠকগোষ্ঠী', "পরিচয়" (ফাল্গুন ১৩৫৩), পৃঃ ৬১৪।

Dhaka University Institutional Repository

নরেন্দু ঘোষ এবং সর্বাধুনিক ননী ভৌমিকের গল্প উপন্যাসে আমরা এই আন্তরিকতার অভাব দেখি না। এই সমস্ত লেখকসবসময়ই আধুনিক জীবনের মূল সুরের সন্ধান করে চলেছেন .... এঁরা প্রত্যেকেই নিপীড়িত মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করে তাকে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং এদের মুক্তিকে সর্বমানবের মুক্তির হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ যদি দলবিশেষের প্রোপাগাণ্ডা হয় তো হোক।'[৪৬৩] আধুনিক জীবনের মূলসুরের সন্ধান করা অর্থাৎ অর্থনীতিক সমস্যা, নিপীড়িত মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন ও সর্বমানবের মুক্তির জন্য সংগ্রাম-এ-তিনটি ব্যাপারকে গণ্য করা হয়েছে বাস্তবতারূপে। লেখক মনে করেন যে-রচনায় এই তিনটি বিষয়ের উপস্থাপনা ঘটে তা-ই প্রকৃত বাস্তবতাবাদী প্রগতি সাহিত্য।

অনিলা গোস্বামী (নৃপেন্দ্র গোস্বামীর ছদ্মনাম) 'নূতন সাহিত্য' প্রবন্ধে ("পরিচয়" চৈত্র ১৩৫৩) প্রগতিবাদী লেখক ও রচনা সম্পর্কে সুবোধ দাশগুপ্তের অভিযোগ খণ্ডনের তৎপর হন। তিনি মনে করেন সমকালীন বাঙলা উপন্যাসে সমকালের রাজনীতিক-সামাজিক বাস্তবতার ব্যাপক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। অবশ্য তিনিও মনে করেন যে এদেশের প্রগতিবাদী লেখকদের রচনায় বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের ছবি ফুটে ওঠেনি, তবে এই লেখকেরা সমকালের বাস্তবতার বিশ্বস্ত উপস্থাপনা করেছেন। তিনি বলেন, 'তাঁরা অন্তত বর্তমান সামাজিক পরিবেশের যথার্থ রূপ আঁকতে সমর্থ হয়েছেন, তার নোংরামী, তার দুঃখদৈন্য দারিদ্র্যদুর্দশা, দুর্বলতাকে নানাভাবে ফুটিয়েছেন। .... তারাশঙ্কর আগে গ্রাম্যসামন্ত সমাজের ছবি আঁকতেন রোমান্টিক মন দিয়ে, কিন্তু গণদেবতা পঞ্চগ্রামের আলেখ্য গ্রাম্য শোষকদের পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কোন গল্পে শোষক চরিত্রের ভণ্ডামী বেয়াদবীকে রূপ দিয়েছেন ....'[৪৬৪] লক্ষণীয় সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গ নিয়ে এই প্রগতিবাদীরা কথা বলেছেন সামান্য, তাঁদের লক্ষ্য ছিলো প্রগতিবাদী সাহিত্যের লক্ষ্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা। সাহিত্যের লক্ষ্য বিষয়ক তাঁদের যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণরূপে রুশ মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ। তাঁরা মনে করেন শুধুমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর দুঃখদুর্দশা পূর্ণ জীবন বা সমকালীন সমাজের ক্লেদ বৈষম্য দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরাই প্রকৃত প্রগতিবাদী লেখকের লক্ষ্য হবে না, প্রগতিবাদী লেখক বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনাকারীমাত্র নন। শোচনীয় দুর্দশা-

---

৪৬৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১৫।

৪৬৪. অনিলা গোস্বামী 'নূতন সাহিত্য', "পরিচয়" (চৈত্র ১৩৫৩) পৃঃ ৬৬১।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু সমকালীন সমাজবাস্তবতার উপস্থাপনার পাশাপাশি তিনি সুন্দর শোষণমুক্ত সমাজের ছবি আঁকবেন, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা বলবেন। এ-দেশের প্রগতিবাদী লেখকেরা ওই সুন্দর শোষণমুক্ত সমাজের ছবি আঁকতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে করেন অনিলা গোস্বামী। তাঁর মতে ওই লেখকেরা 'হুবহু বাস্তবের অনুকৃতিরূপে চিত্রগুলি' আঁকছেন, 'সজীব ও সবল কল্পনার আশ্রয়' তাঁরা নেন নি বলেই ওই রচনা' *morbid* অথবা নীরস' হয়ে পড়েছে।[৪৬৫] তিনি বলেন, 'প্রগতিশীল সাহিত্যিক নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করবেন যে প্রচলিত ব্যবস্থার বহু ক্লেদ-পঙ্ক-গলতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, এসবের নিখুঁত ছবি তিনি এঁকেছেন, তা হচ্ছে *Negative vision* বা নেতিমূলক পর্যবেক্ষণ, তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয় এই যুগ সন্ধিক্ষণে, এই জঘন্য সামাজিক জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার পথ তিনি যেন তাঁর সম্মুখে দেখতে পান, তা নইলে ভাবী বিপ্লবের সাংস্কৃতিক ভূমিকাকে কি করে তাঁর সৃষ্টিগুলিতে রূপ দিতে পারবেন? প্রথম কাজটিতে দক্ষতা অনেকে দেখিয়ে চলেছেন তার পরিচয় নানাভাবে পাওয়া গেছে - কিন্তু শেষোক্ত কাজ, মানে যা ঠিক চিত্রকর বা ফটোগ্রাফারের দায়িত্ব থেকে কিছু স্বতন্ত্র, এড়িয়ে গিয়ে কেউ কি যথার্থভাবে নিজের কাছেই জবাবদিহি করতে পারেন?'[৪৬৬] সাহিত্যে বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপন তাঁর কাছে 'নেতিমূলক' বলে মনে হয়েছে, তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার পাশাপাশি সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী উদ্দীপনার পরিচয় পেতে চান, ভবিষ্যৎ সুন্দর সমাজের ছবি দেখতে চান। এসবের মধ্যদিয়েই প্রগতিবাদী সাহিত্য যথার্থ বিপ্লবী প্রগতিবাদী সাহিত্য হয়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন।

চিন্মোহন সেহানবীশও প্রগতিবাদী সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করেন।[৪৬৭] তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনাকে গণ্য করেন ' *photography*' রূপে। তিনি মনে করেন সাহিত্যে গভীরতর সামাজিক বাস্তবতা উপস্থাপিত হবে এবং লেখক একই সঙ্গে গভীর আশাবাদও প্রচার করবেন। সমকালীন লেখকদের বাস্তবতা উপস্থাপনা প্রবণতাকে তিনি অভিহিত করেন 'জীবনের বহিরাবয়বের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ' বলে। আশাবাদহীন ওই বাস্তবতা হতাশাসৃষ্টিকারী বলে তিনি মনে করেন।[৪৬৮] তবে সমকালীন লেখকদের বাস্তবতামনস্ক হয়ে ওঠার মধ্যে তিনি বিপ্লবী প্রগতিবাদী সাহিত্যসৃষ্টির পূর্বাভাসই

---

৪৬৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬২।

৪৬৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬৫।

৪৬৭. চিন্মোহন সেহানবীশ 'সাহিত্য ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা', "পরিচয়" (মাঘ ১৩৫৩)।

৪৬৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করেছেন। তাঁরমতে, 'বিপ্লবের ঠিক পরে সোভিয়েট সাহিত্যে মিলত বাস্তব ঘটনার যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। নিরক্ষরতার দেশে প্রথম অক্ষরজ্ঞানএলে হঠাৎ আত্মসচেতন মানুষের পক্ষে এরকমটাই স্বাভাবিক। লেখকদের পক্ষেও নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র স্হাপনের প্রথম উত্তেজনায় এইভাবে মানুষের বাইরের দিকটার প্রতি একান্ দৃষ্টিপাতও মোটেই আশ্চর্যের নয়। কিন্তু ক্রমে যখন সোভিয়েটের মানুষ বিপ্লবের তাৎপর্য আত্মস্হ করতে লাগল তখনএই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের জায়গায় এলো ইতিহাসবোধসমৃদ্ধ সাহিত্য।'[৪৬৯] বাংলা সাহিত্যেও এমনই ঘটছে বলে মনে করেন তিনি। তিনি মনে করেন 'জীবনের বহিরাবয়বের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণের সুর পেরিয়েই একদিন বাঙলাসাহিত্যে দেখা দেবে 'অনুর্নিহিত সামাজিক সত্য উদঘাটনের সুর।' তিনি "অতি-স্বাভাবিকতার' সুর পেরিয়ে যে সামাজিক বাস্তবতাবোধ—ঘটনার বহিরাবয়ব নয়, তার অনুর্নিহিত সামাজিক সত্যকেই বাস্তবতার মর্যাদা দেন।[৪৭০] বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন সাহিত্যে শুধুমাত্র দুঃখদুর্দশাপূর্ণ বাস্তবতার নৈর্ব্যক্তিক উপস্হাপনাই লেখকের প্রধান দায়িত্ব নয়, তাঁর প্রধান দায়িত্ব জীবন ও সমাজের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পরিচয় তুলে ধরা এবং সুদূর ভবিষ্যতের পথে মানুষ ও সমাজের উর্ধ্বগতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। তিনি সমাজজীবনের অনুর্নিহিত দ্বন্দ্বকেই গণ্য করেন বাস্তবতারূপে। শোষণমুক্ত সমাজের পথে সর্বহারাশ্রেণীর ক্রমঅগ্রযাত্রার বিবরণহীন সাহিত্যকে তিনিও হতাশসৃষ্টিকারী রচনা রূপে গণ্য করেন। তিনি বলেন,

> কোনো শ্রমিকের জীবন অবলম্বনে রচিত গল্পে বা উপন্যাসে সেই শ্রমিকটির শ্রমশিল্পের ইতিহাস আর তার নানা হাতিয়ার ও কাঁচামালের রূপ ও রকম বর্ণনা করে শ্রমিকটিকে বইয়ের মাঝে বসিয়ে দিতে পারলেই বুঝি বিজ্ঞানপ্রভাবিত সাহিত্য সৃষ্টি করা গেল। কিন্তু একেই তো বলা হয় 'ডকুমেন্টারি ন্যাচুরালিজম', শুধু যে নিদারুণ ভাগ্যবিড়ম্বনার মাঝে মানুষ পড়েছে, এমনি করে তারই এক রোম্যান্টিক চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় মাত্র। আর তার পরিণতি হয় হতাশার মাঝে, তা মানুষকে ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। ঠিক এই জিনিসটিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। ভাগ্যের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলতে

---

৪৬৯ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৬।

৪৭০ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৭।

Dhaka University Institutional Repository

হবে। মানুষের জীবন নাটেক্যগতিটিকে ধরতে হবে সাহিত্যের মাঝে। তবেই সাহিত্যে 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' অর্থাৎ বিজ্ঞানের কালোপযোগী ধারা সৃষ্টি হবে।'[৪৭১]

ধীরেন পাল (ভবানীসেনের ছদ্মনাম) মনে করেন প্রগতিসাহিত্যে সমষ্টিজীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা করে থাকে, 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' ("মার্কসবাদী", অক্টোবর ১৯৪৮) প্রবন্ধে তিনি বলেন যে প্রগতিবাদী লেখক শুধু জনগণের অতীত ও বর্তমান জীবন বাস্তবতার ছবিই তুলে ধরবেন না, তিনি সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিও আঁকবেন। তিনি মনে করেন প্রগতিবাদী লেখক সমাজের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বসংঘর্ষের পরিচয় উদ্ঘাটন করবেন। এবং এ ব্যাপারগুলোকেই তিনি বাস্তবতা রূপে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, 'মার্কসিস্টের কাজ হল ব্যক্তিস্বকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তার নীতি হল নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের জীবনের কথা ভাষায় রূপ দেওয়া, তাঁর ব্রত হল সমাজের ভিতরকার সংঘর্ষকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলা। তিনি বাস্তবের 'নিরপেক্ষসংবাদদাতা' নন, তিনি নূতন বাস্তবের সৃষ্টিকর্তা, অতীতের মৃত্যু, বর্তমানের প্রলয় এবং অনাগত ভবিষ্যতের সূচনা এই তিনটিই ফুটে উঠবে তাঁর সাহিত্যে। সংস্কৃতি যাতে নির্যাতিত জনগণের প্রেরণার বস্তু হয়, সংস্কৃতিতে যাতে তাদেরই সত্যিকার আশাআকাঙ্ক্ষা স্থান পায়, সংস্কৃতি যাতে তাদেরই জীবনের সত্যকার বহুমুখী দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত হয় সেই প্রচেষ্টাই হল মার্কসবাদী সাহিত্যের লক্ষ্য।'[৪৭২] তাঁরমতে প্রগতি সাহিত্য শ্রেণীসংগ্রামের পরিচয় নির্দেশ করবে। প্রগতি সাহিত্যে উপস্থাপিত হবে শুধুমাত্র শ্রমজীবী সংগ্রামী শ্রেণীর জীবনবাস্তবতা। সেই সঙ্গে এ-সাহিত্যে বর্তমান ভাঙনের পরিচয় বিবৃত করার পাশাপাশি তুলে ধরা হবে সম্ভাবনাপূর্ণ সমৃদ্ধ শ্রমজীবী সমাজের ছবি। তিনি বলেন, 'শ্রেণী সংগ্রামকে অবলম্বন করতে হবে, শ্রেণী নিরপেক্ষ জাতির কথা ছাড়তে হবে, শ্রেণীসংগ্রামে মজুর শ্রেণীর পক্ষ নিতে হবে। বাস্তব সংগ্রামে যেমন নিরপেক্ষতা চলে না, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও তেমনি নিরপেক্ষতা চলে না। .... পরিবারে, ব্যক্তিস্ব জীবনে, সংগ্রামে সংসারে, যুদ্ধে, প্রেমে সর্বত্র একদিকে ভাঙন আর একদিকে গড়ন চলছে, এই ভাঙন এবং গড়নের ছবি আঁকতে হবে, যা সহজে চোখে ধরা পড়ে না তা ধরিয়ে দিতে হবে ....।'[৪৭৩] প্রগতিবাদী লেখকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিষয়ক তাঁর এই মতামত রূপ

---

৪৭১. বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায়, 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য', "পরিচয়" (পৌষ ১৩৫৪) পৃঃ ৪৫৩,

৪৭২. উদ্ধৃত, "মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক" (প্রথমখণ্ড, ধনঞ্জয়দাশ সম্পাদিত, প্রাইমা পাবলিকেশন্স কলিকাতা, প্রথমপ্রকাশ: ১৯৭৫), পৃঃ ২৪।

৪৭৩. উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ ২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী তাত্ত্বিকদের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য বিষয়ক বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। এ-দেশের প্রগতিবাদী তাত্ত্বিকেরা প্রত্যেকেই রুশতাত্ত্বিকদের মতামতের প্রতিধ্বনি করেছেন। ঊর্মিলা গুহ (প্রদ্যোৎগুহ-র ছদ্মনাম) 'সাহিত্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি, ("মার্কসবাদী", অক্টোবর ১৯৪৮) প্রবন্ধে প্রগতিসাহিত্যের লক্ষ্য সম্পর্কে ব্যক্ত করেন অভিন্ন অভিমত। তিনি প্রগতিসাহিত্যকে জীবনের অনুলিপি বলে মনে করেন না, গণ্য করেন জীবনের সমালোচনারূপে। তিনিও মনে করেন সমকালের সমাজের গূঢ় দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিবাদী লেখক সুন্দর আগামীকালের কথা বলবেন। তিনি বলেন, 'সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিলিপি নয়, জীবনের সমালোচনা। সাহিত্যে রূপ পায় সমকালের সামাজিক সত্য, অনুরণিত হয় আগামীকালের প্রাণস্পন্দন।'[৪৭৪] তিনি সাহিত্যকে বিপ্লবের হাতিয়াররূপে গণ্য করেন। তাঁর মতে, 'সাহিত্যের একটি চালনা শক্তি আছে, এ-কারণেই প্রগতি সাহিত্য শ্রমিক শ্রেণীর হাতে বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।'[৪৭৫] প্রগতিবাদী তাত্ত্বিকেরা সাহিত্যে বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন, কিংবা ব্যক্তিজীবনবাস্তবতা উপস্থাপনারও পক্ষপাতী নন তাঁরা। সাহিত্যে সমষ্টির জীবন বা সমাজজীবন বাস্তবতার উপস্থাপনা তাঁদের কাম্য। তবে ওই সমষ্টির জীবন হবে সর্বহারা শ্রমজীবীর জীবন, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের জীবন নয়। সেইসঙ্গে তাঁরা মনে করেন সাহিত্য সমাজজীবন বাস্তবতার প্রতিলিপিমাত্র হবে না, সমাজজীবনের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্দেশই হবে সাহিত্যের লক্ষ্য। তাঁরা সমাজজীবনের এই অন্তর্গত দ্বন্দ্বকেই গণ্য করেন পরম বাস্তবতা রূপে।

প্রগতিবাদী তাত্ত্বিক-সমালোচকেরা যেমন পূর্ববর্তী আধুনিক লেখকদের পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন, আত্মবাদী বলে আক্রমণ করেন, তেমনি প্রগতি সাহিত্যও নানাভাবে আক্রান্ত হয়। এ-সাহিত্যকে আক্রমণ করেন কখনো বিরোধী রাজনীতিতে বিশ্বাসী তাত্ত্বিকেরা, কখনো বিশুদ্ধ শিল্পবাদীরা, তাঁরা এ-সাহিত্যকে প্রচার সর্বস্ব, অশিল্পিত, স্থূল বলে অভিযুক্ত করেন, এবং প্রগতিসাহিত্যের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিবাদী তাত্ত্বিকেরা বিরোধীদের এ-সব অভিযোগ খণ্ডনে তৎপর হন। প্রগতিবাদী সাহিত্য প্রচারধর্মী হলেও অশিল্প নয়- এ-সত্য প্রতিপাদনে ব্যাপৃত হন তাঁরা। "কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ" থেকে প্রকাশিত "দিগন্ত"(১৩৫৩) শীর্ষক সংকলন-গ্রন্থে মুদ্রিত হয় অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কংগ্রেস সাহিত্যসংঘ" নামক প্রবন্ধ। লেখক এ-প্রবন্ধে প্রগতিবাদী সাহিত্যকে

---

৪৭৪. উদ্ধৃত, ওই, পৃঃ ২৯।

৪৭৫. উদ্ধৃত, ওই, পৃঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

একটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ প্রচারের বাহন মাত্র বলে নির্দেশ করেন। তাঁরমতে এ-সাহিত্যের লক্ষ্য সৃজনশীলতা নয়, শুধুই রাজনৈতিক মতামত প্রচার এর লক্ষ্য।[৪৭৬] তাঁর এ-অভিযোগ খণ্ডনে অগ্রসর হন চিদানন্দ দাশগুপ্ত। তিনি বলেন যে প্রগতিবাদী সাহিত্য কমিউনিজম নামক এক নতুন জীবন দর্শন ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই এ-সাহিত্যকে রাজনীতিপ্রচারের সাহিত্য বলা যায় না বরং বলা যায় নতুন সময়ের বাস্তবতার উপস্থাপনাকারী সাহিত্য। আজকের পৃথিবীর সংকটের মূলে রয়েছে আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সঙ্কট। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতিকে আক্রমন করে কমিউনিজম। তবে শুধু রাজনীতিক বিপ্লব সাধনই কমিউনিজমের লক্ষ্য নয়। মানুষকে সে অর্থনীতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চায় এবং প্রতিষ্ঠা করতে চায় নতুন সভ্যতার ভিত্তি। প্রগতিবাদী সাহিত্য ওই সঙ্কটের স্বরূপ নির্দেশ করে এবং নতুন সভ্যতার ও সুন্দর ভবিষ্যতের চিত্র আঁকে। তাই প্রগতিবাদী সাহিত্য কেবল 'রাজনৈতিক প্রচারের' সাহিত্য নয়, তা নতুন পৃথিবী বা নতুন কাল ও বাস্তবতার সাহিত্য।[৪৭৭] তিনি বলেন,

> 'সাহিত্যিক সর্বোপরি জীবনকে ভালোবাসেন, তাই মানুষের জীবনের সঙ্কটে তার মন বিচলিত হয়, বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আলোকের পথ খোঁজে। যে দেশে, কালে, পরিবেশে তাঁর জীবনের গতিপথ - তাঁর মনের অনুভূতিক্ষেত্র, সেই দেশকাল আজ সংকটাপন্ন। এই সংকটে কেবল যৌথজীবনের দায়িত্ববোধ তাঁকে জাগ্রত করে তা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন, নিভৃত জীবনও এই বিষবাষ্পের ছোঁয়ায় মলিন হয়ে ওঠে। ············ ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে এই বেদনা সহজেই সাধারণের হয়ে ওঠে, কারণ দুয়ের মূল একই। ·········· একাগ্র খোঁজার পর যখন কবি দেখতে পান যে তাঁর একক মুক্তির পথ একেবারেই রুদ্ধ সাধারণের মুক্তিতেই তাঁর মুক্তি তখন তাঁর সামনে পথ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। বন্ধন যেখানে এক, সেখানে বেদনাও এক-মুক্তিও এক। তাই সাধারণের বেদনা কমিমনকে বিচলিত করে, কারণ তার মধ্যে তার নিজেরই বেদনার প্রকাশ। ·········· সুতরাং কমিউনিস্ট কবিতায় ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ- এ দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ······· 'প্রচার ও 'ব্যক্তিগত' আবেগের প্রকাশ এখানে মিলিত, দ্বিখণ্ডিত নয়। বরং জীবনকে এই অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখতে হলে আজ অন্য কোনো ইডিয়লজি বা মতাদর্শে কুলোয় না।[৪৭৮]

---

৪৭৬. উদ্ধৃত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, "প্রচার বাদী" সাহিত্য', "পরিচয়" (১৫ : ২ : ৬, আষাঢ়, ১৩৫৩), পৃঃ ৭৯৩।

৪৭৭. চিদানন্দ দাশগুপ্ত, "প্রচারবাদী সাহিত্য', পৃঃ ৭৯৪।

৪৭৮. ওই, পৃঃ ৭৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে প্রগতিবাদী লেখক ব্যক্তিগত সঙ্কট ও জীবনবাস্তবতার রূপকার নন, তিনি সমষ্টির সঙ্কট ও সমষ্টির জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা করেন। তিনি নিজেকে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেন না বরং সমষ্টির অংশ বলে গণ্য করেন। তাঁরমতে প্রগতিবাদী সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিগত আবেগ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের মিলিতরূপ।

বুদ্ধদেব বসু প্রগতিবাদীদের প্রচারমুখী সাহিত্য সৃষ্টির প্রবণতাকে অশৈল্পিক প্রবণতা বলে নিন্দা করেন। তাঁর মতে বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের অনেকখানিই হয়ে উঠেছে শিবিরবাসী সৈনিকদের কুচকাওয়াজ মাত্র এবং একে বাঙলা সাহিত্যের বৃহৎ দুর্ভাগ্য বলে মনে করেন তিনি। রাজনীতিক প্রচারবাদিতাকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের অধোগতি বলে।[৪৭৯] প্রগতিবাদী লেখকদের প্রচারবাদী প্রবণতার নিন্দা করেন প্রমথনাথ বিশীও। তিনি সাহিত্যে কোনো বিশেষ তত্ত্ব বা অর্থনীতিক সঙ্কটের বিবরণ প্রত্যাশা করেন না, তিনি, সাহিত্যে প্রত্যাশা করেন জীবনের মহৎ আদর্শের উপস্থিতি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবতাবিমুখ ও ভাববাদী। তিনি মনে করেন সাহিত্য জীবনের পরমআদর্শ ও পূর্ণতার সন্ধান দেবে। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজ প্রভৃতির যেমন ভিন্ন ও নিজস্ব দাবি আছে, তেমনি শিল্পেরও একটি নিজস্ব দাবি আছে। শিল্পের দায়িত্ব মতাদর্শ প্রচার নয়, শিল্প হয়ে ওঠা। প্রগতিবাদী লেখকেরা শিল্পসৃষ্টিতে ব্যর্থ। প্রচারবাদী প্রগতিসাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্যই শিল্প। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিবার পক্ষে সহায় হইতে পারে এমন মহৎশিল্প সৃষ্টি করিতে গেলে তাহার দাবী পূরণ করিয়া তাহার নিয়মানুগ হইয়া চলিতে হইবে। দলীয় ধ্বজা বহন করিবার উদ্দেশ্যে, ছকুমিঞার স্যাকরা গাড়ীতে স্বর্গের অশ্বিনীকুমার যুগলকে জুড়িয়া দিলে চলিবে না। বাংলাসাহিত্যে আজ সেই চেষ্টা হাস্যকরভাবে প্রকট।'[৪৮০] তাঁরমতে মহৎ সাহিত্য হবে জীবনের গভীর বাণী সমৃদ্ধ, তাতে জীবনের গূঢ় রহস্য উদঘাটিত হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে বাহ্যজীবন বাস্তবতার দুঃখদৈন্যের কথাও বিধৃত হয়। প্রগতিবাদী লেখকেরা সেই গভীর জীবনবাণী ব্যক্ত করায় আগ্রহী নন এবং সে-শক্তিও তাঁদের নেই বলে মনে করেন তিনি। প্রগতিবাদী লেখকেরা মানুষের অনুর্নিহিত মহত্ত্ব নির্দেশে আগ্রহী নন তাঁরা শুধু মানুষের মধ্যেকার 'দুর্গত; ইকনমিকমানুষ'টিকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেখাতে চান। তাঁর মতে যেহেতু প্রগতিবাদীরা মানুষকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপে দেখায় ব্যর্থ, তাই তাঁরা শিল্পসৃষ্টিতেও ব্যর্থ।[৪৮১] তাঁর কাছে বাস্তবতা বলে গণ্য হয়েছে অন্যান্য ভাববাদীদের

---

৪৭৯. উদ্ধৃত, গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পলিটিক্স ও সাহিত্য', "বসুমতী" (২৬ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪), পৃঃ ১৬০।

৪৮০. প্রমথনাথ বিশী, 'গণসাহিত্য', "বঙ্গদর্শন" (১ঃ১ঃ২, ভাদ্র ১৩৫৪), পৃঃ ১৪০।

৪৮১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

মতোই জীবনের গভীর বাণী ও গূঢ় রহস্যকে, তাঁর কাছে বাহ্যবাস্তবতা বা প্রাত্যহিক জীবন বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। প্রগতিসাহিত্য জীবনের গূঢ় রহস্যের অনুসন্ধান করে না বলেই এ-সাহিত্যকে তাঁর কাছে অশিল্প বলে মনে হয়। এ-সাহিত্যে উপস্থাপিত বাস্তবতা বা এ-সাহিত্যের বাস্তবতাবিমুখতা তাঁর কাছে বিবেচ্য বলে গণ্য হয় নি। বুদ্ধদেব বসুর বুর্জোয়া শিল্পবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'পলিটিকস ও সাহিত্য' ("বসুমতী" ১৩৫৪) নামক প্রবন্ধ। লেখক প্রগতিসাহিত্যের বিরোধীদের 'আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতিবিমুখ বুর্জোয়া' বলে অভিহিত করেন; এবং প্রগতিবাদী সাহিত্যের বিরোধীদের আলোচনা-সমালোচনা তাঁর কাছে গণ্য হয় 'প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত' রূপে।[৪৮২] তিনি বলেন যে আজ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাজনীতির স্পর্শ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এসে পৌঁচেছে। সাহিত্য যেহেতু জীবনেরই প্রতিফলন, তাই সাহিত্য কোনোভাবেই রাজনীতি থেকে দূর থাকতে পারে না। সাহিত্যের রাজনীতিমনস্কতা মূলত সাহিত্যের গভীর বাস্তবতামনস্কতাকেই নির্দেশ করে। তিনি বলেন, 'পলিটিক্স ও সাহিত্যের মধ্যে একটা মূলতঃ অহিনকুল সম্পর্ক মোটেই নেই। pure art এর জয়ধ্বনি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে শেষ অস্ত্র।'[৪৮৩]

আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রগতিবাদী সাহিত্যকে বিশুদ্ধ শিল্প বলে গণ্য করেন নি। 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' ("পরিচয়", পৌষ ১৩৫৪) প্রবন্ধে তিনি প্রগতিবাদী সাহিত্যকে 'ফলিত সাহিত্য' বলে আখ্যা দেন। তাঁর মতে যেহেতু এ-সাহিত্য থেকে সত্য-শিব-সুন্দর নির্বাসিত, যেহেতু এ-সাহিত্যে শুধু উপযোগিতার কথা স্বীকৃত হয় এবং উপযোগিতা দিকে লক্ষ্য করেই সাহিত্যসৃষ্টি করা হয়, তাই এটি বিশুদ্ধ সাহিত্য রূপে গণ্য হতে পারে না, বরং গণ্য হতে পারে 'উপকরণমূল্য' সমৃদ্ধ সাহিত্যরূপে। তিনি উপকরণমূল্য সমৃদ্ধ সাহিত্যকে শিল্প হিসেবে নিম্নমানের মনে করেন। তিনি বলেন, 'সত্য-শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণ বিকাশ ও বিকীরণই যখন সামাজিক উন্নতির আদর্শ, তখন রাষ্ট্রিক বিপ্লব বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থান্তর ঘটানোর প্রচেষ্টায় ধারালো অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়াকেই শিল্প সাহিত্যের চরম সার্থকতা বলে নির্দেশ করা, non party লেখকদের ধ্বংস কামনা করা, ঘোষণা করা যে সাহিত্যকে সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ বিপ্লবী দলের অংশ বিশেষ হতেই হবে- এসব কি চরম উদ্দেশ্যকে

---

৪৮২. গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পলিটিক্স ও সাহিত্য', পৃঃ ১৬২।

৪৮৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত উপায়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলার মত উলটোবুদ্ধির লক্ষণ নয়?'[৪৮৪] আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাহিত্যের মূল্য বিষয়ক এ-প্রবন্ধটি প্রগতিবাদীদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করে। আবু সয়ীদ আইয়ুবকে আক্রমণ করে ও প্রগতিবাদী সাহিত্যের পক্ষ সমর্থন করে প্রগতিবাদী তাত্ত্বিকেরা লেখেন একাধিক প্রবন্ধ। এ-সব প্রবন্ধে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয় নি। প্রাবন্ধিকেরা মনোযোগী ছিলেন সাহিত্যের চরমমূল্য ও উপকরণমূল্য ব্যাখ্যায়। অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণমূল্য ("পরিচয়"মাঘ ১৩৫৪) প্রবন্ধে আবু সয়ীদ আইয়ুবের বক্তব্যের অসারতা প্রমানে তৎপর হন। তাঁর মতে প্রগতিবাদী সাহিত্য ফলিত সাহিত্য নয়, তা শিল্পধর্মী ও প্রগতিশীল সাহিত্য। তিনি মনে করেন 'সত্য-শিব-সুন্দর মার্কা বিশুদ্ধ সাহিত্য দক্ষিণপন্থী শিবিরের একটা হাতিয়ার' মাত্র, যা দিয়ে বুর্জোয়া লেখকেরা 'সাধারণ মানবের ব্যক্তিচেতনাকে হয় একটা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রত্যয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, আর নয়তো বামপন্থী শিবিরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে সম্পূর্ণ প্রতিবিপ্লবী করে তোলে।'[৪৮৫]

আবু সয়ীদ আইয়ুবের বক্তব্যের বিরোধিতা করে সীতাংশু মৈত্রও লেখেন একই শিরোনামের প্রবন্ধ ("পরিচয়", ফাল্গুন ১৩৫৪), তিনি মনে করেন আজকের সাহিত্যে সত্য-শিব-সুন্দরকে পরম মূল্য দেয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। তিনি পূর্ববর্তী বুর্জোয়া সাহিত্য ও লেখকদের জনবিচ্ছিন্ন ও মৃতপ্রায় বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'গণমানসে ভিত্তি নেই বলে সাহিত্য যে মরে যাচ্ছে এ বোধ নেই তাঁর। খাঁটি হতে হতে সে যে উবে যাবে, তার চেতনা এঁদের জাগে না। তার সামাজিক বৃত্তি লুপ্ত প্রায় বলেই তার প্রয়োজনীয়তা গিয়েছে কমে। তাই সাহিত্য মুষ্টিমেয়ের অবকাশ বিনোদনের, এমন কি দুরূহ, দুষ্প্রকাশ্য আবেগের বাহন হতে গিয়ে অসামাজিকতার, রূপায়ণের অসম্ভাব্যতার চোরাবালিতে নিজের অপমৃত্যু ঘটায়।'[৪৮৬] তিনি মনে করেন সাহিত্যের ব্যবহারিক বা উপকরণ মূল্যই সাহিত্যের একমাত্র মূল্য। তাঁর মতে প্রাচীন সাহিত্য যেমন সমষ্টির চিত্তে কর্মের আবেগ ও প্রেরণা জাগিয়েছে, আধুনিক সাহিত্যও একই ভূমিকা পালন করবে। লেখক সাহিত্যে উপস্থাপিত করবেন জনতার জাগরণের কথা। জনতার জাগরণ তথা বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর আলোড়ন-বিদ্রোহ-শ্রেণীসংগ্রামকেই তিনি চরম বাস্তবতার মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আজকে তাই প্রগতিশীল সাহিত্যের উপাদান এবং লক্ষ্য স্থির হবে

---

৪৮৪. আবু সয়ীদ আইয়ুব, 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণমূল্য', "পরিচয়" (পৌষ, ১৩৫৪) পৃঃ ৫৩৫।

৪৮৫. অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র, 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণমূল্য', "পরিচয়" (মাঘ ১৩৫৪), পৃঃ ৯৩।

৪৮৬. সীতাংশু মৈত্র, 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য', "পরিচয়" (ফাল্গুন, ১৩৫৪), পৃঃ ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

গণজাগরণের বিভিন্ন রূপ দিয়ে, সেই জাগরণেই উদ্ভব হবে সবকিছু মূল্যের, কেননা সেই জাগরণই আজ একমাত্র সামাজিক সত্য।'[৪৮৭] বর্তমান সাহিত্য ওই একমাত্র সামাজিক সত্য বা বাস্তবতারই উপস্থাপনা করবে, বিশুদ্ধ শিল্প সৃষ্টির সাধনা নয়। তাঁর মতে সাহিত্যের মূল্য সম্পূর্ণ রূপে সামাজিক এবং সামাজিক উপযোগিতার মানদণ্ডেই সাহিত্যের মূল্য বিচার করতে হবে। তিনি বলেন :

> আজকের দিনে মানুষের প্রকৃতির ওপর অধিকার অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে তার উৎপাদনীশক্তি আর সেই অনুপাতে পাচ্ছে বৃহত্তর স্বরাটের পূর্বাভাস- যে স্বরাটের (freedom) কল্পনা সে আগের কোনো যুগেই করতে পারে নি। আজকের জনগণ সেই freedom এর পথে এগিয়ে চলেছে- বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির প্রাণপণ, নিষ্ঠুর বাধা দেওয়ার ফলে। তাই আজকের সার্থক সাহিত্যিক সেই বিপ্লবের বাণী শোনাবে, জোগাবে সেই স্বরাট লাভের প্রেরণা। সত্য, শিব, সুন্দরের কল্পিত বোধ জাগানো তাঁর কাজ আজ নয়, কোন যুগে ছিলও না। আর প্রগতির এই বিনির্ণায়ক আছে বলে সত্য শিব সুন্দরকে পরমমূল্য বলে স্বীকার করার কোন প্রয়োজনই সাম্যবাদীর নেই।[৪৮৮]

প্রগতিবাদীরা শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনকেই বাস্তবতা বলে গণ্য করছেন এবং সাহিত্যে শুধু-মাত্র ওই বাস্তবতারই উপস্থাপনার পক্ষপাতী তাঁরা। তাঁরা নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যের ব্যাপারটিকে অপ্রয়োজনীয় গণ্য করেন, কারন অস্তিত্বের সঙ্কটের সময় প্রয়োজন প্রাণপণে অস্তিত্বরক্ষার লড়াই করা, শিল্পসৌন্দর্য চর্চা ওই লড়াইয়ে জয়লাভ করার জন্য জরুরী নয়।

আবু সয়ীদ আইয়ুব 'বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য'("পরিচয়,"চৈত্র ১৩৫৪) শীর্ষক প্রবন্ধে অমরেন্দ্র-প্রসাদ মিত্রের অভিযোগ আক্রমণের প্রত্যুত্তর করেন। প্রগতিবাদীরা সাহিত্যে সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, বিপ্লব বা রাজনৈতিক বাস্তবতা চিত্রনের পক্ষপাতী, অন্যদিকে বিশুদ্ধ শিল্পবাদী আবু সয়ীদ আইয়ুব মনে করেন ব্যক্তিচৈতন্যের দ্বন্দ্ব- আলোড়নকে এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র সমষ্টির জীবন বা সমাজবাস্তবতার উপস্থাপনার প্রবণতা প্রগতিশীলতার

---

৪৮৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৩।

৪৮৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য নয়। তিনি সাহিত্যে আকাঁড়া বাস্তবতা উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন। তিনি শিল্পকলায় পরিশোধিত বাস্তবতাকে পেতে চান। তিনি বলেন, '.......... সাহিত্যে এবং শিল্পকলা মাত্রে আমরা পাই বাস্তবসত্তার রূপায়নিক অভিব্যঞ্জনা। সমাজই একমাত্র বাস্তবসত্তা নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের রহস্যঘন প্রকৃতি, চেখভ কিংবা হেনরী জেমসের কথাসাহিত্যে ব্যক্তিচেতনার যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা অভিব্যক্ত– রসের বিচারে এদের বাস্তবতাও অগ্রাহ্য নয়। .... সমাজকে একমাত্র বাস্তব সত্তা বলে প্রকৃতির লীলাকে কিংবা ব্যক্তিচৈতন্যের সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতকে সাহিত্য থেকে বিতাড়িত করা প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়।'[৪৮৯] উপযোগিতাবাদী সাহিত্যকে তিনি – এ-প্রবন্ধেও নিম্নমানের শিল্পকর্ম বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ শিল্পই চরম মূল্য দাবি করতে পারে। তাঁর অভিমত এমন: 'সাহিত্য যদি শুধু বিপ্লবের ধারালো অস্ত্রই হয় তবে কেবল উপকরণরূপেই তা মূল্যবান, এবং যে-সাহিত্যের চরম মূল্য আছে তা বিপ্লবী দলের হাতে হাতিয়ার হতেও পারে, নাও হতে পারে। না হলেও তার যে মূল্যটি চরম তার কোন ব্যত্যয় ঘটবে না।'[৪৯০] মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী বিনয় ঘোষও প্রগতিবাদী সাহিত্যকে অবাস্তব বলে অভিযুক্ত করেন। 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য' ("পরিচয়", শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৩) প্রবন্ধে তিনি প্রগতিবাদী লেখকদের প্রগতিশীলতার মেকী ও পাঠ্যপুস্তক নির্ভর বলে অভিযোগ করেন। তাঁর মতে ওই লেখকেরা সমাজবিচ্ছিন্ন, শুধুমাত্র তাত্ত্বিকজ্ঞানের অধিকারী তাঁরা। সমাজবাস্তবতার সঙ্গে যেমন তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই, তেমনি শ্রমজীবীদের সম্পর্কে নেই প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা। তাঁরা শুধুমাত্র অধীত বিদ্যা দ্বারা আয়ত্ত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সাহিত্যসৃষ্টিতে তৎপর হয়েছেন। ফলে তাঁদের সাহিত্যে দেশ ও কালের পরিচয় বা প্রকৃত বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি মনে করেন প্রকৃত প্রগতিবাদী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখককে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কয়লাখনি, কারখানা, কামারশালায় নেমে এসে পরিচিত হতে হবে শ্রমজীবীদের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে, শুধুমাত্র এ-ভাবেই প্রকৃত বাস্তবতাবাদী গণসাহিত্য সৃষ্টি করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন।[৪৯১] প্রগতিবাদী সাহিত্যের বিরুদ্ধে আনীত অবাস্তবতার অভিযোগ খণ্ডন করতে তৎপর হন বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বাস্তবতাবাদী সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান শর্ত বলে মনে করেন না। বরং এমন ধারণাকেই তিনি অসঙ্গত বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন নয়, বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্তে আনাই

---

৪৮৯. আবু সয়ীদ আইয়ুব, 'বিশুদ্ধ ও ফলিতসাহিত্য', "পরিচয়" (চৈত্র, ১৩৫৪), পৃঃ ২৫১।

৪৯০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৬।

৪৯১. বিনয় ঘোষ, 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য', "পরিচয়" (শারদীয়-সংখ্যা ১৩৫৩), পৃঃ ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতিবাদী লেখকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজজীবনের বাহ্যিক বিবরণ রচনা করা প্রগতিবাদী লেখকের লক্ষ্য নয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে প্রগতিবাদী লেখকের লক্ষ্য হবে সমাজের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব সঙ্কটের পরিচয় তুলে ধরা, সেই সঙ্গে তিনি দেখাবেন সমৃদ্ধ সুন্দর এক ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি। তবেই সাহিত্যে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম বা বিজ্ঞানের কালোপযোগী ধারা সৃষ্টি সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।[৪৯২] সমাজ জীবনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসঙ্কটই তাঁর কাছে গণ্য হয়েছে বাস্তবতারূপে।

দেখা যাচ্ছে সব ধরনের সাহিত্যের বিরুদ্ধেই অবাস্তবতার অভিযোগ উঠেছে। রক্ষণশীল নীতিবাদীরা আধুনিক কথাসাহিত্যে চিত্রিত বাস্তবতাকে বলেছেন অবাস্তব, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীরাও ওই সাহিত্যকে বলেছেন অবাস্তব। আবার সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে যে এ-সাহিত্য অবাস্তব ও সমাজবিচ্ছিন্ন। এর কারণ বাস্তবতার ধারণা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন।

৪৯২. বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায়, 'আধুনিক চিন্তন ও সাহিত্য', "পরিচয়" (শ্রাবণ, ১৩৫৪), পৃ. ৪৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ: শ্রেণীকরণ

এ-পরিচ্ছেদ থেকে আমাদের লক্ষ্য আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে (১৯২০-১৯৫০) উপস্থাপিত বাস্তবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। এখানে কালের যে উল্লেখ করা হয়েছে তাতেই স্পষ্ট আমাদের আলোচ্য কালের উপন্যাস। তবে যেহেতু এ-উপন্যাসকে 'আধুনিক বাঙলা উপন্যাস' নামে অভিহিত করা হয়েছে, তাই এ-সময়ের উপন্যাসকে কেনো আধুনিক বাঙলা উপন্যাস বলা হলো তাও কিছুটা ব্যাখ্যা করা দরকার। বাঙলা সাহিত্যে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে আবির্ভূত ঔপন্যাসিকগোত্রকে আমরা আধুনিক বলে অভিহিত করেছি, কেননা তাঁরা কাল ও মেজাজের দিক থেকে তাঁদের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র থেকে ভিন্ন। আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিক বাংলা কাব্যের কালনির্দেশক যে সংজ্ঞা দেন তা আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্য সম্পর্কেও অনেকাংশে প্রযোজ্য। তিনি বলেন, : 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তি প্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।'[১] তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই আধুনিকদের সীমারেখা নন, শরৎচন্দ্রও সীমারেখা। তাঁদের পরবর্তী এবং তাঁদের অতিক্রম করে যাওয়ার অভিলাষসম্পন্ন উপন্যাসই আধুনিক উপন্যাস। আধুনিক উপন্যাসের কিছুটা ভিন্ন, পত্রিকা ভিত্তিক সংজ্ঞাও দেয়া যেতে পারে। যে ঔপন্যাসিকদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে "কল্লোল" পত্রিকায় তাঁরা ও তাঁদের পরবর্তীরা আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের স্রষ্টা। "কল্লোল" (১৯২৩-২৭) পত্রিকা আধুনিকদের রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে উদারআনুকূল্য প্রদর্শন করে। অধিকাংশ আধুনিক লেখকের প্রথম রচনা মুদ্রিত হয় "কল্লোল" পত্রিকায়। তাছাড়া "কল্লোল" পত্রিকা অফিসে প্রত্যহ ওই তরুণ লেখকগোত্র মিলিত হতেন সাহিত্যিক আড্ডায়। সবমিলিয়ে ওই পত্রিকা ও আধুনিক লেখকগোত্র হয়ে ওঠে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সূত্রে জড়িত, একে অন্যের সমার্থক। নির্দেশ করার সুবিধার্থে সমকালীন রক্ষণশীলেরা এবং আধুনিকেরা নিজেরাও নিজেদের "কল্লোলী"য় বলে অভিহিত করতে থাকেন। "কল্লোলে"র সহযোগী

---

১. উদ্ধৃত, দীপ্তি ত্রিপাঠী, "আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়", দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, (প্রথম ১৯৫৮ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৪) পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

রূপে দেখা দেয় "কালিকলম" (১৯২৬), "প্রগতি" (১৯২৭), "সংহতি" (১৯২৪) "উত্তরা" (১৯২৫) প্রভৃতি পত্রিকা এবং আধুনিকদের রচনা প্রকাশে ও আধুনিকদের পক্ষ সমর্থনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন যে নদী যেমন বাঁক নেয়, সাহিত্যও তেমনি বিভিন্ন সময়ে গতি বদল করে। তাঁর মতে '...... সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারণ। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'[২] আধুনিকেরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে ভিন্ন মেজাজের সাহিত্যসৃষ্টি করেন; রচনায় সমাজের রসাতল বা বস্তিবাসীর জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা তাঁদের কাম্য হয়ে ওঠে, তাঁরা নরনারীর ইন্দ্রিয়গত জীবনের পরিচয় তুলে ধরায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এবং এ-সবের মধ্যদিয়ে তাঁরা বাঙলা উপন্যাসের বিষয়সীমার সম্প্রসারণ করেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় "পরিচয়" (১৩৩৮) পত্রিকায় আধুনিকদের মেজাজ সম্পর্কে বলেন, 'আধুনিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য লঘু নয়, গুরু; চিত্তরঞ্জন নয়, সত্যানুসন্ধান।'[৩] যৌনজীবনের রূপায়ন বা অপজাত জীবনের উপস্থাপনার পেছনে সক্রিয় ছিলো আধুনিকদের সত্যানুসন্ধানের তাগিদ। তাদের এই প্রবণতা একপর্যায়ে শরৎচন্দ্রের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। আধুনিকদের যৌনজীবন চিত্রন প্রবণতা শরৎচন্দ্রের কাছে 'নোঙরা' বলে মনে হয়। তিনি আধুনিকদের লেখারমধ্যে 'খুব কোরবো, গর্জন করে নোঙরা কথাই লিখবো' মনোভাবই প্রকাশিত হতে দেখেন।[৪] তিনি মনে করেন '........ নোঙরা না করেও অতিআধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, ইনটেলেকটের বলকারক আহার্য পরিবেশ করাও আধুনিককালের রসসাহিত্যের একটা বড় কাজ।'[৫] কিন্তু আধুনিক লেখকেরা যে'ইনটেলেকটের বলকারক আহার্য পরিবেশন' করতে সমর্থ হয়েছেন এমন নয়, তাঁদের অধিকাংশের লেখাই হয়ে ওঠে ভাবালুতা ও পেলব কোমল রসানুভূতির মিলিত রূপ মাত্র। আধুনিকত্বের মানদণ্ডে আধুনিক বাঙলা কবিতা ও আধুনিক বাঙলা উপন্যাস সমান অগ্রসর নয়; আধুনিক কবিতা আধুনিক উপন্যাসের চেয়ে অনেক জটিল, গভীর ও অগ্রসর। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী যেমন আধুনিক

---

২. রবীন্দ্রনাথঠাকুর, 'আধুনিককাব্য' "সাহিত্যের পথে" পৃঃ ১০৭

৩. উদ্ধৃত, অশ্রুকুমার সিকদার, 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : বিষয় ও বিন্যাস', "আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস"(অরুণা প্রকাশণী কলকাতা, প্রথমপ্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯৫), পৃঃ ৩৫

৪. উদ্ধৃত, ওই, পৃঃ ৩৫

৫. উদ্ধৃত, ওই, ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক কবিতার আঙ্গিক ও চেতনাকে রূপান্তরিত করেছেন, বাঙলা ভাষায় সত্যিকার অর্থে অভিনব জগত ও শিল্পকলা সৃষ্টি করেছেন, আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা তা করেউঠতে পারেননি । তবে তাঁদের উপন্যাসে প্রকাশিত চেতনা পূর্ববর্তী উপন্যাসের চেতনা থেকে ভিন্ন ও অগ্রসর এতে সন্দেহ নেই । বুদ্ধ-দেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যে-জগত ও চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জগত ও চেতনা থেকে ভিন্ন ও নতুন । তাঁদের তুলনায় জগদীশগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ প্রথাগত, কিন্তু তারাও সমাজ ও জীবনের যে-চিত্রণ করেছেন, তা পূর্ববর্তী উপন্যাসে পাওয়া যায় না ।

আমরা ১৯২০-৫০ পর্বটিকে গ্রহণ করেছি কারণ এ-সময়েই আধুনিকদের প্রধান উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হয় । এই লেখকেরা অত্যন্ত সৃষ্টিশীল ছিলেন । ওই পর্বে প্রকাশিত হয় তাঁদের প্রচুর উপন্যাস। এ-সময়ের সমস্ত লেখকের সব উপন্যাস পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য কাজ। তদুপরি এ-সময়ের বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাস রচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয় । তাই প্রত্যেক লেখকের প্রতিটি উপন্যাস গ্রহণ করা জরুরী মনে করিনি । তবে এ-সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিকের সবগুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । যে-সব ঔপন্যাসিক আমাদের আলোচনার মধ্যে গৃহীত হয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪), গোপাল হালদার (১৯০২), জগদীশগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৬১), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-৭৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০), প্রেমেন্দ্রমিত্র (১৯০৫-৮৫), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯),, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৭), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৭৫), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-৬৫),সরোজকুমার রায় চৌধুরী(১৯০১-৭২) । এই আধুনিক ঔপন্যাসিকদের প্রথাগত ও অপ্রথাগত এই দুই গোত্রে ভাগ করা যায় । প্রথাগতরা বাস্তবতার মগ্ন চারণ । পারিবারিক ও সমাজজীবন বাস্তবতা, আঞ্চলিক বাস্তবতা বা রাজনীতিক বাস্তবতার অবিকল অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করেন তাঁরা । রচনায় আধুনিক চেতনার উপস্থাপনা কিংবা আধুনিক আঙ্গিকের প্রবর্তন করা তাঁদের লক্ষ্য নয় । তাঁদের সকল মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে বাস্তবতায় এবং বাস্তবতার বিবরণ রচনা করে চলেন তাঁরা । এই প্রথাগতদের এই সময়ের প্রধান আধুনিক ঔপন্যাসিক বলেও চিহ্নিত করা যায় । যদিও জটিল চিন্তাভাবনা ও আধুনিক চেতনার উপস্থাপনা ও অভিনব আঙ্গিকের প্রবর্তন তাঁরা করেন নি , তবে তাঁদের কারো কারো রচনায় সমকাল ও সম-কালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের বিশ্বস্ত পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে, কেউ

Dhaka University Institutional Repository

কেউ উপস্থাপিত করেন শুধুই দেশাচার প্রথা বিশ্বাস ও সমাজনিয়ন্ত্রিত পল্লীজীবন। প্রথাগতদের উপন্যাসে বাস্তবতার ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে বলেই তাঁদের প্রধান ঔপন্যাসিক গোত্রভুক্ত করা যেতে পারে। কারণ তাঁরা ব্যাপকভাবে জীবন উপস্থাপন করেছেন বলেই ঔপন্যাসিক হিসেবে গুরুত্ব পেতে পারেন। এই গুরুত্বপূর্ণ লেখকেরা হচ্ছেন (বর্ণক্রমানুসারে) , গোপাল হালদার, জগদীশগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ। জগদীশগুপ্ত, তারাশঙ্কর, বিভূতি ভূষণকে শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্র প্রধানত পল্লী সমাজবাস্তবতার রূপকার। কুসংস্কার কুপ্রথা, অমানবিকতা, সংকীর্ণতা ও ইতরামোতে ঠাসা পল্লী সমাজের নিরাবেগ উপস্থাপনা করেন তিনি। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়ও তাই। তবে শরৎচন্দ্রের মধ্যে আছে 'মনুষ্যত্ববোধে স্থির আস্থা', অন্যদিকে জগদীশগুপ্তের মনুষ্যত্ব বোধের ব্যাপারটি 'সংশয়াচ্ছিত'। 'শরৎচন্দ্র মনে করেন নরনারীর বিড়ম্বনার প্রধান উৎস সমাজ ও দেশাচার,'[৫] অন্যদিকে জগদীশগুপ্ত দেখান যে মানুষকে নিয়ন্ত্রন করে অপার শক্তিশালী পরিস্থিতি। তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণও উপস্থাপনা করেন পল্লীসমাজ ও ব্যক্তি জীবনবাস্তবতা। তবে শরৎচন্দ্র যেমন সমাজবাস্তবতার চিত্রনে মনোযোগী ছিলেন, তারাশঙ্কর তেমনি শুধুমাত্র সমাজবাস্তবতার চিত্রনেই মনোযোগী নন। ওই পল্লীজীবনে সমকালের রাজনীতিক আন্দোলনের অভিঘাত নির্দেশও তাঁর লক্ষ্য। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসে একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপিত হয়। তাঁর সময়ের সমাজকেও পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসের সমাজ কাল নিরপেক্ষনয়, বিশেষ কালের ঘটনা আলোড়ন দ্বারা আলোড়িত ওই সমাজ। বিভূতিভূষণ পল্লীসমাজ ও পল্লীজীবনকে দেখেন মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে। যে সমাজ ও দেশাচারকে নরনারীর জীবনের বিড়ম্বনার উৎস রূপে গণ্য করেন শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের কাছে তা মহিমাময়, সুন্দর, সনাতন পবিত্র বলে বোধ হয়। ওই পল্লীসমাজ ও মানুষ নানা ত্রুটি সত্ত্বেও অতুলনীয়- বিভূতিভূষণের উপন্যাসে এ-সত্যই প্রতীয়মান হয়। তিনি উপস্থাপন করেন দারিদ্র্যগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জীবনবাস্তবতা কিন্তু ওই দারিদ্র্য পীড়াদায়ক নয়। তাঁর উপন্যাসে ওই দারিদ্র ধর্মের মতোই জন্মসূত্রে পাওয়া এবং ব্যক্তির জীবনের ঐশ্বর্যবিশেষ। বিভূতিভূষণের পল্লীবাঙলাকে তাঁর সমকালের পল্লীবাঙলা বলেও মনে হয় না, মনে হয় তা মধ্যযুগের কোনো স্বনির্ভর, বিচ্ছিন্ন, আত্মমগ্ন, প্রথাশাসিত ও তুষ্ট পল্লীসমাজ।

---

৫. অশ্রুকুমার সিকদার, 'কল্লোলের উত্তরাধিকার', "আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস" পৃঃ ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রথাগত উপন্যাসিকেরা আধুনিক, যদিও তাঁরা দু একজন ব্যতীত সকলেই অপ্রধান উপন্যাসিক। এঁদের মধ্যে আছেন (বর্ণক্রমানুসারে) অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্রমিত্র, বনফুল, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্রথাগত ও আধুনিক, তাঁকে গণ্য করা হয় প্রধান আধুনিক উপন্যাসিকরূপে। তবে এ-সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচিত হতে পারে। মানিকের উপন্যাসে শৈল্পিক সৌকর্যের স্বাক্ষরবাহী, তবে তাঁর রচনায় জীবনের ব্যাপক ও গভীর পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথমপর্যায়ের দুটি উপন্যাস "পদ্মানদীর মাঝি" ও "পুতুল নাচের ইতিকথা" জীবনবাস্তবতার যে ব্যাপক ও অনুরঙ্গ উপস্থাপনা ঘটে অন্যান্য উপন্যাসে তেমনটি ঘটেনি। ওইসব রচনায় মানিক জীবনের ঘোর-বিকার-তুচ্ছতার উপস্থাপনায় মনোনিবেশ করেন, ফলে ওইসব রচনা হয়ে ওঠে অগভীর, মনোজাগতিক নানা বিকারের বিবরণ। অন্যদিকে শৈলজানন্দের উপন্যাসে গভীর জীবনবাস্তবতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায় না তেমনি শিল্পসৌকর্যের স্বাক্ষরবাহীও নয় ওই উপন্যাসগুলো, যদিও সাধারণভাবে রূঢ় বাস্তবতার অসামান্য উপস্থাপনাকারী হিসেবে শৈলজানন্দ খ্যাতিমান, তবে সেখ্যাতি প্রধানত তাঁর কয়লাখনি অঞ্চল নির্ভর কিছু গল্পের কারণে। গল্পে রূঢ় ক্লেদাক্ত বাস্তবতাকে তিনি উপস্থাপন করেন; কিন্তু উপন্যাসে তিনি পাংশু, ছকবাধা কাহিনী নির্ভর ও নিষ্প্রভ। অপ্রথাগত আধুনিক উপন্যাসিকেরা বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাকারী নন, তাদের অনেকে বাস্তবতাকে দেখেন রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে, অনেকে সমাজবাস্তবতা বা ব্যক্তিজীবনবাস্তবতা পরিহার করে মনোজাগতিক জটিলতারই রূপায়ন করেন। লক্ষণীয়, সমাজজীবনের উপস্থাপনা এ-গোত্রের লেখকদের লক্ষ্য নয়, তাঁদের লক্ষ্য ব্যক্তিজীবন। এই লেখকেরা সাধারণত বর্ণনা করেন আধুনিক, নাগরিক চেতনাসমৃদ্ধ রোম্যান্টিক চরিত্রদের কাহিনী; কখনো প্রবল যাযাবর মনোবৃত্তি ওই চরিত্রদের তাড়িত করে, কখনো সে দগ্ধ হয় খাপ না খাওয়াতে পারার সঙ্কটে। প্রথাগতরাও (যেমন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ) ব্যক্তিজীবনের গল্প বলেন কিন্তু ওই চরিত্রকে শুধুই একজন প্রথাগত সমাজসদস্য বলে মনে হয়। তাদের কেউ কেউ রাজনীতি সচেতন, দার্শনিক, সংবেদনশীল হলেও তারা কেউ আধুনিক মানুষ নয়। তাদের বিপন্ন করে না অস্তিত্ব ও চেতনার সঙ্কট, অন্তর্গত দ্বিধা দোলাচলবৃত্তি, প্রগাঢ় জটিলতা। অপ্রথাগত লেখকদের চরিত্রদের সঙ্কট মানসিক, বহুলাংশে মননগত। বলা যায় এই লেখকগোত্রের অধিকাংশই নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনরূপায়নে আগ্রহী। তাঁদের রচনার পাত্রপাত্রী হয়ে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী তরুণেরা, উচ্চবিত্ত নাগরিক আধুনিক তরুণীরা। ওই তরুণেরা মেধাবী কিন্তু দারিদ্র্যগ্রস্ত। ছাত্র পড়ানোর সামান্য আয় ও পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার টাকা তাদের জীবনযাপনের সম্বল। এই লেখকেরা পল্লীজীবনবাস্তবতার চিত্রনে অনীহ, তবে তাঁদের রচনায়

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বিশ্বস্ত ও ব্যাপক রূপায়ণও যে ঘটে তা নয়। তাঁদের লেখায় পাওয়া যায় নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের খণ্ডিতরূপ। রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে তাঁরা বাস্তবতাকে দেখেন। তাঁদের বাস্তবতা কখনো ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাসময়, কখনো কাব্যিক। উপন্যাসে উপস্থাপিত বাস্তবতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লেখক ও পাত্রপাত্রীদের মানসিক অবস্থার স্পর্শ, বাস্তবতার নিরপেক্ষ উপস্থাপনা এখানে ঘটে না।

বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের শ্রেণীকরণ করা যেতে পারে দু'ভাবে : এক, বিষয়ভিত্তিক, দুই, প্রকরণকৌশল ভিত্তিক। বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য উপন্যাসে উপস্থাপিত বাস্তবতা। প্রতিটি লেখক বাস করেন ভিন্ন বাস্তবতায়, বাস্তবতার বিভিন্ন ভূখণ্ড বিভিন্নজনের কাছে গণ্য হয় বাস্তবতারূপে এবং প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন লেখক রচনায় উপস্থাপিত করেন বাস্তবতার বিভিন্ন অঞ্চল। বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে পারি কতো ধরণের বাস্তবতা পাওয়া যাচ্ছে এ-বিষয়টি। অন্যদিকে প্রকরণ কৌশলভিত্তিক শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হচ্ছে বাস্তবতা উপস্থাপনার কৌশল। বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপিত হতে পারে। লেখক বাস্তবতার সহজ বিবরণ রচনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসকে করে তোলেন বাস্তবতার প্রতিলিপিসদৃশ। আবার মন যেভাবে দেখে বস্তুজগত ও বাস্তবতাকে, লেখক রচনায় বাস্তবতার সেরূপেরই উপস্থাপনা করেন। প্রথম রীতিকে অভিহিত করা যায় বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনরীতি অভিধায়, দ্বিতীয়টিকে বলা যায় বাস্তবতার রোম্যান্টিক উপস্থাপনরীতি। প্রথমটি প্রথাগত দ্বিতীয়টি রোম্যান্টিকদের সৃষ্টি। প্রথম পদ্ধতিতে সরল বর্ণনারীতিতে বাস্তবতার প্রতিলিপি সৃষ্টি করা হয়। এখানে শিল্পসৃষ্টির সুযোগ সামান্য। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শিল্পসৌকর্য প্রদর্শনের সুযোগ অপার। আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের প্রধান লেখকেরা অনুসরণ করেন প্রথাগত রীতিটি র অর্থাৎ অবিকল উপস্থাপন পদ্ধতির। তাঁদের রচনায় পাওয়া যায় জীবন ও সমাজবাস্তবতার অবিকল অনুপুঙ্খ উপস্থাপন। তবে কারো কারো রচনায় এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এ দুরীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে যেখানে জীবন ও সমাজবাস্তবতার উপস্থাপনা তাঁর লক্ষ্য (যেমন "পদ্মানদীর মাঝি","পুতুলনাচের ইতিকথা" উপন্যাস)সেখানে তিনি অনুসরণ করেন অবিকল উপস্থাপনা রীতিটির। আর স্বপ্ন-ঘোর বিকারের উপস্থাপনা যেখানে তাঁর লক্ষ্য(যেমন "দিবারাত্রির কাব্য")সেখানে তাঁর বর্ণনা কাব্যিক, শিল্প সৌন্দর্যমণ্ডিত। আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের অপ্রধান ও অপ্রথাগত লেখকগোত্র বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা পদ্ধতির অনুসারী নন। তাঁরা বাস্তবতাকে দেখেন ব্যক্তিগত আবেগের দৃষ্টিতে, নির্মোহ দৃষ্টিতে নয়। আমাদের দায়িত্ব যেহেতু ১৯২০ থেকে ১৯৫০-এর উপন্যাসের বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণয়, তাই আমরা বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ করেছি এবং বিভিন্ন উপন্যাসের বাস্তবতার স্বরূপনির্দেশ করার চেষ্টা করেছি। ওই সময়ের একজন ঔপন্যাসিকের সকল উপন্যাসে যে একই ধরণের বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে এমন নয়। একই লেখকের বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরণের বাস্তবতা। ওই ঔপন্যাসিকেরা বাস্তবতার নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডের উপস্থাপনায়ই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, উপস্থাপন করেছেন বাস্তবতার বিচিত্র ভূভাগ, জীবনের -

Dhaka University Institutional Repository

নানা সুর। তাই দেখা যায় যিনি একপর্যায়ে পল্লীসমাজ ও সমকালের উপস্থাপনা করছেন, তিনিই পরে আগ্রহী হয়ে ওঠেন বাস্তবতার রোমান্স রচনায়; কখনো তাঁর লক্ষ্য হয়ে ওঠে সমকালীন নাগরিক জীবনের রাজনীতিক অস্থিরতার স্বরূপ নির্দেশ। অনেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বাস্তবতার উপস্থাপনা করেছেন, তবে বিভিন্ন উপন্যাসে তাঁরা তুলে ধরেন বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনীতিক জীবনের পরিচয়। এই সময়ের উপন্যাসে বাস্তবতার যে-রূপ চিত্রিত হয় সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে:(ক) পল্লী সমাজ ও জীবনের বাস্তবতা এবং আ-ঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাস,(খ) উদভ্রান্ত অস্থির ও কামনা বিকার ঘোরগ্রস্ত জীবনের বিচূর্ণ বাস্তবতা, গ নগর ও শহরতলীর জীবনের বাস্তবতা,(ঘ) রাজনীতিক বাস্তবতা,(ঙ) ব্যক্তিগত ক্লেদ - ব্যাধি ও রসাতলের বাস্তবতা। এই শ্রেণী-গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো -

ক॥ পল্লীসমাজ ও জীবনের বাস্তবতা

এ-শ্রেণীর উপন্যাসকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়; (এক) পল্লী সমাজ ও জীবনের বাস্তবতা উপস্থাপনাকারী উপন্যাস, (দুই) আঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাস। পল্লীসমাজ ও জীবনের বাস্তবতা নির্ভর উপ-ন্যাসে পাওয়া যায় পল্লী বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনজীবন ও প্রকৃতিকে। এ-শ্রেণীর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঔপন্যাসিক পরিবার ও সমাজজীবনের কাহিনীই বর্ণনা করেন, কখনো কখনো ব্যক্তি প্রধান হয়ে উঠলেও ওই ব্যক্তিজীবন থাকে পরিবার ও সমাজদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো কোনো লেখকের উপন্যাসে ওই পল্লীসমাজকে নির্দেশ করা হয় ক্রুর ইতর সংকীর্ণরূপে, আর তাঁদের রচনায় পল্লীর মানুষগুলোও একই রকম ক্রুরতা ইতরামো সংকীর্ণ-তাগ্রস্ত। কোনো কোনো লেখকের উপন্যাসে পল্লীজীবন উপস্থাপিত হয় মধুর ও প্রশান্তরূপে, যেখানে প্রথা ও আচা-রের কড়াকড়ি সত্ত্বেও সাদাসিদে গৃহস্থালি, সাধারণ স্বপ্নসাধ ব্যর্থতা ও অপার দারিদ্র্য নিয়ে মানুষেরা সুখেই দিন কাটায়। কোনো ব্যাপারেই তাদের উচ্চাশা নেই,কোনো ব্যাপারেই তাদের ক্ষোভ বা অভিযোগ নেই। ওই উপ-ন্যাস পাঠ করে মনে হয় শান্ত বিচিত্ররূপিনী পল্লীপ্রকৃতির কোলে আবহমানকাল ধরে বাস করে চলেছে প্রকৃতির পরিতৃপ্ত সন্তানেরা, বাস করবে অনন্তকাল। ওই জীবনে সমকালের রাজনীতি বা সঙ্কটের কোনো স্পর্শ নেই। কোনো কোনো লেখকের রচনায় উপস্থাপিত হয়েছে পল্লীজীবনের অভিজাত ও সাধারণ - এই দুই সুরের জীবন। ওই পল্লীজীবন সমকালের রাজনীতিক- আর্থনীতিক আলোড়নে আলোড়িত।সদ্য উদীয়মান ধনিক সম্প্রদায় ও ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত জমিদার জীবনের দ্বন্দ্ব ও জমিদার শ্রেণীর পরাভবের চিত্র তুলে ধরার পাশপাশি দেখানো হয় পল্লীসমাজের নোংরামো ও ইতরতা। দুএকজন ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গীর লেখক ছাড়া প্রত্যেকের কাছেই ওই পল্লী-সমাজ গণ্য হয় ক্লেদাক্ত নোংরামো পরিপূর্ণ,যেখানে শক্তিমানের কাছে অকারণে মার খায় দরিদ্র সাধারণ,

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিমানের লালসার শিকার হয় অসহায় নারী এবং যেখানে কোনো অন্যায়েরই প্রতিকার হয় না। পল্লীসমাজ ও জীবনের বাস্তবতাবাদী লেখকেরা পল্লী সমাজ ও জীবনের অবিকল উপস্থাপনা করেন। কেউ কেউ বাস্তবতার নিরাবেগ নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে রচনাকে করে তোলেন বাস্তবতার প্রতিরূপ। কেউ কেউ ওই বাস্তবতাকে দেখেন আবেগ আপ্লুত রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে, তাই ওই রচনায় বাস্তবতা অবিকল উপস্থাপিত হলেও বাস্তবতার নিরপেক্ষ রূপায়ন ঘটে না। (বর্ণক্রমঅনুসারে) জগদীশ গুপ্তের "মহিষী" (১৯২৯), "লঘুগুরু" (১৩৩৮)" দুলালের দোলা" (১৩৩৮), "রোমন্থন"(১৩৩৮) "তাতল সৈকতে"(১৩৩৮); তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নীলকণ্ঠ"(১৩৪০), "প্রেম ও প্রয়োজন "(১৩৪২) "ধাত্রী দেবতা"(১৩৪৬), "কালিন্দী" (১৩৪৭), "গণদেবতা" (১৩৪৯) "পঞ্চগ্রাম"(১৩৫০) "সন্দীপন পাঠশালা"(১৩৫২) "পদচিহ্ন"(১৩৫৭), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "দ্বীপপুঞ্জ" (১৩৫৩), নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী"(১৩৫২) বনফুলের "দ্বৈরথ"(১৩৪৪), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী" (১৩৩৬), "আরণ্যক"(১৩৪৫)" কেদাররাজা" (১৯৪৫), "আদর্শ হিন্দু হোটেল" (১৩৪৭)" দুইবাড়ী"(১৩৪৮), "বিপিনের সংসার"(১৩৪৮), "ইছামতী" (১৯৫০), "অশনি সংকেত"(পত্রিকায় প্রকাশকাল ১৯৪৪-১৯৪৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিন্তামনি" (১৩৫৩) এ-ধারার অন্তর্গত।

এ-সময়ে পল্লীজীবন নির্ভর কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে যেখানে নির্বিশেষ পল্লীজীবনের উপস্থাপনা লেখকের লক্ষ্য নয়। ঔপন্যাসিক এখানে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা অঞ্চলের বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবন বাস্তবতা বর্ণনা করেছেন। এ-শ্রেণীর উপন্যাসকে অভিহিত করা যায় আঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাস বলে। এ-শ্রেণীর উপন্যাসে তলে ধরা হয় এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশ পোশাকপরিচ্ছেদ প্রথা ও দেশাচার, সঙ্গীত সংস্কৃতি লৌকিক উৎসব বাচণভঙ্গী অনুপুঙ্খ বিবরণ। বাঙলা ভাষায় আঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাস রচিত হয়েছে অল্প। কোনো কোনো লেখক বিশেষ ভূখণ্ডের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেও ওই ভূখণ্ডের জনজীবনের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরেন নি। তবে গুটিকয় আঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাস বাঙলায় লেখা হয়েছে। যেমন (বর্ণক্রম অনুসারে) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "উপনিবেশ"(প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, প্রথম প্রকাশ-অজ্ঞাত), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা"(১৩৫৪), ঐ-কয়টি উপন্যাসের জন্য একটি আলাদা শ্রেণী না করে ওই উপন্যাস কয়টিকে পল্লী সমাজ ও জীবনবাস্তবতা শ্রেণীভুক্ত করা গেল।

খ।। <u>উদভ্রান্ত অস্থির ও কামনা-বিকার-ঘোরগ্রস্ত জীবনের বাস্তবতা</u>

এ-শ্রেণীর উপন্যাসকেও দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (এক) উদভ্রান্ত-অস্থির-কামনা-ঘোরগ্রস্ত-

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের উপস্থাপনা মূলক উপন্যাস, (দুই) বিকার ও অস্বাভাবিকতার উপস্থাপনা মূলক উপন্যাস। উদভ্রান্ত-অস্থির-কামনা-ঘোরগ্রস্ত জীবনের উপস্থাপনা মূলক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পাত্রপাত্রীরা তরুণ। তাদের কাছে তাদের বাস্তব জীবনের চাইতে অন্তর্জগৎ অনেক বেশি বাস্তব। তারা কেউ নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে, কেউ এসেছে বলা যায় সমাজের প্রায় নিম্নতল থেকে। তবে তাদের মধ্যে ঐক্য হচ্ছে তারা প্রত্যেকে শারীরিক ও মানসিক কামনা দ্বারা তাড়িত এবং কোথাও তাদের কামনা পরিতৃপ্ত হয় না। ফলে তারা উদভ্রান্তের মতো ছুটে চলে এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে, এক প্রণয়ী থেকে অন্য প্রণয়ীতে। তারা যে কী চায় সে সম্পর্কে তারা খুব নিশ্চিত নয়। অদম্য অনিয়ন্ত্রিত আবেগ তাদের তাড়িয়ে ফেরে। চরিত্রগত দিক দিয়ে তারা রোম্যান্টিক, অস্থির, স্বপ্ন ঘোরাচ্ছন্ন, বহুলাংশে খাপ না খাওয়া। সমাজের সঙ্গে, এমন কী প্রিয় মানুষের সঙ্গে খাপ না খাওয়ানো তাদের সাধারণ চরিত্র। তারা উদভ্রান্ত পথিক, সমাজ সংসার প্রথা তাদের জন্য স্বস্তিকর নয় পথই তাদের প্রিয় ও কাম্য। তবে তারা প্রণয়ীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য চেষ্টাও করে এবং ব্যর্থ হয়। এ-শ্রেণীর উপন্যাসে লেখকেরা বাস্তবতাকে অবিকল তুলে না ধরে তাদের চরিত্রদের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখেন। অর্থাৎ বাস্তবতার অবিকলউপস্থাপন ঘটে না এখানে, বাস্তবতার রোমান্টিক উপস্থাপন ঘটে। ওই পাত্রপাত্রীরা বাস্তবতাকে যেভাবে দেখে উপন্যাসে পাওয়া যায় তার পরিচয়। (বর্ণক্রম অনুসারে) অন্নদাশঙ্কর রায়ের "আগুন নিয়ে খেলা" (১৩৩৫) অসমাপিকা (১৩৩৮), "সত্যাসত্য" ("যার যেথা দেশ" (১৯৩২), "অজ্ঞাত বাস" (১৯৩৩), "কলঙ্কবতী" (১৯৩৪), "দুঃখ মোচন" (১৯৩৬), "মর্ত্যের স্বর্গ" (১৯৪০), "অপসরণ" (১৯৪২)), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বেদে" (১৩৩৫), "আকস্মিক" (১৩৩৬), "বিবাহের চেয়ে বড়ো" (১৩৩৮), "কাকজ্যোৎস্না" (১৩৩৮), "প্রথম প্রেম" (১৩৩৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাইকমল" (১৩৪১), "কবি" (১৩৪৮), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "অন্তঃশীলা" (১৯৩৫), "আবর্ত" (১৯৩৫), "মোহানা" (১৯৪৩), বুদ্ধদেব বসুর "অকর্মন্য বা একটি বাঙালী রুণ্ডিন" (১৯৩১), "হে বিজয়ী বীর" (১৯৩৩), "যেদিন ফুটলোকমল" (১৯৩৩), "ধূসর গোধূলি" (১৯৩৩), "রুপোলি পাখি" (১৯৩৪), "সূর্য্য মুখী" (১৯৩৪), "একদা তুমি প্রিয়ে" (১৯৩৪), "বাসর ঘর" (১৯৩৫) এধারার অন্তর্গত।

বিকার ও অস্বাভাবিকতার উপস্থাপনামূলক উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় বিকার ও অস্বাভাবিকতা। এ-শ্রেণীর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা কেউই সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করে না, তারা প্রত্যেকেই

Dhaka University Institutional Repository

কোনো না কোনো ভাবে বিকার গ্রস্ত । অস্বাভাবিক পারিবারিক পরিস্থিতি, মানসিক বৈকল্য, প্রিয় বিয়োগের শোক, অবদমিত কাম তাদের বিকৃত করে তোলে । তাদের কেউ কেউ ভোগে সন্দেহ বাতিকে, হয়ে ওঠে ক্রূর প্রতিহিংসা পরায়ণ ও কুটিল । কেউ কেউ ভোগে শুচিবায়ু গ্রস্ততার বাতিকে, হয়ে ওঠে ছিচকাঁদুনে, ভাবালুতাসর্বস্ব, বাচাল । কেউ কেউ ভোগে অবিশ্বাস বাতিকে, সহজ ভাবে কোনো মানবিক সম্পর্ক বা কোমল সুন্দর কোনো ব্যাপারকেই বিশ্বাস করতে পারে না তারা । প্রিয় বিয়োগের শোক তাদের কারো কারো প্রাণ ধারণের আগ্রহ কেড়ে নেয়, তারা আত্মহননের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে । তাদের কেউ কেউ ভোগে অকারণ ও অর্থহীন অনুসন্ধিৎসা ও জটিলতা বাতিকে । তারা প্রত্যেকেই প্রথাগত সামাজিক জীবন যাপন করলেও প্রত্যেকেই খাপ না খাওয়া । যদিও তারা সামাজিক জীবন যাপনের প্রথাগুলো মেনে চলে, অন্যান্য সামাজিকের সঙ্গে সহজ বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্কও স্থাপন করে, কিন্তু নিঃসঙ্গতাই তাদের নিয়তি । তাদের অস্বাভাবিক আচরণ, অনুসন্ধিৎসা সমাজের অন্যান্য সদস্যদের ক্ষিপ্ত করে । তাই তাদের ভাগ্যে জোটে সামাজিক নিন্দা, অপবাদ ও নিঃসঙ্গ জীবন। এ-শ্রেণীর উপন্যাসে লেখকেরা বাস্তবতার অবিকল প্রতিলিপি রচনা করেন না বাস্তবতাকে দেখেন রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে । সমাজবাস্তবতা বা পারিবারিক জীবন বাস্তবতাকে তুলে ধরেন না ঔপন্যাসিক, বিকার গ্রস্ত খাপ না খাওয়া সংবেদনশীল মানুষের বিকার ও নিঃসঙ্গতার পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয় । মানুষের জীবনে কতো বিচিত্র ধরণের বিকার আছে, শেষ পর্যন্ত তারই বিবরণ বলে মনে হয় উপন্যাসগুলোকে । (বর্ণক্রম অনুসারে) জগদীশ গুপ্তের "রতি ও বিরতি" (১৩৪১), "নন্দ ও কৃষ্ণা" (১৯৪৭), বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অথৈজল" (১৩৫৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দিবা রাত্রির কাব্য" (১৯৩৫), "পুতুল নাচের ইতিকথা" (১৯৩৬), "জীবনের জটিলতা" (১৯৩৬), "অমৃতস্য পুত্রীঃ" (১৯৩৮), "অহিংসা"(১৩৪৮), "ধরা বাধা জীবন" (১৯৪১), "চতুষ্কোণ" (১৯৪৮), সরোজ কুমার রায় চৌধুরীর "আকাশ ও মৃত্তিকা" (১৩৪০) এ-ধারার অন্তর্গত ।

গ।। নগর ও শহরতলীর জীবন বাস্তবতা ঃ

এ-শ্রেণীর উপন্যাসে পাওয়া যায় কলকাতা নগর ও শহরতলীর জীবনের নানা রূপ । বৈচিত্র্য ওব্যাপ্তিতে ওই জীবন পল্লী জীবনের সমতুল্য নয় । নগরের মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত - এই তিন জীবনই নগরজীবন নির্ভর উপন্যাসের উপজীব্য । উচ্চবিত্তের জীবন নির্ভর উপন্যাসে পাওয়া যায় উচ্চবিত্ত জীবনের দুই রূপ, এক গোত্র উচ্চবিত্ত নাগরিক আধুনিক, অন্যগোত্র অমিত ধনশালী

Dhaka University Institutional Repository

অনাধুনিক, সামন্ত মনোভাবাপন্ন ও অবিকাশিত । তবে এই দুগোত্রের জীবনই নানা অনৈতিকতায় পরিপূর্ণ । কোনো কোনো উপন্যাসের উচ্চবিত্তরা পুরুষানুক্রমে কলকাতাবাসী ও সমাজের সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে । তবে তাদের আয়ের উৎস পল্লী । পল্লীর অনেক ধনশালী গ্রাম ছেড়ে নগরবাসী হয় নাগরিক অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হবার মোহে । ঘন ঘন পার্টি দিয়ে, গাড়ি কিনে, চমৎকার ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে তারা উচ্চবিত্ত সমাজের অনুভুক্ত হয় ঠিকই তবে আধুনিক চেতনা তাদের আয়ত্তে আসে না । কলকাতা নগরীর মধ্যবিত্তরা আধুনিক, উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিত । কোনো কোনো উপন্যাসে ওই মার্জিত মধ্যবিত্তদের আধুনিক, বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক জীবনের আখ্যান বর্ণিত হয় । কোনো কোনো উপন্যাসে বর্ণিত হয় মধ্যবিত্ত সৃষ্টিশীল তরুণের আবেগ আলোড়ন ও সৃষ্টিশীল জীবনের বৃত্তান্ত । নগরীর নিম্নবিত্তদের জীবন নির্ভর উপন্যাসে পাওয়া অর্থাভাবগ্রস্ত দুর্গত জীবনের রূপ । অস্তিত্ব রক্ষার নিরন্তর সংগ্রামে নগরীর নিম্নবিত্তরা ক্ষতবিক্ষত । শহরতলীর জীবন নির্ভর উপন্যাসে কখনো তুলে ধরা হয় শহরতলীর ওপর কলকাতা নগরীর আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত। কলকাতা নগরীর আগ্রাসনের ফলে নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলি শহরতলী পরিণত হয় কুৎসিত অবিকাশিত শহরে । কোনো কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় শহরতলীর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের রূপ । ওই মধ্যবিত্ত জীবন ভাঙনগ্রস্ত আর নিম্নবিত্ত জীবন অর্থাভাবগ্রস্ত । অর্থাভাবে ওই জীবনে আসে নানা দুর্দশা । এ-ধারার ঔপন্যাসিকদের কেউ কেউ ওই জীবনের অবিকল অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করেন, কিন্তু ওই জীবনকে দেখেন মোহমুগ্ধ রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে । কেউ কেউ বাস্তবতার নিরাবেগও অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করেন । (বর্ণক্রম অনুসারে) গোপাল হালদারের "ভাঙন" (১৯৪৭), "স্রোতের দীপ" (১৯৫০), "উজান গঙ্গা" (১৯৫০), প্রেমেন্দ্র মিত্রের "আগামীকাল" (১৯৩০), বনফুলের "জঙ্গম" (প্রথম খণ্ড ১৩৫০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৫, তৃতীয় খণ্ড ?) , বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অনুবর্তন" (১৯৪২), বুদ্ধদেব বসুর "রডোডেনড্রন গুচ্ছ" (১৯৩২), "অসূর্যম্পশ্যা" (১৯৩৩), "সানন্দা" (১৯৩৩), "আমার বন্ধু" (১৯৩৩), "লাল মেঘ" (১৯৩৪), "পরিক্রমা" (১৯৩৮), "কালো হাওয়া" (১৯৪২), "তিথি ডোর" (১৯৪৯); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জননী" (১৯৩৫), "সহরবাসের ইতিকথা" (১৩৫২) এ-ধারার অন্তর্গত ।

ঘ॥ রাজনৈতিক বাস্তবতা :

এ-শ্রেণীর উপন্যাসে ১৯২০ থেকে ৫০ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও মতবাদ গৃহীত হয়েছে । লেখকেরা সাধারণত নিজেদের মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজনীতিকে

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন । এ-সময়ের রাজনৈতিক উপন্যাসে প্রধান দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায় : একটি হচ্ছে গান্ধীবাদী রাজনীতির ধারা, অন্যটি সাম্যবাদী রাজনীতির ধারা । গান্ধীবাদী ঔপন্যাসিকেরা প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদে বিশ্বাসী, সমাজের সম্পূর্ণ পরিবর্তন তাদের লক্ষ্য নয়, গান্ধীবাদ অনুসারে সমাজ সংস্কারের ওপর তাঁরা জোর দেন । চরকা কাটা, গ্রামোন্নয়ন, ,অন্ত্যজদের নৈতিক উন্নতিসাধন, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার তাদের লক্ষ্য এবং এভাবেই একদিন জনসাধারণ স্বরাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে বলে তাঁরা মনে করেন । সাম্যবাদী রাজনীতি নির্ভর উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় শ্রেণীদ্বন্দ্ব । এ-শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা সমাজের কিছুটা সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী নন, সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বদল তাঁদের কাম্য । এ-ধারার উপন্যাসে সাম্যবাদী তরুণ কর্মীরা শ্রমজীবী মজুর ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করার জন্য কাজ করে চলে । এ-ধারার উপন্যাসে শ্রমজীবীদের দেখানো হয় বলিষ্ঠ, সৎ, প্রতিবাদী ও ঐক্যবদ্ধ রূপে । তবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের ছক অনুসারে এ-দেশে সাম্যবাদী সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি । সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী সাহিত্যে বিপ্লবী শ্রমজীবীদের বর্তমান দুর্দশা ও বিপ্লবের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি তুলে ধরতে হয় বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী সাফল্য ও ভবিষ্যৎ শোষণমুক্ত সুন্দর সমাজের ছবি । বাঙলা সাম্যবাদী ঔপন্যাসিকেরা সাম্যবাদী সাহিত্য সৃষ্টির ওই শর্ত পালন করেননি । এ-ধারার উপন্যাসে শ্রমজীবীদের দুর্গতি দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হয় , তাদের মধ্যে সাম্যবাদী কর্মীদের শ্রেণী চেতনা জাগিয়ে তোলার প্রয়াসের পরিচয়ও তুলে ধরা হয় । (বর্ণক্রম অনুসারে) গোপাল হালদারের "একদা" (১৩৩৯), "অন্যদিন" (১৯৫০), "পঞ্চাশের পথ" (১৯৪৪),তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চৈতালী ঘূর্ণি" (১৩৩৮), "মন্বন্তর" (১৩৫০), "ঝড় ও ঝরাপাতা" (১৩৫৩), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "তিমির তীর্থ" (১৩৫১),"মন্ত্রমুখর" (১৩৫২), "বৈতালিক" (১৩৫৪), প্রেমেন্দ্র মিত্রের "মিছিল" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সহরতলী" (প্রথম পর্ব ১৯৪০, দ্বিতীয় পর্ব ১৯৪১), "পতিবিম্ব" (পত্রিকায় প্রকাশ ১৩৫০), "দর্পণ" (১৩৫২), "আদায়ের ইতিহাস" (১৯৪৭), "চিহ্ন" (১৯৪৫), "চিত্র গুপ্তের ফাইল" (১৩৫৬) এ-ধারার অন্তর্গত ।

৬॥ <u>ব্যক্তিগত ক্লেদ-ব্যাধি ও রসাতলের জীবন বাস্তবতা :</u>

এ-শ্রেণীর উপন্যাসকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, (এক) ব্যক্তিগত ক্লেদ-ব্যাধির বাস্তবতা উপস্থাপনাকারী উপন্যাস, (দুই) রসাতলের জীবন বাস্তবতা উপস্থাপনাকারী উপন্যাস । ব্যক্তিগত ক্লেদ-ব্যধি উপস্থাপনাকারী উপন্যাসে পাওয়া যায় ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র অনৈতিক গোপন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাধি ও ক্লেদের পরিচয় । এ-সব উপন্যাসে দেখানো হয় ব্যক্তি প্রবলভাবে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত । প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত অনৈতিক জীবনই সকল ব্যাধির মূলে । কোনো কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় উত্তরাধিকার ও প্রতিবেশী নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি জীবনের রূপ । এই দুই শক্তিই ব্যক্তিকে ক্লেদাক্ত জীবন যাপনে বাধ্য করে । এ-সব উপন্যাস ব্যক্তি প্রধান । ওই ব্যক্তিরা তাড়িত হয় অচরিতার্থতা জনিত অতৃপ্তি দ্বারা । (বর্ণক্রম অনুসারে) জগদীশ গুপ্তের "অসাধু সিদ্ধার্থ" (১৩৩৬), প্রেমেন্দ্র মিত্রের "কুয়াশা" (১৯৪৬), বনফুলের "তৃণখণ্ড" (১৩৪১), "বৈতরণী তীরে" (১৩৪৩), "রাত্রি" (১৯৪১), এ-ধারার অন্তর্গত । রসাতলের জীবন বাস্তবতা উপস্থাপনাকারী উপন্যাস রচিত হয়েছে স্বল্প সংখ্যক । এ-ধারার উপন্যাসের প্রেক্ষাপট রূপে নেয়া হয় সমাজের নিম্নতলকে, ওই জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য এতো প্রকট যে মানুষগুলো পাশবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয় । কোনো কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় কলকাতা নগরীর বস্তিবাসী মানব-পশুদের জীবন বাস্তবতার রূপ । অস্বাস্থ্যকর সংকীর্ণ ঘরে ওই মানুষপশুগুলো অশেষ দুর্গতি ও ক্ষুধার মধ্যে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকে । কোনো কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় কলকাতার ছিন্নমূল, ঠগ মানুষপশুদের অস্তিত্ব রক্ষার বিবরণ । ওই জীবনে মধ্যবিত্তের ন্যায় অন্যায় বোধ, শুদ্ধ অশুদ্ধ ধারণা ও সংস্কার অর্থহীন । যে-কোনো ভাবে টিকে থাকাই সেখানে প্রধান কথা । ক্ষুধাই ওই জীবনে চরম সত্য এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যে-কোনো দুস্কর্ম করতে তৎপর ওই মানুষ-পশুরা । কোনো কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় পল্লীর রসাতলের জীবনের রূপ । ওই জীবনকেও নিয়ন্ত্রন করে দারিদ্র্য ক্ষুধা ও অচরিতার্থ কাম । ওই রসাতলের বাসিন্দারা সংকীর্ণ ভূখণ্ডে অশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে শতছিন্ন জীবন যাপন করে । তাদের নৈতিক জীবন শিথিল । (বর্ণক্রম অনুসারে) প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক (১৯২৪), "উপনায়ণ" (?), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মা নদীর মাঝি" (১৯৩৮), এ-ধারার অন্তর্গত ।

Dhaka University Institutional Repository

ষ ষ্ঠ প রি চ্ছে দ

পল্লীসমাজ ও জীবনের বাস্তবতা

বাঙালি জীবনে পল্লীই এখনো প্রকৃত অর্থে বাস্তবতা, যদিও নগরের বিকাশ ঘটেছে দুই শতাব্দী ধরে তবুও নগর বাস্তবতাকে স্বাভাবিক বলে বাঙালি এখনো মেনে নিতে পারে নি। বাঙলা উপন্যাসে বাঙালির এই মনোভাব রূপায়িত হয়ে আছে। আধুনিক বাঙলা উপন্যাসগুলো যখন রচিত হচ্ছিলো তখন বাঙালি সমাজে গ্রাম ছিলো আরো আধিপত্যশালী এবং ঔপন্যাসিকেরা প্রায় সবাই গ্রামের সন্তান। তাই পল্লীকেই তাঁরা প্রধানত বাস্তব বলে মনে করেছেন এবং অনেকে এ-পল্লীকে স্বর্গের স্তরে উন্নীত করেছেন, তবে তাঁদের বর্ণনায় ধরা পড়ে যে ওই পল্লী স্বর্গের প্রতিভাসে এক ধরণের বাস্তব নরক। কেউ কেউ রাজনীতিক আলোড়নক্ষুব্ধ জনপদ হিশেবে পল্লীকে উপস্থাপিত করলেও, অধিকাংশ উপন্যাসেই পল্লী এক অনড় অপরিবর্তনীয় ভূখণ্ডরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকেরা পৌনপুনিকভাবে দারিদ্র্যের বর্ণনা করেছেন, যে- দারিদ্র্য গ্রামের সবচেয়ে বড় সত্য। কিন্তু অনেকের বর্ণনায়ই ওই দারিদ্র্য একটি গৃহীত শাশ্বত ব্যাপাররূপে গণ্য হয়েছে। পল্লী সম্পর্কে একটি প্রথাগত ধারণা রয়েছে যে পল্লী হচ্ছে সুখশান্তির এলাকা কিন্তু দুএকজন ঔপন্যাসিক প্রথাগত এধারণাকে বাতিল করে দিয়ে পল্লীর নারকীয় চিত্র বর্ণনা করেছেন। যেমন জগদীশ গুপ্ত। পল্লী সমাজওজীবন বাস্তবতার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা অবিকল উপস্থাপনার রীতিটি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা অবিকলভাবে পল্লীকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন, পল্লীর মানুষের নির্মম দারিদ্র্য রূপায়িত করেছেন। তবে তাঁদের পল্লীর সমাজ ও জীবনের বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি অভিন্ন ছিলো না। কেউ বাস্তবতার নিরাবেগ অবিকল উপস্থাপনা করেছেন, আবার কেউ অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করা সত্ত্বেও বাস্তবতাকে দেখেছেন রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে ; ফলে বাস্তবতার নির্মমতা হ্রাস পেয়ে তা সুখকর হয়ে উঠেছে । যেমন তারাশঙ্কর সমকালীন রাজনীতিক আলোড়ন ক্ষুব্ধ জনপদের উপস্থাপনা করেছেন নিরাবেগ অবিকল উপস্থাপন রীতিতে, বিভূতিভূষণ পল্লীর দরিদ্রজীবনের অবিকল বর্ণনা সত্ত্বেও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষকে দেবতা করে তুলেছেন আর জগদীশগুপ্ত পল্লীকে নরক ও পল্লীবাসীদের নরকবাসী করে তুলেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসসমূহে পল্লীকে উপস্থাপিত করেন ভূতলের স্বর্গখণ্ড রূপে। ওই জীবনে অসন্তোষ নেই, মানসিক সঙ্কট নেই। তিনি সাধারণত পল্লীর দরিদ্রশ্রেণী থেকে পাত্রপাত্রী নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তাঁর চরিত্রেরা গভীর সংবেদনশীল, খাপ না খাওয়া ও নিঃসঙ্গ। মানুষের চাইতে তারা অধিক স্বস্তিবোধ করে প্রকৃতির সান্নিধ্যে, গ্রন্থপাঠে কিংবা বেহালা বাদনে। বাস্তবজগতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রবল অর্থনীতিক সঙ্কটে পীড়িত থাকে তাদের জীবন। কিন্তু ওই সঙ্কট ও দুর্দশা শ্বাসরুদ্ধকর বা পীড়াদায়ক নয়, ওই দারিদ্র্য নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে ওই দারিদ্র্যকে মনে হয় চরিত্রদের জন্মসূত্রে পাওয়া ঐশ্বর্যবিশেষ। জীবনকে তা মহিমান্বিত করে তুলেছে। বিভূতিভূষণ পল্লী প্রকৃতির যেমন অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেন তেমনি অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেন দরিদ্র গৃহস্থ জীবনের, দেশাচার ও নানা আনুষ্ঠানিকতার। উপস্থাপন রীতিতে তিনি অবিকল, কিন্তু মনোভাবে রোম্যান্টিক। সুকুমার সেন বলেন, 'বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি পশ্চিম ও মধ্য বাঙালার ধ্বংসপথ বাহী পল্লীজীবনের অরণ্যাক্রান্ত পরিবেশে দারিদ্র জর্জর মুমূর্ষু নরনারীর ক্রমবর্ধমান অভিভব। হিংস্র আরণ্য লতাগুল্মের বেড়াজালে পড়িয়া মানবজীবন যেন শুখাইয়া আসিতেছে। বোধ হয় যেন জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো ভিটার নিঃসঙ্গ বিভীষিকা মরণের ছায়া ফেলিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে বাকি বসতিগুলি দখল করিতে। এই ধ্বংসপথযাত্রীর ছবি বিভূতিবাবুর রচনায় রোম্যান্টিক দূরত্বের প্রজেক্টরের মধ্যদিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং বিভূতিভূষণের দৃষ্টি অভিজ্ঞতালব্ধ হইলেও বাস্তব নয়, রোম্যান্টিক। সে দৃষ্টিতে প্রকৃতি মানব জীবনের খেলাঘর অথবা পটভূমিকা নয়, মানবজীবনই প্রকৃতির খেলাঘর অথবা পটভূমিকা।'[১] ওই দরিদ্র জীবনের সহজ শ্রী ও মাধুর্যের পরিচয় দানই তাঁর লক্ষ্য। এ-কারণেই দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার, আচার অভ্যাস খাদ্য ও রন্ধন, আতিথ্য সেবার উপকরণাদির অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন তিনি। বিভূতিভূষণের পুরুষ চরিত্রগুলি উদাসীন, নির্লিপ্ত, বাস্তবতার মুখোমুখি অসহায় ও ভালোমানুষ ধরনের চরিত্র। তাঁর নারী চরিত্রগুলি সংসার অভিজ্ঞ, শক্তিময়ী। পিতা স্বামী সন্তান সবাইকে রক্ষা করে জননীর মতো মমতায়, তারা পুরুষদের জন্য তৈরি করে দেয় নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, আত্মমগ্ন জীবনে স্বচ্ছন্দের বিচরণের পরিবেশ। প্রিয়জনদের যত্ন পরিচর্যায় যেমন তারা নিবেদিত, তেমনি নানা ভাবে যোগাড়যন্ত্র করে দরিদ্রসংসারের চাকাকে সচল রাখায়ও সিদ্ধ তারা। বিভূতিভূষণের কাছে বাস্তবতারূপে গণ্য হয় পল্লীজীবন। তবে ওই পল্লীজীবনের কুশ্রীতা, কুৎসিত দেশাচার, শ্বাসরুদ্ধকর সংকীর্ণতা নির্দেশ তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ থাকে পল্লী প্রকৃতির দিকে। ওই প্রকৃতি বিচিত্ররূপিনী ও সুন্দর, আর প্রকৃতির কোল থেকে

---

১. সুকুমার সেন, "বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস" (৪র্থখণ্ড), (বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬৫/১৯৫৮) পৃঃ ২৯৭

বাস করা মানুষদের জীবন প্রশান্ত, দারিদ্র্যগ্রস্থ তবুও মধুর । বিভূতিভূষণ হচ্ছেন দারিদ্র্যের রোমান্টিক উপস্থাপক । বিভূতিভূষণের এ-শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে "পথের পাঁচালি"(১৩৩৬), "আরণ্যক" (১৩৪৫) "কেদাররাজা"(১৯৪৫)"আদর্শ হিন্দু হোটেল"(১৩৪৭) "দুইবাড়ী(১৩৪৮)"বিপিনের সংসার" (১৩৪৮) "ই ছামতি" (১৩৪৮) "অশনি সংকেত"(পত্রিকায় প্রকাশকাল ১৯৪৪-৪৬)।

বিভূতিভূষণের প্রধান উপন্যাস "পথের পাঁচালী"(১৩৩৬): এর তিনটি খন্ড: 'বল্লালী বালাই', 'আম আটির ভেঁপু' ও 'অক্রুর সংবাদ' । এ-উপন্যাসে নিশ্চিন্দিপুর নিবাসী হরিহর রায় ও তার স্ত্রী সর্বজয়ার পারিবারিক জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, তবে জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা লেখকের মূল লক্ষ্য নয় । তাঁর মূল উদ্দেশ্য 'একটি শিশুমন বিশ্বের আলোয় তার পাপড়ীগুলি কিরূপে ধীরে ধীরে মেলছে, এর বিপুল রহস্যের প্রতি সচেতন হয়ে উঠচে' তা নির্দেশ ।[২] উপন্যাসটিতে প্রাত্যহিক জীবন ও পল্লীপ্রকৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে, বিভূতিভূষণ বলেছেন, "খুব তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাগুলোকেও দিয়েচি এই জন্যে যে গোটা জীবনের স্মৃতির ভান্ডারে তাদের দান অমূল্য ও অক্ষয়' ।[৩] এ-উপন্যাসে মুগ্ধ বিস্ময়ে একটি শিশু দেখেছে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে, বেড়ে উঠছে শুদ্ধ, সুন্দর, তীক্ষ্ণ, সংবেদনশীল ও খাপ না খাওয়া মানুষরূপে । তাঁর মুগ্ধতা-ভাবুকতা বিস্ময়ের বর্ণনা রয়েছে এ-উপন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে । কিশোর মনের স্বপ্নাচ্ছন্নতা, বিস্ময় মুগ্ধতা, দারিদ্র্য, নিশ্চিন্দিপুরের জন্য কাতরতা ছাড়াও এ-উপন্যাসে বাহ্যজীবন তথা পল্লীজীবনের বাস্তবতা লিপিবদ্ধ হয়েছে । 'বল্লালী বালাই' অংশে বর্ণিত হয়েছে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত হরিহর রায়ের সংসার বৃত্তান্ত । শিশুকন্যা দুর্গা ও স্ত্রী সর্বজয়াকে নিয়ে হরিহর রায়ের দরিদ্র সংসার । এ সংসারের এককোণে মাথাগুঁজে থাকে হরিহর রায়ের দূর সম্পর্কের কুলীন বিধবা বর্ষীয়ান দিদি ইন্দির ঠাকরুণ । এ-অংশে পাওয়া যায় দুর্গাকে । এ-অংশে চিত্রিত হয়েছে একটি পরিবারের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতার পরিচয়, অনটন-কলহ-আচার-সুখ-দুঃখ-কলহ বিষাদময় পারিবারিক জীবন । ওই বাস্তব পীড়াদায়ক নয়, করুণ-কোমল-বিষন্ন-মধুর এক উপকথার মতো । রূপকথায় যেমন দুঃসময়ে নেমে

২· উদ্ধৃত, 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ, "বিভূতিরচনাবলী'(দ্বিতীয়খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,কলিকাতা (প্রথমপ্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৭, চতুর্থ মুদ্রন ১৩৮৫), পৃ· ৪৯৩।

৩· ওই, পৃঃ ৪৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

আসে অভাবিত করুনা, এ-উপন্যাসেও তেমনটি ঘটেছে। এখানে রূঢ় কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি চরিত্রগুলো যখন বিষন্ন ও অসহায়, তখন হঠাৎ কল্যাণময়ী আনন্দময়ী পরীদের মতো কেউ না কেউ নিয়ে আসে সান্ত্বনা শুশ্রূষা, আশা প্রেরণা। যেমন সর্বজয়া কর্তৃক বিতাড়িত এবং সমাজের অন্যান্যদের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে ইন্দির ঠাকরুণ যখন গ্রামের প্রান্তে একলা, ক্ষুধার্ত ও প্রচন্ড জ্বর আক্রান্ত, ওই কঠোর দুঃসময়ে হঠাৎ অভাবিতভাবে খাদ্য ও মমতা নিয়ে পৌঁছে যায় দুর্গা। মর্মস্পর্শী দারিদ্র্য সত্ত্বেও ওই জীবনে দেখা দেয় জন্মের উৎসব। একটি শিশু এসে তার নিজস্ব সৌন্দর্যে ভরে তোলে মলিন আঙিনা। বিভূতিভূষণের বর্ণনায় দারিদ্র্য দুঃখকষ্ট গৌণ হয়ে গেছে, প্রধান হয়েছে জীবনের আনন্দ।

'আম-আটির ভেঁপু' অংশে প্রধান অপুর মুগ্ধতা, প্রকৃতির রহস্যে অভিভূত হওয়া, ভাবুকতা ও স্বপ্ন। প্রকৃতির বিচিত্ররূপ দেখে, নিসর্গের শোভায় তার মন বিভিন্ন অনুভূতি-উপলব্ধিতে পূর্ণ হয়ে যায়, উদাস ব্যাকুল কল্পনাপ্রবণ হয়, উধাও হয়ে যায় নিরুদ্দেশে। এ-সবের পাশে দরিদ্র হরিহরের সংসার জীবনকথাও বিবৃত হয়েছে। কিন্তু ওই দারিদ্র্য মধুর হয়ে ওঠে, ভাইবোনের প্রীতিতে, প্রকৃতির শুশ্রূষায়। অপু স্বাপ্নিক, দুর্গা দরিদ্র সংসারের লুব্ধ, খাদ্য বিলাসী, উড়নচন্ডী কিশোরী। বাউন্ডুলে হয়ে বনেবাদাড়ে সারাদিন সে ঘুরে বেড়ায় কোনো না কোনো ফল পাকুড়, সবজি আনাজের সন্ধানে। লোলুপতা, উড়নচন্ডীপনা সত্ত্বেও সেও কল্পনাপ্রিয় এবং আশাবাদী। পথের পরে সুদর্শন পোকা দেখে অসম্ভবের প্রার্থনায় নতজানু হয় তার কিশোরী হৃদয়। এ-অংশেও বাস্তবের কুশ্রীতা আবৃত হয়ে যায় মানবিক প্রীতিতে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। 'অক্রুর সংবাদ' অংশে আছে অপুদের নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে কাশীতে এসে সংসার পাতা ও পরবর্তী দুর্যোগের কাহিনী। হরিহর এবং সর্বজয়া দুজনেই আশাবাদী। স্বামী অর্থকড়ি উপার্জন করে স্বচ্ছলতা আনবে সংসারে, জীবনে সুখের আগমণ ঘটবে এমন আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সর্বজয়া। কাশীর এক তেতলা বাড়ীর অন্ধকার সাঁৎসেঁতে একতলায় সংসার পাতে সর্বজয়া, স্বামী দশাশ্বমেধের ঘাটে বসে পুরান ব্রতকথা রচনা করে পাঠ করে। মোটামুটি সচ্ছলতা আসে সংসারে। হরিহর এতদিন গুটিয়ে রাখা তার রচিত পালাগুলো আবার বের করে। নতুন করে রচনা করে গাথা, পালা। সে স্বপ্ন দেখে পালা রচয়িতা হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তরে। অপু একটি স্কুলে ভর্তি হয়। গুছিয়ে ঘরকন্না পেতে যখন বসেছে সর্বজয়া, তখন একদিন ধরা পড়ে হরিহরের নিউমোনিয়া। যা কিছু সঞ্চয় ছিলো সব শেষ করেও সুচিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। হরিহরের মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় অনিশ্চিত সর্বজয়াকে রামকৃষ্ণ মিশন এক হিন্দুর বাড়ীতে রাধুনির কাজ জুটিয়ে দেয়। অপু ঠাঁই পায় মায়ের সঙ্গে। অনাদর, অসম্মান, অবহেলার মধ্য দিয়ে পার হতে থাকে তার কৈশোর। ওই রূঢ় অসুন্দর বাস্তবতার নিষ্পেষণে অপু যখন নির্জীব ও বিষাদিত, তখন তার জীবনে এসে পৌঁছে রূপবতী দয়াবতী পরীদের মতো একজন; সুন্দর

Dhaka University Institutional Repository

সহানুভূতিশীল লীলা এবং তার মা। তবু অপুর মন ওই নোংরা কুৎসিত ও অবমাননাকর বাস্তবতার আবেষ্টনে পীড়িত হয়ে পড়ে। অবাধ-নিস্তব্ধ-শ্যামলিমা পরিপূর্ণ নিশ্চিন্দিপুরের জন্য আর্তি হাহাকার জেগে ওঠে তার মনে। সে ফিরে যেতে চায় নিজের নির্জন গ্রামে। এ-অংশে রূঢ় কঠোর বাস্তবতার পরিচয় বিধৃত হলেও, বাস্তবতার উপস্থাপনা এখানে লেখকের লক্ষ্য নয়। ওই বাস্তবতা কোমল স্বপ্নগ্রস্ত সরল বালককে কতখানি কষ্ট দিচ্ছে, তার মন কি রকম সাড়া দিচ্ছে তা নির্দেশই তার লক্ষ্য। ওই কঠোর-কদর্য-অনুদার-অন্ধকারপূর্ণ বাস্তবতার পথ পেরিয়েই সে হয়ে উঠবে পূর্ণ মানব, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং গভীর সংবেদনশীল এক স্রষ্টা। এজন্য বাস্তবতার উপস্থাপনা এখানে। ওই বাস্তবতা অপুকে বিষন্ন ও ক্লান্ত করে, সংকীর্ণতা ও নোংরামোতে তার প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, সে ফিরে পেতে চায় অবাধ অবারিত নিশ্চিন্দিপুরকে। এ-রূঢ় জীবন হচ্ছে অপুর জন্যে বাস্তবতার প্রথম পাঠ। "পথের পাঁচালী"তে সমাজ-সংসার জীবনের বাস্তবতাকে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় অপু ও দুর্গার প্রতিবেশের গভীর অনুরঙ্গ বিবরণ। ওই প্রতিবেশ শ্যামল বনবনানী শোভিত, নির্জন, নিস্তব্ধ এবং রহস্যময়। এর সৌন্দর্য মনকে বিস্ময়মুগ্ধ করে, অজানা অনির্দেশ্য কিছু একটা পাবার জন্য ব্যাকুল করে তোলে, ভাবনা জাগায়, স্বপ্ন দেখায়। এই প্রতিবেশ অনুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে বিশেষ অঞ্চলের রঙ ফুটিয়ে তোলার জন্য নয়; অপুকে মুগ্ধ, বিস্মিত, বিহ্বল ও স্বাপ্নিক করে তোলার উদ্দীপকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রতিবেশ।

"আরণ্যক" এ (১৩৪৫) চিত্রিত হয়েছে অরণ্যবাসী অতি দরিদ্র্যের জীবনের বাস্তবতা। একে ঠিক পল্লী বলা যায়না, তা পল্লীরই দূর আত্মীয়। পূর্ণিয়াজেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গল মহালের প্রেক্ষাপটে "আরণ্যক" রচিত। ঋতুতে ঋতুতে আরণ্য প্রকৃতি ও প্রতিবেশের রূপবদল এবং অধিবাসীদের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে "আরণ্যকে"। এ-উপন্যাসে পুঁজিবাদের আগ্রাসনে অরণ্য ধ্বংস হয়েছে এবং মানুষের জীবন বিস্তার করেছে আধিপত্য। এ-উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ, সে অপুর মতোই স্বাপ্নিক। ওই অরণ্যের নিস্তব্ধতা ও নির্জনতা, প্রহরে প্রহরে, ঋতুতে ঋতুতে রূপ বদলের মোহনীয় মায়া সত্যচরণকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। প্রকৃতি যেমন গম্ভীর, ঔদার্যপূর্ণ, বিশাল, মানুষের জীবন তেমনি অপরিমেয় সংগ্রাম, দারিদ্র্য-ক্ষুধা-অনটন নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নভাবে টিকে থাকার সংগ্রাম চালাতে হয় অরণ্যবাসীদের, শীতে লড়ে যেতে হয় দুর্দমনীয় শৈত্যের সঙ্গে, গ্রীষ্মে ভয়াবহ উত্তাপ ও জলকষ্টের সঙ্গে। এছাড়া সম্বৎসর ধারাবাহিকভাবে লড়তে হয় অন্নাভাবের সঙ্গে। দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী এই মানুষগুলোর খাদ্য হচ্ছে চিনার দানা সেদ্ধ, শাক পাতা সেদ্ধ, ছাতুমাখা ইত্যাদি। অনাড়ম্বর, সরল, সহজ তাদের জীবন ধারা। খাদ্যাভাবগ্রস্ত এই মানুষগুলো সামান্য ভাত খেতে পাবে এই আশায় সাতআট মাইল দূরের কাছারিতে চলে আসে -

Dhaka University Institutional Repository

শীতরাত্রির হিম উপেক্ষা করে। কিছু খেতে পাওয়াটাই তাদের কাছে বড় পাওয়া। তাই সামান্য খাদ্য চীনার-দানা ও একটু নুন জল খাবার হিসেবে পেয়ে অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে ভরে যায় তাদের মন। অসহনীয় কায়ক্লেশ ও কঠোর সংগ্রামপূর্ণ তাদের নিত্যকার জীবন, তবে দারিদ্র্য ও কঠোর জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ নেই, কোনো কিছু কিংবা কারো বিরুদ্ধেই তাদের কোন অভিযোগ নেই। ক্ষুধা, অনটন, জীবিকা নির্বাহের কঠোর শ্রম, ক্ষুন্নিবৃত্তির সামান্য অন্ন সবকিছুই সহজভাবে মেনে নিয়েছে তারা। ওই আরণ্য পল্লীতে যেমন ধূর্ত মহাজন আছে, তেমনি আছে ধাওতাল সাহুর মত নিরাসক্ত বিত্তে নিস্পৃহ সাদাসিদে মহাজন। দারিদ্র্য অনটন সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ভাবুক, স্বাপ্নিক, খাপ না খাওয়া, নিস্পৃহ, ওই প্রকৃতির মতোই। জীবনের সমস্ত গতির আনন্দ অর্থহীন ওই জীবনে। শোভাময় বনভূমির জমি প্রজাবিলি করার ফলে ওই অরণ্য পরিণত হয় বিচ্ছিন্ন বস্তিতে। কুৎসিত অসুন্দর ঘরদোর, উলঙ্গ কৃষ্ণকায় শিশুর দল পথের পরে ধুলাবালি ছড়িয়ে খেলায় মত্ত থাকে, দরিদ্র অসুন্দর জীবনের ছবি মুদ্রিত হয়ে থাকে তার সর্বত্র। অরণ্যের উচ্ছেদ সাধন করে ওই জমিতে বসতি স্থাপন করার ব্যাপারটি দুরকম প্রতিক্রিয়া জাগায় সত্যচরণের মনে। অরণ্যের জন্য ব্যাকুল ও বিষন্ন হয় সে একেক সময়, আবার শস্যপূর্ণ জনপদ প্রতিষ্ঠার সাফল্য ও সুখে হৃদয় ভরে ওঠে। এ-উপন্যাসে অরণ্যই বাস্তব, মানুষগুলো যেনো ওই মহান সুন্দর বাস্তবতার মধ্যে তুচ্ছ অসুন্দর। এখানে মানুষ ও প্রকৃতি মিলিত হয় নি; প্রকৃতির মধ্যে থেকেও মানুষ যেন আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন, সৌন্দর্যের মধ্যে অসৌন্দর্যের মতো।

বিভূতিভূষণ "কেদাররাজা" (১৯৪৫) উপন্যাসেও বার্থ, ও দরিদ্র পল্লী জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে। তবে ওই জীবনকে বিভূতিভূষণের কাছে সুধাময়, শ্রীমন্ডিত ও মাধুর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, তাঁর লক্ষ্য ওই শ্রী ও সুধা ও মাধুর্যের পরিচয় দান। একারণেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন গৃহকর্ম, আচার অভ্যাস খাদ্য আতিথ্য ইত্যাদির বর্ণনা অনুপুঙ্খ দিয়েছেন, দিয়েছেন অনটন জীর্ণতার পরিচয়, কিন্তু অন্নপূর্ণার মতো শত অনটনেও প্রতিদিন নানা অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ পরিজনের সামনে পরিবেশন করে দরিদ্র গৃহের গৃহিনী। তেজী, ব্যক্তিত্বময়ী, সেবাপরায়ণা, পরহিতব্রতী, প্রিয়জনের যত্নপরিচর্যায় সম্পূর্ণ নিবেদিতা, যোগাড়যন্ত্র করে গতিরুদ্ধ দরিদ্রসংসারের চাকাকে সচল রাখায় সিদ্ধ বিভূতিভূষণের নারীচরিত্রের। এই শক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থাশীল ও নিশ্চিন্ত বলে নির্লিপ্ত পুরুষ বা গৃহকর্তা দারিদ্র্যের পীড়নে খুব বেশি হিমশিম খায় না। কিভাবে

Dhaka University Institutional Repository

সংসার চলবে সে ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। "কেদাররাজা" উপন্যাসে ব্যর্থ দরিদ্র ভালোমানুষ আত্মমর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন ও সৎ কেদাররাজার জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে। কেদাররাজার পূর্বপুরুষ ছিলো রাজা, কেদাররাজা তাদের দরিদ্র উত্তরপুরুষ। প্রৌঢ় এই উত্তরপুরুষটি সকাল সন্ধ্যা দুপুর সর্বদাই মাছ ধরা, বেহলা বাজানো কিংবা যাত্রার পালা মুখস্থ করার কাজে ব্যস্ত থাকে। দু এক ঘর প্রজা যা আছে তাদের থেকে অল্প খাজনা যা আদায় হয় তাতে কায়ক্লেশে দিন কাটে। এ-উপন্যাসে বহুঘটনা; কেদাররাজার কন্যা শরৎকুমারীকে লম্পটের কবলে পড়ে পতিতালয়ে পর্যন্ত যেতে হয়, কিন্তু সহৃদয় এক ভ্রাতার সহায়তায় অক্ষুণ্ণ থাকে তার সতীত্ব। এ-উপন্যাসের দারিদ্র্যও নির্মম কিন্তু মধুর। উপন্যাসে নগরও রয়েছে; কিন্তু নগরের বর্ণনায় তিনি ব্যর্থ। যেমন পতিতালয়ের প্রতিবেশ যথার্থরূপে উপস্থাপিত হয় নি, থেকে গেছে অস্পষ্ট। তার পতিতাও অতি হৃদয়-বান, সৎ, উপকারী ভালোমানুষ। বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের মতো "কেদাররাজা"য়ও সাধারণ দরিদ্র গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখপূর্ণ বাস্তবতার চিত্রণ ঘটেছে। অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত দারিদ্র্য জর্জর সংসারে অতি-কষ্টে সংগৃহীত এবং অতি যত্নে রান্না করা 'ডাঁটা-চচ্চড়ি', 'ডুমুর' কি 'থোড় ছেঁচকি', 'সুল্প তেলে পোড়া পোড়া করে ভাজা পাকা কাঁচকলা' এই সব আপাত সামান্য খাদ্য সামগ্রীর অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, তুলে এনেছেন দারিদ্র্য জর্জর জীবন বাস্তবতাকে।

"আদর্শ হিন্দু হোটেল" (১৯৪০) একান্তভাবে পল্লীর উপন্যাস নয়, কিন্তু পল্লীর সাথে রয়েছে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রাণাঘাট রেলস্টেশন সংলগ্ন বাজারের পটভূমিকায় "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর কাহিনী রচিত। হাজারি ঠাকুর রাঁধুনি বামুন, সে সৎ, নির্বিরোধী ভালোমানুষ, সে তার কাজের প্রতি বিশ্বস্ত। তার সরলতা ও সততার সুযোগে তাকে ঠকায় মনিব বেচু চক্রবর্তী, হেনস্থা করে হোটেলের পদ্মঝি। অন্য হোটেল থেকে অনেক বেশি মাইনের চাকুরির প্রস্তাব এলেও সে তা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তার দুঃসময়ে বেচু চক্রবর্তীই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো। সর্বদাই তাকে অন্যায় অপমান সইতে হয়, দোষী বলে চিহ্নিত হতে হয়। আত্ম অপমান জুড়াতে একাকী বসে থাকতে হয় চূর্ণী নদীর ধারে। বিভূতিভূষণ তার অন্যান্য চরিত্রদের ভাবুকতা, স্বপ্নপ্রসুতা থেকে হাজারিকেও বঞ্চিত করেন নি। হাজারি ঠাকুরের মধ্য-দিয়ে তিনি এ-উপন্যাসটিতে একটি আইডিয়ার প্রতিষ্ঠা বা জয় ঘোষণা করতে চেয়েছেন। সরল নিরীহ হাজারি ঠাকুর সংসারের সকল বিরূপতা সত্ত্বেও নিজের যোগ্যতা ও সততার গুণেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রতিকূল বাস্তবতার শত বিরূপতা-নির্মমতা সত্ত্বেও সততার জয় অনিবার্য এ-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভূতিভূষণ এ-উপন্যাসে। তবে সাধারণ গৃহস্থজীবনের দুঃখসুখের পরিচয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে ওই জীবনের শ্রী ও মাধুর্যের পরিচয় দিতে তিনি ভোলেন নি। সাধারণ জীবনের বাস্তবতার অনুপুঙ্খ বিবরণ

Dhaka University Institutional Repository

লিপিবদ্ধ করা তার বৈশিষ্ট্য। বেচু চক্রবর্তীর হোটেলের প্রাত্যহিক বাস্তবতার বিশদ বিবরণ যেমন যেমন পাই, তেমনি পাই হাজারি ঠাকুরের সরলা ভালোমানুষ স্ত্রীর গার্হস্থ্য জীবনের বিবরণ । এ-উপন্যাসটিও সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনবাস্তবতা, স্বপ্নসাধ বাসনার আলোড়নকে ধারণ করে আছে । ওই জীবন দারিদ্র্যগ্রস্ত, লাঞ্ছনা অপমান বিদীর্ণ, তবুও স্বপ্ন দেখে সুন্দর ভবিষ্যতের, পরিকল্পনা করে লাঞ্ছনার জীবনকে পেছনে ফেলে সফল হোটেল মালিক হয়ে ওঠার । আর সে স্বপ্ন পরিকল্পনা অচিরেই বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায় অর্থ-কড়ির অভাবে । তবুও স্বপ্নপরিকল্পনা নিয়ে কথা বলার সুখটুকু উপরিপাওনা হিসেবে পায় হাজারি । এটুকু তার বর্তমানের স্বস্তি, ভবিষ্যতের জন্য প্রেরণা । হোটেল জীবনের বাস্তবতা ও লিপিবদ্ধ হয়েছে উপন্যাসে । হাজারি-র আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিলাষ ও সংগ্রামের পরিচয় দানের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছেন লেখক হাজারি ঠাকুরের সফল ও সচ্ছল জীবনের পরিচয় নির্দেশে । হাজারির ইচ্ছে ও স্বপ্নপূরণের গল্প হয়ে উঠেছে এটি । হোটেল জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অনুপুঙ্খ ও বিশদ কিন্তু নিরপেক্ষ ও কঠোর বাস্তব বর্ণনা মাত্র তা নয় । ওই রূঢ়তা অপমান তাচ্ছিল্য কঠোরতার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে কর্মনিষ্ঠার গৌরব দেখানোর জন্যে ।

"দুইবাড়ী"(১৩৪৮)রচিত গ্রাম ও মহকুমা শহরের প্রেক্ষাপটে । রামতারণ চৌধুরী গ্রামের দরিদ্র গৃহস্থ, ঋণ করে কায়ক্লেশে সংসার জীবন নির্বাহ করে থাকে । বিভূতিভূষণ তার পরিবারের দারিদ্র্যের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন বিভিন্ন ঘটনায় । রামতারণের পুত্র মফস্বল শহরে মোক্তারি করে সামান্য টাকা কড়ি আয় করে সংসারের অনটন মেটাবার প্রয়াস চালায় । শনিবার শনিবার সে পাঁচ মাইল দূরবর্তী মহকুমা শহর থেকে গ্রামের বাড়ীতে হেঁটে চলে আসে ছুটির দিন কাটাবার জন্য । নিধুর মা তারজন্য যত্ন করে কচুর শাক রাধে, প্রিয় খাদ্যগুলো সামনে সাজিয়ে দেয় । মোক্তারীতে নিধুর আয় সামান্যই, তবে ওই জীবনেও আছে প্রতিষ্ঠিত মোক্তারদের রেশারেশি, কন্যাদায় গ্রস্ত বয়স্ক মোক্তার তৎপর হয় তরুণ অবিবাহিত মোক্তারের কাছে কন্যা গছিয়ে দায়মুক্ত হতে । এক শনিবারে গ্রামে গিয়ে নিধু দেখে তাদের পাশের পরিত্যক্ত বাড়ীর জজ লাল বিহারী বাবু পুজো করার জন্য দীর্ঘদিন পর গ্রামে ফিরেছেন । জজ সাহেব ধনী এবং পদস্থ হলেও ভালোমানুষ, নিরহংকারী, ও নম্র । তার স্ত্রী কন্যা পুত্ররাও সরল, আন্তরিক, মানুষকে ভালোবেসে নিকট করে নেয়। কন্যা মঞ্জুর সঙ্গে গড়ে ওঠে নিধুর আন্তরিক সম্পর্ক । সংসারের অভাব, মক্কেল পাবার অনিশ্চয়তা, ক্লান্তক্লেশে জীবন যাপন করা ইত্যাদি সবকিছুই তখন গৌণ হয়ে যায় নিধুর কাছে । মন উন্মুখ হয়ে থাকে শনিবারের জন্য, শনিবার বিকেলে বাড়ি পৌঁছে মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করার জন্য । মঞ্জু দয়াবতী সরলা তরুণী । নিধুদার জন্য নানারকম জলখাবার তৈরি করে খাওয়ায় তাকে, প্রায় প্রতিবেলা আহারের নিমন্ত্রণ করে । গল্প-হাসি-রসিকতা-

Dhaka University Institutional Repository

কুশলবাক্য-প্রতিকাজে বিধুদার সহায়তা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মধুর প্রীতিপূর্ণ স্নিগ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলে সে। বিধুর মন অনুরক্ত হয় মজুর প্রতি, যদিও অনুরাগ সে গোপন রাখে। মজুর জন্য মহকুমা অফিসারের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব আসে। এক শনিবার বিকেলে হেঁটে বিধু বাড়ি ফিরছিলো, পথে তার তীব্র জ্বর আসে। ধুকতে ধুকতে বাড়ি পৌঁছে অজ্ঞান হয়ে যায় সে। শহর থেকে নামী চিকিৎসক আনার ব্যবস্থা করায় মজু তার বাবাকে বলে। ধরাপড়ে টাইফয়েড হয়েছে। দীর্ঘদুমাস অচেতন -অর্ধচেতন থাকার পর বিধু রোগমুক্ত হয়। সজ্ঞান হবার পর জানতে পারে পিতার ছুটি ফুরিয়ে যাবার কারণে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে মজুকেও গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। অসুখের সময় প্রতিদিন প্রায় সারাক্ষণ মজু বিধুর শর্য্যাপার্শ্বে বসে থেকেছে, যাবার সময় চোখের জল বাধা মানে নি তার। রোগমুক্তির পর দুর্বল বিধু ডাক্তারের নির্দেশ মত সকাল বিকাল হেঁটে বেড়ায় আর পরিত্যক্ত নিঃশব্দ অন্ধকার বাড়ীটার দিকে আনমনা চেয়ে থাকে। এ-উপন্যাসে পল্লীর একটি দরিদ্র পরিবার ও গ্রামে বেড়াতে আসা ধনী পরিবারের জীবনবাস্তবতা অনুপুঙ্খ বর্ণিত হয়। কিন্তু এ-উপন্যাসেও বাস্তবতার উপস্থাপনা লেখকের লক্ষ্য নয়, একটি ব্যর্থপ্রেমের গল্প বলাই তাঁর লক্ষ্য। বিভূতিভূষণের যে দারিদ্র্যের জগত তা এ -উপন্যাসেও উপস্থিত।

"বিপিনের সংসার" ও(১৯৪১) দরিদ্র জীবনবাস্তবতার বিভূতিভূষণধর্মী উপস্থাপনা। একদা ধনশালী নায়েবের পুত্র বিপিন বিপুল ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে, কিন্তু অজস্র অপচয়ের মধ্যদিয়ে নিঃস্ব হতেও তার দেরি হয় না। অভাব অনটন, স্ত্রীর নিত্য খোঁটায় অতিষ্ঠ হয়ে সেকাজ নেয় পিতার মনিব জমিদার অনাদি চৌধুরীর সেরেস্তায়। জমির দলিলপত্র দেখাশোনা খাজনা আদায় ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব থাকে তার ওপর। সংসারের নিত্য অনটন, ছোট ভাইটির নেফ্রাইটিস রোগ, স্ত্রীর অভিযোগ, ঠিকমতো খাজনাপত্র আদায়ে ব্যর্থতার জন্যে মনিব ও মনিব গিন্নীর ভৎর্সনায় তার চিত্ত থাকে বিক্ষিপ্ত। এর মধ্যে সান্ত্বনা হিসেবে পায় জমিদার কণ্যা সুলতার আন্তরিক সৌহার্দ্য সহানুভূতি, যত্ন ভালোবাসা, তার দারিদ্র্যপূর্ণ নিরানন্দ জীবনে সুলতা বা মানীর ভালোবাসা অভাবিত মাধুর্যের স্বাদ দেয়। স্ত্রীর আবেগশূণ্যতা, শুধু সাংসারিক প্রয়োজন নিয়ে কথা বলার প্রবণতা তাঁকে বিষন্ন ও বিরক্ত করে। সেও কেনো সুলতার মতো ভালোবাসা যত্নমমতা দিতে পারে না এজন্য বিপিনের মনে গোপন ক্ষোভ ও দুঃখ জন্মে। বিপিন অপরিনামদর্শী উচ্ছৃঙ্খল ঠিকই, তবে অন্তর্লোকে সে বিষন্ন স্বপ্নকাতর, রোমান্টিক। দারিদ্র্যতারই অক্ষমতার ফল, কিন্তু স্ত্রীর মুখে অভাব অভিযোগের অত ফিরিস্তি তাকে বিরক্ত করে। স্ত্রীর কাছে সে আশা করে সহমর্মিতা,

Dhaka University Institutional Repository

অনুকম্পা, মানসিক সমঝোতা। অন্তর্লোকে সে ভাবুক, স্বাপ্নিক, প্রেমিক এবং কোমল। তার মন প্রকৃতির সৌন্দর্যে উদাস হয়, প্রাচীন বয়োবৃদ্ধের প্রতি আগ্রহবোধ করে। বিপিন খাপনা খাওয়া মানুষ। পিতার নায়েবী পেশা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলেও, পিতার মতো দরিদ্র প্রজাসাধারণকে নির্যাতন করে খাজনা আদায় করার কথা ধারণায়ও আনতে পারে না। বরং অবাক হয় এই ভেবে যে তার পিতা কি করে এদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। তার জীবনে বিবাহিতা নারীরা বারবার অযাচিত ভালোবাসা ও মমতা নিয়ে আসে, সে তাতে মুগ্ধ হয়, কিন্তু অশান্তির ভয়ে সে তা গ্রহণ করতে পারে না। বিভূতিভূষণ দরিদ্র পল্লী-গৃহস্থের জীবনবাস্তবতার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের খাদ্যের প্রতি গভীর ও অদম্য লালসা, তাদের আচারআচরণ, অভ্যাস ইত্যাদি বিশ্বস্তভাবে অঙ্কিত হয়েছে এ-উপন্যাসেও। যে জীবনবাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায় তা দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, কিন্তু ক্ষুদ্র আত্মত্যাগ, অশ্রুদীর্ঘশ্বাস , সামান্য প্রাপ্তি ও তৃপ্তির স্পর্শে প্রশান্ত। বিভূতিভূষণের রোমান্টিক মনোভঙ্গির জন্যে নির্মম বাস্তবতাও নির্মম থাকে না, উপন্যাসটিকে মনে হয় নিসর্গআচ্ছাদিত দরিদ্রজীবনের উপকথা।

"ইছামতী"(১৩৫৬)রচনার পেছনে বিভূতিভূষণের যে-আবেগ কাজ করেছে, তা তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে:'কত হাসি-কান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এলো, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল-কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ঐ ঠাণ্ডাজলের কিনারাতেই, ...কত তরুণী সময়ের পাষাণ বর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। .... এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী"।[৪] বিভূতিভূষণের লক্ষ্য জীবনলীলা বর্ণনা, তাই বাস্তবজীবন তার সমস্ত নির্মমতা সত্ত্বেও হয়ে উঠেছে মধুর আনন্দময়। ১২৭০ বঙ্গাব্দের বাঙলা দেশের একটি গ্রাম এই কাহিনীর পটভূমি। যশোর জেলার ইছামতী নদী তীরবর্তী মোল্লাহাটি গ্রামের জীবনযাত্রা ও পল্লীপ্রকৃতির উপস্থাপিত হয়েছে। "ইছামতী"তে। উপন্যাসের একদিকে আছে নীলকুঠির ইংরেজ কর্মকর্তাদের জীবন যাত্রার কাহিনী, অন্যদিকে রয়েছে ওই গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্তান্ত। প্রবহমান ইছামতীর কূলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ গৃহস্থেরা যে জীবন যাপন করে চলেছে তার ইতিকথা বর্ণিত এখানে। "ইছামতী" উপন্যাসে উপস্থাপিত বাস্তবতা রোম্যান্টিক আবেগের রঙ রঞ্জিত। বিভূতিভূষণ এ-উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে, দুঃখ অনটন, সামাজিক অন্যায়, রক্ষিতা নারীর জীবন, যৌতুক, কুলীনকন্যার বিবাহ সমস্যা, বহুবিবাহ, শাশুড়ী বধূরকলহ-নির্যাতন, চোর-দুষ্কৃতিকারীর জীবন সবই চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু ওই বাস্তবতাকে পীড়াদায়ক মনে হয় না, বরং মনে হয় দূরবর্তী কোমল,

৪. উদ্ধৃত, 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ, বিভূতিরচনাবলী(দ্বাদশখণ্ড) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স কলকাতা(প্রথমপ্রকাশ ১৩৭৯১, দ্বিতীয়মুদ্রন ১৩৮৭),পৃঃ ৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর এক উপকথা। লেখক দেখেছেন তাকে মুগ্ধ বেদনাপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিতে। কালস্রোতে জীবনের যে ক্ষণস্থায়ী বুদবুদ জাগছে তার বৈচিত্র্য নির্দেশ করেছেন তিনি। ওই ধারাবাহিক লীলার পুনরাবৃত্তি নিয়ে মহাকালের স্রোত অজানার দিকে ছুটে যাচ্ছে- এই পরিণাম তাকে বেদনাবিধুর বা বিষন্ন করে তুলেছে। বিভূতিভূষণের কাছে বাস্তবতার রূঢ়তা, প্রবঞ্চনা, দুঃখ-অনটন-ক্লেদ-কলুষ সবই হচ্ছে জীবনের বিচিত্ররূপ, আর তারই ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি হচ্ছে জীবন। মানুষ হচ্ছে কালের বুদবুদ। দার্শনিক সুলভ নির্লিপ্ত ও বেদনাময় দৃষ্টিতে তিনি বাস্তবতাকে দেখেছেন। তাই ওই বাস্তবের রূঢ়তাও হয়ে উঠেছে মধুর। বিংশ শতকের মধ্যপর্যায়ে বসে প্রায় একশ বছর পূর্ববর্তী সমাজজীবন বাস্তবতাকে উপস্থাপন করার মধ্যেও ধরা পড়ে বিভূতিভূষণের রোম্যান্টিক মনোভঙ্গীর। দুঃখ-সুখ-রূঢ়তা-ক্লেদ-অনটন- অপ্রাপ্তি ভরা নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনবাস্তবতা অনুপুঙ্খ চিত্রিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা নিরপেক্ষ চিত্রন তা নয়; লেখক এর প্রতি অনুরক্ত। তাই ওই বাস্তবতাকে মধুর, দূরবর্তী ও সুন্দর বলে মনে হয়। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দুঃখ যেন জীবনকে মহৎ করে তোলে, এখানে রূঢ়তাও সুন্দর, সুখও সুন্দর; কলহ বিবাদ সুন্দর; অনটন অপ্রাপ্তিও জীবনের মহৎ সৌন্দর্যেরই একটি দিক। এখানে বাস্তবতা হয়ে উঠেছে উপকথার মতো সুখকর। ক্ষুদ্র দুঃখ-ব্যথা, বঞ্চনা-শোষণ-মৃত্যু-বিরহ-মিলন পূর্ণ জীবনের গাথা হচ্ছে "ইছামতী"।

"অশনি-সংকেত" উপন্যাসটির রচনাকাল মাঘ ১৩৫০ থেকে মাঘ ১৩৫২ বঙ্গাব্দঃ ধারাবাহিকভাবে একটি "মাসিক মাতৃভূমি" পত্রিকায় জানুয়ারী ১৯৪৪ থেকে জানুয়ারী ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। "মাতৃভূমি" পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভূতিভূষণ উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন নি। অসমাপ্ত অবস্থায় এটি দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর ওই অসমাপ্ত আকারেই এটি ১৯৫৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাই এটির গ্রন্থকারে প্রকাশ পরে ঘটলেও এটি আমাদের আলোচ্য পর্বেরই উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত পল্লীজীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। কাহিনীর শুরুতে রয়েছে সচ্ছল নিস্তরঙ্গ সাধারণ পল্লী জীবনের কাহিনী। গ্রামের সাধারণ মানুষ পরস্পর মিলেমিশে থাকে, দেবদ্বিজে ভক্তি জানায়, প্রণামি দেয়। অতি সচ্ছল না হলেও সাধারণ চাহিদাগুলো মিটিয়ে স্বস্তি ও তৃপ্তিতে দিন যাপন করে তারা। বিশ্বযুদ্ধের থাবা এসে হরণ করে ওই স্বস্তি ও প্রাত্যহিক খাদ্য জোটাবার সামর্থ। চাল অগ্নিমূল্য, দুর্লভ হয়ে ওঠে, মন্বন্তরের দংশনে দিশেহারা মানুষ কলমিশাক, লতাপাতা, কলাই সেদ্ধ, কচু সেদ্ধ, ঝিনুক গুগলি সেদ্ধ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে চলে। অনাহারে অনেকে মৃত্যু বরণ করে, সাধ্বী গৃহস্থ বউ দেহ বিক্রী করে চাল সংগ্রহ করে, দোকান থেকে ধান চাল লুট হতে থাকে। অবশেষে অসহায় হতাশ ক্ষুধার্ত মানুষ দলে দলে ছোটে শহরের দিকে।

Dhaka University Institutional Repository

গৃহস্থবধূরা পতিতা দালালদের হাত ধরে শহরের দিকে পা বাড়ায়। পঞ্চাশের মন্বন্তর গ্রস্ত পল্লী বাঙলার এই জীবনবাস্তবতার পরিচয় তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ "অশনি সংকেত" উপন্যাসে। শান্ত সহজ শ্রী ও মাধুর্য সম্পন্ন পল্লীজীবন মন্বন্তরে দংশনে কেমন জর্জরিত হয়েছে তার বিবরণ রচনা করছেন বিভূতিভূষণ। ওই মন্বন্তর হরণ করছে সাধারণ গৃহস্থের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিকতা, অন্নাভাব সবাইকে উদভ্রান্ত করে তাড়িয়ে ফিরছে, একটু ফেনের জন্য ব্যাকুল হয়ে আহাজারি করছে মানুষ, গৃহত্যাগ করে পা বাড়াচ্ছে কঠিন কঠোর অচেনা নগরের দিকে। বিধ্বস্ত হচ্ছে গৃহকোণের শান্ত সুখ ও নিরাপত্তা। বিভূতিভূষণ করুণ বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে ওই মন্বন্তরগ্রস্ত বিপন্নজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। [redacted]। তবে এ-উপন্যাসে ভয়ঙ্কর মন্বন্তর ও বিশ্বযুদ্ধের দংশন গ্রস্ত সময় ও পল্লীজীবন নৈর্ব্যক্তিকভাবে উপস্থাপিত হয় নি। বিপন্ন ক্ষুধাকাতর নিরন্ন মানুষের খাদ্য অন্বেষণ, তাদের উদভ্রান্তি ও অসহায়তার দিকে বেদনাকাতর ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন লেখক। তিনি দেখান যে এতো ক্ষুধা, অনিশ্চয়তা, উচ্চ দ্রব্যমূল্য, মুদ্রাস্ফীতি ওই জীবনকে বিপন্ন করে তুললেও পল্লী মানুষগুলো মানবিকতা হারায়নি; আত্মত্যাগ করার কোমলবৃত্তি তাদের নষ্ট হয় নি। নিজে উপবাস করে আশ্রয় প্রার্থী ব্রাহ্মণের পাতে খাদ্য তুলে দেয় অনঙ্গবৌ, দিনের পর দিন উপবাসে থাকে সেও, তবুও ক্ষুধার কষ্ট সয়ে অন্যকে খাদ্যের ভাগ দেয়। প্রতিবেশী ছোট বৌ দেহ বেক্রী করে যে চাল পায় তা এনে ভাগ করে নেয় অনঙ্গ বৌয়ের সঙ্গে। বিভূতিভূষণের পল্লীর মানুষগুলো কোমল, মানবিকগুণ সম্পন্ন, দয়াদ্রচিত্ত প্রাচীন ভারতীয় মহৎমূল্যবোধ সম্পন্ন গৃহস্থ তারা সবাই। একই মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "চিন্তামনি"। ওই উপন্যাসে মন্বন্তরের চাপ ও মানুষের দুর্বিসহ কষ্ট, অন্নাভাব বর্ণিত হয় নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে। মানিক নির্মোহ ভঙ্গিতে তুলে ধরেন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের জীবনবাস্তবতা, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ও পরিণাম। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে এমন ঘটে নি। তিনি মন্বন্তর পূর্ববর্তী শান্ত সচ্ছল পল্লীবাঙলার গৃহস্থজীবনের শ্রী ও মাধুর্যের বিবরণ রচনা করেন এবং ক্রমশ মন্বন্তরের বিষাক্ত দংশনে ওই মাধুর্য কীভাবে বিনষ্ট হচ্ছে তা নির্দেশ করেছেন। তিনি সনাতন সেবাপরায়ণ আত্মত্যাগী সহিষ্ণু ভারতীয় নারীদের গল্প বলেন। এ-উপন্যাসে যারা অনাহার নিশ্চিত জেনেও দুঃস্থ ক্ষুধার্তের পাতে খাদ্য তুলে দেয়, নানা রকম জোগাড়যন্ত্র করে স্বামী পুত্রকে অনাহার থেকে রক্ষা করে। তারা কল্যাণী, সহিষ্ণু ও আত্মত্যাগী। ওই নারীদের তিনি দেখেন মুগ্ধ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে। রূঢ়, নির্মম ও প্রকৃত বাস্তবতার নিরাবেগ উপস্থাপনা করেন নি বিভূতিভূষন। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অসহায় মানুষের শোক অসহায়তা বিপন্নতার করুণ কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখতারাক্রান্ত চিত্তে বিবৃত করেন । যেখানে দুর্ভিক্ষপূর্ব সচ্ছল স্বাভাবিক দৈনন্দিন, পারিপারিক ও সামাজিক জীবনের বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি, যেখানে তিনি সফল । গৃহস্থ জীবনের সুখ, দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্ম, অভ্যাস, প্রাত্যহিক খাদ্যাভ্যাস গৃহস্থালীর তিনি অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করেছেন, নির্দেশ করেছেন ওই জীবনের সহজ স্ফূর্তি ও মাধুর্য । আপাত নিস্তরঙ্গ ওই জীবনের আভ্যন্তর স্রোত, ছোটখাট প্রাপ্তি, চাহিদা,কাজ-কর্ম, সুপ্রপরিকল্পনা ব্যর্থতা সাফল্যপূর্ণ সহজ গ্রামীণ জীবনের গল্পবলায় তিনি সফল । এই জীবনের পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সব কটি উপন্যাসে,বিভূতিভূষণ সাধারণত তুচ্ছ বাস্তবতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন । তিনি নিম্নরূপে উপস্থাপিত করেন বাস্তবতা :

> অনঙ্গদের বাড়ী গোয়ালপাড়ার প্রান্তে, দুখানে মেটে ঘর । খড়ের ছাউনি, একখানা দোচালা রান্নাঘর । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠানের ধারে ধারে পেপে ও মানকচু গাছ । চালে দিশি কুমড়োর লতা দেওয়া হয়েছে কঞ্চি দিয়ে, রান্নাঘরের পাশে গোটাকতক বেগুন গাছ, ঢেঁড়স গাছ । অনঙ্গ এসে দেখল বদ্যিনাথ কলু বড় একটা ভাড়ে প্রায় আড়াই সের খাঁটি সর্ষে তেল এনেছে । তেল মাপা হয়ে গেলে বদ্যিনাথ বললে- মাঠাকরুন, আজ আর সর্ষে দেবেন নাকি ?
> – উনি বাড়ী এনে পাঠিয়ে দেবো । এখন এই তেলে একমাস চলে যাবে-[৫]

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দারিদ্র্য বাতাসের মতো স্বাভাবিক, এবং তিনি দারিদ্র্যদুরবস্থা নির্দেশ করেন সাধারণত খাদ্যের অভাব বা সামান্য খাদ্য ভোজনের তৃপ্তি বর্ণনা করে । নিচের উদ্ধৃতিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে :

> ১। পূর্ব্বদিন ছিল একাদশী । হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাকরুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে । হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে । দু-একবার

৫· অশনিসংকেত" পৃঃ ১১৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাকরুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না? - ওই দ্যাখো।

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক পিতি, তুই খা-দুটো পাকা বড় বীচে কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙিয়া ইন্দির ঠাকরুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাইল- সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।[৬]

২। তারপর এই দুর্দশার সংসারে বীণা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পড়ে, রাত্রে একমুঠা চাল চিবাইয়া জল খাইয়া সারারাত কাটায়।..... ....

আজকাল, বিপিনের চাকুরি হওয়া পর্য্যন্ত রাত্রে এক পোয়া আটার রুটি হয় বীণার জন্য। আগে এমন একদিন ও গিয়াছে বীণা কিছু না খাইয়া রাত কাটাইয়াছে। আটা ময়দা কিনিবার পয়সা তো দূরের কথা, বাড়ীতে একমুঠা চাল থাকিত না যে ভাজিয়া খায়। আজকাল মনোরমাই এ-বন্দোবস্ত করিয়াছে, একসঙ্গে আটা আনিয়া রাখে, বীণার যাহাতে এক সপ্তাহ চলে। শাশুড়ী রাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না, সহ্য হয় না। বীণা রাত্রে না খাইয়া কষ্ট পাইত, মনোরমা তাহা সহ্য করিতে পারিত না। সে অত্যন্ত গোছালো সংসারী মানুষ, তাহার সংসারে কেহ কষ্ট পায়, ইহা সে দেখিতে পারে না। তবে আজকাল আবার বলাইয়ের অসুখ লইয়া মুশকিল বাধিয়াছে, বীণার জন্য তোলা আটায় তাহাকেও রুটি করিয়া দিতে হয় রাত্রে। অথচ বেশী করিয়া আনিবার পয়সা নাই। বিপিন যে টাকা পাঠায় তাহাতে সবদিকে সংকুলান হওয়া দুষ্কর। বেশী পয়সা চাইলেও বিপিন দিতে পারে না।

---

৬. "পথের পাঁচালী", পৃঃ ৩,

Dhaka University Institutional Repository

মনোরমা যেভাবে সংসার গুছাইয়া রাখিতে চায়, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সবাই সুখে থাক, মনোরমার সেদিকে অত্যন্ত নজর।[৭]

৩।। কেদার স্নান সেরে এসে খেতে বসলেন। পাথরের খোরায় বুক্‌ড়ি কালো আউশ চালের ভাত ও ডাঁটা চচ্চড়ি। খোরার পাশে একটা ছোট কাঁসার বাটিতে কাঁচা কলাইয়ের ডাল। কেদার নাক সিঁটকে বললে, কি ছাই-রাই-ই রাঁধিস রোজ, তোর রান্না নিত্যি খাওয়া এক ঝকমারি।

শরৎ চুপ করে রইলো।

নীরবে কয়েকগ্রাস উদরস্থ করে ক্ষুধার প্রথম দিকের জ্বালাটা খানিকটা মিটিয়ে কেদার মেয়ের দিকে তিরস্কারসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আহা, কি ডাল রাঁধবার ছিরি! আর এই একঘেয়ে ডাঁটা চচ্চড়ি, এ রোজ রোজ তুই পাস কোথায় বাপু!

-আমার কি দোষ, আমি কি বাজারে যাই না কি? যা পাই হাতের কাছে তাই রাঁধি। কে এনে দিচ্ছে বল না -

কেদার মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, তার মানে?

তার মানে কি শরৎ বাবাকে ভাল ভাবেই বুঝিয়ে বলতে পারত, ঝগড়ায় সেও কম যানে না - কিন্তু বাবার মেজাজ সে উত্তমরূপে জানে, এখুনি রাগ করে ভাতের থালা ফেলে উঠে যাবেন এখন। সুতরাং চুপ করেই গেল সে।

কেদার পাতের চারিদিকে ডাল মাখা ভাত ফেলে ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো আগোছালো ভাবে আহার সম্পন্ন করে অপ্রসন্ন মুখে উঠে যাবার উদ্যোগ করতে শরৎ বললে- বসো বাবা, উঠো না, কিছু তো খেলে না, একটু তেঁতুল দিয়ে খেয়ে নাও -।[৮]

বিভূতিভূষনের পল্লী হচ্ছে একধরণের আর্কেডিয়া। যেখানে দারিদ্র্যসত্য,

---

৭• বিপিনের সংসার", পৃঃ ২১৪,

৮• "কেদাররাজা" পৃঃ ১৭১,

কিন্তু দারিদ্র্যকে স্নিগ্ধ করে রাখে মানুষের হৃদয় ও প্রকৃতির শোভা। তাঁর উপন্যাসে বাস্তবতা নির্মম নয়, তা মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে না। তা বরং মানুষকে জীবন অভিলাষী করে তোলে। মনে হয় জীবন কতো-মধুর। বিভূতিভূষণ যদিও সমকালের গল্প বলেছেন তবু তাঁর উপন্যাসের পল্লীকে অনেকটা কাল নিরপেক্ষ পল্লী বলেই মনে হয় বা এই পল্লী হয়তো ছিলো মধ্যযুগে। ওই কাল নিরপেক্ষ পল্লীর দরিদ্র সাধারণ গৃহস্থের পারিবারিক জীবনকথাই তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়।

জগদীশগুপ্তের উপন্যাসে যে পল্লীসমাজের পরিচয় পাওয়া তা কুৎসিত ও কদর্যতায় ভরপুর এক নারকীয় সমাজ। জগদীশগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গী অ্যান্টিরোমান্টিক। পল্লীজীবন বা পল্লীর মানুষ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে ওই জীবন স্নিগ্ধ, জটিলতাহীন, কলুষমুক্ত ও সরলসহজ, আর পল্লীর মানুষেরা অতিথিপরায়ণ, সরল ও আন্তরিক। কিন্তু জগদীশগুপ্ত তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেন বিপরীতচিত্র। তিনি প্রতিটি উপন্যাসে দেখান যে পল্লীসমাজ ও মানুষ সম্পর্কে ওইসব ধারণা গল্পকথা মাত্র। তিনি পল্লীর নারকীয় রূপের চিত্র আঁকেন। তিনি দেখান পল্লীর মানুষ উদার, আন্তরিক, সরলসহজ,নিরীহ ও সৎ নয়। পল্লীসমাজ ও মানুষের জীবন নানারকম সংকীর্ণতা ও ইতরতায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে পল্লীসমাজের শ্বাসরুদ্ধকর সংকীর্ণতার পরিচয় তুলে ধরেন এবং বিচিত্র ধরনের ইতর চরিত্রের ক্রিয়া বর্ণনা করেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা মধ্যবয়সী বৃদ্ধ তরুণ যা-ই হোক না কেনো, প্রত্যেকেই ধুরন্ধর, অসৎ , নিষ্ঠুর,দুশ্চরিত্র ও মেরুদন্ডহীন। বিভূতি-ভূষণের কাছে পল্লী হচ্ছে স্বর্গ আর জগদীশ গুপ্তের কাছে নরক। একই বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপে প্রতিভাত হয়েছে দুজনের কাছে। তবে বিভূতিভূষণ যেমন পল্লীকে নিরপেক্ষ রূপে দেখেন নি, জগদীশগুপ্তও পল্লীকে নিরপেক্ষ-রূপে দেখেন নি, জগদীশ গুপ্তও পল্লীকে নিরপেক্ষরূপে উপস্থিত করেন নি। তিনি পল্লীর কালিমাময় বাস্তবতাকে উদঘাটন করেছেন। তার পল্লী শোভাময় নয়, প্রকৃতির রূপকথা রচনাও তাঁর লক্ষ্য নয়। ওই পল্লীর মানুষের সংকীর্ণতা নির্দেশ তাঁর লক্ষ্য। ওই পল্লীর মানুষেরা মানবিক নয়। জগদীশগুপ্তের পল্লীসমাজ নীরন্ধ্র ইতরতায় ভরা। ওই পল্লী-সমাজকে জমাট অন্ধকারে পরিপূর্ণ বলে মনে হয়। ওই জীবনে মহত্ত্ব নেই, প্রেম নেই,মনুষ্যত্ব নেই,সুকুমার মানবিক বৃত্তির উপস্থিতি নেই। ওই জীবনে কোমলতা, শুদ্ধ ধারণা,বিশ্বাস,ভালোমানুষ থাকার চেষ্টা মার খায় ইতরতার কাছে,অশুভের কাছে শুভ হার মানে এবং একাধিপত্য বিস্তার করে থাকে অশুভ।

জগদীশ গুপ্তের জগত ও মানুষ সম্পর্কে অনিলবরণ রায় বলেন, জগদীশগুপ্ত তাঁর উপন্যাসে

Dhaka University Institutional Repository

দেখান যে মানুষ 'একটি দুর্নিরীক্ষ্য আর অতিহিংস্র শক্তির হাতে অসহায় ক্রীড়নক মাত্র।'[৯] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এক 'উদাসীন অদৃষ্ট শক্তি' মানুষকে চালিত করে জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে।[১০] মোহিতলাল মজুমদারের মতে জগদীশ গুপ্ত দেখাতে চান 'মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব-নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে।'[১১] সুকুমার সেন বলেন, 'অসহায় মানুষের জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে, ... মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক "আধুনিক" লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণ্য বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই, ... তিনি কিছুকে ও তবে জগদীশগুপ্তের জগত দৈবনিয়ন্ত্রিত নয়, তা সহজাতভাবে দূষিত মানুষের জগত, যারা আকস্মিক ঘটনা ও পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাহাকে দায়ী না করিয়া যে হিংস্র অন্ধ শক্তি মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিমিমিনি খেলে তাহার দিকে ইশারা করিয়াছেন।'[১২] জগদীশ গুপ্তের জগত ও মানুষদের চারিত্র্য নির্দেশ প্রসঙ্গে ডঃ অশ্রুকুমার সিকদার বলেন, 'হিংস্র পাশবিক নীচতায় ভরা এই জগতের মানুষগুলির ঈর্ষা ও অর্থগৃধ্নুতা তার সহজাত ধর্ম।'[১৩] তাঁর মতে জগদীশগুপ্ত দেখিয়েছেন মানুষের স্বভাবের দৈন্য কদর্যতা নোংরামি, দেখিয়েছেন জীবনের অনুর্নিহিত শুদ্ধিতবনের শক্তি বারেবারে মানুষের অমানুষিত নীচতা ও ইতরতার কাছে কী ভাবে পরাভব মানে। মানুষ সম্বন্ধে এক গভীর অশ্রদ্ধাই

৯, অনিলবরণ রায়, 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ', "বিচিত্রা", ৩ঃ১,১৩৩৬, ৩৭০

১০। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর", দে'জপাবলিশিং দে'জ সংস্করণ,১৯৮০, পৃষ্ঠা ২৬৭

১১। মোহিতলাল মজুমদার, 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' "সাহিত্যবিতান", ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ৩১১

১২। সুকুমার সেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থখণ্ড), ~~১৩৬৩,১৩৫৮~~, (বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৬৫) পৃষ্ঠা ৩০২-৩০৩

১৩। অশ্রুকুমার সিকদার, 'মনুষ্যধর্মের সুরে নিরুত্তর জগদীশগুপ্ত' "আধুনিকতা ও বাংলা সাহিত্য" অরুণা প্রকাশনী (কলকাতা ১৯৮৮) পৃঃ ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচনার প্রধান লক্ষ্য। মানুষের মহিমা নয়, মানুষের মহিমাহীনতাই তার বিষয়।'[১৪] অরুনকুমারের এই ব্যাখ্যাই যথার্থ। জগদীশগুপ্ত পল্লীকে নরকরূপে দেখেছেন এবং তার চিত্রই অঙ্কন করেছেন।

"লঘুগুরু"র (১৩৩৮) পাত্রপাত্রী বিশ্বম্ভর, উত্তম, বিশ্বম্ভরের আত্মীয় লালমোহন, কন্যা টুকী, টুকীর স্বামী প্রৌঢ় পরিতোষ, রক্ষিতা সুন্দরী, বিশ্বম্ভরের গ্রাম্য বন্ধু ও প্রতিবেশীবৃন্দ। জগদীশগুপ্তের এ-উপন্যাসে পাপাচার ও ইতরতায় পরিপূর্ণ এক ভদ্রপল্লী সমাজের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। বিপত্নীক গৃহস্থ বিশ্বম্ভর অন্য পল্লী থেকে একজন পতিতাকে ঘরে এনে তোলে। সমাজের সকলে এ-ব্যাপারটির নিন্দা করে ঠিকই, তবে নিঃশব্দে অনুমোদনও করে। ওই সমাজের একজন পুরুষ একজন পতিতাকে রক্ষিতারূপে রেখে সমাজে বাস করতে পারে এবং দশজনের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কও তার বজায় থাকে। ওই সমাজ শিথিল, অন্যায় ও অসদাচরণকে প্রশ্রয় দেয়। ইতরতা ওই সমাজের সাধারণ ধর্ম। পাপাচার ওই সমাজে গর্হিত কর্ম বলে নিন্দিত হয় না। পল্লীবাসী নারীরা মুখরা, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্রুর ও কলহ পরায়ণ। বিশ্বম্ভরের মুখরা নারী প্রতিবেশীরা উচ্চকণ্ঠে রক্ষিতা উত্তমের কুৎসা রটনা করে আর সমাজের সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কা করে। এমন কী বিশ্বম্ভরের শিশুকন্যাকে মায়ের চরিত্রহীনতার সংবাদ জানাবার জন্য তারা ব্যগ্র হয়ে ওঠে। জগদীশগুপ্ত ওই ইতরতাকে নির্দেশ করেন এভাবে :

> 'হাসিতে হাসিতে একটি নিদারুণ কথা, সাপের বিষ- দাঁতে যেমন বিষ জমে তেমনি, মোক্ষর মায়ের জিহবাগ্রে আসিয়া জমিল- মোক্ষর মা অনুভব করিতে লাগিল, একটি স্থানে সেই সঞ্চিত বিষ ঢালিয়া বিশেষর ভাণ্ড উজাড় করিতে না পারিলে যেন সে নিজেই বাঁচিবে না।
>
> মোক্ষর মা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। টুকীর হাত ধরিয়া তাহাকে একটু দূরে লইয়া গেল, তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, - তোর মা বেশ্যে ছিল, গয়না দিয়েছে হাজার লোকে - তোর এ বাবা দেয় নি। যা শুধোকে তোর মাকে। - তারপর টুকীর'

১৪, ওই, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

মাথার উপর হাত রাখিয়া সস্নেহকণ্ঠে বলিল- শুদোস, বুঝলি।'[১৫]

আবার ওই নারীরা ধনী রক্ষিতাটির স্বর্ণালঙ্কার ও অর্থকড়ির কথা স্মরণ করে ঈর্ষাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং গোপনে গোপনে অর্থসাহায্যের জন্য ওই রক্ষিতার কাছে হাতও পাতে। পাওনাদার হিশেবে উত্তম উদাসীন ও উদার বলে গৃহস্থ নারীরা তার সুনাম রটাতে ব্যগ্রও হয়ে পড়ে। একই রকম দুশ্চরিত্র ওই সমাজের পুরুষগুলো। রক্ষিতা হিশেবে ঘরে এনে তুললেও বিশ্বম্ভর ওই নারীকে পুরস্ত্রীর মর্যাদা দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। বিশ্বম্ভরের ইয়ার বন্ধুরা ওই নারীটিকে উপভোগের সুযোগ সন্ধান করতে থাকে। নানা ছুতায় এসে বাড়ির ভেতরে ঢোকে।

ওই সমাজ পরশ্রীকাতর ও অসততায় পরিপূর্ণ। অকারণ গোপন শত্রুতা করে ওই সমাজের মানুষ পরম সুখ পায়। অন্যের সুখ ও সাফল্য তাদের ঈর্ষান্বিত করে তোলে। প্রতিবেশীর জীবনকে অশান্তিগ্রস্থ করে তোলার চক্রান্তে লিপ্ত থাকে নানাজন। বিশ্বম্ভরের কন্যা টুকী রূপেগুণে চমৎকার হলেও সৎপাত্রে তাকে সমর্পণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে কারণ প্রতিবেশীরা পাত্রপক্ষকে উড়োচিঠি দিয়ে কন্যার পিতার রক্ষিতা রাখার সংবাদ ফাঁস করে দেয়। ফলে বিয়ে ভেঙে যায়। বিশ্বম্ভর উত্তম ও টুকির পারিবারিক জীবন বাস্তবতা উপস্থাপনার পাশাপাশি জগদীশ গুপ্ত সমগ্র সমাজের ওপরও আলোকপাত করেন। ওই সমাজ পাপাচারের অন্ধকারে পরিপূর্ণ এবং ক্লেদাক্ত। সমাজের সদস্যরা বিবেকবোধ শূন্য। ক্লেদ ও কলুষময় জীবনে তারা এতোই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে,ওই জীবনকেই তারা সত্য বলে মানে। কোনো গ্লানি বা লজ্জা বোধ করে না পাপাচারপূর্ণ ক্লেদাক্ত ওই জীবনের জন্য। দেখা যায় ওই সমাজে যৌবনে স্ত্রী বিয়োগের পর ত্রিশ বছর ধরে পুরুষ রক্ষিতার সঙ্গে ঘর করে। বাস করতে থাকে রক্ষিতার বাসগৃহে। ডোমপাড়ার নারীরা একই সঙ্গে গৃহস্থ বউ ও পতিতা। তারা দিনে-রাতে দুরকম জীবন যাপন করে। ওই পাড়ার বিধবা বউ ঝিয়েরা অবৈধ সন্তান সম্ভাবা হলে, প্রকাশ্যে হাতুড়ে দাই ও কবিরাজের শরনাপন্ন হয় অভিভাবকেরা। তাদের অনৈতিক জীবনের বর্ণনা এমন :

কে যেন সুন্দরীকে তল্লাস করিয়া ডাক দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, - মা রয়েছিস গো ' ডাক শুনিয়া সুন্দরী এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে টুকীও বাহির হইয়া আসিল। আঁচলে টাকা দশটি

১৫, "লঘুগুরু "জগদীশগুপ্ত রচনাবলী(প্রথমখন্ড ১৩৮৫) পৃ: ৩০

Dhaka University Institutional Repository

বাঁধিতে বাঁধিতে সুন্দরী আগন্তুক রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, - কি খবর ? খালাস হয়েছে ?

- না, মা, আর সামলাতে নারছি- বলিয়া বিপন্না রমণী এক ফোঁটা অকপট অশ্রু ত্যাগ করিল ।

-খাইয়ে ছিলি ?

- দু'বার খোঁয়াইছি ।

উহারই দুশ্চিন্তার ছোঁয়াচ সুন্দরীর মুখেও লাগিল, বলিল,

- বেঁধেছে কেউ নিশ্চয়ই ।

- কে বাঁধবেক, মা, সত্তুর অমন কেউ নাই ।

ঔষধ ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে, যাহাকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহারই উপর, সুন্দরী রাগিয়া উঠিল- তোরা ছোটলোক ত ছোটলোকই, ছোটলোকের হদ্দ-ডোম কিনা । নড়ে ?

মাথা নাড়িয়া রমণী বলিল- হ্যাঁ, মা, নড়ে

- সেঁকে ছিলি ?

- না ।[১৬]

সন্ধ্যায় ওই পল্লীর কারো না কারো ঘরে বসে খোল করতাল ও কীর্তনের আসর । পয়সার প্রয়োজনে প্রৌঢ় মাতাল সাধক সেজে ধর্ম সাধনা শুরু করে, আশানুরূপ আয় করতে ব্যর্থ হলে রক্ষিতার পরামর্শে বরপণ পাবার লোভে বিবাহ করে । শ্বশুরের রক্ষিতা আছে জেনে স্বস্তি পায়, শ্বশুরের সামনে নিজের রক্ষিতা রাখার ব্যাপারটিও খোলাখুলি বলতে বাধে না । অর্থাৎ চক্ষুলজ্জা শালীনতাবোধ শূন্য ওই মানুষগুলো'র জীবন চরম ইতরতায় পূর্ণ । পণ হিসেবে পাওয়া টাকা কড়ি গহনা কাপড় সিঁদেল চোর চুরি করে নিলে বাবার কাছ থেকে বউকে টাকা আনার জন্য চাপ দেয়া হতে থাকে । এমন কী রক্ষিতা ও স্বামী মিলে কিশোরী বউটিকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করারও সিদ্ধান্ত নেয় । এ-উপন্যাসে পল্লী কুৎসিত এবং তার মানুষেরা পাশবিক, জগদীশ গুপ্তের বর্ণনায় পল্লী হয়ে উঠেছে এক অনৈতিক নরক ।

১৬, "লঘুগুরু", পৃষ্ঠা ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

জগদীশগুপ্তের "মহিষী" (১৯২৯) উপন্যাসে পল্লীর এক কূটকৌশলী। অর্থগৃধ্নু, মামলাবাজ ও সুদখোর মহাজন ব্রজকিশোরের পারিবারিক বৃত্তান্ত। ব্রজকিশোর প্রবল বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। সে গ্রামের নকড়ি ঘোষের তেজারতি সেরেস্তার হেড মোহররার। 'ভাগ লইয়া, বখরা লইয়া, দস্তুরী লইয়া, ঘুষ লইয়া ব্রজকিশোর আজ টাকার মানুষ।'[১৭] একমাত্র পুত্র অশোক মোক্তারী পড়ে। পিতা পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান করতে থাকে, 'অপুত্রক কিন্তু সকন্যা কোনো ভূসম্পদশালীর' ঘরেই পুত্রের বিয়ে দিতে চায় পিতা। পুত্র পিতার পছন্দমতো কালো মেয়েকে বিয়ে করতে অসম্মত হলে পিতা কৌশলে পুত্রকে রাজি করায়, পিতা তার-করে যাবতীয় সম্পত্তি ও ভদ্রাসন ইত্যাদি। ধর্মাশ্রমে দান করে তীর্থে যাবার প্রস্তুতি নেয়। পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে অশোক বিয়েতে রাজি হয়। বিয়ের পরে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হলেও পিতার কি ভণ্ডামীর কথা শুনে স্ত্রীর ওপর তার মন বিরূপ হয়। নানাভাবে সে স্ত্রীকে অপমান করে। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না মেয়ে জ্যোতি পিত্রালয়ে চলে গেলে অশোকের পৌরুষ আহত হয়। তার মনে হয় ধনী কন্যা বলেই জ্যোতি এমন অবাধ্যতা ও অপমান করার সাহস পেয়েছে। স্ত্রীর নামে জঘন্য অপবাদ রটায় অশোক, পুরো গ্রামের মানুষ এ অপবাদ নিয়ে মেতে ওঠে। জ্যোতির পিতা এ কথা শুনতে পায়। জ্যোতি সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামীগৃহে আসে কিন্তু পুনর্বার স্বামী তাকে অপমান ও প্রত্যাখ্যান করে। জ্যোতির মন স্বামীর ওপর বিরূপ হয়, একসময় স্বামী সদ্ভাব করতে এগিয়ে এলে জ্যোতি তাকে গ্রহণ করতে পারে না। অহং-এ আঘাত লাগে বলে অশোক আবারো ক্ষিপ্ত হয়। পুত্রকে সুখী করার জন্য এবং জ্যোতির পিতার কাছ থেকে ভূসম্পদ পাবার সম্ভাবনা শূন্য দেখে পিতামাতা অশোকের পুনর্বার বিয়ে দেয়। সুন্দরী দরিদ্র কন্যা নন্দরাণীকে পেয়ে অশোক সুখী হয়। জ্যোতি পিতৃগৃহে ফিরে যায়। জ্যোতি ওই সমাজের ব্যতিক্রম একটি নারী। সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সৎ ও ভালোমানুষ। একারণেই তাকে সহ্য করতে হয় ইতর সমাজের দেয়া অপবাদ ও লাঞ্ছনা। অপমানিত হয়ে নিজেকে যে লুকায় পিতৃগৃহকোণে।

এ-উপন্যাসে আছে সমাজ বাস্তবতার নানা অংশের পরিচয়। ওই সমাজ কলুষ ও ইতরতায়

১৭, "মহিষী" পৃঃ ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূর্ণ। একজন ধূর্ত কর্মচারী কিভাবে মনিবের উদাসীনতার সুযোগে ধনশালী হয়ে ওঠে তার বিবরণ পাওয়া যায় এ-উপন্যাসে। সম্পদশালী হওয়াই তার লক্ষ্য, মনিবের বিশ্বাসের মর্যাদা না দিয়ে নানাভাবে সে অর্থ আত্মসাৎ করতে থাকে। যেকোনো ভাবে ধনশালী হওয়াই তার উদ্দেশ্য,তাই বিবাহ যোগ্য পুত্রের পাত্রী খোঁজার সময় সে লক্ষ্য রাখে কন্যার পিতার আর্থিক অবস্থা, তার ভূসম্পত্তির নিষ্কন্টকত্ব, উত্তরাধিকার এর সংখ্যা। কন্যার পিতার আর্থিক সচ্ছলতার কাছে গৌণ হয়ে যায় কন্যার গাত্রবর্ণ। কালো মেয়ে ঘরে তোলায় তার আপত্তি থাকে না। পুত্র আপত্তি জানালে পুত্রকে বশ করার জন্যে পিতা মিথ্যাচার করতে কিংবা কূট কৌশল প্রয়োগে দ্বিধা করে না। পুত্র ও অর্থ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার চাইতে কালো মেয়ে বিয়ে করাকেই অধিক বিচক্ষণতার কাজ বলে মনে করে। কালো মেয়ে বিয়ে করার সকল আপত্তি উঠে যায়।

ওই পল্লীসমাজ পরছিদ্রান্বেষী, যে কোনো মিথ্যা রটনায় সিদ্ধ, মানুষগুলো ইতর ও ক্ষুদ্র। সামান্য মনোমালিন্যের কারণে নবপরিণীতা বধূ বাপের বাড়ি গেলে গ্রামের কেউই বাপের বাড়ি যাবার পেছনে এতো সামান্য কারণ আছে বলে বিশ্বাস করে না। অশোকের বন্ধুস্থানীয়রা তৎপর হয় আসল কারণ অনুসন্ধানে। স্ত্রীর কালো রঙ অশোককে ক্ষিপ্ত করে, সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রবল আত্মমর্যাদাবোধও তার কাছে অসহ্য বোধ হতে থাকে। এমন কী সে নিজেও স্ত্রীর নামে জঘন্য অপবাদ রটাতে কুণ্ঠিত হয় না। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া গেছে- ওটাকে সে পদাঘাতের তুল্য অপমানকর মনে করিয়া স্ত্রীর নামে রটায় জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। সে বলে তার স্ত্রী জ্যোতির 'প্রবৃত্তি বড় জঘন্য, আর ভদ্র বলে কোনো আচরণ তার নেই, হস্তিনী নারীর সব লক্ষণ তাতে বিদ্যমান।'[১৮] আর তার বন্ধুগণের মানসিকতা এমন : 'কুৎসার ঘ্রাণ পাইয়া মানবাত্মা উৎসুক্যে খাড়া হইয়া উঠিল' এবং অশোকের 'স্ত্রীর সম্বন্ধে ইতর একটা কল্পনা যেন উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া তার প্রাণের আবরণটাকেই ঝমঝম করিয়া নাচাইতে লাগিল।'[১৯] "মহিষী" উপন্যাসে ইতর পল্লী-সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে।

১৮, "মহিষী" পৃঃ ২৮০।

১৯, "মহিষী, পৃঃ ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

"দুলালেরদোলা" (১৩৩৮) উপন্যাসে একটি তরুণের দৃষ্টিতে দেখা পল্লীসমাজের কদর্যরূপ অঙ্কিত হয়েছে। এ-উপন্যাসের পাত্রপাত্রী- নীরদবরণ, প্রিসীমা, সতীশ, কণ্যা নির্মলা, মুনিষ পীরু, গ্রামের পড়শী বাবাঠাকুর মণীশ প্রমুখ। পূজা অর্চনা, সুরুচি সংস্কার, দোসরা অতিথি সংকার দান আশ্রিতজনের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সুন্দর প্রথা আচার পূর্ণ যে পল্লী সমাজ জীবনের ধারণা আমাদের মনে আছে, জগদীশ গুপ্ত এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেন তার রূপ। তিনি দেখান ওই আচার প্রথাপূর্ণ শান্ত শ্যামল প্রকৃতি বেষ্টিত সমাজ-মানুষ ধীর, সুশীল, উদার নীতিপরায়ণ, ধার্মিক ও নিরীহ নয়। তারা অজ্ঞ, সংকীর্ণ, ইতর ও দুর্দমণীয় রিপু তাড়িত, ঈর্ষা ও প্রতিশোধস্পৃহা তীব্র তাদের। ব্যভিচার ওই জীবনে সাধারণ ব্যাপারে, অন্যের যে-কোনো ব্যাপারে নাক গলানো ও নির্লজ্জ অশোভন কৌতূহল তাদের মজ্জাগত। তাদের জীবন নীরন্ধ্র ইতরতায় পরিপূর্ণ। ওই পল্লী সমাজের মানুষদের নির্লজ্জ ইতরতা সংকীর্ণতা ও আত্মসম্মান বোধহীন জীবন-বাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে এ উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ নির্ভর উপন্যাসে দেখা যায় এমন ইতর, ক্রুর, অতিসন্ধিপরায়ণ ও নির্লজ্জ দু একজন মানুষ পল্লীজীবনে আছে। বাকি সবাই অতিথিপরায়ণ, শান্ত, ছা পোষা গৃহস্থ ও ভালোমানুষ। নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম পালাপার্বন ও সামাজিকতার মধ্য দিয়ে তারা জীবন কাটায়। জগদীশগুপ্তের উপন্যাসে দেখা যায় পল্লীবাসীরা নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম পালাপার্বন সামাজিকতা ঠিকই পালন করে, তবে মানবিক সৎগুণগুলোর উপস্থিতি তাদের কারো মধ্যে নেই। তারা অত্যন্ত ইতর ধরণের মানুষ প্রত্যেককেই তাড়িত করে স্বার্থবোধ। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে অকুণ্ঠিত একেকজন, অশোভন তাদের কৌতূহল, অশালীন তাদের আচার আচরণ। ওই সমাজের মানুষের হীনতা দৈন্য নোংরামি নীচতা ও ইতরতার পরিচয় এ-উপন্যাসের নানা ঘটনা ধারণ করে আছে।

"দুলালের দোলা"-র নায়ক নীরদবরণ স্বগ্রামে বেড়াতে আসে। নিজের গ্রামের নাম কেনো 'পোড়া বৌ' তা জানতে চেয়ে সে শোনে এক 'বীভৎস ইতরতার গল্প'। নীরদের পিতামহের সময়ে গ্রামের এক ব্রাহ্মণের ধনীপুত্র ভারত বিদেশ থেকে নিজের গ্রামে বেড়াতে এসে কাজের মেয়ে স্বর্ণর প্রতি আসক্ত হয়, তাকে সন্তান সম্ভবা করে, স্বামীর ইতরামোর প্রমাণ পেয়ে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী গিরিবালা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। তাই লক্ষ্মীদিয়া গ্রামের নাম হয়ে যায় পোড়া বৌ। এ-ঘটনার মধ্যদিয়ে নীরদ ওই গ্রামের অতীতকলুষের সঙ্গে পরিচিত হয়, গ্রামের বিভিন্ন সদস্যের সঙ্গে পরিচিত হবার মধ্যদিয়ে তার পরিচয় ঘটে ওই সমাজের বর্তমান কলুষের সঙ্গে। সে দেখে বর্তমান পল্লীসমাজ আরো কলুষযুক্ত। তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে পোড়া বৌ-এর স্বামীর রক্ষিতাবংশের উত্তরপুরুষ সতীশের সঙ্গে, নীরদের পিতামহের ধর্মভাইয়ের

Dhaka University Institutional Repository

পৌত্র মনীশ ও তার ইয়ারদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, পরিচয় ঘটে গ্রামের উগ্র ব্রাহ্মণ দ্বারিকঠাকুরের সঙ্গে। পল্লীর ওই মানুষদের প্রত্যেকের জীবন অপরিমেয় কলুষ ও ইতরতাপূর্ণ। সতীশ বিকারগ্রস্ত মেরুদন্ডহীন ও আত্মমর্যাদাবোধশূন্য। নিজের পিতামহীকে অসতী জেনে এবং পূর্বপুরুষের কলুষময় জন্মবৃত্তান্ত জেনে সতীশ হয়ে ওঠে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। নিজের স্ত্রীকে সে সন্দেহ করে এই অজুহাতে যে 'পিতামহী যার অসতী, তার স্ত্রী সতী হবে কেমন করে।' নারীমাত্রকেই সে দুশ্চরিত্র বলে গণ্য করে,নিজের কিশোরী কন্যাকেও সে ভ্রষ্টা বলে মনে করে। দিনে দুপুরে মধ্যরাতে সে প্রতিবেশীদের বাড়ির আনাচেকানাচে কানপেতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কেউ তার নামে কলঙ্ক রটাচ্ছে কিনা শোনার জন্য। এই আড়িপাতার কারণ হিসেবে সে বলে, 'আমি যে জারজের বংশধর তাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু সেই মেয়েটার কথা মনে পড়লেই মনে হয়, শুনে আসি কেউ কুৎসো করছে কিনা।'[২০]

ওই সমাজের মানুষ সৌজন্যবোধশূন্য, অজ্ঞ ও অশালীন। পিতামহের ধর্মভাইয়ের পৌত্রের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে সমাজের মানুষের এই নোংরামি ও অশালীনতা নীরদের চোখে পড়ে। অচেনা ধর্মভাই মনীশরায় দেখা হওয়া মাত্র কপট আন্তরিকতায় গলা জড়িয়ে ধরে অল্পসময়ের মধ্যে তুই তোকারি করে অতি নিকটজন হয়ে ওঠার কপট আন্তরিকতা প্রদর্শন করে। আবার অতিথিকে উপেক্ষা করে ইয়ারদের সঙ্গে স্থূল অশ্লীল অরুচিকর গানবাজনায় মেতে ওঠে। নীরদ অব্রাহ্মণ বলে সে নিমন্ত্রিত অতিথি হওয়া সত্ত্বেও আহারকালে বাগদীর সঙ্গে বসতে দেয়। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একসারীতে ও একস্থানে বসতে দেয় না। পরিবেশনের সময় অতিথিকে উপেক্ষা করে নিজেদের পাতেই ভালো খাবার তুলে নেয়, কারণ তারা ব্রাহ্মণ। ওই সমাজের শাস্ত্র বা ব্রাহ্মণ আচার অনুসারে,'ব্রাহ্মণ ভোজন থাকিতে অব্রাহ্মণের পাতের সম্মুখে খাদ্যের পাত্র অবনত করিতে নাই- করিলে নাসিকায় ঘ্রাণ প্রবেশ করিয়া এবং চোখের দৃষ্টি পড়িয়া খাদ্যবস্তু উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়।'[২১]

২০, "দুলালের দোলা" পৃঃ ২২৯।

২১, "দুলালের দোলা" পৃঃ ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ওই ব্রাহ্মণেরা এতোই সংকীর্ণতাগ্রস্ত ও সৌজন্যবোধহীন যে আহারের শেষে অতিথিকেই বাসনপত্র সেজে দিয়ে যেতে বলে। তবে ওই আদেশ দেবার সময় তারা কপট বিণয় দেখাতে ভোলে না। কপট বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'না বলে আর পারলাম না, ভাই। আমাদের ঝিটা বাইরের ঝি, সে সন্ধ্যে বেলাই চাল আঁচলে বেঁধে নিয়ে পালায়। মা বুড়ো মানুষ আর তার শ্লেষার ধাত। রাত্তিরে চান করলে তিনি রাত্তিরেই মরে যাবেন আর এই দেশটায় এমন ছিঁচকে চোরের উপদ্রব যে বললে তুমি বিশ্বেস যাবে না .... বাসন ক'খানা বাইরে পড়ে থাকলে চোর নিয়ে যাবে। তুমি ত আবার পর নও, মায়ের পেটের ভাইয়ের মত একেবারে। যদি--'[২২] কপটতা ও ভণ্ডামি ওই সমাজের মানুষদের সজ্জাগত। তারা প্রায় সকলেই ফন্দিবাজ খল ও আত্মমর্যাদাবোধ শূণ্য। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত সতীশ নিমন্ত্রণ থেকে ফিরেই কণ্যাকে প্রহার শুরু করে। নিমন্ত্রণকর্তা মনীশ মেয়েটিকে রক্ষা করতে এলে ক্রুদ্ধ সতীশ পাগলামির ভান করে মনীশকেও ঠেঙিয়ে দেয়, কারণ মনে মনে সে সন্দেহ করে- যে মনীশ তার কণ্যাকে নষ্ট করেছে নীরদ দেখে এমন অপমানিত হয়েও মনীশ সতীশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করছেনা বরং পরদিন ভোরে মনীশ ও তার মা এসে সতীশের সঙ্গে ভাব করে নেয় কারণ মনীশের পাত্রী দেখতে যাবার সময় সতীশ না গেলে ঠকার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তাই সতীশ খেপে মারামারি বাধালে 'মনীশ আর মনীশের মায়ের বিপদ হল ভারি। আর কারু উপর তাদের বিশ্বেস নেই। সতীশ কথাবার্তার ভুল শুধরে দেবে, ওদিকে অলপবিসুর খানসামার কাজও করিয়ে নেবে- বন্ধুভাবেই ....। কিন্তুক এমন ধারা কাজের লোক সে ছাড়া গাঁয়ে আর নাই। মনীশের মা দেখলো, সতীশ না হলে বুঝি বিয়েই ফস্কে, তখন মায়েপোয়ে পরামর্শ করে মা গিয়ে সতীশের হাত ধরে বাপুবাছা বলে রাজি করেছে।'[২৩] তারই পরিণামে আগের রাতে প্রহৃত হওয়া সত্বেও মনীশ সতীশের হাত ধরে সকালে কণ্যা দেখতে চলে। অর্থাৎ যেকোনো উপায়ে স্বার্থসিদ্ধিই ওই মানুষদের কাছে বড়ো কথা আত্মসম্মানবোধ ঘৃণা প্রভৃতি আবেগ তাদের কখনোই আলোড়িত করে না অর্থাৎ তারা যাপন করে একধরণের পাশব জীবন।

নীরদ দেখে গ্রামের উচ্চবর্ণের অন্যান্য ব্রাহ্মণের জীবনও একই রকম ইতরতা পূর্ণ ও বিনষ্টিগ্রস্ত।

২২, ওই, পৃঃ ২৩৭।

২৩, ওই, পৃঃ ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত দ্বারিকঠাকুরের শীতের বেলায় পূজাআহ্নিক সারতেই'বেলা তিন পহর হয়ে'যায় এবং 'খেয়েদেয়ে উঠতেই সন্ধ্যে'। আচার পালনে নিষ্ঠাবান হলেও ধর্ম ওই ব্রাহ্মণের বাইরের ব্যাপার মাত্র,ভেতরে সে অসৎ ও ভণ্ড; গ্রামের চোরের দলের ভান্ডারী সে। ঘুষ দিয়ে থানার মুখ বন্ধেরও শক্তি রাখে সে, দুলো সিঁদেল চোর তার হাতে। গ্রামের সকলেই জানে তার সঙ্গে বুজতে যাওয়া সহজ নয়। অত্যন্ত সতর্ক আচরণ করে শ্রদ্ধা দেখাবার ভণ্ডামী করে তাকে গ্রামবাসীরা তুষ্ট করে। অর্থাৎ সাধুসজ্জনরূপে খ্যাত পল্লীসমাজের ব্রাহ্মণের সাধুবেশ তার ছদ্মবেশমাত্র। এইসব কপটদের ভণ্ডামী ও ইতরতা পল্লীসমাজকে গভীরভাবে কলুষিত করে তুলেছে। ওই কলুষ ওই সমাজে বহুদিন ধরে জমাট বেঁধে আছে এবং তা থেকে সমাজের মুক্তির কোনো উপায় নেই। এ-উপন্যাসে বাস্তবতা অবিকল উপস্থাপিত হয় নি। এ-উপন্যাসের নানা ঘটনার বাস্তবতা প্রসঙ্গে পশুপতি ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, 'কিন্তু জিজ্ঞাসা করি- এসব ঘটনা কি সত্য বা সম্ভাব্য বলে মেনে নিতে হবে ?'[২৪] এ-প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদার বলেন, 'মনে হয় বাস্তবতার সমস্যাটা জগদীশচন্দ্রের কাছে তত জরুরি ছিল না, তার কাছে অনেক বেশি জরুরি ছিল মানুষের সহজাত ইতরতার রূপায়ণ।'[২৫]

"রোমন্থন" (১৩৩৮)উপন্যাসটিতে পাওয়া যায় দুটি পটভূমি। প্রথম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায় কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের জীবনের খণ্ডিত পরিচয়। অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলোতে রয়েছে কলিকাতা থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরবর্তী মানিনগর গ্রামের জীবনের পরিচয়। উচ্চবিত্তের জীবনের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হলেও ওই জীবনের চিত্রন উপন্যাসিকের লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য পল্লীজীবনের রূপ অঙ্কন। কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের তিনভাই বিলেতপ্রবাসী ধনবান অবিবাহিত জ্যেষ্ঠভ্রাতের আদেশে তাদের বহুকাল পরিত্যক্ত গ্রামের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য বসবাস করতে যায়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনভাইয়ের গ্রামে যাওয়ার প্রস্তুতির কৌতুককর বিবরণ দেয়া হয়েছে। উপন্যাসে অখণ্ড কোনো কাহিনী নেই। লেখক ঘটনাপরম্পরায় পল্লীজীবনের বাস্তবতাকে বিধৃত করেছেন।

২৪, উদ্ধৃত, অশ্রুকুমার সিকদার, 'মনুষ্যধর্মের সুরে নিরুত্তর জগদীশগুপ্ত, "আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস", পৃঃ ৭৩।

২৫, অশ্রুকুমার সিকদার, ওই, পৃঃ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ওই তিন ভাইয়ের চোখে গ্রামজীবন যেভাবে ধরা পড়েছে লেখক তারই উপস্থাপনা করেছেন। ~~নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে তারই উপস্থাপনা করেছেন~~। নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে গ্রামীন সমাজকলুষময় ও ইতরতাপূর্ণ। নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই লেখক গ্রামীণ জীবনের পরিচয় পরিস্ফুট করেছেন। অভয়, কালোশশী, প্রাণনাথ, মাধবী, ভুলুদাস, জয়নাব, মদন পল্লীর এই চরিত্রগুলোর দৈনন্দিন জীবনের দৈন্য, শোষণ, বঞ্চনা, কলহবিবাদ, স্বার্থপরতা, এ-সবতার খণ্ড খণ্ড ছবি আঁকা হয়েছে। ওই সমাজ ক্ষুদ্রতা ও ইতরতায়ভরা। অকারণ কলহ, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকে মানুষেরা, এ ব্যাপারগুলো তাদের বেঁচে থাকার আনন্দের ভিন্নরূপ। পল্লীসমাজের খণ্ডচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি লেখক একটি সংসারের চিত্রও তুলে ধরেন। অভয় ও মাধবীর ওই সংসারে অভাব প্রকট , মহাজনের কাছে আকণ্ঠ ঋণী অভয়। স্বামীর ব্যর্থতা ও দারিদ্র্যে মাধবীকে কলহপরায়ণ ও নিষ্ঠুর করে তোলে।

যে পল্লীসমাজের পরিচয় তুলে ধরেছেন জগদীশগুপ্ত সেখানে অর্থনৈতিক চাপে জীবন নিষ্পেষিত। সহিষ্ণুতা, মমতা, সততা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর উপস্থিতি এই জীবনে নেই। পল্লীর অধিবাসীরা সর্বদাই কাংস্য এবং মৃৎপাত্রের মতো' পরস্পরের সঙ্গে 'অবিরাম ঠোকাঠুকিতে মত্ত এবং পরিণামে 'একজনের গাত্রে অনিবার্য্য ছিদ্র হওয়া' স্বাভাবিক নৈমিত্তিক ব্যাপার।[২৬] তাদের জীবনে যে ধরণের সমস্যাই দেখা দিক না কেন, তার প্রত্যেকটিই অর্থনৈতিক সমস্যা। লেখক এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ- রকম :

> 'যাহার সুপারি চুরি গিয়াছে, ঐ সুপারি ক'টিই ছিল তার অন্তত এক সপ্তাহের নুন তেলের সংস্থানের উপায়, সুপারি পয়সায় পাঁচটি। গগণ প্রামানিক বনাম বদনচন্দ্র মামলাতেও তাহ-ঐ পেটের দায়, মদন নির্দ্দোষ গরুকে লইয়া খোঁয়াড়ে দিয়া কিঞ্চিৎ নুন তেলের পয়সা করিয়াছে - এবং মদনের পাঁচ আনা অপব্যয়িত না হইলে ঐ পাঁচ আনায় কত কি যে হইতে পারিত তাহার তাহার ইয়ত্তাই নাই। ফর্দ্দ করিয়া লটকানা দোকানে দিলে ঐ পাঁচ আনায় পঁচিশটি ছোটবড় মোড়ক পাওয়া যাইত। স্ত্রীর সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে

২৬, "রোমন্থন" পৃ, ১০৩।

শ্যালকেরা পথে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে সে ভাবিতেছে, স্ত্রীর ঐ পাঁচ আনা ছয় গন্ডা দুই-কড়া দুই ক্রান্তি অংশ তাহার আয়ত্তে থাকিলে তার অভাব কমিবে, শ্যালকেরা ভাবিতেছে, ভগ্নি-নীর ঐ অংশটুকু যে-সে করিয়া লিখিয়া লইতে পারিলেই কিছু আয় বাড়িবে। আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু এককণা তাহাদের কাহারো ভান্ডারে নাই, মনের ভুলেও নাই, যাহার যত-টুকু থাক ততটুকুই অমূল্য ও অত্যাজ্য, মনের তরতিব ভাসিঁয়া তাহাতেই তার পাগল পাগল ঠেকে। তাহাদের অবিরাম মনে হয়, যেন কাহারো অনুপস্থিতির সুযোগে আসিয়া বসিয়াছে, সে আসিলেই উঠিয়া যাইতে হইবে, তাই তাহাদের ধৈর্য্য এত কম।[২৭]

কলকাতার উচ্চবিত্ত তিনবাবুর সামনে পল্লীসমাজের যে পরিচয় ফুটে ওঠে তা কুৎসিত, ইতরতাপূর্ণ। শঠতা ও হিংসা, বিবাদ বিসম্বাদ পাপাচার ওই জীবনের বৈশিষ্ট্য। মুসলমান চাষী জয়নাবের স্ত্রীকে তার ভাইয়েরা আটকে রাখে কারণ ওই মহিলা উত্তরাধিকার সূত্রে পৈত্রিক জমিজমার ভাগ পেয়েছে, ভাইয়েরা ওই সম্পত্তি বোনের কাছ থেকে নিজেদের নামে লিখিয়ে নিতে চায়। তাই বোনকে তারা স্বামীগৃহে যেতে না দিয়ে আ-টকে রাখে। তিনবাবুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ব্রাহ্মণ প্রাণনাথ ঠাকুরের। বাবু তিনজনকে আশীর্বাদ করতে আসা তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ব্রাহ্মণ হিসেবে প্রণামী আদায় করা। এবং ওই ব্রাহ্মণ সুকৌশলে গায়ের চাদর সরিয়ে নিজের ব্রাহ্মণত্ব জাহিরের জন্য উপবীতটি প্রদর্শন করে। ব্রাহ্মণ হলেও প্রাণনাথ ঠাকুর কুচক্রী ও শঠ। টাকা খেয়ে সে সুবিধা মত শাস্ত্রীয় বিধিবিধান ওই সমাজে প্রচলন করে। সে ইচ্ছে করলেই কাউকে একঘরে করার বিধান দিতে পারে আবার ইচ্ছে করলেই অপবাদ দূর করার জন্য নতুন বিধান দেয় অর্থাৎ অর্থকড়িই ওই সমাজে মহাশক্তিমান। যে ব্রাহ্মণ কে অর্থকড়ি দেবার সামর্থ্য রাখে সমাজ ও শাস্ত্র তার পক্ষেই কথা বলে। ওই সমাজের পুরুষ রক্ষিতা পোষে, স্ত্রী স্বাস্থ্যবতী না হবার কারণে স্ত্রীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। স্ত্রী ও তার বিপন্ন বিধবা মাতা আদালতে নালিশ করলে হাকিম স্ত্রীকে খোরপোষ বাবদ আটটাকা দেবার হুকুম দেন। এত টাকা গচ্চা দেবার ভয়ে স্বামীটি তখন স্ত্রীকে ঘরে তোলে কিন্তু বাড়ির রাখাল বাগদী

২৭, ওই, পৃঃ ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ছোড়াকে স্ত্রীর পেছনে লেলিয়ে দেয় । বিপন্না স্ত্রীটি তখন মায়ের কাছে পালিয়ে আসলে বাধ্য হয় । শোভনতাও সুরুচিশীলতার পরিমণ্ডলে বর্ধিত বাবুদের কাছে ওই মানুষের সংকীর্ণতা, সামান্য পয়সার জন্য কলহ, খুন করার ইচ্ছা, দারিদ্র্য, শঠতা ও ইতরতা অসহ্যবোধ হয় । তারা দীর্ঘদিন গ্রামে বাস করার পরিকল্পনা নিয়ে গেলেও তিন দিনের মাথায় গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন । তাঁদের দৃষ্টিতে গ্রামের যে রূপ ধরা পড়ে তা নারকীয় ও বীভৎস। তাদের চোখে দারিদ্র্য ও ক্লেদজর্জরিত পল্লীবাসীরা প্রতীয়মান হয় নরকের কীটরূপে। ওই সমাজকে মনে হয় নরক। ওই নরকের বীভৎস নারকীয়জীবন সহ্য করতে না পেরে তারা শহরে প্রায় পালিয়ে আসে। "রোমন্থন" উপন্যাসেও জগদীশগুপ্ত প্রবলভাবে পল্লীসমাজের ইতরতার চিত্র রচনা করেছেন। মনে হয় তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে পল্লীসমাজকে ইতরতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছেন । এই পল্লীসমাজ ও জীবন ঠিক বাস্তব পল্লী ও জীবন নয় বলেই মনে হয় । বরং মনে হয় যেন এই পল্লী জগদীশগুপ্তের সৃষ্ট পল্লী, যেখানে অনৈতিকতাই হানাহানিই জীবন প্রবাহের সূত্র ।

"তাতলসৈকতে" (১৩৩৮) উপন্যাসে আছে একটি দরিদ্র্য পরিবারের দুর্দশা দুঃখ সংগ্রামের এবং সমাজের ইতরতা ও অমানবিকতার পরিচয় । ওই সমাজ এতোই হিংস্র ও অমানবিক যে তা কেড়ে নেয় মানুষের মানসিক সুস্থিরতা, জীবন যাপনের স্বাভাবিকতা ও বেঁচে থাকার প্রেরণা । ওই সমাজ সংবেদনশীল মানুষকে আত্মহননে পর্যন্ত বাধ্য করে । এ-উপন্যাসের পাত্রপাত্রী বিদুর, তার স্ত্রী শরৎ, সুত্র শান্ত, স্থানীয় ব্যবসায়ী মনোহর দত্ত, তার রক্ষিতা সুখী, রণজিৎ প্রমুখ । লেখক সর্বত্র দৃষ্টিকোণ থেকে ক্লেদ কদর্যতা ও নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ সমাজের উপস্থাপনা করেছেন । ওই সমাজ পাপ ও অনৈতিকতায় পূর্ণ । ওই পাপ ও অনৈতিকতা গোপন রাখার প্রয়োজনবোধ করে না অর্থশালী মহাজন । ওই সমাজের ব্যবসায়ী মহাজন স্ত্রীর বাইরেও রক্ষিতা পোষে । যে কোনো নারীকে শয্যাসঙ্গিনী হবার প্রস্তাব দেয় । হিংস্র ও পাশবিক নীচতায় ভরা ওই সমাজ আর সামাজিক মানুষগুলো নারীপুরুষ নির্বিশেষে মনুষ্যত্বহীন, ইতর ও নিষ্ঠুর। ব্যবসায় মার খাওয়া পিতার নিঃসম্বল পুত্র বিদুর পিতা ব্যবসায়ী বন্ধুদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং প্রত্যেকেই তাকে নানা ছুতায় প্রত্যাখ্যান করে । বিদুর অবশেষে সামান্য কর্মচারীর কাজই গ্রহণ করে। অনন্যোপায় বিদুর স্বাধীন ব্যবসা করতে না পেরে 'অবশেষে কারবার সূত্রে একদিন তাহারা যাদের সমকক্ষ ছিল বিদুর তাহাদেরই একজনের অনুগ্রহ মানিয়া লইল-মনোহরদত্ত তাহাকে কর্মচারী করিয়া রাখিলেন ।[২৮]

২৮. "তাতলসৈকতে", পৃ ঃ ২২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

মনোহরদত্ত এতোই ইতর যে নিজের এই দয়ার কথা উচ্চকণ্ঠে অন্যদের জানাতে জানাতে বিদুরকে দিয়ে তুতোর কাজগুলোও করিয়ে নেয়। বিদুরের আকস্মিক মৃত্যুতে স্ত্রী শরৎকে আরো বেশি অভাবের মুখোমুখি হতে হয়। আদালতের নীলামে একটি ঢেঁকি কিনে শরৎ, ধান ঢেঁকিতে ছেটে চাল করে এবং লাভে বিক্রি করে। দুখানি ঘরের একখানি ভাড়া দেয় হোটেলের ঝি চিন্তকে। হোটেলের তরিতরকারি ঘরে বসে কুটে দিয়েও কিছু পারিশ্রমিক পায় শরৎ। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র শানুকে আঁকড়ে ধরে জীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে। শরৎ পুত্রের জন্য এক অন্ধকার রাতে পথে অপেক্ষা করার সময় পথিক মনোহরদত্ত মাতাল অবস্থায় তাকে শয্যাসঙ্গী হবার প্রস্তাব দেয়। অপমানি শরৎ মনোহর দত্তকে লোহার ডান্ডা দিয়ে আঘাত করে। আহত মনোহরের চেঁচামেচি-তে লোক জড়ো হয়, তবে আঘাত গুরুতর না হওয়ায় হৈচৈ থেমে যায় কিন্তু লোকজন শরতের চরিত্র নিয়ে কানাঘুষা শুরু করে। এই ঘটনাটি শরৎ-এর জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দেয়। ভ্রষ্টা অপবাদরটে তার নামে, গ্রামত্যাগ করে গিয়েও এই অপবাদ থেকে সে রেহাই পায় না। লোকনিন্দায় অতিষ্ঠ হয়ে সে আত্মহত্যা করে।

ভণ্ডামি, ইতরতা-লোভ-হিংসা -ক্লেদ সর্বব্যাপী ওই সমাজে। মনোহর দত্ত ও সমাজের গণ্যমান্য একজন ব্যবসায়ী, বাহ্যিকভাবে সে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, 'তাঁহার শানবাঁধানো পুকুর ঘাটে খুঁদিয়া লেখা রহিয়াছে - 'এমন দিন নেহি রহেগা', বাড়ীর সদর দরজার গণেশ মূর্তির নীচে খোঁদা আছে, 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অসৎ ও দুশ্চরিত্র। বারোয়ারি পূজার তহবিল থেকে সে অর্থ আত্মসাৎ করে। অন্য কর্মকর্তার কাছে পূজা তহবিলের হিসেব দিতে গিয়ে 'জেরায় পড়িয়া 'পেটে পরানে' এক হইয়া' যায়' কারণ 'কাজের খরচ অপেক্ষা সেবারকার পূজায় তিনি বাজে খরচই দেখাইয়াছিলেন বেশী ······ সেই হইতে তহবিল তাঁর হস্তচ্যুত হইয়াছে।"[২৯] মদ্য ও পতিতা দুইয়েই তার আসক্তি প্রবল। স্ত্রীকে না জানিয়ে রক্ষিতা পোষে, রক্ষিতার অগোচরে অন্যনারী ভোগ করে। পথে একাকী কোনো নারীকে পেলে সে প্রস্তাব দেয়, 'ছুটো দেখছি ······ দরদস্তুর করতে হবে, না একদরে বিক্রয়?'[৩০] ওই 'ছুটো মাগী' গৃহস্থ বউ হতে পারে

২৯, ওই, পৃঃ ২৮৪।

৩০, ওই, পৃঃ ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

কিনা এমন অন্য মনে জাগে না। ওই সমাজের মানুষেরা বিবেকবোধহীন ও নির্লজ্জ। কপটতা ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ তাদের জীবন। তারা যে গ্লানিকর জীবনযাপন করে তা নিয়ে তাদের কোনো লজ্জা বা গ্লানি নেই, মিথ্যাচার ও পাপাচারের পরিপূর্ণ জীবনকেই তারা স্বাভাবিক জীবন বলে মনে করে। তাদের ভালোমন্দবোধও অস্বাভাবিক ও বিকৃত। গৃহস্থ বধূর হাতে মনোহর দত্তের প্রহৃত হবার সংবাদ সমাজের সবাই জেনে ফেললেও মনোহর দত্ত লজ্জিত হয় না। যেন এটি একটি সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার, যারজন্য লোকনিন্দা সহ্য করতে হবে না অর্থাৎ সে জানে সে পুরুষ বলে এবং ধনশালী বলে লোকনিন্দার যন্ত্রনা তাকে সহ্য করতে হবে না। কিন্তু সে ভয় পায় তার স্ত্রীকে। এ-ঘটনা যাতে স্ত্রীর কানে না পৌঁছে তার জন্য সে যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেয়। ভৃত্য প্রহারের সংবাদ স্ত্রীকে জানায়নি জেনে মুনিব তার বেতন বাড়িয়ে দেয়। স্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে ভেবে সে রাত্রিযাপনের জন্যও বাড়িতেও ফেরে না। অপরাধ বোধের কারণে যে সে এমন টি করে তা নয়। খান্ডারণী স্ত্রীকে সে ভয় পায় বলে তার মুখোমুখি হতে চায় না। অর্থাৎ ওই সমাজের নারীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যে প্রীতি ভালোবাসা বিশ্বাস নেই, আছে উগ্র অবিশ্বাস সন্দেহ ও ঘৃণা। একারণেই মনোহর দত্তের রক্ষিতা 'বাবু দড়ি ছিঁড়েছে, এমন উড়ো খবর পাওয়া মাত্র ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শরৎকে শায়েস্তা করতে ছুটে যায়। নিজেকে উচ্চকণ্ঠে 'মনোহরের মেয়ে মানুষ' বলে জাহির কুণ্ঠা লজ্জা কিছুই হয় না তার। কুৎসা রটাতে অত্যন্ত সিদ্ধ ওই সমাজের নারীরা। মনোহর দত্তকে শরতের প্রহার করার ঘটনাটিকে 'পুষ্পপল্লব'ময় কুৎসিত ব্যভিচারের কাহিনীতে পরিণত করে তারা। যেমন, '······· মনোহর দত্ত মদ খাইয়া উঁহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, ········· কিন্তু আমাকে নয়, তোমাকে নয়, বিদুকে নয়, সিদুকে নয়, উঁহাকেই কেন সে ··········। ········· কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহাই বা কে জানে। মানুষের অন্তরের গুপ্ত কথার সন্ধান কে রাখে বলো। ·········· এতবড় ঘটনার সমুদায়টা কি মাত্র ঐটুকু। ······· ইহা যে বিশ্বাস করিতে পারে, তাহার নিজের মন নিষ্কলুষ, তাহাই কি সে বুকে হাত দিয়া মানুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে বলিতে পারে। ········· ঢের দেখা গেছে, কিন্তু কোথাকার জল কোথায় যাইয়া দাঁড়ায়, জল দাঁড়াই-বার আগে তাহা বিধাতাও জানেন না। ········ অমন সব মানুষ মানুষের চোখে ধুলা আর বিধাতার উপর টেক্কা দিতে এমন দক্ষ যে ডাল নড়ে ত পাতা নড়ে না ········ এমনি ওরা ধূর্ত। কিন্তু একদিন তার শেষ হইবেই ······· মানুষের চোখে ধরা দিতে হইবেই।'[৩১]

৩১, ওই, পৃঃ ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্লানিজর্জরিত বিমর্ষ শরৎ লোকনিন্দা সইতে না পেরে একদিন রাতের অন্ধকারে পুত্রকে নিয়ে গৃহত্যাগ করে। পথে তার সঙ্গে দেখা হয় গুরুগৃহ পলাতক সদ্যতরুণ রণজিৎ-এর সঙ্গে। রণজিৎ তাকে মাতৃবৎ সম্মান করে এবং স্বগ্রামের পৈত্রিক ভিটায় নিয়ে যায়। ওই সমাজও শরৎ-এর সমাজের মতোই ইতরতা পূর্ণ, মনুষ্যত্বহীন ও নোংরা। শরতের সমাজ মনে করে নতুন খদ্দের ধরার জন্যই শরৎ গৃহত্যাগিনী হয়েছে। মনোহরের সঙ্গে দরেদামে বনেনি বলেই মনোহর দত্তের সঙ্গে শরতের অবৈধ সম্পর্ক ভেঙে যায় বলে মনে করে ওই সমাজ। আর রণজিতের গ্রামের মনুষ্যত্বহীন ইতর মানুষেরা সন্দেহ বিষে জর্জরিত করে রণজিৎ ও শরৎকে। রণজিৎ ও শরতের সম্পর্ক নিয়ে অপকৌতূহল তাদের মধ্যে উগ্র হয়ে ওঠে। রণজিৎ ও শরতের মাতাপুত্রের সম্পর্ক তারা স্বীকার করে না বরং গ্রামের লোকের মনে হতে থাকে, 'কেবল চুপ করিয়া থাকিয়া, কি একটা অতিশয় চমৎকার আর গুরুতর কথা চাপিয়া রাখিয়া গ্রামস্থ স্ত্রীপুরুষকে ও ঠকাইয়া যাইতেছে ······ অনুমান করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না ········ ব্যাপার আঠারো আনা ঘোরালো করিয়া তোলা যাইতেছে না ····· প্রাণ পাগল পাগল ঠেকিতেছে ········· যেন সেই কথাটা শুনিয়া আহ্লাদে না ওঠা পর্যন্ত দেহের শান্তি নাই, মনের বিশ্রাম নাই।'[৩২] যখনতখন রণজিতের কুশল সংবাদ নেয়ার জন্য গ্রামের পুরুষেরা তার বাড়ির দরোজায় উঁকি দিতে থাকে, নারী বাহিনী আসলখবর বের করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। রণজিৎ সদগোপ-কন্যা শরতের হাতে খাচ্ছে জেনে গ্রামের পঞ্চায়েত রণজিৎকে একঘরে করে দেয়। অর্থাৎ কিছুতেই ওই সমাজ বিশ্বাস করতে পারে না যে শরৎ ও রণজিতের মধ্যেকার সুন্দর পবিত্র ও মধুর মাতা ও পুত্রের সম্পর্কটি। ইতরতা ও অবৈধ সম্পর্কই জগতে একমাত্র সত্য বলে গণ্য করে জগদীশগুপ্তের পল্লীসমাজ। মিথ্যা অপবাদ ও লোকনিন্দা সহ্য করতে না পেরে শরৎ আত্মহত্যা করে। অশ্রুকুমার সিকদারের মতে 'জয় হলো সর্বব্যাপী ইতরতার।'[৩৩] এ-উপন্যাসেও সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে দারিদ্র, লাম্পট্য, নির্লজ্জতা, অপবাদ রটনচ্ছার আগ্রহ ইত্যাদি। ইতরতার অতিশায়িতরূপ পাওয়া যায় তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ-উপন্যাসেও।

৩২, ওই, পৃঃ ৩১১।

৩৩, অশ্রুকুমার সিকদার, পৃঃ ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

জগদীশ গুপ্ত পল্লীকে কোনো রকম মোহগ্রস্ত দৃষ্টিতে দেখেননি । তাঁর লক্ষ্য ছিলো পল্লীর ও পল্লীর মানুষের কদর্যতা ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা । তিনি পল্লীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির জীবনকথা উপস্থাপিত করেন। ওই জীবনের কদর্যতা ও ইতরতা নির্দেশই তাঁরলক্ষ্য তাঁর মধ্যে কোনো সহানুভূতি নেই, মমতা নেই, বরং একধরনের প্রতিক্রিয়া রয়েছে । পল্লীর যে নারকীয় চিত্র তিনি রচনা করেছেন তাকে নিরপেক্ষ চিত্রন বলে মনে করতে দ্বিধা জাগে,কারণ তিনি পল্লী ও তার অধিবাসীদের মধ্যে ভালো কিছু দেখেননি । তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রথাগত পল্লীবিমুগ্ধতার প্রতিক্রিয়া রূপে গণ্য করা যায় । তিনি যেন পণ করেছিলেন যে তিনি দেখিয়ে দেবেন পল্লী কতো অসুন্দর, তার মানুষেরা কতোটা অমানুষ । তাই তাঁর পল্লীচিত্রও বাস্তবতার বিশ্বস্ত উপস্থাপন নয় ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার রাঢ় ভূখণ্ডের পল্লীর জীবনের অবিকল উপস্থাপক, তাঁকে ওই অঞ্চলের জীবনের বিশ্বস্ত দলিল রচয়িতাও বলা যায় । তারাশঙ্করের পল্লী-প্রকৃতি-মানুষ চিরকালের পল্লী-প্রকৃতি ও মানুষ নয় । তা বিশেষকালে ও স্থানে স্থাপিত । আধুনিক বাঙলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন রীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ; তিনি পল্লী সম্পর্কে কোনো পূর্বধারণা নিয়ে পল্লীজীবন উপস্থাপন করেন নি । তাঁর পল্লী ওই সময়ের রাজনীতিক-সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আলোড়িত । তারাশঙ্করের উপন্যাসে পল্লীর সবশ্রেণীর মানুষের স্থান পায় । তারাশঙ্করের জমিদার মানেই হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু, আর্থনীতিক ভাবে দুর্গত, প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ; তাদের মধ্যে একদল প্রাচীন, তারা দুশ্চরিত্র নারীলিপ্সু ও অত্যাচারী, এবং আরেকদল নবীন, তারা আদর্শবাদী, সমাজ-সংস্কারক, উদার মানবতাবাদী । শেষ পর্যন্ত তারা কোনো না কোনো রাজনীতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত হয় । তারাশঙ্করের সাধারণ গৃহস্থেরা মোটামুটি সচ্ছল । যদিও নানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় তাদের জীবন নানা সময়ে জর্জরিত হয় । তারাশঙ্করের পল্লীভিত্তিক উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা ব্যাপকভাবে উপস্থিত থাকে । তাদের মধ্যে রয়েছে বাগদী, ডোম, বাউরী, সাঁওতাল, সদগোপ চাষী প্রভৃতি । তাদের জীবনের রূপ এতো ব্যাপক ও বিশ্বস্তভাবে আর কারো উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় নি । বাঙলাদেশে পল্লী মানেই হচ্ছে দারিদ্র্য এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস ওই দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের উপস্থাপন । ওই পল্লীজীবনে জমিদার ও মহাজনের শোষণ আছে, দুর্ভিক্ষ খরা অতিবৃষ্টি ঝড় অগ্নিকাণ্ড, কলেরা-বসন্ত, তীব্র জলাভাব ও অনশনের দুর্দশা আছে এবং ঋতুতে ঋতুতে নানা সামাজিক উৎসবও আছে । বিভূতিভূষণের উপন্যাস পাঠের পর পল্লীজীবন সম্পর্কে মোহ জাগে । বিভূতিভূষণের পল্লীজীবন আমাদের আবেগগ্রস্ত করে তোলে । তারাশঙ্করের পল্লী-প্রকৃতির রূঢ়তা ও পল্লীজীবনের অবিরাম সংগ্রামশীলতা ওই জীবন যাপনের জন্য মোহগ্রস্ত করে না,কিন্তু মানুষের বেঁচে

Dhaka University Institutional Repository

থাকার অবিরাম সংগ্রাম জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তারাশঙ্করের পল্লীজীবন স্থির অপরিবর্তনীয় নয়, বরং তা সময়ের চাপে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনকে শুভ বলেই তিনি গণ্য করেছেন।

তারাশঙ্করের "নীলকণ্ঠ" (১৩৪০) একটি সাধারণ পল্লীপরিবারের ধ্বংসের কাহিনী। কাহিনীতে রয়েছে দারিদ্র্য, অনৈতিকতা, ব্যভিচার, দুর্যোগ ও বাৎসল্য। তবে "নীলকণ্ঠ" উপন্যাসে পারিবারিক জীবন বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজবাস্তবতার পরিচয়ও লিপিবদ্ধ। শ্রীমন্ত ও গিরির দাম্পত্য-জীবনে অন্ন ও অর্থকষ্ট তেমন না থাকলেও সঙ্কট আসে গিরির আপাতবন্ধ্যাত্বের জন্যে। তাদের অপার স্নেহে লালিত গৌরীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠার আশঙ্কায়, তারা দুজনে গৌরীকে পত্নীকামাসক্ত পিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সকল ভূসম্পত্তি বন্ধক দিয়ে, নিজেদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলে। অন্ধ অথর্বের সঙ্গে গৌরীকে নির্দ্বিধায় তুলে দিতে দেখে হরলালের মাথা ফাটিয়ে শ্রীমন্ত মামলায় জড়িয়ে পড়ে। কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে কারাবাস বরণ করতে হয়। ধনী ভূস্বামীর লালসার শিকার হয়ে গিরি শুরু করে অবৈধ সম্পর্কের জীবন। সন্তান সম্ভবা হয়ে সে পথে নামে, তাকে দেহ ব্যবসা করেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়। যৌনব্যাধি আক্রান্ত হয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে গিরির। শ্রীমন্ত ছাড়া পেয়ে গ্রহণ করে বৈষ্ণব ভিখারীর জীবন। গিরির অবৈধ পুত্র নীলকণ্ঠের পরিচয় না জানলেও তাকে আশ্রয় দেয় শ্রীমন্ত। একটি পরিবারের চরম বিনাশের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে, যে-বিনাশের মূলে রয়েছে বাৎসল্য। লালিত কন্যার জীবনকে সুখময় করে তোলার ব্যাকুলতার কারণেই শ্রীমন্ত-গিরির শান্ত সচ্ছল জীবন দারিদ্র্য লাঞ্ছনাও গ্লানিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে, দুটি মানুষের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে, ধ্বংস করে। বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে কাহিনীর পরিবেশের বিস্তৃত বর্ণনা দেন, এবং বাস্তবতাকে করে তোলেন মধুর ও প্রশান্ত। তারাশঙ্কর পরিবেশের বর্ণনা করেন সংক্ষেপে, বিস্তৃত বিবরণ রচনা করে বলেন না, কিন্তু কাহিনীকে এমনভাবে বর্ণনা করেন যাতে তাঁর পটভূমি-বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ঘটনার পর ঘটনা পরম্পরায় দেখান ওই সমাজ কিংবা বাস্তব পটভূমির কঠোরতা। বাস্তবতার উপস্থাপনকারী হিসেবে তারাশঙ্কর নিরাসক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। বাস্তবজীবনের প্রেক্ষাপটে মনের আকুলতা কিংবা কোনো আদর্শের কিংবা মানবজীবনের নানা আবেগের উত্থানপতন-বিকাশ দেখানো তারাশঙ্করের একটি প্রধান প্রবণতা। এ-উপন্যাসেও তাই ঘটেছে। সন্তানকামনায় অধীর স্বামী স্ত্রীর মনস্তাপ- আশা-স্নেহ- কাতরতাপূর্ণ জীবন চিত্রিত করার সঙ্গে বাস্তবজীবন সমস্যার ব্যাপক পরিচয় উপস্থাপন করেছেন তারাশঙ্কর।

যে সমাজে শ্রীমন্ত ও গিরি বাস করে তা ক্রুর, অভিসন্ধিপরায়ণ, অসৎ, প্রতারক, লোভী ও

Dhaka University Institutional Repository

দুশ্চরিত্র। মহাজনের কাছে জমি বিক্রী করতে গেলে ন্যায্যদামে অল্পতূখণ্ড কেনার চেয়ে মহাজন সমস্ত ভূসম্পদ বন্ধক রাখায়ই আগ্রহবোধ করে। কারণ তাতে' সুদের অস্ত্র বয়ন করিয়া একদিন ' সমগ্র জমিটুকু টানিয়া লইতে পারিবে।'[৩৪] পিতা এ-উপন্যাসে পশুমাত্র। এ-সমাজ নৈতিকতার বিধিবিধান মেনে চলে তা একধরণের তন্ড্রামী। একটি পারিবারিক জীবনের বিপর্যয় বর্ণনা করতে গিয়ে তারাশঙ্কর উপস্থাপন করেছেন একটি নষ্ট সমাজকে, যে-সমাজ পীড়ন করে ব্যক্তিকে, নষ্ট করে দরিদ্র জীবনের সহজসুখ, বিপন্ন করে অসহায় নারীর গার্হস্থ্য জীবন, ওই সমাজ ধনীর সকল অন্যায় না দেখার ভান করে চলে। একটি ভোজ পেয়েই নিশ্চুপ হয়ে যায় সমাজের মুখ। অসহায় বিপন্নকে সাহায্য শুশ্রূষা করার মানবিক বৃত্তি সেখানে নেই। নারী হচ্ছে খাদ্যমাত্র- এই বোধ থেকে গিরিকে ব্যবহার করেছে সমাজের সকল স্তরের মানুষ। রূঢ় পাশবিকতাপূর্ণ, ভণ্ড, বর্বর, অমানবিক পল্লী সমাজ বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। ["প্রেম ও প্রয়োজন"-এর (১৩৪২) কাহিনী গড়ে উঠেছে বীরভূমের জমিদার শাসিত একটি গ্রামের প্রেক্ষাপটে। যদিও কাহিনীর কাল নির্দেশিত হয় নি, তবুও নায়ক সঞ্জীবের পল্লীসংস্কার, নারীপুরুষের সমানাধিকার বিষয়ক তর্ক, খদ্দর প্রীতি ইত্যাদি থেকে অনুমান করা যায় বিংশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের সময় প্রেক্ষাপটটি এ-উপন্যাসে নেয়া হয়েছে। সঞ্জীব চরিত্রের মধ্যে তারাশঙ্করের জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এ-উপন্যাসে পাওয়া যায় দুশ্চরিত্র জমিদার জীবনের ছবি। স্বেচ্ছাচারী জমিদারের প্রতিহিংসা পরায়ণতা ও বর্বরতায় পল্লীবাসীর জীবন কীভাবে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তার চিত্র পাওয়া যায় "প্রেম ও প্রয়োজনে"। পত্নীবিয়োগের পর জমিদারের শিশুপুত্রের পরিচর্যাকারী হিশেবে আনা হয় একের পর এক নারী, যাদের ওই জমিদার রক্ষিতা হিশেবে ব্যবহার করে। পতিতাকন্যা খ্রিস্টান ডাক্তার নির্মলা জমিদারের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসকের দায়িত্ব নিয়ে এসে জমিদারের রক্ষিতা হয়ে পড়ে। নির্মলায় অরুচি ধরে গেলে, নিম্নবর্ণের দরিদ্র কন্যা বিধবা রমাকে পুত্রের জন্য কিনে নেয় জমিদার। রমার পিতা রমনদাস সচ্ছলতা ও অর্থকড়ির লোভে কন্যাকে জমিদারের রক্ষিতা হবার জন্য বিক্রী করতে গ্লানি বোধ করে না। এ-উপন্যাসে জমিদারের লোভ, দম্ভ, বর্বরতা, বহুনারীসম্ভোগ পঙ্কিল জমিদার জীবনের উপস্থাপনার পাশে লেখক একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠারও প্রয়াস পেয়েছেন। আদর্শবান সর্বসংস্কারমুক্ত পল্লীসেবক সঞ্জীব, সে খদ্দের পরে, জমিদারের

৩৪, "নীলকণ্ঠ" (তারাশঙ্কর রচনাবলী (তৃতীয়খণ্ড), পৃঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, অন্ত্যজ গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্য নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, সমবায় দোকান প্রতিষ্ঠা করে নিম্নশ্রেণীকে উন্নত সুন্দর জীবনের আস্বাদ দিতে চায়। মানুষকে সে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, জমিদারের রক্ষিতা জেনেও চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত নির্মলার সম্মান রক্ষা করতে সে এগিয়ে আসে। কর্মের জগতে নারী ও পুরুষের ভেদ সে মানেনা। রক্ষিতা জেনেও নির্মলার প্রতি শ্রদ্ধা হারায় না সে। গ্লানি জর্জরিত নির্মলাকে তাই সে বলে, 'কিসের লজ্জা আপনার ? কার চেয়ে ছোট আপনি ? দয়া মায়া মহত্ত্ব সত্যনিষ্ঠায় আপনি তো কারও চেয়ে ছোট নন।'[৩৫] নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী সে' কমরেড' বলে সম্বোধনে আগ্রহী, নারীকে সে শুধু সম্ভোগের বস্তু কিংবা দুর্বল অবলারূপে দেখে না; দেখে কর্মসহচরীরূপে। যেমন, সে বলে- ' আমরা কমরেড মিস গাঙ্গুলী। আপনি আমার চেয়ে হীন নন, আমার চেয়ে অস্পৃশ্য নন, -পৃথিবীর সমতল বুকের উপর আমরা মানুষ।'[৩৬] এ-উপন্যাসে শেষে জয় হয় গান্ধীবাদের; মনে হয় গান্ধী-বাদকে আকর্ষনীয় করার জন্যেই চিত্রিত হয়েছে পল্লীজীবনের নারকীয় বাস্তবতার চিত্র।

প্রমথনাথ বিশী "ধাত্রীদেবতা" (১৩৪৬) সম্পর্কে বলে যে এটি একটি আদর্শবাদী উপন্যাস।[৩৭] গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতিষ্ঠা কয়েকটি উপন্যাসে তারাশঙ্করের লক্ষ্য। বিশীর অভিমত এমন: ' ধাত্রী-দেবতা একটি আদর্শানুসারী উপন্যাস। গণদেবতাও তাই। কিন্তু এগুলি তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত বলে মনে হয় না। আদর্শবাদ ও রিয়ালিজম দুই শ্রেণীর রচনাই তারাশঙ্করের আছে, আদর্শবাদী উপ-ন্যাসগুলি হয়তো অধিকতর জনপ্রিয় তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় সেই সব উপন্যাসে যথা কবি এবং হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, যেখানে রিয়ালিজম প্রাধান্য পেয়েছে।'[৩৮] উদ্দেশ্যপ্রধান উপন্যাসে কাহিনী ও সমস্ত কিছু বিবৃত হয় ওই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে। "ধাত্রীদেবতা"য়ও তাই হয়েছে। "ধাত্রীদেবতা" আদর্শবাদী যুবকরূপে

---

৩৫. 'প্রেম ও প্রয়োজন' (তারাশঙ্কর রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড), পৃঃ ৩৫৭।

৩৬. ঐ, পৃঃ৩৬৮।

৩৭. প্রমথনাথ বিশী, 'ভূমিকা,' (তারাশঙ্কর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)।

৩৮. ঐ, পৃঃ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

শিবনাথের বিকশিত হয়ে ওঠার আখ্যান। তবে যে বাস্তবতার মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠছে সে তার বিবরণ রয়েছে এতে। সমাজজীবনের ভগ্নদশা, জাতির অধঃপতন তাকে দুঃখিত করে, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সে রাজনীতি প্রকাশ হয়ে ওঠে। শিবনাথ ক্ষয়িষ্ণু জমিদারপুত্র, তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সামন্তধর্মী। তার পিসীমা সামন্ত শ্রেণীর প্রতিভূ, আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উদার মানবতাবাদী হচ্ছে শিবনাথের মা জ্যোতির্ময়ী। লোকহিত ব্রতে, দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে চায় সে পুত্রকে, জমিদারী দর্প, ভোগবিলাস উচ্ছৃঙ্খল অশিক্ষাপূর্ণ জীবনধারা থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিবেকবান মহৎ মানুষে পরিণত হোক সন্তান তাইই জননীর কাম্য। এ নিয়ে ননদ ও ভ্রাতৃবধুর মধ্যে বিরোধ বাধে। পুত্রের শিক্ষার কথা ভেবে ননদ ভ্রাতৃবধুর ইচ্ছেই মেনে নেয়, তবে অল্পবয়সে শিবনাথের বিয়ে দিয়ে ঘরে একটি ছোট বউ নিয়ে সংসার করার শৈলজাদেবীর সাধ পূর্ণ করায় বাধা দেয় না জ্যোতির্ময়ী। তবে এ বিবাহ সুখকর হয় নি। শিবনাথের গ্রামে মহামারীরূপে কলেরা দেখা দেয়, দেখা দেয় খাদ্য অনটন। শিবনাথ কলকাতা থেকে আসা মেডিক্যাল ভলেনটিয়ারদের সঙ্গে রোগীদের শুশ্রূষা করে চলে, চাল ভিক্ষা করার জন্য দল গঠন করে দ্বারে দ্বারে চাল ভিক্ষা করতে থাকে অনাহারী দরিদ্রদের জন্য। কলেরা আক্রান্ত একটি বিধবা ডোমবধুকে সেবা করে সে বাঁচায়, তবে এতে তার নামে গ্রামবাসীরা কুৎসিত অপবাদ রটায়। কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে শিবনাথ জড়িয়ে পড়ে তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে। হত্যা ও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই ব্রিটিশদের হটানো সম্ভব এতত্ত্বে আস্থাশীল হয়ে পড়ে সে। সে লক্ষ্য করে এনার্কিস্ট ও টেরোরিস্টদের উগ্র চরমপন্থী কার্যকলাপ, তারমন এতে সায় দিতে পারে না। গ্রামে ফিরে আসে শিবনাথ। জননীর মৃত্যুশোক সামলাতে না সামলাতে আসে আরেক বিচ্ছেদ বেদনা। মায়ের মৃত্যুর পর গৌরী নিজে থেকে সংসারে এসে পৌঁছুলে তাকে গৃহে অধিষ্ঠিত করে শৈলজাদেবী কাশীবাসিনী হন। কারণ পিসীমাকে গৌরী সহ্য করতে পারে না। শিবনাথের দারিদ্র, ভূনির্ভরশীলতা ইত্যাদি গৌরীকে ক্ষিপ্ত করে। সে স্বামীকে চাকুরী নেয়ার জন্য চাপ দেয়, ব্যবসা করে টাকা উপার্জন করতে বলে।

খাজনা বকেয়া থাকার দরুণ শিবনাথে জমিদারী নিলামে যাবার উপক্রম হলে প্রজারা এসে কেঁদে পড়ে। কারণ তারা জমিদারী চায় কিন্তু নতুন জমিদার চায় না। নায়েব রাখাল সিং পাইক কেষ্ট সিং খাজনা আদায়ের জন্য মহালে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু খরার দরুণ ফসল উৎপাদনে অসমর্থ প্রজারা কিছুতেই সামান্য পয়সাও দিতে পারে না। শিবনাথ নিজে খাজনা আদায়ে বেরিয়েও ব্যর্থ হয়। অবশেষে তার শিক্ষক রামরতনবাবু নিজের সম্পত্তি বন্ধক রেখে মহাজনদের কাছ থেকে খাজনার টাকা এনে দেয়। এরমধ্যে আড়াই বৎসর কেটে যায়। আসে ১৯২১ সাল। শিবু ময়ূরাক্ষীর চরে একটি খামারবাড়ি তৈরি করে, জমিদারী দেখাশোনার ভার

Dhaka University Institutional Repository

নায়েবের ওপর ছেড়ে দিয়ে সে ওই অঞ্চলের শূদ্রদের মধ্যে মুক্তির বাণী প্রচার করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। তাদের নাইট স্কুলে শিক্ষাদান, চিকিৎসাবিধি ও স্বাস্থ্য বিধির সঙ্গে পরিচিত করানো, চরকা ও তাঁত প্রবর্তন করে নিজেদের বস্ত্র নিজেরা তৈরি করে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার ব্যবস্থা নেয়। এক সন্ধ্যায় তার কাছে আসে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানো টেররিস্ট সুশীল। সে জানায় তাদের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, এখন সে দেশের বাইরে চলে যেতে চায়, বাইরে থেকে দেশকে সেবা করার জন্য। সুশীল চলে গেলে শিবনাথ গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক রূপে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। নিজগ্রামে ফিরে এসে জনগণের কাছে স্বরাজের বাণী প্রচার করতে থাকে। সে বুঝতে পারে জনবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে দেশ স্বাধীন হবে না। গ্রামে গান্ধীবাদী আদর্শ প্রচারের সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সংবাদ পেয়ে পিসীমা কাশী থেকে এবং সন্তানসহ গৌরী কলকাতা থেকে আসে। পিসীমার কাছে আত্মসমর্পণ করে গৌরী। দুজনে শিবনাথকে দেখতে যায় কারাগারে। পিসীমা আশীর্বাদ করে এবং গৌরী সমর্থন করে তার এই বিপ্লবী ভূমিকা। পিসীমাকে ধাত্রীদেবতা জেনে প্রণাম করে শিবু এবং নিজের সন্তানের লালনপালনের ভার তার ওপর অর্পণ করে।

"ধাত্রীদেবতা" উপন্যাসে বীরভূমের একটি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারকে কেন্দ্র করে ওই সমাজের সামাজিক অবস্থার এবং কিছু পরিমানে রাজনীতিক অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর পটভূমিকে অবিকল উপস্থাপন করতে চেয়েছেন কিন্তু একটি বিশেষ আদর্শবাদ প্রচার এ-উপন্যাসে তাঁর লক্ষ্য। তিনি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের জীবন পদ্ধতি যেমন বর্ণনা করেছেন, তাদের সামন্তধর্মী আচরণ ও বিশ্বাস উপস্থাপিত করেছেন এবং ওই পরিবারে নতুন রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ দেখিয়েছেন। যেহেতু এ-উপন্যাসের বিষয় পল্লী এবং পল্লীর সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে দারিদ্র্য তাই এ-উপন্যাসে পল্লীর সাধারণ মানুষের দুর্দশার বিবরণ। লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারাশঙ্করের পল্লী ছায়া সুনিবিড় সুখদুঃখে ঘেরা শান্তির নীড় নয় বরং তা মানুষের জীবন যাত্রার সংগ্রামে জীবন্ত, তারাশঙ্কর উপন্যাসে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার যেমন বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি সেখানকার মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতিরও অবিকল বর্ণনা দিয়েছেন, উপন্যাসটিতে দুধরনের রাজনীতির পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। এক ধরনের রাজনীতি সন্ত্রাসবাদী, অন্যধরণের রাজনীতি গান্ধীবাদী, যে আদর্শে তারাশঙ্কর নিজে বিশ্বাস করেন। "ধাত্রী দেবতা"য় শিবনাথ গান্ধীবাদী আদর্শগ্রহণ করে কারাবরণ করে এই ঘটনার মধ্যদিয়ে তারাশঙ্কর ওই অঞ্চলকেই গান্ধীবাদী আদর্শে দীক্ষিত করেছেন। তাই এ-উপন্যাসে পল্লীবাস্তবতার বিশ্বস্ত বর্ণনা হয়েও তা আদর্শের রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

"কালিন্দী" (১৩৪৭) নদীতে বিশাল চর জেগে উঠলে তা দখল করার জন্য নিকটবর্তী গ্রামের বিভিন্ন শরিকের জমিদারেরা তৎপর হয়। এই জমিদারদের মধ্যে সম্প্রীতি কিংবা ঐক্য ছিলো না, তারা পরস্পরকে ঘৃণা করে একে অন্যের অগোচরে কুৎসা রটায়। ওই চরের ওপর অন্যান্য শরিকদের তুলনায় শক্তিশালী জমিদার ইন্দ্র রায়ের সহায়তায় জমিদার রামেশ্বর চক্রবর্তীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। চর জাগবার খবর পেয়ে যাযাবর সাঁওতালেরা ওই চরে এসে বসতি স্থাপন করে, আগাছা জঙ্গল পরিষ্কার করে ফসলের চাষ করে। নিকটবর্তী গ্রামগুলোর সদগোপ প্রজারাও চরে জমি বন্দোবস্ত নেয়; তবে তারা এতোই অসৎ যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের সেলামী না দেয়ার চক্রান্তও করে। জমিদারদের কাছ থেকে কিছু জমির বন্দোবস্ত নেয় নব্যধনিক বিমলবাবু। বিস্তীর্ণ এলাকায় আখচাষ করে সে এবং জমিদারের অনুমতি না নিয়ে চরে চিনির কারখানা স্থাপন করে। জমিদারের সঙ্গে এ নিয়ে সংঘর্ষ বাধে; ওই বণিক কূটকৌশল শঠতা অর্থকড়ির জোরে চরের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়ে নেয়। বন্য সাঁওতালদের অধিকাংশ পরিণত হয় শ্রমিকে, যারা শ্রমিক হতে রাজি হয় না চর থেকে তাদের উৎখাত করা হয়। এভাবে শস্যশালী একটি সবুজ চর পরিণত হয় কুৎসিত বস্তিভরা কারখানা এলাকায়।

"কালিন্দী" হচ্ছে চরদখলের উপন্যাস-পল্লীর বিভিন্ন স্তরের মানুষ চরটি দখল করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে আছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, ভ্রাম্যমান সাঁওতাল, অবস্থাপন্ন সদগোপ চাষী, জমিদারের নায়েব, নব্যধনিক ব্যবসায়ী প্রমুখ। ওই চরের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা করে চলে এরা প্রত্যেকে, কূটকৌশল প্রয়োগ করে, জাল দলিলপত্র তৈরি করে। একটি চরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের পল্লীর মানুষের সম্পত্তি অধিকারের লোভ ও পাশবিকতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে উপন্যাসটিতে। তারাশঙ্কর এ-উপন্যাসেও ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের প্রতি সহানুভূতিশীল, তিনি জমিদারদের ক্ষয়িষ্ণুতার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন সমকালীন শক্তির লড়াই-এ সামন্ত শ্রেণীর পরাজয় অনিবার্য। সেখানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে নব্য ধনিক শ্রেণী। এ-উপন্যাসেও একটি আদর্শবাদী তরুণ রয়েছে এবং যে উঠে এসেছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণী থেকে। "ধাত্রীদেবতা"য় ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণী থেকে উঠে এসেছিলো গান্ধীবাদী নায়ক এবং "কালিন্দী"তে একই শ্রেণী থেকে উঠে এসেছে নায়ক অহীন্দ্র, যে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদকেই দরিদ্র সাধারণের দুঃখ মোচনের একমাত্র উপায় রূপে মনে করে। এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে এক পরিবর্তনমুখী পল্লীসমাজ ও জীবনের রূপ।

Dhaka University Institutional Repository

"গণদেবতা"(১৩৪৯) উপন্যাসটির নাম তারাশঙ্কর রাখতে চেয়েছিলেন "চণ্ডীমণ্ডপ", এবং এটিই এ-উপন্যাসের যথার্থ নাম হতে পারতো। চণ্ডীমণ্ডপকেন্দ্রিক একটি পল্লীর জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের পটভূমিতে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। তেরোশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দের রাঢ় অঞ্চলের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী পল্লীর সামাজিক আর্থনীতিক, ব্যক্তিগত,ধর্মীয় জীবনের রূপ এতে পাওয়া যায়। এ-উপন্যাসে সমাজের তিন শ্রেণীর মানুষের জীবনের রূপ পাওয়া যায়। শিবকালীপুরের এক অংশে বাস করে অন্ত্যজ, বাগদীশ্রেণীটি। ওই অন্ত্যজদের জীবন চরম দুর্দশায় পরিপূর্ণ। তাদের লড়তে হয় দারিদ্র্যের সঙ্গে, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড ঝড়ের সঙ্গে। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে ওই জীবনকে বিধ্বস্ত করে বারে বারে, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা ওই শ্রেণীর মানুষদের বাধ্য করে হীন অনৈতিক জীবনযাপনে। এছাড়া রয়েছে উচ্চবর্ণের সম্পন্ন গৃহস্থদের শোষণ। সব মিলিয়ে তারা যাপন করে পশু মানুষের জীবন। ওই সমাজের মেয়েরাও রসাতলের পশুমানুষের জীবন যাপন করে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তারা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে বাসন মাজে, দুধ ও ঘুঁটে বিক্রি করে এবং দেহ বিক্রী করে। স্বামীর প্রহার তাদের জীবনে স্বাভাবিক ব্যাপার, ননদ শাশুড়ী প্রতিবেশী ও স্বামীর সঙ্গে কলহবিবাদ বিসম্বাদ করা ওই নারীদের প্রাত্যহিক কাজ। তাদের 'জীর্ণ ঘর রিক্ত অঙ্গনে' বারেবারে হানা দেয় ম্যালেরিয়া,ঘরে ঘরে শীর্ণকায় অর্ধউলঙ্গ অর্ধভুক্ত শিশুর দল। প্রতি গ্রীষ্মে তীব্র জলকষ্টের পাশাপাশি তাদের সহ্য করতে হয় মহামারীরূপে দেখা দেয়া কলেরার আক্রমণ। ওই শ্রেণীর পুরুষেরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কেউ কর্মকার,কেউ — কেউ ছুতার এবং অধিকাংশই ভূমিহীন শ্রমিক। এদের কাজ হচ্ছে গ্রামের উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত ও সচ্ছল গৃহস্থদের সেবা করা। গ্রামের উচ্চবর্ণ শ্রেণীটির পূর্বপুরুষেরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে এই অন্ত্যজ শ্রেণীটিকে গ্রামে এনে পত্তনি দেয়। প্রাচীনকাল থেকেই তাদের মজুরি হিশেবে বরাদ্দ করা হয় বিভিন্ন পরিমাণের ধান। কর্মকারের জন্য বরাদ্দ হয় হাল পিছু পাঁচ শালি আর ছুতারের জন্য বরাদ্দ হয় হাল পিছু চারশালি ধান। কিন্তু উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা ওই শ্রমজীবীদের প্রাপ্য কখনোই ঠিকমতো মিটিয়ে দেয় না, কিছুদিন পরে দেয়া হবে কিংবা আসছে বছর দেয়া হবে বলে তারা প্রাপ্য মজুরি বাকি রেখেই কাজ করিয়ে নেয়। ওই শ্রেণীর ভূমিশ্রমিকদের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। উচ্চসম্প্রদায়টি তাদের মজুরি দেবার এমন ব্যবস্থা করে ঃ

এ পাড়ার প্রায় সকলেই চাষীদের অধীনে খাটে- বাঁধা বাৎসরিক, বেতন বা

Dhaka University Institutional Repository

মাসে ভাতের হিসাব মত ধান লইয়া থাকে এবং ছোটগুলা পেটভাতায় বৎসরে চারখান সাত হাত কাপড় লইয়া রাখালি করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা মাসে আট আনা হইতে একটাকা পর্যন্ত মাহিনা পায়-ধানের পরিমাণও তাহাদের বেশী। পূর্ণ জোয়ানদের অধিকাংশই উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ পাইবার চুক্তিতে চাষে শ্রমিকের কাজ করে। মনিব সমস্ত চাষের সময়টা ধান দিয়া ইহাদের সংসারের সংস্থান করিয়া দেয় - ফসল উঠিলে ভাগের সময় সুদ-সমেত ধান কাটিয়া লয়। সুদের হার প্রায় শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত। অজন্মার বৎসরের এই ঋণ শোধ না হইলে আসল এবং সুদ এক করিয়ে তাহার উপর আবার ঐ হারে সুদ টানা হয়। এই প্রথার মধ্যে অন্যায় কিছু ইহারা বোধ করে না - বরং সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের ভাবই অন্তরে ইহার জন্য পোষণ করে। দায় দৈবে মনিবেরা যে সাহায্য করেন- সেইটাই অতিরিক্ত করুণা।[৩৯]

ওই সমাজে নৈতিকতাবোধ শিথিল। উচ্চবর্ণের পুরুষেরা সঙ্গে ওই সমাজের নারীদের অবৈধ সম্পর্ক একটি সাধারণ ব্যাপার। ওই শ্রেণীর জীবনে ক্ষুধা এতো প্রকট, অনটন এতো তীব্র যে নারীদের পতিতাবৃত্তিকে ওই সমাজের পুরুষেরা দুটো পয়সা আয়ের উপায় বলে গণ্য করে। এমন কী জননী নিজে কণ্যাকে পতিতা হতে উৎসাহিত করে। স্বামী স্ত্রীকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে নিঃশব্দে অনুমোদন দেয়। নারীদের অবাধ যৌনসম্পর্ক স্থাপন কিংবা বহুপুরুষে গমনের ব্যাপারে ওই সমাজের পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গী এমন : 'এই স্বভাব দমনের জন্য কোন কঠোর শাস্তি বা পরিবর্তনের জন্য কোন আদর্শের সংস্কার ইহাদের সমাজে নাই। অলপস্বলপ উচ্ছৃঙ্খলতা স্বামীরা পর্যন্ত দেখিয়াও দেখে না। বিশেষ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যদি উচ্চবর্ণের সচ্ছল অবস্থার পুরুষ জড়িত থাকে তাহা হইলে তো তাহারা বোবা হইয়া যায়।'[৪০] প্রয়োজন বা ক্ষুধার কাছে গৌণ হয়ে গেছে অপরাধ বা পাপবোধ। ক্ষুধা ওই জীবনে চরম সত্য এবং যে কোনো উপায়ে ক্ষুধা নিবৃত্তিই ওই জীবনের লক্ষ্য। তাই শাশুড়ী উচ্চবর্ণের বাবুর সঙ্গে যোগসাজশ করে পুত্রবধূকে ধর্ষিতা হতে সাহায্য করে, জননী কণ্যাকে স্বাধীনভাবে দেহ বিক্রীর লাভজনক পেশা গ্রহণে প্ররোচিত করে।

৩৯, "গণদেবতা" (তারাশঙ্কররচনাবলী, ৩য়খণ্ড), পৃঃ ২৪০।

৪০, "গণদেবতা", ওই, পৃঃ ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষম অকর্মণ্য স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ীকে খোসামদ করে কয়েকআনা পয়সা আদায় করে নিতে গ্লানি বোধ করে না, বোনের নৈশঅভিসারের পথের সঙ্গী হয় তাই, খদ্দেরের কাছ থেকে সিগারেট কেনার পয়সাও আদায় করে। এ-উপন্যাসে পাতুবায়েন তার বোন দুর্গা, পাতুর স্ত্রী, অনিরুদ্ধ কর্মকার, তার স্ত্রী পদ্ম ওই অন্ত্যজ শোষিত শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্ব করে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমকালের রাজনীতিক-অর্থনীতিক আলোড়নে আলোড়িত পল্লী সমাজকে পাওয়া যায়। তেরোশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দের শিবকালীপুর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দংশনে অস্থির। বিশৃঙ্খল হয়ে যায় ওই সনাতন বিধিবিধানপূর্ণ সমাজ, দেখা দেয় নানা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। ওই সমাজে নতুন সময়ের জন্য নতুন ধরনের বিধি-বিধান তৈরি হতে থাকে আপন নিয়মে। নিত্যব্যবহার্য সকল দ্রব্য অগ্নিমূল্য হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে জমির দামও বেড়ে যায়। ওই গ্রামের সাধারণ সদগোপ চাষীরা নগদ কিছু অর্থ পাবার লোভে জমি বিক্রি করে তারা ক্রমশ পরিণত হয় ভূমিহীন শ্রমিকে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স বাড়িয়ে দেয়। ফলে সাধারণ কৃষকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সমাজের প্রথা বিধিবিধান অমান্য করার প্রবণতা দেখা দেয় অন্ত্যজ শ্রেণীটির মধ্যে। প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ কঠিন হয়ে ওঠার কারণে কামার, ছুতার, দাই মুচি নাপিত প্রভৃতি চিরকালের প্রথা মেনে বরাদ্দ ধানের ওপর নির্ভর করে সম্পন্ন গৃহস্থদের সেবা করতে চায় না। তারা চায় নগদ পয়সা এবং জংশন শহরে কাজ করে নগদ পয়সা পাওয়া সহজ বলে তারা গ্রাম থেকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে। ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের প্রাত্যহিক জীবন বিপন্ন হয়। তবে গ্রাম থেকে ব্যবসা নিয়ে শহরে গিয়েও সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পায় না অনিরুদ্ধ কর্মকার। কারখানায় তৈরি কোদাল কুড়লে ফাল সস্তায় পাওয়া যায় বলে তার কামারশালায় তৈরি দা ক্ষুর গুপ্তি ফাল কেউ কেনে না, ক্রমশ তাকে পৈত্রিক ব্যবসা ত্যাগ করে শ্রমিকের পেশা গ্রহণ করতে হয়। সমকালীন বিভিন্ন আইনও ওই গ্রামের মানুষের জীবনে নানা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাশ হওয়া জরীপ আইন অনুসারে শিবকালীপুর গ্রামেও সেটেলমেন্টের খানাপুরী আরম্ভ হয়। গ্রামের মানুষেরা হাকিম পেয়াদা ও সেটেলমেন্ট অফিসারদের ভয়ে ও অজানা নানা বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত দিন কাটায়। সেটেলমেন্টের জমি জরিপ শুরু হয় পৌষমাসে যখন মাঠজুড়ে পাকা ধান। জমিদার সাতদিনের মধ্যে মাঠের ধান কেটে ফেলার হুকুম দেয় কিন্তু অর্থবলহীন দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে তা করা সম্ভব হয় না ফলে গৃহস্থের সম্বৎসরের খোরাক মাঠেই নষ্ট হয়। এছাড়া জমিজরীপ করতে আসা সরকারি কর্মচারীরা অশিক্ষিত চাষীদের সঙ্গে নানা দুর্ব্যবহারও করে, প্রতিবাদকারীকে সরকার বিরোধী অ্যানার্কিস্ট বলে চিহ্নিত করে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এ-সব মিলিয়ে ওই সময়ের ওই জনজীবন হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত। দুর্যোগের পর দুর্যোগ এসে তাদের পীড়িত ও বিপন্ন করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

এ উপন্যাসের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্ব করে দেবু পণ্ডিত, দ্বারিক চৌধুরী, পণ্ডিত ন্যায়রত্ন ঠাকুর। এরা যাপন করে একধরণের আদর্শায়িত জীবন। পণ্ডিত ন্যায়রত্ন ঠাকুর আধুনিক কালের বাসিন্দা হলেও তিনি বাস করেন প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক জগতে। জমিদার বংশের নিঃস্ব সন্তান দ্বারিকচৌধুরী অর্থের আভিজাত্য হারালেও, সুরুচি উন্নত সুন্দর নীতিবোধ তার বিনষ্ট হয় না। একারণে সে সবার শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ দেবুপণ্ডিত আধুনিক কালের তরুণ; সে গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী, সৎ, প্রতিবাদী, প্রজা-সাধারণের উপকারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে, গড়ে প্রজাসমিতি, নতুন জমিদার ছিরু বা শ্রীহরি পালের সঙ্গে প্রজাস্বার্থ বিষয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। জমি জরীপের কর্মকর্তাদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে কারাভোগ করে। তারাশঙ্কর দেবুপণ্ডিত-কে গড়তে চেয়েছেন ভারতীয় ঋষিদের মতো নিরাসক্ত ত্যাগী সাধকের মতো করে এবং তার চেষ্টা সার্থক হয়েছে। এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বাস্তব জীবনের চাইতে তাদের মনোজগত আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও প্রজাসাধারণের পক্ষ নিয়ে লড়াইএর বিবরণ রচনায়ই লেখক অধিক মনোযোগী থেকেছেন।

"গণদেবতা"য় একটি নতুন ধনিকশ্রেণীর উত্থান ও সামন্ত ভূস্বামীর পতনের ছবি আঁকা হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ভূস্বামীর প্রতিই তারাশঙ্কর গভীর সহানুভূতিবোধ করেছেন। এ-উপন্যাসে নবধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধি শ্রীহরিপাল বা ছিরুপাল, ব্যবসা সুদের কারবার ইত্যাদি করে শ্রীহরি অর্থশালী হয়ে ওঠে, ক্রমশ সে শিবকালীপুরের জমিদার হয়ে ওঠে। সে অমার্জিত, স্থূল রুক্ষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। অর্থের জোরে সে সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যমণি হয়ে উঠতে চায়, সেও ক্ষয়িষ্ণু জমিদার দ্বারিক চৌধুরীর মতো সকলের শ্রদ্ধা ভালোবাসা লাভ করতে চায়, কিন্তু দ্বারিক চৌধুরীর মার্জিত আচার আচরণ স্বভাবের সৌম্যতা তার আয়ত্তে আসে না। জনগণ তাকে ভয় পায় কিন্তু ভালোবাসে না। এই গ্রামবাসী সাধারণেরা অবজ্ঞা ও অপছন্দ করলেও তাকে উপেক্ষা করার শক্তি ওই সমাজের নেই।

তারাশঙ্কর উদ্ধত অমার্জিত শ্রীহরি পালের যে বর্ণনা দেন তা এমন :

> আসরের প্রায় মাঝখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল ছিরু পাল, সে নিজেই আসিয়া জাঁকিয়া আসন লইয়াছিল। ছিরু বা শ্রীহরি পালই এই দুইখানা গ্রামের নতুন সম্পদশালী ব্যক্তি। .... লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড, প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয় সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই ছিরুর নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না। এজন্য ছিরুর ক্ষোভ আছে, লোকে তাহাকে সম্মান করে না বলিয়া সেও সকলের উপর মনে মনে রুষ্ট। প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা জোর করিয়া আদায় করিতে সে বদ্ধ -

Dhaka University Institutional Repository

পরিকর। তাই সাধারণের সামাজিক মজলিস হইলেই ঠিক মাঝখানে সে জাঁকিয়া বসে।[৪১]

শ্রীহরি ধূর্ত ও কুটকৌশলী। জনগনের শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য সে সমাজসেবার উদ্যোগ নেয়। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটি ইট সিমেন্টে বাঁধিয়ে দেবার উদ্যোগ নেয় সে, ষষ্ঠীতলটি বাধিয়ে দেয়, কুয়ো বসায়; প্রকৃতপক্ষে এর মধ্য দিয়ে সে চন্ডীমণ্ডপের ওপর নিজের আধিপত্য কায়েম করে। চণ্ডীমণ্ডপটি সাধারণ মানুষদের স্বাধীন সাদাসিদে জীবনের প্রতীক। উদীয়মান নব্য ধনিক তার অর্থকড়ি ও শক্তি দিয়ে সেটিকে নিয়ন্ত্রনাধীনে নিয়ে যায়। এরপর থেকে দরিদ্র জনসাধারণের জীবন সামাজিক ক্রিয়াকান্ড সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে চলে শ্রীহরি পাল। "গণদেবতা"য় একটি পল্লীর বিশেষ সময়ের জীবনের সার্বিক রূপ অবিকল রীতিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

" পঞ্চগ্রাম " (১৩৫০) উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী পাঁচটি গ্রামের সমাজজীবন বাস্তবতার রূপায়ণ করা হয়েছে। এতে ব্যক্তিরজীবনালেখ্য রচনা লেখকের লক্ষ্য নয়, তবে সমাজ জীবনের নানা ঘটনা-অভিঘাতে ব্যক্তি-জীবনে যে-বিপর্যয় নেমে আসে, সমাজ-প্রধানদের ক্রুর অভিসন্ধি পরায়ণতা, ষড়যন্ত্র কুটিলতায় ব্যক্তিজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে, তার বিবরণ রয়েছে উপন্যাসে। " পঞ্চগ্রাম"-এ সমগ্র জনজীবনের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনীতিক ও পেশাজীবনের উপস্থাপনাই প্রধান বিষয়। গ্রন্থের ভূমিকায় তারাশঙ্কর বলেছেন, 'পঞ্চগ্রামের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চাষী মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। এ ক্ষেত্রে একটা কথা নিবেদন করি। আমি নিজে যেমন দেখিয়াছি- তেমনি লিখিয়াছি। কতকগুলি হুবহু সত্য ঘটনা কাহিনীর আকারে সাজাইয়া দিয়াছি মাত্র। সমাজের পটভূমিকায় পল্লীর কথা বলিবার আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে সব কথা বলা সম্ভবপর হয় নাই। .... তবে যাহার কথকতা করিয়াছি - তাহার রূপ সম্বন্ধে আমার দাবী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার।'[৪২] তাই উপন্যাসটিকে লেখকের অভিজ্ঞতার অবিকল উপস্থাপন বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সরকারী জরিপ আইন অনুযায়ী সেটেলমেন্ট সার্ভের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী পাঁচটি গ্রাম - মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, বালিয়াড়া-দেখুরিয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কনা এ উপন্যাসে

৪১, গণদেবতা, ঐ পৃঃ ১০৬।

৪২, উদ্ধৃত, 'গ্রন্থপরিচয়' (তারাশঙ্কররচনাবলী চতুর্থখণ্ড), পৃঃ ৪৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

পটভূমি হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-উপন্যাসে রয়েছে খাজনা-বৃদ্ধি নিয়ে জমিদার -প্রজায় বিরোধ, জমিদারদের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল, প্রজাদের খাজনা না দেবার সঙ্কল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট, দুঃসহ অনটন, এবং অভাবের কারণে ধর্মঘট ভেঙেঁ জমিদারের কাছে নতিস্বীকার, মহাজনদের কাছে প্রজাদের ঋণগ্রস্ত হওয়া, জমিদার -মহাজনের কাছে চক্রবৃদ্ধি সুদের জালে জড়িয়ে যাওয়া, জমিদারদের চক্রান্তে হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে ফাটল ধরা এবং দাঙ্গা - অর্থাৎ ওই সময়ের সমস্ত সামাজিক প্রপঞ্চ উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। পঞ্চগ্রামের জনপদবাসীদের মধ্যে আছে মুসলমান চাষী, উগ্র স্বভাবের দুর্দান্ত ভল্লাসম্প্রদায়, চাষাবাদের বাইরে ডাকাতি করা যাদের পেশা, আছে সদগোপ চাষী সম্প্রদায়, অন্ত্যজ ডোম-মুচি-বাউরি গোত্রের মানুষ। চাষাবাদই এদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। এদের ওপরে আছে জমিদারকুল, তেজারতি করে সম্পদশালী হয়ে ওঠা মহাজন,জংশনের কলমালিকেরা।

পঞ্চগ্রামের দরিদ্র কৃষকসম্প্রদায়ের জীবনে আসে বিবিধ দুর্বিপাক। জমিদার ফসলের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাত ধরে খাজনা বৃদ্ধি করে। প্রজাকুল 'বৃদ্ধি দিব না' স্লোগান তুলে ধর্মঘট শুরু করে, কিন্তু ঐক্যে ও ধর্মঘটে অটল থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। উদরান্নের অভাব, অবিশ্বাস, জমিদারদের রটনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে পড়ে জনগণ। তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। তাদের জীবনে আসে বন্যা, ধ্বংস হয় ঘরবাড়ি, শস্য। মড়করূপে দেখা দেয় ম্যালেরিয়া, শিশু ও বয়স্ক মানুষের ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটে। দেখা দেয় গো মড়ক, পঞ্চগ্রামের অর্ধেক পশু মারা যায় তাতে। উদরান্নের অভাব ঘোচাবার জন্য ভল্লরা দূরবর্তী গ্রামে ডাকাতিতে গিয়ে ধরা পড়ে। দারিদ্র্য, জমিদারের মহাজনের শোষণ, রোগ ব্যাধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত ওই জনজীবন। ধর্মঘটের সময় স্থানীয় মহাজন, জমিদাররা প্রজাদের ঋণ দেয়া বন্ধ রাখে প্রজাদের জব্দ করার জন্য। তারা জংশন থেকে টাকা দাদন নেয়, সেখানেও নানা শর্তে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়। অন্নাভাব অর্থকষ্ট সহ্য করতে না পেরে বাউরি মুচি ডোম সম্প্রদায় পৈত্রিক পেশা ত্যাগ করে। চাষাবাদ ত্যাগ করে তারা জংশনের কলে শ্রমিকের কাজ শুরু করে। জমিদার ও উচ্চবর্ণের গৃহস্থেরা এতে তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। জমিদার জমি থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেয়। কিন্তু পরোয়াহীন এই সাধারণ নারী পুরুষ কলে কাজ করে বলে, দুবেলার অন্ন সংগ্রহের নিশ্চয়তা আসে তাদের জীবনে। ভূমিজীবী সম্প্রদায় পরিণত কারখানার শ্রমিকে।

শুধু দরিদ্ররাই দুর্গত নয়, পঞ্চগ্রামের অবক্ষয়গ্রস্ত সামন্ত জমিদার পরিবারও আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে অযোগ্য উত্তরসূরী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। নিত্যপূজা ও নিত্য ভোগের ব্যবস্থা করতে অক্ষম জমিদার

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ির উত্তর পুরুষ দ্বারিক চৌধুরী বহুকালের পারিবারিক দেবতা লক্ষ্মী জনার্দনকে শ্রীহরি পালের কাছে বিক্রী করে দেয়। তিরিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলন এবং পূর্ববর্তী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ওই গ্রামেও পৌঁছে। চরকা প্রতিষ্ঠিত হয়, মদ্যপান নিবারণে সমর্থ হয় স্বেচ্ছাসেবকেরা।

এই জনপদবাসীদের শোচনীয় জীবন তারাশঙ্কর বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু এই বাস্তবতাই শাশ্বত চিরস্থির এমন ধারণা তিনি দেন না। তিনি এমন একটি বাণী প্রকাশ করেন যে দুর্যোগ ওই জনপদের জীবনপ্রবাহকে বিপন্ন করে। খাজনা বৃদ্ধি, সুদ, অনাহার, কলেরা, ম্যালেরিয়া দাঙ্গা, গোমড়ক, অগ্নিকাণ্ড অনাবৃষ্টি খরা প্রভৃতিদ্বারা তাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু ওই মানুষেরা অমিত শক্তির অধিকারী, অদম্য তাদের বাঁচার আগ্রহ। তাই তারা সমস্ত বিপর্যয়ের পর শুরু করে নতুন জীবন। "পঞ্চগ্রাম" উপন্যাসের নায়ক দেবু পণ্ডিতের চোখে পড়ে ওই জনপদবাসীদের অপরাজেয় জীবনস্পৃহা:

> দেবু দেখে আর ভাবে- আশ্চর্য মানুষ। আশ্চর্য সহিষ্ণুতা। আশ্চর্য তাহার বাঁচিবার-ঘরকন্না করিবার সাধ-আকাঙ্ক্ষা। এই মহাবিপর্যয়-বন্যারাক্ষসীর করকরে জিভের লেহন চিহ্ন সর্বাঙ্গে অঙ্কিত, এই অভাব, এই রোগ, ওই মড়কের মধ্যে ঘরের ভাঙন, জমির বালি, ক্ষেত্রের গর্ত- সমস্তই মানুষ এক লহমায়-মুছিয়া ফেলিল।[৪৩]

গণদেবতা এবং পঞ্চগ্রাম সম্পর্কিত উপন্যাস। গণদেবতা হচ্ছে পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের ভূমিকা। গণদেবতার একগ্রামভিত্তিক পটভূমি পঞ্চগ্রাম"-এ পাঁচটি গ্রামে বিস্তৃত হয়েছে। এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত জীবন অনেক বেশি বিস্তৃত, বহু ঘটনাপূর্ণ। তারাশঙ্কর ওই বিস্তৃত জনপদটির একটি সমকালীন জীবনচিত্র রচনা করার চেষ্টা করেছেন এ-উপন্যাসে; যাতে মানুষের সমস্ত সামাজিক-আর্থনীতিক-প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বিস্তৃতভাবে চিত্রিত হয়েছে। ওই সমাজ ও জনপদের জীবনধারা যেমন আছে তেমন ভাবেই চলবে তারাশঙ্কর এমন ধারণা দেন না বরং তিনি তাঁর ধীর বিবর্তন নির্দেশ করেন। বাগদী ভূমিশ্রমিকেরা তাদের সনাতন চাষাবাদের পেশা ত্যাগ করে পরিণত হয় কারখানার শ্রমিকে। তারাশঙ্কর এ ব্যাপারটিকে অশুভ বলে মনে করেননি, বরং তার কাছে এটি একটি শুভ ব্যাপার গণ্য হয়েছে। কারণ ওই অন্ত্যজেরা এই পেশা গ্রহণ করার ফলে নগদ পয়সা হাতে পাচ্ছে, তাদের ওপর

৪৩, "পঞ্চগ্রাম" (তারাশঙ্কররচনাবলী চতুর্থখণ্ড) পৃঃ ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের সমাজের চাপও শোষণ বন্ধ হয়েছে। ওই অন্ত্যজেরা স্বাধীন স্বতস্ফূর্ত জীবন যাপন করতে পারছে। এ-ব্যাপারটিই উপন্যাসের উপসংহারে তারাশঙ্কর নির্দেশ করেছেন। [রাঢ় ভূখণ্ডের প্রেক্ষাপটে "সন্দীপন পাঠশালা" (১৩৫২) উপন্যাসটি রচিত,এ-উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭ সময়ের প্রেক্ষাপটে,"ধাত্রীদেবতা"র মতো এ-উপন্যাসেও লেখকের লক্ষ্য প্রধান চরিত্রটির বিকাশ বর্ণনা। তবে "ধাত্রীদেবতা"র নায়ক সামন্তশ্রেণীর, আর "সন্দীপন পাঠশালা"র নায়ক সদগোপ চাষীপুত্র সীতারাম। তার জীবনের লক্ষ্য একটি আদর্শ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, মেধাবী আদর্শবান ছাত্র তৈরি করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথে বাধা আসে বিস্তর। সামাজিক শক্তিমান অভিজাত বংশীয়রা চাষার পুত্রের বিদ্যানুরাগকে ব্যঙ্গ করে, বিপ্লবীদলের সদস্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকার অভিযোগ করে জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বেনামা দরখাস্ত পাঠায়। ওই পাঠশালাটি সন্ত্রাস শিক্ষা দেবার আখড়া এমন অভিযোগ এনে পুলিশ তল্লাসি চালিয়ে পাঠশালা ভেঙে তছনছ করে। বাড়ির মালিক ভয় পেয়ে ঘর ছেড়ে দেবার জন্য চাপ দেয়। পাঠশালা তুলে দিতে বাধ্য হয় সীতারাম। আবার উদ্যম নিয়ে গাছতলায় পাঠশালা বসায়, এবং অদম্য অধ্যবসায়ে গড়ে তোলে একটি আদর্শ পাঠশালা। জীবনে আসে একতরফা প্রেম, পত্নীবিয়োগ, কন্যার বৈধব্য। দুঃখের তপস্যার মধ্যদিয়ে সে হয়ে ওঠে প্রশান্ত দুঃখজয়ী সন্ত।

তারাশঙ্কর এ-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালের ভূমিকায় বলেছেন, 'বাংলাদেশের শিক্ষক জীবন অবহেলিত, অনাদৃত। পাঠশালার শিক্ষক বা পণ্ডিত মহাশয়দের তো কথাই নাই। এঁদের সুখদুঃখ অবহেলিত, সমাজজীবনে সামান্যতম সম্মান থেকেও এঁরা বঞ্চিত। .... সীতারাম আমার কাছে বাস্তব; তার মনের পরিচয় বহুবার পেয়েছি। তাকে সাহিত্যে রূপদানের বাসনা ছিল।'[৪৪] তাই এ-উপন্যাসটিকে বাস্তবের অবিকল উপস্থাপন বলে গণ্য করতে পারি। প্রধান চরিত্রটির বিকাশ বর্ণনা লেখকের লক্ষ্য হলেও একটি ব্যাপক সমাজবাস্তবতার পরিচয় এ-উপন্যাসে পাওয়া যায়। এ-উপন্যাসের চরিত্রেরা কেউই সমাজ বিচ্ছিন্ন দ্বাপ্রিক নয়, বাস্তবতার বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে তারা বিকাশ লাভ করে। সমাজ তাদের নিয়ন্ত্রন করে, তারাও সমাজকে নিয়ন্ত্রন করে। এ-উপন্যাসে সামন্ত অভিজাত উচ্চবিত্তের সমাজের রূপ তুলে ধরা হয়, তুলে ধরা হয় অন্ত্যজ জীবনের রূপ। ওই উচ্চবিত্ত সমাজ কুশ্রর, ষড়যন্ত্রপ্রিয়, আত্মম্ভরী, অনুদার। সদগোপ এক চাষীপুত্রের বিদ্যামনস্কতাকে তারা

৪৪, উদ্ধৃত, (তারাশঙ্কর রচনাবলী সপ্তমখণ্ড), পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

ঈর্ষা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে। উপহাস করে। শুধু ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে ওই পাঠশালা ও তার পণ্ডিতের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনতে দ্বিধান্বিত নয় তারা। মিথ্যে অভিযোগ এনে পুলিশি তদন্তের মধ্যদিয়ে পাঠশালার ক্ষতিসাধন করে। পাঠশালার সাজানো গোছানো ঘর ও আঙিনাকে মধ্যরাতে এসে নোংরা করে রেখে যায় বাবু পাড়ার লোকজন। মদখেয়ে, তাড়ি ভেঙে ছত্রখান করে এঁটো মাটির হাড়ি ভেঙে ছড়িয়ে, চুনকাম করা মাটির দেয়ালে কাঠকয়লার টুকরা দিয়ে সীতারামের হীন কুলের নিন্দা করে তারা অসৎ আক্রোশ নিবৃত্ত করে। হীনকুলের একজনের বিদ্যানুরাগী তাদের কাছে উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। চিরশোষিত নিম্নবর্ণের একজনের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস তাদের অহংকে আহত করে।

"সন্দীপন পাঠশালা" একটি পাঠশালাকে কেন্দ্র করে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ উপাখ্যান। সীতারাম অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তার শ্রেণীর মানুষেরা আবহমানকালধরে প্রথা এবং উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা শোষিত ও পর্যুদস্ত। সীতারাম বুঝতে পারে শিক্ষাই হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের মূল শক্তি। তাই সে শিক্ষার আলো জ্বালতে চায়, কিন্তু চারপাশের অন্ধকার ওই আলোকে গ্রাস করার জন্য বারবার ব্যগ্র হয়ে ওঠে। উচ্চবর্ণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তার পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে একটি ব্যক্তির জয় যেমন ঘোষিত হয়েছে, তেমনি ওই অন্ত্যজ মানুষদের নতুন জীবনস্পৃহাও রূপ লাভ করেছে। তারাশঙ্কর নতুন সময়ের প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ শ্রেণীর জাগরণের ছবি আঁকেন। তিনি দেখান ওই জাগরণ ও জীবনযাপনের ধরণ বদল শুভ পরিণামই বয়ে আনে। "পঞ্চগ্রাম" উপন্যাসে তিনি অন্ত্যজশ্রেণীর জাগরণের শুভ পরিণামই নির্দেশ করেছেন, "সন্দীপ পাঠশালা" উপন্যাসেও নির্দেশিত হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণীটির নতুন ধরনের জাগরণের কথা। আবহমান কাল ধরে শোষিত ও অবনত মানুষেরা এখন জ্ঞানের আলোয় তাদের অন্ধকার জীবন আলোকিত করতে চায়, মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদা ও অধিকার পেতে চায়। "সন্দীপন পাঠশালা" উপন্যাসে নতুন কালের এই যুগ সত্যই উপস্থাপিত হয়েছে।

"পদচিহ্ন" (১৩৫৭) রাঢ়বঙ্গের একটি গ্রামের পটভূমিকায় রচিত। গ্রামটির নাম নবগ্রাম। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বও পরবর্তী বছরগুলো এ-উপন্যাসের সময়-পটভূমি। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'এর কাল ১৯০০ থেকে ১৯০৮-৯ সাল পর্যন্ত। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে সে আমলের পাত্রপাত্রীদের ভাষা, সমাজের রূপ কালানুযায়ী চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছি।।'[৪৫] নবগ্রাম কুলীন প্রধান, নানা মানের

৪৫, ভূমিকা, "পদচিহ্ন" (১৩৫৭)।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার বাস করে নবগ্রামে। তাদের আছে অনুঃসারশূন্য আভিজাত্যবোধ। এছাড়া ওই পল্লীতে আছে উদীয়মান বণিকশ্রেণীর প্রতিনিধি গোপীচন্দ্র, সামান্য অবস্থা থেকে সে কয়লা খনির মালিক হয়েছে। তার বৈভব পুরোনো জমিদারদের মনে ঈর্ষা জাগায়। জমিদারেরা নিজেদের মধ্যে যেমন বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত, তেমনি উঠতি-ধনী গোপীচন্দ্রের সঙ্গেও গ্রামের-প্রতিপত্তিশালী প্রধান জমিদার স্বর্ণকমলবাবু নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত থাকে। এ-উপন্যাসে ওই সামন্ত জমিদারদের দম্ভ অহঙ্কার ও দ্বন্দ্ব-ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ পল্লী সমাজের উপস্থাপনা করেছেন তারাশঙ্কর। সেই সঙ্গে এ-উপন্যাসে রয়েছে অন্ত্যজ দরিদ্র শ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবনের পরিচয়। তারাশঙ্কর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সংসারে নারীর অবস্থান নির্দেশ করেছেন।

"পদচিহ্ন" উপন্যাসে উপস্থাপনার বিষয় হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ও নব্য ধনিকের দ্বন্দ্ব। এবং এই দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করার জন্য তিনি একটি সম্পূর্ণ গ্রামের জীবনকেই উপস্থাপিত করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসে তিনি ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন এখানেও উপস্থাপিত হয়েছে একই চিত্র অর্থাৎ তাদের ক্ষয়িষ্ণুতা দাম্ভিকতা অনৈতিকতা চক্রান্তপরায়ণতা ঈর্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যদিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এ-উপন্যাসের নব্যধনিক হচ্ছে গোপীচন্দ্র যে সামান্য অবস্থা থেকে কয়লাখনির মালিক হয়েছে। সে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের।গোপীচন্দ্র ধীর, বিচক্ষণ ও কূটকৌশলী। গোপীচন্দ্র নতুন পুঁজিপতি শ্রেণীর সমস্ত চারিত্রিকবৈশিষ্ট্য ধারণ করে। জমিদার স্বর্ণকমল ও নব্যধনী গোপীচন্দ্রের দ্বন্দ্ব হচ্ছে একজন তার পূর্ব প্রভুত্ব এবং মহিমা রক্ষা করতে চায় এবং অন্যজন তার ধনের দ্বারা সমাজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। দুজনের শক্তি পরীক্ষিত হয় একটি স্কুলকে কেন্দ্র করে। স্বর্ণকমল তার পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিকে সজীব করতে ব্যর্থ হয় কিন্তু গোপীচন্দ্র নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নতুন স্কুল স্থাপন করে। তার শক্তি হচ্ছে তার অর্থ এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, যে গোপীচন্দ্রকেই নানাভাবে সাহায্য করে। গোপী চন্দ্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত জমিদারকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে অর্থাৎ পুরোনো শক্তিকে সে পদানত করে তারপর সে উদ্যোগী হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও তার অধীনে নিয়ে আসার। সম্পন্ন গৃহস্থ রাধাকান্তের জীবনের ওপরও শক্তির প্রভাব পড়ে। তাতে রাধাকান্তের জীবনই নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে সে গ্রামে নতুন প্রভুরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারাশঙ্কর এউপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের প্রতি মমতাবোধ করলেও ওই নব্য-ধনীটির প্রতিষ্ঠাকেও সময়ের অনিবার্য ঘটনা বলে গ্রহণ করেছেন। তারাশঙ্করের "ধাত্রীদেবতা"য় একটি জমিদার পুত্রকে বিকশিত করা হয়েছে আদর্শবাদী তরুণ হিসেবে। এই উপন্যাসে সম্পন্ন গৃহস্থপুত্র কিশোরকে বিকশিত করা হয়েছে আদর্শবাদী হিসেবে। সে সমাজের অপাংক্তেয়দের সাহায্য করে, দুর্দশার সময় বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। কিশোরকে দিয়ে এ-উপন্যাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

কিশোর আদর্শবাদী তবে একদিন সে মায়ের নির্দেশে নব্যধনী গোপীচন্দ্রকে প্রণাম করে। গোপীচন্দ্রও কিশোরকে প্রীতির চোখে দেখে। তারাশঙ্কর যেন দেখাতে চান যে নতুন সময়ের প্রভু পুঁজিপতি ও নতুন সময়ের রাজনীতিক নায়ক-পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে জড়িত - তারা যেন পরস্পরের শক্তিকে অনুধাবন করতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে নতুন সময়কে তারাই নিয়ন্ত্রন করবে।

মূল উপাখ্যানের পাশে সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবনের রূপও বিশদভাবে চিত্রণ করা হয়। কিশোর কোন পারিবারিক প্রেক্ষাপটে বেড়ে উঠছে তা নির্দেশ করার জন্যই অন্তঃপুর জীবনের বিশদ বর্ণনা করেছেন তারাশঙ্কর। এর পাশাপাশি সমাজজীবনের নানারূপও তুলে ধরেন তিনি। পল্লীর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে গৃহস্থবধূ যাপন করে শোচনীয় দুর্দশাপূর্ণ জীবন। তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় দাপটশালী বিধবা ননদ, উগ্রমেজাজের দেবর ও অন্যান্য মুরুব্বিদের দ্বারা। ভাসুর শ্বশুর দেবর বিধবা ননদ জা শাশুড়ীর একান্নবর্তী পরিবারে গৃহস্থবধূ দাসীর ভূমিকা পালন করে মাত্র, স্বামী প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুসারে ভ্রাতৃপ্রীতি প্রদর্শন করেযে কোনো অবিচার অন্যায় নিঃশব্দে মেনে নেয়। সংসারের অন্য সকলের যে কোনো অন্যায়কে ন্যায় বলে মেনে নেয়াটাই ওই সমাজের সম্মানিত প্রথা রূপে স্বীকৃত। ওই সংসারে পালা করে বউদের কাজ করতে হয়, কারোভাগে 'কোনদিন পড়ে বাসন-মাজা ঝাঁট-দেয়া এঁটো কাঁটা পরিষ্কার এই সবের কাজ, কোনদিন পড়ে বাটনা-বাটা কুটনো-কোটা জলতোলার কাজ।' প্রবাসে চাকুরিত স্বামীর কাছে স্ত্রীর মিথ্যে অবাধ্যতার ফিরিস্তি দিয়ে ভাসুর দেবরেরা চিঠি দিলে, কুপিত স্বামী রূঢ় ভৎর্সনাপূর্ণ চিঠি লিখে স্ত্রীকে শাসন করে। সত্য-মিথ্যা বিচারের প্রয়োজনবোধ করে না, ওই মধ্যবিত্ত কুলীন পরিবারের বিধবা কন্যা সংসারের কর্ত্রীরা ভূমিকা-পালন করে দাপটের সঙ্গে। নিষ্ঠুরতা, রূঢ়ভাষণ, নির্মমতা পীড়িত ওই একান্নবর্তী পরিবারগুলোর বধূ ও সন্তা-নদের জীবন। লেখক ওই জীবনের যে বর্ণনা দেন তা এমন :

> 'কিশোরদের বাড়িরও ওই চারুদের বাড়িরমত অবস্থা। একান্নবর্তী পরিবার। কিশোরের বাপের ছয় সহোদর, সাত বউয়ের বাড়ি, বাড়ির কর্ত্রী কিন্তু কিশোরের পিসীমা। তার শাসনে মধ্যে মধ্যে কিশোরের মাকে কাঁদতে হয়, কিশোর বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমন করেন কিশোরের এক কাকা, নির্মম হস্তে দমন করেন, এখনও কিশোরের পিঠে বেত পড়ে। কিশোরের বাপ ভাইদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ, তবু তিনি এর বিরূদ্ধে একটি কথাও বলেন না। জ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি অগ্রজভক্ত চারুর বাপের মতই অনুজভক্ত। ভক্তি বা প্রীতিই এখানে একমাত্র কারণ নয়, প্রধান কারণ-

Dhaka University Institutional Repository

এই রীতিই হল সমাজপ্রচলিত প্রশংসিত রীতি ও বিধান।'[৪৬]

সংসারের ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব থাকে বিধবা ননদ কন্যা কিংবা শাশুড়ীর ওপর। সন্দিগ্ধচিত্ত কর্ত্রীরা পরিবারের মেয়ে সদস্যদের পদক্ষেপ, ক্রিয়াকলাপের দিকে নজর রাখে, তাদের ধারণা ভাড়ারের দ্রব্য চুরি করেই অল্পবয়সী পুত্রবধূ বা কন্যারা প্রসাধন দ্রব্য কেনার পয়সা জোগাড় করে। কর্ত্রী যেমন সন্দিগ্ধচিত্ত ও সতর্ক, পুত্রবধূরাও তেমনি চতুর ও চৌর্যবৃত্তিতে দক্ষ।

১৯০৬ সালের বাঙলার পল্লী সমাজের উচ্চস্তরে আছে কৌলিণ্য প্রথার চাপ, আভিজাত্যে ও ভঙ্গিনের মুখোমুখি নিম্নস্তরের মধ্যে আছে জমিদারের প্রতি অগাধ আনুগত্য ও ভীতি। পেশা হিশেবে নিম্ন শ্রেণীটি চাষাবাদ ছাড়া অন্যকোনো পেশার কথা ধারণাও করতে পারে না। যাদের নিজস্ব জমি নেই, তারা ভূমি শ্রমিক হিশেবে সম্পন্ন গৃহস্থদের চাষেই খাটে। আপন আপন গন্ত গ্রামের গণ্ডির মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ থাকতে চায় তারা। লেখক ওই জীবন বর্ণনা করেন এভাবে :

> এই উনিশ শো ছ সালে লোকে চাষ ছাড়া অন্য কিছুতে মজুর খাটবে না। তাও চালের মণ পাঁচ সিকে থেকে ছটাকা। টাকায় তেরো সের চাল অর্থাৎ তিন টাকা মণ হলে, দেশে আকাড়া অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হয়েছে বলে হাহাকার ওঠে, চাষ ছাড়া মানুষ কিছু বুঝে না। চাষের কাজে স্থায়ী কৃষাণ জীবিকা যাদের নাই, তারা শ্রমিক হিশেবে ওই চাষেই খাটে। আর আছে বছরে একবার খ'ড়ো ঘরের চাল-ছাওয়ানোর কাজ। তাও তারা আপন আপন গ্রামের মধ্যেই মজুর খাটার গণ্ডি সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়। কেবল স্বর্ণবাবুর মত ব্যক্তিদের হুকুমে গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে আসতে বাধ্য হয়, কারণ তাঁরা জমিদার, জমিদারের হুকুম অমান্য করতে নাই-এইটাই চলিত শিক্ষা, এবং অমান্য করবার মত সাহস, সাহস দূরের কথা, কল্পনাও তারা করতে পারে না। তাছাড়া নিজেদের গ্রামের গৃহস্থদের চাপ থেকে, অত্যাচার অবিচার থেকে বাঁচবার একমাত্র আশ্রয়স্থল এই জমিদার।'[৪৭]

৪৬, "পদচিহ্ন" (তারাশঙ্কর রচনাবলী নবমখণ্ড) পৃঃ ২৪০।

৪৭, "পদচিহ্ন" ওই, পৃঃ ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

ওই সমাজ কৌলিণ্য প্রথার বিষ জর্জরিত ; দুষ্ট ক্ষতযুক্ত সমাজ । ওই সমাজে পাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হতো কৌলিণ্যের বিচারে । কুলীন জমিদারেরা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জামাতাদের ঘরে রাখার ব্যবস্থা করে যায় । ওই সমাজে কুলীন পুত্রকণ্যার বিবাহে এক অভিনব প্রথা প্রচলিত ছিলো । দুষ্টকুল থেকে কণ্যা আনায় কুলীনেরা বিশ্বাস করতেন দোষ নেই । কিন্তু অকুলীন পুরুষ সম্পদ শিক্ষা স্বাস্থ্যরূপ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও সুপাত্র বলে গণ্য হতোনা । ফলে অযোগ্য কুলীনদের হাতে কণ্যা সমর্পণ করে জামাতাকে ঘরজামাই করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে । এরফল হয়েছে ভয়াবহ, ভবিষ্যৎকালের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে কুলীন জামাতার উত্তরাধিকারীরা কুৎসিত কলহে-লিপ্ত হয় । জামাতাদের প্রত্যেকের বাড়িতে দুখানি হিসাবে ঘর, কিছু জমি, কিছু জমিদারীর মুনাফা, পুকুর প্রভৃতিতে কিছু অংশ দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে শরিক করে দিয়ে যান পূর্বপুরুষেরা । এবং এই শরিকেরা পরস্পরকে ঘৃণা করে । কটুক্তি শ্লেষ উপহাস বাক্যের মধ্যদিয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে । প্রাচীন জমিদার বংশের অধিকাংশ তরুন উত্তরপুরুষই অধঃপতিত, মাতাল ও চরিত্রহীন । অনুজদের বিধবা তরুণী কণ্যাদের সঙ্গে নিশিযাপন করে, তারা মদখেয়ে বীভৎসচীৎকার করে পাড়া মাথায় করে । গৃহস্থ পাড়ার মধ্যে খিড়কির আশেপাশে এবং স্নানের পুকুরের আশেপাশেও তারা মেয়েদের দেখার জন্য বন্দুক হাতে মিথ্যা পাখির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় । অভিভাবকদের কাছে এর প্রতিবিধান চাওয়া হলে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কখনো মিষ্টি কথায় জানানো হয় যে ওই ছেলেদের শাসন করা হবে । কখনো কখনো অভিযোগকারীকেই ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয় । অর্থাৎ ওই অনৈতিকতা দুষণীয় বলে গণ্য হয় না অভিভাবকদের কাছেও।তারা প্রকারান্তরে ওই অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেন

"চিন্নামণি" (১৩৫৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের মধুবনী নামের একটি মফস্বল শহরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের পল্লীজীবনের কাহিনী । মধুবনীতে থানা আদালত জেলখানা আছে, আছে ঘিঞ্জিবাজার এলাকা । বাজারে রয়েছে তিনখানা চালকল । বাজার পেরিয়ে কাদামাটির রাস্তা কাঁকর মাটির পথ দিয়ে কিছু দুর গেলে গ্রাম । চাষীগৃহস্থ, তাঁতী, মুচি ইত্যাদি পেশার মানুষ পেশার মানুষ সেখানে বাসকরে । চিন্নামণি, তারদিদি, বন্ধু, তার দুই স্ত্রী বিরজা ও দুর্গা, গৌরাঙ্গ, তার মা, রাইস মিলের মালিক নীলকণ্ঠ বাবু, তার কর্মচারী পটল, গৌরের চাচা চাঁদ পড়ুশি কালাচাঁদ হারান প্রমুখ এ-উপন্যাসের পাত্রপাত্রী । বিধবা তরুণী চিন্নামণি অভাবের কারণে মধুবনীর চালকলের মালিক নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়িতে ঝির কাজ করতে আসে চব্বিশ পরগনার খিদির পাড়া-গ্রাম থেকে । সংসারে তার একমাত্র আশ্রয় বিধবা দিদি । মধুবনীতে এসে পরিচয় ঘটে গ্রামের চাষী গৃহস্থ -

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ গৌরাঙ্গের সঙ্গে, গৌর নীলকণ্ঠের বাড়িতে নিয়মিত দুধ দেয়। বন্ধু ও প্রতিবেশী রঘুর দ্বিতীয়া স্ত্রী সন্তান সম্ভবা দুর্গা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে, ডাক্তার তাকে খাওয়াবার জন্য একটি বিলিতী ফুড জোগাড় করতে বলে। দ্বিগুণ দাম দিতে স্বীকৃত হয়েও কোন দোকানে রঘু ফুডটি খুঁজে না পেয়ে নীলকণ্ঠের কাছে যায়। ওটি জোগাড় করে দেবার মিনতি জানায়। নীলকণ্ঠের সঞ্চয়ে দুটি থাকলেও সে তা দিতে সম্মত হয় না, চিনুমণি একটি ফুড চুরি করে গৌরাঙ্গকে দিয়ে দুর্গার কাছে পাঠায়। নিয়মিত গৌরের বাড়িতে দুধ আনতে যাবার কারণে এবং ফুড দেবার কারণে গৌরের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিয়মিত রাতে তারা রাইস মিলের উঠানে মিলিত হতে থাকে। গৌরের মনে হঠাৎ সমাজের ভয় এবং একটি কিশোরী স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা দেখা দিলে সে চিনুমণির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চায়। যুদ্ধের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, চাল ডাল তেল কাপড়, এমনকি কাঁচা টাকা রুপার দামও অত্যন্ত বেড়ে যায়। গৌরের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের বাজারে চালের দাম চড়ে যাবার কারণে লোভে পড়ে কৃষকেরা সমস্ত ধান বিক্রি করে টাকা ঘরে তুলতে থাকে। ক্রমে বাজার থেকে ধান উধাও হয়, বাজারসওদা করার পূর্বতন রীতি পদ্ধতি বদলায়, খাজনা বাড়ে। লোহা রেজগি উধাও হয় রুপার বাজার চড়ে যায়। অনাহারে মধুবনীর অর্ধেক গৃহস্থ মারা যায়, অধিকাংশ পালায়। গৌরের মা মারা যাবার পর চিনুমণি গৌরকে নিয়ে তার দিদির কর্মস্থল বড়নিছিপুরের কারখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

যুদ্ধের ফলে আর্থনীতিক কারণে কীভাবে বিশৃঙ্খল ও নষ্ট হয়ে যায় পল্লীর সাধারণ গৃহস্থজীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিনুমণি" উপন্যাসে তা নির্দেশ করা হয়েছে। এ-উপন্যাসে যুদ্ধকালীন গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের রূপ পাওয়া যায়। মফস্বল শহরের প্রেক্ষাপটে কাহিনী শুরু হলেও মধুবনী গ্রাম এবং বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের পল্লীর সাধারণ জীবনের উপস্থাপনা ঘটেছে এ-উপন্যাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব গ্রামগুলোতে পৌঁছুবার আগে জীবন ছিলো সাদাসিদে স্বচ্ছন্দ। যুদ্ধের প্রভাবে পল্লী-বাঙলার গৃহস্থজীবন হয়ে পড়ে নানাভাবে বিপর্যস্ত, ধ্বংস হয় বহু মূল্যবোধ। ওই জীবন হয়ে ওঠে অপরিমেয় ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রিত। ক্ষুধাই একমাত্র নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে ওঠে বলে ওই জীবনে সনাতন নানা মূল্যবোধ আর মান্য বলে বিবেচিত হয় না। কোনোরকমে অস্তিত্ব রক্ষাই হয়ে ওঠে বড়ো কথা। ক্ষুধার কারণে সোমত্ত বিধবা বোনকে একলা দূরদেশ মধুবনীতে কাজ নিয়ে যেতে দিতে বাধ্য হয় বড়ো বোন। নিজেও নতুন গড়ে ওঠা কারখানা শহরে এসে কুলি ব্যারাকে ঝিয়ের কাজ শুরু করে। মুনাফার লোভে মহাজনেরা গ্রামের পর গ্রামের উচ্ছেদ সাধন করে সেখানে বসায় নানা কারখানা, কারখানা

Dhaka University Institutional Repository

ঘিরে গড়ে ওঠে কুলি ব্যারাক। শ্রীসম্পন্ন গৃহস্থ জনপদ পরিণত হয় কুৎসিত কারখানা ও কুলিব্যারাক অঞ্চলে। ক্ষুধা তাড়িত গৃহস্থ বৌঝিয়েরা কুলিব্যারাকে রাঁধুনির কাজ করতে আসে,একাজে ক্ষুধানিবৃত্তির নিশ্চয়তা এলেও ওই নারীদের জীবন অন্যভাবে দুর্দশা ও কলুষগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কুলিব্যারাকের উচ্ছৃঙ্খল পুরুষেরা বেপরোয়াভাবে ওই নারীদের সম্ভোগ করে। পেটের ক্ষুধা সইতে না পেরে কাজ করতে আসা ওই নারীরা কুলিপুরুষদের জৈবিক-ক্ষুধাও মেটায়। এজন্য পুরুষগুলোর যেমন মাথাব্যথা নেই নারীদের তেমনি সংস্কার ধর্মাধর্ম ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ নেই। চিনুমনির বোনের জবানী ওই উচ্ছৃঙ্খল ক্ষুধাতাড়িত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়:

> 'কী দুঃখ পাইয়াছি নাখাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকইতগুলার দাসী হইলাম ইহা অদৃষ্টে ছিল। কিরূপ হৈচৈ হইয়াছে লম্বা লম্বা কতবাড়ী উঠিয়াছে অবাককান্ড দেখিয়া তুমি চোখের পলক ফেলিতে পারিবা না। ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা। ইহার মধ্যে গাদায় গাদায় মাতালগুন্ডা গিজ গিজ করিতেছে। আমারমত শতাবধি পোড়া-কপালী ঝি কাজ করিতে আসিয়াছে, কাহারো ধর্ম নাই সতীত্ব নাই এরূপ কান্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে কোনমতে ধর্ম রাখিয়াছি। না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলামইহা ভিন্ন গতি কি। দুই স্থানে বাসন মাজিয়া তের টাকা করিয়া ছাব্বিশ টাকা পাই।"[৪৮]

পেটের ক্ষুধার কাছে গৌণ হয়ে যায় মান অপমানবোধ, সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রশ্ন। লম্পট হয়ে ওঠে 'দেবতা', যার পরিচয় পাওয়া যায় চিনুমণির দিদির কথায়:

> বৈন চিনুমণি আমি বড় নিছিরপুর আসিয়াছি জানিবা। না আসিয়া কি করিব আমার কে আছে আমাকে পুষিবেন ············ বড় নিছিপুরে আমি ভূষণবাবুর বাসায় আসিয়াছি। ভূষণবাবুরে তুমি চিনিবা তিনি মোদের গাঁয়ের হালদার মশায়ের বড় জামাই তোমার হাত ধরিয়া টানিতে দেখিয়া যাহাকে গালমন্দ করিয়াছিলাম। কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রকাশ করি নাই। আমি ভূষণ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া আছি। তিনি এমন ভালো লোক তাহা জানিতাম না। আমাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। ·······ভূষণ-বাবুকে দেবতা বলিয়া জানিয়া পায় ধরিয়া কত কাঁদিয়াছি ········,[৪৯]

৪৮, "চিনুমণি" (মানিকগ্রন্থাবলী, ষষ্ঠখন্ড) পৃঃ ৪৯-৫০।

৪৯, "চিনুমণি " পৃঃ ৪১-৪২ ।

"চিন্তামণি " উপন্যাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট আর্থিক সঙ্কটের ফলে কীভাবে পল্লীবাঙলার জীবন বিপন্ন বিপর্যস্ত এমন কী উন্মূল হয়ে যায় তার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে । দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পড়ে মানুষ তাদের ভিটামাটি থেকে উন্মূল হয় , তারা প্রথাগত নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে শুধু জীবন রক্ষার জন্য নানারকম শোষণের কাছে আত্মসমর্পন করে । গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়, গ্রামবাসীরা শহরের দিকে ছুটতে থাকে । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-উপন্যাসে আর্থিকভাবে বিপন্ন গ্রামের বাস্তব রূপ উপস্থাপিত করেছেন ।

বনফুলের "দ্বৈরথ " (১৩৪৪) উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে দুই শক্তিমান জমিদারের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কাহিনী । "দ্বৈরথ" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চারজন চন্দ্রকান্ত, উগ্রমোহন, বহ্নিকুমারী, গঙ্গাগোবিন্দ । পরাক্রমশালী জমিদার উগ্রমোহন জমিদার চন্দ্রকান্তের বোন বহ্নিকুমারীর সঙ্গে বিবাহিত হয় । উগ্রমোহন স্বভাবে উগ্র, দাম্ভিক, দুর্জয় প্রতাপশালী । জমিদার চন্দ্রকান্ত এর বিপরীত, অন্তর্মুখী, দার্শনিক ভাবুকতাপূর্ণ, কূটকৌশলে দক্ষ, তবে উগ্রমোহনের মতো উগ্র নয় । চন্দ্রকান্তের সঙ্গে উগ্রমোহনের জমিদারীর নানা কাজ নিয়ে বিরোধ লেগেই থাকে । অবিবাহিত নিঃসঙ্গ চন্দ্রকান্তের বেঁচে থাকার একমাত্র আনন্দই হয়ে ওঠে উগ্রমোহনের সঙ্গে জমিদারীর নানা ব্যাপার নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদে জড়িয়ে থাকা, চন্দ্রকান্ত উগ্রমোহনকে নানাভাবে হেনস্থা করে । কখনো চন্দ্রকান্তের অধীনস্থ কর্মচারীরা চন্দ্রকান্তের আদেশে রাতের অন্ধকারে উগ্রমোহনের জলমহল লুট করে এবং ভোরবেলা সমস্ত মাছ উগ্রমোহনের কাছে উপঢৌকন রূপে পাঠানো হয় । কখনো চন্দ্রকান্ত জমিদার উগ্রমোহনের মহাজন প্রজাকে জমিদারের অবাধ্য হতে প্ররোচিত করে । উগ্রমোহনও এর পাল্টা জবাব দেয় । তবে চন্দ্রকান্তের মতো ঠান্ডামাথায় কৌশলে কাজ করতে পারে না সে । দাপট ও শক্তি দিয়ে যেমন প্রজাদের শাসন করে তেমনি শক্তি দিয়ে চন্দ্রকান্তকে পরাভূত করতে চায় । কোনো বিশেষকালের ও সমাজের বাস্তবতা ও জীবনকে এখানে পাওয়া যায় না । এ-উপন্যাস দুই বয়স্ক শিশু জমিদারের বিত্ত ও দর্পের কাহিনী, প্রজাদের ওপর তীব্র অত্যাচার ও প্রবল দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শনের গল্প । এ-উপন্যাসটিকে তাই জমিদার জীবনের রোমান্স বলা যায় ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের " ষোল আনা " (১৩৩২) উপন্যাসের পটভূমি ' বর্দ্ধমান ও বীরভূমের সীমান্ত প্রান্তে ছোট্ট একখানি গ্রাম', আর ওই গ্রামে ' না আছে ডাক্তারখানা, না আছে ইস্কুল, না আছে-পোস্টাপিস- রেল স্টেশন হইতে অনেক দূরে ।' এ-উপন্যাসেও পাওয়া যায় সে-পল্লীজীবনকে, যেখানে দারিদ্র্য ,

Dhaka University Institutional Repository

ইতরতা, লোভ, চক্রান্ত, ব্যভিচার সাধারণ ব্যাপার। ওই সমাজের নৈতিকতা শিথিল, সেখানে বিধবা তরুণী সকলের চোখের সামনে উপপতির সাথে বসে করে, সমাজবাসীরা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে-কোনো খারাপ কাজ করে, এবং তারা প্রায় সবাই দরিদ্র। তারা যাপন করে আদিম জীবন। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ জড়পদার্থ, শুধু দু-একজন তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে। শৈলজানন্দ পল্লীজীবনের চিত্র এঁকেছেন মোটা দাগে।

নারায়ণগঙ্গোপাধ্যায়ের " সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী "(১৩৫২) বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দশকের প্রেক্ষাপটে রচিত। উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুমারদহ, রূপাপুর ও নবীপুর নামক তিনটি গ্রাম এর পটভূমি। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন ' বাস্তবে এই দুখানি গ্রামের নাম অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনেই আমি এদের নতুন নামকরণ করেছি।'[৫০] ক্ষয়িষ্ণু জমিদার কুমার বিশ্বনাথ, উদীয়মান বেনিয়া লালা হরিশরণ, বিশ্বনাথের পত্নী অর্পণা, কুমার সম্প্রদায় এ-উপন্যাসে পাত্রপাত্রী। রূপাপুরের উপন্যাসটির প্রথমাংশে রয়েছে কুমারদহের প্রাচীন, ঐশ্বর্যশালী, উগ্র ও শক্তিমান জমিদার বংশের শেষ সন্তান কুমার বিশ্বনাথের জীবনকাহিনী। বিশ্বনাথ অবক্ষয়গ্রস্ত জমিদার, খাজনার টাকার জন্য তাকে হাত পাততে হয় উঠতি বেনিয়ার কাছে, তার রাত কাটে বন্য ওরাং নারী সম্ভোগে ও মদ্যপানে, রংমহলে। জমিদার জীবনের বাস্তবতা, সেরেস্তার কাজ, পারিবারিক জীবন, রংমহলের অমিতাচার ইত্যাদি কোনো কিছুই বিশদ ও যথাযথ উপস্থাপিত হয় নি উপন্যাসে, প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্কের বিবরণও রচিত হয় নি। উপন্যাসে। বাঙলার জমিদারদের সম্পর্কে যে-সব কিংবদন্তী লোকসমাজে প্রচলিত আছে, যেমন তারা ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় উগ্র, অমিতাচারী ও সম্ভোগমত্ত বেহিসাবী কিন্তু মহৎ- এসবই লক্ষ্য করা যায় কুমার বিশ্বনাথের মধ্যে। ভগ্ন রংমহলে ওরাং নারী সম্ভোগ করে, মদ খেয়ে তার রাত কাটে। স্ত্রী অর্পণা বিদুষী ও সুন্দরী, অন্তঃপুরে সে উপেক্ষিতার জীবনই কাটায়। নিঃশব্দে অর্পনা স্বামীর উপেক্ষা মেনে নিয়ে বই পড়ে সময় কাটায়। সে বেনিয়া হরিশরণের কাছ থেকে খাজনার টাকা ধার করতে বাধ্য হয়, আয়ের উৎস বাৎসরিক মেলার ইজারাও পাঁচ বৎসরের জন্য হরিশরণকে দিতে বাধ্য হয় কিন্তু মেলায় যাতে হরিশরণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় সেজন্য রূপাপুরের দুর্ধর্ষ কামারদের মেলায় দাঙ্গা বাধাবার জন্য ভাড়াও করে। কামারপাড়ায় গিয়ে স্বামী পরিত্যক্তা স্বাস্থ্যবতী কামার বউ ভানীকে দেখে তাকে অধিগত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। মেলা থেকে রাতের অন্ধকারে তাকে অপহরণ করতে লোক পাঠায়। ভুলক্রমে অপহরণ করা হয় কামারদের মাতবরের স্ত্রীকে,ফলে জমিদার জড়িয়ে পড়ে আরেকটি ঝামেলায়- কামারদের ক্রোধ ও আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয় তাকে। চড়ারঙে জমিদারের উগ্র প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চিত্রণ

৫০, ভূমিকাংশ "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী"(১৩৫২)।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন লেখক।

লালাহরিশরণের কঠোর কর্মজীবন বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চাইলেও একসময় লেখক ঝুঁকে পড়েছেন সদ্যধনী আভিজাত্য অভিলাষী এই বেনিয়ার ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার চিত্রণে। অমিত ধন আয়ত্তে এলেও জমিদারের মহিমা ও আভিজাত্য তার আয়ত্তে আসে নি। জনগণ ধনের জন্য তাকে সমীহ করলেও জমিদারের শ্রদ্ধা ও বিনীত ভক্তি তাকে প্রদর্শন করে না। কুমারদহকে নিশ্চিহ্ন করে তাই সেখানে সে নতুন গ্রামের পত্তনের স্বপ্ন দেখে,যে গ্রামের নাম হবে হরিশরণপুর। নানাবিষয়ে জমিদারকে হেয় করতে পারার মধ্যে পায় চরম আনন্দ। উপন্যাসটিতে পাওয়া যায় ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের অন্তঃসারশূণ্য দম্ভ ও পরাজয়ের কাহিনী, আর শ্রেষ্ঠীর ঈর্ষার গল্প। রূপাপুরের কামারদেরও জীবনের খন্ড অংশের পরিচয় দেয়া হয়। হাতুড়ি ঠুকে লোহা গালিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করে-এতথ্য জানা যায়, তারা দুর্ধর্ষ ডাকাত দাঙ্গাবাজ নিষ্ঠুর তাদের এই পরিচয়কেই প্রধান করে তোলা হয় রচনায়। "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী," ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ও নব্যধনিকের লড়াই-এর উপাখ্যান যাতে জয় হয়েছে নব্য ধনিকের। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই জয়ের উপাখ্যান সমাজের বিস্তৃত পরিচয় উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে রচনা করতে পারেন নি, উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে দুইব্যক্তির প্রতিযোগিতার কাহিনী।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "দ্বীপপুঞ্জ" (১৩৫৩) উপন্যাসে সময়ের উল্লেখ করা না হলেও পাত্রপাত্রীদের জীবনাচরণ পেশা ইত্যাদি থেকে অনুমান করা চলে যে বিংশশতাব্দীর প্রথম অংশের বাঙলা দেশের কোনো একটি গ্রামের সমাজজীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লেখক উপন্যাসে গ্রামের নামও বলেন নি, তবে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন এই বইয়ের পটভূমি পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম। সেগ্রামের পরিকল্পনায় লেখকের স্বগ্রামের একাংশের অনেক মিল রয়েছে। লেখক তাঁর "আত্মকথা"য় বলেছেন : 'হরিবংশে' (পরিবর্তিত নাম' দ্বীপপুঞ্জ') আমাদের সদরদি গ্রামের অনেকেই এসে ভিড় করেছিল। আমাদের মধ্যপাড়ার উত্তরে ছিল সাহাপাড়া। দোকানপাট, ছোট-খাট ব্যবসাবানিজ্যই ছিল এদের জীবীকা। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক দূরে যে শহরটি আছে, তার নাম ভাঙ্গা। ········ আমাদের গ্রামের সাহা সম্প্রদায়ের অনেকেরই দোকানপাট ছিল সেই ভাঙ্গা শহরে। ······ সেই সাহাপাড়ার অনেকেই এসে ভিড় করেছিলেন আবার প্রথম উপন্যাসে।'[৫১] এ-উপন্যাসে ধনী মহাজন নবদ্বীপ সা, তার পুত্র মুরলী, পুত্রবধু মনোরমা, প্রতিবেশী ফটিক, মধু সা, মধু সার ক্ষ্যাবেস্টী, সুবল, সুবলের স্ত্রী

৫১· 'আত্মকথা', (নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী,(প্রথমখণ্ড), পৃঃ ৬০৯।

মর্সলা, বিনোদ, বিনোদের মা, আলতা, আলতার মা প্রভৃতি চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়।

উপন্যাসের প্রথমাংশে লেখক এক ক্ষুদ্র গ্রামের ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের বর্ণনা করেছেন এবং শেষাংশে বর্ণনা করেছেন ওই সমাজের এক বিবাহিত নারীর অবৈধ সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত। ওই গ্রামবাসীরা সকলেই হরিভক্ত বৈষ্ণব। ওই সামাজিক জীবনে নানা সামাজিক ক্রিয়াকান্ড আছে অবৈধ পরকীয়া প্রণয় আছে, মহামারীর উপদ্রব আছে, অপরিমেয় দারিদ্র্য আছে গৃহস্থ নারীদের উচ্চকণ্ঠ কলহ ও কুৎসা রটনা আছে। ওই সমাজের বিশিষ্ট ধনী নবদ্বীপ সা। তার পুত্র মুরলী সুদর্শন নিষ্কর্মা এবং লম্পট। কৌশলে কিংবা বলপ্রয়োগে নারীদেহ সম্ভোগই তার কাজ। পিতা এজন্য তাকে ভৎর্সনা করলেও তার খরচাদির টাকা দিতে কার্পণ্য করে না। গ্রামের সবাই গোপনে মুরলীর নিন্দা করলেও প্রকাশ্যে কেউ তার সমালোচনা করার সাহস পায় না, কারণ প্রায় প্রতিটি গৃহস্থই নবদ্বীপ সার কাছে ঋণী। মুরলী একসময় প্রতিবেশী সুবলের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। সুবলের স্ত্রী মর্সলা ইতিপূর্বে সন্তানাদি না হবার জন্য বন্ধ্যানারীর অপবাদ নিয়ে বেঁচে ছিলো। মুরলীর সঙ্গে সম্পর্কের পর সে সন্তানসম্ভবা হয়। মুরলী তার প্রতি গভীর ভালোবাসা বোধ করে এবং তাকে নিয়ে নতুন জায়গায় নতুন সংসার গড়ার কথাও ভাবে। মর্সলা যেতে রাজি হয় না, উপন্যাসের শেষাংশে এই সন্তানসম্ভবা নারীর মনোগত টানাপোড়েন ও উপলব্ধিবোধ অনুভূতির পরিচয় তুলে ধরা হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "দ্বীপপুঞ্জ" উপন্যাসে পল্লীবাঙলার অসংখ্য দরিদ্র পল্লীর একটির রূপ উপস্থাপিত হয়েছে।

এ-সময় পল্লীনির্ভর স্বল্পসংখ্যক এমন কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে যেগুলোতে একটি বিশেষ ভূখন্ডের বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবন প্রথা সংস্কৃতির পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে। এধরণের উপন্যাসকে আঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাসের গোত্রভুক্ত করা হয়েছে। এশ্রেণীর কোনো কোনো উপন্যাসে আঞ্চলিক রঙ যথাযথ বিধৃত হয়েছে, কোনো কোনোটিতে আঞ্চলিক রঙের প্রতিভাস সৃষ্টি হয়েছে।

"উপনিবেশ" (পত্রিকায় প্রকাশঃ ১৩৪৯-৫০) প্রথমখন্ডের পাত্রপাত্রীরা সভ্যতা থেকে দূরে অবস্থিত এক দ্বীপের অধিবাসী। ওই দ্বীপে আইন ও সমাজের শাসন শিথিল, জীবন যেখানে আদিম বা বর্বর। তবে লেখক ওই দ্বীপখন্ডের আদিম জীবনের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে সমর্থ হন নি, তিনি ওই দ্বীপবাসীদের প্রবৃত্তিগত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বর্ণনা করেছেন। এটিকে আপাতদৃষ্টিতে আঞ্চলিক রঙবাদী বা আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মনে হতে পারে, তবে -এটি প্রকৃত আঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাস নয়, যদিও তার প্রতিভাস এতে সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল ও নোয়াখালির সমুদ্র মোহনার একটি কল্পিত দ্বীপের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত। লেখক ওই দ্বীপটির নামকরণ করেছেন চরইসমাইল। এই ভূখণ্ডটির বাস্তবতা অস্তিত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন " চর ইসমাইল " নামটি বাস্তব না হইলেও বরিশাল ও নোয়াখালি সামুদ্রিক মোহনায় অনুরূপ স্থান বিরল নহে এবং কাহিনী বর্ণিত অপরিচিত ধরণের মানুষগুলিকেও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি গল্পই লিখিয়াছি সুতরাং কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন অবান্তর। তবে উপাদান এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি'।[৫২] লেখক বলেছেন এ-উপন্যাসের পাত্রপাত্রী ও কাহিনী কল্পিত হলেও এর উপাদান বা জীবনযাপনের রীতিপদ্ধতি ও প্রতিবেশ বাস্তব। লেখক উপন্যাসের ভূমিকায় বলেন যে ব্যক্তি বিশেষের নয়, ওই অঞ্চলের সমষ্টির বা গোষ্ঠীর জীবনাচার-আবেগ আলোড়নকে তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য। নিম্নবঙ্গের নদীসমুদ্রের অঞ্চলে মাটির মতোই যেখানে সমাজ ও জীবন অপরিণত এবং আদিম, সেই আদিম জীবনের রূপায়নই তাঁর লক্ষ্য। এক্ষেত্রে মিখাইল শলোকভের প্রভাবের কথা বলেন তিনি ; '...... ডন কোজাকদের নিয়ে শোলোকভের সেই আশ্চর্য সৃষ্টি-সেখানে ব্যক্তি চরিত্র মুখ্য নয়, আলোড়িত বিলোড়িত একটা বিপুল গোষ্ঠীর প্রাণ বন্যায় ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে গেছে এবং বিলিতী অর্কেস্ট্রার বহু যন্ত্রের হার্মনির মতো বিচিত্রের অখণ্ডতা যেখানে ধ্বনিত হয়েছে সেইরকম ভাবে একটা সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে আমি প্রলুব্ধ হয়ে উঠলাম। চর ইসমাইলের পটভূমি তার আদিমতার স্বরলিপিতে বহু চরিত্রের যন্ত্রকে ঐকতানে বাজিয়ে তুলল।' ভূমিকায় তিনি এও জানান যে ' নিম্নবাংলার নদীসমুদ্রের দেশে মাটির মতোই সমাজ আর জীবন যেখানে অপরিণত, তার একটা অপরূপ রূপ, আমার কিশোর কল্পনাকে রোমাঞ্চিত করে রেখেছিল। '[৫৩] শলোকভের প্রভাবে একটি দূরবর্তী ভূখণ্ডের সমাজজীবনের রূপায়ন লেখকের লক্ষ্য হলেও তিনি ওই জীবনের সম্পূর্ণ রূপ বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত করেন নি। তিনি দূর দ্বীপের রোমান্স রচনা করেছেন।

---

৫২. 'গ্রন্থপরিচয়' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, প্রথমখণ্ড) পৃঃ ৬৩১।

৫৩. ওই, পৃঃ ৬৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের শুরুতে চর ইসমাইলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্তু-গীজ জলদস্যুদের ঘাটি চর ইসমাইলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পরিণত হয় সমৃদ্ধ বাজারে। সরকারী ডাক্তারখানা, ডাকঘর, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ছোটখাট কাছারী সবই সেখানে আছে। বাসিন্দাদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী থেকে আসা ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, কিছু পরিমাণে মগ ও একদল জেলেও সেখানে বাস করে। কম করে হলেও ওই দ্বীপে দেড় হাজার মানুষের বসতি। সপ্তাহে একদিন খুব বড় করে হাট বসে। চর ইসমাইলের অধিবাসীরা বছরে ছয় মাস মাত্র বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে। চৈত্র থেকে আশ্বিন পর্যন্ত নদী থাকে অশান্ত, ঝঞ্ঝামায়, ঘূর্ণিসংকুল। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সেসময় একেবারে বন্ধ থাকে। এমন একটি সময়ের সেই সব সভ্য ও অর্ধসভ্য মানুষদের নিয়ে এই কাহিনী রচিত হয়েছে বলে লেখক জানান। লেখক দ্বীপের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিচয় দিয়েছেন বিস্তৃতভাবে; কিন্তু জীবনই হয়ে উঠেছে সমস্যা। দ্বীপবাসীদের সামাজিক জীবন, কর্মজীবন, প্রাকৃতিক প্রতিবেশ, বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল প্রতিবেশের সঙ্গে দুঃসহ সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, সামাজিক সংস্কার পারিবারিক জীবনাচরণ কোনো কিছু উপস্থাপিত হয় নি। প্রায় দেড় হাজার মানুষের বসতির ওই দ্বীপের মাত্র চারটি চরিত্রের দ্বন্দ্বযুগত সমস্যা ভাবনাচিন্তা ও জীবনকে তিনি তুলে ধরেছেন। তাদের জীবন দ্বীপ-বাসীদের জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে না; ওই চারটি চরিত্রের বাস্তবজীবন বর্ণনাও তার লক্ষ্য নয়, ওই দ্বীপে জীবন যাপন করতে বাধ্য এসব চরিত্রের মনোকষ্ট, চিন্তা, বিরহবেদনা দর্শনচিন্তা ইত্যাদির বিবরণ রচনা করেছেন লেখক। যেখানে তিনি মগ বা পর্তুগীজ জল দস্যুদের উত্তরপুরুষদের আঁকতে চেয়েছেন সে-খানে তারা হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ প্রবৃত্তির সমষ্টি, বাস্তব সাধারণ মানুষ নয়। "উপনিবেশ" উপ-ন্যাসে পাঁচটি চরিত্রের জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যদিও লেখক বলেছেন দ্বীপবাসীদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি থেকে আসা ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, তবে উপন্যাসে ওই মুসলমানদের জীবনবাস্তবতা তুলে ধরা হয় নি। লেখক ওই দ্বীপে কর্মোপলক্ষে আগত কয়েকজন হিন্দুর জীবন যাপনের বিবরণ লিখেছেন, ফরিদপুর থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী একজন হিন্দু কবিরাজের দ্বীপ জীবনের বিবরণ দিয়েছেন, একটি মগ দম্পতির জী-বনবৃত্তান্ত এবং পর্তুগীজ উত্তরপুরুষদের কয়েকজনের জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। মগ পর্তুগীজদের বাস্তব-জীবনের চেয়ে প্রবৃত্তিগত জীবনের রূপায়নেই লেখক আগ্রহী ছিলেন বেশী, তারা সাধারণ পেশা গ্রহনে আগ্রহী নয়, জলদস্যুদের ওই উত্তরপুরুষেরা নিষিদ্ধ জীবন ও পেশার প্রতি আসক্তি বোধ করে। তারা হিংস্র, ক্রুর, শঠ,

Dhaka University Institutional Repository

উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবনে অভ্যস্ত। লেখক তাদের এঁকেছেন চড়া রঙে। যেমন ওই মানুষদের উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম প্রবৃত্তিবশ্য অনৈতিক বলে দূর থেকে কল্পনা করে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি, ওই কল্পনাকেই রূপায়িত করা হয়েছে।

"উপনিবেশ" উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডে (প্রকাশকাল নেই) প্রথমখন্ডের পাত্রপাত্রীদেরই প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনের বিবরণ রচনা করা হয়। চর ইসমাইলের বাসিন্দাদের পাশবজীবনের হিংস্রতা ও পশুত্বের পরিচয় দেয়াই এ-খন্ডে লেখকের লক্ষ্য। ওই সমাজের প্রতিটি মানুষ অন্যায় ও পাপাচারের তাগিদ রক্তের মধ্যে বোধ করে। পর্তুগীজ আদিবাসীদের উত্তরপুরুষেরা যেমন অবৈধ ব্যবসা করে,তেমনি মূলভূখন্ড থেকে আওয়া ধনী জমিদারও আফিঙের চোরাচালান করে। ওই আদিম সমাজের সদস্যরা একে অন্যকে অবিশ্বাস করে, সময় ও সুযোগ বুঝে প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রতারণা করে। শক্তি ও হিংস্রতাই ওই সমাজে টি কে থাকার যোগ্যতা। আইনের শাসন ওই জীবনে অচল, খুন হত্যাকান্ড রাহাজানি ওই সমাজে নৈমিত্তিক ব্যাপার। ঘুষ দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ রাখে শক্তিমান অপরাধী এবং প্রকৃতঅপরাধী কোনো শাস্তিই পায় না। ওই সভ্যতাবিচ্ছিন্ন জলবেষ্টিত আদিম ভূখন্ডে সভ্যমানুষ এসেও বন্য উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে প্রতিবেশের প্রভাবে। কামক্ষুধা নৃশংসতা হত্যা করার প্রবণতা-মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তিগুলোই ওই জীবনে প্রধান। এই প্রবৃত্তির গাথাই লেখক রচনা করেছেন।প্রাত্যহিক বাস্তবজীবন থেকে দূরবর্তী দুর্গম দ্বীপজীবন সম্পর্কে আমাদের মনে এক ধরনের রোম্যান্টিক ধারণা আছে। মনে করা হয় ওই জীবন হিংস্র, ভীতিকর, আদিম ও পাশবিকতায় পরিপূর্ণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চর ইসমাইলকে এমনই একটি ভূখন্ডরূপে প্রতিপাদন করে রোমান্সধর্মিতারই পরিচয় দিয়েছেন।

"হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" (১৯৪৭) উপন্যাসে রাঢ় ভূখন্ডের কোপাই তীরবর্তী কাহার সম্প্রদায়ের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটিকে আঞ্চলিকতাবাদী উপন্যাস হিশেবে চিহ্নিত করা যায়। সাধারণ ভদ্রলোকের পল্লীগুলো থেকে দূরে কোপাই নদীরতীরবর্তী নীলকুঠী সংলগ্ন ভূখন্ডে তাদের বসবাস। নীলকুঠির সাহেব মেয়ের পালকি বইবার জন্য এবং গৃহকর্মের নানাকাজ করার জন্য অন্য অঞ্চল থেকে তাদের এনে ওই অঞ্চলে বসত করানো হয়। কোপাই তীরবর্তী ক্ষুদ্র একটি অংশে সামান্য কঘর কাহার বাস করতে থাকে। তাদের ভাষাভঙ্গী অন্যদের থেকে ভিন্ন। ধর্মবোধ, আচার সংস্কার বিশ্বাস, জীবনাচরণ পদ্ধতি, পোশাক সমস্তই আদিম। আদিম সমাজের মতোই একজন গোত্রপতি আছে, সে পাড়ার নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। আছে গভীর আধিভৌতিক বিশ্বাস ও সংস্কার। কাহার সম্প্রদায়ের বাসস্থান, দেবপীঠ পল্লী-

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেশের পরিচয়, ধর্মবোধ, নৈতিক বিশ্বাস, জীবনাচরণ , কর্ম, গৃহস্থালি সামাজিক বিধিবিধান, উৎসব প্রথা, বাচনভঙ্গী র অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তারাশঙ্কর এ-উপন্যাসে। শুধু পরিবেশ-ভূভাগ, বাহ্যিক জীবনধারা ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বিবরণ মাত্র নয় "হাঁসুলী বাঁকের ইতিকথা", কাহার সম্প্রদায়ের জীবনের গভীর পরিচয়, তাদের ঐতিহ্য, স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা, সঙ্কট সম্ভাবনা, বিশ্বাস-প্রথা এ-সবই উপস্থাপিত হয়েছে।

রাঢ়ের কোপাইনদী তীরবর্তী বাঁশবাঁদি নামক ছোটগ্রামের প্রেক্ষাপটে কাহিনীটি রচিত। কোপাই নদীর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত হাঁসুলীবাঁক। ওই জায়গায় অত্যন্ত অল্পপরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর রূপ হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো। এই জন্য বাঁকটির নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজাবাঁশবাঁদি। বাঁশবাঁদি ছোট-গ্রাম; দুটি পুকুরের চার পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারের বসতি। বাঁশবাঁদি গ্রামকে ঘিরে রেখেছে 'সবুজ কস্তার ডুরি মালার মত'। সন্ধ্যায় বাঁশবন থেকে অন্ধকার গোল হয়ে এগিয়ে আসে কাহার পাড়ার দিকে। হাঁসুলী-বাঁকের পশ্চিম দিকের প্রথম বাঁকটি বেলগাছ আর স্যাওড়া ঝোপে ভর্তি ওটি কাহার সম্প্রদায়ের দেবপীঠ-ব্রহ্মদৈত্যতলা, হাঁসুলীবাঁকের দেশ কড়া ধাতের মাটির দেশ। প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, বালি ধু ধু করে, এক পাশে মাত্র এক হাঁটু গভীর জল কোনমতে বয়ে যায়। খালবিল পুকুর শুকিয়ে চৌচির হয়ে ফেটে যায়। মাটি হয়ে যায় পাথরের মতো শক্ত আর আগুনে পোড়া লোহার মতো তপ্ত। আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত কোপাইনদী অধিবাসীদের দুর্ভাবনাগ্রস্থ করে রাখে। পরিপূর্ণ হয়ে উঠে হঠাৎ একদিন ভরানদী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে, ভাসিয়ে নেয় সবকিছু। দুতিন বৎসর অন্তর অন্তর আসে প্রবল আকস্মিক বান- কাহাররা তাকে বলে 'হড়পাবান'। সেই বন্যার স্রোতে পড়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসে মরা বাঘ, ভালুক। বাঁশবাঁদির বাঁশবেড়ে জঙ্গল থেকে খানিক দূরে সাহেব ডাঙায় 'আস্তাগাড়ত' গড়ে তুলেছে বুনো শুয়োরের পাল। দুএকটা কখনো কাহারদের গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে অকস্মাৎ, কেউ কেউ সামনে পড়ে জখম হয়। কাহাররা বুনো শুয়ের মারার জন্য তৈরি করে ফাঁদ। হাত খানেক লম্বা বাখারির ফালির মাঝ-খানে আধহাত লম্বা দড়ি বেঁধে প্রান্তভাগে বাঁধে ধারালো বড়শি। তাতে টোপের মত গেঁথে দেয় কলা এবং পচুই মদের ম্যাতা, মদ ও ম্যাতার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শুয়ের এসে টোপ গিলতেই বড়শি জিভে গেথে যায়। বানের জলে ভেসে আসে কুমীর। তখন কাহারেরা দল বেঁধে বের হয়, সর্বাঙ্গে হলুদ মাখে, সঙ্গে নেয় কোদাল,

কুড়ুল লাঠি সড়কি, আর বড় বড় বাঁশের ডগায় বাধা শক্ত কাস্তির ফাঁস। নানাভাবে চালায় কুম্ভীর বাঁধের পালা। জল সরে গেলে ভেজা মাটি থেকে তাপ উঠতে থাকে, মাছি ও মশায় অঞ্চল ছেয়ে যায়। মানুষ চলে, মাথার ওপর ঝাঁকবন্দী মশা সঙ্গে চলে ভনভন শব্দ তুলে। কামড়ে শরীর 'দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে। গরুর গায়ে মাছি বসে থাকে চাপবন্দী হয়ে।' তার কিছুদিন পরেই শুরু হয় ম্যালেরিয়া জ্বর, কখনো কখনো মহামারী আকারে।

কাহারেরা দুই গোত্রে বিভক্ত: বেহারা কাহার এবং আটপৌরে কাহার। এখন কাহারদের দুগোত্রই সম্পন্ন সদগোপদের জমিচাষ করে। কেউ ভাগ জোতদার, কেউ কৃষাণ। যুদ্ধ, বন্যা, মহামারী ইত্যাদির কারণে ধান, চাল আলুগুড় তরকারির দর চড়লে কিংবা পরিধেয় বস্ত্র দুর্মূল্য হওয়া নিয়ে কাহারদের ভাবনা নেই। ধান চালগুলির দাম বাড়লে তাদের কিছু লাভ বা ক্ষতি নেই। তারা মনিবের ক্ষেত্রে খেটে খায়। ফসলের তিনভাগের একভাগ পায়, তাও দু-মাস খেতে না খেতেই ফুরিয়ে যায়- বাকি ছ মাস মনিবের কাছে 'দেড়ী'তে ধান নেয়, বেচার মত ধান চাল তাদের থাকে না। তারা শস্য বেঁচেও না কেনেওনা। বাড়ির আনাচে কানাচের শাকপাতা পুকুর বিল নদীর শামুক গুগলি মাছ ধরে নিয়ে আসে। কয়লার দাম বাড়লেও সমস্যা নেই। কারণ কাহাররা কয়লা পোড়ায় না। নদীর ধারের ঝোপ ঝাড় থেকে কাঠকুটো কুড়োয় তারা। গরুর গোবর ঘেঁটে ঘুঁটে দেয়। কিছু নিজেরা পোড়ায় বাকীটা দূরবর্তী ভদ্রগ্রাম চন্দনপুরে বিক্রি করে। তবে কাপড়ের দর চড়লে কিছুটা সমস্যা তাদের হয়। পুরুষের গায়ে বছরে চাষের ছ'মাস কাপড় থাকেই না, গামছা পরেই অর্ধেক দিন কাটে, বাকি ছ'মাস- ছ-হাত মোটা কাপড় পরে কাটে। মেয়েদের বছরে চারখানা কি তিনখানা কাপড় হলেও স্বচ্ছন্দভাবে চলে যায়। তবে তারা 'একটুকুন' সাজগোজ করতে ভালোবাসে বলে দু' একখানা মিহিফুলপার শাড়ি তাদের চাইই। আর মিহি কাপড়ের পয়সাও ঘরের কর্তাকে জোগাতে হয় না। মেয়েরা নিজেরাই ওই পয়সা রোজগার করে নেয়। রোজ খেটে, ভদ্রজনের কাছ থেকে চেয়ে তারা ওই পয়সা জোগাড় করে।

কুঠিয়াল সাহেবদের সময় থেকেই কাহার নারীরা মনে 'রঙ' ধরলেই তারা স্বামীকে ছেড়ে মনের মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। ওই নারীরা কাউকে ভালোবাসলে লোকলজ্জা, গুরুজন ও সমাজের ভয় কিংবা সমাজের ঘৃণার কথা ভেবে ওই ভালোবাসা গোপন রাখে না। তাদের কেউ কেউ রক্ষিতা থাকে, অনেকে

Dhaka University Institutional Repository

কুল ত্যাগ করে পেশাদার পতিতায় পরিণত হয়। এসব কারণে সমাজে নিন্দা হয়, তবে এ-ব্যাপারকে ওই সমাজ অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করে না। যেমন, স্বামীর কারাবাসকালীন সময়ে আটপৌড়ে বেহার মাতবর পরমের স্ত্রী-কালোশশী চন্দনপুরের বাবুদের হিন্দুস্হানী বরকন্দাজ ভূপসিং-এর রক্ষিতা হিসেবে থাকে। পরম ফিরেএসে কালোশশীকে সহজেই ঘরে ফিরিয়ে আনে। উচ্চবর্ণের, ক্ষত্রীগোত্রভুক্ত ইতে সমুলিত বাবুদের বরকন্দাজের প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠায় কালোশশীকে ওই সমাজ বেশ সমীহের চোখে দেখতে থাকে। কাহার কন্যা বসন্ত আটিলের চৌধুরী বাড়ির পুত্রের রক্ষিতা হয়ে সন্তানবতী হয়ে ওঠে। শোভন দেখাবার জন্য একটি পঙ্গু অথর্ব কাহার তরুণের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু সন্তানটি জন্মায় চৌধুরীপুত্রের গড়নে। এ নিয়ে সন্তান ও জন্মদাত্রী কারো মনেই গ্লানি জাগে না। ভালোবাসার মানুষের জন্য শিশুপুত্রকে ফেলে দেশান্তরী হয় করালীর মা। কোনো মমতা কিংবা পিছুটান বোধ করে না ওই কাহার নারী। কাহার পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে কাহার নারীও খেটে খায়। কাহার পাড়ার মেয়েরা জাড়লে সদগোপচাষীদের বাড়িতে ভোরবেলায় গিয়ে গৃহস্হালীর কাজকর্ম শুরু করে, ক্ষেত্রে মজুরের কাজ করে। কাহার বৃদ্ধারা যারা মজুরনী খাটতে পারে না, তারাও বসে খায় না। তাদের 'পিত্রিপুরুষের নিয়ম এই, যেমন গতর তেমনই খাটতে হবে। তারা দুপুরবেলা গোরু-বাছুর ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে যায়। কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে, কাস্তে নিয়ে চলে যায় হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে- কোপাইয়ের অপর পারে গোপের পাড়ায় 'মোষদহরী'র ঝিলে ঘাস কাটতে।'[৫৪]

কাহারদের পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস হচ্ছে সম্পন্ন গৃহস্হদের আশ্রয় করে জীবনকাটিয়ে দেয়া, ক্রীতদাসের মতো মনিবের শাসন প্রহার অবিচার সহ্য করা। চাষাবাদ করে খাদ্য জোগানো আর অনটনের সময়ে মনিবের কাছ থেকে সুদে ধান ঋণ করা ছাড়া অন্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা তাদের 'পিতিপুরুষের বারণ।' তারা মেনে চলে প্রথা: 'পিতিপুরুষে বলেগিয়েছেন - আশা করবি লক্ষ্মীমন্তকে, মা লক্ষ্মী মনিবের ঘরে ঢুকবেন, মনিবের উঠানে মায়ের পায়ের ধুলো অবশ্যই পড়বে, তাই কুড়িয়ে মাথায় করে আনবি, তাতেই তোর 'সোগুষ্ঠির প্যাট' ভরবে। এতটুকু মিথ্যে নয় পিতি পুরুষের কথা।'[৫৫] নতুন জমিতে প্রথম ফসল উঠলে

---

৫৪. "হাঁসলীবাঁকের উপকথা" (তারাশঙ্কর রচনাবলী, সপ্তমখন্ড) পৃ: ২০৫।

৫৫. ওই, পৃঃ ২৪৩।

তারা ফসলের ভোগ দেয় নিজেদের দেবতা বাবাঠাকুরের থানে, মুগসিদ্ধ চরবটি সিদ্ধ আর একবোতল পাকিমদ। মদ ওই জীবনে আনন্দ উৎসবের প্রধান পানীয়। তারপর ফসলের ভোগ দিয়ে আসে জাঙাল গ্রামের কালারুদ্র দেবতার পুরোহিতকে; পাঠায় মনিবের বাড়িতে। মুনিব বাড়িতে দেয়ার পর যদি থাকে তবে পাড়ার সবঘরে এক মুঠো করে পাঠিয়ে দেয়। এই ই ওই সমাজের প্রথা, পরকালের পুণ্য সঞ্চয়ের উপায়ও এটি।

কাহারপাড়ার বাতাসে গোবরমাটির গন্ধ গরুর গায়ের গন্ধ ধানের গন্ধ, কাঠ- ঘুঁটে পোড়ার গন্ধ, সারগাদার গন্ধ পচাই মদের গন্ধ, বাড়ির আশে পাশের বাবুরি তুলসী গাছের গন্ধ মিশে বাতাসকে জমাট ভারী করে রাখে। কাহার পাড়ায় যে রাত্রি নেমে আসে তার সঙ্গে অন্যান্য গৃহস্থগ্রামের রাত্রির অনেক তফাৎ। ওই রাত্র ভীতি ও ত্রাস পরিপূর্ণ, নিশ্ছিদ্র গভীর অন্ধকারময়। চারপাশের বাঁশবনের তলায় জমে থাকা অন্ধকার কাহারপাড়ার রাত্রিকে ঘন ও দুর্ভেদ্য করে তোলে। তাদের মন নানাপ্রকম সংস্কার বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভূতপ্রেতেও আছে গভীর বিশ্বাস। সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাককে মনে করে দেবরোষ, ক্রুদ্ধ দেবতার দেয়া শাস্তি। তাদের জীবনে অনিষ্ট সাধনের জন্য ওত পেতে থাকে রাত্রিভরে অশুভ শক্তিরা। ওই জীবনেও আসে ঋতুতে ঋতুতে নানা ধর্মীয় উৎসব। ছেলে ছোকরারা ঢোল বাজিয়ে গায় ধর্মরাজের বোলান, মনসার ভাসান, ভাদ্রমাসে ভাদু ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা দশভুজার পূজায় গায় পাঁচালী। কার্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীতের সময় গান বাজনার আসর ঝিমিয়ে পড়ে। শীতে ধানকাটা, ফসল তোলা শেষ হলে চৈত্রে নতুন করে বসে ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের পালা। বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক উৎসবে রাত্রিভরে চলে মদ্যপান, গানবাজনা নাচের হুল্লোড়। কাহার পাড়া ঢোলকাসি সানাই এর সুরে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তেল হলুদ রঙ নিয়ে হুল্লুড়িয় মাতামাতি। থাকে 'প্রচুর মদ, বড় বড় হাঁড়ি থেকে বাটি ভরে তুলে দিচ্ছে একজন, সকলে আকণ্ঠ পান করছে।'[৫৬]

---

৫৬. ওই, পৃঃ ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

কুসংস্কার, ভীতি, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, দেবরোষের শঙ্কায় সর্বদা তটস্থ কাহারেরা। যা কিছু আকস্মিক ভাবে ঘটে তাকে দৈব, অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী বলে গ্রহণ করে। খুঁতো পাঠা বলিদানের অপরাধ খণ্ডনের জন্য আরেকটি নিখুঁতে পাঠা বলিদান করে প্রতিবিধানের জন্য তৎপর হয় তারা। সেই সঙ্গে নতুন জমি পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে কর্তাঠাকুরকে আগামতুষ্ট করার জন্য আর একটি পাঁঠা জুড়ে দেয়। বাবাঠাকুরের পূজা হয় মদে মাংসে, ফুলে বেলপাতায় আতাপ চিনিতে, তেলে সিঁদুরে, কাপড়ে দক্ষিণায়। কোপাইয়ের তীরে শিস দিয়ে চলা অজগর তুল্য চন্দ্রবোড়া সাপটিকে কাহার তরুণ কাপালী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। কাহারকুল ভয়ে আতঙ্কে হিম হয়ে যায়। এই চন্দ্রবোড়াটিকে বাবার বিচিত্র বর্ণ বাহন বলে মনে করতে থাকে এবং কর্তার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপে কাহারকুলের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে বলে মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অর্থনৈতিক চাপে বিপর্যস্ত হয় কাহারদের জীবন। দুর্দশাগ্রস্ত কাহার নারী-পুরুষকে করালী চন্দনপুরের বিভিন্ন কারখানায় কাজ জুটিয়ে দেয়। বর্ষীয়ান মোড়ল বনওয়ারী কাহারদের ওই কাজে যেতে বারণ করে, কারণ 'পিতিপুরুষের বারণ আছে দক্খিনে যেতে'। ওই বারণ কেউ মানে না। করালী বনওয়ারীর দ্বিতীয় স্ত্রী সুবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুবাসী গরুবাছুর বিক্রী করে অসুস্থ স্বামীকে ফেলে করালীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। করালীর স্ত্রী পাখী আত্মহত্যা করে। কাহারদের মুনিব জাঙ্গালের ঘোষ বাবু যুদ্ধকালে চড়াদাম পাবার সুযোগ পেয়ে কাহারপাড়ার বাঁশঝাড় ও জঙ্গল বিক্রি করে দেয়, উজাড় হয়ে যায় কাহার পাড়ার গহীন বনভূমি, কাহাররা সবাই পরিণত হয় কারখানার শ্রমিকে। বনওয়ারী দীর্ঘদিন রোগে ভুগে মারা যায়। কাহারপাড়ার চারপাশের প্রাচীন বৃক্ষরাজি ও বাঁশবন উজাড় হয়ে গেলে এবং কাহারদের সবাই চন্দনপুরে শ্রমিকের জীবনযাপন করা শুরু করলে কাহারপাড়া পরিত্যক্ত পোড়ো গ্রামে পরিণত হয়। এমনসময় একদিন কোপাই নদীর প্রবল বান ভাসিয়ে নিয়ে যায় কাহারপল্লী। বানের পর কাহারপাড়ার ভূমি বালিময় বিরান প্রান্তরে পরিণত হয়। আর শ্রমিক কাহাররা পরিণত হয় নতুন মানুষে, তারা চন্দনপুরের কারখানায় খেটে ও না খেয়ে মরে, রোগে মরে। সাপের কামড়ের বদলে কারখানায় কাটা পড়ে মরে। কিন্তু তার জন্য আর তারা দেবতা 'বাবাঠাকুর'কে ডাকে না। অনেকদিন পর বাশবাঁদির বাঁধের বালি ফুঁড়ে বাঁশের কোড়া মাথা তোলে, কচিঘাসে ছেয়ে যায় বিরান প্রান্তর। করালী গাইতি হাতে ছুটে যায় বালি খুঁড়তে। বালি সরিয়ে মাটি বের করে সে নতুন কাহারপাড়া গড়ার সঙ্কল্প নেয়।

এ-উপন্যাসে তারাশঙ্কর একটি আদিম জনগোষ্ঠীর জীবন সংস্কৃতি বিশ্বাস ধর্মবোধ উপস্থাপন করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

অবিকল উপস্থাপনার রীতিতে। তিনি তাদের জীবন পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বিশেষ কোনো ব্যক্তির উপন্যাসের বদলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর একধরনের নৃতাত্ত্বিক বর্ণনাও বলা যেতে পারে। তারাশঙ্করের "নাগিণীকন্যার কাহিনী"ও এ-ধরণের উপন্যাস, তবে সেটিতে সম্পূর্ণ কল্পিত জীবন ও ভূখণ্ডকে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতা রূপে উপস্থাপিত হয়। উপন্যাসটি পুস্তকাকারে সম্পূর্ণরূপে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৯(১৯৫১)-এ। এজন্য উপন্যাসটি আলোচিত হলো না, অদ্বৈত মল্লবর্মনের "তিতাস-একটি নদীর নাম" একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিকতাবাদী উপন্যাস। উপন্যাসটির অংশ বিশেষ "মাসিক মোহাম্মদী" পত্রিকার ১৩৫২-এর শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যায় বেরুলেও উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থাকারে বেরোর ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে, তাই এটিও আলোচিত হলো না।

Dhaka University Institutional Repository

স প্ত ম প রি চ্ছে দ

উদ্ভ্রান্ত – অস্থির ও কামনা-বিকার ঘোরগ্রস্ত জীবনের বিচূর্ণ বাস্তবতা

এ-পরিচ্ছেদে আলোচিত উপন্যাসগুলোই সূচনা করেছিলো আধুনিক বাঙলা উপন্যাস ধারার এবং সৃষ্টি করেছিলো প্রবল বিতর্কের। অনেকে এগুলোর বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ উত্থাপন করেন ।[১] এ-শ্রেণীর উপন্যাস ব্যক্তি প্রধান । বাহ্যবাস্তবতার বিস্তৃত ও স্বাভাবিক উপস্থাপনের বদলে এ-শ্রেণীর উপ-ন্যাসে প্রধান চরিত্রদের আবেগতাড়িত জীবন উপস্থাপিত করা হয়েছে । এই ব্যক্তিদের দুটিভাগে ভাগ করা যায়, – একভাগে রয়েছে উদ্ভ্রান্ত অস্থির আবেগ তাড়িতরা, যারা সবাই তরুণ । তাদের বয়স মোটামুটি আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে । অন্য ভাগে রয়েছে কামনাবিকারঘোরগ্রস্ত ব্যক্তিরা, যারা প্রায় সবাই তিরিশোর্ধ্ব । প্রথম শ্রেণীর নায়কেরা জীবন অনভিজ্ঞ ও অস্বাভাবিক, বলা যায় তারা এখনো জীবনে প্রবেশ করেনি । তারা প্রথাগত জীবনকে, বাহ্যবাস্তবতাকে নিজেদের প্রতিবন্ধকরূপে দেখে এবং ব্যক্তিগতভাবে যাপন করে আবেগ তাড়িত ঘোরাচ্ছন্ন, অস্থির জীবন । প্রথাগত জীবনের সঙ্গে তারা খাপে খাপে মেলে নি, এদের খাপনা খাওয়া মানুষ বলা যায় । সমাজের প্রথা নিয়ম শৃঙ্খলা স্বাভাবিক জীবন যাপনকে তারা গ্রহণ করে নি, বরং ওই জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে তারা নিজস্ব সূত্রে চালিত জীবন যাপন করে থাকে । এদের উদ্ভ্রান্তির পেছনে একটি প্রধান শক্তি রূপে কাজ করে থাকে অবদমিতকাম । এরা অনেকেই সৃষ্টিশীল । সাহিত্যকে তারা নিজেদের জী-বনরূপে গ্রহণ করে । এরা সবাই প্রেম থেকে প্রেমে ছুটে চলে । কোনো এক শাশ্বতী যেন এদের অনিষ্ট, তাই তারা কোনো বিশেষ প্রেমের সম্পর্কে স্থির থাকতে পারে না । এই সমস্ত চরিত্র অনেকটা লেখকদের ব্যক্তিগত-চরিত্রের সম্প্রসারণ । উদ্ভ্রান্ত অস্থির নায়কসম্পন্ন উপন্যাসসমূহের পটভূমি সাধারণত নগর, তবে ওই নগরজীবনের উপস্থাপন এ-শ্রেণীর উপন্যাসে প্রধান হয়ে ওঠে না । ওই বাস্তব জীবন যতোটা উপস্থাপিত হয় তাও উপস্থাপিত হয় ওই চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে । ওই চরিত্রেরা যেভাবে বাস্তবতাকে দেখে সেভাবে বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়ে থাকে ।

---

১. এ-প্রসঙ্গ বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে ৪.৩,৪.৪,৪.৭ পরিচ্ছেদাংশে।

Dhaka University Institutional Repository

আর এই কামনা ঘোর বিকারগ্রস্ত নায়কেরা জীবনবিমুখ। বাহ্যজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও তারা বাস করে ব্যক্তিগত গুহায়। এরা অনেকটা স্থবির জীবন যাপন করে। এ-শ্রেণীর উপন্যাস যেহেতু ব্যক্তির উপন্যাস, তাই বাহ্য বাস্তবতার অবিকল ও বিস্তৃত উপস্থাপন লেখকদের লক্ষ্য নয়। এ-শ্রেণীর উপন্যাসে সমাজজীবন, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি গৌণ হয়ে গেছে, প্রধান হয়ে উঠেছে চরিত্রদের উদভ্রান্তি-অস্থিরতা ও কামনা-বিকার ঘোর। বাস্তবতা উপস্থাপনার যে সামঞ্জস্যতত্ত্ব রয়েছে, এশ্রেণীর উপন্যাসে বাস্তবতা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ওই রীতিটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঔপন্যাসিকেরা সচেতনভাবে ওই রীতির প্রয়োগ করেন নি, কিন্তু তাঁরা যে-ভাবে বাস্তবতাকে দেখেছেন, তাঁদের ওই দৃষ্টিভঙ্গীটি হয়ে উঠেছে সামঞ্জস্যতত্ত্ববাদীদের অনুরূপ। সামঞ্জস্যতত্ত্ব রীতিতে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা করা হয় না, এখানে স্রষ্টার মন যেভাবে বাস্তবতাকে দেখে সেরূপেই বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়। বাস্তবতাকে দেখার এই রীতিটি রোম্যান্টিকদের সৃষ্টি। এরীতির অন্যনাম প্রদীপতত্ত্ব। মনকে এখানে প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ওই প্রদীপের আলোয় বাস্তবতা যেরূপে উদ্ভাসিত হয় রোম্যান্টিকেরা রচনায় তারই উপস্থাপন করেন। উদভ্রান্তি-অস্থিরতা ও কামনা-বিকার-ঘোরের বাস্তবতাবাদীরা বাস্তবতাকে দেখেছেন পাত্রপাত্রীদের মনের আলোয়। ওই আলোতে বাস্তবতা যেরূপে ধরা পড়েছে, উপন্যাসে বাস্তবতার সে-রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন অস্থির ও উদভ্রান্ত মানুষের ইতিবৃত্ত। তাঁর নায়কেরা প্রত্যেকেই তরুণ, তারা যাযাবরের মতো ছুটে চলে এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে। কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বসে না। কখনো অধরা চিরন্তনীর সন্ধানে তারা এক নারী থেকে অন্য নারীতে ছুটে চলে, কখনো তাদের তাড়িয়ে ফেরে অচরিতার্থ কাম। তার নায়িকারাও একইরকম উদভ্রান্ত অস্থির। তারা যা পায় তা তাদের কাম্য নয়। অধরা সুদূর কাম্যকে পাবার জন্য তারাও অস্থির হয়ে ছুটে চলে। এই ঘোর আবেগ অস্থিরতাই তাদের জীবনে চরম বাস্তব। অচিন্ত্যকুমারও এই আবেগ অস্থিরতাকেই বাস্তবতা বলে গণ্য করেন আর বাস্তবতা তাঁর কাছে গণ্য হয় গৌণ ব্যাপার রূপে। তাই তিনি পাত্রপাত্রীদের বিচিত্র আবেগ ভাবালুতার বিশদ বর্ণনা দেন অতিউচ্ছ্বসিত ভাবে। তার উপন্যাসে বাস্তব পটভূমি সংকীর্ণ নয় কিন্তু ওই পটভূমির বিশেষ কোনো মূল্য নেই।

Dhaka University Institutional Repository

"বেদে" (১৩৩৫) এক উদভ্রান্ত যাযাবরধর্মী তরুণের ইতিবৃত্ত। ছিন্নমূল কাঞ্চনের নয় বছর বয়স থেকে একুশ-বাইশ বছর বয়সের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। নিরাশ্রয় বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ কাঞ্চন ছুটে বেড়ায় এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে। কোনো বন্ধন নিবিড় করে বাঁধে না তাকে, কোথাও নোঙর ফেলে না তার সত্তা। বিভিন্নজনের সঙ্গে সে মিশেছে, দুঃখ পেয়েছে, বিভিন্ন নারীকে আকাঙ্ক্ষা করেছে, চরিতার্থ হয়নি। তারআকাঙ্ক্ষা তার পর এক সময় সে আবার একাকী পথে নেমেছে। বেদুইনের মতো সে ভেসে চলেছে, মুখোমুখি হয়েছে বিচিত্র বাস্তবতার। দেখেছে জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্যপূর্ণ, পাপ ও ক্লেদ আকীর্ণ রূপ; দেখেছে বিচিত্র ধরনের মানুষের বিচিত্র কামনা-আবেগ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অবস্থানের বিভিন্ন নারী তাকে আকৃষ্ট করেছে। ওই নারীদের প্রেম কিংবা সামান্য মনোযোগ পাবার জন্যেও সে করেছে দুস্তর সাধনা, কখনো করেছে দুঃসাধ্য কর্ম। কিন্তু দেখা গেছে ওরা নারীদের প্রত্যেকেই ওই একনিষ্ঠ নিবেদনের দিকে ফিরেও তাকায় নি। তারা মগ্ন থাকে নিজেদের অন্ধ আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ও নিজের পছন্দের মানুষটিকে নিয়ে। তারা কাঞ্চনকে বড়োজোর করুনা করে- এর বেশি কিছু নয়। অতৃপ্তি ও অস্থিরতা আবার তাকে তাড়িয়ে নেয় পথে, সে ছুটে চলে পথ থেকে পথে, এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে। ওর লক্ষ্য 'নানান ভাবে জীবনটাকে বাজিয়ে যাই। একটা-একটা করে তার ছিঁড়ুক'।[১] দৈহিক ভাবে কাঞ্চনশক্ত সবল, কঠোর পরিশ্রমে সমর্থ, স্বাস্থ্যবান এক তরুণ। কিন্তু অন্তরে সে ভিখিরির মতো কাঙাল, সে নারীদের প্রেম দয়ার কাঙাল। সে নারীদের কাছে প্রেম চায়, নারীরা তাকে উপেক্ষা করে, নারীরা তাকে ব্যবহার করে কিন্তু ভালোবাসে না। কাঞ্চনের দয়িতারা প্রত্যেকেই তার জীবন থেকে সরে গেছে; বিচ্ছেদ এসেছে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে, অন্যপুরুষের সঙ্গে বিবাহের ফলে, অনেক বিচ্ছেদ ও শূণ্যতার শোক বুকে নিয়ে কাঞ্চনপথে নেমেছে। কাঞ্চনভালোবেসেছে ছটি নারীকে- আহলাদী, আসমানী, বাতাসী, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না ও মৈত্রেয়ীকে। অবস্থান প্রতিবেশ ভিন্ন হলেও মনোজগতে এরা প্রত্যেকে অভিন্ন রহস্যময়তা ধারণ করে। নারীর প্রতি কাঞ্চনশুধু প্লেটোনিক ভালোবাসা বোধ করে না, আছে স্পর্শের বাসনাও। কোনো না কোনো ছুতোয় দয়িতাকে স্পর্শ করে তৃপ্ত হতে চায় কাঞ্চনের শরীর ও মন। প্রিয় নারীর ঝকঝকে চটিজোড়া নিজের বাক্সে তুলে রেখে দয়িতাকে কাছে পাবার সুখ পায় সে, কিংবা বাতাসির মুখের হুঁকো না মুছেই মুখ লাগিয়ে তাকে স্পর্শের সুখ পেতে থাকে।

---

১. "বেদে" (অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, প্রথমখন্ড) পৃঃ ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

কাঞ্চনের জীবনের উদভ্রান্তি উপস্থাপনই এ-উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। তবে কাঞ্চন যেহেতু ভাসমান তাই সে জীবনের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় উপনীত হয়েছে। এতে সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে একই সংক্ষিপ্ত জীবনে যাপন করেছে কয়েকটি জীবন; সে মফস্বলের বস্তির জীবন যাপন করেছে, গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ভূমি শ্রমিকের জীবন যাপন করেছে, কলকাতার বস্তিতে বাস করেছে, ট্রামের কন্ডাকটরের জীবন যাপন করেছে, ধনী চাকুরীজীবীর গৃহে গৃহভৃত্যের জীবন যাপন করেছে, এমনকী সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের জীবনও যাপন করেছে। উপন্যাসটিতে হারমান হেসের "সিদ্ধার্থ" উপন্যাসের প্রভাব রয়েছে, তবে কাঞ্চন সিদ্ধার্থের মতো কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করে নি। তবে জীবন সম্পর্কে যে ধারণা সে বোধ করেছে তা হচ্ছে জীবন ক্লেদাক্ত। কাঞ্চনের জীবন আশ্রয় করে এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে বাস্তবজীবনের ক্লেদময় রূপ, কাঞ্চন যার বেদনার্ত উদভ্রান্ত দর্শক।

"আকস্মিক" (১৩৩৬) উপন্যাসের পটভূমি : গ্রাম এবং শহর : তবে পটভূমির বিশদ বিবরণ দানের চেয়ে লেখকের লক্ষ্য ব্যক্তিকজীবনের বাস্তবতা এবং মনোগত আকাঙ্ক্ষা-কামনা- দ্বন্দ্বের উপস্থাপন। ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস এ-জীবনে খুবই বেশি। উপন্যাসটির প্রথম অংশে পঞ্চুর চারপাশের গ্রামীন জীবনের বিভিন্ন ব্যক্তির গার্হস্থ্যবৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে, ওই জীবনের চারপাশে পরিভ্রমণরত পঞ্চু। দ্বিতীয় অংশে প্রধান হয়ে ওঠে পঞ্চুর জীবন। জমিদারের অবৈধ সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে এক-বৃষ্টির ভোরে মারা যায় গৌরি বোষ্টমী। মৃতপ্রায় সদ্যজাত শিশুকে পথে কুড়িয়ে পেয়ে ঘরে নিয়ে আসে শশীকুমোর। সন্তানহীন নিস্তারিনী ওই শিশুটির নাম রাখে রাখহরি। গ্রামের সবাই ওই জারজ শিশুটিকে পরিত্যাগের পরামর্শ দিলেও শশী তাকে লালনপালন করে। গ্রামের সবাই শশীকে গৌরীর সঙ্গে জড়িয়ে অপবাদ রটাতে থাকে। শশীর পক্ষে থেকে শুধু যাত্রাদলের গায়েন পঞ্চু। কলেরায় নিস্তারিনীর মৃত্যু হলে পঞ্চু তার দূর সম্পর্কের বোন দামিনীর সঙ্গে শশীর বিবাহের সম্বন্ধ করে। কামিনী শশীর পালিত পুত্রটিকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, নানাভাবে যন্ত্রনা দিতে থাকে। দামিনী পঞ্চুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। তাকে খেতে দেয়, তার গান শোনে, এমনকি গহীন রাতে মাতাল পঞ্চুর গলা জড়িয়ে তার সঙ্গে চলে যাবার প্রস্তাবও দেয়। ক্রুদ্ধ শশী গলাটিপে দামিনীকে হত্যা করে কড়ি-কাঠে ঝুলিয়ে রেখে মধ্যরাতেই গ্রাম ছেড়ে চলে যায় রাখহরিকে সঙ্গে নিয়ে। পঞ্চু ভোরবেলায় শশীর বাড়িতে এসে দামিনীর আত্মহত্যার সংবাদ জানতে পারে। বেদনা ও অস্থিরতায় পঞ্চু ছুটতে থাকে।

উদভ্রান্ত পঞ্চু একসময় নিকটতবর্তী শহরের উপকণ্ঠের মেলায় এসে পৌঁছে। শশীও রাখহরিকে নিয়ে মেলায় এসেছিলো। মেলার অবৈধ ক্রিয়াকলাপের বিরোধী তরুণেরা মেলার প্যান্ডেল ও দোকানে আগুন ধরিয়ে দিলে ভস্মীভূত হয় দোকানপসার-দেহোপজীবিনী নারীদের অস্থায়ী গৃহ ও দ্রব্যসামগ্রী, সেই সঙ্গে তারাও অগ্নিদগ্ধ হয়। পঞ্চু রাখহরিকে অসহায় অবস্থায় মেলায় খুঁজে পায়, কিন্তু শশীর কোন খোঁজ পায় না। রাখহরিকে নিয়ে গ্রামের পথে পা বাড়াবার সময় সে দেখে অগ্নিদগ্ধ পতিতাদের মধ্যে রয়েছে তার একসময়ের প্রেয়সী ও বন্ধু পত্নী কুঞ্জ। পঞ্চু কুঞ্জকে নিজের গৃহে নিয়ে আসে। কুঞ্জ পঞ্চুর সঙ্গে এসেছিলো মূলতঃ তার স্বামী নিকুঞ্জের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য, তাকে একনজর দেখার জন্য। গৃহ ও স্বামী ত্যাগ করে গিয়ে পতিতা হিসেবে সে প্রসিদ্ধি লাভ করে, বিস্তর ধনও অধিগত হয়। তবুও কখনো তার মন উন্মুখ হয়ে উঠতো স্বামী নিকুঞ্জকে দেখার জন্য। পঞ্চুর গৃহে গৃহলক্ষ্মী হয়ে অধিষ্ঠানের কোন বাসনা তার ছিলো না, কারণ ওই সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের চেয়ে নগরের চাকচিক্যময় স্বাধীন পতিতার জীবনই তার কাছে আকর্ষণীয়। অন্যদিকে কুঞ্জকে গৃহে এনে পঞ্চুর মন গৃহী ও সুখী হয়ে উঠতে চায়। কুঞ্জকে চায় স্ত্রী করে নিতে, ভালোবাসা ও সচ্ছলতাপূর্ণ একটি পারিবারিক জীবন গড়ে তুলতে চায় সে। ছলনায় পারঙ্গম কুঞ্জ একরাতে ঘুমন্ত পঞ্চুকে এড়িয়ে পথে নামে। স্বামীর গৃহে পৌঁছে দেখে ওই ভিটে পোড়ো- জনশূণ্য। কারণ নিকুঞ্জ বহুদিন আগেই মারা গেছে। কুঞ্জর সে খবর জানা ছিল না। স্বামীভিটে দেখা হলে কুঞ্জ কালকাতকাগামী ট্রেনে চাপে। পঞ্চু ইত্যবসরে ষ্টেশনে এসে কুঞ্জকে দেখে ফেলে এবং রাখহরিকে নিয়ে সেও ট্রেনে চাপে। কুঞ্জ পঞ্চুকে পতিতাপল্লীতে নিয়ে কৌশলে বিতাড়িত করে, কিন্তু ছেলেটির প্রতি তার বাৎসল্যবোধ জন্মে। সে খদ্দের গ্রহণ থেকে বিরত থাকে ওই পুত্রের জন্য। একদিন অনন্যোপায় হয়ে এক খদ্দেরের সঙ্গে মোটরবিহার শেষে ফিরে এসে দেখে, মায়ের সঙ্গে যেতে না পারার ক্ষোভে রাখহরি কুঞ্জর দামী সমস্ত পোশাক আগুনে পুড়িয়েছে। মাতাল ও ক্রুদ্ধ কুঞ্জ প্রহার করে রাখহরিকে ঘরের বার করে দেয় এবং শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে ওঠে জানতে পারে শহরের বিশাল জনসমুদ্রে রাখহরি মিশে গেছে। তার চিত্তে জাগে অনুতাপ, তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে মাতৃসত্তা। রাখহরির ফিরের আসার জন্য সে যেন তপস্যা শুরু করে। খদ্দের ধরা থেকে বিরত থাকে, ক্রমশ অনাহার অসুখ তাকে জীর্ণ করে তোলে। নিঃস্ব কুঞ্জ তখন ঠাঁই নেয় অন্ধকার সস্তা একটি কক্ষে। মনস্তাপ ও প্রতীক্ষাকাতর এক নারীতে পরিণত হয় সে। এক সন্ধ্যায় তার সামনে এসে দাঁড়ায় পঞ্চু, সে ইতিমধ্যে নানা দুর্নীতির মধ্য দিয়ে কুঞ্জকে একবেলা লাভ করার জন্য অর্থ সঞ্চয় করেছে। অসুস্থ জীর্ণ কুঞ্জকে দেখে

ফিউরে ওঠে উদভ্রান্তের মতো পালিয়ে যায় পঙ্কজ। অন্যমনস্কভাবে হেঁটে যাবার সময় একটি গাড়ীর নীচে পড়ে সে মারা যায়। টাকাকড়ি দিতে না পারার কারণে বাড়িউলি কুঞ্জকে পতিতাপল্লী থেকে তাড়িয়ে দেয়। অনাহারক্লিষ্ট কুৎসিত কুঞ্জ পথে নামে। "আকস্মিক" উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা রয়েছে, তবে সব ঘটনা বাস্তবসম্মত রূপেও উপস্থাপিত হয় নি, মনে হয় উপন্যাসের প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমাংশে পল্লীসমাজ-জীবনের যে-বর্ণনা রয়েছে, তা অনেকখানি বাস্তবের বিশ্বস্ত উপস্থাপন, কিন্তু যখন পঙ্কজ এবং কুঞ্জের আখ্যান প্রধান হয়ে ওঠে, যেখানে পতিতার জীবন বর্ণিত হয়, সেঅংশ লঘু উপন্যাসধর্মী। অবশ্য পল্লীসমাজ বা নিষিদ্ধপল্লীর জীবন উপস্থাপন প্রধান ব্যাপার নয় এ-উপন্যাসে, পঙ্কজের প্রবল প্রেমাবেগ ও কুঞ্জের মাতৃত্ব বোধের অতিশায়িত উপস্থাপনই এখানে প্রধান। লেখক দেখাতে চেয়েছেন বিলাসব্যসনে আসক্ত উঁচুদরের এক পণ্যনারীও একসময় হয়ে ওঠে ত্যাগতিতিক্ষাময় জননী। লাভক্ষতির হিসেব, নগদপ্রাপ্তি, বিলাসব্যসন সমস্ত কিছুই বাৎসল্যবোধের কাছে নগণ্য ও অর্থহীন হয়ে যায়। পণ্যনারীর ভেতর এক স্নেহময়ী জননীর আবির্ভাব দেখানোই লেখকের লক্ষ্য। তবে লেখকের বর্ণনা ভাবালুতাপূর্ণ, তাই এর সবকিছু ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অচিন্ত্যকুমারের "বিবাহের চেয়ে বড়ো" (১৩৩৮) উপন্যাসে দুজন তরুণ তরুণীর যেজীবন উপস্থাপিত হয়েছে তা ওই সময়ের জন্য স্বাভাবিক নয়; একটি বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্যই এই কাহিনী রচিত হয়েছে। বক্তব্যটি হচ্ছে প্রেম বিয়ের চেয়ে অনেক বড়ো। এ-উপন্যাসের নায়ক প্রভাত, বি, এ পাশ নিম্ন মধ্যবিত্ত তরুণ, পেশায় কেরাণী এবং নায়িকা অশ্রু বি,এ পাশ, ধনীর কণ্যা। তারা আকস্মিকভাবে সম্পর্কিত হয়, প্রেমে পড়ে, কিন্তু তারা ওই প্রেমকে বিয়েতে পরিণত করতে সম্মত হয় না। কারণ প্রথাগত যে বিয়ে তারা দেখেছে তা হচ্ছে 'উদয়াস্ত একসঙ্গে থেকে পরস্পরকে ক্ষয় করে ফেলা। অবারিত সান্নিধ্যই তো অনাদরের হেতু। অভ্যাস থেকেই শৈথিল্য, বিমুখতা। রক্তের মধ্যে জরার প্রবেশ।'[২] তারা চায় 'বন্ধুতা - স্ত্রী পুরুষে বন্ধুতা একসঙ্গে সংসার না করেও বন্ধুতা।

---

২. বিবাহের চেয়ে বড়ো (অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী), পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

সজ্ঞান, সক্রিয়, সংযত বন্ধুতা।'[৩] কারণ 'এই বন্ধুতায় জরা নেই, বার্ধক্য নেই, নেই ক্ষয়তয়। আকাঙ্ক্ষা সবসময়ই অনির্বাণ। পুরুষ সব সময়ই দুষ্কায়। স্ত্রী সবসময়ই স্থিরশ্রী। রক্তের মধ্যে যন্ত্রনার চিরন্তন আনন্দ।'[৪] "বিবাহের চেয়ে বড়ো" হচ্ছে নারীপুরুষের প্রথাগত মানসিক ও শারীরিক সম্পর্ককে প্রত্যাখ্যান করে নতুন মানসিক-শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ভাবাবেগপূর্ণ প্রস্তাব। উপন্যাসটি প্রথাবিরোধী। বাস্তবতার চিত্রনে অবিশ্বস্ত, ভাবাবেগ চিত্রনে অতি উৎসাহী। অচিন্ত্যকুমার যদিও প্রথাবিরোধী সম্পর্ক প্রস্তাব করেছেন, তাঁর দুই অস্থির উদভ্রান্ত নায়কনায়িকা প্রথাকে অতিক্রম করে নতুন শারীরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করেনি। ফলে তারা যে নতুন সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়েছে তা যেমন প্রথাগত, যৌনতাবোধদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ভাবালুতাপূর্ণ। তাই উপন্যাসটি নারীপুরুষের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ইশতেহার না হয়ে ভাবাবেগ উপস্থাপন হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটিতে পাত্রপাত্রীদের জীবনবাস্তবতা বিশ্বাসযোগ্যরূপে যেমন চিত্রিত হয় নি, তেমনি নতুন সমাজবাস্তবতার কোনো রূপরেখাও নির্মিত হয় নি। প্রভাত ও অরুন্ধর বাস্তবজীবন এ-উপন্যাসে চিত্রিত হয় নি। তারা উপন্যাসে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করেছে, চিঠি লিখেছে, কথার পর কথা বলেছে, বন্ধুতা সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে অতি উচ্ছ্বসিত মত বিনিময় করেছে। এসব কিছুর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের উদভ্রান্তি, অস্থিরতা ও ঘোরগ্রস্ততা। তাদের বাস্তবজীবনের বর্ণনায় লেখক বিমুখ, আর আবেগগত জীবনের বর্ণনা অতিউচ্ছ্বসিত।

অচিন্ত্যকুমারের "কাকজ্যোৎস্না" (১৩৩৮) তিনটি অস্থির আবেগতাড়িত রোম্যান্টিক স্বপ্নঘোর আক্রান্ত তরুণ ও একটি তরুণীর উপাখ্যান। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাস ঘটনাবহুল হয়ে থাকে এবং ওই ঘটনা-রাশি উপন্যাসকে মহিমামন্ডিত করে না বরং লঘু করে তোলে। "কাকজ্যোৎস্না"-য় দেখা যায় যে যাকে চায় সে তাকে পায় না, আর যাকে পায় তাকে চায় না। এ-উপন্যাসে নমিতার বিয়ে হয় সুধীন্দ্রের সঙ্গে। রোম্যান্টিক সুধীন্দ্র বিয়ের কয়েকমাসের মধ্যে বিবাহক্লান্ত হয়ে ওঠে, কারণ

---

৩০ ওই, পৃঃ ১৫৫।

৪০ ওই, পৃঃ ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের মধ্যে সে তার রোম্যান্টিক বিরহ দীর্ঘশ্বাস দূরত্ব ও রহস্য খুঁজে পায় না। সে চায় রহস্যময়ীকে। তাই সে নিজের বন্ধু প্রদীপের সঙ্গে স্ত্রী নমিতার পরিচয় করিয়ে দেয় এবং দুজনের মধ্যে প্রণয় গড়ে উঠুক তা সে চায়। এই ঘটনাই নির্দেশ করে অচিন্ত্যকুমার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ভাবালুতাকেই বড়ো করে তুলেছেন। এরপর সুধীন্দ্রের মৃত্যু হয় এবং সুধীন্দ্রের বন্ধু প্রদীপ প্রণয় কাতর হয়ে পড়ে নমিতার জন্য, কিন্তু নমিতা কাতর হয় না। নমিতা কাতর হয় আরেক তরুণের জন্য, তার নাম অজয়। অজয় প্রথমে নমিতার প্রতি সহানুভূতিবোধ করে কিন্তু তা গভীর প্রণয় নয়। কিছুপরে নমিতা প্রদীপের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে কিন্তু তা প্রদীপকে ভালোবেসে নয়, অজয়কে ভালোবেসে। পরিশেষে নমিতা প্রদীপকে শিশুর মতো ঘুম পড়িয়ে রেখে অজয়ের সঙ্গে নৌকোয় উঠে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। উপন্যাসে নমিতার শেষ সংলাপ 'তারপর নদী জানে আর নৌকো জানে'। এ-উপাখ্যান বর্ণনার জন্য পাত্রপাত্রীদের প্রতিবেশ বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের হৃদয়ের রোম্যান্টিক কাতরতা, ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস। এ-উপন্যাসে বাস্তব জগতকেই মনে হয় অবাস্তব, পাত্রপাত্রীদের কাছে বাস্তব শুধুমাত্র তাদের কামনা ঘোর।

অচিন্ত্যকুমারের "প্রথমপ্রেম" (১৩৩৯) উপন্যাসও বৃহৎ সমাজ ও জীবনের উপস্থাপনা নয়। এর বিষয়ও এক উদভ্রান্ত, রোম্যান্টিক, লক্ষ্যহীন তরুণের ব্যক্তিগত জীবন। ওই তরুণের নাম মানব। সে বলে 'আমি স্রোতচাই, নিত্যনতুন পরিবর্তনের বেগ'[৫] স্থির প্রথাগত জীবন তাকে আকৃষ্ট করে না, বরং জীবনের একসুর থেকে আরেকসুরে অবলীলায় ভেসে যেতে চায় সে। সে তার বন্ধুকে বলে, 'আমাকে দেখে কি তোমার মনে হয় যে পৃথিবীতে আমি খুব প্রকান্ড একটা দুঃখ পেতে এসেছি? এই বেশে আমাকে মানায় না - আমি হব রাস্তার মজুর, জেলের কয়েদী, খনির কুলি। কিম্বা এখান থেকে অন্যকোথাও, অন্যকোথাও থেকে আরো দূরে।'[৬] মানবের জীবনে এ বক্তব্যটুকু প্রতিপাদন করার জন্য অচিন্ত্যকুমার "প্রথমপ্রেমে" বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে মানবের

---

৫. "প্রথম প্রেম" (অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, তৃতীয়খন্ড) পৃঃ ১১৭।

৬. ওই, পৃঃ ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

পিতার অমিতব্যয়িতা, স্বেচ্ছাচার ও জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। তারপর বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে কলকাতার এক নিঃসন্তান ধনী গৃহে মানবের অমিতব্যয়ী লক্ষ্যহীন জীবনযাপন। তার এজীবন স্থায়ী হয় না। সে ওই ধনীগৃহ থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং শুরু হয় তার নতুন জীবন, যেখানে সে যাপন করে দরিদ্র নিষ্প্রভ লক্ষ্যহীন কেরাণীর জীবন। এ-উপন্যাসে বাস্তব পটভূমি গৌণ হয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে মানবের রোম্যান্টিক ভাবালুতা এবং জীবন হয়ে উঠেছে ভাবালুতার অন্য নাম, বাস্তবজগত হয়ে উঠেছে অবাস্তব। তার মনোজগত হয়ে উঠেছে বাস্তব।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের "আগুন নিয়ে খেলা" (১৩৩৭) উপন্যাসও এক উদ্ভ্রান্ত তরুণের কাহিনী; তবে এর পটভূমি বাংলাদেশ নয়, এর পটভূমি কুড়ির দশকের ইংলন্ড। ভারতবর্ষ থেকে ইংলন্ডে উচ্চশিক্ষা নিতে যাওয়া বাঙালী তরুণ কল্যাণকুমার সোম, ব্রিটিশ তরুণী পেগী স্কট এ-উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী। ইস্টারের ছুটিতে বিলেতের নানা অঞ্চল ঘুরে দেখতে বেরোয় সোম। পথে ট্রেনে পরিচয় ঘটে খেলনা কারখানার কর্মচারী তরুণী পেগী স্কটের সঙ্গে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে তারা ঘুরতে থাকে নানা অঞ্চলে। কোথাও রাত্রিবাস জোটে, খাদ্য জোটে না। কোথাও দুজনের জন্য স্বতন্ত্র দুটি কক্ষ জোটে না, এককক্ষে নিরুপায় রাত্রিবাস করতে হয়। সোম পেগীর প্রতি ক্রমশ অনুরক্ত হয়ে ওঠে, সে পেগীকে বিয়ের প্রস্তাবও দেয়। সোম বিশ্বাস করে প্রেম বা অনুরক্তি বড়জোর দুবছর টেকে, পেগী-কেও সে নিজের এই বিশ্বাসের কথা বলে। পেগী সোমকে বিয়ে করতে সম্মত হয় না, সে চায় চিরজীবন গভীরভাবে ভালোবাসবে এমন একজন স্বামী। পরিশেষে তারা বন্ধু হয়ে ওঠে। ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ এ-উপন্যাসের জীবন যেমন বাংলাদেশ থেকে দূরবর্তী, তেমনি এতে চিত্রিত হয়েছে যে-বাস্তবতা তাও তুচ্ছ।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের "অসমাপিকা" (১৩৩৮) পুরী ও কলকাতার পটভূমিতে দুটি ভাবাবেগগ্রস্ত তরুণতরুণীর প্রেমের উপাখ্যান। এ-উপন্যাসে বাস্তবপটভূমি গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নায়ক সুচারু ও নায়িকা সুরুচির হৃদয়াবেগ, যা ভাবালুতায় পরিপূর্ণ। তাদের দু একটি সংলাপ উদ্ধৃত করলেই এ-ভাবালুতার পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন, 'ওগো! রাজকন্যা ও অর্ধেকরাজত্ব প্রসন্ন মনে ত্যাগ করলুম। এই কি আমার প্রেমের প্রমাণ নয়? প্রেম তো বাঁধে ও বাঁধা পড়ে। তাকে

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি দিলে নেবে কেন ? ওগো'—[৭] বা 'সুরুচি বজ্রবেগে নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে সুচারুর আঙুলে পরিয়ে দিলে। বললে, একজন্মের অদর্শন তো কিছুই নয়, প্রিয়তম। এই রইলো অভিজ্ঞান। সুচারু বললেন, 'এজন্মে যা তুমি অসমাপ্ত রাখলে আর জন্মে সমাপ্ত করবে ত?'[৮] এই উপন্যাসে ঘটনার পর ঘটনায় তাদের প্রেমের নানা সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে। যে-সঙ্কট প্রকৃতপক্ষে সঙ্কটই নয়। নায়ক নায়িকাকে কিছুদিন ছদ্মবেশে কলকাতার ফিরিঙ্গিপাড়ায়ও রাখা হয়েছে। নায়কের সঙ্গে পালিয়ে এসে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে একগৃহে বাস করলেও সুরুচি কখনো ভুলতে পারে নি সে হিন্দু বিবাহিত নারী। তাই সে কখনো নায়কের বাহুবন্ধনেও ধরা দেয় নি। লেখক এ-উপন্যাসে প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন যে ভালোবাসা প্রবল হলেও হিন্দুনারীর সংস্কার আরো প্রবল, সুরুচির এই সংস্কারই সুচারুর সঙ্গে মিলনের পথে প্রধান বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। যদিও সুরুচি সুচারুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে সমাজের 'বড়ো বড়ো অন্যায়গুলোর' প্রতিবাদ জানাবার জন্য, কিন্তু সে তা করে উঠতে পারে না। গৃহত্যাগের প্রাক্কালে তার মনে এমন অনুভূতি জাগে :

> তারজন্যে একটা মানুষ রাজকণ্যা ও অর্ধেক রাজত্বের মায়া কাটাবে, সে নিজের জীবনব্যাপী মিথ্যাচারের মোহ কাটাতে পারবে না। সে ধর্মত যার স্ত্রী নয় তার সঙ্গে ঘর করতে থাকবে ?
>
> মা বাবার বুক ভেঙে যাবেই। সে ভাজানকে ভয় করলে নিজের বুক ভেঙে যায়, বড়ো বড়ো অন্যায়গুলোর প্রতিবাদ বা প্রতিকার হয় না। ধর্মযুদ্ধে কতো মা-বোনের কোল খালি হয়, কতো স্ত্রীর সর্বস্ব যায় – উপায় কী।[৯]

সুরুচি, জীবনব্যাপী মিথ্যাচারের মোহ কাটাবার জন্য যদিও গৃহত্যাগ করে, কিন্তু দেখা যায় ওই মিথ্যাচারেরই মোহেই সে বন্দী থাকে। কপাল থেকে সিঁদুর মুছে ফেলার দুঃখে দগ্ধ হতে থাকে,

---

৭. অসমাপিকা পৃঃ ১০৭।

৮. ওই, পৃঃ ১৮৫।

৯. ওই, পৃঃ ১০৯,

Dhaka University Institutional Repository

সুচারু ধর্মানুরিত হয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে শিউরে ওঠে। সুচারুকে সে একশয্যায় ঠাঁই দেয় না কারণ সে পরস্ত্রী। লঘু ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসে উপন্যাসের বাস্তব পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে গেছে, তরল হয়ে উঠেছে সব কিছু।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের "সত্যাসত্য" ছখণ্ডের বিশাল উচ্চাভিলাষী উপন্যাস, এর প্রথমখণ্ড "যার যেথাদেশ" (১৯৩২), দ্বিতীয়খণ্ড "অজ্ঞাতবাস" (১৯৩৩), তৃতীয় খণ্ড কলঙ্কবতী "(১৯৩৪) চতুর্থ খণ্ড "দুঃখমোচন" (১৯৩৬), পঞ্চমখণ্ড "মর্তের স্বর্গ" (১৯৪০) ষষ্ঠ খণ্ড "অপসরণ" (১৯৪২)। অন্নদাশঙ্কর সমগ্র উপন্যাসটিকে 'এপিক তথা রূপক' হিশেবে রচনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে এর রূপকত্ব রক্ষিত হয় নি, কিন্তু এপিকত্ব রক্ষিত হয়েছে।[১০] এ-উপন্যাসে এপিকত্ব কতোটা রক্ষিত হয়েছে এবং রূপকত্ব আসলে পরিত্যক্ত হয়েছে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। অন্নদাশঙ্কর ছখণ্ডের উপন্যাসে বিশাল কাহিনী বর্ণনা করেছেন, ওই কাহিনী ভারত থেকে বিলেত, আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত, বাঙালি, ইংরেজ, ফরাশি বিভিন্ন জাতির চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন এবং কাহিনীকে বিশ্বপটভূমিতে উপস্থাপিত করেছেন। তবে "সত্যাসত্য" মানুষের বা উপন্যাসের চরিত্রদের জীবনযাপনের উপাখ্যান নয়, বরং তাদের চিন্তা ভাবনার প্রকাশই বড়ো হয়ে উঠেছে। এ-উপন্যাসে প্রধানচরিত্র তিনটি মানুষের বিশেষ বিশেষ প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন সুধী প্রতিনিধিত্ব করে বোধির, বাদল প্রতিনিধিত্ব করে মননশীলতার, উজ্জয়িনী প্রতিনিধিত্ব করে রাধাসুলভ আত্মনিবেদনের। তারা প্রত্যেকেই যতোটা বাস্তব জীবন যাপন করে তারচেয়ে বেশি যাপন করে অবাস্তব জীবন, বিশেষ বিশেষ প্রেরণার দ্বারা তারা পরিচালিত এবং তারা কথা বলতেই বেশি স্বস্তিবোধ করে। তাদের মুখে লেখক অসংখ্য চিন্তা-ভাবনা, সমাজসম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করেছেন সেগুলো অনেকাংশেই তাদের জীবন থেকে উঠে আসেনি। মনে হয় তারা যা কিছু পড়েছে সেগুলোই তারা নিজেদের সংলাপে প্রকাশ করছে। এ-উপন্যাসে সংলাপই হয়ে উঠেছে জীবন।

১০· "অজ্ঞাতবাস"। (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৫) পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাদল বা সুধী বা উজ্জয়িনী এমনভাবে সৃষ্ট হয়েছে যে তারা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি এবং লেখক তাদের যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে সৃষ্টি করেছেন, সে ব্যক্তিত্ব তাদের সহজাত নয়, অনেকাংশে কৃত্রিম। যেমন বাদলকে সৃষ্টি করা হয়েছে একজন মননশীল ভাবুক চিন্তাবিদ হিসেবে, যে বাদল লেখকের মতে 'চিরজাগ্রতমানব' বা 'প্রমিথিউসের দোসর' এবং সে যা চিন্তা করে তাই 'মানবের চিন্তা ও চিন্তনীয়',[১১] কিন্তু এই বাদল যে-ভাবে বিকশিত হয়েছে তাতে তাকে মৌলিকচিন্তাবিদ বলে মনে হয় না। সে নিজের সম্পর্কে ভাবে 'বাদল একদিন একটা *World figure* হবে, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ জানতে চাইবে সে কেমন আছে ইত্যাদি। তার অটোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ নেবার জন্য প্রতিদিন ভীড় হবে, সে ভীড় কাটিয়ে সে কোন চুলোয় যে লুকোবে তাই এক মস্ত সমস্যা।'[১২] এমন লঘু ভাবনা যার সে যে মহাচিন্তাবিদ হবে না এটাবোঝা যায়। "সত্যাসত্যে"র বিভিন্ন খণ্ডগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে জীবন এখানে বিভিন্নজনের জীবনযাপনের মধ্যদিয়ে যতোটা উপস্থাপিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উপস্থাপিত হয়েছে তর্কবিতর্কের মধ্যদিয়ে, অর্থাৎ বাস্তবজীবন হয়ে উঠেছে তর্কের বিষয়; এবং এভাবেই ক্ষুন্ন হয়েছে এ-উপন্যাসের বাস্তবজীবন উপস্থাপন। এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত জীবন অভিজ্ঞতার উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে উপস্থাপিত নয়, তা উপস্থাপিত উক্তির মধ্যদিয়ে। বাদলের ভাবুকতা, সুধীর বোধি এবং উজ্জয়িনীর রাধাভাব মূলতঃ ব্যাপক ক্রোধের প্রকাশ।

বুদ্ধদেববসুর এ-শ্রেণীর উপন্যাস হচ্ছে যৌবনের তীব্র আবেগ ও ঘোরলাগা প্রেমের উপাখ্যান। তাঁর পাত্রপাত্রীরা আধুনিক নাগরিক, বয়েস আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে। কেউ সচ্ছল মধ্যবিত্ত কেউ নিম্নবিত্ত। তাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ কেউ সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে। এদের কেউ কেউ পিতৃহীন বা মাতৃহীন। এদের আর্থিক সমস্যা নেই, কিন্তু একধরণের অন্তর্গত অসহায়ত্ব এদের মধ্যে আছে। উপন্যাসে জীবনবাস্তবতা বর্ণনা বুদ্ধদেবের লক্ষ্য নয়, পাত্রপাত্রীদের

---

১১. "অজ্ঞাতবাস" (চতুর্থসংস্করণ ১৩৬৫) পৃঃ ১৪,

১২. ঐ, পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়ের ঘোর আবেগের সুর বর্ণনা করেন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের বাস্তব পটভূমি সংকীর্ণ, তাঁর উপন্যাসে বাস্তবজীবনের উপস্থাপন ঘটেনি। তিনি তরুণতরুণীদের হৃদয়াবেগের উপস্থাপক। ফলে বুদ্ধদেব বসুর বিশ্বসীমাবদ্ধ। তা ওই তরুণ তরুণীদের জীবন থেকে শুরু করে আবেগলোকে এসে সমাপ্তি লাভ করে। বুদ্ধদেববসুর এ-শ্রেণীর উপন্যাসকে বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের উপন্যাস, বিশেষ করে ইংরেজি বিভাগের উপন্যাস। তাঁর নায়কেরা ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র বা ইংরেজি রোম্যান্টিক ও প্রিরাফেলাইট কবিতা দ্বারা বুদ্ধদেববসুর মতোই উন্মথিত। আর নায়িকারা ওই ইংরেজি কাব্যের Archetypal Beauty বা পরমা। বুদ্ধদেব বসুর এই নায়ক নায়িকারা সবাই আঠারো বছরের ব্যাধি অর্থাৎ প্রেমকাতরতায় ভোগে এবং রোম্যান্টিক বিরহ উপভোগ করার জন্য ব্যগ্র থাকে। তারা তীব্র সংবেদনশীল ও ভাবাবেগ জড়িত। তারা প্রেমে পড়ে এবং দয়িতকে কাছে পাবার জন্য তাদের মধ্যে অন্ধউন্মাদনা জাগে। তীব্র উচ্ছ্বাসময় ওই বয়ঃসন্ধির প্রেম অনেকাংশে মন্ময় অর্থাৎ তাতে লেখকের নিজস্ব আবেগ ব্যাকুলতারই প্রকাশ ঘটেছে। বুদ্ধদেববসুর নায়কেরা আত্মকেন্দ্রিক, সমাজবিচ্ছিন্ন এবং নিজেদের মনের সোনালী গুহার অধিবাসী। তাদের বাস্তব জীবনের আক্রমনে যাতে তাদের জীবন ছিন্নভিন্ন না হয়ে যায় সেজন্য বর্মের মতো থাকে বিধবা মা আর তাদের স্বপ্ন-আবেগের জন্য থাকে সাহিত্য ও কোনো বাস্তব মানসসঙ্গিনী। ওই বাস্তব পৃথিবী তাদের কাছে কুৎসিত, বিষমিষাউদ্রেককর । বাস্তবপৃথিবীকে যদি তারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারতো তাহলেই তারা সুখী হতো। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে আবেগ কাতরতা ও প্রেমই হচ্ছে বাস্তবতা, বাহ্যবাস্তবতাকেও তাই অনেকসময় অবাস্তব বলে মনে হয়। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নায়কপ্রধান। তাঁর উপন্যাসে প্রেমই ওই নায়কদের জীবন বলে প্রেম বারবারে আসে। প্রেম নিবেদনে তারা তীব্র এবং প্রেম যখন শুষ্ক হয়ে ওঠে, প্রেমিকায় যখন বিরাগ আসে, তখন ওই ক্লান্তিকে অনুরাগহীনতাকেও তারা প্রকাশ করে না। নিস্পৃহতা তাদের চরিত্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধদেববসুর উপন্যাসের বাস্তবপটভূমি সংকীর্ণ, কিন্তু তিনি ওই পটভূমির অবিকল পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন করে থাকেন। তার উপন্যাসে পাত্রপাত্রীদের পটভূমি যেমন ড্রইংরুম, জানালার পর্দা, চেয়ার পেয়ালা, খাদ্য, বিশেষ করে নায়িকার পোশাক ইত্যাদি অনুপুঙ্খ বর্ণিত হয়। এই বর্ণনা বুদ্ধদেববসুকে যতোটা বাস্তবতাবাদী করে তোলে তার চেয়ে বেশি করে তোলে রোম্যান্টিক। কারণ ওই বর্ণনার মধ্যে এক ধরণের মুগ্ধতা জড়ানো থাকে। তার মুগ্ধতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে উচ্চবিত্তের সংসার, গৃহ, বিকেলের চায়ের আসর ইত্যাদি বাহ্যিক আড়ম্বরের বর্ণনায়। মনে হয় এক মোহাচ্ছন্ন তরুন ওই আড়ম্বরের বর্ণনা করে তার অচরিতার্থ বাসনাকে চরিতার্থ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধদেববসুর "অকর্মণ্য বা একটিবাঙালী রুডিন" (১৯৩১) উপন্যাসের পটভূমি বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের ঢাকা শহর এবং আরো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় যে ওই পটভূমি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে ওই সময়ের পুরানা পল্টন এলাকা। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের ঢাকার পটভূমির অর্থই হচ্ছে পুরানা পল্টনের পটভূমি, যেখানে নতুন উচ্চবিত্ত পল্লী গড়ে উঠেছে। ওই পল্লীশান্ত, সুশোভিত, সুন্দর এবং এই পরিবেশ ব্যবহৃত হয়েছে সমাজবিচ্ছিন্ন নায়কদের গজদন্তমিনার স্বরূপ আশ্রয়স্থল হিশেবে। এর নায়ক ব্যারিষ্টারপুত্র শশাঙ্ক, উপন্যাসের নাম থেকেই বোঝাযায় বুদ্ধদেব বসু ইভান তুর্গেনিভের "রুডিন" (১৮৫৬) উপন্যাসের নিস্পৃহ, নিরাসক্ত আসেভিয়াগ্রস্ত রুশনায়কের এক বাঙালি প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেববসুর উপর ইভান তুর্গেনিভের "রুডিনের" প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তুর্গেনিভের রুডিন বিদগ্ধ, পরিশীলিত, উচ্চ সাংস্কৃতিক চেতনা সমৃদ্ধ নাগরিক তরুণ বুদ্ধিজীবী। তারমধ্যে রয়েছে বহু মহৎ বাসনা কিন্তু সে ওই সমস্ত বাসনাকে সাধারণত বাস্তবায়িত করে না বরং সে বাগবিস্তার করেই সুখবোধ করে। "রুডিন" উপন্যাসে রুডিনের সঙ্গে পরিচয় হয় জনৈক প্রিভিকাউন্সিলরের পত্নী ডারিয়া মিখাইলভ্না ও তার সপ্তদশী কন্যা নাতালিয়ার সঙ্গে, এবং তারা দু-জনেই রুডিনের অসাধারণ বাগ্মিতায়মুগ্ধ হয়। নাতালিয়া ও রুডিন পরস্পরের প্রেমে পড়ে কিন্তু নাতালিয়া যখন বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন রুডিন অত্যন্ত নিস্পৃহ বোধ করে এবং ওই সম্পর্ককে বিয়েতে পরিণত করার কোনো উৎসাহ বোধ করে না। তবে রুডিন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নয়, সে ১৯৪৮-এর ২৩জুন তারিখে প্যারিসে শ্রমজীবী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে এবং নিহত হয়। তার লাশও কেউ সনাক্ত করতে পারে না। বুদ্ধদেববসুর শশাঙ্ক "অকর্মন্য বা একটি বাঙালী রুডিন"-এর নায়ক।

শশাঙ্ক 'অকর্মণ্য বা একটি বাঙালী রুডিন'-এর নায়ক। শশাঙ্ক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সকল কর্ম ও আচরণে রুডিনের অন্ধ অনুকরণ করে এবং নিজেকে আরেকটি রুডিন রূপে প্রতিপন্ন করতে চায়। রুডিন শশাঙ্কের কাছে একজন ব্যক্তিবিশেষ হয়ে থাকে না, গণ্য হতে থাকে জীবন যাপনের আদর্শ। শশাঙ্ক রুডিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে শুধুমাত্র ওই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করে না, ওইবৈশিষ্ট্যরাশি তার কাছে হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্বস্বী এক ধরনের মানুষের বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। ওই বৈশিষ্ট্যগুলোকে শশাঙ্ক অভিহিত করে 'রুডিনত্ব' বলে এবং তা আয়ত্ত করার জন্য সে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে। ধনী পিতার পুত্র শশাঙ্ক পুরীতে বেড়াতে গিয়ে পরিচিত হয় সরোজের সঙ্গে। সরোজের সঙ্গে শশাঙ্ক তাদের বাড়িতে বেড়াতেও আসে। মফস্বল শহর ঢাকার এই সচ্ছল অভিজাত পরিবারটির অতি-

Dhaka University Institutional Repository

শিপরায়ণতা, আনুরিকতা, রুচিশীলতা শশাঙ্ককে মুগ্ধ করে। সরোজের দুই বিপরীত স্বভাবের বোন অনসুয়া ও রিণি শশাঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনসুয়াকে ভালো লাগলেও, শশাঙ্ক মুগ্ধ হয় অস্থির, আবেগ-স্বপ্ন-লীলাচঞ্চল রিণিকে দেখে। শশাঙ্ক রিণির প্রতি গভীর অনুরাগ বোধ করলেও প্রত্যাখ্যাত হবার অকারণ শঙ্কায় রিণিকে তার আবেগ জানায় না। রিণি প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে, কিন্তু সেও আবেগ জানাতে সক্রিয় হয় না। অনসুয়া প্রায় জোর করে শশাঙ্কের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। শশাঙ্ক অনসুয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে কোনো আগ্রহ কিংবা পুলক বোধ করে না, কিন্তু প্রতিবাদ করার স্পৃহাও জাগে না তার মধ্যে। অসাড়, নির্জীব, বিমুখ শশাঙ্ক এ সম্পর্ককে মেনে নেয়।

শশাঙ্ক রুডিনের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তুলতে চায় বলে ছেটে ফেলে দেয় নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা। নিজের স্বভাবের মৌলিকত্ব তার প্রিয় নয়, নিজেকে নকল রুডিন-রূপে গড়ে তুলতে পারাকেই চরম সাফল্য বলে গণ্য করে সে। বাস্তব জীবনে রুডিন যেমনটি করে থাকে শশাঙ্ক তেমন আচরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। রুডিন যেহেতু কথা বলতে ভালো বাসে, কথা বলা তাই শশাঙ্কেরও প্রিয় হয়ে ওঠে। রুডিন বাকনিপুণ, সেই সঙ্গে সে চমৎকার শ্রোতাও। অন্যের কথা মনোযোগ সহকারে সশ্রদ্ধভাবে শোনার গুণটিও রুডিনের আয়ত্তে আছে। রুডিনের অনুকরণে শশাঙ্ক নিজেকে মনোযোগী শ্রোতা হিসেবেও সৃষ্টি করে, যে-বিষয়ে যার রুচি নেই তার সঙ্গে সে-বিষয়টি এড়িয়ে চলার মতো বিরল বুদ্ধির অধিকারীও সে হয়ে ওঠে রুডিনের প্রভাবে। শশাঙ্ক ভাববিলাসী। শশাঙ্ক ভাবালুতাগ্রস্ত বলেই রুডিনের বাকনিপুণতা, নিশ্চেষ্টতা, ইচ্ছাশক্তি ও উদ্যমের অভাব, উদভ্রান্তি তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে; রুডিনের ব্যর্থতা ও উদভ্রান্তির সময় ও সমাজ প্রেক্ষাপট অনুধাবনে ব্যর্থ হয় শশাঙ্ক। রুডিনের মৌলিক প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোও শশাঙ্ক ধরতে পারে নি। শশাঙ্ক রুডিনকে নিষ্ক্রিয় ও কর্মনিস্পৃহ বলে মনে করে এবং রুডিনের মতো নিষ্ক্রিয় হবার সাধনা করে। কিন্তু রুডিন কর্মনিস্পৃহ বা নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়। কথার খেলায় মত্ত থাকলেও রুডিন কমবেশি কর্মেও উদ্যোগী হয়; কিন্তু অদূরদর্শিতা, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, বাস্তব অনভিজ্ঞতা ও প্রতিকূল পরিবেশ তাকে ব্যর্থ হতে বাধ্য করে। রুডিনের এই সক্রিয়তা শশাঙ্কের চোখে পড়ে না। ভাববিলাসী শশাঙ্কের কাছে প্রিয় শুধু রুডিনের বিফলতাটুকু। তাই শশাঙ্ক সকল কাজে বিফল হবার সাধনা করে। যেহেতু রুডিনকে দিয়ে কোনো কাজ হয় নি তাই তাকে দিয়েও কোনো কাজ হবেনা বলে বিশ্বাস করে সে। কাজ করার শক্তি ও আগ্রহের অভাবই তাকে করে তোলে এমন নির্লিপ্ত। রুডিনের মতোই শশাঙ্কেরও বহু কিছু করার যোগ্যতা আছে, আর রুডিনের মতোই

ওই শক্তি কিভাবে ব্যবহার করবে তা নির্ণয়ে অসমর্থ শশাঙ্ক। বুডিনের উদভ্রান্তি এবং শশাঙ্কের উদভ্রান্তি অভিন্ন প্রেক্ষাপট উদ্ভূত নয়। বুডিনের উদভ্রান্তির জন্য দায়ী তার বিরূপ সময় ও সমাজ-ব্যবস্থা। আর শশাঙ্কের উদভ্রান্তির জন্য দায়ী তার ভাবালুতা। শশাঙ্ক বুডিনের মতো নিজের সময়ের নায়ক নয়, শশাঙ্ক নিজের হৃদয়াবেগের নায়ক মাত্র। এ-উপন্যাসে বাস্তব পটভূমি সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং শশাঙ্ক ও দুটি তরুণীর যে সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে তাও বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে গেছে।

ত্রিশের দশকের ঢাকার প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে "হে বিজয়ী বীর" (১৯৩৩) উপন্যাসটি। রঞ্জন ঢাকার নতুন উচ্চবিত্ত পাড়ার বাসিন্দা, লোকান্তরিত সাবজজের পুত্র, উত্তরাধিকারসূত্রে ধনী, ঢাকা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যে এম,এ-র ছাত্র। বাস্তবজীবনের নানা ঝক্কাট পোহায় তার মা। রঞ্জন স্বাপ্নিক, কাব্যপ্রেমিক ও অস্থির। তাদের বাড়িতে সাহায্য চাইতে আসা এক আত্মীয়াকে গোপনে সাহায্য করতে গিয়ে আত্মীয়াকন্যা অতসীর প্রেমে পড়ে সে। অতসীর বয়স আঠারো, ম্যাট্রিক পাশ, একটি স্কুলে মাস্টারি করে। অতসী মনে করে রঞ্জন সাহায্যে করার ছুতো করে তাকে কিনতে চায়। প্রবল বিমুখতা দেখালেও শেষ পর্যন্ত রঞ্জনের প্রেমে পড়ে সেও। এরআগে রঞ্জন প্রতিবেশী ধনীকণ্যা প্রমীলার প্রতি একধরনের আবেগবোধ করতো, বর্তমানে তারমনে প্রমীলার প্রতি কিছুমাত্র আবেগ না থাকলেও প্রমীলা ধরে নেয় এখনো তার জন্যে রঞ্জনের প্রবল আবেগ বিদ্যমান। প্রমীলা মিলির সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখে রঞ্জনের নির্বোধ কঠোর মা মিলিরসঙ্গে রঞ্জনের বিয়ের সমন্ধ করে। রঞ্জন পরিস্থিতির চাপে পড়ে এবং অন্তর্গত নিষ্ক্রিয়তার কারনে এ-বিয়েতে সম্মত হয়। অতসী ট্রেনের নিচে পড়ে আত্মহত্যা করে।

বুদ্ধদেববসু ব্যাপক বাস্তবতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। কিন্তু তিনি খণ্ড বাস্তব, যা তাঁর কাছে মনোহর কাব্যিক বলে মনে হয় তা তিনি অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেন। যেমন এ-উপন্যাসের নতুন গড়ে ওঠা অভিজাত পাড়ার বর্ণনা দেন তিনি এ-ভাবে: 'উঁচু দরের প্রায় বড়লোক এক পাড়া-সবসুদ্ধু খান পঁচিশেক বাড়ি, তাদের জানালায় ঝুলছে শৌখিন ছিটের পরদা, রাস্তা থেকে বসবার ঘরের সোফায় ফুল আঁকা অ্যান্টি মার্কাসের আভাস পাওয়া যায় কখনো বা, কারো কারো সামনে একটু ফুলের বাগান .... সন্ধের সময় গাড়ি এসে দাঁড়ায় এখানে ওখানে, চায়ের পেয়ালা টুংটাং বাজে,

Dhaka University Institutional Repository

বাজে গ্রামোফোন। ·······তাদের কর্তারা বিকেলে একত্র হয়ে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আলাপ করেন, আর গিন্নীরা হিশেবের খাতা না মিলিয়ে কখনো শুতে যান না, আর মেয়েরা ব্লাউজের হাতা আরো আধ ইঞ্চি তোলবার জন্য তাকিয়ে থাকে কলকাতার মুখের দিকে।'[১৩] ওই পাড়ার তরুণীরা 'দুএকবার পীড়াপীড়িরপর' গান গেয়ে থাকে, "নটরাজে"র কোনো না কোনো গান'ই তারা গায় আর 'তাদের ছোটো বোনেরা নাচতেও পারে।'[১৪] অতসী 'বিকেলে বারান্দায় পাটি পেতে' বসে, স্নান সেরে ভেজা চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে, 'মিলের সাদা শাড়ির আঁচল' অযত্নে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে 'শেলাই' নিয়ে বসে॥কোনো কোনোদিন 'ইলিশমাছ' কিনতে পাঠায় বাজারে, 'রুইমাছের মুড়ো চিঁড়ে দিয়ে' রাঁধার পরিকল্পনা করে,'শহরের মহিলা সমিতির উদ্যোগে' বুড়িগঙ্গার ধারে অনুষ্ঠিত 'শিল্প প্রদর্শনীতে' শেলাইয়ের কাজ পাঠায়। প্রদর্শনীতে অতসী যায় 'শাদার উপরে এখানে ওখানে হলদের ছিটে' দেয়া 'খদ্দরের শাড়ি' পরে, 'ব্লাউজটার রং মেটে সিঁদুর' 'হাতা কাঁধের ঠিক নিচেই' কাটা।[১৫] রঞ্জন বারান্দার ইজিচেয়ারে বই নিয়ে অলসতন্দ্রার ঘোরে সময় কাটায়। প্রমীলার সঙ্গে বিকেলে চা খায়। প্রমীলা পরে 'কালো চীনে সিল্কেরশাড়ি' 'রঙিন লতার পাড় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে' ঘিরে থাকে দেহ, গলায় পরে 'আধুনিক ধরণের মালা- বাঁকা টেপ্টা নানা আকৃতির ও নানা রঙের কতগুলো পাথরের কুচি একসঙ্গে গাথা-শাড়ির পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে।'[১৬]

খণ্ড মনোহর বাস্তবতার বর্ণনার মধ্যদিয়ে বুদ্ধদেব পাত্রপাত্রীদের জীবনযাপনের সৌন্দর্য-গাথা বর্ণনা করেন, ওই বর্ণনার মধ্যদিয়ে তিনি চরিত্রদের সুদূরত্ব অবাস্তবতা ও সৌন্দর্যকেই স্পষ্ট করে তোলেন। বুদ্ধদেব বসুর ওই পাত্রপাত্রীরা বাস্তবতার অধিবাসী হলেও তারা রোম্যান্টিক স্বপ্নঘোরময় জগতের পাত্রপাত্রী। আবেগের উন্মাদনা নির্দেশই বুদ্ধদেবের লক্ষ্য। এ-উপন্যাসে রঞ্জন

১৩· "হেবিজয়ীবীর", (বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড) পৃঃ ২৯০।

১৪. ওই, পৃঃ ২৯০।

১৫· ওই, পৃঃ ২৯৫।

১৬· ওই, পৃঃ ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

অতসীর আবেগের তীব্র উন্মাদনার পরিচয় পাওয়া যায়। অতসীকে ভালোবেসে রত্নজ্যোতির মনে গুঞ্জিত হতে থাকে 'রোজালিন্ড' 'রোজালিন্ড' নামের ধ্বনি , 'যেন বহুদূর কোনো অতীতের, যেন অন্য কোনো জন্মের হঠাৎ এসে লাগা প্রতিধ্বনি। ....আ, আর্ডিনের বনের সেই রোমান্স। কেমন হবে সেই ভালোবাসা, যাকে পেতে হয় এত দুঃখে, এমন দুঃসাহসের ভিতর দিয়ে।'[১৭] রত্নজ্যোতির জন্য অতসীর বুকের ভেতর 'এক উদ্দাম, উন্মত্ত, ভয়ংকর বাসনা লাফ দিয়ে' ওঠে। 'আঃ, রত্নজ্যোতি, রত্নজ্যোতি তুমি আমার, তুমি আমার। আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি ?'[১৮] ভাবাবেগপ্রবলতায় "হে বিজয়ীবীর"-এর বাস্তব জগত তুচ্ছ হয়ে গেছে, প্রধান হয়ে উঠেছে নায়কনায়িকার প্রেমঘোরময় মনোজগত।

"যেদিন ফুটলো কমল" (১৯৩৩) উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতা। দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। পার্থপ্রতিম পিতৃহীন স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত, তার মা বাস্তব ঝামেলাগুলো দেখাশোনা করেন। এম,এ পরীক্ষার পর শ্রীলতার উদার দাদা পার্থের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। পার্থ প্রত্যাখ্যান করে এজন্য যে শ্রীলতার তুলনায় তারা দরিদ্র। প্রত্যাখ্যানের পর সে টের পায় শ্রীলতা তার অস্তিত্বকে কতোখানি ঘিরে আছে। সে শ্রীলতার সঙ্গে চিঠিতে সহজবন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়, কিন্তু শ্রীলতা চিঠির উত্তর দেয় না। পুরীতে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে দুজনের দেখা হয়, অনুরাগ জাগে নতুন করে। শ্রীলতা এক মহিলা কলেজে চাকুরি পায়। পার্থপ্রতিম ও শ্রীলতা পরস্পর নিকট হবার প্রস্তুতি নেয়। পার্থপ্রতিম চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের "শেষেরকবিতা"র অমিতরায়ের ছাঁচে সৃষ্টি করা হয়েছে। অমিতরায়ের মতো একই রকম কথার খেলায় মত্ত থাকে পার্থপ্রতিম। অমিতরায়ের মতো সেও মুহূর্তের এবং বর্তমানের উপাসক। কোনো ব্যাপারেই পার্থপ্রতিম সিরিয়াস নয়। তার 'মগজের কোষে কোষে অগুনতি ভাবনা ভিড় করে আছে, ঠেলাঠেলি করছে

---

১৭. ওই, পৃঃ ৩৩৬।

১৮. ওই, পৃঃ ৪১৯।

Dhaka University Institutional Repository

বেরিয়ে আসার জন্য।'[১৯] সৃষ্টিশীল সে, লেখেও অজস্র, 'স্রোতের জলের মতো অজস্র সব লেখা-মুহূর্তের অস্তিত্বে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ * তারা।'[২০] অমিতরায়ের মতোই 'পার্থপ্রতিমভাবের মানুষ। তার মন বাইরের প্রেরণায় সাড়া দেয় সহজেই, যেন এক হাওয়ার লঘু ছোঁওয়ায় ঝংকৃত হয়ে ওঠে তারে তারে, সহজে তার রেশ মিলোয় না।'[২১] পার্থপ্রতিম শেখেনি 'গম্ভীর হতে, যে সমস্যাকঠিন, যাতে অনেক ভাবনা, ... তার ওপর দিয়ে তার মন চলে যায় হাসতে হাসতে, অবাধে, যেন কিছুই ব্যাপার নয়।'[২২] পার্থপ্রতিম সাধারণ মধ্যবিত্ত আর শ্রীলতা উচ্চবিত্ত পরিবারের কন্যা, কিন্তু তাদের দু-জনের মিলনের পথে অবস্থানগত অসাম্য কোনো সমস্যা নয়। বাস্তবজীবন তাদের সমস্যা নয়, তাদের সমস্যা তাদের হৃদয়। এ-উপন্যাসেও মধ্যবিত্ত জীবন ও উচ্চবিত্তের জীবনবাস্তবতার খণ্ডাংশের অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেন বুদ্ধদেব মোহগ্রস্ত দৃষ্টিতে। তাঁর প্রধান লক্ষ্য পাত্রপাত্রীদের হৃদয়ঘোর নির্দেশ। পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও মিলনে উন্মুখ শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিম থাকে সতৃষ্ণ, ঘোরগ্রস্ত, বিবশ। তারা এতোই ঘোরের মধ্যে দিন কাটায় যে যেন অন্যকেউ যাপন করে দিতে থাকে তাদের বাস্তব-জীবন, আর প্রকৃত শ্রীলতা ও পার্থ পড়ে থাকে প্রতীক্ষাকাতর বিরহী উন্মুখ সত্তারূপে। তাদের সমস্যা নিজেদের পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও ভাবালুতা। ওই হৃদয়াবেগ ও ভাবালুতার গল্প বলাই বুদ্ধদেব বসুর লক্ষ্য। বাস্তব পরিবেশ এখানে গৌণ হয়ে মুখ্য বাস্তব হয়ে উঠেছে তাদের আবেগকাতরতা।

'ধূসর গোধূলি'(১৯৩৩) উপন্যাসের নায়ক কল্যাণকুমার, নায়িকা অপর্ণা। কল্যাণকুমার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী কালের কলকাতার সিরিআস ছাত্রদের একজন 'যারা উচ্চশিক্ষা, মহৎজীবনে

---

১৯. "যেদিন ফুটলোকমল"(বুদ্ধদেববসুর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয়খণ্ড), পৃঃ১৭০।

২০. ওই, পৃঃ১৭০।

২১. ওই, পৃঃ ২০৪।

২২. ওই, পৃঃ ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস' করতো, তারা 'মন্ত্র' নিয়েছিলো 'অগ্রগামিতার- আলোক বিতরণ, স্বাস্থ্য বিকীরণ, সুখ-স্ফীতি, মানবজাতির কল্যাণ সাধনে'র। কল্যাণকুমারের মধ্যে ছিলো প্রচুর প্রাণশক্তি, 'কলেজের পড়া নিয়ে ভীষণ পরিশ্রম করতেন তাতে 'অমন প্রচুর প্রাণশক্তির' একরকম ব্যবহার হতো।[২৩] মাত্রাজ্ঞান ও কান্ডজ্ঞানের অভাব ছিলো তার মধ্যে, 'যখন যে কথা মুখে আসতো সেটা বলতেই হবে, যখন যেদিকে মন ছুটলো সে না করলেই নয়', 'ঝড়ো স্বভাবে'র ওই তরুণটি ছিলো 'বন্য-ঘোড়ারমত অশান্ত।'[২৪] এই 'দানবিক দুরন্ত পুরুষ'টি আর 'স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট একমুঠো মেয়ে' অপর্ণা গভীরভাবে পরস্পরের প্রেমে পড়ে, তাদের বিয়ে হয়। বিবাহিত জীবনে কল্যাণকুমারের মনে যে প্রেম জাগে তা 'বন্য, দুরন্ত উদ্দাম, উন্মত্ততায় আসুরিক।' এর আগে যেমন উন্মত্ত হয়ে সে ঝাপিয়ে পড়েছিলো 'বিদ্যার্জনে, কর্মের প্ররোচনায়' তেমনি বিবাহের পর 'ঝাপিয়ে পড়লেন তার স্ত্রীতে', স্ত্রীর মধ্যে একটি নতুন বিশ্ব আবিষ্কারের উত্তেজনায় সে ওই বিশ্বের 'রহস্য ও ঐশ্বর্য' উদঘাটনে মত্ত হয়ে পড়ে।'[২৫] বিলেত থেকে ফেরার পর কল্যান কুমারের এই 'প্রেমউন্মত্ততা' পরিণত হয় সন্দেহ বিকারে। স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠছে ভেবে ভেবে সে উন্মাদ হয়ে যায় এবং বাকিজীবনের জন্য তাকে পাঠানো হয় রাঁচির পাগলাগারদে। আর স্বামীর কাছে 'চরম আত্মসমর্পনে' লুটিয়ে পড়া অপর্ণা দুঃখময় জীবন সইতে না পেরে নদীর জলে আত্মাহুতি দেয়। পারিবারিক বা সমাজ জীবনের বাস্তবতার উপস্থাপনা এখানে লেখকের লক্ষ্য নয়। যদিও কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী কালের কলকাতার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আচার - আচরণ, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবনে বিলেতের প্রভাবে দেখা দেয়া পরিবর্তনের ছবিও আঁকেন। যেমন কল্যাণকুমার বিলেত থেকে ফিরে এসে ঘরগৃহস্থালি বিলেতের গৃহস্থালির অনুকরণে সাজাতে তৎপর হয়। পাটি পেতে খাবারের রীতির বদলে খাবার টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়, সোফাকুশন শোভিত ড্রইংরুমের আবির্ভাব ঘটে, বারান্দায় বিকেলে বসার জন্য বিছানো শীতল পাটি তুলে ফেলে সেখানে পাতা হয় 'বেতের চেয়ার', বাড়িতে গান শোনার জন্য কেনা হয় 'গ্রামোফোন ও ইংরেজি গানের

২৩• ধূসরগোধূলি, (বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ(চতুর্থ খন্ড), পৃঃ ৩৩

২৪• ওই, পৃঃ ৩৪

২৫• ওই, পৃঃ ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

রেকর্ড। এসব আঁকা হয় পারিবারিক জীবনবাস্তবতাকে নির্দেশ করার জন্য নয়, উদভ্রান্ত কল্যাণ-কুমারের নতুনধরণের অস্থিরতার পরিচয় দেবার জন্য। বাস্তবপটভূমি ও বাস্তবজীবন এখানে গৌণ হয়ে যায়, একটি 'উদভ্রান্ত উতরোল' যুবকের প্রেম উন্মত্ততার ব্যাপারটি প্রধান হয়ে ওঠে।

বুদ্ধদেব বসুর "সূর্যমুখী" (১৯৩৪) বাস্তব প্রতিবেশের থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন এক তরুণের হৃদয়কাতরতার উপাখ্যান। বুদ্ধদেবের এ-ধরণের তরুণ নায়কেরা এক পরমার জন্যে স্বপ্ন-ঘোরাচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু তারা অন্যনারীর সঙ্গে অনাসক্ত শারীরিক সম্পর্কেও জড়িত থাকে, এবং এক সময় চরম ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে লাভ করে পরমাকে। অন্য নারীটি অবশ্য মৃত্যুবরণ ক'রে স্বপ্ন-ঘোরাচ্ছন্ন নায়ক ও তার পরমার মধ্যে মিলনের পথ সুগম করে যায়। "সূর্যমুখী"তে মিহির বিধবা মায়ের চোখের মণি; মা মিহিরের বাস্তব জীবনটিকে রক্ষা করে সব রকম বিঘ্নের আক্রমণ থেকে; আর মিহির কবিতা লেখে, বাস করে স্বপ্নের জগতে। কিন্তু সে বিয়ে করে মায়ের পছন্দ করা মৃণালকে, যে অশিক্ষিত, স্বপ্ন ও কাব্যজগত থেকে দূরবর্তী বাস্তবজগতের নারী। সে জানে সেবা করতে, যা মিহির অনিচ্ছায় গ্রহণ করে। মৃণাল মিহিরকে স্বপ্নের খাদ্য দিতে পারে না। মিহির শারীরিক সম্পর্কও পাতায় না স্ত্রীর সঙ্গে; তবে এক শ্রাবণঘন রাতে আকস্মিক আবেগে মিহির স্ত্রীসম্ভোগ করে। এর পর প্রেমে নয়, ঘৃণায় চলে তার স্ত্রীসম্ভোগ। এরপর, রোম্যানটিক ও বুদ্ধদেবের উপন্যাসের সূত্রানুসারে, মিহিরের সাক্ষাৎ ঘটে তার স্বপ্নের পরমার সাথে-যার নাম তাপসী। এমন সময় সন্তানপ্রসব করতে গিয়ে মিহিরের স্ত্রী মারা যায়: এতে মুহ্যমান হয়ে পড়ে মিহির। ওই মুহ্যমান অবস্থা থেকে মিহিরকে উদ্ধার করে তাপসী, যে মিহিরের কাছে কোমল স্বপ্নের মতো। বাস্তব জীবনের উপস্থাপন বুদ্ধদেবের লক্ষ্য নয় "সূর্যমুখী"তেও, তাঁর লক্ষ্য ভাবাবেগপূর্ণ হৃদয়-কাতরতার উপস্থাপন। ভাবাবেগই এখানে বাস্তবতা, অন্য সব কিছু তুচ্ছ। "একদা তুমি প্রিয়ে" (১৯৩৪) উপন্যাসের নায়ক পলাশ সচ্ছল পরিবারের পঁচিশ বছর বয়েসী যুবক। কলেজে পড়ার সময় সমবয়েসী প্রতিবেশিনী সহপাঠী রেবার সঙ্গে প্রেম হয় তার। বয়সন্ধির ওই প্রেম মরেও যায় একসময়, কিন্তু পঁচিশ বছর বয়েসী রেবা ওই প্রেমকে জীবিত মনে করে পলাশকে তার বাড়িতে বেড়াতে যেতে ডাকে। সে তখন দূর মফস্বলে স্কুলে শিক্ষকতা করছিলো; সেখানে গিয়ে পলাশ প্রেমে পড়ে রেবার ছাত্রী ষোল বছরের প্রতিমার। প্রতিমার সঙ্গে সম্পর্কিত হবার পরিবেশ তৈরি হতেই পলাশ পালিয়ে কল-

Dhaka University Institutional Repository

কাতায় চলে আসে। সে ভাবুক, স্বাপ্নিক, নিষ্ক্রিয়, অপ্রেম বিষয়ক চিন্তার পাশাপাশি তার মধ্যে আছে চিরন্তনীর জন্য আকুলতা। পলাশ যৌথপরিবারের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে যাপন করে বাস্তব জীবন; তার জীবনে 'কোনো ভাবনা নেই, কোনো দায়িত্ব নেই, আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে সূর্যের নিচে ঝলোমলো-রঙিন প্রজাপতি,'[২৬] পরমার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তার মনে হয় 'যেন সব সময় ঐ রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ····· বাস-এ উঠতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে হয়েছেঃ এই বাস-এই কি তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হবে? আমি বেরুবো তাকে খুঁজতে জিরুসালেমের পথে পথে ·········।'[২৭] এমন অবাস্তব ঘোরের মধ্যে সেবাস করে, আর তার প্রেমের অনুভূতিও তার জীবনের মতোই তীব্র। তা 'আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য, অপরূপ'। আকাশের গায়ে এক বিশাল উজ্জ্বল রামধনু।'[২৮] এ-ঘোরলাগা জীবনে বাস্তব জগত অবাস্তব, আর বাস্তব হচ্ছে হৃদয়ের ঘোর। বুদ্ধদেব এই ঘোরেরই শিল্পী।

"রুপোলিপাখি" (১৯৩৪) উপন্যাসের নায়ক কপিল। বাস্তবজগত তাকে পীড়িত করে, আর্টের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যলোকে সে স্বস্তিতে থাকে। একসময় তার বিয়ে করার বাসনা জাগে। গভীর কালো চোখের মৃদুভাষী তরুণী মিনুকে সে বিয়ে করতে চায়। মিনু তাকে ভালোবাসে, তবে সে মানসিক প্রস্তুতি নেবার জন্য আরো কিছুদিন সময় চায়। কপিল গ্রীষ্ম কাটাতে চলে যায় সাঁওতাল পরগনার এক ছোটো শহরে। ওই শহরের নির্জনতা আর গভীর নীল আকাশের শোভা তার হৃদয়কে মোহগ্রস্ত করে। সাঁওতাল যুবতী ঝমরের সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অচিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মেয়েটি মারা যায়। কপিলের তখন মিনুকে মনে পড়ে। মিনু বিয়েতে সম্মত হয়। এ-উপন্যাসে একজন সংবেদনশীল ও সৃষ্টিশীল তরুণের ভাবাবেগ ও অস্থিরতার বিবরণ রচনা করেছেন বুদ্ধদেব। বাস্তবতার মুখোমুখি হলে ওই তরুণ বিপন্ন বোধ করে, সে স্বস্তি পায় এবং প্রকৃতঅর্থে বেঁচে থাকে আর্টের বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় সৌন্দর্যের জগতে।

---

২৬. "একদা তুমি প্রিয়ে", (বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, চতুর্থখণ্ড), পৃঃ ১২৩।

২৭. ওই, পৃঃ ১৩৮।

২৮. ওই, পৃঃ ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

কপিল ঘৃণা করে অর্থকড়িশাসিত বাস্তবজীবনকে । কখনো কখনো যখন জীবিকানির্বাহের পয়সার জন্য পত্রিকা অফিসে কিংবা প্রকাশকের কাছে যেতে হয় তাকে, সে টের পায় ' তখন সংসারের মোটামোটা সাঁৎসেঁতে আঙুলগুলো বেশ ভালো করেই ' তার গায়ে লাগে , সে পীড়াবোধ করলেও ওই 'চড়চাপড়' সে গায়ে মাখে না। সে মনে করে সংসারের চড়চাপড় লাগে তার বাইরের খোলসে। ওই বাস্তবতায় সবসময়ই সে অনুপস্থিত থাকে। বাস্তবতাকে কপিল দেখে ঘৃণা বিতৃষ্ণা বিবমিষাভরা দৃষ্টিতে। ব্যবসামত্ত কলকাতা নগরীকে তার মনে হয় 'যেন অতিকায় কুৎসিত একটা জন্তু' বলে, তার মনে হয় আধুনিক কালের শহরের বাতাস 'যন্ত্রের চীৎকারে' ভরে গেছে, ব্যবসার এক 'বিশাল, জটিল, সর্বব্যাপী চাকা দারুণ বেগে' ঘুরছে অবিশ্রান্ত। আধুনিক মানুষেরা 'সবাই আটকা' পড়েছে তার মধ্যে। কপিল মনে করে 'তারই ঠেলায় তো আমরা ছিটকে পড়ছি এখান থেকে ওখানে, ছটফট করছি, কৎরাচ্ছি, গোঙাচ্ছি, তার চাপে রক্ত আমাদের শুকিয়ে গেলো।' এই সত্য উপলব্ধি করে কপিলের 'সমস্ত জঠর যেন নিজেকে উগড়ে ফেলতে চাইলো, বিতৃষ্ণায়।'[২৯] বাস্তবতা কপিলের কাছে বিভীষিকা আর আর্টের ভুবন প্রকৃত সত্যের জগতরূপে। বাহ্যবাস্তবতা নয়, আর্টের ভুবনই তার কাছে বাস্তবতার মর্যাদা পায়। সে উপলব্ধি করে 'মানুষের জগতেই পরিবর্তন আর বিক্ষোভ আর অশান্তি: আর্ট চিরন্তন, মানুষের জগতেই দূরে চলে যাওয়া আর কাছে আসা, ভালোবাসা আর ভুলে যাওয়া; কিন্তু আফ্রোদিতের দীর্ঘ, কালো চুল চিরকাল সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ের মত জড়িয়ে থাকবে; চিরকাল ঝলমল করবে হেলেনের বক্ষ গ্রীষ্মনিবিড় বনে পাকা আপেলের মত। আর সে তার অন্তরের চোখ ফেরালো আর্টের দিকে: আর সেই দীপ্তিতে পৃথিবী যেন মুছে গেলো।'[৩০] 'আমার জীবন হোক আর্টের মধ্যে' মনে মনে এ-সিদ্ধান্ত নেয় সে। সে যখন বাস্তবসাংসারিক জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়, তখনও সে প্রকৃতপক্ষে নতুন ধরনের স্বপ্নে বাস করারই পরিকল্পনা করে।

---

২৯. "রূপোলিপাখি"(বুদ্ধদেববসুর রচনাসংগ্রহ ষষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ২৪০।

৩০. ঐ, পৃঃ ২৩৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

সে চায় একজন সংবেদনশীল প্রায়-অবাস্তব নারীসঙ্গী, যে তার ভাবোচ্ছ্বাস, কাব্যোন্মাদনা, উন্মত্ততার সঙ্গী হবে। সে স্বপ্নসঙ্গিনী চায়, বাস্তবনারীর কাঠামোতে সংসারঅভিজ্ঞ স্ত্রী চায় না। মিনু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হলেও তাকে বাস্তবমানবী বলে মনে হয় না। বুদ্ধদেব ওই মধ্যবিত্ত জীবনের খণ্ডবাস্তবতার বর্ণনা করেন মোহগ্রস্ত ভাবে। মিনু বিকেলে গা ধুয়ে ভেজা এলোচুল এলিয়ে দোতালার খোলা বারান্দায় পাটি পেতে বসে, হাতে থাকে 'সেলাই', 'লোহার সাদা খাটে' শুয়ে অলস দুপুরে 'আঁচলে মুখ ঢেকে' গুনগুন গান গায়। বিকেলের চা খাওয়া হলে 'কলের নিচে বসে' চায়ের বাসন ধুয়ে নেয়।'[৩১] বুদ্ধদেব বসু বাস্তবপ্রেক্ষাপটকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য এ-সব বর্ণনা করেন না, এসব বর্ণনার মধ্যদিয়ে মন্থর ও মধুর এক জীবনে নায়কের স্বপ্নকন্যা কেমন ঘোরগ্রস্ত, ধীর, সুন্দর, প্রশান্ত দিন কাটায় তাই তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছেন। কপিল কলাকৈবল্যবাদী, গজদন্তমিনারবাসী, বাস্তব তার অচেনা; সে জানে শুধু হৃদয়ের আলোড়নকে ও শিল্পকলাকে। বাস্তবজগত সম্পর্কে তার রয়েছে রোম্যান্টিক ঘৃণা, তাই তার বসবাস বাস্তববিচ্ছিন্ন ঘোরের মধ্যে।

"বাসরঘর" (১৯৩৫) উপন্যাসের নায়ক পরাশর, নায়িকা কুন্তলা। পরাশরের বয়স পঁচিশ, পিতৃমাতৃহীন। বিধবা মায়ের একমাত্র কন্যা কুন্তলাকে ভালোবাসে সে। তাদের বিয়ের তারিখ ঠিক হলে দুজনে মিলে নানা দোকানঘুরে জিনিসপত্র কেনে। কলকাতা থেকে অল্পদূরে ব্যারাকপুরে নদীর ধারে বাড়ি ভাড়া করে পরাশর। বিয়ের পর ওই খোলামেলা একতলা ভাড়া বাড়িতে তারা সংসার শুরু করে। মাঝেমধ্যে কলকাতায় এসে গৃহস্থালির নানা দ্রব্যসামগ্রী কেনে, ঘর সাজায়। পুরন্দর যদিও 'দস্তুরমতো গুছিয়ে বসা সংসারিয়ানা'কে অপছন্দ করে, কিন্তু কুন্তলা যখন নতুন করে ঘর সাজায় তখন সে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। নানা তুচ্ছ কারনে এই প্রেমিক স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কলহমনোমালিন্য হয়, একে অন্যকে ছেড়ে যাবার কথা বলে। তারপর একসময় স্বামীটি অনুতপ্ত ও আত্মসমর্পিত হয়। প্রবল ভাবালুতাগ্রস্ত সদ্য তারুণ্যে উত্তীর্ণ দুটি নরনারীর প্রথম প্রেমের ঘোর- স্ফূর্তি-কলহ-মিলনের বৃত্তান্ত হচ্ছে "বাসরঘর" উপন্যাসটি। পরাশর ও কুন্তলারদাম্পত্য জীবনকে মনে হতে থাকে দুজনের মধুর পিকনিক বলে।

---

৩১. ওই, পৃঃ ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে আনন্দের পাশাপাশি অভিমান মনোমালিন্যও আছে। বাস্তব ঘটনা এখানে ঘটে সামান্য, বাস্তবতা উপস্থাপনা বুদ্ধদেবের লক্ষ্য নয়। পাত্রপাত্রীর আবেগঘোর ভাবালুতা অনুভূতির বর্ণনা দেয়াই তাঁর লক্ষ্য এবং তা ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়। এ-উপন্যাসেও বাস্তবতার যেব্যাপারগুলো বুদ্ধদেবের কাছে মধুর ও সুন্দর বলে বোধ হয় তিনি তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। পরাশর ও কুন্তলা প্রতি বিকেলে ঘুমায়, তাদের বিছানায় পাতা থাকে 'চিকন পাটি', 'লক্ষ্ণৌছিটের সুজনি' দিয়ে ঢাকা থাকে বিছানা, 'ঝলমলে সাদা পেয়ালা' ট্রেতে বসিয়ে ভৃত্য সকাল বেলার চা আনে। কুন্তলা পরাশরের বন্ধুপত্নীর সঙ্গে 'বিলিতি দোকানে' গিয়ে 'নানা রকমের নানা রঙের পরদা' থেকে বেছে বেছে পরদা কেনে, কেনে 'পরদা খাটাবার সরঞ্জাম', নানা রঙের 'নেট'। মার্কেট ঘুরে ঘুরে স্বামী স্ত্রী মিলে কেনে 'কার্পেট', 'কুশান'। ভাঁড়ারঘর থেকে 'নানারকম তরকারি' বার করে কুটতে বসে কুন্তলা, 'স্টোভ' ধরিয়ে মাংস রাঁধে, মাংস যেতলে 'চপ' ভাজে; বিকেলে চায়ের সঙ্গে খায় 'সিংগাড়া', 'বেগুণী', 'চিঁড়েভাজা'। বুদ্ধদেব ভাবালুতা ও উপলব্ধির অনুপুঙ্খ বিবরণ রচনা করেন, বাস্তবতার খুঁটিনাটি ব্যাপার যা তার কাছে সুন্দর ও প্রীতিকর মনে হয় মোহগ্রস্ত ভাবে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেন; কিন্তু শারীরিক সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেন না তিনি। বরং ওই ব্যাপারটি তিনি এড়িয়ে যান। মনে হয় তাঁর বিবাহিত পাত্র-পাত্রী যেন বাস করে প্লেটোনিক প্রেমের ভুবনে। একটুখানি স্পর্শ করে চোখে চোখ রেখে পরস্পরের সান্নিধ্য অনুভব করেই তাদের মন পূর্ণ ও তৃপ্ত হয়ে যায়। চোখে দেখেই মুগ্ধ আবেশগ্রস্ত হয়ে থাকে দুজন, আর দুজনের হৃদয় হারাবার অকারণ শঙ্কার ত্রস্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাস্তবতার পটভূমি বুদ্ধদেবের রচনায় সংকীর্ণ, ভাবালুতা ঘোরই এখানে প্রধান।

বুদ্ধদেবের প্রতিটি উপন্যাসের প্রবল ভাবালুতাগ্রস্ত পাত্রপাত্রীরা প্রণয়জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অভিন্ন আচরণ করে। প্রণয়ীর সামান্য স্পর্শে প্রত্যেকের অভিন্ন আবেগ জাগে। নায়িকাদের প্রত্যেকে প্রেমিকের প্রতি পরম আবেগবোধ করার সময় কেঁদে ফেলে, এই কান্না তাদের প্রণয়-জ্ঞাপনের রীতি। তাদের ভাবালু হৃদয় এভাবে সুখ পায়। খুব আলগোছে তারা দয়িতের হাত স্পর্শ করে। সামান্য স্পর্শই দেয় পরম মধুর আনন্দের আস্বাদ। স্পর্শের জন্য ব্যাকুল নয় তারা কেউ। হৃদয়ের অস্থিরতা ভাবালুতা উচ্ছ্বাসের টানাপোড়েনে তারা বিহবল সবাই। যেমন, অতসী মুহূর্তের জন্য রক্তজন্বের হাত স্পর্শ করলে 'লক্ষ বিদ্যুৎ এক সঙ্গে ঝিলিক দিয়ে উঠলো রক্তজন্বের শরীরে।' 'বন্যার মতো দুলে' ওঠে তার রক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ওঃ, যন্ত্রনা, যন্ত্রনা - এত সহ্য করতে পারে কি মানুষের শরীর ? তার সমস্ত সত্তা যেন ফেটে ফেটে পড়ছে .... মৃত্যুর উন্মুখতায়।'[৩২] "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসে নায়িকার একটু স্পর্শেই নায়ক বিভোর হয়। যেমন: "অন্ধকারে, শ্রীলতার হাত পার্থপ্রতিমের হাতের উপর এসে পড়লো। .... এক টুকরো উষ্ণ প্রাণ, সেই হাত। শান্ত, নরম একমুঠো আগুন। ..... সেই আগুন, পার্থপ্রতিম অনুভব করলো, অসংখ্য সূক্ষ্ম স্রোতে সঞ্চারিত হচ্ছে তার শরীরের কোষে। প্রদীপ থেকে জ্বলে উঠছে প্রদীপ। সেই ছোটো, নরম হাতের চাপে পার্থপ্রতিম যেন পূর্ণ হয়ে গেলো।'[৩৩] "রূপোলি পাখির" নায়ক কপিলও নায়িকার 'নরম পাখির মত' হাতের সামান্য স্পর্শ পেয়ে জ্বলে ওঠে। সে টের পায় 'আগুনের শিখার মত নরম আর শিখার মত উষ্ণ, রক্তের আগুনে উষ্ণ, দয়িতার হাত। ওই হাতের সামান্য ছোঁয়ায় 'কপিলের হাতের ভিতর দিয়ে যেন এক অপরূপ সুরা রক্তের মধ্যে গিয়ে মিশলো; আর তার সমস্ত মাংস যেন জ্বলে উঠলো, জ্বলে উঠলো আনন্দে। আর তারপর মনে হলো, এ আর সে সইতে পারছে না, ... সে যেন ছিঁড়ে যাবে এই আনন্দে, এই ব্যথায়।'[৩৪] কপিলকে কাছে পেয়ে সুখের 'কান্না উথলে' ওঠে মিনুর 'বুক ঠেলে', প্রিয়তমের কাছে যাবার জন্য তার রক্তের মধ্যে জাগে 'কী ব্যাকুলতা।'[৩৫] "বাসরঘর" উপন্যাসের নায়ক পরাশরের সঙ্গে নায়িকা কুন্তলা প্রতিদিন দেখা হয়, অভিমান, মনোমালিন্য হয়, অবসানও ঘটে। প্রতি সন্ধ্যায় 'কুন্তলাকে ছেড়ে যেতে হবে এ-কথা মনে করে' পরাশরের বুকের ভেতরটা মুচড়িয়ে' ওঠে।[৩৬] কখনো 'মুমূর্ষু দিনের মধুরতার দিকে তাকিয়ে আর একবার তার মনে' পড়ে যে 'এখনই কুন্তলাকে ছেড়ে যেতে হবে। কাল আবার দেখা হবে, কাল আবার আসবে বিদায়ের সময়। যতবার ওকে ছেড়ে যেতে হয় - কী ব্যথা, কী অসহ্য ব্যথা! যদি সে তার বুকের দেয়াল ভেঙে ফেলতে পারতো, যদি ওকে ভরে রাখতে পারতো বুকের মধ্যে চির কালের মত।'[৩৭] প্রায়-কিশোর প্রেমের এমন ভাবালুতা, উচ্ছ্বাস ও অতিশয়োক্তিতে প্রেম তরল হয়ে গেছে উপন্যাসে, বাস্তব জগত হয়েছে তরলতায় আবৃত।

---

৩২. "হে বিজয়ী বীর" পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭।

৩৩. "যেদিন ফুটলো কমল", পৃঃ ২৮২।

৩৪. "রূপোলিপাখি" পৃঃ ২৫৫।

৩৫. ওই, পৃঃ ২৫৯।

৩৬. "বাসরঘর", পৃঃ ১৪।

৩৭. ওই, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অপরাজিত" (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : ১৩৩৮) এক স্বপ্ন ঘোরগ্রস্ত তরুণের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত। এ-উপন্যাসে পল্লী ও নগরের পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে, তবে পল্লী ও নগরের বাস্তবতার উপস্থাপনা এখানে লেখকের লক্ষ্য নয়, 'সুদূরের পিপাসা'-কাতর এক স্বাপ্নিক তরুণ-এর ঘোর-আচ্ছন্নতার উপস্থাপনা লেখকের লক্ষ্য। এ-উপন্যাসের নায়ক অপূর্ব। এ-ধারার অন্যান্য ঘোরগ্রস্তের সঙ্গে অপূর্বের পার্থক্য হচ্ছে অন্যান্যদের বাহ্যিক জীবন উদভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, অনির্ণেয় এক ঘোরে তাড়িত তাদের চিত্তলোক ও বাস্তব জীবন। অন্যদিকে অপূর্ব দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট অনিশ্চিত বাস্তব জীবন যাপন করে। ওই জীবন তাকে পীড়িত করে; বিপন্ন অপু ক্ষুন্নিবৃত্তির অর্থ জোগাড় করার জন্য ছাত্র পড়ানোর কাজ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়। দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করে কলকাতায় কলেজ জীবন কাটাতে হয় তাকে। বাস্তব জীবনে সে নিরীহ, মুখচোরা, আত্মকেন্দ্রিক, অর্থাৎ উদভ্রান্ত যাযাবর সে নয়। কিন্তু অন্তর্লোকে সে প্রবল স্বপ্নগ্রস্ত, বিধিবদ্ধ প্রথাগত সাধারণ জীবন তার কাম্য নয়। 'নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতি' তাকে আহবান করে, তার রক্তে সে 'রোমান্সের আহবান' শুনতেপায়। "অপরাজিত"র প্রথম খণ্ডে অপূর্বকে যুদ্ধ করতে হয় অপরিমেয় দারিদ্র্য ও দুর্দশার সঙ্গে, কিন্তু কিছুই তাকে দমিয়ে দেয় না। একে একে ঘটে প্রিয়জনদের মৃত্যু। ওই দারিদ্র্য দুর্গতি ও মৃত্যু তার মধ্যে গভীর জীবনবোধ জাগিয়ে তোলে। সে জীবনের মাধুর্য ও সহজ শ্রী আবিষ্কারের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। প্রথাগত সাধারণ জীবনকে সে ঘৃণা করে। বাধ্য হয়ে ওই জীবন গ্রহণ করতে হলে তার মনে জাগে এমন অনুভূতি : 'এই আফিস-জীবনের বদ্ধতাকে অপু শান্ত ভাবে, নিরুপায়ের মত দুর্বলের মত মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই।.... জীবন যে রকম হইবে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রতি দণ্ড পল যে তুচ্ছ আকিঞ্চিৎকর বৈচিত্র্য-হীন ঘটনায় ভরিয়া উঠিবে, তার কল্পনা তো তাহাকে এ আভাস দেয় নাই। তবে কেন এমন হয়। তাহাকে কাঁচা, অনভিজ্ঞ পাইয়া নিষ্ঠুর জীবন, তাহাকে এতদিন কি প্রতারণাই করিয়া আসিয়াছে?'[৩৭.ক] সে চায় বাধাবন্ধনহীন রহস্যময় অভিযাত্রীর জীবন। তাকে ডাক দেয় 'গম্ভীর নিনাদী জলপ্রপাত', নিস্তব্ধ নীল পর্বতের সারি, গভীর অরণ্য ও পাখিরা। তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে সুদূর সুন্দরের জন্য। ওই সুদূর সুন্দর প্রকৃতি-পৃথিবীই তার কাছে বাস্তব বা সত্য, আর প্রাত্যহিক স্থূল দুর্দশাপূর্ণ জীবন অবাস্তব বা দিনগত পাপক্ষয়ের মতো ব্যাপার। ওই সুদূরের জন্য তার মনে জাগে এমন অনুভূতি:

> টাহিটি। টাহিটি, কোথায় কত দূরে, কোন জ্যোৎস্না লোকিত সহস্যময় কূলহীন স্বপ্ন সমুদ্রের পারে, শুভরাতে গভীর জলের তলায় যেখানে মুক্তার জন্ম হয়, সাগর গুহায় প্রবালের দল ফুটিয়া থাকে, কানে শুধু

৩৭.ক. "অপরাজিত" (দ্বিতীয়াংশ), বিভূতি রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ : ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

> দুরপ্রান্ত অতীতের মত তাহাদের অপূর্ব্ব আহবান ভাসিয়া আসে । আফিসের ডেস্কে বসিয়া এক একদিন সে স্বপ্নে ভোর হইয়া থাকে–এই সবের স্বপ্নে। ঐরকম নির্জ্জন স্থানে, যেখানে লোকালয় নাই, ঘণ নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে ছোট্ট কুটিরে, খোলা জানালা দিয়া দুরের নীল সমুদ্র চোখে পড়িবে–তার ওপরে মরকতশ্যাম ছোট ছোট দ্বীপ, বিচিত্র পক্ষীরাজি, অজানা দেশের অজানা আকাশের তলে তারার আলোয় উজ্জ্বল মাঠটা একটা রহস্যের বার্ত্তা বহিয়া আনিবে কুটিরের ধারে ফুটিয়া থাকিবে ছোট ছোট বনফুল। ৩৭'খ'

ওই রহস্যময় প্রকৃতিকে সে দেখে মুগ্ধ বিস্মত দৃষ্টিতে। সে ওই রহস্যের মুগ্ধ দর্শকমাত্র নয়, তার মধ্যে জাগে একধরণের অধ্যাত্মবোধ। নিস্তব্ধ অরণ্য পর্বতের মুখোমুখি সে হয়ে ওঠে বিস্ময়বিহ্বল:

> এতদুর বিসর্পিত দিগবলয় সে কখনও দেখে নাই, এত নির্জ্জনতার কখনও ধারণা ছিল না তাহার–বহুদুরে পশ্চিম আকাশের অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখার উপরকার আকাশটাতে সে কি অপরূপ বর্ণ সমুদ্র !
>
> ... এ বিপুল আনন্দ তাহার প্রাণে কোথা হইতে আসে ।
>
> এই সন্ধ্যা, এই শ্যামলতা, এই মুক্ত প্রসারের দর্শনে যে অমৃত মাখানো আছে সে মুখে তাহা কাহাকে বলিবে ? ....কে তাহার এ চোখ ফুটাইল, কে সাঁঝ সকালের, সূর্য্যাস্তের, নীল বনানীর শ্যামলতার মায়া কাজল তাহার চোখে মাখাইয়া ছিল? ৩৭'গ

ওই ভাবুক, স্বপ্ন ঘোরগ্রস্ত যুবক শুধু স্বপ্ন-ঘোরগ্রস্তই থাকে না, সে স্রাষ্টশীলও হয়ে ওঠে এবং উপন্যাসের শেষে দেখা যায় সে বেরিয়ে পড়েছে নিরুদ্দেশ যাত্রায় । অপু রোম্যান্টিক । তার সুদুরের অভিলাষ ও স্থূল বাস্তবতায় ক্লান্তি বোধ তার এই রোম্যান্টিক চারিত্র্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় "অপরাজিত"তে নগর জীবনের ঘৃণ্য বাস্তবতার রূপ বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন, তবে এই উপস্থাপন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন করার জন্য নয়, বরং স্থূল বাস্তবতা ও অপুর রোম্যান্টিক মনোবৃত্তির মধ্যে বৈপরীত্যকে প্রকট করে তোলার জন্য । স্থূল বাস্তবতার পটভূমিতে অপুর স্বপ্নপরায়ণতা উদভাসিত হয়ে ওঠে দীপ্তভাবে । অপুর সঙ্গে অন্য স্বপ্নঘোরাচ্ছন্ন তরুণদের পার্থক্য এখানে যে অন্যরা যেখানে স্বপ্নঘোরে অনেকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, অপু সেখানে অসুস্থ হয়নি, যদিও জীবনের সঙ্গে সেও খাপ খাওয়াতে পারে নি ।

৩৭'খ' "অপরাজিত" (দ্বিতীয়াংশ), বিভূতি রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ : ৩১ ।

৩৭'গ' "অপরাজিত" (দ্বিতীয়াংশ), বিভূতি রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ : ৮৫-৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস "রাইকমল" (১৩৪১) এবং "কবি" (১৩৪৮) গভীর তীব্র প্রেমাবেগের উপাখ্যান। এদুটি উপন্যাসে প্রেমের আবেগের ভেতর দিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অর্জন করা হয়েছে। এদুটি উপাখ্যানকে আমরা উদভ্রান্ত অস্থির ঘোরাচ্ছন্ন জীবন-বাস্তবতার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছি, কিন্তু এ-দুটি উপন্যাসের সঙ্গে এ-শ্রেণীর পূর্বে আলোচিত অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেবের উপন্যাসের আবেগের প্রকৃতি ও সিদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব লঘু রোম্যান্টিক বাস্তবজীবন বিচ্ছিন্ন উদভ্রান্তির রূপ উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁদের উপন্যাস বিশেষ মূল্যবান হয়ে ওঠে নি। অন্যদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তব পটভূমিতে দৃঢ়মূল, তীব্র, গভীর, জীবনের চেয়েও মূল্যবান প্রেমের রূপ উপস্থাপন করেছেন। "রাইকমল" এবং কবি" দুটি উপন্যাসেই প্রেমবিভোর চরিত্র দুটির সমগ্রজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পরম প্রেমের জন্য অভিলাষ ও তার অপ্রাপ্তিজাত বেদনার দ্বারা। কিন্তু তবু তারা পরম প্রেমকে জীবনের শ্রেষ্ঠধনরূপে গ্রহণ করে যাপন করেছে উদভ্রান্ত পথিকের জীবন। তারাশঙ্কর সবসময়ই বাস্তব জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বাস্তবতা উপস্থাপনে তিনি অবিকল উপস্থাপনরীতির অনুসারী এবং তাঁর এই বৈশিষ্ট্য এ-শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যেও সুস্পষ্ট। বাস্তব প্রতিবেশের মধ্যে তিনি হৃদয়ের পরম ব্যাকুলতাকে চিত্রিত করেছেন।

"রাইকমল" উপন্যাসে অজয় তীরবর্তী রাঢ় ভূখন্ডের একটি বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা। রাইকমলের পরম প্রেমাবেগের কাতরতা, ব্যর্থতা, উদভ্রান্তির রূপ চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তারাশঙ্কর বাস্তব পটভূমিকে উপেক্ষা করেন নি। তিনি বৈষ্ণবজীবনের রূপ, তার প্রথা সংস্কার, আচার গৃহস্থালি দৈনন্দিন জীবন অবিকল উপস্থাপিত হয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় এই বৈষ্ণব পল্লীটি এবং ওই পল্লীর অধিবাসীদের জীবন ধারণ পদ্ধতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। যদিও ওই পল্লীজীবনের উপস্থাপন এ-উপন্যাসে তারাশঙ্করের লক্ষ্য নয়। এউপন্যাসে রাইকমল কিশোরী থেকে তরুণীতে রূপান্তরিত হয়। গভীর প্রেমে জড়িত হয় রঞ্জনের সঙ্গে, কিন্তু তার প্রেম পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায়। রঞ্জন তার শরীরের প্রতি আকৃষ্ট, রাইকমল রঞ্জনের মধ্যে পরমপুরুষ বা কৃষ্ণকে পেতে চায়। রাইকমলের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে চিরন্তন-রাধার কৃষ্ণ প্রেমের পরম ব্যাকুলতা। রাইকমলের উদভ্রান্তি তরল আবেগের ফলে নয় তার উদভ্রান্তি গভীর-আধ্যাত্মিক। তারাশঙ্কর এই উদভ্রান্তিকে বাস্তবের অবিকল পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ-উপন্যাসে হৃদয়ের ব্যাকুলতা এ বাস্তব পটভূমি গভীর সম্পর্কে জড়িত থেকে পরমপ্রেমের তৃষ্ণাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

"কবি" বীরভূম অঞ্চলের অন্ত্যজ ডোম শ্রেণীর সন্তান নিতাই-এর কবি হয়ে ওঠার এবং পরমপ্রেমের সন্ধানে জীবনকে, প্রথাগত অর্থে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার কাহিনী। তারাশঙ্কর এ-উপাখ্যানকে বাস্তবপটভূমিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন, নিতাই-এর বিকাশের পটভূমিতে রয়েছে যে-বাস্তবতা, তাকে তিনি অবিকল উপস্থাপন করেছেন। নিতাই সমাজের রসাতলের অধিবাসী। সেই রসাতলেরজীবনের উপস্থাপন ঘটেছে অবিকল উপস্থাপন-রীতিতে। নিতাইকে বলা যেতে পারে পঙ্কজ, যে পঙ্কে সে জন্ম নিয়েছে তা হচ্ছে ডোম সমাজ। নিতাই-এর কথা ছিলো ডাকাত হওয়া, কিন্তু বিস্ময়করভাবে। সে কবি হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর উপন্যাসের সূচনাতে ডোমসমাজের জীবন পদ্ধতি অবি-কল উপস্থাপিত করেছেন, তাঁর বর্ণনায় ওই রসাতলের জীবন মূর্ত হয়ে উঠেছে। ডোমশ্রেণীর জীবন ক্লেদ ও কলুষে পরিপূর্ণ। খুন চুরি ডাকাতি ইত্যাদিকে ডোমপুরুষেরা পুরুষানুক্রমিকভাবে পেশা রূপে গ্রহণ করে। ওই জীবন গ্রহনের জন্য বালক পুত্রদের উৎসাহিত ও প্ররোচিত করে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়। ওইজীবন পাপ ও রোমাঞ্চময়। তাই ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বেও পুরুষেরা ত্রস্ত হয় না, বরং ধরাপড়ার উদ্বেগ তারা একাজ করে উল্লাসই বোধ করে। মদ্যপান ও আহারের প্রাচুর্য জামাইবাড়িতে আছে জেনে নিতাই-এর মা পুত্রকে ত্যাগ করে মেয়ে-জামাতার আশ্রয়ে চলে যায়। স্টেশনে নিতাই যে কুলি-জীবন যাপন করে, তা শুদ্ধসুন্দর জীবন নয়। ওই জীবনে আছে অভাব ও অনিশ্চয়তা, স্টেশনের পয়েন্টসম্যানের রূঢ়ভাষিনী স্ত্রীর ইতর গালিগালাজ ও চীৎকার। নিতাই যে ঝুমুর দলের সঙ্গে মিলিত হয় ওই জীবনও ক্লেদাক্ত, কলুষময়, ভ্রাম্যমান। অশ্লীল নৃত্যগীত ও দেহই ব্যবসা ঝুমুর মেয়েদের পুঁজি। অশ্লীল ও কদর্য নৃত্যগীত দ্বারা তারা দর্শকদের মনোরঞ্জন করে অর্থ উপার্জন করে আর রাতের অন্ধকারে তারা পতিতা বৃত্তি করে। সস্তা মদ্যপান করে সবাই এবং ওই মেয়েরা তাদের শরীরে বহন করে চলে উপদংশের বীজ। তারাশঙ্কর নিতাই-এর জীবনের এই বাস্তবপটভূমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত করে-ছেন এবং এই কলুষিত পটভূমিতে বিকশিত করেছেন নিষ্কলুষ প্রেমের জন্য মহাব্যাকুলতা। বাস্তব-পটভূমি ও এই নিষ্কলুষ প্রেমের মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে তা দীপ্ত হয়েছে পটভূমির বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার জন্যই। নিতাই তার উদ্ভ্রান্তি ও জীবনের ব্যর্থতাকে বহন করেছে নিজের মধ্যে। তার প্রেমকে সে ভাবালুতার স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছে। এটা সম্ভব হয়েছে বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার জন্যই। তারপ্রেম আকাশকুসুম নয়, তা রসাতলের বাস্তবতায় আমূল প্রোথিত পঙ্কজ।

Dhaka University Institutional Repository

ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রিউপন্যাস "অন্তঃশীলা" (১৯৩৫), "আবর্ত" (১৯৩৫), "মোহানা" (১৯৪৩) একজন প্রৌঢ়, সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিপত্নীক ভদ্রলোকের (খগেনবাবু, যার নামই তার পরিচয় অনেকটা জ্ঞাপন করে) উদ্ভ্রান্তি ঘোরের আখ্যান। খগেনবাবু, রমলা, সুজন, বিজন এই ত্রিউপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী। এই ত্রি-উপন্যাস রচিত হয়েছে চেতনা প্রবাহ রীতিতে, পাত্রপাত্রীদের অসংলগ্ন ভাবনা আলোড়ন ও অন্তর্গত ঘোরই এখানে উপস্থাপিত হয়। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেন, 'ইহার সবচেয়ে বিশিষ্ট রচনা উপন্যাস এয়ী-অন্তঃশীলা (১৯৩৫) "আবর্ত" (১৯৩৫) মোহানা (১৯৪৩)। পোলিটিকাল ও সামাজিক আবেষ্টনে দুই সমসাময়িক নরনারীর আত্মজিজ্ঞাসার ও প্রেম-উপলব্ধির ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত।'[৩৮] "অন্তঃশীলা" উপন্যাসে পাওয়া যায় খগেন বাবুর আত্মজিজ্ঞাসা জনিত ঘোরের বিবরণ। এ-ধারার অন্যান্য ঘোরগ্রস্তের সঙ্গে খগেনবাবুর পার্থক্য হচ্ছে অন্যান্য ঘোরগ্রস্তরা তরুণ। প্রণয় বা আবেগের ঘোরে তারা উদ্ভ্রান্ত ও অস্থির। খগেনবাবু প্রৌঢ়, তার অস্থিরতার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে সামান্য, সে নিজের সঙ্গে নিজে কথার খেলায় মত্ত হয়। কখনো আত্মজিজ্ঞাসা তাকে দীর্ণ করে, কখনো রমলার প্রতি তার প্রণয় উপলব্ধিকে সে ব্যাখ্যা করতে তৎপর হয়। সে কর্মবিমুখ, নিষ্ক্রিয়, চিন্তাজীবী। তার একমাত্র কাজ সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা, নিজের সঙ্গে নিজে কথার খেলায় মত্ত থাকা। ওই কথার খেলায় মত্ত থাকাকে তার কাছে মনে হয় সুষুপ্তি। তার কাম্য ওই সুষুপ্তি :

> ....প্রকৃতি দেবীর প্রথম কম্পনের কথা কল্পনা করতে ভালোলাগে - গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বনানীর মধ্যে বনদেবতার একটি নিঃশ্বাসে পাতা শিহরনের মতন। জাগরণ নয়, শিহরণ। জাগরণ সকলে সহ্য করতে পারে না, আমি পারব না। জাগ্রত অবস্থা বড়ই স্পষ্ট, বড়ই খোলাখুলি, ইন্দ্রিয় তখন অতিশয় ক্রিয়াশীল।
>
> আমি চাই সুষুপ্তি - তামসিক তন্দ্রা নয়, রাজসিক জাগরণ নয়। সেখানে সব আছে - নির্যাসের অবস্থায় ঠিক নির্যাসত্ব নয়, কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ-অন্ধ হয়ে নয়, বাইরের চোখ বুজে, তৃতীয় নেত্র খুলে। লোকে ভাবছে ঘুমুচ্ছে।[৩৯]

---

৩৮. সুকুমার সেন "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (চতুর্থ খণ্ড) পৃঃ ২৮৩।

৩৯. "অন্তঃশীলা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১), পৃ : ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

সে বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করে না, বাস্তবজীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, বাস্তবজীবনকে এক রকম অচেতন তন্দ্রায় পরিণত করে। আত্মজিজ্ঞাসায় দীর্ণ হতে ভালোবাসে সে। অন্তর্গত স্ববিরোধিতা তাকে দীর্ণ করে, বাস্তব ও স্বপ্নের অসামঞ্জস্য তাকে পীড়িত করে। 'দিনের সাধনা, রাতের বাসনা, দিনের আদর্শ, রাতের বাস্তব, আলোর বুদ্ধি তমিস্রার দেহ - এই কি চিরন্তন বিরোধ ? বিরোধের অতিরিক্ত কি কিছুই নেই ? সামঞ্জস্য কি কেবল সাহিত্যের ভাষা ? এই দোলাতেই কি দুলব সারাক্ষণ ? সাধনা, আদর্শ, বুদ্ধির অত্যাচারে চিত্ত আমার জর্জরিত"।[৪০]

সে মানসিকভাবে বৈরাগ্য-সাধনের পক্ষপাতী, তাতে চিত্তশুদ্ধি ঘটে বলে তার বিশ্বাস, 'কবি লিখেছেন 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়', আমি ভাবি - নেতিবিচারে, অস্বীকারে যে মুক্তি সে মুক্তি আমার নয়। বৈরাগ্য সাধনের প্রয়োজন আছে, চিত্ত শুদ্ধিতে। এই আমার ধর্ম।'[৪১] প্রেমের ক্ষেত্রেও তার অন্তর্গত আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে বিরোধ বাধে। স্ত্রী সাবিত্রীকে সে ভালোবাসতে চায় অন্তর্গত আদর্শ অনুসারে এবং ব্যর্থ হয়। তার উপলব্ধি এমন : 'সবিত্রীকে বড় করতে গিয়ে ছিলাম ভালবেসে নয়, মাপকাঠি দিয়ে। মাপকাঠি দিয়ে মাপাই যায়, দীঘল করা যায় না। সাবিত্রীকে সার্থক করতে পারি নি - আমার আপশোস রাখবার জায়গা নেই।'[৪২] স্ত্রী সাবিত্রীর বান্ধবী রমলা তাকে আকৃষ্ট করে। নতুন করে প্রেমে পড়তে ইচ্ছুক হয় তার মন। সে সিদ্ধান্ত নেয় নতুন রীতিতে দায়িতাকে ভালোবাসার,'তার বিশেষ অস্তিত্ব আমি গ্রাহ্য করব। প্রথমেই গ্রাহ্য করব তার কাছে কিছু দাবি না করে। দাবি করলেই নিজের করে নেওয়া হল। দাবি না করে ভালবাসব। আমার ভালবাসার জোরেই সে নিজে থেকে পূর্ণ হবে। যতই পৃথক করে ভালবাসব ততই সে আরো ভাল হয়ে যাবে, তার নাগাল পাব না, সে আমার আদর্শকে অতিক্রম করবে, ...আমার প্রেম তার পরিণতির সুর হবে, আমার সার্থকতা তার উন্নতির সোপান হবে ? ভালবাসায় আমার আদর্শ ক্ষুন্ন হল না, মমত্ব বোধ লোপ পেল না, সমৃদ্ধতর হল। স্থাণু নয়, চলিষ্ণু ভালবাসা, যেমন এই হল আমার পুরুষ সিদ্ধি।'[৪৩]সে যাপন করে নিস্ক্রিয় ভাবুক-জীবন। সে নিজেও মানে যে সে 'রুগ্নের মতন বাইরের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে' রেখেছে[৪৪]তার

৪০· "অন্তঃশীলা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১), পৃ : ১৩৪।
৪১· "অন্তঃশীলা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১), পৃ : ১৩৭।
৪২· "অন্তঃশীলা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী১), পৃ : ১৩৬।
৪৩· "অন্তঃশীলা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১১, পৃ : ১৩৭-১৩৮।
৪৪· "অন্তঃশীলা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১), পৃ : ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইচ্ছাশক্তিও এমন প্রবল নয় যে কোনো না কোনো কর্তব্য বা কর্ম দিয়ে 'সময়কে ভারী ও তার গতিকে রুদ্ধ' করে তুলবে । চিন্তা ছাড়া তার কোনো কর্ম নেই । নিজের জীবনকে সে ব্যাখ্যা করে এভাবে,

> আমার জীবনের ক্ষণগুলি রঙ্গমঞ্চের নর্তকীর মত লঘুপদে নাচে । ক্যাম্বাসে তাদের রং, পাউডার মাখা তাদের মুখ, রাত্রি জাগরণে, অত্যাচারে, চিত্ত-শূন্যতায় তাদের চোখের কোলে কালিমা পড়েছে, কৃত্রিম তাদের আভা, তাদের নিজত্ব নেই, নৃত্য শিক্ষকের আদেশ অনুসারে ছক তৈরি করাই তাদের চরম সার্থকতা । এই আকস্মিকের ছক তৈরি করার নামই জীবন, আমার জীবন । তার মধ্যে রূপের ঐক্যনেই, মালার সাতত্য নেই, সুরের অবিচ্ছিন্নতা নেই।[৪৫]

তার মনে আছে দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব । একই সঙ্গে তার মনে 'দুটি বিপরীতভাব একসঙ্গে কাজ করে, একটির গতি বিচ্ছিন্নতার দিকে, অন্যের গতি সম্পূর্ণতা ও ঐক্যের দিকে ঝোঁকে ।'[৪৬] সে চেষ্টা করেও এই দুই বিপরীতকে এক সঙ্গে মেলাতে পারেনা বরং 'বিরোধের দোটানায়' তার 'সকল শান্তি ঘুচে গিয়েছে ।' একসময় ওই 'নিষ্কর্মা সমুন্নত, চিন্তাময়' জীবনে তার ক্লান্তি জাগে । সে উপলব্ধি করে 'সম্বন্ধেই আনন্দ । নার্সিসাসের মত নিজের মুখই দেখে এসেছি, কর্মের সোনার কাঠিতে অনুর জেগে ওঠে, শুষ্ক চিন্তাধারায় জেগে ওঠে না ।'[৪৭]

"অন্তঃশীলা" উপন্যাসে খগেনবাবুর আত্মজিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির টানাপোড়েনই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, "আবর্ত" এ পাওয়া যায় রমলা ও সুজনের সম্পর্কের জটিলতার পরিচয় । খগেন-বাবুর জন্য ব্যাকুল রমলা সুজনকে নিয়ে কাশীতে আসে । ঘটনা পরম্পরায় সুজনের মনে রমলার প্রতি গভীর আবেগ জন্ম নেয় । রমলা সুজনকে নানাভাবে শাসন ও দমন করে । রমলা ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করে খগেনবাবুর জন্য । খগেনবাবুর মনেও রমলার জন্য জাগে ব্যাকুলতা । হিমালয়ের বিভিন্ন আশ্রমে ঘুরে বেড়িয়ে একসময় খগেন বাবু কাশীতে ফিরে আসে । রমলা খগেনবাবুকে নিবিড় করে পাবার জন্য ব্যগ্র হয় । খগেনবাবুর কাশীবাসিনী মাসিমা দুজনের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় । বেদ-নার্ত সুজন কাশী ত্যাগ করে এবং উপন্যাসের শেষে মাসিমার মৃত্যু দুজনের মিলন পথের বিঘ্ন দূর

---

৪৫. "অন্তঃশীলা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১), পৃ ঃ ১৪১ ।
৪৬. "অন্তঃশীলা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১), পৃ ঃ ১৪১ ।
৪৭. "অন্তঃশীলা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১), পৃ ঃ ১৫৩ ।

করে । "অন্তঃশীলা" চেতনা প্রবাহ রীতিতে রচিত, "আবর্তে" ওই রীতির উপস্থিতি সামান্য । "মোহানা" খগেনবাবু ও রমলার একত্রে বসবাস ও ব্যক্তিস্বত্ত্বের বিরোধের ইতিবৃত্ত । মাসিমার মৃত্যুর পরে খগেনবাবু রমলার সঙ্গে বিবাহিত না হয়েও একত্রে বসবাস শুরু করে । রমলা খগেনবাবু যেমন কোনো বাস্তব কাজ করে না তেমনি তাদের মধ্যে প্রথাগত কোনো সমাজ সংস্কার নেই । দেশাচার মেনে চলার কোনো প্রয়োজন তাদের নেই । সমাজ, দেশাচার, বাস্তব জীবন এখানে গৌণ, চিন্তা, ব্যক্তিস্বত্ত্বের বিরোধ, দ্বন্দ্বই এখানে বাস্তবতার মর্যাদা পায় । দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর পরস্পরের মনে এমন প্রতিক্রিয়া জাগে,

> পরস্পরের অন্তর্ব্যাপ্তিতে শারীরিক সম্ভোগ অপাপবিদ্ধ, চিন্তাধারা অনুভূত, প্রবৃত্তিগুলি রঙ্গমঞ্চের নর্তকীদের মতন সুসম্বদ্ধ হওত । যে অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় পরিশীলনের অলিতে গলিতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন তার সন্তুষ্টি সাধন এই দেহবাদের অন্তরে বিরাজ করে । বিরোধ বিমুক্ত অবস্থায় খগেনবাবু যৌবন ফিরে পান, রমলার অকুণ্ঠ আত্মদানে জীবনের নতুন সুর আবিস্কৃত হয় ।[৪৮]

কিন্তু অচিরেই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় । রমলা মাতৃত্ব কামনা করে এবং শারীরিক অসুবিধার কারনে সে মাতৃত্বলাভে ব্যর্থ হয় । রমলা পৃথক শয্যা গ্রহণ করে । পারস্পরিক সঙ্গও আর পরস্পরের কাছে মধুর বোধ হয় না । তারা কাশী ছেড়ে একসময় নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তারা এসে পৌঁছে কানপুরে । কানপুরে খগেনবাবু কিছুদিন থাকতে মনস্থ করে । কানপুরে গিয়ে দেখা হয় সুজনের ভাই কমিউনিস্ট বিজনের সঙ্গে । সে তখন মজুর আন্দোলনের জন্য স্থানীয় পার্টিকর্মী ও মজুরদের সঙ্গে কাজ করছিল । খগেনবাবু পার্টির কাজে জড়িয়ে পড়ে, তার ভাল লাগে পার্টির নেতা সফীককে । রমলা কানপুরের অভিজাত শ্রেণীটির সঙ্গে মেলামেশার জন্য ব্যগ্র হয় । একটি চমৎকার বাংলো ভাড়া নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেনা হয় চমৎকার আসবাবপত্র ও গাড়ি । স্থানীয় অভিজাত নারীপুরুষ ও ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে রমলার সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে । ধনী অবিবাহিত এক অধ্যাপক রমলার গুণ ও রূপগ্রাহী হয়ে ওঠে, রমলাও তার প্রতি দুর্বল হয় । রমলা ও খগেনবাবুর মানসিক দূরত্ব বেড়ে যায় । পার্টির কাজে সাহায্য করার ব্যাপারটিও খগেনবাবুকে আর স্বস্তি দেয় না । তার মধ্যে জাগে দ্বন্দ্ব - আত্মজিজ্ঞাসা,

> একলা বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগে না । অথচ সেদিন পর্যন্ত নিরালায়

---

৪৮০ "মোহানা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১), পৃঃ ৫-৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

> সাধনাই কাম্য ছিল । পাহাড়ে নিঃসর্গ ভ্রমন, বই-এর বনে বহু পুরাতন চীনে কবি, বহুদুরের মেকসিকান চিত্রকর, অতি আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যিকের সঙ্গে প্রদান বর্জিত সুমুন্ধ, শয্যায় সাবিত্রী ও রমলা, তবুও সেই দুরতিক্রম্য ব্যবধান দুর হল না । এ যেন একটি স্বরূপ সিদ্ধির ক্রমিক পর্যায়। বিপরীত বোধের জন্ম হল, দেহ চর্চায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে সেটা বৃদ্ধি পেল। আজ রমলা সরে গেছে, আন্দোলনের প্রাণ নেই, ধাক্কা খেয়ে যে-কে-সেই। ...দুরে ছুঁড়ে ফেলা আর কাছে টেনে নিয়ে আসা এক প্রকারের ছেলে খেলা । এটা কিন্তু খেলা নয় । মাসীমা ঠিক বুঝেছিলেন রমলার সঙ্গে চলবে না...তার মৃত্যুতেও বিরোধের অবসান হল কৈ?[৪৯]

রমলা ও খগেনবাবুর বিচ্ছিন্নতার মধ্যদিয়েই "মোহানা" উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে ।

"অন্তঃশীলা" সম্পর্কে ধূর্জটি প্রসাদ বলেছেন, 'একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল । বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়ণই হল খগেন-বাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া কিন্তু পলায়ণ অসম্ভব । নিজের অজ্ঞাতে খগেনবাবুর রমলাদেবীর প্রতি আকর্ষণ হল অন্তঃশীলার বিষয় ।'[৫০] "অন্তঃশীলা" ও অন্য দুটি উপন্যাস বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপন নয়, এ-উপন্যাস তিনটি উপস্থাপন মনোবাস্তবতার । লেখক উপন্যাস তিনটির পাত্রপাত্রীদের বাহ্যবাস্তবতা থেকে সঙ্কুচিত করে সংহত করেছেন তাদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনকে পরিণত করেছেন মনোগত চিন্তাস্রোতে। তাই এ-উপন্যাস তিনটি হয়ে উঠেছে 'চিন্তাস্রোতের কলু কলু ধ্বনি ।'[৫১] এগুলোতে অতিসাধারণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনা নিয়ে চিন্তা স্রোত বয়ে চলে এবং অভিজ্ঞতার বদলে প্রকাশ পায় অভিজ্ঞতার তাৎপর্য । লেখক বাহ্যবাস্তবতা থেকে চরিত্রদের শুধু গুটিয়েই নেন নি তিনি বাহ্যবাস্তবতার অনেক সত্যকে অস্বীকারও করেছেন । যেমন রমলার স্বাধীন জীবনযাপন এবং "মোহানা"য় রমলা ও খগেনবাবুর অবিবাহিত সহবাস । বাহ্যবাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত উপন্যাসে এ-ঘটনা বড়ো সংকটের সৃষ্টি করতো কিন্তু এ-উপন্যাস গুচ্ছে তা কোনো সংকটের সৃষ্টি করেনি । বরং একে অত্যন্ত স্বা-ভাবিক জীবন যাপন রূপে চিত্রিত করা হয়েছে । এর কারণ বাহ্যবাস্তবতা এখানে মূল্যহীন, এখানে মূল্যবান শুধু মনোবাস্তবতা এবং ঘোর সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতা ।

---

৪৯. "মোহানা" (ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১), পৃ ঃ ১৪৯ ।

৫০. 'ভূমিকা' "অন্তঃশীলা" দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৩, ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১, ১৯৮৫, পৃ ঃ ২৪০।

৫১. ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, '"অন্তঃশীলা"র বিচার', উদ্ধৃত, ধূর্জটি প্রসাদ রচনাবলী ১, পৃ ঃ ২২৬ ।

এসময়ে কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে যেগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে বিচিত্রধরনের মনোবিকার, অবদমিত যৌনবিকার, সন্তানবিয়োগের শোকজনিত বিকার, সন্দেহজনিত বিকার, বাতিকগ্রস্ততা, যৌনঈর্ষাজাত বিকার ইত্যাদি। এ-সমস্ত উপন্যাসে এই বিকারগ্রস্ত চরিত্রেরাই প্রধান এবং তারা প্রথাগত সামাজিক জীবনযাপন করে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না তাদের ভেতরে রয়েছে কতটা বিকারের স্তূপ। এ-সব উপন্যাসে পাত্রপাত্রীদের সামাজিক পটভূমি বিস্তৃতভাবে অবিকল উপস্থাপিত করা হয়, এই পাত্রপাত্রীরা সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চায়, কিন্তু তাদের অস্বাভাবিকতার জন্য তারা প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীর উপন্যাসকে প্রথাগত ভাবে মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণীতেই বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে এগুলোর চারিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এগুলোকে ঘোরবিকার অস্বাভাবিকতার উপস্থাপন হিশেবে গণ্য করা হয়েছে, কেননা এর ফলে এইসব উপন্যাসে উপস্থাপিত বাস্তবতার স্বরূপ অনেকবেশি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা সম্ভব।

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর "আকাশ ও মৃত্তিকা" (১৩৪০) একটি নারীর মনোবিকলনজনিত উদভ্রান্তির উপাখ্যান। এ-উপন্যাসের নায়িকা জয়ন্তী, সে উচ্চশিক্ষিত, তরুণী এবং জমিদারের বিধবা স্ত্রী। কলেজে পড়ার সময় কলকাতার অধিবাসী জনৈক ধনী জমিদার পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তাদের বিবাহিত জীবন ছিলো মধুর, প্রেমপরিপূর্ণ। বিয়ের অল্পদিন পরে স্বামী মারা গেলে জয়ন্তীকে জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয়। জমিদারী দেখাশোনার ব্যস্ততা শেষ হলে সে প্রতিদিন স্বামীর বিশাল তৈলচিত্রকে পূজা করতে বসে; গলার লকেটে স্বামীর ছবি রেখে নিজের কামনাকে সংবরণ করে। কিন্তু তার মধ্যে দেখা দেয় ছেনালীপনা। জয়ন্তী নিয়ন্ত্রিত হয় অবদমিত কাম দ্বারা। ওই অবদমিত কাম তাকে অস্থির, উদভ্রান্ত, বিকারগ্রস্ত করে তোলে। স্বামীর জমিদারীর কাজকর্ম ছবিপূজা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সে তার কামনাকে অবদমন করে। লোকে যেমন শখ করে কুকুর পুষে থাকে, তেমনি জয়ন্তী পোষে অনুরাগী পুরুষ। তার জমিদারীর কাজকর্ম দেখার জন্য সে নিযুক্ত করে একের পর এক তরুণ নায়েব। তাদের মধ্যে নানা ভাবে অনুরাগ জাগিয়ে তোলে, নানাভাবে প্রশ্রয় দেয় তাদের, কিন্তু কাউকেই সে গ্রহণ করে না। কারণ সে স্বামীর ছবি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিশেষে সে প্রজাদের গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ওই আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্বামীর ছবিসহ লকেটটি সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। স্বামীর প্রভাবমুক্ত হয়ে নতুন জীবনের জন্য সে কাশী যাত্রা করে। "আকাশ ও মৃত্তিকা"র জয়ন্তী কামবিকারগ্রস্ত এক বিধবা তরুণী। এ-উপন্যাসে যে বাস্তব পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে তা বাস্তবতার উপস্থাপনার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

নয় বরং ওই তরুণীর বিকারকেই বিচিত্ররূপে উপস্থাপনার জন্য। তার বিভিন্ন আচরণে অবদমিত কাম নানাভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে, এমন কী তা নিষ্ঠুরতার পর্যায়েও পৌঁছেছে। উপন্যাসের শেষে তার রোষে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় একটি সম্পূর্ণ গ্রামে; ওই অগ্নিকান্ড যেন তারই ভয়াবহ অবদমিত বিকৃত কামের প্রকাশ। ওই আগুনে পল্লীটিই শুধু দগ্ধ হয় নি, তার স্বামীর স্মৃতি দগ্ধ হয়েছে। "আকাশ ও মৃত্তিকা" কাম বিকারের উপস্থাপন, তা বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপন নয়।

জগদীশগুপ্তের "রতি ও বিরতি" (১৩৪৯) এবং "নন্দ আর কৃষ্ণা" (১৯৪৭) উপন্যাসের উপজীব্য বিকার; প্রথমটিতে উপস্থাপিত হয়েছে সন্তান বিয়োগের ফলে শোকের অতিরেকজনিত বিকার, দ্বিতীয়টিতে কামক্ষুধা ও তার অচরিতার্থতাজনিত বিকার। "রতি ও বিরতি" উপন্যাসে গ্রামের একজন দিনমজুরের জীবনবাস্তবতা বর্ণিত হয়। দরিদ্র দিনমজুর রাম ও গয়ামনির সংসারে শিশুপুত্র লবের আবির্ভাব ঘটে। পুত্রকে নিয়ে ভবিষ্যতের নানা মধুর স্বপ্ন ও পরিকল্পনা করে পিতামাতা। সর্পদংশনে লবের মৃত্যু হলে জননী গয়ামনি উন্মাদ হয়ে যায় এবং নদীর জলে সে আত্মহত্যা করে। শোকগ্রস্ত রামের মধ্যে দেখা দেয় নানা বিকার ও অস্বাভাবিকতা। রাম ও গয়ামনি যেজীবন যাপন করতো তা ছিলো আদিম ও প্রাকৃত। কায়িকশ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিনের জীবিকা নির্বাহের অর্থ আয় করতো রাম। ওই সংসারের গৃহিনী গয়ামনির দায়িত্ব ছিলো খাদ্যপ্রস্তুত করা ও সন্তান পালন। পুত্র লবের প্রতি তারা এতো উগ্র ও তীব্র বাৎসল্যবোধ করে যে তাকে পাশবিক বাৎসল্যবোধ বলে অভিহিত করা যায়। পুত্রের মৃত্যুতে তাদের মনোজগতে যে বিকার দেখা দেয় তা আদিম জীবনযাপনকারী অসংস্কৃত মানুষের বিকার। মধ্যবিত্তের মতো গভীর বিষাদ, মনস্তাপ কিংবা শোকে নিঃশব্দে দগ্ধ হয় না রাম ও গয়ামনি, তারা শোকপ্রকাশে উচ্চকণ্ঠ, তাদের বিকারও উগ্র। জগদীশগুপ্তের স্বভাবই হচ্ছে মানুষের বিকৃতিকে প্রধান করে তোলা; যেমন পল্লীসমাজভিত্তিক উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছিলেন ইতরতা কতো সর্বব্যাপী হতে পারে আর এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন বিকারই জীবনের নিয়ন্ত্রক।

নন্দ আর কৃষ্ণা" উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে নন্দের কামক্ষুধা ও অতৃপ্তিজনিত বিকার। নন্দ বিবাহিত তরুন। স্ত্রীর সঙ্গে তার সহজসাধারণ সম্পর্ক। কলকাতায় ধনী ব্যবসায়ী মনীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতা করতে এসে একদিন মনীন্দ্রবাবুর সুন্দরী রক্ষিতাকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলে সে। রক্ষিতা কৃষ্ণা এতে ক্ষিপ্ত না হয়ে বরং নন্দকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে থাকে। স্বভাবস্বৈরিনী ওই তরুণী

Dhaka University Institutional Repository

নানাভাবে তার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে মজাপায়। নন্দের মধ্যে জাগে তীব্র কামাবেগ, যা স্ত্রীর প্রতি সে কখনো বোধ করেনি। নন্দ নিরীহ ভদ্র, নিজেকে সে জানে পরস্ত্রীর প্রতি লালসাবোধ করার ইতরতা মুক্ত ভদ্রলোকরূপে। ক্রমশ সে টের পায় পরস্ত্রীর সৌন্দর্যদর্শনের বাসনাই শুধু নয়, তার মধ্যে ওই সৌন্দর্যময়ীকে সম্ভোগেরকামনাও তীব্রতর হয়ে উঠছে। তখন থেকে সে ঘোরগ্রস্ত অস্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকে। কামক্ষুধা মানুষের জীবনে কতোটা গভীর প্রভাব বিস্তার করে জগদীশগুপ্ত তা নির্দেশ করেছেন। এখানে একটি সুশীল শান্ত তরুণ কামক্ষুধায় হয়ে ওঠে বিকৃত, অতৃপ্ত কামুক। দিবাভাগ যার কাটে কামচরিতার্থতার নানা দিবাস্বপ্নে আর রাত্রিগুলো কাটে সুন্দরী পরস্ত্রীর আগমণ প্রত্যাশায়। কামক্ষুধা তাড়িত অস্বাভাবিক জীবনই এ-উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে, বাস্তব পটভূমি নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ-শ্রেণীর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কোনো না কোনো বিকার ঘোর দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা সাধারণত প্রথাগত সামাজিক জীবনই যাপন করে, প্রথা-সমাজ ও অন্য ব্যক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার প্রবণতাও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাদের অন্তর্গত অস্বাভাবিকতার কারনে ওই সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তারা ব্যর্থ হয়। সমাজে বাস করেও তারা যাপন করে সমাজবিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, খাপনা খাওয়া জীবন। মানিক উপন্যাসে সাধারণত একটি পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করেন, তবে পরিবারের একটি দুটি চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে। সমাজ বাস্তবতা কিংবা পারিবারিক জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা তাঁর উপন্যাসে প্রধান নয়, মানুষের অন্তর্গত অস্বাভাবিকতার উপস্থাপনই প্রধান। তাঁর উপন্যাস মূলত মানুষের বিচিত্র বিকারের সমষ্টি। তিনি সাধারণতঃ শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে তাঁর এ-শ্রেণীর উপন্যাসের পাত্রপাত্রী নির্বাচন করেন, তবে দু-একটি উপন্যাসের পাত্রপাত্রী গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাঁর নায়কেরা উচ্চশিক্ষিত সমাজ ও রাজনীতি সচেতন, স্থিতধী এবং প্রাজ্ঞতরুণ, বাহ্যিকভাবে অস্থির উদভ্রান্ত তারা নয়, যদিও অন্তরলোকে তারা নানা জিজ্ঞাসা বিকার ও ঘোরে আচ্ছন্ন থাকে। তাঁর নায়িকারাও বাহ্যিকভাবে স্থির ও স্বাভাবিক, কিন্তু অন্তরলোকে নানা আলোড়ন তাদের দীর্ণ করে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের প্রধান পাত্রপাত্রীরাই শুধু বিকারগ্রস্ত নয়, অপ্রধান পাত্রপাত্রীরাও বিকারগ্রস্ত। মানিক বন্দোপাধ্যায় এক বাহ্যবাস্তব দিয়ে ঘেরা বিকারের জগতের উপস্থাপক।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ঘোরবিকারের জগতের সূচনা হয়েছে তাঁর প্রথম উপন্যাস "দিবা-

Dhaka University Institutional Repository

রাত্রির কাব্য" (১৯৩৫)-এ। এ-উপন্যাসে শুধু প্রধান চরিত্ররাই নয়, অপ্রধানেরাও অস্বাভাবিক। "দিবারাত্রির কাব্যে" বাহ্যবাস্তব অবিকল উপস্থাপিত হয়নি, তাকে ভেঙেচুরে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে বিকারগ্রস্ত চরিত্রদের। হেরম্ব মনোবিকলনগ্রস্ত, নিষ্ক্রিয়, দার্শনিক ভাবুকতাসম্পন্ন তরুণ। প্রেম বা অন্যকোনো সম্পর্কেই সে স্বাভাবিক নয়। সে নিজের প্রেমিকাকে নির্দ্বিধায় অন্যের সঙ্গে বিবাহিত হতে বলে। তার সম্পর্ক হয়েছে তিনটি নারীর সঙ্গে, সুপ্রিয়া, আনন্দ এবং তার স্ত্রী। তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে এবং অন্য দুজনও স্বাভাবিক নারী নয়। তারমধ্যে সুপ্রিয়া অবদমিত কামে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয় এবং আনন্দও আত্মহত্যা করে। আনন্দ বেড়েই উঠেছে অস্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশে, ফলে স্বাভাবিক জীবন তার আয়ত্তের মধ্যে আসে নি। তার পিতামাতাও অস্বাভাবিক। "দিবারাত্রিরকাব্যে" বাহ্যবাস্তবতা মূল্যহীন, এখানে বাস্তব হয়ে উঠেছে পাত্রপাত্রীদের বিকারগ্রস্ততা। "দিবারাত্রির কাব্যে" সমস্ত চরিত্র নিয়ন্ত্রিত অবদমিত কাম দ্বারা। এখানে সত্য হচ্ছে কাম ও বিকার।

"পুতুল নাচের ইতিকথা" (১৯৩৬) রচিত হয়েছে গাওদিয়া নামক একটি ছোটো গ্রামের পটভূমিতে। এ-উপন্যাসে গাওদিয়া গ্রামের সমাজবাস্তবতা ও প্রকৃতির উপস্থাপনা ঘটেছে। গাওদিয়ার সমাজজীবন সংকীর্ণতা হানাহানি কুৎসাদলাদলিতে পূর্ণ। ওই জীবনে আছে দেবদ্বিজে অন্ধভক্তি ও দেশাচার সংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য। ঋতুতে ঋতুতে গ্রামের স্বাস্থ্য ও আবহাওয়ার বদল ঘটে, আসে নানাউৎসব। এসব নিয়েও গাওদিয়া গ্রামের জীবনপ্রবাহ শান্ত, নিস্তরঙ্গ, একঘেয়ে। ক্ষেতের চাষাবাদ, টুকটাক ব্যবসা, শহরে ছোটখাট চাকুরি ইত্যাদি পেশা ওই গ্রামের অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। অর্থাৎ একটি সাধারণ বাঙলার পল্লী ও তার জীবন উপস্থাপিত হয়েছে, যেগ্রাম বা জীবনের নিজস্ব কোনো অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বাভাবিক পল্লীর পটভূমিতেই উপস্থাপিত করেছেন একরাশ অস্বাভাবিক চরিত্র। এই অস্বাভাবিক চরিত্রদের মধ্যে রয়েছে শশী, কুসুম, যাদবপণ্ডিত ও তার স্ত্রী, যামিনী কবিরাজ ও তার স্ত্রী সেন দিদি, মতি ও তার স্বামী কুমুদ, শশীর বোন বিন্দু ও তার স্বামী নন্দ, শশীর বাবা গোপাল প্রমুখ, এরা দুধরণের শক্তির চাপে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে; একধরণের শক্তি হচ্ছে তাদের অব্যবহিত প্রতিবেশ, আরেক ধরণের শক্তি হচ্ছে তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। শশী এম, বি, বি, এস ডাক্তার, গ্রামে থাকার কথা তার ছিলো না। কিন্তু তার অব্যবহিত প্রতিবেশের চাপে সে গ্রামে থাকতে বাধ্য হয়েছে, এবং তার সহজাত

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্ক্রিয়তাও তাকে ওই জীবন মেনে নিতে বাধ্য করে। শশীর যে অস্বাভাবিকতা তা তার সহজাত নিষ্ক্রিয়তার ফল। এই নিষ্ক্রিয়তার জন্যই সে কুসুমের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। এবং হয়ে ওঠে মূক, মন্থর, নির্জীব প্রাণী। শশীর জন্য কুসুমের আবেগের মধ্যেই অস্বাভাবিকতার বীজ রয়েছে যার পরিণতিতে কুসুম পরিণত হয় বিমর্ষ, নির্জীব এক নারীতে। শশীর পিতাও অস্বাভাবিক। সে তার সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব শশীকে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় যা তার মতো একজন সাংসারিক মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। যাদব পণ্ডিত ও তার স্ত্রী জীবনযাপন ও তার পরিণতি বিকারের ফল। যাদবপন্ডিতের বিকার হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে অতিবিশ্বাস; যে বিশ্বাসের জন্য তাকে সস্ত্রীক আত্মহত্যা বরণ করতে হয়। যামিনী কবিরাজের বিকার হচ্ছে স্ত্রীর সৌন্দর্যে অতিমুগ্ধতা এবং স্ত্রীকে নিয়ে সন্দেহপরায়ণতা, যা তাদের পারিবারিক জীবনকে তিক্ত করে তোলে। শশী, কুসুম শশীর পিতা গোপাল, যাদব পণ্ডিত ও তার স্ত্রী, যামিনীকবিরাজ ও তার স্ত্রী সেনদিদির বিকার বিশেষ সীমার মধ্যে সীমিত; কিন্তু এউপন্যাসে রয়েছে আরো কয়েকটি চরিত্র, যেমন বিন্দু ও তার স্বামী নন্দ, কুমুদ ও তার স্ত্রী মতি- যাদের অস্বাভাবিকতা ও বিকার সীমাহীন। তাদের জীবনযাপনকে উন্মত্ততারই একটিরূপ বলে বোধ হয়। বিন্দুর সঙ্গে বিন্দুর বিয়েই হয়েছে অস্বাভাবিকভাবে নন্দের অনিচ্ছায়। বিয়ের পর স্ত্রীকে কলক'তায় নিয়ে নন্দ তাকে রক্ষিতার জীবনযাপন করতে বাধ্য করে। এমন কী বিন্দুর দাঁত সাঁড়াশী দিয়ে উপড়ে ফেলে তাকে মদ্যপান করায় এবং বাইজীরমতো জীবনযাপনে অভ্যস্হ করে অর্থাৎ তাদের বিবাহিত জীবনও অস্বাভাবিক। পরে প্রৌঢ় নন্দ বিন্দুকে প্রথমস্ত্রীর সংসারে এনে গৃহস্হনারীতে পরিণত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর নন্দ ও বিন্দু ওই অস্বাভাবিক জীবনকেই স্বাভাবিক জীবনরূপে গ্রহন করে। নন্দ হচ্ছে বিকারের মনুষ্যরূপ। কুমুদ বিকারগ্রস্ত নয়, কিন্তু সে ঘোরগ্রস্ত। সে স্বাপ্নিক, পরিকল্পনা সর্বস্ব, নিষ্ক্রিয়, বাকনিপুণ ও উদ্দেশ্যহীন। তার সংস্পর্শে তার স্ত্রী মতি স্বাভাবিক গ্রাম্য বালিকা থেকে তারই ছায়া হয়ে ওঠে। তাই এ-উপন্যাসে বিপুলভাবে উপস্হাপিত হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির অস্বাভাবিকতা ও বিকার। বাস্তবপ্রতিবেশ পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু সারা উপন্যাসে বাস্তবতারূপে উপস্হাপিত হয়েছে ব্যক্তিমানুষের অস্বাভাবিক জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অন্তর্গত বিকার আবিষ্কার করেন সর্বত্রই। ওই বিকার কোনো বিশেষ শ্রেণী বা এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়, "জীবনের জটিলতা" (১৯৩৬)-য় তিনি বিকারের উদঘাটন করেছেন কলকাতা শহরের নিম্নমধ্যবিত্তপাড়ার দুটি কেরাণী পরিবারের জীবনযাপনের মধ্যে। এই উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের বর্ণনা রয়েছে ওই জীবন অনেকটা অবিকল উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের বাহ্যজটিলতার উদঘাটন এ-উপন্যাসের মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হচ্ছে যৌনকামনা বাসনা জাত বিকার ও অস্বাভাবিকতা। বিমল প্রতিবেশী পরস্ত্রীর প্রেমে পড়ে কিন্তু সে অন্যতরুণীর প্রেম নিবেদনে সাড়া দেয় না অর্থাৎ স্বাভাবিক হৃদয়সম্পর্কেজড়িত হয়ে স্বাভাবিক জীবনের প্রতি সে আকর্ষণ বোধ করে না। এ-উপন্যাসে অধর অত্যন্ত অস্বাভাবিক মানুষ। স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে স্বাভাবিকতা নেই এবং সে যখন জানতে পারে তার স্ত্রী বিমলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িত আছে, যৌনঈর্ষাতাকে পরিণত করে মূর্তিমান বিকারে। সে হয়ে ওঠে চক্রান্তপরায়ণ, নীরব নিঃশব্দ পীড়নকারী। সে স্ত্রীকে তার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করে, স্নায়বিক অত্যাচার চালায়; নিজে স্ত্রী খুন না করে স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। কিন্তু স্ত্রীর আত্মহত্যায়ই তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় না। সে তার স্ত্রীর প্রেমিকের বোনকে বিয়ে করতে চায় নিজের প্রতিহিংসা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করার জন্য। এ-উপন্যাসে নগেন আরেকটি অস্বাভাবিক ও বিকৃত চরিত্র। সে একের পর এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে এবং তাদের প্রত্যাখ্যান করে অদ্ভুত আনন্দ লাভ করে। এ সমস্ত চরিত্রের বিচিত্র বিকারের পরিচয় দিয়ে "জীবনের জটিলতায়" এক শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকার জগত সৃষ্টি করা হয়েছে। এজগতে বিকারগ্রস্তরাই শক্তিমান, তারাই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সুস্থরা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও তাদের চক্রান্তের শিকার, এ-উপন্যাসটি তাই বাহ্যজীবনের জটিলতার উপস্থাপন নয়, এটি বিকৃত মনোজাগতিক জটিলতার উপস্থাপন।

" অমৃতস্য: পুত্রী " (১৯৩৮) উপন্যাসে কলকাতাশহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত দুই পরিবারের প্রেক্ষাপটে চরিত্রদের ব্যাতিকগ্রস্ততা উপস্থাপিত হয়েছে। এ-উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেও আয়রণি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুধর্মে মানুষ অমৃতের সন্তান, কিন্তু মানিক দেখান অমৃতের সন্তানদের মধ্যে মহৎ গুণাবলীর কিছুই নেই, তারা বাতিক ও বিকারের সমষ্টি। এ-উপন্যাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনবাস্তবতা অবিকল উপস্থাপিত হয়, তবে জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা এখানে গৌণ - ব্যাপার, মুখ্য পাত্রপাত্রীদের অস্বাভাবিকতা ও বাতিকগ্রস্ততার উপস্থাপন। অনুপম ও তার মা সাধনা

Dhaka University Institutional Repository

এবং তাদের সঙ্গে থাকতে আসা অনুপমের পিতার বন্ধুকণ্যা বিধবা তরুণী তরঙ্গ মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। এরা কেউই স্বাভাবিক জীবনযাপন করেনা। অনুপমের মা সাধনার জীবন অস্বাভাবিক। তার সমগ্রজীবনই নিয়ন্ত্রিত হয় শ্বশুরকুলকে ঘৃণা করার বাতিক দ্বারা। সাধনার স্বামী পিতৃকুলের প্রতি সারাজীবন যে ঘৃণা লালন করে স্বামীর মৃত্যুরপর ওই ঘৃণা লালনের দায়িত্ব নেয় সে। বিধবা অস্থির তরুণী তরঙ্গ ভোগে উন্নত আদর্শজীবন যাপন করার বাতিকে। শেষপর্যন্ত ওই বাতিক তাকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে যায়। অনুপম উদ্‌ভ্রান্ত ও ঘোরগ্রস্ত তরুণ, একের পর এক অস্বাভাবিক ঘোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সে। শৈশব থেকে প্রথমযৌবন পর্যন্ত মায়ের নির্দেশে পিতৃকুলকে ঘৃণা করাই হয়ে ওঠে তার জীবন। তরঙ্গের মৃত্যুর পর সে হয়ে ওঠে বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক। ওই অস্বাভাবিকতা থেকে মুক্তির জন্য তাকে জড়াতে হয় নতুন ঘোরে। রাজনীতি করার নেশায় আচ্ছন্ন হয় সে। তারপর শ্রীর নিয়ন্ত্রনে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ উচ্চবিত্তের জীবনের স্বপ্নদেখার বাতিক তাকে পেয়ে বসে। সীতাপিসী উচ্চবিত্ত পরিবারের বিধবা। তার বাতিক নানারকম ভাবালুতা ও নাকি কান্না প্রদর্শনের সুযোগ খুঁজে বার করা। ধনীর গৃহিনী শঙ্করের মায়ের বাতিক একখাপছাড়া চিরস্থায়ী বিষাদ লালন করা। নিজের চারদিকে একটি গভীর বিষাদের আবহাওয়া সৃষ্টি করে রাখাই তার আনন্দ। তার স্বামী রামনাথের জীবনই তার কাছে একটি বড়ো সমস্যা। তার কোনো কিছুই ভালো লাগে না। প্রতি সন্ধ্যায় তাই মদ্যপান করে জীবনের কিছু ভালো না লাগার ব্যাপারটাকে তীব্র করে নিতে হয়। ওই পরিবারের তরুণ শঙ্কর অনুপমের মতোই উদ্‌ভ্রান্ত ও ঘোরগ্রস্ত; নানারকম খাপ্যাম্মিতে পরিপূর্ণ তার জীবন। তরঙ্গের ভালোবাসা লাভে ব্যর্থ হয়ে জনসভায় গিয়ে অর্থহীন হিস্টিরিয়া করে জনসমক্ষে নিজেকে পাগল প্রতিপাদন করে সে প্রেশাধ উপলব্ধ করে। তাড়ির দোকানে পিকেটিং করে জেলে যায়। তরঙ্গের প্রতি আবেগও নিঃশেষ হয়। তখন সে মেতে ওঠে নতুন ঝোঁকে। তখন রাজনীতির পথে প্রসিদ্ধ হবার বাতিক দেখা দেয় তার মধ্যে। অমৃতের পুত্রদের উৎকট বাতিকগ্রস্ততার জটিলতা উপস্থাপন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মহিমা হরণ করেছেন, "অমৃতস্য: পুত্রা"য় তারা হয়ে উঠেছে গরলের সন্তান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "অহিংসা" (১৩৪৮) উপন্যাসে বিকারকে সামাজিক পরিবেশ থেকে কপট আধ্যাত্মিক আশ্রমের পরিবেশে নিয়ে গেছেন; এবং দেখিয়েছেন অহিংসার মুখোশের আড়ালে বিকার, বিশেষ করে যৌনবিকার, কীভাবে আশ্রমের আরাধ্য হয়ে উঠেছে। আশ্রমের পরিচালক বিপিন ভন্ড, আশ্রম হচ্ছে তার ধনউপার্জনের উপায় এবং ওই আশ্রমের কপট সাধু সদানন্দ ধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

মুখোশে আবৃত এক যৌনবিকারগ্রস্ত মানুষ। ওই আশ্রমে একরাজপুত্র মাধবী নামে একটি মেয়েকে হরণ করে এনে রাখে, এরপর সাধু সদানন্দ ও মাধবীর মধ্যে গড়ে ওঠে বিকারগ্রস্ত কামের সম্পর্ক। মাধবী এরপর বিবাহিত হয়, কিন্তু সাধুর সঙ্গে তার বিকৃত সম্পর্ক সে লালন করে চলে। সদানন্দ জোর করে তার দেহভোগ করে বলে মাধবী তাকে ঘৃণা করে। স্বামীকে দিয়ে তাই সুযোগমতো সদানন্দকে প্রহৃতও করে মাধবী, আবার স্বামীর কোমল বিনীত প্রণয় নিবেদন ও আলিঙ্গন তাকে বিরক্ত করে। সদানন্দের তীব্র পেষণ, বল প্রয়োগ ও অত্যাচারের জন্য তার মন সংগোপনে উন্মুখ হয়ে থাকে। স্বামীর অনুরাগে তৃপ্ত হয়েও সে তাই নানা ছুতায় আশ্রমে ছোটে এবং সদানন্দের সম্ভোগকামনা চরিতার্থ হতে দেয় সে। দ্বিচারিতা ও 'ম্যাসোকিজম'-এর বিকার হচ্ছে মাধবী। আশ্রম এ-উপন্যাসে বাহ্যিক পটভূমি মাত্র। এর মূল বিষয় বিকার।

'ধরাবাধা জীবন" (১৯৪১) উপন্যাসে একটি বিবাহিত ও পরে বিপত্নীক পুরুষ ও একটি ডাক্তার তরুণীর প্রণয়ের মানসিক ও শারীরিক সঙ্কট উপস্থাপিত হয়েছে। তাদের বাস্তবজীবন বিস্তৃত ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু প্রধান হয়ে উঠেছে তাদের মানসিক সঙ্কট। প্রভার মানসিক এবং শারীরিক সঙ্কটের যে-বর্ণনা মানিক দিয়েছেন, তা এমন :

> কোনদিন অন্যমনেও তার কাছে মেলামেশার বেশি কিছু চাহিবে না, প্রথমে একথা তার কল্পনাতেও ছিল না। কল্পনা করিতেও চায় নাই। একটু অধীরতার সঙ্গে অন্যকল্পনাই বরং সে আরম্ভ করিয়াছিল, কবে কথা বলিতে বলিতে ভূপেন তার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া নিবে — তারপর দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গিয়াছিল, মাঝে মাঝে ভূপেনের চোখে সে দেখিয়াছিল ক্ষুধা আর কাতরতা, কিন্তু কথায় সে কিছু বলে নাই, ব্যবহারে কিছু বুঝিতে দেয় নাই।
>
> এ অভিজ্ঞতা ছিল তার অভিজ্ঞতার বাইরে। পুরুষ ঘনিষ্ঠ হয় যতখানি হওয়া সম্ভব, বছর পার হইয়া যায়, প্রকাশ্যে আর নির্জনে কাছাকাছি হওয়ার ভূমিকা করিয়া, অথচ কিছুই ঘটে না। এ কোন দেশী সম্পর্ক নারী ও পুরুষের ? জীবনের অনেক সীমাহীন সম্ভাবনার দুর্বোধ্য রহস্যময় অনুভূতি তাকে কখনো ব্যাকুল করিয়া করিয়া রাখিত, কখনো সে অনুভব করিত খাপছাড়া আনন্দ, বিষাদের চাপে জীবন কখনো হইয়া উঠিত

মুখোশে আবৃত এক যৌনবিকারগ্রস্ত মানুষ । ওই আশ্রমে একরাজপুত্র মাধবী নামে একটি মেয়েকে হরণ করে এনে রাখে, এরপর সাধু সদানন্দ ও মাধবীর মধ্যে গড়ে ওঠে বিকারগ্রস্ত কামের সম্পর্ক । মাধবী এরপর বিবাহিত হয়, কিন্তু সাধুর সঙ্গে তার বিকৃত সম্পর্ক সে লালন করে চলে। সদানন্দ জোর করে তার দেহভোগ করে বলে মাধবী তাকে ঘৃণা করে। স্বামীকে দিয়ে তাই সুযোগমতো সদানন্দকে প্রহৃতও করে মাধবী, আবার স্বামীর কোমল বিনীত প্রণয় নিবেদন ও আলিঙ্গন তাকে বিরক্ত করে। সদানন্দের তীব্র পেষণ, বল প্রয়োগ ও অত্যাচারের জন্য তার মন সংগোপনে উন্মুখ হয়ে থাকে। স্বামীর অনুরাগে তৃপ্ত হয়েও সে তাই নানা ছুতায় আশ্রমে ছোটে এবং সদানন্দের সম্ভোগকামনা চরিতার্থ হতে দেয় সে। দ্বিচারিতা ও 'ম্যাসোকিজম'-এর বিকার হচ্ছে মাধবী । আশ্রম এ-উপন্যাসে বাহ্যিক পটভূমি মাত্র। এর মূল বিষয় বিকার ।

'ধরাবাধা জীবন" (১৯৪১) উপন্যাসে একটি বিবাহিত ও পরে বিপত্নীক পুরুষ ও একটি ডাক্তার তরুণীর প্রণয়ের মানসিক ও শারীরিক সঙ্কট উপস্থাপিত হয়েছে। তাদের বাস্তবজীবন বিস্তৃত ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু প্রধান হয়ে উঠেছে তাদের মানসিক সঙ্কট। প্রভার মানসিক এবং শারীরিক সঙ্কটের যে-বর্ণনা মানিক দিয়েছেন, তা এমন :

> কোনদিন অন্যমনেও তার কাছে মেলামেশার বেশি কিছু চাহিবে না, প্রথমে একথা তার কল্পনাতেও ছিল না। কল্পনা করিতেও চায় নাই। একটু অধীরতার সঙ্গে অন্যকল্পনাই বরং সে আরম্ভ করিয়াছিল, কবে কথা বলিতে বলিতে ভূপেন তার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া নিবে — তারপর দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গিয়াছিল, মাঝে মাঝে ভূপেনের চোখে সে দেখিয়াছিল ক্ষুধা আর কাতরতা, কিন্তু কথায় সে কিছু বলে নাই, ব্যবহারে কিছু বুঝিতে দেয় নাই।
>
> এ অভিজ্ঞতা ছিল তার অভিজ্ঞতার বাইরে। পুরুষ ঘনিষ্ঠ হয় যতখানি হওয়া সম্ভব, বছর পার হইয়া যায়, প্রকাশ্যে আর নির্জনে কাছাকাছি হওয়ার ভূমিকা করিয়া, অথচ কিছুই ঘটে না। এ কোন দেশী সম্পর্ক নারী ও পুরুষের ? জীবনের অনেক সীমাহীন সম্ভাবনার দুর্বোধ্য রহস্যময় অনুভূতি তাকে কখনো ব্যাকুল করিয়া করিয়া রাখিত, কখনো সে অনুভব করিত খাপছাড়া আনন্দ, বিষাদের চাপে জীবন কখনো হইয়া উঠিত

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বহ। বিষাদের পর আসিত ক্ষোভ। দেহ মন তার যেন জ্বালা করিতে থাকিত।[৫২] অপরিতৃপ্ত কামনায় প্রভা পরিণত হয় নিরুত্তাপ নারীতে। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভূপেন যখন প্রভাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন প্রভার মনে হয় 'মনে মনে হয়তো দুজনেই বিরক্ত হব, হয়তো মনে হবে বেশ ছিলাম আমরা —'[৫৩] ভূপেনও পরলোকগতা স্ত্রীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে প্রভাকে তীব্রভাবে আহ্বান জানাতে পারে না। "ধরাবাঁধা জীবনে" সময় কী-ভাবে কামনার মৃত্যু ঘটায় তার রূপ উপস্থাপিত হয়েছে।

"চতুষ্কোণ" (১৯৪৮) উপন্যাস তাৎক্ষণিক ঝোঁকতাড়িত এক যুবকের নানা ঝোঁক বা বাতিকের উপাখ্যান। এ-উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার। নিজেকে সে চিহ্নিত করে 'চিন্তাগ্রস্ত নিউরোটিক মানুষ' বলে।[৫৪] সামান্য যে-কোনো বিষয় ও ঘটনা তার মধ্যে সংকট ও জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলে। তার এ-সঙ্কট ও জিজ্ঞাসা বিকৃত মানসিকতাজাত নয়, নিজেকে এবং পারিপার্শ্বকে আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে এ-সব জিজ্ঞাসা তার মধ্যে জাগ্রত হয়। সে প্রচলিত সমাজ ও মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ না খাওয়া, বিচ্ছিন্ন এক যুবক। সমাজের সঙ্গে, সমাজের সদস্যদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে সে, সামাজিক সংস্কার ও মানসিকতা সম্পর্কে অনবধানতার কারণে সে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়, বরং তার আচরণ সামাজিক মানুষদের ক্ষুব্ধ করে। সে সমাজ বিচ্ছিন্ন কিন্তু অনুসন্ধিৎসু। জীবনে তার বারবার নানারকম ঝোঁক দেখা দেয়। সামাজিক রীতি নীতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ঝোঁকের পাশাপাশি তার মধ্যে দেখা দেয় মেয়েদের দেহের গড়নের সঙ্গে মনের গড়নের সম্পর্ক নিরূপণের ঝোঁক। তার মনে এমন প্রশ্ন জাগে :

> যতই ভীরু আর লাজুক মনে হোক, উদ্ধত অত্যাচারী সৈনিক বা যন্ত্রীর জীবন ছাড়া শ্যামলের সুখী হওয়ার উপায় কেন নাই, কত্রিণের মতো যতই অবাধ্য ও স্বাধীন

৫২· "ধরা-বাঁধা জীবন" (মানিকগ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড), পৃঃ ২১৩।

৫৩· ঐ, পৃঃ ২২১।

৫৪· "চতুষ্কোণ" (মানিকগ্রন্থাবলী ষষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

> মনে হোক রিণিকে, শাসন পিপাসু শক্তিমান পুরুষের উপর কলা বৌ-এর মত নির্ভর করিতে না পারিলে রিনির জীবনে সার্থকতা কেন নাই, ...ইতি-মধ্যেই চারপাঁচটি সন্তানের মা হইতে না পারায় সরসী কেন সভাসমিতি করিয়া বেড়ায়, ...[৫৫]

মানুষের দেহে এ-সব রহস্যের উত্তর সন্ধান করে সে এবং তার আচরণ অন্যদের কাছে অর্থহীন উদ্ভট ও নিন্দিত ব্যাপাররূপে ধিকৃত হয়। সে পেশাদার মনোবিজ্ঞানী নয়। পেশাদার মনোবিজ্ঞানী তার গবেষণাগারে মানুষের শরীর ও মনের কাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্য উদঘাটনের গবেষণা চালাতে পারেন। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু রাজকুমার মনোবিজ্ঞানী নয়। তার বিকার হচ্ছে সে পুরো সমাজটাকেই তার গবেষণাগারে পরিণত করেছে। নিজের স্বভাবের অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে সজ্ঞান সে। এমন কী নিজের খাপনা খাওয়া ও জটিল স্বভাব নিয়েও সংশয় জিজ্ঞাসাও জাগে তার মধ্যে;

> ভাবি যে আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কেন। কারো সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সঙ্কীর্ণজীবন তারও কয়েকজনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার, বন্ধুত্বের ঘৃণা, বিদ্বেষের সম্পর্ক। কারো সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কি যেন বিকার আমার মধ্যে আছে.. আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে আমি সেখানে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারিনা। আমার যেন সব খাপছাড়া, উদ্ভট। নাড়ী দেখব বলে আমি গিরির সঙ্গে কেলেঙ্কারী করি, শুধু খেয়ালের বশে রিনি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমার কাছে সেটা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সৌন্দর্যের বদলে মেয়েদের দেহে আমি খুঁজি আমার থিয়োরীর সমর্থন। আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল।[৫৬]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকার ও ঝোঁক বা বাতিকগ্রস্ত অন্যান্য চরিত্রেরা নিজেদের বিকার বা বাতিক সম্পর্কে অজ্ঞান, এ-উপন্যাসে রাজকুমার নিজের বিকার ও ঝোঁক সম্পর্কে সজ্ঞান। তবে ওই বিকার থেকে পরিত্রানের

---

৫৫. ওই, পৃঃ ২১৩।

৫৬. ওই, পৃঃ ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

পথ খোঁজে না সে বরং নতুন নতুন ঝোঁকে জড়িত হয় সে নতুন করে। উন্মাদ রিণিকে পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহনের মধ্য দিয়ে তার বাতিকগ্রস্ততা চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে। বাহ্যজগতের বদলে এ-উপন্যাসেও উপস্থাপিত হয়েছে অস্বাভাবিক ব্যক্তির জীবন ও তার বিকারগ্রস্ত মনোজগত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অথৈজল" (১৩৫৪) উপন্যাসকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়; প্রথম অংশে শশাঙ্কের উগ্র প্রথাগত জীবন এবং দ্বিতীয়াংশে প্রথাবিরোধী জীবনের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। সম্পূর্ণ উপন্যাসে জীবন ও ঘটনারাশি বর্ণিত হয়েছে অবিকল উপস্থাপন রীতিতে। কিন্তু শশাঙ্কের যে আকস্মিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে, তাতে বাহ্যবাস্তবতা গৌণ হয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে তার অন্তর্লোক। প্রথাগত সনাতন বিধিবিধান ও নীতিরক্ষক শশাঙ্ক আকস্মিকভাবে একটি ষোড়শী খেমটা-ওয়ালীর মধ্যে তার পরমাকে আবিষ্কার করে, এবং তার জন্য তার সমস্ত পূর্ব জীবন প্রত্যাখ্যান করে এমন একটি জীবন গ্রহণ করে যা স্বাভাবিক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ত নয়ই বরং নিন্দনীয়। এককালের সমাজরক্ষক এম, বি চিকিৎসক হয়ে ওঠে ওই বাইজীর তল্পিবাহক। প্রথাগত দৃষ্টিতে একে বিকার বলেই চিহ্নিত করতে হবে। প্রবল কামতৃষ্ণা শশাঙ্ককে উৎপাটিত করে নেয় স্বাভাবিক জীবন থেকে। নতুন জীবনে অভিভূত শশাঙ্ক তার ওই জীবনকে দেখেছে নিম্নরূপে :

> কি সুন্দর লাবণ্যময় ভঙ্গি ওর। চোখ ফেরানো যায় না। সত্যি কোন্ স্বর্গে আমায় রেখেচেও? ওয়ে পেয়ে দুনিয়া ভুল হয়ে গিয়েচে আমার। পূর্ব্ব আশ্রমের কথা কিছুই মনে নেই। সুরবালা টুরবালা কোথায় তলিয়ে গিয়েচে।[৫৭]

বিভূতিভূষণ শশাঙ্ক ও পান্নার অস্বাভাবিক প্রেমকে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ করেছেন, যা তার রোমান্টিক অতীন্দ্রিয় মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। বিভূতিভূষণ একে যে অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক বর্ণে রঞ্জিত করেছেন তা নির্দেশ করে যে বিভূতিভূষণ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে অস্বস্তি বোধ করেন।

---

৫৭ অথৈজল (বিভূতিরচনাবলী, একাদশ খণ্ড), পৃঃ ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নগর ও শহরতলীর জীবনবাস্তবতা

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভবই ঘটেছে নগরে । উনিশ শতকে দেখাগেছে নকশাগুলো রচিত হয়েছে নগরকে কেন্দ্র করে । তবু আধুনিক বাঙলা ঔপন্যাসিকদের কাছে পল্লী যতোখানি গৃহীত হয়েছে নগর ততোখানি গৃহীত হয় নি । ১৯২০ থেকে ৫০ পর্যন্ত সময়ের উপন্যাস প্রধানত পল্লীভিত্তিক । তবে এসময় কিছু নগরভিত্তিক উপন্যাসও রচিত হয়েছে । ওই সময়ে যে নগরটি পটভূমি হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা কলকাতা । এ-শ্রেণীর উপন্যাসে কলকাতা নগরীর নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে । নিম্নবিত্ত জীবন অপরিমেয় দারিদ্র্য ও দুর্দশাগ্রস্ত । মধ্যবিত্ত জীবনে আছে নানা সাধ ও সাধ্যের সংকট । মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি আধুনিক, উচ্চশিক্ষিত । তাদের জীবনে সঙ্কট আসে কখনো আর্থনীতিক কারণে, কখনো দেখা দেয় ব্যক্তিসত্তার সংকট । মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেমের রূপায়নও ঘটেছে কোনো কোনো রচনায় । আর উচ্চবিত্ত শ্রেণীটি সচ্ছল জীবনযাপন করলেও তাদের জীবন নানা অনৈতিকতায় পরিপূর্ণ । ওই জীবনের মানুষের নানারকম ভন্ডামি, ব্যভিচার, অসূয়াপরায়ণতা, সংকীর্ণতার বিবরণ উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে । নগরের পটভূমিতে ব্যক্তির জীবন, পারিবারিক জীবন এবং কখনো নগর জীবনের নানা রূপ তুলে ধরা হয় । নগর ভিত্তিক অনেক উপন্যাসে বিশেষ সময়ের, যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালীন সময়ের মন্বন্তর, দাঙ্গা ইত্যাদি আলোড়িত কলকাতার পরিচয় পাওয়া যায় । ওই সময়ের নগর জীবনের কষ্ট, যন্ত্রনা, দুর্যোগের পরিচয়ই এখানে তুলে ধরা হয় । তবে এ-শ্রেণীর উপন্যাসে নগরজীবনের যে চিত্রন ঘটেছে তা খন্ডিত । পল্লীজীবন ভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে পল্লীর বাহ্যজগত, দারিদ্র্য, শোষণপদ্ধতি, দেশাচার অর্থাৎ জীবনও সমাজ বাস্তবতার ব্যাপক ও বিশ্বস্ত উপস্থাপনা ঘটেছে । পল্লীভিত্তিক উপন্যাসগুলো জীবনের সামগ্রিকতাকে ধারন করে, নগরভিত্তিক উপন্যাসগুলোর সে ব্যাপ্তি নেই । এ উপন্যাসগুলো নগর জীবনের সামগ্রিকতাকে ধারন করে না, নগর জীবনের খন্ড পরিচয় মাত্র বহন করে । ব্যাপকতায় পল্লীভিত্তিক উপন্যাগুলো যে মহিমা অর্জন করেছে নগরভিত্তিক উপন্যাসগুলো তা করতে ব্যর্থ হয়েছে । শহরতলীর পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসে শহরতলীর নিম্নবিত্ত জীবনবাস্তবতার রূপ পাওয়া যায়, কোনো কোনো উপন্যাসে দেখানো হয় শহরতলীর ওপর নগরের আগ্রাসনের রূপ । নগরীকে মনে হয় সর্বগ্রাসী ও ভয়াবহ এক দানব । সামান্য চাকুরিরত সাধারণ মানুষের কায়ক্লেশে

Dhaka University Institutional Repository

কাটানো সংসার জীবনের উপস্থাপনা ঘটেছে কোনো কোনো উপন্যাসে । এ-শ্রেণীর উপন্যাসে বাস্তবতা বর্ণিত হয়েছে অবিকল উপস্থাপন রীতিতে , যদিও বাস্তবতা দেখার দৃষ্টিভঙ্গী সবলেখকের অভিন্ন নয় । কেউ কেউ বাস্তবতার নিরাবেগ নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপন করেন, কেউ কেউ বাস্তবতাকে দেখেন মোহমুগ্ধ রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে । তবে আধুনিক বাঙলা কবিতায় নগরচেতনার যে আধুনিক রূপ এবং নাগরিকত্বের যে রূপ পাওয়া যায়, উপন্যাসে সে রূপ ধরা পড়ে নি । কবিরা অনেক বেশি আধুনিক চেতনা সমৃদ্ধ, ঔপন্যাসিকেরা সেখানে অনেক বেশি প্রথাগত । আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে নগর এসেছে, কিন্তু নাগরিক চেতনা তেমন প্রকাশিত হয় নি ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "আগামীকাল" (১৯৩০) -এ কলকাতা নগরীর আগ্রাসনে নগরীর প্রান্তে অবস্থিত গ্রাম জীবনের বিপর্যয় ও গ্রামের নগরীতে রূপান্তরের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে । দ্রুত সম্প্রসারণশীল নগরের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে ওই এলাকার আদি বাসিন্দারা জায়গা জমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় আরো দুরবর্তী গ্রামের দিকে । তাদের জীবন এবং সংসার সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে । কারো স্ত্রী পালিয়ে যায় নতুন শহরের ফেরিওয়ালার সঙ্গে, তারপর পরিণত হয় পতিতায় । কারো একমাত্র পুত্র শহর দেখতে এসে গাড়ির নিচে পড়ে । পুরোনো দোকানিরা নতুন দোকানের জৌলুষের কাছে পরাজিত হয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে যায় । পুরোনো নাপিতের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় নতুন বিলেতী সাজ সরঞ্জামসহ নতুন নাপিতের আবির্ভাবে। পুরোনো বাসিন্দারা যারা রয়ে যায় তারা সদ্য গড়ে ওঠা শহরের পরিবেশে হয়ে ওঠে বেমানান এবং নতুন অধিবাসীদের কাছে অবাঞ্ছিত । যারপাশে মাথা তুলে দাঁড়ায় কুৎসিত আকৃতির দালান কোঠা । এ উপন্যাসে শহর প্রান্তের ভূখন্ডের পরিবর্তনের বাহ্যিক রূপ উপস্থাপিত হয়েছে এবং ওই এলাকার প্রাক্তন ও নতুন অধিবাসীদের জীবনের রূপও উপস্থাপিত হয়েছে । আগে যেখানে ছিল নিস্তরঙ্গ, শান্ত জীবন, অধিকাংশ বাড়িই ছিলো পাতার কুঁড়েঘর । ওই জীবন এবং গৃহ ধ্বংস করে যেখানে আবির্ভূত হয় ক্লেদাক্ত কঠোর জীবন ও চেপে আকৃতির বিভিন্ন দালান কোঠা । এ-উপন্যাসে আক্রান্ত পল্লী ভূখন্ডটি একটি আধুনিক নগরে রূপান্তরিত হয় নি, রূপান্তরিত হয়েছে অসুস্থ শহরে, যেখানে বাহ্যিক সৌন্দর্য যেমন অনুপস্থিত, তেমনি জীবনেও সুখ বা সৌন্দর্য নেই । সদ্য গড়ে ওঠা শহরের রাস্তার দুপাশে 'বাড়ী গজায় বটে কিন্তু..... তাদের...... শ্রীহীন কাঙাল চেহারা । .. ....ছোট ছোট দোতলা আর একতলা, কোনটা বা কায়ক্লেশে তেতলার ছিলে কোঠা পর্যন্ত ওঠে । কোনটার গায়ে বালিকাজ আর হয় না , ন্যাড়া ইটগুলো দাঁত বার করে থাকে ।'[১]

---

১. " আগামীকাল " (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড) পৃঃ ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

ওই বাড়িগলোর গৃহ অভ্যন্তরেও সংকীর্ণ ও অসুন্দর। ওই গৃহগুলোতে দৈন্যের ছাপ প্রকট, সুখ বা সৌন্দর্যের কোনো ছাপ সেখানে নেই। 'ঘরে স্থানের অভাব' থাকলেও ওই পাড়ার বাসিন্দাদের প্রত্যেকের প্রতিঘরেই আছে 'তক্তপোশ বা খাট','টিনের, কাঠের বা ইস্পাতের রঙচটা ও রঙবিলীন বাকস ও তোরঙ্গের স্তুপ, তা ছাড়া আলনায় কাপড় জামা ছাতা ও জুতা', 'তাকে বাসন........ হরেক রকমের শিশি বাকস গেলাস ও খেলনা।'[২] কোনো কোনো বাড়িতে 'ছোট্ট হোক, দু'জনার বেশী তিনজনের বসবার জায়গা না কুলোক, বাইরের ঘর আছে একটি। নতুন পালিশ করা পুরোনো নীলেমে কেনা টেবিল, হাতল ভাঙা চেয়ার দুখানা কোনরকমে ঘেষাঘেষি করে আছে। দেয়ালময় অবর্তমান বর্তমান বহু বৎসরের ক্যালেন্ডারের ছবি।'[৩]

নতুন গড়ে ওঠা শহরের নতুন বাসিন্দারা সকলেই কায়ক্লেশে নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জীবন যাপন করে। ওই শহরের প্রান্তে সস্তায় জমি কিনে কোনোরকমে মাথা গোঁজার একটি ঠাঁই তৈরি করে তারা। তবে যেহেতু তারা ভদ্রলোক তাই কদাকার হলেও দালানই বানানো থাকে তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আর্থিক অসামর্থ্যের দরুন সুসম্পূর্ণ ও সুন্দর অট্টালিকা তৈরিতে সমর্থ হয় না তারা। তাদের তৈরি বেঢপ কুৎসিত দালানগুলো তাদের অসামর্থ্যের স্বাক্ষরবাদী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ওই শহরের বাসিন্দারা নিজেদের ব্যর্থতা, দৈন্য ও অনটনকে হাস্যকর মিথ্যা দিয়ে আবৃত করে রাখে। প্রতিবেশীরা একে অন্যকে পরস্পরের দৈন্য দিয়ে অপ্রস্তুত করে এবং নিজের মান বাঁচাবার জন্য একে অন্যের কাছে নানা মিথ্যাচার করে। যেমন, '... পুরোনো শহরের রাস্তাগুলো ও চওড়া হয়ে ওঠে। মহাজনদের পাড়ায় ইমারতের আড়ালে দিন দুপুরে সূর্য অস্ত যায়। আর এদিকেও সুবোধ বাবুর নতুন বাড়ী ওঠে। দেয়ালটা বাঁকা তা হোক। কোনের ঘরটা একটু অন্ধকার - তা থাক। মানুষ মাথা গুঁজে ত থাকতে পারে। ফাঁকা মাঠের চেয়ে ত ভাল, পাতার ঘরের চেয়ে ত সভ্য। সুবোধ বাবু নতুন বাড়ীতে বালিকার্য পর্যন্ত আর কুলিয়ে উঠতে পারেন নি। রাস্তার অপর পারের একতলা বাড়ী থেকে পরনের কাপড়টি লুঙ্গির মত করে পরে অজীর্ণ রোগের ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যিনি আলাপ করতে এসেছেন তার বাড়ীতে বালি ও চুনকাম দুই-ই হয়েছে, সুতরাং তিনি পেছনে হাত দিয়ে মুখটা তুলে বাড়ীটা আর একবার পর্যবেক্ষণ করে নাক একটু সিঁটকে না বলেই পারেন না, "কিন্তু দেখায় যে বড় খারাপ।" সুবোধ বাবু চটেন,

---

২. "আগামীকাল" (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড) পৃঃ ২৪২

৩. "আগামীকাল" (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড) পৃ ঃ ২৪১

Dhaka University Institutional Repository

একটু বিব্রত হন বোধহয় , কিন্তু বাইরে হেসে বলতে হয় - "ও বাইরেটা দেখতে ভাল আর মন্দ । খোসা দেখব না শাঁস খাব বলুন ? আমি মশাই খোসার চেয়ে শাঁসই বুঝি ।" তারপর একটু পাল্টা আঘাত, বিনয়ে মধুর করে - "ক'-দিনই ত আপনাকে বলছি, আসুন না একটু পায়ের ধুলো দিন না উপরে, দেখবেন কি হাওয়া আর কি চমৎকার ভিউ - আপনাদের একতলা বাড়ির ওই সুখটি নেই মশাই । আপনি দোতলা না করে অমন একতলা করলেন কেন ?" এক তলার সুবোধ বন্ধু খুঁজে পেতে বোধহয় একতলা বাড়ী করলেও বা ভব্যতা নষ্ট হয় না তার প্রমান দেন । এমনি তর সুবোধ বাবুদের বাড়ী ওঠে ব্যাঙের ছাতারমত শহরতলীর রাস্তার ধারে ধারে ।'[৪]

আগ্রাসী শহরের যারা হরণ করেছে প্রাক্তন অধিবাসীদের নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন । শহরের বর্তমান বাসিন্দাদের কাছে বাড়ি বিক্রি করে দেবার পর তাদের প্রায় কেউই আর সুস্থির গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে পারে নি । কোনো না কোনোভাবে তাদের জীবনে বিপর্যয় এসেছে । যেমন প্রাক্তন বাসিন্দা অঘোর বাড়ি বিক্রি করে পাওয়া টাকা দিয়ে স্ত্রীকে গয়না গড়িয়ে দেয় । ওই গয়না নিয়ে অঘোরের স্ত্রী এক খোট্টা কাপড় ফিরিওয়ালার সঙ্গে পালিয়ে যায় । সর্বস্ব খুইয়ে অঘোর পরিণত হয় দিনমজুরে, এবং তাকে অপঘাতে মৃত্যু বরণ করতে হয় । আর প্রেমিকটি গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়ে গেলে অঘোরের স্ত্রীকে পতিতার জীবন গ্রহণ করতে হয় । রাজবল্লভ বাড়ি বিক্রী করে অনেকগুলো টাকা হাতে পেয়ে ধনী হবার জন্য ওই টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে, ব্যবসায় মার খেয়ে সর্বস্ব হারায় । রসিলাল ওই টাকা দিয়ে দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে জমি কিনতে গিয়ে দালালের পাল্লায় পড়ে নিঃস্ব হয় এবং লোকলজ্জার ভয়ে দেশান্তরী হয়ে যায়। এভাবে শহরের আগ্রাসনে বিধ্বস্ত হয় সাধারণ গৃহস্থ জীবন । শহরের বাহ্য চাকচিক্য ও জৌলুষপূর্ণ দোকানের প্রতারক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হয় পুরোনো দোকানিরা । নতুন দোকানের জিনিসপত্রের মান উন্নত বলে যে তাদের বিক্রি কমে যায় তা নয়, নতুন দোকানের জৌলুষের কাছে তারা পরাভূত হয় । ওই অঞ্চলের পুরোনো দোকানি সাধু ময়রার দোকানের খাবার উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তা বিক্রি হয় না । কারণ 'কে কিনবে তার সে নোংরা গামলার ময়লা খাবার । দোকানে একটা কাচের আলমারি পর্যন্ত নেই । একটা পুরোনো ঝুলে কালো চিক । তাই দিয়ে কি ধুলো আটকায়, না আটকায় মাছি ?'[৫] শহরের নতুন বাজারের

---

৪. "আগামীকাল" (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড) পৃ: ২৪০-২৪১,

৫. "আগামীকাল" (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড) পৃ: ২৫৫ ,

Dhaka University Institutional Repository

দোকানীদের রুচিতেও ঘটে বিকৃত পরিবর্তন । পাঁচালী পুথি পড়ে এবং শুনে তারা আর সন্তুষ্ট হতে পারে না । তারা শুনতে চায় এবং শোনে রোমহর্ষক ডিটেকটিভ গল্প । পাঁচালী পুথির শ্রোতা পুরোনো দোকানীরা ওই পরিবেশে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয় । "আগামীকাল" উপন্যাসে পল্লীর বিকৃত নগরায়নের বাহ্যবাস্তবতা পাত্রপাত্রীদের জীবনের খন্ড খন্ড ঘটনা এবং ওই অঞ্চলের বাহ্যবর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে । এ-অঞ্চলের নগরায়নের অসুস্থতাই ধরা পড়েছে এ-উপন্যাসে।

বুদ্ধদেব বসু কলকাতার নগর জীবনের উচ্চবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের রূপ উপস্থাপনা করেছেন । তিনি উচ্চবিত্ত সমাজের দু'ধরনের পাত্রপাত্রীদের জীবনের রূপায়ন করেছেন । এদের এক দল জমিদার, তাদের অর্থের উৎস হচ্ছে গ্রামের জমিদারী, তারা কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতার অধিবাসী এবং নাগরিক জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করে । তবে চেতনার দিক দিয়ে এরা সামন্ত । তাঁর আরেক দল পাত্রপাত্রী উচ্চবিত্ত আধুনিক তরুণ-তরুণী । এরা আর্থিক সংকটে পীড়িত হয় না, এদের সঙ্কট প্রধানত হৃদয়গত । উচ্চবিত্ত ওই তরুণতরুণীদের প্রেমের বহুচারিতা ছেনালীপনা প্রগল্ভতা নির্দেশ করেন তিনি । বুদ্ধদেব বসু ওই উচ্চবিত্ত জীবনের আসবাবপত্র সান্ধ্যচায়ের আসর ড্রইংরুম, তৈজষপত্রের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন এবং ওইসব বিষয়কে তিনি দেখেন মোহমুগ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিতে, আর ওই উচ্চবিত্ত পাত্রপাত্রীদের দেখেন উপহাস ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে । ওই জীবনের অন্তঃসার শূন্যতা, সামন্ত মানসিকতা, নির্বোধ তরুণীদের প্রগল্ভতা ও ছেনালীপনার স্বরূপ উদঘাটিত হয় তাঁর উপন্যাসে । তিনি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখেন নাগরিক মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া জীবনকে । তাঁর মধ্যবিত্ত পাত্রপাত্রীরা উচ্চশিক্ষিত, পরিমার্জিত ও আধুনিক । তাদের কেউ কেউ বিদেশি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত, কেউ কেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র , অধ্যাপনা পেশার সঙ্গে জড়িত, কেউ কেউ সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান তরুণ । তারা কখনো আত্মজিজ্ঞাসার সংকটে পীড়িত হয়, কখনো প্রণয় তাদের সঙ্কট হয়ে ওঠে, কখনো বেকারত্ব নিয়ে বিব্রত হয় তারা । এ-শ্রেণীর নায়িকারা শিক্ষিত, পরিমার্জিত, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ও প্রেমময়ী । নিম্নবিত্তের দারিদ্র্য ও দুর্দশাপূর্ণ জীবন বুদ্ধদেব এর উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় না । ওই দারিদ্র্যগ্রস্ত অসুন্দর জীবনকে তিনি সযতনে পরিহার করে চলেন । নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে এলেও ওই জীবনের দারিদ্র্য দুর্দশার চিত্রন করেন না তিনি, তিনি ওই দারিদ্র্য দুর্দশাপূর্ণ জীবনের মহৎ ও ব্যর্থ উচ্চভিলাষের বর্ণনাই করেন । বুদ্ধদেব মধ্যবিত্ত জীবনের প্রাত্যহিক খুঁটি নাটি সকল বিষয়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন, ওই প্রাত্যহিক জীবন ও তৈজষপত্র ইত্যাদিকে তিনি দেখেন মোহগ্রস্ত দৃষ্টিতে ।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধদেব বসু মধ্যবিত্ত জীবনের খন্ডিত বাস্তবতার রূপায়ন করে থাকেন, সমগ্র জীবন বাস্তবতার উপস্থাপন তাঁর উপন্যাসে ঘটেনা । বুদ্ধদেব বসু প্রধানত নাগরিক উচ্চবিত্ত শ্রেণীটির জীবনের সংকীর্ণ বৃত্তে ঘূর্ণমান । বুদ্ধদেব সম্পর্কে সুকুমার সেনের মূল্যায়ন নিম্নরূপ :

> ইহার গল্পবস্তু বহির্ঘটনা সাপেক্ষ নয়, প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের যে সাধারণ ও সামান্য ব্যাপার তাহারই ভূমিকায় লেখকের (নায়কের) মন যে কামনা ভাবনার সাদা-কালো নকশা বুনিয়া চলিয়াছে তাহাই কাহিনীতে রূপ পাইয়াছে ।:........বুদ্ধদেবের কাব্য গল্প উপন্যাসে তাহার নিজেরই যেন আত্মবিস্তার । অধিকাংশে রচনা আত্মস্মৃতিমূলক, অথবা তেমনই মনে হয় । লেখকের অভিজ্ঞতার বারো আনাই আত্মচিন্তা নির্ভর কল্পনা, এবং সে বারো আনার পরিধি মধ্যে যেসব নর নারীর আনাগোনা তাহারা লেখকেরই সমান স্তরের অথবা উচ্চস্তরের লোক , নিম্নস্তরের লোক-পাড়া গাঁয়ের লোকের কথা দূরে থাক , শহরের বাড়ির দাসদাসীও যে পরিধির মধ্যে দেখা দেয় নাই । সুতরাং বুদ্ধদেব বাবুর রচনায় লোকের ভিড় নাই, মানুষের বৈচিত্র্যও নাই । আছে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই ধরনের নরনারী যাঁহারা কোনো না কোনো সময়ে লেখকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন অথবা লেখকের কল্পনায় উদিত হইয়াছিলেন ।[৬]

বুদ্ধদেব বসুর উপস্থাপিত বাস্তবতার প্রকৃতি সুকুমার সেনের ভাষ্যে যথাযথ ধরা পড়েছে ।

বুদ্ধদেব বসুর "রডোডেনড্রন গুচ্ছ"(১৯৩২) উপন্যাসে কলকাতার উচ্চবিত্ত নাগরিক তরুণ তরুণীদের খন্ডিত জীবনের রূপ পাওয়া যায়, এ উপন্যাসে উচ্চবিত্তের সমগ্র জীবন উপস্থাপিত হয় নি । একটি উচ্চবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে ওই শ্রেণীর তরুণতরুণীদের কয়েকটি দিনের ঘটনাবলী উপস্থাপিত করেন বুদ্ধদেব । কলকাতার ওই উচ্চবিত্ত পরিবারের কর্ত্রী ধনী বিধবা,তার দুটি কন্যা । ওই তরুণীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা প্রসাধনপ্রিয় ও প্রগল্ভা । কথাবলাই তাদের স্বভাব আর বিকেলে চায়ের আসরে তরুণদের সঙ্গে ছেনালীপনা করাই হচ্ছে তাদের জীবন যাপনের আনন্দ । তাদের জননী সমাজে দামি পাত্ররূপে চিহ্নিত তরুণদের বাড়িতে দাওয়াত করে খাইয়ে মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুতে তৎপর থাকে । আবার পাত্র হাতছাড়া হয়ে গেলে ক্ষুব্ধ জননী তরুণটির নিন্দায় শতমুখ হয়ে ওঠে ।

৬· সুকুমার সেন, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড) বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা(১৩৬৫/১৯৫৮) পৃ : ৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি সন্ধ্যায় ওই পরিবারের বসার ঘর জমজমাট হয়ে ওঠে অভিজাত তরুন তরুনীদের আগমন ও আড্ডায় । সমাজের ধনী অবিবাহিত বিলাতফেরত যুবক ওই আসরের যুবতীদের সঙ্গে নানা কায়দায় কথা বলে । ওই যুবকটিকে লেখক অমিত রায়ের ছাঁচে তৈরি করেছেন । তার কথার ছাঁদ বাকপ্রীতি ও বাকনৈপুন্য অমিত রায়ের মতো । ওই পরিবারের প্রসঙ্গে সম্পর্কিত একটি ধনী প্রৌঢ়ের নেশা হচ্ছে নানাবয়সী নারীদের জয়করা । "রডোডেনড্রনগুচ্ছ"- এর পাত্রপাত্রীরা বেশ সহজেই আলিঙ্গনে ধরা পড়ে ও ধরা দেয় । উচ্চবিত্তদের অন্তঃসারশূন্য জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে এ-উপন্যাসে । ওই জীবন সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন । পাত্রপাত্রীরা নিষ্ক্রিয়, কোনো বাস্তব কাজই তারা করে না ; প্রচুর কথা বলা ও ছেনালীপনা ছাড়া তাদের করনীয় কিছু নেই । তারা সকলেই অস্থিরতা আক্রান্ত , প্রচুর অবকাশ ও সচ্ছলতা তাদের সমস্যা । নাগরিক উচ্চবিত্তের প্রাত্যহিক জীবন যাপনের রীতিকে বুদ্ধদেব নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেন । ওই উচ্চবিত্ত পরিবারের স্নানের ঘরের নানা প্রসাধন দ্রব্য, আধুনিক তৈজষপত্র ও গৃহস্থালির নানা বিষয়, সকালের চায়ের টেবিলের সরঞ্জাম ও বিলেতি ধরনের প্রাতঃরাশ, বিকেলে ড্রইংরুমের জমজমাট চায়ের আসরে ব্যবহৃত উপকরনাদি ও খাদ্যের বিস্তৃত বিবরণ রচনা করেন তিনি । উচ্চবিত্তের প্রাত্যহিক জীবন যাপনের রীতিকে তিনি দেখেছেন মোহমুগ্ধ ও ভাবালুতাগ্রস্ত দৃষ্টিতে, আর উচ্চবিত্ত তরুন তরুনীদের অন্তঃসারশূন্য জীবনকে দেখেছেন অবজ্ঞা-উপহাসের দৃষ্টিতে । উচ্চবিত্তদের জীবন পশ্চিমের বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিকেরাও সাধারণত পরিহার করেছেন, কারণ ওই জীবন তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে এবং ওই জীবন এতো একঘেয়ে এবং কৃত্রিম যে তাতে জীবনের আসলরূপ ধরা পড়ে না । বুদ্ধদেব বসুও এই উচ্চবিত্তের জীবন দূর থেকে দেখেছেন । তবে ওই জীবনের অন্তঃসারশূণ্যতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি । এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে উচ্চবিত্তের বাহ্যিক কৃত্রিম আড়ম্বর ও অন্তঃসারশূন্যতা ।

"অসূর্যস্পশ্যা" (১৯৩৩) উপন্যাসে কলকাতার উচ্চবিত্ত জীবনের একটি গ্লানিকর দিকের উপস্থাপনা ঘটেছে । ভানুমতী সেন, স্বামী অক্ষয় সেন, কন্যা সরমা- এ-উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী । ভানুমতী সেন কলকাতার এক ধনী অভিজাত বংশের মেয়ে । উদীয়মান ব্যারিস্টার অক্ষয় সেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয় । ভানুমতী অর্থের জন্য 'অপরিসীম অতৃপ্তি' গ্রস্ত, 'জমাট জমকালো জীবন' লোলুপ । যে কোনো ভাবে অর্থলাভ করা, ইচ্ছে যতো খরচ করা, শরীরকে সুখ দেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী সে । তার স্বামী পেশাগত জীবনে সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয় । ভানুমতী ব্যর্থ স্বামীকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে । অক্ষয় সেন স্বল্পবাক, মুখচোরা, অন্তর্মুখী মানুষ । অধ্যয়নই তার জীবনের আনন্দ , স্ত্রীর সীমাহীন অতৃপ্তি অক্ষয়ের অসহ্য লাগে । হঠাৎ বেধে যাওয়া কলহে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের পারস্পরিক ঘৃণা প্রকাশিত হয় । অভিজাত সমাজের প্রথা অনুসারে কন্যা সরমাকে ব্যয়বহুল ইংরেজি স্কুলে পাঠানো হয় । সেখানে সরমা ইংরেজি চলনবলন ছাড়া কিছুই শেখেনা । কোনো পরীক্ষায় পাশ না করেই স্কুল ছাড়ে সে কারণ ওই সমাজে পাশ করার দরকার পড়ে না , দরকার পড়ে সুন্দর হওয়া পুরুষকে মুগ্ধ করা ও লুব্ধ করার যোগ্যতা আয়ত্ত করা । ওই সমাজে তরুণীকে যৌন সামগ্রীরূপে তৈরি করা হয় এবং ধনশালী পুরুষ ধরার টোপ রূপে ব্যবহার করা হয় । ভানুমতী স্বামীকে যেমন ঘৃণা করে তেমনি কন্যার প্রতিও বোধ করে ঘৃণা । এ-উপন্যাসের প্রধান বিষয় হচ্ছে কন্যা সরমার জীবন । সে কী করে অসূর্যম্পশ্যা থেকে বহুচারিনী হয়ে উঠলো, কী করে বহুচারিনী নারীর জীবনে অভ্যস্থ হয়ে উঠলো এ-উপন্যাসে তা বিবৃত হয়েছে । কিশোর বয়সে সে ভালোবাসে সদ্য তরুন অনিলকে । অনিল একজন সামান্য ডেপুটির পুত্র জেনে জননী ভানুমতী কন্যাকে বাধ্য করে সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং এরপর সে কন্যাকে সমাজের নানা ধনী, পুরুষের সঙ্গিনী হতে বাধ্য করে । সরমা প্রথম যৌবনে ছিলো কোমল, সুপ্রগ্রসু, ভীরু । মায়ের কঠোর ও নিষ্ঠুর ব্যক্তিত্বের সামনে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো । নির্বিবাদে জননীর আদেশ পালনে বাধ্য হতো সে । জননীর আদেশে সে ধনী জমিদার পুত্র পান্নালালের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় । পান্নালাল তাকে নানা দামি উপহার দেয়, বিনিময়ে শরীর সম্ভোগ করে এবং একসময় চলে যায় । সরমা পান্নালালকেও বিশ্বাস করেছিলো এবং ভালোবেসেছিল । পান্নালালের জন্য সরমা ব্যাকুল হলে জননী জানায় ওই যুবকের জন্য ব্যাকুল হবার কিছু নেই । কারণ সে সরমার কাছথেকে যা নিয়েছে তা নগদ মূল্য দিয়েই নিয়েছে । এরপর সরমা একের পর এক ধনী পুরুষের সঙ্গিনী হতে থাকে এবং ক্রমশ বনেদী পতিতার জীবনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে । তার সংবেদনশীল, বিশ্বাসপ্রবণ, ভীরু, সৎ, প্রেমিক আত্মার মৃত্যু ঘটে ।

এ-উপন্যাসে পাওয়া যায় উচ্চবিত্ত জীবনের খন্ডিতরূপ, অর্থগৃধ্নুতা, বিলাস, বিকার ও ছেনালীপনার বিবরণ । উচ্চবিত্ত জীবনের সমগ্ররূপ এখানে তুলে ধরা হয় নি । বুদ্ধদেব বসু ওই খন্ডিত জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন । ভানুমতী সেন ভালোবাসে 'জমাট জমকালো জীবন', ভালোবাসে 'নিজের চারিদিকে সেইসব বস্তুর স্তূপ বানিয়ে তুলতে, যা অনেক টাকা দিয়ে কিনতে হয়, কিন্তু কোনো কাজেই প্রায় লাগেনা ।' তাই গৃহ সজ্জার জন্য সে কেনে 'নতুন নতুন পরদা, সিল্কের কুশন, কার্পেটের টুকরো,' কেনা হয় 'চিতাবাঘের চামড়া,' 'কাশ্মিরি গালিচা' 'রূপোর বাসন, আয়না, বুদ্ধমূর্তি, কাঁসার, পাথরের, এমনকি, ব্রোঞ্জের ব্রিক-এ-ব্র্যাক ।' কেনে 'শাড়ি,

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট আর নীলার আংটি', গয়না রাখার জন্য তার আছে 'হাতির দাঁতের বাক্স ।'[৭] ভানুমতী ও সরমা উচ্চবিত্ত যেসব বাড়িতে যাতায়ত করে তাদের সবারই 'প্রকাণ্ড বাড়ি' মার্বেল সিঁড়ি, টবে সাজানো অর্কিড, ড্রইংরুমে পিয়ানো ।'[৮] মাঝে মাঝে অন্যের গাড়িতে চেপে ভানুমতী সেন কেনা-কাটা করতে যায়, মেয়ের জন্য নিয়ে আসে 'হাল ফ্যাশানের শাড়ি, টুকটুকে লাল গালার বাক্স, মহামূল্য প্যারিসীয় সেন্ট ।'[৯] ঘরে সরমার পায়ে পায়ে ঘোরে 'ছোট্ট সীলাম কুকুর ।'[১০] ধনীপুত্র পান্নালাল সরমাকে উপহার দেয় 'লাল পাথরের একজোড়া দুল','ব্রোঞ্জের ভেনাসমূর্তি। ' 'কুচকুচে কালো ড্রেসসুট' পরে 'শোফার চালিত মস্ত কালো চকচকে গাড়ি'তে করে পান্নালাল সরমাকে নিয়ে যায় চৌরঙ্গির বিখ্যাত ও দামি 'ক্লিওপেট্রা কাফে'তে , দুজনে পান করে 'টকটক হালকা আস্বাদের' শ্যাম্পেন, [১১] গ্রীষ্মের গরমে দার্জিলিং বেড়াতে যায় । কয়লা খনির মালিক অধিরাজ হালদার সরমাদের বাড়িতে ডিনারে এলে সরমা পরে 'কালো ক্রেপের শাড়ির সঙ্গে সোনামোড়া ব্লাউজ', ' মুক্তো দিয়ে সাজাতে হয় শরীর ।'[১২] ওই উচ্চবিত্ত খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন বুদ্ধদেব মোহ-মুগ্ধ ভঙ্গিতে । ওই উচ্চবিত্ত জীবনের নানা ব্যাপার ও রীতির বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হলেও, এ-উপন্যাসেও বাহ্যজীবন গৌণ । ওই উচ্চবিত্ত সমাজের নরনারীর বিকার ও অনৈতিকতা, সম্পদ বৈভবের ক্ষুধা এবং একটি প্রেমময়ী কোমল বিশ্বাসপ্রবণ তরুণীর ভীরু প্রেমিক আত্মার মৃত্যুর চিত্রন করা এ-উপন্যাসের লক্ষ্য ।

৭· "অসূর্যম্পশ্যা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড) পৃ : ৪২৬।

৮· "অসূর্যম্পশ্যা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড) পৃ : ৪২৯।

৯· অসূর্যম্পশ্যা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড) পৃ : ৪৫৪।

১০· "অসূর্যম্পশ্যা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড) পৃ : ৪৫৫।

১১· "অসূর্যম্পশ্যা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড) পৃ : ৪৫৬-৪৫৮।

১২· " অসূর্যম্পশ্যা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড) পৃ : ৪৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

"সানন্দা" (১৯৩৩) উপন্যাসটিও নাগরিক উচ্চবিত্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত, তবে এ-উপন্যাসেও ওই জীবনের খন্ডিত উপস্থাপনা ঘটেছে। উচ্চবিত্ত জীবন নির্ভর উপন্যাসে জীবনের সমগ্র রূপ তুলে ধরার পরিবর্তে একটি দুটি পাত্রপাত্রীর ঘোর বিকার ব্যর্থতা সঙ্কটের বিবরণ রচনা করেন বুদ্ধদেব। তবে ওই পাত্রপাত্রীদের জীবন যাপনের রীতি ও প্রেক্ষাপট বিশদ বর্ণিত হয়। "সানন্দা" উপন্যাসে উচ্চবিত্ত সমাজের একজন আধুনিকা তরুনীর অনুঃসারশূন্যতা, মূঢ়তা ও ব্যক্তিত্বহীনতাকে নির্দেশ করেছেন বুদ্ধদেব। সানন্দা এ-উপন্যাসের নায়িকা। সে শান্তি নিকেতন থেকে সঙ্গীত, নৃত্যকলা ও আরো অন্যান্য বিষয়ে ডিগ্রী নেয়। তার বাতিক হচ্ছে কোনো না কোনো দিক দিয়ে খ্যাতিমান কিংবা সুদর্শন তরুনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা, সে যখন যার সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তখন সে তারই আচরণ চিন্তা বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত থাকে এবং তারই কথাবলার ভঙ্গী অনুকরণ করে। একের পর এক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াই সানন্দার জীবন। বুদ্ধদেব ওই জীবনেরই বর্ণনা দিয়েছেন। সানন্দা এবং ওই সমাজের অন্যান্য তরুন তরুনীরা নানা খেয়াল দ্বারা তাড়িত, তারা স্বেচ্ছাচারী এবং ছেনালীপনা তাদের জীবনধারণের রীতি। এ-উপন্যাসে বুদ্ধদেব সমকালীন কলকাতা নগরের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জীবন যাপনের ধরনের বিস্তৃত বর্ণনা করেন। কলকাতার পার্ক সার্কাসের 'পশ্চিমি প্যাটার্নের সুদৃশ্য' বাড়িতে বসবাসরত উচ্চবিত্ত ধনী তরুনদের বিলাসিতা হচ্ছে জীবিত বিখ্যাত বয়স্ক লেখকদের ভক্ত হয়ে তাদের ঘিরে থাকা, ওই সময়ে 'আধুনিক' রূপে কুখ্যাত লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অন্যদের কাছে তা জাহির করা, উচ্চমূল্যে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের টিকিট কেটে প্রদর্শনী দেখা। এসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের রুচিশীল সংস্কৃতিবান নাগরিক রূপে জাহির করাই তাদের লক্ষ্য। ওই উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতে তরুনী কন্যাকে দিয়ে অতিথিকে 'রবীন্দ্রনাথের যে কোনো একটা '*Latest*' গান শোনানো প্রথা হয়ে দাঁড়ায়[১৩] শান্তি নিকেতনে পড়তে যাওয়া, ভাবে ঢুলুঢুলু হয়ে কথা বলা ওই সমাজের তরুনীদের অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ে। সানন্দা 'খাঁটি দিনু ঠাকুরের সুরে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে বহু ডুইংরুমকে সুপ্তিত করে' দেয় 'এবং একেবারে নির্ভেজাল শান্তিনিকেতনি নাচ দেখিয়ে ও ...... ঝড়ের মত কলকাতাকে লুটে' নেয়।[১৪] ওই উচ্চবিত্ত তরুনীরা ফিল্মের নায়িকাদের অনুকরণে সজ্জা প্রসাধন করে থাকে। সানন্দার 'লম্বা কাঁধ প্রায় ছোঁয়ছোঁয়' কর্নাভরণের সঙ্গে থাকে 'কপালে হাল ফ্যাশান অনুযায়ী ছোট সিঁদুরের কৌটা।'[১৫] সানন্দা কোনোদিন তরুন বন্ধুকে নিয়ে চা খেতে

---

১৩. "সানন্দা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড) পৃ : ৬০।

১৪. "সানন্দা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড) পৃ : ৬১।

১৫. "সানন্দা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড) পৃ : ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

যায় চৌরঙ্গীর 'প্লাজা রেস্টুরেন্টে' , কোনোদিন যায় 'এম্পায়ার হলে' 'গ্রেটাগার্বোর ফিল্ম' দেখতে, তারপর চা খেতে যায় 'ফ্রিপোতে' । তরুনটি নিজের জন্য নেয় 'ভার্মুথ' নামক পানীয়, সানন্দার জন্য নেয় 'সাইডার' 'আপেলের সিরাপ, অ্যালকহল নেই বললেই চলে' তাতে । সুদৃশ্য" cut glass' এ করে ওই পানীয় তাদের সরবরাহ করা হয় ।[১৬] এসব বর্ণনা বুদ্ধদেব -এর সমকালের উচ্চবিত্ত সমাজের রূপ আমাদের সামনে উদঘাটিত করে ।

বুদ্ধদেব বসুর "আমার বন্ধু" (১৯৩৩) উপন্যাসে নাগরিক এক উচ্চমধ্যবিত্ত তরুনের এবং একজন নিম্নবিত্ত এক দুর্দশাগ্রস্ত ব্যর্থ তরুনের জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে । উচ্চমধ্যবিত্ত তরুনটির নাম রামতনু, সে মার্জিত, সৃষ্টিশীল এবং আধুনিক । সে জন্মসূত্রে সচ্ছল । মনমতো চাকুরি জোটাতে না পেরে বেকার জীবন যাপন করলেও পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার টাকা ও গ্রন্থের রয়ালিটি দিয়ে মধ্যবিত্ত ধরনের একলা জীবন যাপন করে সে । ওই তরুন ভাবনা ও লেখালেখি ছাড়া কোনো কাজই করে না । ওই নিষ্ক্রিয় ভাবনামগ্ন জীবনই ওই তরুনের বাস্তব জীবন । রামতনুর দিন ও রাত কাটে নতুন নতুন লেখা তৈরি করার নানা রকম ঘোরে, ছুটির দিনে অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে ডিম পাউরুটি ইত্যাদি দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে সুন্দর পেয়ালায় চা খায় সে, ঘুম চোখে 'অলসভাবে মুড়মুড়ে খবরের কাগজের ভাঁজ' খোলে ।[১৭] দরিদ্র নিম্নবিত্ত তরুনটির নাম ভবভূতি । তার জীবন অপার দারিদ্র্যগ্রস্ত । অসৌন্দর্য ও দারিদ্র্য ওই জীবনকে নিষ্পেষিত করে । অনিঃশেষ দারিদ্র্যই ওই জীবনে চরম বাস্তব । তার দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা দেয়া হয়েছে উপন্যাসটিতে । কেরানী ভবভূতি প্রতিমাসে চল্লিশ টাকা মাইনে পায়, দৈনিক আট ঘন্টা কলম পেশার ক্লান্তিতে সে নির্জীব । অধিকাংশ সময়ই তার গালে থাকে না কামানো দাড়ি, 'মুখে চোখে আস্ত একটা দীর্ঘদিনের মস্তিস্কহীন যান্ত্রিক কাজের ক্লান্তি' জড়িয়ে থাকে । সে বয়সে তরুন হলেও তার তরুন মুখ 'অত্যন্ত বেশি পরিপক্ক, অকাল প্রৌঢ়ত্বের ছায়ায় যে মুখ স্থবির,' ' 'ভীত অসহায়' চোখের দৃষ্টি 'ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন ।'[১৮] অন্ধকার গলির যে বাসায় সে থাকে তা

---

১৬. "সানন্দা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড) পৃ : ৭৫ ।

১৭. "আমার বন্ধু" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড) পৃ : ১০২ ।

১৮. "আমার বন্ধু" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড) পৃ : ১২৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁতসেতে, দারিদ্র্যের পাশাপাশি অপরিচ্ছন্নতাও যেখানে জমাট বেঁধে আছে। অসুস্থ ভবভূতির ঘরে 'নোংরা কাপড় স্তূপীকৃত' করে রাখা, সমস্ত ঘর এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, পানের ডিবে থেকে আরম্ভ করে মুদিখানার কাগজের ঠোঙা পর্যন্ত কাজের ও অকাজের নানারকমের জিনিস মেঝেময় ছড়ানো' থাকে।[১১] বুদ্ধদেব বসু ওই জীবনের দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও অপরিচ্ছন্নতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করেছেন ভবভূতির সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে 'জ্যোতির্ময় অমরত্ব' লাভের সাধনার অর্থহীনতাকে প্রকট করে তুলবার জন্য। নিম্নবিত্তের সমগ্র জীবন তুলে আনা তাঁর লক্ষ্য নয়। ভবভূতি নিজের অমোচনীয় দারিদ্র্য ও প্রতিভাহীনতা সত্ত্বেও প্রচুর লিখে চলে। সে নিজেকে একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল বলে জানে, যে সম্পাদকদের মূঢ়তার কারণে নিজের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু পাচ্ছে না। সে দারিদ্র্যগ্রস্ত জীবনযাপন করে বটে কিন্তু ওটি তার প্রকৃত জীবন নয়, সৃষ্টিশীলতার ও সাধনার জীবনই তার প্রকৃত জীবন। বিপরীত শ্রেণী অবস্থানের দুই বন্ধুর বাহ্যজীবন এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হলেও, এ-উপন্যাসে বাহ্যজীবন গৌণ। একজন সহজাত প্রতিভাহীন মানুষের ব্যর্থতা চিত্রনই "আমার বন্ধু"-র লক্ষ্য। ধনী বন্ধুটি সহজাত প্রতিভাবান দারিদ্র বন্ধুটি সহজাত প্রতিভাহীন; কিন্তু এমন কোনো ইঙ্গিত করেন না যে তাদের সামাজিক অবস্থান এর জন্য দায়ী। তিনি সহজাত শক্তিকেই মনে করেণ মূল্যবান, যার উপর প্রাত্যহিক জীবন ও সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থানের কোনো প্রভাব নেই।

বুদ্ধদেব বসুর "লাল মেঘ" (১৯৩৪) উপন্যাসে সচ্ছল, পরিমার্জিত, সংস্কৃতিপরায়ণ উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হয়েছে। এই উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী অবিনাশ, স্ত্রী শোভনা ও অবিনাশের নিকট আত্মীয় তরুণী সন্ধ্যামনি। অবিনাশ উচ্চশিক্ষিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তার স্ত্রী শোভনা প্রবল সংসার আসক্ত, সন্ধ্যামনি স্বাপ্নিক, প্রেমময়ী, উচ্চশিক্ষিতা তরুণী। এরা যে সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাতে বাহ্যজীবন প্রধান নয়, প্রধান অন্তর্জীবন। তাদের বাহ্যজীবন মনোরম একঘেয়েমিতে পরিপূর্ণ, চারপাশের ব্যাপক জীবন থেকে পরিচ্ছন্নভাবে বিচ্ছিন্ন। অবিনাশ 'ছোট্ট, লাল গাড়ি' চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। তার জন্য রান্না করা হয় 'টম্যাটো সুপ'; 'মাগুর মাছের ঝোল' 'টক পালঙের অম্বল,' 'কলাইয়ের ডাল', 'মুরগির ঝোল,' সেদ্ধ করা হয় 'বীন', শেষ পাতে খাবার জন্য থাকে 'দই'। কর্মস্থলে যাবার সময় সে পরে নানা কাপড়ের 'স্যুট', 'টাই' বাঁধে, প্রচুর ধূমপান করে। কর্মস্থল থেকে ফিরে স্যুট খুলে ধুতি পরে আরাম পায়। দক্ষিণের খোলা বারান্দায় 'ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে' বসে বই

১১. "আমার বন্ধু" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ তৃতীয় খন্ড) পৃ: ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে, 'চা' খায় । স্ত্রী অসুস্থ, শয্যাশায়ী । সংসার বিষয়ক চিন্তাভাবনাই তার কাজ, এমন কী তার কোনো সন্তানও নেই । বুদ্ধদেব বসু এই শ্রেণীর নির্জীবতার ব্যাপারটি অসচেতনভাবে হলেও চিত্রিত করেছেন । তাদের বাহ্যজীবন ক্রমসংকীর্ণ হয়ে তিনটি মানুষের প্রায় নির্জীব সম্পর্কে পর্যবসিত হয়েছে । বাস্তবজীবন যখন এমন নির্জীব হয়ে ওঠে, বিশেষ করে এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে, তখন সজীব হয়ে ওঠে অন্তর্জীবন । এই উপন্যাসে অবিনাশ শোভনা ও সন্ধ্যামনির অন্তর্জীবনকেই টুকরো টুকরোভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে ।

সন্ধ্যামনি অবিনাশের আত্মীয় । স্ত্রী শোভনা আকস্মিকভাবে অসুস্থ হলে অবিনাশের সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । বাল্যকাল থেকে অবিনাশের স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠা সন্ধ্যামনি হোস্টেল ছেড়ে চলে এসে ওই সংসারের দায়িত্ব নেয় । সে অবিনাশকে গোপনে ভালোবাসে । অবিনাশও সন্ধ্যামনিকে ভালোবাসে । ওই আবেগ কেউ কাউকে প্রকাশ না করলেও দুজনেই তা বুঝতে পারে এবং কষ্ট পায় । সন্ধ্যামনি অসুস্থ শোভনার শুশ্রূষা করার সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সংসার পরিচালনা করে, খেয়ালরাখে অবিনাশের আরামের দিকে । মাসের পর মাস অবিশ্রাম এভাবে কাজ করার ফলে এবং মানসিক কষ্টে সন্ধ্যামনিও অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায় । আর চিকিৎসকদের অবাক করে দিয়ে রুগ্ন শোভনা সেরে ওঠে । অবিনাশ বায়ুবদলের জন্য স্ত্রীকে শৈলনিবাসে নিয়ে যায় । তার বাহ্য আচরণ থাকে স্বাভাবিক কিন্তু ভেতরে সে সন্ধ্যামনির জন্য বিরাম দগ্ধ হতে থাকে । "ম্লান মেঘ" উপন্যাসে বাস্তব জগৎ গৌণ হয়ে অন্তর্জগত প্রধান হয়ে উঠেছে এবং অর্ন্তজগতের বাস্তবতাই উপস্থাপিত হয়েছে বিস্তৃতভাবে । সন্ধ্যামনির মৃত্যু ঘটে বাস্তবতার দাবিতে যতোখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি অবিনাশ ও শোভনার মনোবাস্তবতার উপস্থাপনার দাবিতে ।

অন্যান্য উপন্যাসে বুদ্ধদের যেমন নাগরিক উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনকে গ্রহণ করেন "পরিক্রমা" (১৯৩৮) উপন্যাসেও তিনি ওই জীবনেই পরিক্রমন করেছেন । এ-উপন্যাসে শুধু স্বামী স্ত্রীতে গঠিত তিনটি পরিবারের জীবনের রূপ পাওয়া যায় । প্রশান্ত দত্ত ও বরুনা দত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন যাপন করে । প্রশান্ত দত্ত লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস থেকে পড়াশোনা করে এসেছে । প্রথম জীবনে জীবিকা নির্বাহের জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে যাপন করেছে অনটন কায়ক্লেশে পূর্ণজীবন । সে বিয়ে করে কলকাতায় পড়তে আসা বাল্যবিধবা বরুনাকে । এ বিয়ের জন্য তাদের দুজনকেই সামাজিকভাবে নানা গঞ্জনা সহ্য করতে হয় । নানা পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক দুর্যোগ অতিক্রম করে প্রশান্ত বিদেশী কোম্পানীতে উচ্চপদে আসীন হয় এবং সচ্ছল বুর্জোয়া জীবন যাপন করতে থাকে । প্রশান্ত উচ্চশিক্ষিত, পরিমার্জিত, প্রথাদ্রোহী ও প্রেমিক । বরুনাও

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চশিক্ষিত, প্রেমময়ী ও প্রথাদ্রোহী। বিজন ঘোষ বিকৃত সামন্ত মানসিকতাসম্পন্ন উচ্চবিত্ত, তার স্ত্রী সুমিতা প্রাক্তন দত্তের বোন। বিজন হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করলেও তার আয়ের উৎস জমিদারী - যার বার্ষিক আয় দুলক্ষ টাকা, মেধার জোর না থাকলেও বাপের টাকায় বিলেত থেকে বার এটল করে আসে। সেখানে একটি ইংরেজ মহিলাকে বিয়েও করে সে। বিজন ঘোষ অমার্জিত ও দুশ্চরিত্র। তার সবকিছুতেই প্রকটিত হয়ে ওঠে বর্বরতা। যে কোনো বিষয় নিয়ে 'ইডিয়টিক' তর্ক তোলে সে। সবকাজে প্রতিমুহূর্তে স্ত্রীর কাছে বাহবা নেবার জন্য ব্যগ্র থাকে সে এবং তার স্ত্রী প্রতি মুহূর্তেনিজেদের ধনীত্ব জাহির করে নানা স্থূল উপায়ে। তাদের জীবন একঘেয়েমি পূর্ণ। তারা সংকীর্ণ, পরশ্রীকাতর, কুৎসা প্রবণ এবং স্থূল। কন্যার অনিচ্ছাসত্ত্বেও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাকে নাচতে গাইতে তারা বাধ্য করে। এ ব্যাপারটিকে তারা পরি-বারের সংস্কৃতিমনস্কতার নমুনা রূপে জাহির করতে চায়। সামাজিক উৎসবাদিতে অন্যের সঙ্গে উপহার দেয়ার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য দামি জিনিস অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গে হলেও উপহার দেয়। এই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মেয়েদের কড়া শাসনে রাখার পক্ষপাতী, কারণ তারা বিশ্বাস করে মেয়েদের চোখে চোখে না রাখলে অঘটন ঘটতে সময় লাগে না। তবে তারা বিশ্বাস করে মেয়েদের চোখে চোখে রেখেই চলনসই কোর্টশিপ চলতে দেয়া যেতে পারে। পনেরো বছরের মধ্যে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে 'আপদ চুকিয়ে দিয়ে' দুর্ভাবনামুক্ত হতে চায় দুজন। দুজনেই বিশ্বাস করে 'মেয়ে জাতটাই শয়তানের প্রতিমূর্তি' এবং 'মেয়ে মানুষের জন্যেই তো পৃথিবীতে যত পাপ।'২০ আলস্য ওই জীবনের মানুষদের মজ্জাগত। ধনের গরিমা প্রদর্শন, পরনিন্দা ও পরছিদ্রান্বেষণ এই জীবনের আনন্দ। বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ ওই জীবনে আছে গোপন কুতরতা ও নোংরামি। কুঙ্কুম পিতৃমাতৃহীন মেধাবী যুবক। ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণী পেয়ে এম,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও মুরুব্বির অভাবে কোথাও কাজ জোটে না। কয়েকটি টিউশনী ও পত্রিকায় লেখার টাকা তার জীবন যাপনের সম্বল। সে প্রেম করে বিয়ে করে মল্লিকাকে। মল্লিকা পিতামাতার মনোনীত পাত্রকে বিয়ে না করে কুঙ্কুমকে বিয়ে করে বলে পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে, পুরোনো কলকাতার একটি সাদাসিদে তেতলার আড়াই কক্ষের ফ্লাটে তারা শুরু করে দাম্পত্য জীবন। দারিদ্র্য কায়ক্লেশ সত্ত্বেও ওই জীবন মধুর, প্রেমপরিপূর্ণ। কুঙ্কুম সৃষ্টিশীল, গভীর সংবেদনশীল ও প্রেমিক; মল্লিকা

---

২০. "পরিক্রমা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, অষ্টম খন্ড) পৃঃ ৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাহসী, স্বাপ্নিক, প্রেমময়ী ও উচ্চশিক্ষিতা । তারা দুজনেই পরিমার্জিত ও আধুনিক মানুষ । আর্থিক অনটন তাদের তীব্র , কিন্তু দুজনের মনই কাম্যকে পা বার আনন্দে ভরপুর । তারা সুখী, তৃপ্ত ও পরিপূর্ণ । তারা ওই অনটন পূর্ণ জীবনের দিকে তাকিয়ে জয়ী হবার গর্ব বোধ করে । তারা প্রেমে সাফল্য অর্জন করেছে , সামাজিক সাফল্যও তাদের নিশ্চিত । কুঙ্কুম অগ্রসর হচ্ছে প্রশান্তর পদরেখা ধরে । বোঝা যায় অদূর ভবিষ্যতেই যে প্রশান্তরই মতোই বিদেশী কোম্পানীতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হবে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি বৈশ্বিক জীবন যাপন করবে ।

বুদ্ধদেব বসুর স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে এ উপন্যাসেও সংকীর্ণ পটভূমির ও জীবন যাপন রীতির উপস্থাপিত হয়েছে । উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের নানা প্রতিনিধিত্বশীল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ রচনার মধ্য দিয়ে ওই জীবনকে স্পষ্ট করে তোলেন বুদ্ধদেব । প্রশান্ত ও বরুনার পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া কন্যা বাবলির জন্মদিন উপলক্ষে নিমন্ত্রন করে আত্মীয় বান্ধবকে, তাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল, ঘরে টেলিফোন আছে, কন্যার খেলার সঙ্গী হিশাবে আছে 'কালো রূপো মোটা রোঁয়াওয়ালা ব্রাউন মুখো একটা আইরিশ টেরিয়ার ।' কন্যাকে স্কুলে থেকে বাড়িতে আনা নেয়ার জন্য ঝি আছে । স্কুলে বাবলি পরে যায় ' টুকটুকে লাল জুতো' আর 'নীল রঙের ফ্রক ।' জন্মদিন উপলক্ষে বসার ঘরের জন্য কেনা হয় 'কুশান' 'পরদা' 'ফুল', অতিথি আপ্যায়নের জন্য কেনা হয় 'নতুন একটা চায়ের সেট' । জন্মদিনে বসার ঘরকে নতুন করে সাজানো হয় । বরুনা 'হলদে কালো নকসা, চিতাবাঘের চামড়ার মতো' পরদা কিনতে চায়, ওই রকম না পেয়ে কেনে 'ফিকে হলুদ রঙে খয়েরি পাড় তোলা পরদা ।' নতুন পরদায়, ঘরের কোনে ফুলদানিতে রাখা রজনীগন্ধার 'তীব্র মধুর গন্ধে বসার ঘর রহস্যময়' হয়ে ওঠে, রান্নাঘর ভরে ওঠে বিচিত্র খাদ্যের সৌরভে, টেবিলে নতুন কেনা চায়ের সেট 'ঝকঝক' করতে থাকে।

উচ্চবিত্তদের জীবনযাপন পদ্ধতির গৃহসজ্জা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বর্ণনায় অবিকল উপস্থাপন রীতিটি ব্যবহৃত হয়। উচ্চবিত্তদের জীবন যাপনের ধরণ গৃহসজ্জাও আভরনের বিস্তৃত বিবরণ দানের মধ্য ওই জীবনের রূপ যেমন স্পষ্ট করে তোলা হয় তেমনি স্পষ্ট করে তোলা হয় ওই উচ্চবিত্তদের অন্তঃসারশূণ্যতা , অমার্জিত জীবন যাপন ও স্থূলতা । বিজন ঘোষ ও সুমিতা বাস করে মস্ত প্রাসাদোপম বাড়িতে। দোতালায় 'বাড়ির পিছন দিকের মস্ত বারান্দায়' সুমিতা বিকেল কাটায়, 'বারান্দার মেঝেটা শুভ্র শীতল ক্যারারা পাথরের', দেয়ালের গায়ে চৌকো ছাঁচে ইলেকট্রিক আলো বসানো, চাবি টিপলে আলো হবে, চোখে লাগবেনা। ' ....নিভাজ সাদা চাদরের মতো কংক্রিটের ছাদের

Dhaka University Institutional Repository

মাঝখান থেকে তিন কোনা শেড পরানো একগুচ্ছ আলো ঝুলছে আর ঝুলছে কোনাকুনি দুই দিকে দুটো ভারি আসনার ঝাখা '। বারান্দার পশ্চিম দিকে 'রোদে পোড়া' দিকটাতে সূর্যকে সম্পূর্ণ আড়াল করার জন্য আছে 'খসখসের পরদা'। বিকেলে জল দিয়ে ধোয়া বারান্দার মেঝে থেকে বেরোতে থাকে 'সোঁদাসোঁদা' 'আবছা' চন্দনের মতো' গন্ধ ।[২১] বারান্দায় রাখা আছে বসার জন্য 'অটোমান' , শ্বেত পাথরের টেবিল, 'ইজিচেয়ার'। সুমিতার আছে নিজস্ব 'একটি রাইটিং টেবল, ল্যাজারাসের বানানো, দেড়শো টাকা দাম', ওই টেবিলে বসে সুমিতা 'এসবস করা কাগজে' দু একটা চিঠিপত্র লেখে । কোনো কোনো বিকেলে বারান্দায় পাতা 'অটোমানে' বসে সে ধোপাবাড়ির হিসাব মেলায় । 'কোলের উপর চামড়ায় বাধানো খাতা রেখে' 'পার্কার কলমটা'য় 'উজ্জ্বল ভায়োলেট রঙের কালিতে' সে হিসেব লেখে । কোর্ট থেকে বাড়িতে ফিরে এসে বিজন বারান্দার ইজিচেয়ারে ঢলে পড়লে নিঃশব্দ দ্রুত 'বয়' নিয়ে আসে তার 'সবুজ কার্পেটের চটি' আর 'অতি মিহি করে কুঁচানো ঢাকাই ধুতি' । বিজন 'উঠে শিথিল পপাৎলুনের উপর দিয়ে ধুতিটা লুঙ্গির মতো জড়িয়ে ফের বসে পড়লে', বয় পাৎলুন টেনে খুলে নেয় । বিজন ঘোষ 'হাত কাটা পিঠ কাটা বিলেতি গেঞ্জি আর হাটুর কাছে উঠে আসা ঢাকাই ধুতি পরে' বিশ্রাম করতে থাকে । 'উর্দিপরা ভৃত্য রুপোর ট্রেতে চা সাজিয়ে নিয়ে' এসে রাখে 'টিপয়ে', 'ই-পি-এন-এস-এর টিপট থেকে অভিনব আধুনিক ছাঁচের ঝকমকে পেয়ালায়' চা ঢেলে দেয় । 'দুখন্ড স্যান্ডউইচ একসঙ্গে মুখে পুরে' চা দিয়ে সেটা গলাধকরণ করে । উর্দিপরা ভৃত্য 'প্রভুর সামনে রুপোর ডিবেয় স্তূপীকৃত পান' রেখে যায়, প্রভু 'একসঙ্গে গোটা চারেক পান মুখে ফেলে চিবোতে' থাকে ।[২২] স্ত্রীকে প্রসন্ন রাখার জন্য বিজন ঘোষ নানা রকম শাড়ি উপহার দেয় । কিনে আনে কলকাতার প্রসিদ্ধ 'জেঠমলের দোকানের 'শালের শাড়ি', 'একটা ক্রীম' অন্যটা 'ওয়াইন রঙের', একখানা মাইসোর জরজেট'ও সঙ্গে থাকে 'সাচ্চাজরির কাজ' করা , তার 'পঞ্চাশ টাকা দাম'। নতুন বেরোনো 'জাপানি জরজেট' এর জন্য সুমিতার মনে ক্ষোভ দেখা দেয় । তারা প্রতি গ্রীষ্মে দার্জিলিং বেড়াতে যায় । বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে 'উপহারে চার পাঁচ টাকার বেশি খরচ করবার ইচ্ছে না থাকলেও, সামাজিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য দিতে হয় দামি উপহার ।

---

২১. "পরিক্রমা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, অষ্টম খন্ড) পৃ ঃ ৩০২।

২২. "পরিক্রমা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, অষ্টম খন্ড) পৃ ঃ ৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবন যাপন পদ্ধতির খুঁটিনাটি সবকিছুকেও মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন বুদ্ধদেব। মল্লিকা কুঙ্কুম নীড় বাঁধে কলকাতার কালিঘাট অঞ্চলের 'ছোট দুখানা ঘর আর এক চিলতে বারান্দায় ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে। 'বাড়ি ভাড়া তিরিশ টাকা। কারেন্ট সুদ্ধ'। দক্ষিণের খোলা চিলতে বারান্দায় 'স্টোভে রান্না' হয় - 'ভাতের মধ্যে ন্যাকড়ায় জড়ানো পুটলি', তাতে 'মুগের ডাল সেদ্ধ' হয়, থাকে 'দুটো একচারটে ভাইটামিনাত্মক তরকারি আধাসেদ্ধ', 'একটু মাছের ঝোল, সর্বশেষে চার পয়সার দই'। বারান্দাতেই চা চক্র বসে সকালে বিকালে। রান্না খাওয়ার সরঞ্জামের মধ্যে আছে 'ছোটো একটি এলুমিনিয়ামের প্যান', 'একটি কড়াই', 'জলের কুঁজো', 'গোটা কয়েক কাচের গেলাস' 'চীনে মাটির থালা আর চায়ের বাসন'। কেনা 'গুড়ো মসলা'য় রান্না করা হয়, চায়ের সঙ্গে থাকে 'বিলিতি টিনের দুধ'।[২৩] শোবার ঘরের দেয়ালে আছে 'পাঁচসিকে দামের গোল আয়না', 'ছোট্ট তেপায়া বাঁশের গোল টেবিলে' থাকে কুঙ্কুমের 'ক্ষুর' মল্লিকার 'চুলের কাঁটা 'পাউডারের কৌটো' 'মেঝেতে পরিপাটি বিছানা' পাতা থাকে, 'তোষকের উপর একটি চিকন পাটি আর গোটা চারেক বালিশ', একটি লাল রঙের 'সিগারেটের কৌটা'য় মল্লিকা বাজার ফেরত ভাংতি পয়সা জমায়। হাতে টাকা এলে কুঙ্কুম কেনে নানা টুকিটাকি দ্রব্য, দু'খানা তোয়ালে, একটা ফাউন্টেন পেনের কালি, এয়ার মেইল রাইটিং প্যাড ...., সিগারেট একটিন, ছোট্ট সেন্টের শিশি। কোনো বিকেলে অতিথি এলে মল্লিকা অতিথি আপ্যায়নেও ব্যস্ত হয়। 'ডিম ভেঙে কাটা দিয়ে ফ্যাটাতে ফ্যাটাতে' 'ডিমের মধ্যে কুচি কুচি কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ' মেশায়। কেটলিতে জল গরম করে 'টীপটে' গরম জল ঢালে, চা পাতা দেয়। মোড়ের দোকান থেকে কুঙ্কুম নিয়ে আসে 'গরম শিঙাড়া, সন্দেশ, গোটা চারেক রসগোল্লা,....... মিঠে পানের খিলি।'[২৪] বুদ্ধদেব বসুর কাছে বাস্তবতা হচ্ছে জীবন যাপন-এর রীতি ও পদ্ধতি, যা তিনি এ উপন্যাসেও নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন।

---

২৩. "পরিক্রমা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, অষ্টম খন্ড) পৃ: ৩১৬।

২৪. "পরিক্রমা" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, অষটম খন্ড) পৃ: ৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতার উচ্চমধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে "কালো হাওয়া" (১৯৪২) উপন্যাসটি রচিত। একটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের জীবনের রূপ বর্ণনার পাশাপাশি বুদ্ধদেব ওই পরিবারের দুর্বিপাক ও ধ্বংসের বিবরণ রচনা করেন। অরিন্দম সেন ইঞ্জিনিয়ার। অরুন, মিনি ও বুলি তার তিন পুত্র কন্যা। অরিন্দম সেন প্রবল জীবনবাদী, ভোজনবিলাস, প্রাণবন্ত স্নেহবৎসল ও স্ত্রী অনুরক্ত। অরিন্দম চায় স্নেহ ভালোবাসা পারস্পরিক সমঝোতা মমতায় ভরা পারিবারিক জীবন। এটি বুদ্ধদেব বসুর কাছে এই সামাজিক শ্রেণীভুক্ত মানুষের আদর্শ পারিবারিক জীবন। স্ত্রী হৈমন্তী রূপসী কিন্তু কোনো না কোনো উন্মাদনা দ্বারা আবিষ্ট থাকতে ভালোবাসে সে। কর্মোপলক্ষে গৃহস্বামীকে বিশ্বস্ত গৃহভৃত্য সঙ্গে নিয়ে নানাস্থানে থাকতে হয়। পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে একমাত্র পুত্র লম্পট হয়ে ওঠে। মদ ও পতিতা আসক্তি দূর করার জন্য সুন্দরী ধনীকন্যা উজ্জ্বলার সঙ্গে তার বিয়ে দেয়া হলেও স্বভাব শোধরায় না। উপরন্তু অরুনের দেহ থেকে উজ্জ্বলার দেহে ও সদ্য ভূমিষ্ট শিশুপুত্রের দেহে সিফিলিস সংক্রমিত হয়। হৈমন্তী মা মহামায়া নামক ভন্ড নারী সাধুর প্রভাবে সংসার উদাসীন, আশ্রমমুখী হয়ে ওঠে, মা মহামায়ার প্রকৃত পরিচয় সে যাদবপুরের এক রাধুনি বামুনের স্ত্রী, যে এর ওর ফাইফরমাশ খেটে দিতে দিতে একদিন নিজেকে 'রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত অবতার' রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। উচ্চ সমাজের নারী ও পুরুষেরা তার ভক্ত হয়ে ওঠে। হৈমন্তীকে ধনী, নির্বোধ ও উড়নচন্ডী বলে বুঝতে পেরে মহামায়া অত্যন্ত কৌশলে তাকে গ্রাস করতে থাকে, তার কাছ থেকে নানা ছুতার আশ্রম-এর নাম করে টাকা নিতে থাকে। হৈমন্তী পরিণত হয় এক ধরণের ধর্মোন্মাদনা ও প্রবল ঘোর গ্রস্ত মানুষে। হৈমন্তীর ধর্মোন্মাদনা প্রথমাকন্যা মিনির মধ্যেও সংক্রমিত হয়। প্রাত্যহিক সাধারণ জীবন ও ইহকালকে ঘৃণা করতে শুরু করে সেও তার মায়ের মতো, প্রতিদিন দুই ঘন্টা ধরে মা মহামায়ার ছবির সামনে বসে জপ করে চলে সে। শুধুমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা বুলি থাকে ওই পরিবারের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। গৃহস্বামী অরিন্দম সেন প্রবাস থেকে তিনমাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলে স্ত্রীর সঙ্গে সংঘাত বাধে। স্বামী ওই ধর্মোন্মাদনা থেকে স্ত্রীকে মুক্ত করতে চায়, স্ত্রী স্বামীকেও ঘৃণা করতে শুরু করে। এক মধ্যরাতে অরিন্দম হৈমন্তীর কক্ষে প্রবেশ করলে ড্রয়ারে রাখা পিস্তল বের করে ঘুম ঘোরে হৈমন্তী স্বামীকে গুলি করে। রক্তক্ষরণ ও অন্যান্য জটিলতায় অরিন্দম মারাগেলে হৈমন্তী উন্মাদ হয়ে যায়। একমাত্র পুত্র রূপে সকল সম্পত্তির অধিকারী অরুন সর্বময় ক্ষমতা পেয়ে স্বেচ্ছাচার শুরু করে, মহামায়ার সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এভবে অরুনকে সম্মোহিত করে যাবতীয় সম্পত্তি আশ্রয়ের নামে লিখিয়ে নিতে তৎপর হয় মহামায়া।

Dhaka University Institutional Repository

উন্মাদ হৈমন্তীকে যাপন করতে হয় দাসীর মতো জীবন, মিনি তার পরিচর্যাকারিনী রূপে জীবন কাটাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ক নিষ্ঠা কন্যা রুলি অরুনের কলেজ জীবনের বন্ধু নিরঞ্জনকে ভালোবেসে তার সঙ্গে বার্মায় পালিয়ে গিয়ে সংসার শুরু করে। এ-উপন্যাসে বুদ্ধদেব ওই সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারটির ওপর ভন্ড মহামায়ার ক্ষতিকর প্রভাব নির্দেশের পাশাপাশি কীভাবে ওই ভন্ড সাধু-নারী একটি পরিবারকে সম্মোহনগ্রস্ত করে চরম সর্বনাশের দিকে নিয়ে গেছে তাররূপ উপস্থাপিত করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন মহামায়ার প্রভাব ওই পরিবারে 'একটি নির্লিপ্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছে।'[২৫] ওই পরিবারের যে পরিণতি ঘটে তা নির্লিপ্তও নয়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যও নয়। সবাই স্বাভাবিক জীবনকে পরিত্যাগ করে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

বুদ্ধদেব বসু সাধারণত নাগরিক উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত জীবনের বাহ্যিক শোভা ও অন্তর্গত-গত সারশূন্যতা উপস্থাপন করেন, তিনি একটি বুর্জোয়া বৃত্তের মধ্যে তার পাত্রপাত্রীদের বিবরণ করান। কিন্তু এ-উপন্যাসে ওই পাত্রপাত্রীরা বুদ্ধদেব বসুর প্রিয় জীবনের সীমা অতিক্রম করে নিচে নেমে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ প্রবণতা হচ্ছে সঙ্কীর্ণ পটভূমি তন্নতন্ন করে বর্ণনা করা। এ-উপন্যাসেও তা পাওয়া যায়। দীর্ঘ প্রবাস সেরে পিতা অরিন্দম বাড়ি ফিরে এলে গৃহে আনন্দ উৎসব শুরু হয়। আর্দালী বুটের ফিতে খুলে অরিন্দমের পায়ের কাছে রাখে 'পাৎলা একজোড়া স্যান্ডেল', 'বাথসল্ট মেশানো সুগন্ধি স্নানের জলে' গা ভেজানো অরিন্দমের বিলাস। তার বাথরুমে 'প্রসাধনের উপকরণ সারি সারি সাজানো' থাকে, সে যে সাবান ব্যবহার করে 'তার এক কেকের দাম আড়াই টাকা'। সে স্নানের 'টব থেকে নেমে ধবধবে তোয়ালে' দিয়ে গা মোছে, পরে 'পিঙ্ক রঙের ডোরাকাটা পাজামার উপর হলদে সিল্কের ড্রেসিং গাউন'। বিকেলে 'দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারে' বসে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে, 'সবুজ শেড দেয়া টেবল ল্যাম্প' জ্বলে পাশের টেবিলে, 'হাতের কাছে ছোটো টেবিলে' থাকে 'সিগারেটের টিন, দেশলাই, হাঁকরা নরমুণ্ডের আকারে একটি রূপোর ছাইদান।'[২৬] তার খাবার টেবিলে থাকে 'স্যুপ', 'মাছভাজা' 'মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা মুগের ডাল', চিংড়ি মুর্গির ঝোল, পুডিং। প্রতিঃরাশে থাকে বেকন ও নানা বিলেতি

---

২৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" মডার্ন বুক এজেন্সী (ষষ্ঠসংস্করণ ১৩৮০) পৃ: ৪৫৯।

২৬. "কালো হাওয়া" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ ষষ্ঠ খন্ড) পৃ: ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য । রাতে 'একপেগ হুইস্কি' না হলে তার চলে না । মহামায়ার অন্ধ ভক্ত উর্মিলা খায় ডাল, ভাত, কুমড়োর ছেঁচকি । রাতে খায় 'ঢাকাই পরোটা' 'দুরকমের সন্দেশ' 'গোটা দুই পাল্তোয়া 'মস্ত ফজলি আম' 'শবরি কলা, 'একটু পায়েস আর পাথরের গেলাশ ভরা দুধ।'[২৭] বুদ্ধদেব বসুর এ ধরনের বর্ণনায় যেমন অনুপুঙ্খতা রয়েছে তেমনি মোহমুগ্ধতাও রয়েছে । তিনি যেহেতু বিস্তৃত বাস্তবতাকে উপস্থাপন করতে পারেন না, সেই অভাব তিনি পূরণ করে খন্ডিত পটভূমি ও জীবন পদ্ধতির এ-ধরনের বর্ণনার সাহায্যে ।

"তিথিডোর" (১৯৪৯) বুদ্ধদেব বসুর বৃহৎ উপন্যাস, সাধারণত তার উপন্যাস যে আয়তনের হয়ে থাকে, এ-উপন্যাসটি তার দ্বিগুন । "তিথিডোর"-এ বুদ্ধদেব বসু একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার উদ্যোগ নিয়েছেন । একটি নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ তিনি তিথিডোর" -এ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় তিনি এতো অনুপুঙ্খ যে উপন্যাসটি অনেকাংশে দলিল ধর্মী হয়ে উঠেছে । তবে বুদ্ধদেব এর দলিল নির্মোহ, নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক না, তা ব্যক্তিগত মোহ ও আবেগ দ্বারা রঞ্জিত । "তিথিডোর"-এ কাহিনী বা ঘটনার খুব জটিলতা বা ব্যাপকতা নেই, কিন্তু বর্ণনার আধিক্য রয়েছে । বুদ্ধদেব বসু এ-উপন্যাসে বিস্তৃত জীবনকে না হলেও একটি নাগরিক পরিবারের জীবন, আচার আচরণ, উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন । ওই মধ্যবিত্ত পরিবারটি স্নেহ-প্রেম-মমতায় পরিপূর্ণ । নানা সময়ে নানা সঙ্কট ওই পরিবারে আসে, নানাভাবে ক্ষুন্ন হয় নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনের সহজ প্রবাহটি । তা সত্ত্বেও ওই জীবন স্নিগ্ধ, মনোরম ও মধুর । ওই পরিবারটি কলকাতায় নাগরিক জীবন যাপন করলেও অন্তরে পরিবারটি মফস্বলধর্মী । বুদ্ধদেব বসু যেন একটি মফস্বলের স্নিগ্ধ মধুর পরিবারকে কলকাতা নগরীতে স্থানান্তরিত করেছেন । "তিথিডোর" -এ উপস্থাপিত জীবন সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, '...........কলকাতার ছাপোষা মধ্যবিত্ত জীবনের যা কিছু গৌরব, তার যা কিছু সততা সমস্তের আশ্চর্য পরিবার কেন্দ্রিক চিত্র তিথিডোর । ....এই উপন্যাসকে, যে স্নিগ্ধ দিনগুলি আর একটু পরেই বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলল, তার শেষ অকৃত্রিম চিহ্ন হিসাবে আমরা মনে রাখব ।'[২৮]

---

২৭. "কালো হাওয়া" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ,ষষ্ঠ খন্ড) পৃ : ৬৬।

২৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর", দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৯৬২ পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ ১৯৮০), পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত ' ছাপোষা' মধ্যবিত্ত জীবনের' 'শেষ 'অকৃত্রিম চিহ্ন' বুদ্ধদেব বসু রচনা করেছেন বিস্তৃত বর্ণনা বিবরণের সাহায্যে । তিনি পাত্রপাত্রীদের চেহারা আচরণ, গৃহসজ্জা, উৎসব, আচার, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশণ, তৈজষপত্র ইত্যাদির খুঁটিনাটি বিবরণ রচনা করেছেন । ওই বর্ণনা কাব্যিক এবং ওই জীবনকে রূপকথা বলে মনে হয় । কনিষ্ঠা কন্যা স্বাতীর জন্মদিন উপলক্ষে ওই মাতৃহীন সংসারের পিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । স্বাতীর জন্য কেনা হয় ' সুন্দর সবুজের ওপর সোনালী বুটি'র শাড়ি, সাটিনের ব্লাউজ, ' আর একটা পাৎলা ছোটো বাক্সে চিকচিকে কাগজের তলায় ঠিক জ্যামিতির ত্রিভুজের মতো ভাঁজ করা হলদে, গোলাপি, ফিকে নীল রুমাল ।' ঘর সাজাবার জন্য এবং অভ্যাগতদের জন্য আনা হয় 'ফুল, নতুন চায়ের পেয়ালা, চকচকে চামচ, 'ঘাস রঙের পেস্তা বসানো শাদা শাদা ফোলা ফোলা ঠান্ডা নরম' সন্দেশ । নিমন্ত্রন করা হয় পাড়ার গায়ক ও বাজিয়েদের , বসে জমজমাট গানের আসন । স্বাতীকে পরতে হয় 'সবুজ সিল্কের শাড়ি, সাটিনের ব্লাউজ, পিঠেপিঠি বোন শাশ্বতী 'জোর করে ধরে চুলটা নতুন ধরনে উল্টিয়ে দেয় ঘাড়ের উপর, কপালে চন্দনের ফোঁটাও ' বাদ পড়ে না।[২৯] কোনো শনিবার পিতা অফিস থেকে ফিরে সন্তানদের সিনেমায় নিয়ে যায়, কোনো সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরোয় । বিকেলে অফিস থেকে ফিরে পিতা মাঝেমধ্যে বসার ঘরে বসে চা খায় । স্বাতী 'ছোটো পটে করে' বাবার চা নিয়ে আসে । বোনেরা 'কিউটিকুরা-পাউডার' মুখে মাখা উচিত কিনা এ-নিয়ে তর্ক করে । পরিবারের কোনো বান্ধবকে কোনো সন্ধ্যায় চা খেতে নিমন্ত্রন করা হয় । চায়ের সঙ্গে দেয়া হয় 'চিংড়ির কাটলেট, চিড়ে ভাজা, শিঙারা' । আমন্ত্রিতকে নিজেরা হাতে চা ঢেলে দেয় স্বাতী, 'স্পষ্ট বুঝতে দিলো যে নিমন্ত্রিতেরা আর একটু চিড়ে ভাজা, আরো একটা শিঙারা খেলে তার সুখের সীমা থাকবে না । অতিথিদের সঙ্গে সে নিজেও খায়, 'কিন্তু তার খাওয়াটা যেন বোঝাই গেল না, কথা যে বেশি বললো তা নয়, কিন্তু যখনই কথা বলা মিইয়ে এসেছে, আস্তে ফুঁ- দিয়ে জীইয়ে তুলেছে আসর ।'[৩০] কখনো ওই পরিবার কলকাতার 'মেট্রো সিনেমায় সিনেমা দেখার আমন্ত্রন পায় ; পরিবারের কোনো বন্ধুর কাছে থেকে । সিনেমা দেখতে গিয়ে স্বাতী 'নল ডোবানো গ্লাসে পান করে ঠান্ডা পানীয় ।

---

২৯. "তিথিডোর" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ সপ্তম খন্ড) পৃ ঃ ১৯৬।

৩০. "তিথিডোর"(বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ সপ্তমখন্ড) পৃ ঃ ৩১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মেট্রোর দোতলায় ছবি দেখতে এসে স্বাতী অনুভব করে 'চেয়ারটা কতো আরামের, পিঠে কত নরম, হাঁটু রাখার জায়গা কতো বেশী। কার্পেট মোড়া গদি, সোনালী সিলিং, দেয়ালে ছবি' দেখে স্বাতী মুগ্ধ হয়। ছবি শেষে চীনা খাবার খেতে যায় 'সরু প্যাঁচালো কম আলোর গলি'র চীনা পাড়ায়। ফেরার পথে জার্মান ইহুদীদের কফি হাউস 'কাউফমান' -এ কফি খায়। কখনো ওই পরিবারটি নিমন্ত্রিত হয়ে বন্ধুর বাড়িতে। প্রখিতযশা শিল্পীর একক সঙ্গীতের পর ওই বাড়ির দোতলার 'মস্ত বারান্দায় রেস্তোরাঁ-র মতো ছোটোছোটো টেবিল ঘিরে চেয়ার, খাবার সাজানো থালা, চা, কফি, আইসক্রীম, যার যেটা পছন্দ ' দেয়া হয়।

ওই পরিবারটি নাগরিক নানা প্রথা মেনে চললেও তা পুরোপুরি নাগরিক ও আধুনিক নয়। পারিপার্শ্বের প্রভাবে ওই পরিবারটি আধুনিক নাগরিক জীবন যাপনের নানা রীতি পালন করে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে মফস্বলধর্মী জীবন যাপনে। সাদাসিদে অকপট আটপৌরে জীবনেই স্বস্তি পায় তারা। অফিস থেকে ফিরে বসার ঘরে কেতাদুরস্ত হয়ে বসে চা খাবার চাইতে ছাদে পাটি পেতে গা এলিয়ে সুস্থির বোধ করে স্বাতীর বাবা রাজেনবাবু। পা দুটোকে জুতার অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়ে আরাম পায়। এক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বিবাহিত অন্যান্য কন্যারা স্বামী সন্তানসহ পিতার বাড়িতে বেড়াতে আসে। যে কন্যাটি সংসারের ঝামেলার কারণে আসতে পারে না সে লম্বা চিঠিতে বাবার কাছে দুঃখ জানায়, পাঠায় 'সেই খামই পাঁচশো টাকার ড্রাফট আর পার্সেলে বর্মি স্যাকরার শিল্পকলার কয়েকটি নমুনা'। 'ভিড়, হৈ চৈ, অফুরন্ত রান্না আর খাওয়া'য় বাড়িটি জমজমাট বিয়ে বাড়িতে পরিণত হয়। বিয়ের পরে নতুন জামাই-এর প্রাতঃরাশের জন্য করা হয় মস্ত আয়োজন, 'মস্ত রুপোর ট্রেতে চা- শুধু কি চা, মাখন, ডিমের পোচ, সোনা রঙের মোটামোটা মর্তমান কলা, আবার ফুলোফুলো লুচি, ঝিরি ঝিরি আলুভাজা, সন্দেশ, পান্তুয়া, সরভাজা।'[৩১] শ্যালিকারা নানাভাবে রঙ্গপরিহাস করে। মধ্যাহ্নে হিন্দু পরিবারের প্রথামতো দেয়া হয় 'মস্তো রুপোর থালায় বাটি চেপে গোল করা ফুলের মতো ভাত, আর থালাটি ঘিরে হারের নহরের মতো ঝকমকে কাঁসার ছোটো বড় বাটি।' কোনোটিতে দেয়া হয় 'শুক্তো' , কোনোটিতে 'ছোলার ডালের ছেচকি', 'মাছের চপ' 'শাদা শাদা লাউয়ের তরকারি' 'সর্ষে নারকোল ও চিংড়ির তরকারি', 'উচ্ছে দিয়ে রাধা মৌরলা মাছ।'[৩২]

---

৩১. "তিথিডোর" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ সপ্তম খন্ড) পৃ: ২১৪।

৩২. "তিথিডোর" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ সপ্তম খন্ড) পৃ: ২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন পর ময়মনসিংহের শ্বশুরবাড়ি থেকে পুজোর ছুটি কাটাতে বাপের বাড়ি কলকাতায় আসে প্রথম কন্যা শ্বেতা । নেমেই 'হোল্ডলে বাঁধা মস্ত বিছানা' খুলে বার করে সবার জন্য আনা 'এক বাক্সিল পুজোর কাপড়, আর বিস্কুটের টিনে টিনে ভরা ক্ষীরের আর নারকোলের রকমারি খাবার' । কন্যার জন্য পিতা কলকাতার দোকান থেকে কিনে আনে 'ডিম সন্দেশ' সোনপাপড়ি' আর কলে ঠান্ডা দই' । বাজার থেকে আনা হয় 'তেলওলা আড়মাছ' 'বাঁধাকপি', বড়ো বড়ো 'কাঁকড়া' । কন্যা কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্না ঘরে ঢোকে । 'কাঁকড়ায় মশলা' মাখায় নিজহাতে, ' ডালের টকবগে ডেকচিটা হাতা দিয়ে ঘুঁটে একবারেই তিনটে আলু তুলে ' ' এক আঙুল দিয়ে একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরীক্ষা করে' দুটোকে ফের পাঠিয়ে দেয় 'ফুলন্ত জলে' অন্যটিকে বাটিতে ফেলে 'ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে আঙুলে সইয়ে সইয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফেললো নিমিষে, তারপর ....ধোঁয়া ওঠা সুগন্ধি একটি আলু চায়ের প্লেটে নুন গোল মরিচসুদ্ধ সাজিয়ে' দেয় ছোটো বোনের সামনে । শ্বেতার স্বামী কলকাতায় শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসে নাটক সিনেমা বাজার নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে রীতি-মতো একটা প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দেয় । শ্বেতার স্বামী প্রমথেশ ভোজনরসিক, সরল, প্রানবন্ত । তার মস্ত দেহ, চর্বির ভাজ দুপাশের গালে'। শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করলেই 'ঘামতে ঘামতে হাঁপাতে হাঁপাতে' নাজেহাল হয়, শ্বেতার পিতা যদি 'বাঁধাকপি' আনে, তবে প্রমথেশ নিয়ে আসে 'একঝুড়ি ফুলকপি', রাজেনবাবু 'মুরগি' আনলে প্রমথেশ পরদিন আনে 'হগসাহেবের বাজারের সবসেরা মটন, সঙ্গে টাটকা সবুজ মটরশুটি আর আপেলের মতো বড়ো বড়ো টুকটুকে লাল টম্যাটো' একমাত্র শ্যালক 'জামাই বাবুর সঙ্গে ঘনঘন গোপন পরামর্শ' করে কিনে আনে ' কোনো নাটকের কি সিনেমার এক গোছা টিকিট', 'দুই ট্যাক্সি বোঝাই হয়ে বাড়িসুদ্ধ হৈহৈ করে শ্যাম বাজারে থিয়েটারে' যায় , সিনেমা দেখতে যায় 'মেট্রো সিনেমা হলে, 'কলকাতার তখন তাজ্জবতম লাইট হাউসও বাদ' যায় না ।[৩৩]

মধ্যবিত্ত জীবনের নানা অনুষ্ঠানের, যেমন জন্মদিন বিয়ে কিংবা বৈকালিক চায়ের আসরের বিস্তৃত বর্ণনা দেয়াই বুদ্ধদেবের বৈশিষ্ট্য।"তিথিডোর" উপন্যাসেও ওই মধ্যবিত্ত পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা স্বাতীর বিবাহ অনুষ্ঠানের সকল আচার আনুষ্ঠানিকতার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন তিনি । বিবাহে আমন্ত্রিতদের খাবার ব্যবস্থা করা হয় ভাড়া করা বাড়ির ছাদে, 'মেরাপ বাঁধা

৩৩' তিথিডোর" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ সপ্তম খন্ড) পৃ ঃ ২৬৯,

Dhaka University Institutional Repository

শামিয়ানা খাটানো মস্ত ছাত, ব্ল্যাক আউট আর শীতের জন্য টেনিস লনের মতো মোটা নীল পরদা ঘেরা।'[৩৪] বরকে বসতে দেয়া হয় নীচতলার এক কক্ষে, 'দরোজায় জুতার স্তূপ, শাদা ফরাসের উপর হলদে কার্পেট', তার ওপর পাতা থাকে 'ঘোর লাল মখমলের তাকিয়া' প্রায় কালচে লাল গোলাপের দুটো তোড়া' রাখা হয় দুপাশে। বর যাত্রীদের আপ্যায়ন করা হয় 'লেমনেড, চা, প্লেটভরা পান আর সিগারেটে'। 'সরু সরু লম্বা টেবিলে মুখোমুখি ডবল সারিতে' আমন্ত্রিতদের বসবার ব্যবস্থা হয়, টেবিলে বিছানো থাকে 'ঘি রঙের পাৎলা কাগজ', খাদ্য পরিবেশণ করা হয় 'ঠোট বড়ো খুরিতে ঘেরা মাটির লাল থালায়' তাতে থাকে শাক থেকে রসমালাই পর্যন্ত আমিষ নিরামিষ চাটনি মিষ্টি মিলিয়ে আঠারো রকম খাবার' - 'একই সঙ্গে সাজানো সুগন্ধি কেওরা জল' আলাদা একটি ছোট্ট থালায় লবঙ্গ বেঁধা একটি পান পর্যন্ত সঙ্গে, পান যারা খায়না ......তাদের জন্য একটু শুপুরি, মৌরি আর আস্ত একটা বড় এলাচি।' অতিথিদের পাতে দেয়া হয় 'ভেটকি মাছের ফ্রাই,' 'শাক', 'ছোলার ডালের ছেচকি' 'মটরশুটির কচুরি' 'সর্ষে দিয়ে ভাপানো চিংড়ি' 'পেস্তা বাদাম দেয়া পোলাও', 'মাংস' 'বেসনে ভাজা চাকতি বেগুন', 'মাছের মুড়ো দিয়ে রাধা বাঁধাকপির ডালনা', 'চিংড়ি ভাজা', 'জলপাইয়ের টক', 'টম্যাটোর চাটনি' 'ফুলকপি দিয়ে রাধা রুইমাছ', 'মুগের ডাল' 'সন্দেশ', 'পাঁপর', 'রসমালাই' 'রসগোল্লা' ইত্যাদি আঠারো পদের খাবার। আমন্ত্রিত আত্মীয়রা কেউ উপহার দেয় 'সাচ্চাবুপোর কাজ করা টিশু সাড়ি', 'স্কাই বু রঙের ফ্রেঞ্চ শিফন', কেউ 'মেরুন রঙের মুর্শিদাবাদ সিল্ক', 'ঢাকাই জামদানি', 'ভিটের শাড়ি' 'জংলি শাড়ি', 'নতুন একরকম ডুঁরে শাড়ি', কেউ উপহার দেয় 'নিউ মডেল লেডিজ পার্কার', 'নতুন ধরণের ফুলদানি' 'গালার কাজ করা ছোট্ট বাক্স', 'জয়পুরি মিনে করা হাতির দাঁতের সিঁদুর কৌটা, 'টয়লেটসেট' 'গ্রামফোন' ইত্যাদি।

'শাদা সুন্দর মেঝেতে সুন্দর শাদা চিকন পাটের উপর' স্বাতীকে বসানো হয়। তাকে পরানো হয় 'সোনালী লাল উজ্জ্বল শাড়ি', 'পদ্ম লাল জামা' 'পান্নার দুল আর পান্না চুনির হার', হাতের 'শাদা শাখার পাশে ঝকঝকে নতুন চুড়ি আর কঙ্কণ'। বিবাহ বাসরে নিয়ে যাবার আগে স্বাতীর মুখের অর্ধেক ঢেকে দেয়া হয় 'একটি গোলাপী রঙের স্বচ্ছ রেশমী ওড়নায়' 'সিঁথেতে বাঁধা সোনার মুকুট' 'মস্ত মোটা ধবধবে শাদা সুগন্ধি মালা' গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে থাকে।

---

৩৪. "তিথিডোর" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, সপ্তম খন্ড) পৃঃ ৫১১।

Dhaka University Institutional Repository

'হলদে শাদা আর লাল রঙের আঁকা' পিঁড়িতে বসিয়ে কনেকে বিয়ের আসরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ,'শক্ত পোক্ত' তিনজন পুরুষ কনেকে 'ঘূর্ণি' করে সাত পাঁক ঘোরাতে' থাকে । নানা স্ত্রী আচার পালন করা হয়, নতুন জামাই ঘরে ঢুকতেই একজন বয়স্কা নারী 'একটি লাঠি হাতে তাকে তাড়া করলেন', 'লাঠি দিয়ে বরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপা হলো 'তারপর একবার' বরকে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হলো, একবার মেঝেতে কয়েক পা হাঁটতে হলো, তারপর একজন কেউ কী বিড়বিড় করতে করতে তিনবার টোকা দিলেন' বরের মাথায় । বরকে নিয়ে আসা হলো ঘরের কোনে 'সেখানে কুলোয় জ্বলছে প্রদীপ,' 'চিত্রবিচিত্র করা কুলোয়' সাজানো নানা জিনিসের 'কোনো কোনোটা সত্যেনকে ছুঁতে হলো', তারপর একজন মহিলা একটি পানের পাতা 'ঘাট ডুবিয়ে তার গায়ে জল ছিটোলেন ।'[৩৫] বিয়ের সম্প্রদান কর্তা পুরোহিতের নির্দেশে ' কোশার জলে হাত' ডোবায়, 'ডান হাতে ত্রিপত্র' ধরে, 'ডান হাতের ওপর বা হাতটি উপুর করলো, ...শক্ত শূণ্য মেঝেটার মাথা ঠেকালো।' বর ও কনের 'মন্ত্রপাঠ' শেষহলে 'পুরুৎ পুঁথি বন্ধ করে দুইহাতের কুশের বাঁধন খুলে' দেয় তারপর 'হোমের আগুন জ্বালে । পুরোহিতের নির্দেশ-মতো বর 'আগুনে ঘি দিলো;.......ছবার .... ' তারপর বর কনের 'দুপাশ দিয়ে বাড়িয়ে দুহাত অঞ্জলি করে মেলে ধরলো আর সেই হাতের উপর' কনে 'তার দুহাত অঞ্জলি করে পাতলো' কনের হাতে দেয়া হলো 'একমুঠো করে খই', একজন প্রবীনা মাটির ভাড়ে চালের গোলা এনে 'কোনাকুনি করে সাতটা গোলগোল পিটুলির দাগ এঁকে দিলো । বর কনের হাত তাক করে 'নিজের হাতটা ঠেলে দিলো উপরের দিকে । ....খই ছিটোনো', 'খই পড়লো আগুনে মেয়েরা শূণ্যে খই ছিটোলো ।'[৩৬] "তিথিডোর" উপন্যাসে কলকাতার সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার ও ওই পরিবারের জীবনযাপনের পদ্ধতির উপস্থাপন ঘটেছে ঔপন্যাসিকের আবেগে রঞ্জিত হয়ে, ওই মধ্যবিত্ত জীবনের সবকিছুই সুন্দর, তার দুঃখকষ্ট মৃত্যুও যেন সুন্দর ; ওই জীবনের মাধুর্য এমন স্বতঃসিদ্ধ যে কোনো বিঘ্নই তাকে ম্লান করতে পারে না ।

৩৫· "তিথিডোর" (বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, সপ্তম খন্ড) পৃ : ৫৫০।

৩৬· "তিথিডোর"(বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, সপ্তম খন্ড) পৃ : ৫৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জননী" (১৯৩৫) উপন্যাসে শহর তলীর প্রেক্ষাপটে নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। "জননী" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্যামা। শ্যামার জননী সত্তার শঙ্কা-সংশয়-মমতা অনিশ্চয়তা ও অসহায়তাবোধ - ঈর্ষা-বেদনা- অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস তুলে ধরা হয়েছে এখানে। শ্যামাকে এ-উপন্যাসে ভারতীয় আদর্শমতে মহৎ, ত্যাগী, ক্ষমা ও দয়ার প্রতিমূর্তি ও সর্বংসহিষ্ণু জননীরূপে সৃষ্টি করা হয়নি। শ্যামা এ-দেশের নিম্নবিত্ত জননীদের প্রতিনিধিত্ব করে। সন্তানদের ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অসংখ্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় তাকে। শ্যামা আত্মপরায়ণ, সতর্ক, দূরদর্শী ও পরিশ্রমী। নিজের সংসার ও সন্তানের স্বার্থ তার কাছে প্রধান। স্বেচ্ছাচারী স্বামীর অপরিণামদর্শিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে সে উচ্চকন্ঠে গালি-গালাজ করে ও অভিসম্পাত দেয়, কখনো কপাল চাপড়ে কাঁদে। স্বামী চাকুরিস্থলের টাকা আত্মসাৎ করে পালাবার আগে তার হাতে যে টাকা দেয়, প্রেস মালিক ও পুলিশের শত জিজ্ঞাসাবাদেও সে ওই টাকার কথা স্বীকার করে না। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত দিনগুলোতে ওই টাকা কটি একমাত্র সম্বল জেনেই সে এই মিথ্যাচার করে। তার জীবন বারবার এক দুর্দশা থেকে আরেক দুর্দশা দ্বারা জর্জরিত হয়, কিন্তু সে হাল ছাড়েনা। ওই দুর্যোগের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয় এবং নতুন করে ওই জীবন নিয়েই স্বপ্ন দেখতে থাকে। সন্তানদের জন্য প্রয়োজনে চৌর্যবৃত্তিও সে করে। স্বপ্ন দেখে পুত্রটি বড়ো হয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখে ভরে দেবে। এ সবই ভারতীয় নিম্নবিত্ত নারীদের বৈশিষ্ট্য। সন্তানদের প্রতি তার স্নেহ এতো উদগ্র যে তাকে পাশবিক বলা যায়। সন্তানরাই হয়ে ওঠে তার জীবন এবং ওই জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার যে প্রাণপন চেষ্টা তা আদিম এবং পাশবিক। শ্যামার স্বামী অস্বাভাবিক, অবিবেচক, কান্ডজ্ঞানহীন, অপরিণামদর্শী ও স্বেচ্ছাচারী। শ্যামাকে উপেক্ষা ও প্রহার করে এবং আপন স্বেচ্ছাচার দিয়ে শ্যামার জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। বন্ধুদের সঙ্গে ফূর্তি করে ঋণের দায়ে তাকে নিজস্ব প্রেসটি বিক্রি করে দিতে হয়। কিছুদিন বেকার থেকে সংসারকে নানাদুর্দশায় জর্জরিত করে সে একটি প্রেসে ম্যানেজারির কাজ পায়, সেখান থেকে যন্ত্র কেনার টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যায় সে। অর্থআত্মসাতের দায়ে পুলিশ তাকে ধরে নিলে শ্যামার জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। স্বামীর ভগ্নিপতির বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় সে। সেখানে তাকে যাপন করতে হয় দাসীর দুঃসহ জীবন, পুত্র বড়ো হয়ে তাকে সুখ দেবে - এমন স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে সে। ক্রমশ পুত্র বড়ো হয়ে লেখাপড়া শেষ করে চাকুরি নেয়, মা ও ভাইবোনদের নিয়ে বাসাভাড়া করে। শ্যামা পুত্রের বিয়ে দেয়, তবে পুত্রবধুর স্বাস্থ্য, লাবণ্য ও যৌবন তার অসহ্য বোধ হয়। পুত্রবধুকে সে ভালোবাসতে পারে না। পুত্রবধু

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান সম্ভবা হয়েছে জেনে শ্যামার বিরূপতা মুছে যায় । "জননী" নিম্নবিত্ত পরিবারে ঘটতে পারে এমন সব ঘটনার সমষ্টি । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পারিবারটিকে আদর্শায়িত না করে অবিকল উপস্থাপন রীতিতে চিত্রিত করেছেন । বাহ্যবাস্তব ও ঘটনার বর্ণনায় কোনো ভাবাবেগ সৃষ্টি করা হয় নি এবং শ্যামার যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তা অবিকল বাস্তবতারই উপস্থাপন । তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাহ্যবাস্তবতার বর্ণনায়ই সীমাবদ্ধ থাকেন নি । তিনি ওই নারীর মনোজগতও উদঘাটন করেছেন । সে সরল মানসিকতার নারী নয় । তার মনে যথেষ্ট জটিলতা রয়েছে । একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য : সে যখন জীবনে একধরনের সাফল্য অর্জন করেছে, পুত্রকে একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, তখন ওই তরুণীর রূপে সে সুখী বোধ না করে পীড়া বোধ করেছে । বৌয়ের 'চোখ ঝলসানো মূর্তির দিকে ' শ্যামা তাকাতে পারে না , ওই সৌন্দর্যের জন্য সে পুত্রবধুকে 'সুনজরে দেখিতে পারিলনা, একটা বিদ্বেষের ভাব রহিয়াই গেল ।' তাই ওই পুত্রবধু যখন বাপের বাড়ি যেতে চায় শ্যামার মনে হয় 'যাক, ও চলিয়া যাক, দুদিন চোখ দুটো একটু জুড়াক শ্যামার ।'[৩৭] শ্যামার এই মনোভাবের অবচেতন সুরে রয়েছে যৌন ঈর্ষা । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই দুর্গত দরিদ্র পরিবারের বাহ্যবাস্তবতা উপস্থাপন করার সময়ও অন্তরের এই জটিলতাকে উপেক্ষা করেন নি ।

"সহর বাসের ইতিকথা" (১৩৫২) উপন্যাসে কলকাতা নগরীর প্রেক্ষাপটে উচ্চবিত্ত জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে । ওই জীবন জটিল, অ-সুখকর, বাহ্যচাকচিক্যপূর্ণ কিন্তু বিষাক্ত । উচ্চ-বিত্ত জীবনের নানা সঙ্কট ও জটিলতা, উচ্চবিত্ত আধুনিক নরনারীর ব্যক্তিস্বত্বের দ্বন্দ্ব ও অন্তর্গত বিকারের উপস্থাপনা ঘটেছে এ-উপন্যাসে । অর্থনীতিক কারনই ওই জীবনের জটিলতার মূলে । অর্থাভাবের সমস্যায় ওই জীবন পীড়িত নয় । তাদের প্রভুত বিত্তই তাদের জীবনে সঙ্কট ঘনীভূত করে, পরস্পরের মধ্যে জন্মদেয় অবিশ্বাস ও হিংসা ।মানিক বাহ্যবাস্তবতার বিবরণ রচনার পাশা-পাশি উদ্ঘাটন করেছেন চরিত্রদের অন্তর্লোকের দ্বন্দ্ব বিকার । ধনশালী মিতব্যয়ী পিতার মৃত্যুর পর পুত্র মোহন সিদ্ধান্ত নেয় গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার । কলকাতার অভিজাত পাড়ায় তিনশো টাকায় বাড়ি ভাড়া নেয় । কলকাতার অভিজাত ধনী বন্ধু চিন্ময় ও তার স্ত্রী সন্ধ্যার সঙ্গে নতুন করে মেলামেশা শুরু করে মোহন । প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় পার্টির আয়োজন করে নিজগৃহে । শহরের গণ্যমান্য ধনীদের নিমন্ত্রন করে , নিজেও নানা

৩৭· "জননী" (মানিক গ্রন্থাবলী,দ্বিতীয় খন্ড), পৃঃ ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

জায়গায় নিমন্ত্রিত হয়ে যায় । এভাবে সে শহরের একজন অভিজাত ধনীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে । মোহনের অমিতব্যয়িতা তার জননীকে ক্ষুব্ধকরে, কনিষ্ঠ পুত্র নগেনের ভবিষ্যৎ ভেবে সে শঙ্কাতুর হয় এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শত্রু জ্ঞান করতে থাকে । মা এবং অন্যান্য ভাই বোনেরা মোহনকে সন্দেহ অবিশ্বাস করে দূরে সরে যায় । গ্রামে থাকাকালীন সময়ের সহজ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। স্ত্রীর সঙ্গেও মোহনের সহজ সম্পর্ক থাকে না, তা হয়ে ওঠে বিরক্তিও, বিতৃষ্ণাপূর্ণ সম্পর্ক । যে নাগরিক অভিজাত জীবন তার কাম্য ছিলো তা লাভ করলেও এভাবে মোহন হারায় স্নিগ্ধ আন্তরিক পারিবারিক জীবনকে । ওই উচ্চবিত্ত নাগরিক জীবন বিকার, উদ্দেশ্যপরায়ণতা, স্বার্থান্ধতা ও সংশয় পরিপূর্ণ, ওই জীবনে সহজভাবে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় না । প্রতিটি সম্পর্কের পেছনে থাকে গূঢ় স্বার্থ । ওই মানুষেরা জটিল, ব্যক্তিত্বের সংঘাত ওই জীবনের মানুষদের একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় । মোহনের উচ্চবিত্ত নাগরিক বন্ধু চিন্ময় ও সন্ধ্যার জীবনে বিচ্ছেদ আসে ব্যক্তিত্বের সংঘাতের কারণে । চিন্ময় স্ত্রী সন্ধ্যাকে চায় পুরোদস্তুর গৃহবধূ করে রাখতে, আর সন্ধ্যা চায় স্বাধীন উদ্দাম জীবন । স্বামীর ইচ্ছেমতো চলতে চায়না বলে সন্ধ্যা চলে যায় বাপের বাড়িতে, তবে টাকার প্রয়োজন হলে সে চিন্ময়কে ফোন করে । টাকা পেলে কখনো সে যায় রেসের মাঠে, কখনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে হোটেলে মদখেতে । চিন্ময় টাকা পাঠাতে অস্বীকৃত হলে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান ধারণে অনীহ সন্ধ্যা স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হয় । সন্ধ্যার যে স্বাধীন উদ্দাম জীবনের রূপ বর্ণনা করেন মানিক তা উচ্চবিত্ত তরুণীদের সম্পর্কে প্রথাগত সাধারণ ধারনার রূপায়ণ । তাই তা বানোয়াটি বলে মনে হয় ।

উদ্দেশ্যপরায়ণ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র ওই সমাজের মানুষ । ছেনালীপনা ওই সমাজের তরুণীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য । চিন্ময়ের অবিবাহিত বোন ঝরনা মোহনের ছোট ভাই নগেনকে কুক্ষীগত করার জন্য নানারকম ছেনালীপনা করতে থাকে । পিতার বিপুল বিত্তে নগেনের সমান ভাগ আছে জেনেই সে নগেনের প্রতি আকৃষ্ট হয় । ব্যক্তিত্বের সংঘাতের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় মোহনও । গ্রামীন জীবনে যে স্ত্রী সঙ্গে নিবিড় সখ্যছিলো, শহুরে জীবনে সে স্ত্রীকে সংকীর্ণ, ন্যাকা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে মনে হতে থাকে । স্ত্রী অসুখে সে সহানুভূতিশীল না হয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে । ওই জীবনে পারস্পরিক অবিশ্বাসই চরম সত্য । স্বার্থচিন্তা ও অবিশ্বাস প্রত্যেককে তাড়িত করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে জটিল করে তোলে । মোহনের স্নেহশীল কোমল জননী শহুরে জীবনে হয়ে ওঠে প্রবল হিংসুটে, বাস্তববাদী, কলহপরায়ণ । বড় ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নগেনই সম্পত্তিতে সমান অধিকারের দাবি নিয়ে হয়েওঠে বেয়াদব ও অবাধ্য। । মোহন সংবেদনশীল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন তরুণ ।

Dhaka University Institutional Repository

শহুরে উচ্চবিত্ত জীবনের জটিলতা ও তার পরিবারের পারস্পরিক সহজসম্পর্কের বিনষ্টি তাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। ওই বিনষ্টির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোহনের উপলব্ধি এমন ;

> মোহন জানে এভাবে চলিতে পারে না, পারিবারিক জীবনে তার যে ভাঙন ধরিয়াছে তাকে আর টেকানো চলে না, একদিন এ জীবন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবেই এবং তার বেশী দেরী নাই।
>
> তবু সে প্রাণপণে সংঘর্ষে এড়াইয়া চলে, শেষ বুঝাপড়ার দিনটা যতদিন পারে পিছাইয়া দিতে চায়, মিথ্যা আশায় নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।[৩৮]

"সহরবাসের ইতিকথা"য় বাঙালী প্রথাগত একান্নবর্তী পরিবারের রূপান্তরের চিত্র রচিত হয়েছে। পল্লীতে যে পরিবারটি সুখে ছিলো কিন্তু পল্লীতে থাকা যাদের কাছে আর রুচিকর বলে মনে হয় নি, তারা যেন নিয়তি-তাড়িত হয়েস্বেচ্ছায় শহরে স্থানান্তরিত হয় ; এবং তাদের পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের সম্পর্কের যে-জটিলতা দেখিয়েছেন, তা আধুনিক সংবেদনশীল মানুষের জটিলতা। যে-স্বার্থেরকলহে পরিবারটি বিপর্যস্ত হয়ে গেলো তার জন্য নগর অত্যাবশ্যক নয়, এই স্বার্থের কলহ ও পারিবারিক বিপর্যয় পল্লীর জীবনেও খুবই সম্ভব। নগর সম্পর্কে একটি পূর্বধারণা নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন "সহরবাসের ইতিকথা"। এ-উপন্যাসে পল্লী ও নগরের বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনায় তিনি অবিকল উপস্থাপণ রীতি অবলম্বন করেন, কিন্তু উচ্চবিত্তের পারিবারিক জীবন বর্ণনায় অবিকল উপস্থাপন রীতি ক্ষুন্ন হয়ে সেখানে প্রধান হয়ে উচ্চবিত্তের নাগরিক জীবন সম্পর্কে তাঁর পূর্বধারণা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস জনবহুল, অসংখ্য চরিত্র তাঁর উপন্যাসে ভিড় করে আসে এবং বাহ্যজগতের একটি প্রতিরূপ তৈরী করে। তিনি বুদ্ধদেব বসুর বিপরীত, বুদ্ধদেবের উপন্যাস জনবিরল ; বাহ্যজীবন সেখানে ব্যক্তিগত জীবনে সংহত হয়। তাই বুদ্ধদেবের উপন্যাসে নাগরিক আধুনিক চেতনা প্রকাশ পায়, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ওই নাগরিক আধুনিক চেতনা প্রকাশ পায়না, প্রকাশ পায় বাহ্যজীবন ও ব্যক্তির অন্তরের বিকার।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অনুবর্তন" (১৯৪২) উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতা নগরীর প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হয়েছে। কলকাতার একটি স্কুলের নিম্নবেতনভুক্ত শিক্ষকদের

শিক্ষকতাজীবন ও পারিবারিক জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু, নারানবাবু, হেডপন্ডিত প্রমুখ এ-উপন্যাসের চরিত্র। এই শিক্ষকদের কর্মজীবন ও

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক জীবন অপরিমেয় দুর্দশাগ্রস্ত । এরা সামান্য বেতনে চাকুরি করে কিন্তু ওই বেতনও জোটে অনিয়মিত । স্কুল সেরে প্রত্যেককেই টিউশনি করতে যেতে হয় । স্কুলে দেখা দেয় নানা সমস্যা, কখনো ছাত্রেরা স্ট্রাইক করে , কখনো খেলতে গিয়ে ছাত্ররা দুর্ঘটনায় পতিত হয় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জাপানী বোমারু বিমানের কলকাতা আক্রমনের সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রধান শিক্ষক স্কুল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় । এই শিক্ষকদের পারিবারিক জীবন দারিদ্র্য ও নানা দুর্দশায় পরিপুর্ণ । জাপানী বোমা আতঙ্ক তাদের দুর্দশা আরো বাড়িয়ে তোলে । ওই শিক্ষকেরা প্রত্যেকেই ব্যর্থ, খাপনা খাওয়া, সাদাসিদে এবং ভালো মানুষ । তারা নগরে বাস করলেও নাগরিক নয়; তাদের কথা, চিন্তা, জীবনযাপনের ধরণ, খাদ্যাভ্যাস - সমস্ত কিছুতেই প্রকট হয়ে ওঠে গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ চরিত্র । ওই শিক্ষকেরা নানাভাবে নানাজনের হাতে লাঞ্ছিত হয় । কখনো তাদের লাঞ্ছনা করে প্রাইভেট টিউশনীর গৃহস্বামী, কখনো অবাধ্য দুরন্ত ছাত্র, কখনো স্ত্রী । তারা সরল, হৃদয়বান ও ভালোমানুষ বলেই তাদের ভাগ্যে এতো লাঞ্ছনা জোটে । তারা সবকিছুর সঙ্গে এবং সবার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ । খাদ্য লোলুপতা তাদের প্রত্যেকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যে কোনো খাদ্য তারা খায় অত্যন্ত ধীরে সুস্নেহ, যেন খাদ্যের সামান্য কণাও বাদ না পড়ে । ক্লাশ ফাঁকি দেয়ার জন্য প্রত্যেকেই সুযোগ খোঁজে, ছুটির ঘন্টা শোনার জন্য হয়ে থাকে উৎকর্ণ । দুর্দশা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও ওই জীবন সহজশ্রী ও মাধুর্য পুর্ণ । যে কোনো সামান্য সুখই ওই জীবনে পরম সুখরূপে গণ্য হয় । এই উপন্যাসেও বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যকে দেখেন জীবনের ঐশ্বর্য এবং সহজাত ব্যাপার রূপে । ফলে তার উপন্যাসে দারিদ্র্য পীড়াদায়ক না হয়ে মধুর হয়ে ওঠে ।ওই জীবন দারিদ্র্য সত্ত্বেও এতো শ্রী ও মাধুর্য মন্ডিত এবং ওই মানুষগুলো এতো আদিম সরলতাপূর্ণ যে ওই জীবনের আখ্যান পাঠ করার পর পাঠকচিত্ত মুগ্ধতা ও করুনায় পরিপুর্ণ হয়ে ওঠে । সুখমিলিয়ে ওই জীবনের গল্প রূপকথা পাঠের আস্বাদ দেয় । বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যের রোম্যান্টিক উপস্থাপক, তাই বাহ্যবাস্তবের অবিকল উপস্থাপনও আর অবিকল থাকে না । তাঁর রোম্যান্টিক মনোভঙ্গীর জন্য তা হয়ে ওঠে করুণ, মধুর ।

বনফুলের "জঙ্গম" তিন খন্ডে সমাপ্ত (প্রথম খন্ড : ১৩৫০, দ্বিতীয় খন্ড : ১৯৪৫, তৃতীয় খন্ড : ?) । প্রথম দুখন্ডে উপস্থাপিত হয়েছে কলকাতা নগরীর উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের রূপ, পতিতা পল্লীর জীবনের রূপও পাওয়া যায় । তৃতীয় খন্ডে সমকালীন কলকাতার সাংবাদিক জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয় । এ-খন্ডের শেষাংশে বনফুল গ্রাম জীবনের রূপ

Dhaka University Institutional Repository

উপস্হাপনা করেন । বনফুলের এ-উপন্যাস জনবহুল । উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত অসংখ্য পাত্রপাত্রী এ-উপন্যাসে ভিড় করে আছে । উচ্চ ও নিম্নবিত্তের জীবনের বৈপরীত্য উপস্হাপনই এ-উপন্যাসের লক্ষ্য, তার সাথে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুন তরুনীদের অস্হিরতা উদভ্রান্তির রূপও খন্ডিত ভাবে উপস্হাপিত হয়েছে । নগরের পতিতাদের জীবনের বাহ্যিক রূপও বনফুল উপস্হাপন করেছেন । উচ্চবিত্ত জীবন অনৈতিকতা গ্রস্ত । ব্যভিচার ও ছেনালীপনা ওই সমাজের নারী পুরুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য । উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতে সান্ধ্য টিপার্টি লেগেই থাকে, সিনেমায় যাওয়া, আড্ডা, পরচর্চায় সময় কাটানো ছাড়া ওই সমাজের নারীদের কিছুই করনীয় নেই । বোঝা যায় উচ্চবিত্ত সমাজ ও নারীদের সম্পর্কে প্রচলিত পূর্ব ধারণা থেকেই বনফুল ওই সমাজ ও নারীদের এঁকেছেন । মিষ্টিদিদি, তার অধ্যাপক স্বামী, মিস্টার বোস উচ্চবিত্ত শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্ব করে । মিস্টিদিদির অধ্যাপক স্বামী অন্যমনস্ক, স্ত্রীর প্রতি উদাসীন ও আত্মপরায়ণ। মিস্টিদিদি প্রগল্‌ভা, স্বৈরিনী নারী । স্বামীর অন্যমনস্কতাও উপেক্ষা তাকে অন্য পুরুষের প্রতি আগ্রহী করে তোলে । মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে সে ছেনালীপনা করে, ছোট বোনের বাগদত্তের সঙ্গেও শারীরিক সম্পর্ক স্হাপন করে । ওই উচ্চবিত্ত সমাজে দাম্পত্য জীবন অপ্রেম ও উপেক্ষায় পরিপূর্ণ । স্বামীরা নিজেদের কর্ম ও পরনারীতে মগ্ন, উপেক্ষিত স্ত্রীদের কেউ পরপুরুষের সঙ্গে ছেনালীপনা করে, কেউ স্বামীর মোটর নিয়ে অবিরাম বাইরে ঘুরে বেড়ায়, অকারণ কেনাকাটা করে সময় কাটায় ।

নাগরিক নিম্নবিত্ত জীবন পারস্পরিক সম্প্রীতিও সহজ ভালোবাসায় পূর্ণ , কিন্তু ওই জীবনে অর্থকস্ট প্রবল । ভনটু, তার বৌদি ওই জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে । ভনটু নিম্নবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুত্র । জ্যেস্ঠ ভ্রাতাকে অসুস্হতার জন্য দূরবর্তী স্বাস্হ্যকর স্হানে পাঠাতে হয় । সংসারের ব্যয় নির্বাহ ও অসুস্হ ভাইকে চিকিৎসার টাকা পাঠাবার দায়িত্ব পড়ে ভনটুর ওপর । পড়াশোনা ছেড়ে সে সওদাগরি অফিসে কেরানির কাজ নেয় , নানা জনের কাছ থেকে নানা কৌশলে টাকা ধার করে জোড়াতালি দিয়ে সে সংসার চালায় । ভনটুর বৌদি মমতাময়ী, গৃহকর্মনিপুণা, কল্যানী নারী । সংসারের সকলের সেবা করাই তার সুখ । একশ দুই জ্বর গায়ে থাকা সত্ত্বেও সে মধ্যরাতে উঠে শ্বশুরকে চা করে দেয় । ভনটুর জন্য আলুর খোসার চড়চড়ি রান্না করে, পোস্ত বেটে তড়িঘড়ি দেবরের জন্য বড়া ভাজে, অতিথি এলে নিজের পাতের খাবার তুলে দেয় । তার একমাত্র বিলাসিতা পান খাওয়া, সে তার রূপোর পানের ডিবে অতি

Dhaka University Institutional Repository

যতনে গুছিয়ে রাখে । প্রথাগতপ্রচলিত ধারণা হচ্ছে নিম্নবিত্ত সাধারণ জীবন দারিদ্র্য পীড়িত হলেও পারস্পারিক সম্প্রীতি ওই জীবনকে মধুর করে রাখে । এই প্রচলিত পূর্ব ধারণা নিয়েই বনফুল নিম্নবিত্তের জীবনের রূপ এঁকেছেন । বনফুল পতিতা জীবনের বিস্তৃত পরিচয় তুলে ধরেন না, তাদের বাহ্যজীবনের খন্ডিত রূপের উপস্থাপনা করেন । প্রতি সন্ধ্যায় পতিতাপল্লীর নারীরা খদ্দের ধরার জন্য পথে নামে, খদ্দের পেলে মদ্যপান করে অশ্লীল নৃত্যগীত ও হুল্লোড়ে মেতে ওঠে, যে খদ্দের বেশি অর্থ দিতে পারে তাদের অনুরাগ তার প্রতিই বেশি । বনফুলের বর্ণনায় পতিতা পল্লীর প্রতিবেশ, পতিতাদের জীবন যাপনের ধরণ ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনের সমগ্ররূপ উপস্থাপিত হয় না । বোঝা যায় পতিতা পল্লী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ভিত্তি করেই তিনি কাল্পনিক বর্ণনা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন ।

এ-উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুন তরুনী শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্ব করে শঙ্কর ও বেলা । শঙ্কর আদর্শবান, সৎ এবং অস্থিরতাগ্রস্ত । তবে তার অস্থিরতার যথাযথ বাস্তব প্রেক্ষাপট নির্দেশে ব্যর্থ হয়েছেন বনফুল, ফলে শঙ্করের ঘোর অস্থিরতাকে অকারণ ও আরোপিত বলে মনে হয় । বেলা শিক্ষিত এবং প্রবল আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন । সে চায় স্বাধীন, একাকী ও স্বাবলম্বী জীবন যাপন করতে । কিন্তু তার ওই জীবন যাপনে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায় সমাজ । সে কয়েকটি টিউশনি জুটিয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে একলা জীবন শুরু করে, কিন্তু নানা বয়সের পুরুষেরা তাকে উত্যক্ত করতে থাকে, পাড়ার মাস্তানেরাও নানা ভাবে উৎপাত করে । অবশেষে এক বৃদ্ধ ইংরেজের সঙ্গে সে বিলেতে চলে যায় । এ-উপন্যাসে বেলার জীবনের সঙ্কট চিত্রনের চেষ্টা আছে, তবে পরিশেষে তাকে যে বিলেত পাঠিয়ে দেয়া হয় তা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ সমাধান । তার বিলেত চলে যাওয়া হচ্ছে এই সমাজের বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাওয়া । এ-উপন্যাসে বাস্তব জীবনের রূপ উপস্থাপনার ব্যাপারটি প্রধান হয়ে থাকেনি, একটি রহস্য রোমাঞ্চভরা কাহিনী বর্ণনাই শেষ পর্যন্ত লেখকের লক্ষ্য হয়ে ওঠে । এ-কারণেই রহস্য, ভায়োলেন্স পতিতাপল্লীর সান্ধ্য আসর, খুন, ছিনতাই, গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতা, খুনের পরিকল্পনা, ভিকটিমের ছবি তুলে খুনীর হাতে পৌঁছে দেয়া ইত্যাদি ব্যাপার এ-উপন্যাসে সন্নিবেশিত হয়েছে । অর্থাৎ বাস্তবতা তার মূল্য হারিয়ে বিষয় হয়ে উঠেছে রোমাঞ্চকর গোয়েন্দাধর্মী প্লট নির্ভর উপাখ্যানের ।

"জঙ্গম" তৃতীয় খন্ডে সমকালীন কলকাতার পারস্পরিক ঈর্ষা বিদ্বেষ আক্রমন প্রতিআক্রমনে পরিপূর্ণ সাংবাদিক জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে । ওই সাংবাদিকেরা উগ্র আত্মসম্মানবোধ নিয়ন্ত্রিত, প্রতিপক্ষকে তীব্রভাবে আক্রমন করার জন্য সদাসচেষ্ট তারা, তারা পরস্পরকে ঈর্ষা

Dhaka University Institutional Repository

যাপন করে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবন । পাশাপাশি কবিরাও নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে লড়াইয়ে মত্ত । শঙ্কর ওই উন্মত্ত অস্থির জীবনের দর্শক । ওইসব ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা তাকে ক্লান্ত করে । জটিল অস্থির শহুরে জীবন ত্যাগ করে সে অবশেষে গ্রামে চলে যায় এবং গ্রামেই সে তার প্রকৃত কর্মস্থল খুঁজে পায় । ওই পল্লীবাসীরা দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী, আত্মোন্নতিবিমুখ, অপরিণামদর্শী এবং অমিতব্যয়ী । এদের জীবন সম্বৎসরই দুঃখ ও অভাবে পরিপূর্ণ, কিন্তু পালপার্বনে আনন্দ উৎসবের জন্য এরা উচ্চসুদে ঋণ নিতে অকুন্ঠ । এভাবে নিজেদের ও উত্তর-পুরুষদের ঋণে শৃঙ্খলিত করে নেয় তারা । এরা মদ খায়, জুয়া খেলে, অবৈধ যৌন সম্পর্কে জড়িত হয় । শিক্ষিত উপকারী বাবুদের প্রতি এরা পোষণ করে সন্দেহ ও অবিশ্বাস । তাদের উপকারের জন্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা ওই সমিতিকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং মহাজনের কাছে ঋণী হতেই অধিক আগ্রহ বোধ করে । শঙ্কর সিদ্ধান্ত নেয় সে চাষীদের সঙ্গে মাঠে খেটে, তাদের জীবনযাপনের শরীক হয়ে ওই চাষীদের একজন হয়ে উঠবে এবং তাদের হিত সাধন করবে । এখন্ডে নগর এবং গ্রাম দুই জীবনেরই রূপ পাওয়া যায় এবং ওই দুই জীবনই সুস্থ জীবন বিরোধী । তবে নগর জীবন তিনি পরিত্যাগ্য গণ্য করেছেন এবং নায়ককে গ্রামে ফিরিয়ে এনেছেন । এতে নগর-বিমুখতার যে-বাণীটি রয়েছে সে-বাণীটি ভাবাবেগ-প্রসূত । গ্রামোন্নতির ওই পদ্ধতি গত কয়েক দশকে ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে ।

গোপাল হালদারের "শতাব্দীর স্রোত" ট্রিওলজির অন্তর্গত "ভাঙন" (১৯৪৭), "স্রোতের দীপ" (১৯৫০), "উজান গঙ্গা" (১৯৫০) উপন্যাসে শহরতলী ও কলকাতা নগরীর প্রেক্ষাপট গ্রহণ করা হয় । এ-উপন্যাসত্রয়ীতে বিশ শতকের প্রথম দিকের মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকদের জী-বনের নানা ভাঙনের পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে । "ভাঙন"-এর ভূমিকায় লেখক বলেন, ' এ কাহিনীর কাল মোটামুটি ইং ১৯২০-১৯২৫ সাল । সে সময়কার বাঙালী ভদ্রলোকের জীবন যাত্রায় ভাঙনের যে লক্ষনগুলি অস্ফুট ছিল, ইং ১৯৩০-৩২-এই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সেই ভাঙন ধরা জীবন যাত্রা চুরমার হয়ে যায় । ....। 'ভাঙনীকুল' শুধু ভদ্রশ্রেণীর অবসানের প্রথম দিককার কথা. প্রধানতঃ যারা তখনকার পিতৃ-স্থানীয় তাদের চোখ দিয়ে পুত্রস্থানীয়দের অবলোকন ও বিচার ।'[৩১] বিংশ শতাব্দীর বিশের

৩১· গোপাল হালদার, 'ভূমিকা', "ভাঙন" ।

Dhaka University Institutional Repository

দশকে বাঙালি মধ্যশ্রেণীর জীবনে ভাঙন আসে নানাদিক থেকে । পরবর্তী প্রজন্মের উত্তর-পুরুষেরা আগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে পূর্ববর্তী প্রজন্মের ঐতিহ্য ও বিশ্বাস, প্রত্যাখ্যান করে জীবন যাপনের রীতি ও ধর্ম, গ্রহণ করে নতুন মত ও পথ । তাদের প্রত্যাখ্যান পুরাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী পরিবার জীবনে ভাঙন নিয়ে আসে । এ-উপন্যাসে বাঙালি মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে জ্ঞান শঙ্কর চৌধুরী । মেঘনা তীরবর্তী শহর মধুখালির প্রসিদ্ধ উকিল জ্ঞান শঙ্কর চিত্রিসারের বিখ্যাত জমিদার পরিবারের দশম পুরুষ । নিজের কর্মজীবনে প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও নিজেকে চিত্রিসায়ের চৌধুরী পরিবারের উত্তরপুরুষ ভাবতেই সে সুখী বোধ করে । সে ওই বংশের প্রথাগুলো পালন করে নিষ্ঠার সঙ্গে, ওই বংশের মর্যাদারক্ষার জন্য এক ধরণের দায়বদ্ধতা ও বোধ করে । তার সন্তান ও ভ্রাতুষপুত্রেরাও পূর্বপুরুষদের ওই অভিজাত্যবোধ ও প্রথা বিশ্বাসে শ্রদ্ধাশীল থেকে বংশের মর্যদা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করে । কিন্তু তার এ-আশা ব্যর্থ হয় । প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী কালে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে যে আলোড়ন ও ব্যাপক বদল শুরু হয়, তার অভিঘাতে চিত্রিসায়ের চৌধুরী বংশের তরুণ প্রজন্মের চেতনায়ও ব্যাপক বদল ঘটে । জ্ঞান চৌধুরীর প্রত্যাশা পুরণ হয় না বরং উত্তরপুরুষদের আচরণ, প্রথা বিরোধিতা ও বংশমর্যাদারক্ষায় অনীহা তাকে ব্যথিত করে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর জীবনের সঙ্কট ও ক্রমপতনের ইতিবৃত্ত গোপাল হালদার উপস্থাপিত করেছেন জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভাঙনের কাহিনী বর্ণনার মধ্যদিয়ে । ওই শ্রেণীর জীবনে ভাঙন আসে পারিবারিক ভাবে, সামাজিকভাবে , রাজনীতিও ওই ভাঙনের পেছনে সক্রিয় থাকে ।

ব্যালজাক যেমন দেখান ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর অনিবার্য পতন ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অবশ্য-ম্ভাবী উত্থানকে, গোপাল হালদারও তেমনি নির্দেশ করেছেন একটি বিশেষ শ্রেণীর অবক্ষয় ও বিলোপ, নতুন আরেকটি শ্রেণীর উত্থানকেও নির্দেশ করেন তিনি । এই নতুন শ্রেণীটি প্রবল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী । পূর্বপুরুষদের আভিজাত্য, ভদ্রাসন, বিশ্বাস প্রথা, ধর্মবোধ, বংশমর্যাদা কোনোকিছু রক্ষায়ই মনোযোগী নয় নতুন প্রজন্মের মানুষেরা । নানা বিষয় নানাভাবে তাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়, জীবনকে তারা একেকজন গড়তে চায় একেকভাবে । চৌধুরী বংশের নতুন প্রজন্মের সন্তান সুরেশ্বর প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে ব্যবসা শুরু করে এবং লাভবান হয় । ক্রমশ ব্যবসায় টাকা খাটানো ছাড়া অন্য কোনো কাজে যেমন পূর্বপুরুষের ভিটার সংস্কার পুকুর সংস্কার ইত্যাদি কাজে অর্থ ব্যয় করা অর্থের অপচয় বলে গণ্য করতে থাকে । তার

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী যামিনীও পুত্রবধু হিশেবে পারিবারিক প্রথাগুলো পালন করতে চায় না । চৌধুরী পরিবারের আরেক সন্তান অতুল পুলিশের সাইন্সপেক্টরের মেয়েকে নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করে ফেলে এবং নিজে পুলিশের কাজ নেয় । এ সংবাদ পরিবারকে ব্যথিত করে । পুলিশের কাজ ওই পরিবার অত্যন্ত হীনকর্ম রূপে গণ্য করে । বিমূঢ় জ্ঞান শঙ্করের মনে ওই সংবাদ এমন প্রতিক্রিয়া জাগায় :

> জ্ঞানের বিস্ময় যেন বাড়িয়াগেল । দারোগা পুলিশ হইবে অতুল ! বুদ্ধিমান-সচ্চরিত্র চৌধুরী বংশের ছেলে, বিভূতি শঙ্কর জ্ঞান শঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র হইবে দারোগা ! বিভূতি শঙ্করের আত্মা আপত্তি করিবে না ?[৪০]

জ্ঞান-শঙ্করের আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র অমর প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী । সে মূল্য দেয় শিক্ষাকে এবং ব্যক্তিস্বত্বের বিকাশই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করে । বংশমর্যাদা ও পূর্ববর্তী বিধান প্রথা সংস্কারে তার আস্থাও নেই শ্রদ্ধাও নেই । পুরাতন সমাজ ও একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনকে সে ক্ষতিকর বলে মনে করে, কারণ ওই সমাজ ব্যক্তিকে মর্যাদা দেয় নি এবং একান্নবর্তী পরিবার ব্যক্তির বিকাশের পথের বাধা ।'চৌধুরীদের কোনো ঐতিহ্য, জাতি ধর্ম সাধনা কিছুতেই অমর আস্থা রাখে না ।'[৪১] তার উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সবকিছুকে অস্বীকার করার প্রবণতা জ্ঞানশঙ্করকে বিপন্ন করে । অমর পাঞ্জাবী খ্রিস্টান কলেজ শিক্ষিকাকে বিয়ে করতে চেয়ে জ্ঞান-শঙ্করকে দেয় তীব্র আঘাত । অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিয়ে করা জ্ঞানশঙ্করের কাছে ক্ষমাহীন অপরাধ এবং অনৈতিক কাজ বলেই গণ্য হয় । অমরের সঙ্কল্প তার বিশ্বাসকে আঘাত করে । পুত্র অশোক ও অরুনও পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস প্রথা আচার গ্রহণ যোগ্য বলে মনে করে না,তারাও বিকশিত হয় স্বাধীনভাবে , গ্রহণ করে নিজেদের মনমতো জীবন । অশোক পিতার ইচ্ছানুযায়ী বিলাত ফেরত অফিসার না হয়ে হয়ে ওঠে বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী । সে প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়, কারাবরণ করে । দেশ যখন সন্ত্রাসবাদ, স্বদেশী ডাকাতির মাধ্যমে ইংরেজ বিরোধিতা প্রকাশে ব্যস্ত, অশোক তখন গণবিপ্লবের কথাভাবে । তার উপর্যুপুরী কারাবরণ পরিবারকে অশান্তি ও উদ্বেগগ্রস্ত করে । অশোক এবং অন্যান্যরা কেউই চৌধুরীদের সনাতন প্রথা ও 'বাহুল্যবিহীন প্রশান্ত ঐতিহ্য' মানে না । তাদের এই অশ্রদ্ধা জ্ঞানশঙ্করকে বিপর্যস্ত করে তোলে, প্রাকৃতিকভাবে

---

৪০. "ভাঙন" , পৃ ঃ ৩৫ ।

৪১. "ভাঙন", পৃ ঃ ৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী বংশে ভাঙন আসে, ঝড়ে বিধবস্ত হয় পূর্বপুরুষদের ভিটা, দুর্গামন্ডপ, নতুন প্রজন্মের তরুনেরা কেউই তার সংস্কারে অগ্রসর হয় না, জ্ঞানশঙ্করের পক্ষেও তা সারাই করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নানাভাবে বিপর্যস্ত জ্ঞানশঙ্কর সান্ত্বনা খোঁজে নিজের কাল ও বংশমর্যাদার স্মৃতি-চারনায়, ভারত বর্ষের ধর্মবোধের মহিমা নিজেকে নিজে ব্যাখ্যা করে শোনায়।

"ভাঙন"-এর শেষদিকে জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর স্বগত ভাবনা ছিলো এমন : 'আমাদের এ-জীবনে বেদনা আছে, দুর্বলতা আছে, মন্থরতা আছে, তবু আছে স্থির আশ্রয়, গৃহ আর গৃহ দেবতা, কন্যা মাতা জায়া, আর তাহাদের তিনি কল্যাণ গৃহশ্রী।'[৪২] "স্রোতের দীপে" পাওয়া যায় এই 'কল্যাণ গৃহশ্রী' বিধবস্ত হবার ইতিবৃত্ত। ওই শান্ত গৃহজীবনের শান্তি বিনষ্ট হয় অর্থ-নৈতিক কারণে, পুত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে, সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে। সমস্ত বিনষ্টি ভাঙন ও নৈরাজ্যের অসহায় দর্শক মাত্র জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী, যে কোনো বিনষ্টি তাকে প্রবল আঘাত করে, কিন্তু ভাঙন রোধ করার কোনো শক্তি তার নেই। প্রথমা কন্যা সরযুর বিয়ে হয় বাবুর হাটের বিখ্যাত বাবুদের পুত্রের সঙ্গে। জামাতা নৃপেন্দ্র অকর্মন্য, আয়েসী, স্বার্থপর, সংকীর্ণ ও দুশ্চরিত্র। খাজনা বাকির দায়ে বাবুর হাটের এজমালি সম্পত্তি বিকিয়ে গেলে নৃপেন্দ্র স্ত্রী পুত্রনিয়ে শ্বশুরের গৃহে আশ্রয় নেয়। জ্ঞানশঙ্কর ধরাধরি করে জমিদারদের জমিজিরিপের তত্ত্বাব-ধায়কের কাজটি তাকে জুটিয়ে দেয় এবং ওই শহরে বাস করার জন্য বাসাবাড়ি ভাড়া করে দেয়। নৃপেন্দ্র একটি খ্রিস্টান ধাত্রী মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে, পুরো শহরে তাকে নিয়ে চলে কানাঘুষা ও রসিকতা। ব্যথিত সরযু বিষ খায়। এই সংবাদ জ্ঞানচৌধুরীর কর্নগোচর হলে ধ্বসে পড়ে তার মানসিক দৃঢ়তা ও শান্তি। ওই দুর্বিপাকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মনে এমন আলোড়ণ জাগে :

> এত সাধের স্বপ্ন তাঁহার - তাঁহার সংসার, তাঁহার পরিবার, তাঁহার সমাজ, - কত আশাভর্ষই তাঁহার ঘটিতেছে এই সম্পর্কে প্রতিদিন। কিন্তু সমস্ত আশা ভঙ্গের মধ্যেও জ্ঞানশঙ্কর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এমন আঘাত পান নাই। কতবার নিরাশা মনে জাগিয়াছে - কি করিল অশোক, কি করিল অমর ? অরুণের আচরণে অপমান বোধও করিয়াছেন। কিন্তু তখনো জানিতেন - তাহার জীবনের অঙ্গিনায় কদর্যতা জমিতে পারিবে না, তাহার পরিবার পরিবেশে একটা সহজ নির্মলতাই

---

৪২. "ভাঙন", পৃ : ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চারিত হয়। সেই সুস্থ জীবন যাত্রা ও জীবনাদর্শের সুগভীর আস্থাই তাঁহাকে সমস্ত নিরাশায় সুস্থির রাখিয়াছে, আপন আস্থায় গর্বিত চিত্তে চলিবার প্রেরণা দিয়াছে - সংসারে তাঁহার অভাব ও ব্যর্থতা ফুটিলেও কোথাও এই চৌধুরী সংসারে কদর্যতা নাই, ক্লেদ নাই তাঁহার পরিবেশের এক কোণেও - এমনি একটা বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থির হইয়া জাগিতেছিল। আজ সেই আস্থা ; সেই গর্ব যেন চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল।'[৪৩]

কনিষ্ঠ পুত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নকলকরার অভিযোগে অপমানিত হয়। মধুখালির অন্য উকিলেরা জ্ঞানচৌধুরীর এমন অপমানের সংবাদে পুলকিত হয়ে ওঠে, জ্ঞানচৌধুরীকে সান্ত্বনা দেবার ছলে অপমান করে তারা। কনিষ্ঠপুত্র অরুন কলকাতার হোস্টেল থেকে প্রেমপত্র লেখে মধুখালির বিবাহিত তরুনী চিনুর কাছে। চিনুর পিতা অরুনের চরিত্র সম্পর্কে নালিশ জানায় জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর কাছে। পুত্রের নীতিহীনতায় জ্ঞানশঙ্কর 'লজ্জায়, গ্লানিতে, ধিক্কারে তিনি আপনার মধ্যে আপনি মিশাইয়া যাইতে চাহিতেছিলেন।' এ-ঘটনা তার বিশ্বাস ও মুল্যবোধকে প্রবলভাবে আঘাত করে। মধুখালির মফস্বল জীবনেও ওই সময় খুব তুচ্ছ কারণে ঘনিয়ে আসে হিন্দু মুসলমান বিরোধ। ওই বিরোধ মামলা পর্যন্ত গড়ায়। শেষ পর্যন্ত হিন্দুরা বিরূপ মনোভাব বজায় রাখতে চাইলেও জ্ঞানচৌধুরী আপোষের কথা বলে। মামলা মিটে যায় কিন্তু হিন্দুরা জ্ঞানচৌধুরীর নিরপেক্ষতা বিষয়ে সংশয় সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। তাদের ধারণা 'জামিন মুচলিকার হুকুম হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই জ্ঞানচৌধুরী হিন্দু স্বার্থকে বলি দিয়াছেন।'[৪৪] পিতা জ্ঞানচৌধুরীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকেরও। ওই অঞ্চলে জমিদার প্রজার সংঘর্ষের সময় পিতা পালন করে প্রজাপীড়ক জমিদারের উকিলের ভূমিকা আর পুত্র অশোক পালন করে উৎপীড়িত ভয়াতুর প্রজার মুখপাত্রের ভূমিকা। পুত্রের সঙ্গে এই দ্বন্দ্ব পিতাকে ব্যথিত করে, পুত্রের সঙ্গে সহজস্বচ্ছন্দ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে ঘরে বাইরে নানাভাবে আঘাত পেতে থাকে জ্ঞানশঙ্কর।

"উজান গঙ্গায়" (১৯৫০) জ্ঞান চৌধুরী পারিবারিক জীবনে আরো বেশি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। এখন্ডে কাহিনীর প্রেক্ষাপট মফস্বল শহর থেকে কলকাতা নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত।

---

৪৩. "স্রোতের দীপ", পৃ : ১৮৭।

৪৪. "স্রোতের দীপ", পৃ : ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

বিশের দশকের শেষভাগে কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলনের বিক্ষোভে উত্তপ্ত কলকাতা। অধিকার সচেতন নারী ও পুরুষ পথে নেমেছে। জ্ঞান চৌধুরী সমস্ত কিছুর বেদনার্ত দর্শক। নারীদের রাজনীতি মনস্কতা, পথে নেমে আসা তার কাছে শুভ লক্ষন বলে মনে হয় না, 'স্বামী সংসার ফেলিয়া ইহারা এইরূপ মাতিয়া উঠিল, ইহা কি খুব শুভ লক্ষন - সমাজের পক্ষে, কিংবা ইহাদেরই পরিবারের পক্ষে, কিংবা দশজন পরিচিত শুভানুধ্যায়ীর পক্ষে?'[৪৫] যে-কোনো নতুনই তার কাছে অশুভ বলে মনে হয়; যা কিছু তার অতীত প্রথা ও বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় না, তাই তাকে বিমূঢ়, ব্যথিত ও চিন্তিত করে, নিজের সঙ্গে নিজের অবিরাম বোঝা-পড়ায় ক্ষতবিক্ষত হয় জ্ঞানশঙ্কর, তবে সে গোঁড়া কূপমন্ডুক নয়। নিজের বিশ্বাস ও শুভ-বোধকে আরো বেশি আকড়ে ধরে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। অনুমতি দেয় ভ্রাতুষ্পুত্র অমরকে খ্রিস্টান অবাঙালী কন্যা বিবাহে, পুত্র অশোককে রাজনৈতিক জীবন গ্রহণে, প্রবল বেদনা বোধ করেও কনিষ্ঠা কন্যার অসবর্ণ বিবাহ মেনে নেয়। মধ্যম কন্যা কমলা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনে দেখা দেয় অন্য তরুনের প্রতি গোপন ভালোবাসা। সে ওই কথা পিতার কাছে স্বীকার করে। ওই স্বীকারোক্তি শুনে জ্ঞান চৌধুরীর নিজেকে 'বজ্রাহত বনস্পতি' বলে মনে হয়। কনিষ্ঠা কন্যা নমিতা পিতার পছন্দমতো পাত্রকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে, কারণ প্রথাগত কণে দেখা রীতি ও বিবাহ তার কাছে পণ্য ক্রয়ের মতো নোংরা ব্যাপার। পিতার আপত্তি সত্ত্বেও সে কলকাতার এক চ্যারিটি শোতে এক তরুনের সঙ্গে নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারটি মধুখালির মফস্বল সমাজে তুমুল আলোড়ন তোলে। জ্ঞানশঙ্কর এ-সংবাদ শুনে অপমানে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তার মনে হয় 'এই কথা তিনি কি করিয়া ভাবিবেন - তাহার কন্যা তাঁহার বধু দশজনের সম্মুখে গান গাহিবে নাচ দেখাইবে? টিকিট কাটিয়া লোক আসিবে, যাহার খুশী, মোক্তার আমজাদ আলী কিংবা পাটের দালাল গেন্দারী রায়। তাহারা বসিয়া বাহবা দিবে - আর তাহাদের সম্মুখে নাচিবে, তাঁহার কন্যা, তাঁহার পুত্রবধু। ....অ, আর্ট, আর্ট। - যেন সব আর্ট এক দরের।'[৪৬] নতুন কালের আগ্রাসন থেকে সে প্রাণপনে রক্ষা করতে চায় তার পারিবারিক জীবনকে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। চিত্রিসারের জমিদার বাড়ি যেমন উন্মত্ত পদ্মা গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, মধুখালির ভিটে বাড়ি যেমন মেঘনার করাল গ্রাসে পতিত

---

৪৫. "উজানগঙ্গা" পৃ: ১৪৮,

৪৬. "উজানগঙ্গা" পৃ: ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

হয়, তেমনি নতুন কালের নানা মতাদর্শ গ্রাস করে নেয় তার প্রিয় পুত্রকন্যাদের। তার বিশ্বাস মতাদর্শকে অগ্রাহ্য করে প্রত্যেকে চলতে থাকে নিজের মতাদর্শে। কন্যা নমিতা নিজের ইচ্ছে-মতো অসবর্ণ বিবাহও করে। কন্যার এই বিদ্রোহ ও উন্মাদনা জ্ঞানশঙ্করকে দেয় তীব্র আঘাত।

জ্ঞানশঙ্করের জীবনের ভাঙন বিপর্যয়ের পাশাপাশি উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতির ছবি। "উজানগঙ্গা" উপন্যাসটিতে ১৯২৭-৩০ কালের রাজনৈতিক জীবনের বিস্তৃত রূপও তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন সাম্যবাদী পত্রিকায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা শ্রমিক কৃষকদের জাগরণের জন্য প্রচারনা কার্য চালাতে থাকে। রাজরোষে পতিত পত্রিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়, পার্টিকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়, অশোকও বন্দী হয়। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশ-ব্যাপী শুরু হয় আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির পাশাপাশি কংগ্রেস পার্টিও সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। ১৯২৮ -এর ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেস অধিবেশন। ১৯৩০-এ ভারতবাসী গান্ধীর নেতৃত্বে মেতে ওঠে আইন অমান্য আন্দোলনে। ওই বিক্ষোভ উত্তাল সময়ের দর্শক জ্ঞানশঙ্কর, ওই সময়ের ওই সবকিছুর সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ, কংগ্রেস অধিবেশনে গিয়ে অধিবেশনের ভিড় হৈ-হুল্লোড়ে সে বিরক্ত হয়, সবকিছু তার কাছে অশোভন ও অমার্জিত মনে হতে থাকে। পুরোনো দিনের কংগ্রেস অধিবেশনের মার্জিত শান্ত পরিবেশের জন্য সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আইন অমান্য আন্দোলনে আলোড়িত কলকাতাকে তার কাছে অপরিচিত অস্থির নগরী বলে মনে হয়। ওই রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা ওই সময়ের নারীদের রাজনীতি সচেতনতা কোনোটিই সে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারে না। উপন্যাসটি সমাপ্ত হয় বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। গোপাল হালদার তাঁর এই ত্রি-উপন্যাসে একটি প্রথাগত সামন্ত চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের বঙলার পরিবর্তনশীল পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার রূপটি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বাহ্যবাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন অবিকল উপস্থাপন রীতিতে; তবে গোপাল হালদারের মধ্যে একজন সমাজ-ঐতিহাসিক ও মনস্তত্ত্ববিদের বসবাস রয়েছে: সমাজ ঐতিহাসিক বর্ণনা করে বাহ্যবাস্তবের পরিবর্তনশীলতা আর মনস্তত্ত্ববিদটি তুলে ধরে তার চরিত্রদের মানসিক চিন্তা-ভাবনা।

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক বাস্তবতা

আধুনিক মানুষের জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রক রাজনীতি, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন রাজনীতি দ্বারা বিচিত্র রূপে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপন্যাস সবচেয়ে উপযুক্ত রাজনীতির ব্যাপকতা উপস্থাপনার জন্য। কবিতায় রাজনীতি প্রবল আবেগ রূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপন্যাসে তা শুধু আবেগ থাকে না। রাজনীতি ব্যাপক জীবনের রূপ ধরে দেখা দেয় উপন্যাসে। ১৯২০-৫০ কালের মধ্যে রচিত বাঙলা উপন্যাসে রাজনীতি গৃহীত হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে বাঙলা-দেশ নানারকম রাজনৈতিক আন্দোলনে আলোড়িত হয়ে ওঠে। রাজনীতি শুধু ওপরতলার কিছু বিশিষ্ট মানুষের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, ওই আন্দোলন সাধারণ মানুষকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, গুপ্ত সশস্ত্র আন্দোলন, এমন কী পাকিস্তান আন্দোলন বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানদের নানা ভাবে উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করে। দেশ তখন ছিলো ইংরেজের অধীন, তাই এই সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা, যদিও স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে ছিলো মতভিন্নতা। আধুনিক বাঙলা ঔপন্যাসিকদের কৈশোর ও যৌবন কাটে বঙ্গভঙ্গও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল দেশানুরাগের উদ্দীপনার মধ্যে। এরপর তাঁরা আলোড়িত হন সশস্ত্র আন্দোলন ও মার্কসীয় সাম্যবাদী আন্দোলন দ্বারা। এ-সময়ের উপন্যাসে ওই সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন ও মতবাদ গৃহীত হয়েছে এবং লেখকেরা যে মতবাদে দীক্ষিত সেই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই রাজনীতিকে উপন্যাসের বিষয় করেছেন। এ-সময়ের রাজনৈতিক উপন্যাসের দুটি ধারা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা সম্ভব। একটি গান্ধীবাদী রাজনীতির ধারা ও অন্যটি সাম্যবাদী রাজনীতির ধারা। এ-সময়ের ঔপন্যাসিকদের অধিকাংশই গান্ধীবাদী, তাই এ-সময়ের রাজনৈতিক উপন্যাস প্রধানত গান্ধীবাদী উপন্যাস। তবে দু'একজন সাম্যবাদী রাজনীতিকেও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন উপন্যাসে।

এ-সময়ের রাজনৈতিক উপন্যাসিকেরা যেহেতু অধিকাংশই গান্ধীবাদী, তাই এ-উপন্যাসে শ্রেণীচেতনা, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, সমাজ বিপ্লব, বা সমাজের আমূল পরিবর্তনের বিষয়টি বড়ো হয়ে ওঠে নি, বড়ো হয়ে উঠেছে সমাজ সংস্কার। এমন কী স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের সঙ্গে সরাসরি লড়াই -এর ব্যাপারটিও প্রধান হয়ে ওঠে নি। গান্ধীবাদী রাজনৈতিক উপন্যাস সমূহ প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদ দ্বারা আবৃত, এগুলো সামন্ত মানসিকতার প্রস্তাবক। এ-সব উপন্যাসে বুর্জোয়াদের বিকাশও গুরুত্ব লাভ করে নি। কিছু গান্ধীবাদী উপন্যাসের লক্ষ্য সাম্যবাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং সমস্ত গান্ধীবাদী রাজনৈতিক উপন্যাসই মূলতঃ গান্ধীবাদের মাহাত্ম্যপ্রচারের উপাখ্যান। গান্ধীবাদী উপন্যাসের পটভূমি গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ-সব উপন্যাসে গান্ধীবাদী মতাদর্শ প্রচার অর্থাৎ চরকা কাটা, গ্রামোন্নয়ন, অন্ত্যজদের প্রথাগত নৈতিক উন্নতি, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করে কোনো না কোনো আদর্শবাদী তরুণ। এ-প্রক্রিয়ায় তারা অন্ত্যজ ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের জাগ্রত করার সাধনা করে। তারা প্রাচীন ভারতীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং তারা গান্ধীকে উন্নীত করে প্রাচীন ভারতীয় ঋষির স্তরে। এই গান্ধীবাদ প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদেরই এক বর্তমান রূপ যা সমাজের কিছুটা সংস্কার সাধন করে তাকে সহনযোগ্য করে তুলতে চায়। সমাজ কাঠামো ও জীবনের আমূল রূপান্তর সম্পন্ন করে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন এদের লক্ষ্য নয়। বরং তারা ওই ধরনের পরিবর্তনের বিরোধী। এ-রাজনীতি সমাজকে কিছুটা সংস্কার করে আগের মতোই রেখে দিতে ইচ্ছুক।

এ সময় সাম্যবাদী রাজনীতি ধারার উপন্যাস লিখেছেন মাত্র দুজন - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার। তাঁরা মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী, তাই তাঁদের উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে শ্রেণী দ্বন্দ্ব। তাঁরা সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন চেয়েছেন। সাম্যবাদী উপন্যাসের পটভূমি সাধারণত নগর। এ-উপন্যাসে শিক্ষিত, বস্তুবাদী, যুক্তিপরায়ণ মধ্যবিত্ত তরুণ তরুণীরা সাম্যবাদী চেতনা প্রচার করে বস্তিবাসী শ্রমিক ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সাম্যবাদী উপন্যাসে কোনো ব্যক্তির মহিমা প্রচার করা হয় না, ভাবাবেগ সৃষ্টি করা হয় না, শ্রমজীবী শ্রেণীটিকে তাদের শোষিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। বাঙলা সাম্যবাদী উপন্যাসগুলোকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাস বলা যায় না; কারণ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের সূত্র হচ্ছে যে এ-শ্রেণীর উপন্যাসে শ্রমজীবীদের বর্তমান দুর্গতি দেখাতে হবে এবং শ্রেণী দ্বন্দ্ব, শ্রেণী সংগ্রাম ও সংগ্রামের জয় দেখাতে হবে। শ্রমজীবীদের বর্তমান দুর্দশা

ও সংগ্রামের পরিচয় চিত্রন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের জন্য যথেষ্ট নয় ; শ্রম-জীবীদের বিপ্লবের জয় ও শোষণমুক্ত সুন্দর শ্রেণীহীন সমাজের ছবি চিত্রনও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের অবশ্য কর্তব্য । বাঙলা সাম্যবাদী উপন্যাস গুলোতে এ-সূত্র পালিত হয় নি, এ-সব উপন্যাসের উপস্থাপিত হয়েছে শ্রমজীবীদের দুর্দশা ও তাদের মধ্যে সাম্যবাদী চেতনা প্রচারের বিষয়টি । এ-উপন্যাসে সাম্যবাদী তরুন তরুনীরা শ্রমজীবীদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগানোর জন্য শ্রমজীবীদের নিয়ে সভাসমিতি করে, বস্তিতে গিয়ে শ্রমজীবীদের সমস্যা শোনে ও তা সমাধানের চেস্টা করে । কখনো মিল মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের সমঝোতা সাধন করে, কখনো বিপন্ন কৃষকদের পাশে গিয়ে তাদের দাবি আদায়ে সাহায্য করে । গান্ধীবাদীদের লক্ষ্য তথা-কথিত নৈতিক উন্নতি আর সাম্যবাদীদের লক্ষ্য আর্থিক উন্নতি । সাম্যবাদী উপন্যাসে সাম্যবাদীদের দৃস্টি ভবিষ্যতের দিকে, যদিও ভবিষ্যৎ সমাজের কোনো সুস্পস্ট রূপরেখা তারা নির্দিস্ট করতে পারে না ।

১৯২০-৫০ কালের মধ্যে আধুনিক উপন্যাসিকদের রচিত রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের "মিছিল" (১৯২৮) । এটি রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাস কারণ এ-উপন্যাসে গান্ধীবাদী তরুন রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনের একটি পর্যায় উপস্থাপিত হয়েছে । তারা যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত ছিলো, চরকাব্রত গ্রহণ করে দেশের মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলো, তাদের জীবনের সে পর্যায় এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় নি । উপস্থাপিত হয়েছে তার পরবর্তী পর্যায় যখন তারা সম্পূর্ণ নিঃশোষিত হয়েগেছে । অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ কয়েকটি তরুন ব্রিটিশ সরকারের আইন অমান্য করে কারাবরণ করে । তখন তারা ছিলো দেশের গৌরব । কিন্তু এ-উপন্যাসে তাদের ওই গৌরব মন্ডিত জীবনের বিবরণ নেই । এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে কারামুক্তির পর ওই স্বদেশী রাজনৈতিক কর্মদের দুর্গত, উদ্দেশ্যহীন এমন কী নৈতিকতাবর্জিত জীবন । কারাগার থেকে বেরিয়ে নিজেদের জীবন নিয়ে তারা বিব্রত হয়ে পড়ে । তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার আচ্ছন্ন, এমন কী তারা প্রাত্যহিক আহার্যের সংস্থান করতেও সমর্থ নয় । তারা কয়েকজন মিলে কলকাতায় একটি মেসে ওঠে, নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন নিবৃত্তির অর্থ জোগাড়ের জন্য আশ্রয় নেয় নানা ছল চাতুরি, শঠতা ও ফন্দিফিকিরের । কেউ কেউ পত্রিকা অফিসে প্রুফ রিডারের কাজ পায় । এক সময়ের আত্মত্যাগী অকুতোভয় গানধীবাদী রাজনৈতিক কর্মীরা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় পরিণত অতিতুচ্ছ শোচনীয় মানুষে । প্রেমেন্দ্র মিত্র রাজনীতিকে রেখেছেন পটভূমি রূপে ; তিনি

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকন্ডের উপস্থাপনার বদলে উপস্থাপন করেছেন রাজনৈতিক কর্মীদের শোচনীয় জীবন। তিনি উপন্যাসে গান্ধীবাদ প্রচার করেন নি, তার সমালোচনাও করেন নি, তবে রাজনৈতিক কর্মীদের দুর্গত গ্লানিকর বাস্তব জীবন উপস্থাপন করে অপরিকল্পিত ধ্রুব লক্ষ্যহীন রাজনীতির পরিনাম চিত্রিত করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু উপন্যাসেই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু তার সমস্ত উপন্যাসকেই আমরা রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাস হিশেবে গণ্য করিনি। যেমন, "ধাত্রী দেবতা" (১৩৪৬) "কালিন্দী" (১৯৪০), " গণ দেবতা " (১৯৪২), "পঞ্চগ্রাম" (১৯৪৪),"সন্দীপন পাঠশালা" (১৩৫২) প্রভৃতি উপন্যাসে কিছু রাজনৈতিক চরিত্র রয়েছে, কিন্তু ওই উপন্যাস সমূহে রাজনীতি প্রধান নয়, পল্লী জীবনের বাস্তবতাই প্রধান। তাই ওই উপন্যাসগুলোকে আমরা পল্লীসমাজ ও জীবনের বাস্তবতা শ্রেণীভুক্ত করেছি (দ্রুষ্টব্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। তারাশঙ্করের রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রধান উপন্যাস "চৈতালী ঘূর্ণি" (১৩৩৮), "মন্বন্তর" (১৩৫০), "ঝড় ও ঝরাপাতা" (১৩৫৩)। তারাশঙ্কর গান্ধীবাদী, তিনি নিজে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে ভারতীয় ভাববাদ ও সামনুবাদের প্রবল প্রভাব রয়েছে।

তারাশঙ্কর গান্ধীবাদী কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস "চৈতালী ঘূর্ণি" তে (১৩৩৮) তিনি গান্ধীবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের সমন্বয়ের চেস্টা করেছেন। এ-উপন্যাসে শ্রমজীবী শ্রেণীর শোষিত বঞ্চিত জীবন ও তাদের ব্যর্থ বিদ্রোহের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে ভবিষ্যৎ বিজয়ের আশা ব্যক্ত করে। তারাশঙ্কর অবিকল উপস্থাপনবাদী। এ-উপন্যাসেও তিনি বাস্তব জীবনের অবিকল রূপটি উপস্থাপিত করেছেন। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন যে বিত্তহীন কৃষক যেমন গ্রামে নানাভাবে শোষিত হয়, বিত্তহীন শ্রমিকও তেমনি শহরে নানাভাবে শোষিত হয়। গোস্ঠ এ-উপন্যাসের নায়ক। জমিদার - গ্রামমহাজন - কাবুলিওয়ালা মহাজনের চক্রবৃদ্ধি সুদের ঋণে, খরা ও ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে ক্রমে সে পরিণত হয় ভূমিহীন বিত্তহীন কৃষকে। নিকটবর্তী শহরের কারখানায় শ্রমিকের কাজ নেয় গোস্ঠ, স্ত্রীকে নিয়ে বস্তিতে সংসার পাতে। ওই জীবন চরম অনটন ও ইতরতায় পরিপূর্ণ। শ্বাসরুদ্ধকর কালি ও ধোঁয়ায় ভ্যাপসা অস্বাস্থ্যকর প্রতিবেশে মানুষ কোনোমতে স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঝুপড়ি গুলোতে মাথা গুঁজে থাকে। শ্রমিকের মজুরি হরণ করে নেবার জন্য উদ্যত হয়ে থাকে তাড়িখানা, পতিতা নারী ইত্যাদি। কোনোমতেই বেঁচে থাকাই ওই জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

বড়ো কথা, তাই অবাধে যে কোনো নারী যে কোনো পুরুষের রক্ষিতা হয় । মদ্যপান করে পুরুষগুলো প্রতি সন্ধ্যায় উন্মত্ত হয়ে হল্লা করে । সাধারণ সহজ চক্ষুলজ্জা সংকোচ ওই বস্তিবাসী নারী পুরুষ কারোরই নেই । স্বামীর সামনেই পরস্ত্রীকে সম্ভোগের বাসনা উচ্চকন্ঠে বলে চলে লোলুপ মদ্যপ আরেক পুরুষ, অর্থাৎ ওই জীবনে মানুষগুলো পরিণত হয় রসাতলের পশুতে । ক্ষুধা , ক্ষুধানিবৃত্তি, জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও পরিশ্রমের পয়সায় মদ্যপান করে মাতাল হওয়াই তাদের জীবন । ওই জীবনকে তারাশঙ্কর দেখেছেন শ্রদ্ধার চোখে । ওই জীবন প্রেতের জীবন , কিন্তু তা বিদ্রোহ সংগ্রামপূর্ণ জীবন । গোস্ঠর কারখানার শ্রমিকেরা মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে । কিন্তু ধর্মঘট ব্যর্থ হয় । ধর্মঘটী বেকার শ্রমিকদের এক দল মালিক পক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করলে অন্য দল ক্ষিপ্ত হয় । নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে মৃত্যুবরণ করে অনেকে, গোস্ঠও মারা যায় ।

এ-উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণীকে সচেতন ও রাজনীতিমনস্ক করে তোলার কাজে নিবেদিত দুজন গান্ধীবাদী কংগ্রেসকর্মী । সভ্যতার চাকা সচল রাখে যে শ্রমিকেরা তারাই সর্বশক্তিমান - এই বিশ্বাস তারা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জাগ্রত করার জন্য কাজ করে যায় । শ্রমিকেরা একথা ..শ্বাস করে , এ ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করে, এমন কী ওকথা তারা শুনতেও ভয় পায় । গান্ধীবাদী বাবুদের নিয়ে যেমন তাদের প্রচুর সংশয় অবিশ্বাস আছে তেমনি নিজেদের মধ্যেও আছে অনৈক্য, অবিশ্বাস সন্দেহ । তারা বারবার নিজেদের সংঘ ভাঙে এবং গড়ে । আত্ম সচেতন হয়ে তারা আন্দোলন শুরু করেনি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে রক্ষা পাবার জৈবিক তাড়না তাদের ধর্মঘটে উদ্বুদ্ধ করে । সে কারণেই ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে শেষে নিজেরা মারা-মারি করে হতাহত হয় । শ্রমিক ধর্মঘট ব্যর্থ হয়, কিন্তু তাতে হতাশ ও বিমর্ষ নন তারা-শঙ্কর । তিনি বরং উপন্যাসে জ্ঞাপন করেন আশাবাদ । গোস্ঠদের ধর্মঘট ব্যর্থ হতে পারে কারণ তা জাগ্রত সংঘবদ্ধ সচেতন শ্রমিকের আন্দোলন নয় । গোস্ঠদের ধর্মঘট তাই তাঁর কাছে 'চৈতালী ঘূর্ণি' রূপে প্রতীয়মান হয়েছে । তারপরই আসবে বজ্রগর্ভ ও শক্তিমান কালবৈশাখী, যা উড়িয়ে নেবে সকল শোষণ, অবিচার - উপন্যাসের শেষে তারাশঙ্কর এ-আশাবাদই ব্যক্ত করেন ।

তারাশঙ্করের "মন্বন্তর" (১৩৫০) উপন্যাসে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩-এর মার্চ পর্যন্ত সময়ের আকালের পটভূমিকায় কলকাতা নগরীর জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে । ওই জীবন

নানা সঙ্কটে বিপর্যস্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর্থনীতিক প্রভাবে কলকাতা নগরীর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আরো লাভবান হবার লোভে সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ও ধানচাল গুদামজাত করে রাখে এবং চড়া দামে বিক্রি করা শুরু করে, ফলে দেশ জুড়ে দেখা দেয় মহা দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধার্ত শীর্ণ পল্লীবাসীরা খাদ্যের সন্ধানে কলকাতায় ছুটে আসতে থাকে। কলকাতা ভরে যায় ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষে, তারা অনাহারে অপঘাতে ফুটপাতে রাস্তায় মৃত্যু বরণ করতে থাকে। কলকাতা নগরীতে খাদ্য নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, প্রবল ভিড়ের কারণে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ন্যায্যমূল্যে খাদ্যদ্রব্য কিনতে ব্যর্থ হয়, ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কলকাতাবাসী ভোগ করতে থাকে নিদারুন দুর্দশা। যুদ্ধকালীন ব্যয় সঙ্কোচ নীতি অবলম্বন করে কলকাতার বহু অফিস, নির্বিচারে কর্মচারীদের ছাটাই করে তারা। বেকারের সংখ্যা বাড়ে দ্রুত হারে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি ও যুদ্ধের কারণে চাকুরিচ্যুত হওয়া ইত্যাদি কারণে ওই নগরীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ ক্রমশ হয়ে ওঠে নিম্নবিত্ত থেকে বিত্তহীন শ্রেণী। সেই সঙ্গে জাপানী বোমারু বিমান কলকাতার এখানে ওখানে বোমা ফেলতে থাকে, সন্ত্রস্ত কলকাতাবাসীদের মধ্যে কলকাতা ত্যাগ করার হিড়িক দেখা দেয়। সব মিলিয়ে ওই সময়ের নগর জীবন হয়ে ওঠে শ্বাসরুদ্ধকর, বিভীষিকাপূর্ণ ও চরম অনিশ্চয়তাপূর্ণ। বাজার থেকে খুচরো পয়সা উধাও হয়ে যায়। ফলে ট্রামের টিকিট কাটা কিংবা খুচরো সওদা কেনা সাধারণ মানুষের পক্ষে ...ঠন হয়ে পড়ে। কোনোমতে বেঁচে থাকাই নগরবাসীদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ক্ষুধা অনাহারে জর্জরিত নিম্নবিত্ত নিরুপায় পিতামাতা কন্যাকে পতিতাবৃত্তিতে ঠেলে দেয়। মনে গ্লানি এলেও কন্যার রোজগারে দুটো খেয়ে পরে বেঁচে থাকার আগ্রহের কাছে গ্লানি তুচ্ছ হয়ে যায়। দালালের সঙ্গে পাঠাবার সময় কন্যাকে মিনতি করে জননী, 'বামুন দিদি যা বলবে, তাই শুনিস মা। তোর দৌলতে যদি দুটো খেতে পরতে পাই, নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।'[১] অর্থাৎ সংস্কার পাপপুণ্য বোধও খসে যায় মন থেকে ক্ষুধার তাড়নায়। সধবা-পুরস্ত্রী ক্ষুধার তাড়নায় একসময় ট্রামের জানালায় ভিক্ষার জন্য হাত পাতে, কন্যার ধর্ষণকারীর কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেয় জননী।

---

১. "মন্বন্তর" (তারাশঙ্কর রচনাবলী পঞ্চম খন্ড) পৃ: ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

শ্বাসরুদ্ধকর ও বিভীষিকাপূর্ণ ওই নগর জীবনে রাজনীতিক কর্মীরা আন্তরিকভাবে দুর্যোগ ত্রান তৎপরতা চালাতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা জাপানী বোমায় আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করে, রক্তদেয়, অর্থ সাহায্য করে, তারাশঙ্কর এ- উপন্যাসে যে কমিউনিস্ট কর্মীদের কথা বলেছেন তারা পরস্পরকে কমরেড বলে সম্বোধন করে ঠিকই তবে তারা চরিত্রে ঠিক কমিউনিস্ট নয়। এ-উপন্যাসের কমিউনিস্ট নেতা গান্ধীর অহিংসা নীতির প্রশংসায় উদ্বেলিত, প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদী আত্মত্যাগ নীতি, ক্ষমাশীলতা, অহিংসা, সত্য ধর্ম, আত্মবিসর্জন নীতি ইত্যাদিতে গভীর বিশ্বাসী। অহিংসাবাদের মধ্য দিয়েই জনগণের কর্মশক্তি সঞ্চারিত হবে বলে মনে করে ওই নেতা। ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারীতে গান্ধী একবিংশতি দিবস ব্যাপী অনশন ব্রত পালন শুরু করেন। গান্ধীর এ-অনশনব্রত কলকাতাবাসীর মনে কেমন আলোড়ন তোলে - এ-উপন্যাসে তাও নির্দেশ করেছেন তারাশঙ্কর। গান্ধীর আদর্শের প্রতি লেখকের গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে। গান্ধীকে এ-উপন্যাসে তিনি তুলনা করেছেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষি বশিষ্টের সঙ্গে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে মানুষের মহাসমাজের মহামন্বন্তরে গান্ধীর অনশনব্রতের পুণ্যফলই এক-মাত্র ভরসা বলে মনে করেন তারাশঙ্কর।

আকালগ্রস্ত কলকাতা জীবনের নারকীয় রূপ তারাশঙ্কর বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু তিনি যে রাজনীতি উপস্থাপন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে গভীর স্ববিরোধিতা। তিনি সাম্যবাদী চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন কিন্তু নিজের প্রকৃতিবশত তিনি সাম্যবাদীদের দীক্ষিত করেছেন গান্ধীবাদে, সাম্যবাদীরা মুখর হয়ে উঠেছে গান্ধীবাদের স্তবগানে। তারাশঙ্কর "মন্বন্তরে" যে বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপন করেছেন তা আকালের বিভীষিকাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছে, কিন্তু তিনি যে রাজনীতিক বাণী প্রচার করেছেন তা রাজনীতিকভাবে বিভ্রান্ত।

তারাশঙ্করের "ঝড় ও ঝরাপাতা" (১৯৪৬) ১৯৪৬ সালের ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারীর কলকাতা নগরীর গণ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। ১৯৪৬ সালের ১১ই ফেব্রু-য়ারীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নেতা ক্যাপ্টেন রসিদ আলী খাঁ-র সাত বৎসরের কারা-দন্ডাদেশ ঘোষিত হয়। এবং এর প্রতিবাদে ওই দিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্ররা মিছিল শোভাযাত্রা বের করে এবং পুলিশের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ক্রমশ এই বিক্ষোভ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে কলকাতা নগর রূপান্তরিত হয়ে যায়, কলকাতা হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ওঠে অগ্নিগিরির মতো বিস্ফোরণোন্মুখ । তারাশঙ্কর জনতার এই বিক্ষোভের পাঁচ দিনের কাহিনী উপস্থাপন করেছেন ''ঝড় ও ঝরাপাতা'' উপন্যাসে । তিনি ছাত্র ও জনতার বিক্ষোভের প্রচণ্ড রূপ উপস্থাপন করেছেন, পুলিশের নৃশংসতার বর্ণনা দিয়েছেন, শহরব্যাপী হরতালের বিবরণ দিয়েছেন এবং কলকাতা নগরীর আকস্মিক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত রূপটি চিত্রিত করেছেন । তবে তারাশঙ্কর শুধুমাত্র এই বিক্ষোভের রূপ উপস্থাপনেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, তিনি একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের দুর্গতির রূপ এবং ওই পরিবারটির মধ্যে কীভাবে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে তাও চিত্রিত করেছেন । এ-উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র গোপেন । সে ঠিকমতো সংসার চালাতে পারে না, পুত্রকন্যাদের খাদ্য, বস্ত্র দিতে পারে না, তার জীবন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ও নানা দুর্গতিতে পরিপূর্ণ , সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ছিলো 'নিম্নবিত্ত' , বর্তমানে 'বিত্তনিঃশেষিত' । সে আত্মপরায়ণ, নিষ্ঠুর, প্রায় অমানুষ,কিন্তু কলকাতার জনতার বিক্ষোভ তার মধ্যেও সংক্রমিত হয় এবং সে একজন প্রতিবাদী মানুষে পরিণত হয়ে জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে । তারাশঙ্কর "ঝড় ও ঝরাপাতা"য় যে বিক্ষুব্ধ জনতাকে উপস্থাপিত করেছেন তারা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত নয় । তাদের তুলনা করা যেতে পারে আকস্মিক দাবানল, ঝড় বা প্লাবনের সঙ্গে । কোনো রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা তারা উদ্বুদ্ধ হয় নি, তাদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে নিজেদের অনুর্গত ক্ষোভ । সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ সফল হতে পারে না, সফল হয়ও নি । কিন্তু তারাশঙ্কর এমন বাণী জ্ঞাপন করেছেন যে শাসকদের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে একদিন অকস্মাৎ ঝড় জাগে এবং এভাবেই সাধারণ মানুষের শৃঙ্খল মুক্তি ঘটে, নতুন সমাজ কাঠামো সৃষ্ট হয় । উপন্যাসটি পাঁচ দিনের কলকাতার রাজনৈতিক বাস্তবতার দলিল ।

গোপাল হালদার সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বাস্তবতার মননশীল উপস্থাপক, তাঁর উপন্যাসে শ্রেণীদ্বন্দ্বের সুপরিকল্পিত রূপ উপস্থাপনের বদলে উপস্থাপিত হয়েছে বাঙলাদেশে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি বিকাশের রূপটি । তাঁকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ঔপন্যাসিক না বলে সাম্যবাদী পার্টির ঔপন্যাসিক বলাই অধিকতর সংগত । তার কারণ তাঁর উপন্যাসে সাম্যবাদী পার্টির উদ্ভব বিকাশ ও পার্টি কর্মীদের ক্রিয়া কলাপ, তাদের বিশ্বাস ও সন্দেহ চিত্রিত হয়েছে । গোপাল হালদার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দীক্ষিত সাম্যবাদী ঔপন্যাসিক নন । সাম্যবাদী সূত্র বিনাপ্রশ্নে তিনি প্রয়োগ করেন নি বরং মননশীল দৃষ্টিতে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সাম্যবাদের বিকাশের রূপ ও তার সমস্যা উদঘাটন করেছেন । এ জন্য তাঁর উপন্যাসে বাহ্যবাস্তব উপস্থাপিত হয়েছে খন্ড খন্ড রূপে । তবে তাঁর উপন্যাসেই সম্ভবত সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বাস্তবতার রূপটি নিভের্জাল উপস্থাপিত হয়েছে ।

গোপাল হালদারের "একদা" (১৩৩৯) "অন্যদিন" (১৯৫০) উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে । এ-দুটি উপন্যাসের মূল বিষয়ই হচ্ছে রাজনীতি, বিশেষ করে বামপন্থী রাজনীতি । তাই ওই রাজনৈতিক বাস্তবতা উপস্থাপনার জন্য স্বাভাবিক কৌশল হওয়ার কথা ছিলো অবিকল উপস্থাপনা রীতি । কিন্তু গোপাল হালদার এ-উপন্যাসে চেতনা প্রবাহী স্মৃতিচারনের কৌশল অবলম্বন করেছেন ; নায়কের জীবনের বিশেষ একটি দিনে তার স্মৃতিচারনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন তার বিগত জীবনের একদশক বা একদশকের মতো সময়ের ঘটনা । তাই এ-উপন্যাসদুটিতে বাস্তব জগত ধারাবাহিক ও অবিকলভাবে উপস্থাপিত হয় নি, উপস্থাপিত হয়েছে টুকরো টুকরো ভাবে । নায়ক অমিত স্মৃতিচারনায় সময় এক ঘটনা থেকে আরেক ঘটনায় চলে গেছে, এক দৃশ্য থেকে চলে গেছে দৃশ্যান্তরে এবং তার স্মৃতিচারন উপস্থাপন করে অখন্ড বাস্তবতার বদলে বাস্তবতার অসংখ্য খন্ডের সমষ্টি ।

"একদা"য় উপস্থাপিত হয়েছে বিশের দশকের সন্ত্রাসবাদী ও সাম্যবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের ক্রিয়াকর্ম, তাদের অস্থিরতা, সংশয় ও বিশ্বাস অবিশ্বাসের রূপ । এ-উপন্যাসে প্রধান হচ্ছে সাম্যবাদী রাজনৈতিক কর্মীরা । গোপাল হালদার এ-উপন্যাসে শুধুমাত্র সমাজবিপ্লবের ইশতেহার রচনা করেন নি , তিনি ওই কর্মীদের চরিত্র, নিষ্ঠা, দ্বন্দ্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং বামপন্থী আন্দোলনের আভ্যন্তর সমস্যাগুলোও নির্দেশ করেছেন । এ-উপন্যাসে কমিউনিস্ট পার্টি কর্মীরা সর্বহারার স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে চলে - তারা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে, সাম্যবাদী বই ও প্যামফ্লিট পড়ে , ওকইয়ার্ডে শ্রমিকদের মধ্যে প্যামফ্লিট বিতরন করে । এখানে এসে পড়ে 'ডগমা'র ব্যাপারটি । তারা কেউ কেউ ডগমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করে যান্ত্রিকভাবে কাজ করে, আবার অনেকে বিনা প্রশ্নে ওই মতবাদ মেনেনিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় । পার্টির ধীরগতি ইশতেহার নির্ভর বিপ্লবের পথ তাদের মনে সংশয় জাগিয়ে তোলে । তারা কোনো পথ দেখতে পায় না, 'দিনের পর দিন' তাদের মনে হয় 'একটা উৎসাহহীন উদ্যমহীন সুদূর স্বপ্নের জন্য' কাজ করে চলছে তারা ।[২]

---

২. "একদা" (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১), পৃ : ৮১ ।

বামপন্থী আন্দোলন কোনো দুর্বার বেগে বয়ে চলা নদী নয় , তারও পথে পথে রয়েছে নানা বাধা । যেমন, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রয়েছে বহু মজুর সমিতি , কিন্তু ওই সমিতিগুলিই আবার পারস্পরিক কোন্দলে মেতে উঠে আন্দোলনকে ব্যাহত করে । সমিতিগুলো তাদের মুখপত্র পত্রিকাগুলোতে পরস্পরকে গালাগালি দেয় , ' প্রত্যেকে প্রত্যেককে বলিতেছে 'এক্সপ্লয়েটার' , 'দালাল' , প্রত্যেকে নিজেকে জাহির করে মজুরের একমাত্র স্বার্থরক্ষক বলিয়া ।'[৩] কোনো কাগজ দফায় দফায় অন্য সমিতির নেতাদের ঘুষ খাবার তথ্য ফাঁস করে চলে । অন্য সমিতিগুলো তাদের পত্রিকায় পাল্টা মারমুখী আক্রমন চালায় । এসবের মধ্যেই শেষ হয় সমিতিগুলোর সকল উদ্যম । সম্মিলিত সংগ্রামী কোনো মজদুর দল গড়ার পরিকল্পনা, লক্ষ্য বা উদ্যম তাদের মধ্যে নেই । এই হচ্ছে সাম্যবাদী দলের সমস্যা । এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের রাজনীতি । তাদের রাজনীতি সাম্যবাদী রাজনীতি থেকে ভিন্ন । তারা বিশ্বাস করে হত্যার রাজনীতিতে । এ-উপন্যাসে দেখানো হয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা বিচার বিবেচনাহীন, আত্মদানে অধীর । তারা সর্বহারার বিপ্লবে বিশ্বাস করে না , তারা সর্বহারার বিপ্লবের প্রস্তুতিতে উপহাস করে । তবে তারা বেছে নিয়েছে অনিশ্চিত জীবন । 'নিশ্চিন্ত দিনরাত্রি , তৈয়ারি আহার, অভ্যস্থ জীবন যাত্রা - সবই চুকাইয়া' তারা 'পথে পথে ঘুরিতেছে, কলের জলে পেট ভরিতেছে , ফুটপাতে ঘুমাইতেছে ।'[৪] তাদের পেছনে গোয়েন্দা পুলিশের চর সর্বক্ষন ঘুরে বেড়াচ্ছে , আত্মীয়েরাও তাদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য তৎপর, পুলিশের হাতে ধরা না পড়ার জন্য তাদের সর্বক্ষন সতর্ক ও উৎকন্ঠ থাকতে হয় । এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট পার্টিকর্মী সকলেই বিশ্বাস করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 'দুই একটা জেনারেশন বলি দিতে হইবে । '

"একদা"য় পার্টিকর্মীরা সবাই মধ্যবিত্ত পারিবারের শিক্ষিত তরুন । তারা অনেকটা শ্রেণীচ্যুতির ঝুঁকি নিয়ে পার্টির কাজ করে । উপন্যাসে তাদের পারিবারিক জীবন এবং পরিবারের মধ্যে তাদের অবস্থান সঙ্কটের চিত্রও রচিত হয়েছে । পার্টির কাজে তারা ব্যস্ত কিন্তু বেকার জীবন কাটায় , যা তাদের পরিজনদের ক্ষুব্ধ করে । মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো চায় তাদের

---

৩. "একদা" (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১) , পৃঃ ৭৫ ।

৪. "একদা" (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১) , পৃ ঃ ৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

পুত্রদের প্রথাগত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। পার্টির কাজে ব্যস্ত তরুণেরা পরিবারের কাছে প্রতিভাত হয় ভবঘুরে ও নিষ্কর্মা রূপে, তাই ওই তরুণেরা যাপন করে বিব্রত পারিবারিক জীবন। এ-উপন্যাসের নায়ক অমিত। অমিত অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল। সাম্যবাদী মতবাদের অনুরাগী সে তবে তার মধ্যে গোঁড়ামি ও উগ্রতা নেই; আবার সক্রিয় কর্মী হয়ে গণ আন্দোলনে সে যোগও দিতে পারে না। সে দ্বিধান্বিত। সে নিজেই স্বীকার করে 'মোতাহেরের মতো সে ভগমার কাছে নিজেকে সঁপিয়া দিতে পারে না, দাশের মত আধা সৌখিন আধা ইনটেলেকচুয়াল ইডিয়লজি ও টেকনিক লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না; মজুর কর্মীর উপযোগী স্থিরতা ও ধৈর্যও তাহার নাই। তাহার মনের গড়ন স্বতন্ত্র ....'। সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দর্শক যেন সে। অরুণকুমার সিকদার অমিত প্রসঙ্গে বলেন, 'একদায় বাস্তবতাগুণ তুলনায় অনেক কম, আর নায়ক মধ্যবিত্ত যুবক অমিত যেন অনেকটা নির্লিপ্ত, বাস্তব জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন থেকে খানিকটা দূরে যেন তার অবস্থান।'[৫] অরুণকুমারের এমন মনে হওয়ার কারণ বাস্তবতা এখানে ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপিত হয় নি, উপস্থাপিত হয়েছে স্মৃতিচারনার মধ্যদিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে।

"অন্যদিন" (১৯৫০) হচ্ছে একদা"র দ্বিতীয় খণ্ড এবং এই উপন্যাসে অমিতের প্রায় এক দশকের জীবন স্মৃতিচারনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। "একদা" সমাপ্ত হয়েছিলো অমিতের বাড়ির দরোজায় পুলিশের বুটের শব্দে অর্থাৎ অমিতের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে আর "অন্যদিন" শুরু হয় অমিতের কারামুক্তির মধ্য দিয়ে। কারামুক্তির দিনটিতে যে স্মৃতি তার মনে ভিড় করে এবং সে যতোটুকু বাস্তব কাজ করে তাই হচ্ছে "অন্যদিন"। "অন্যদিন" উপন্যাসেও জীবন অবিকল ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপিত হয়নি, জীবন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে স্মৃতির ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ-খণ্ডে অমিতের কারাবাসের বিবরণ রয়েছে, রাজনীতি রয়েছে এবং ব্যাপকভাবে রয়েছে তার আবেগঘণ পারিবারিক জীবন। অমিত এমন তরুণ যাকে রাজনৈতিক কর্মীর চেয়ে মননশীল, সংবেদনশীল ভাবুক তরুণ বলেই মনে হয়। সে যদিও সাম্যবাদী রাজনীতিতে দীক্ষিত কিন্তু ওই রাজনীতির উগ্রতার চেয়ে তার মধ্যে বুর্জোয়া সংবেদনশীলতার

---

৫. অরুণকুমার সিকদার, 'রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ত্রিদিবা', "আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস", পৃঃ ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিমান অনেক বেশি। পুর্ব প্রজন্মের জ্ঞানবৃদ্ধদের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল, প্রকৃতির সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়, শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ তাকে দুঃসহ ক্লান্তির মধ্যে পথ দেখায়, রবীন্দ্রনাথকে সে বুর্জোয়া কবি বলে দুরে সরিয়েও রাখে না। "অন্যদিনে" অমিতের মনে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উপস্থিত হয়েছে তার পারিবারিক জীবন : অমিতের জন্য মায়ের উদ্বেগ - কাতরতা ও তার মৃত্যু, পিতার স্নেহ ভাইবোনের প্রীতি আবেগ স্পন্দিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাদের পারিবারটি ছিলো উদার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় ভরা, যে পরিবারে প্রতিভোরে মা পুত্রের হাতে তুলে দেয় নিজের বানানো চায়ের পেয়ালা, পিতা ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট এবং সংবাদপত্রের খবর নিয়ে পুত্রের সঙ্গে মেতে ওঠে তর্কবিতর্কে। কিন্তু ওই পরিবারে অমিতই ছিলো সকলের বড়ো উদ্বেগ, কারণ সে বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িত। পিতামাতার তার সম্পর্কে বড়ো প্রশ্ন - 'অমিত কি করিতেছে ? কোথায় চলিয়াছে ?'[৬] মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সম্ভাবনাময় পুত্র বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িত হলে সে সময় ওই পরিবারে যে উদ্বেগ সঙ্কট আশঙ্কা দেখা দিতে পারে, "অন্যদিনে" তা খন্ড খন্ড কিন্তু বিশ্বস্ত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

এ-উপন্যাসে জেল জীবনের বিশ্বস্ত রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। ওখানে আছে নিম্নশ্রেণীর কয়েদীরা, যারা নানা কায়িক শ্রমের মধ্য দিয়ে জেল জীবন কাটায়, তাদের কেউ কেউ রাজবন্দীদের পরিচর্যা করার দায়িত্ব পালন করে। ওই কারাগারে আছে স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীরা, জীবন তাদের কাছে 'বড় কঠোর সাধনা' রূপে গণ্য হয়। তারা মনে করে 'রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ স্বীকার করিলেই স্বাধীনতার সাধনায় পরাজয় হইবে।'[৭] সাম্যবাদী কর্মীদের চেতনা ও মতাদর্শের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে। মার্কস এঙ্গেলসের তত্ত্ব ও গ্রন্থাদি, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করে নতুন যুগের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক তত্ত্ব গ্রহণকে তারা আদর্শচ্যুতি বলে গণ্য করেন এবং তাদের তরুন কর্মীদের আদর্শচ্যুত হতে বাধা দেন, কিন্তু তরুনেরা তাদের উপেক্ষা করে ওই নতুন মতাদর্শে দীক্ষিত হয়। কাজের মধ্যে প্রাণশক্তি ব্যয় করার সুযোগ নেই বলে রাজবন্দীরা নিজেদের ব্যাপৃত রাখে নানা গ্রন্থ পাঠে, বিচার-বিতর্ক-

---

৬. "অন্যদিন" (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১) পৃ : ১৩১।

৭. "অন্যদিন" (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১) পৃ : ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনায় । কট্টর উগ্র সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী তরুনেরা মার্কসবাদী গ্রন্থ পাঠ করে, বিতর্ক আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত হয় । উগ্র সন্ত্রাসবাদী তরুনেরা বিশ্বের যুদ্ধের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পড়ে , পড়ে গেরিলা যুদ্ধের রীতিনীতি । দেশের স্বাধীনতা শুধুমাত্র শাসকের সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যদিয়েই অর্জন করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করে তারা এবং সৈনিক জীবন যাপনের জন্য কারাগারে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকে । তারা 'লাল কেতাব' পড়ে 'তর্কের কচকচিতে' যেতে অনিচ্ছুক, তারা হবে 'সৈনিক - স্বাধীনতার শানিত অস্ত্র - দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বহীন অস্ত্র ।'[৮] কমিউনিজমকে শত্রু বলে গণ্য করে উগ্র আধ্যাত্মবাদী রাজনৈতিক নেতারাও । তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে তাঁরা কমিউনিজমকে ভয় পান না, 'কি ভয় ? যখন আমাদের দেশ, আমাদের অধ্যাত্ম সম্পদ ও রাজনৈতিক আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া 'আমরা' প্রোগ্রাম দিব - তখন তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাবে এসব 'ইজম' ।'[৯]

এ-উপন্যাসে ত্রিশের দশকের সাম্যবাদী দলের রাজনৈতিক কর্মকান্ড , দলের অবস্থা ও কর্মীদের ক্রিয়াকর্মের ও বিশৃঙ্খল রূপ চিত্রিত হয়েছে । সাম্যবাদী কর্মীদের নিরলস 'ওয়ার্ক'-এর ফলে কলকাতা ও আশেপাশের কলকারখানার শ্রমজীবীরা সচেতন ও সংঘবদ্ধ হতে থাকে । শ্রমিক-দের সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলার কাজে সাম্যবাদী কর্মীরা যে নীতি দ্বারা চালিত হয় তা হচ্ছে 'প্রথম ওয়ার্ক, - ঘোরো,.........দুপায়ের পরীক্ষা । তারপরের ওয়ার্ক - বকো, মানুষ পেলেই মুখ খুলবে, ...তৃতীয় ওয়ার্ক - বৈঠক বসাও, সওয়াল তোলো, সভা মিলাও, ভাষণ দাও । চতুর্থ ওয়ার্ক - মিছিল করো দাবি তোলো । পঞ্চম ওয়ার্ক - ইশতেহার লেখো ইশতেহার বাঁটো । আর সব ওয়ার্কের সেরা ওয়ার্ক হরতাল বাধাও, স্ট্রাইক চালাও ।'[১০] পার্টি কর্মীদের নিরন্তর প্রয়াসে ওই সময়ের শ্রমিকেরা ক্রমশ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে । যদিও তখনো তাদের চেতনা অনেকটা আচ্ছন্ন, 'এখনো তাহারা কথায় ভোলে, চালে ভোলে, কংগ্রেসের নাম শুনিলে আশা পায়, বড়লোকের ভরসা পাইলে নিঃশঙ্ক হয়' অর্থাৎ শক্তিমানের ওপর নির্ভরশীল হবারমানসিকতা তাদের মধ্যে অক্ষুন্ন থাকলেও

---

৮. "অন্যদিন" (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১) পৃ ঃ ২০৮ ।

৯. "অন্যদিন" (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১) পৃ ঃ ২০৫-২০৬ ।

১০. "অন্যদিন" (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১) পৃঃ ৩২২ ।

'সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় এই বোধও আসিয়াছে - সংগ্রামেই মজুরের বাঁচিবার পথ । তাই শুধু বড় কথার দালালদের ভোট দিয়া মজুরেরা নিশ্চিন্ত হয় না , ধর্মঘটও করে ।'[১১] মজুরদের এই বোধকে স্বচ্ছ, তীব্র ও ব্যাপক করার কাজে দিবারাত্র নিয়োজিত থাকে পার্টি কর্মীরা । ওই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে ব্রিটিশ শাসক বেআইনী ঘোষণা করে । পার্টিকর্মীরা গোপনে নিজেদের উদ্যোগে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে চলে । সার্বক্ষনিক এই কর্মীদের জীবিকা নির্বাহের অর্থকড়ি নিজেকেই জোগাড় করে নিতে হয় , কারণ দেবার মতো টাকা পার্টির নেই । "একদা"য় উপস্থাপিত হয়েছে সাম্যবাদী দলের উন্মেষ অবস্থার রূপ এবং "অন্যদিন"-এ উপস্থাপিত হয়েছে তার বিকশিত অবস্থার রূপ । এই দুটি উপন্যাস দুই দশকের সাম্যবাদী রাজনীতির বিকাশের ইতিহাস হয়ে উঠেছে, যদিও ওই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে খন্ড খন্ড ভাবে ।

গোপাল হালদারের "পঞ্চাশের পথ" (১৯৪৪) উপন্যাসে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর পূর্ববর্তী সময়ের বাঙলাদেশের গ্রাম ও শহরে জীবনের অর্থনৈতিক - রাজনৈতিক - সামাজিক রূপ উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের ক্রিয়াবলীর ব্যাপক পরিচয় উপস্থাপিত করা হয়েছে । গোপাল হালদার এ-উপন্যাসকে 'সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে অভিহিত করেন । তিনি বলেন , '.........আমি চেষ্টা করেছি ডকুমেন্টারি উপন্যাসের ধরণে উপন্যাস লিখতে ।........আমি একে সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে উপস্থিত করেছি । চরিত্রসমূহ যদিওঐতিহাসিক নয় , ঘটনা বিকৃত হতে দিই নি ।'[১২] এ-উপন্যাসে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিনামমুখী কাহিনী নেই, ১৯৪২-এর এপ্রিল - আগস্টের বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর জীবনের রূপ এতে অবিকল উপস্থাপন রীতিতে তুলে ধরা হয় । ওই জীবনে মন্বন্তরের পূর্বাভাস দেখা দেয় নানা কারণে । ওই মন্বন্তরের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে জাপানী বাহিনীর আক্রমনের ভয়ে তটস্থ ইংরেজ শাসক, লোভী অসাধু ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রমুখ । নানাভাবে সমস্যা জর্জরিত পল্লী বাঙলার ওই সময়ের জনসাধারণের পাশেদাঁড়িয়ে তাদের সমস্যা মোচনের জন্য কাজ করে সাম্যবাদী কর্মীরা । তাদের নানা প্রয়াস, সাফল্য ও ব্যর্থতার ঘটনাবলীও লিপিবদ্ধ হয়েছে উপন্যাসে । সবমিলিয়ে "পঞ্চাশের পথ" ওই সময়ের বাঙলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবন এবং ওই সময়ের কমিউনিস্ট পার্টিকর্মীদের রাজনৈতিক তৎপরতার দলিল ।

---

১১. "অন্যদিন" (গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১) পৃ : ৩২৩-৩২৪ ।

১২. গোপাল হালদার, 'ভূমিকা', "তেরোশ পঞ্চাশ" ।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানীরা বার্মা দখল করে নিলে ইংরেজ পাততাড়ি গুটিয়ে বার্মা ছেড়ে ভারতে ফিরে আসে এবং জাপানী আক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ববাঙলা জুড়ে নিতে থাকে ব্যাপক প্রস্তুতি । গ্রামের পর গ্রাম থেকে গৃহস্থদের তুলে দিয়ে সেখানে বসাতে থাকে সেনা ছাউনি, চাষীদের চাষ বন্ধ করে দেবার হুকুমজারি হয় । নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয় যাতে জাপানীরা এলে চলাচলের জন্য নৌকা না পাওয়া যায় । গৃহস্থ কৃষকেরা ভিটে বাড়ি ছাড়ার আদেশ পেয়ে বিমূঢ় হয়ে যায় । শাসকেরা খুব অল্পদিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার হুকুমজারি করে, এত অল্প সময়ে গৃহস্থলি গুছিয়ে অন্য জায়গায় যাওয়া গৃহস্থদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে । এ ছাড়া বাঙলাদেশের বিভিন্ন গ্রামগুলোতে নজরবন্দী হিশেবে বসবাসরত 'স্বদেশী দাদাবাবুরা' গৃহস্থ চাষীদের বাড়ি না ছাড়ার প্ররোচনা দেয়, স্থানীয় অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরাও প্রশাসনের বিরোধিতা করার জন্য কৃষকদের উস্কিয়ে দিতে থাকে । কমিউনিস্ট পার্টিকর্মীরা ওই উত্তেজিত গোঁয়ার ভিটে বাড়ি ত্যাগে অনিচ্ছুক গৃহস্থদের গৃহত্যাগের প্রয়োজনীয়তা বোঝায়, একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে । স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে চাষীদের ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ে তৎপর হয় তারা । প্রজাদের ক্ষতিপূরণ দেবার বেলায় প্রশাসন নানা জটিলতা তৈরি করে । প্রশাসন সরেজমিনে তদন্ত করে প্রত্যেক জমিপুকুরের স্বত্বস্বামিত্বের মীমাংসা আগে করতে চায়, তারপর জমির ফসলের হাল পুকুরের মাছের হাল দেখে তারা নির্ধারন করতে চায় ক্ষতিপূরণের রেট । পার্টি কর্মীরা এসব আমলাতান্ত্রিক ঘোরপ্যাচ থেকে দুঃস্থ গৃহস্থ চাষীদের পরিত্রানের পথ বের করে, নির্বিঘ্নে টাকা পাবার ব্যবস্থা করে তারা।

দেশ জুড়ে দেখা দেয় ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা । একের পর এক নানা কারণ জমে পূর্ব বাঙলার দুর্ভিক্ষের পথ তৈরি করে । দরিদ্র প্রজাদের জমি আইনের ম্যারপ্যাচে জমিদারের নামে চুপেচাপে খাস হয়ে যায়, ক্ষতিপূরণের টাকাও যায় জমিদারের পকেটে । দেশে চালের দাম দফায় দফায় বাড়তে থাকে । বার্মা জাপানীদের দখলে চলে যাবার কারণে বার্মা থেকে ভারতে চাল আসা বন্ধ হয়ে যায়, আর রেলওয়ে কোম্পানী, চা বাগানের মালিক এবং সৈন্যদের জন্য ব্রিটিশ সরকার বাঙলার সব চাল কিনে দিতে থাকে । দিল্লী সরকার নাখোদা ব্যবসায়িদের যুদ্ধের চাল জোগাড় করার এজেন্ট নিযুক্ত করে । তারা বাঙলার সমস্ত চাল চড়া দামে কিনে নিতে থাকে । অনেক ধানী জমির ফসল জাপানীদের ভয়ে নষ্ট করে দেয়া হয় ,সরকারী আদেশ দিয়ে বাঙলার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চাল আমদানী রপ্তানীও বন্ধ করে দেয়া হয় । বাজারে চালের দাম ব্যবসায়ীরা নানা ছুতায় বাড়াতে থাকে। চালের দাম একটু চড়া হতে চাষী

গৃহস্থরা ঘরের ধান চাল বিক্রি করে দেয় । ক্রমশ চালের দাম আরো চড়তে থাকে, বাজারে চালের উচ্চমূল্য এবং ক্রয়ক্ষমতা না থাকার কারণে সাধারণ গৃহস্থরা একবেলা আধপেটা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে । খাওয়া শুরু করে কচু, গাছের মূল পাতা । মহাজনদের গুদামে গুদামে চাল জমতে থাকে, চিনি জমতে থাকে, কিন্তু মুনাফার লোভে তারা খোলা বাজারে তা ছাড়ে না । বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় কেরোসিন, লবণ, রেজকি, লেখার কাগজ । গ্রামে গ্রামে ব্রিটিশ সৈন্যদের আগমনের ফলেও জিনিসপত্রের দাম চড়ে । সেনা ছাউনিতে কাজ জোটে বলে দরিদ্ররা পয়সার মুখ দেখে । চিরকাল মাছ ধরবার কাজে নিয়োজিত জেলেরাও অভাবের তাড়নায় সেনাদের মোট বইতে যায়, কিন্তু শক্ত কাজ করার শক্তি ও ইচ্ছে না থাকার কারণে ওই কাজে তারা ব্যর্থ হয় । তাদের যুবতী মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তি শুরু করে । কেরোসিন সুতা লোহা বাজার থেকে উধাও হয়ে যাবার কারনে গ্রামগুলোর বিভিন্ন পেশাজীবীদের অবস্থা হয়ে ওঠে করুন ।

পার্টিকর্মীরা দুর্গত দেশবাসীর নানা সমস্যা সমাধানের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে । তারা জনগণের দুর্দশা মোচনের কাজে এতো নিবেদিত থাকে এবং ভবিষ্যতের মন্বন্তর রোধের জন্য তারা এতো প্রয়াস চালায় যে তাদের ওই মন্বন্তর ও অশুভের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়, তবে শেষ পর্যন্ত অশুভের কাছে তাদের পরাজয় ঘটে । কলকাতা থেকে মফস্বলগুলোতে কাজ করতে যায় কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা । স্থানীয় পার্টিকর্মীদের সঙ্গে মিলে তারা কাজ করে । বাজার থেকে কেরোসিন উধাও হয়ে গেলে পার্টিকর্মীরা স্থানীয় প্রশাসনকে ধরে ডিলারের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে কেরোসিন দেবার ব্যবস্থা করে, কন্ট্রোল ও রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে চাল দেবার উদ্যোগ নেয় এবং তাদের উদ্যোগ ও চেষ্টায় খাদ্য ঘাটতির অঞ্চলগুলোতে অন্য অঞ্চল থেকে প্রচুর চাল আসতে থাকে । অর্থাৎ তারা প্রানপনে চেষ্টা করে মন্বন্তরের আগমনকে রোধ করতে, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা অসাধু ব্যবসায়ীদের লোভ ও নীতিহীনতার কারণে ব্যর্থ হয় । ন্যায্য মূল্যে কেরোসিন দেবার ডিলারেরা নানা দুর্নীতি করে, তারা টিন কেটে নানাভাবে তেল সরিয়ে রাখে, ফলে লাইনে দীর্ঘক্ষন অপেক্ষা করেও অধিকাংশ মানুষের পক্ষে তেল পাওয়া সম্ভব হয় না । টিন থেকে সরানো তেল খোলা বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি হতে থাকে,সাধারণ জনগণ তা কিনতে ব্যর্থ হয়। পার্টিকর্মীদের চালের কন্ট্রোল ও রেশনিং ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতার কারণে ব্যর্থ হয় । অন্য জেলা থেকে খাদ্য ঘাটতির অঞ্চলগুলোতে চাল এলেও মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা ন্যায্যমূল্যে চাল বিক্রি না করে চড়া দামে বিক্রি করতে থাকে । পাইকারদের কাছে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করে দিয়ে তারা খাদ্য সমিতিকে জানায় যে ওই চাল বিভিন্ন হাটে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে । এভাবে ব্যর্থ হয় পার্টিকর্মীদের মন্বন্তর রোধ করার সকল প্রয়াস । এ-উপন্যাসে কমিউনিস্ট পার্টিকর্মীদের এই

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়াবলীর পাশাপাশি পাওয়া যায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থার পরিচয় । এ-সময় ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে, গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের বন্দী করে, দেশ ক্ষোভে উত্তাল হয় । ওই উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এখানে উপস্থাপিত হয় । এ-উপন্যাসে ১৯৪২-এর এপ্রিল-আগস্টের বাঙলাদেশের রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং সাম্যবাদী কর্মীদের তৎপরতা অবিকল উপস্থাপিত হয়ে উপন্যাসটিকে করে তুলেছে সমকালের দলিল ।

এই সময়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে রাজনীতি প্রবন এবং তিনি বাঙলা উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বাস্তবতার সবচেয়ে দীক্ষিত উপস্থাপক । রাজ-নৈতিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাসগুলোতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাহ্যবাস্তবতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যাতে শোষক ও শোষিতের শ্রেণী দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে এবং শোষিতদের বিদ্রোহ বিশেষ মহিমা লাভ করে । মানিক শোষিতদের পক্ষে । তিনি শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার অভিলাষী । তাঁর উপন্যাসে শ্রেণী চেতনা ও সংগ্রাম মাঝে মাঝে ইশতেহারের রূপ পরিগ্রহ করে । তিনি বাহ্য-বাস্তবতাকে অবিকল গ্রহণ করেন, রাজনৈতিক প্রয়োজন তাকে রূপান্তরিত করেন । তাঁর রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাসগুলো খাঁটি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাস হয়ে ওঠে নি, কেননা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের কিছু শর্ত তাঁর পক্ষে পূরণ করা সম্ভব ছিলো না । সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী রচনায় শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণীর বর্তমান দুর্দশা ও সংগ্রামের পরিচয় উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের শোষণমুক্ত সুন্দর সর্বহারা সমাজের ছবিও আঁকতে হয় । কিন্তু বাস্তবতার দাবিতেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী রচনার এই ছক মানিকের পক্ষে মানা সম্ভব হয় নি, যদিও ছকের কিছু অংশ তিনি মান্য করেছেন ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদী প্রথম উপন্যাস "সহরতলী" (প্রথম পর্ব : ১৯৪০, দ্বিতীয়পর্ব : ১৯৪১) । "সহরতলী"র বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়েছিলো, 'সহরতলী কর্মচঞ্চল বস্তী জীবনের নিখুঁত ছবি । একদিকে পুঁজিপতি ধনিক অপরদিকে শ্রম সম্বল শ্রমিক, মধ্যে বস্তি অঞ্চলের প্রাণস্বরূপিনী এক অদ্ভুত নারী ।'[১৩] "সহরতলী"তে পুঁজিপতি

---

১৩. গ্রন্থপরিচয়, (মানিক গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খন্ড), পৃ : ৪৬৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক বস্তিজীবনের

ধনিক আছে, যশোদা নামের 'এক অদ্ভুত নারী'ও আছে, কিন্তু "সহরতলী" ছবি নয় । এ-উপন্যাসে কোনো বস্তি উপস্থাপিত হয় নি, উপস্থাপিত হয়েছে যশোদার বাড়িতে ভাড়াটে রূপে বসবাসরত কুড়ি বাইশজন শ্রমিকের জীবন চিত্র । "সহরতলী"র প্রথম পর্বে যশোদাকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে ওঠে । যশোদা তার দুটি বাড়ির একটিতে নানা গৃহস্থ পরিবারকে ভাড়া দেয়, অন্যটিতে সে নিজে থাকার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সম্প্রদায়ের নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ- দেরও ভাড়া দিয়ে বাড়িটিকে করে তোলে 'ঘরোয়া মেস বা হোটেল বা ঐধরনের একটা কিছু ।' নির্ঝঞ্ঝাট শ্রমিকদের ভাড়া দেয়ার আগে সে তার বাড়িতে ভাড়া দিতো 'মাল সরকার, ট্রামের কন্ট্রাকটর, প্রেসের কম্পোজিটর' ইত্যাদি পেশার মানুষদের । ক্রমশ যশোদা টের পায় এই 'নাপুরো ভদ্রলোক না খাঁটি ছোট লোক' শ্রেণীর মানুষগুলো অদ্ভুত অপদার্থ জীব । তাদের প্রতি ক্রমশ তার ঘৃণা জন্মায় এবং কুলিমজুর শ্রেণীটিকে বাড়ি ভাড়া দেয় । ওই শ্রেণীটির সঙ্গে গড়ে ওঠে তার নিবিড় মমতার সম্পর্ক । 'চোখের সামনে এই শ্রেণীর জীবগুলির কয়েকজন প্রতিনিধির জীবন যাপনের প্রক্রিয়া দেখিতে দেখিতে যশোদা টের পাইয়া ছিল, এরা সব বয়স্ক শিশুমাত্র, অভাবে আর চাপে খানিকটা বিগড়াইয়া গিয়াছে । একটু একটু করিয়া তারপর সে জড়াইয়া গিয়াছিল ওদের জীবনের সঙ্গে । টাঁদের জন্য সবসময় যশোদার মনটা তখন হু হু করিত, এতগুলি বয়স্ক শিশুকে পাইয়া ... কটা তার কমিয়া গিয়াছিল ।'[১৪] যশোদা তার বাড়িতে বসবাসরত ওই 'বয়স্ক শিশু'দের নানা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় মমতা ও করুনাবশত। তাদের প্রতি মমতা বোধ করে বলেই যশোদা নানাভাবে তাদের উপকার করে । এখানে ওখানে পরিচিতদের ধরে বেকার বা কর্মচ্যুত কোনো কোনো শ্রমিককে কাজ জুটিয়ে দেয়, বিপদে আপদে পরামর্শ দেয়, অর্থ ... দিয়ে সাহায্য করে । ওই 'বয়স্ক শিশু'গুলো নানা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লে তাদের নিবুর্দ্ধিতার জন্য যশোদা ভৎর্সনা করে । কখনো কখনো শ্রমিকদের গোলযোগ মিটিয়ে ফেলার সময় মালিক পক্ষ শ্রমিক সমিতির সদস্যদের ছাড়াও যশোদাকেও আলোচনায় রাখে । তবে যশোদার কোনো রাজনৈতিক বোধ নেই । শ্রমিকদের সে বয়স্ক শিশু রূপেই দেখে, সে কখনো তাদের একটি শ্রেণী হিশেবে ভেবে দেখেনি । ওই মজুরেরা অস্থির চিত্ত । অকারণে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি থেকে তারা মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে । ওই অস্থির চিত্তদের বিপদে সর্বদা পাশে থাকা, তাদের সমস্যা সমাধান করা, বেঁচে থাকার মর্মান্তিক চেষ্টায় আহত অনেকগুলি 'অশিক্ষিত ও অমার্জিত' বয়স্ক

১৪· "সহরতলী" (দ্বিতীয় পর্ব), (মানিক গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খন্ড) পৃ ঃ ৩৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর সেবা করা হয়ে ওঠে যশোদার জীবন যাপনের আনন্দ । মানিক এ - উপন্যাসে উল্লেখ করেন যে ওই সব বয়স্ক শিশুরা 'বেঁচে থাকার মর্মান্তিক চেষ্টায় আহত', কিন্তু ওই মর্মান্তিক প্রচেষ্টার বিশদ ভাষ্য তিনি রচনা করেন নি ; যশোদার সংসারে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন , যশোদার শাসন স্নেহ এবং যশোদার প্রতি তাদের অভিমান, তাদের প্রতি যশোদার মমতা ও সঙ্কট মোচনের চেষ্টা ইত্যাদির উপস্থাপনা করেছেন মানিক । অর্থাৎ যশোদা এখানে কেন্দ্রবিন্দু , এ-উপন্যাসে শ্রমিকদের নিয়ে তার ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত বিবরণ রচিত হয়েছে । একসময় স্থানীয় মিল মালিক সত্যপ্রিয়র চক্রান্তে তার গৃহে বসবাসরত ওই শ্রমিকেরা তাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে এবং তার পাওনা মিটিয়ে ওই শ্রমিকেরা অন্যত্র চলে যায় ।

"সহরতলী"র দ্বিতীয় পর্বেও যশোদা সমাজসেবায় মেতে ওঠে । প্রথম পর্বে সে মগ্নছিলো 'বয়স্ক শিশু'দের লালন পালনে, দ্বিতীয় পর্বে সে মধ্যবিত্ত নানা বিকারগ্রস্ত ভদ্রলোকের অন্তঃপুর বাসি-নীদের নানা হিত সাধনে তৎপর হয় । তার বাড়িতে ভাড়া দেয় নিম্নমধ্যবিত্ত এক তরুন দম্পতিকে। ওই তরুনী স্ত্রীটি প্রতিদিন দুপুরে পাড়ার মধ্যবিত্ত নারীদের নিয়ে ঘরোয়া আলাপের আসর বসায়, ক্রমে যশোদাও ওই আসরে জড়িয়ে পড়ে এবং নানা কর্মকান্ডে অংশ নেয় । ওই মধ্যবিত্ত-দের প্রতি যশোদা প্রথমে প্রবল ঘৃণা বোধ করতো । ঘৃণাবোধ করা সত্ত্বেও ওই দশজনের নানা সমস্যায় তাদের পাশে গিয়ে যশোদা যথাসাধ্য উপকার করে । মধ্যবিত্ত পরুষদের সম্পর্কে তার ধারনা, 'এইসব কলম পেশা কুলীরা কারো সঙ্গে সুখদুঃখের ভাগাভাগি করে নেয় না, যেটুকু করে সেটুকু শুধু মৌখিক ভদ্র আলাপে চলতি শব্দের আদান প্রদান । সহানুভূতি কাকে বলে কেউ জানে জানে না ।'[১৫] মধ্যবিত্ত অন্তঃপুর বাসিনীদের শ্যাওলা ধরা ও বিকারগ্রস্ত জীবন দেখে তার বিতৃষ্ণা জাগতো , সে ভুলে যেতো 'যে এরাও মানুষ ।' যশোদার বাড়ির নতুন ভাড়াটে অতসীর চাপে ওই সব মধ্যবিত্ত নারীদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে তাদের প্রতি 'উপেক্ষা, অবহেলা বা বিতৃষ্ণার বদলে যশোদার মনে জাগে মমতা ।'[১৬]

---

১৫. "সহরতলী" দ্বিতীয় পর্ব, পৃ ঃ ৩০১ ।

১৬. "সহরতলী" দ্বিতীয় পর্ব, পৃ ঃ ৩৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository

যশোদার ব্যক্তিগত জীবনে দারিদ্র্য দুর্দশা নেই । দারিদ্র্য বা অন্নকষ্ট তার জীবনে বড়ো ব্যাপার নয় ; মনের কষ্ট, আত্মসম্মান রক্ষা, আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই-ই বড়ো ব্যাপার । প্রথম পর্বে দেখা যায় মৃত শিশুপুত্র চাঁদের জন্য তার মনে যে যন্ত্রনা হতো তা ভুলে থাকার জন্যই যশোদা 'বয়স্ক শিশু' মজুরদের সেবায় মগ্ন হয় , আর দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় প্রেমিকাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ ভাবপ্রবণ কীর্তনমত্ত ছোটভাই নন্দের জন্য তার মনে যে বেদনা ও শূণ্যতা বোধ জাগে তা ভোলার জন্যই সে নতুন ভাড়াটেদের সেবা যত্নে মেতে ওঠে , মেতে ওঠে নতুন ধরনের সমাজ সেবায় । সে ঝোঁক চালিত এবং ধাত্রীসুলভ অভিভাবকত্বই তার মূল বৈশিষ্ট্য । তার বাড়ির নতুন ভাড়াটে দম্পতিকে দেখে যশোদার 'মন কাঁদিতে থাকে নন্দ আর সুবর্ণের জন্য । হয়তো এমনিভাবে কোথায় কার বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নিয়া তারা আছে । ... প্রথম বয়সের উত্তেজনায় দুঃখকে বরণ করায় সুখ দুদিনে ঘুচিয়া গিয়া দুর্দশার দুজনের সীমা থাকিবে না, এই কথাই সর্বদা সে ভাবে ।'[১৭] ক্রমবর্ধমান শহরের আগ্রাসনের কাছে হার মানে যশোদার শহরতলীর দরিদ্র, নিম্নবিত্ত বাসিন্দারা । নিম্নবিত্ত মালিকদের কাছে থেকে অধিক-দামে মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীরা প্রথমে জমি কিনে নিতে থাকে । ক্রমশ শহরতলীর জমির দাম খুবই চড়ে যায় । শহরতলীর আদিবাসিন্দারা প্রচুর নগদ টাকা একসঙ্গে পাবার লোভে বাড়ি বিক্রি করে দূরের গ্রাম ও মফস্বলগুলোতে চলে যেতে থাকে । যশোদা বাড়ি বিক্রি করতে সম্মত হয় না । মিলমালিক সত্যপ্রিয় শহরতলীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত অফিসকে যশোদার বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা নেবার জন্য প্ররোচিত করে । যশোদার কাছে উকিল নোটিশ আসে । এই আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য যশোদা লড়তে চাইলেও শেষপর্যন্ত নিরস্ত হয় । কারণ সে বুঝতে পারে ধনশালীর সঙ্গে লড়াই করতে সে উদ্যোগী হলেও, আইন প্রশাসন কোনো কিছুই তাকে সাহায্য করবে না , বরং সবকিছুই তার বিরুদ্ধে যাবে । তাই সে নিজেও মেনে নেয় পুঁজিবাদী আগ্রা-সনকে ঃ সে নিজেই উৎখাত হয়ে যায় শহরতলী থেকে ।

"সহরতলী"র প্রথম পর্বে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ স্পষ্ট, তবে এটিকে বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাস বলা যায় না । দ্বিতীয় পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই রাজনীতি থেকেও সরে এসেছেন, তবে শহরতলীতে পুঁজিবাদী আগ্রাসনের রূপটি চিত্রিত হয়েছে,

---

১৭. "সহরতলী" দ্বিতীয় পর্ব , পৃ ঃ ৩২৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

দুপর্বেই বাহ্যবাস্তবতা উপস্থাপনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তুনিষ্ট, কিন্তু এ-উপন্যাসে যশোদা নামের যে 'অদ্ভুত নারী'টি রয়েছে যাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জননী বা ধাত্রী রূপে চিত্রিত করেছেন তার বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে । সে বাস্তবতা থেকে উঠে আসে নি , বরং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে সৃষ্টি করে বাস্তবতায় সংযোজিত করেছেন এবং তাকে এক নতুন সমাজের স্বাপ্নিক ও ধাত্রীর ভূমিকায় নিয়োজিত করেছেন । সে যে সমাজের স্বপ্ন দেখে তা এমন :

> নগরের পথে ট্রাম চলে, পথের দুপাশে পাঁচ সাততলা বাড়ি থাকে, দোকান থাকে, সিনেমা থাকে, পার্ক থাকে, গলি থাকে, হাজার হাজার মানুষ থাকে, অনেক কিছুই থাকে সহরের । কেবল সেই সঙ্গে সঙ্গে থাকে সামঞ্জস্য, বড় বাড়ির আড়ালে ছোট বাড়ির কাঁপর লাগে না, গলি ঘুঁজির গোলক ধাঁধা থাকে না, নাকেও লাগে গায়েও ল্যাপটাইয়া যায় এমন ভাপসা দুর্গন্ধ কোন গলিতে কোন বাড়িতে পাওয়া যায় না, আর - আর; সত্যপ্রিয় অবশ্য মোটরে চড়িয়াই বেড়ায় যশোদার নগরে , কিন্তু যশোদা যে কুলী মজুরদের সঙ্গে ঘর করে, তারা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, পরিস্কার জামা কাপড় পরিতে পায় , নুরকার মত স্ত্রী পায় , জীবনটা উপভোগ করার মত অবসর পায় ।[১৮]

এই হচ্ছে যশোদার ইউটোপিয়া ; এটি শ্রেণীহীন শোষনহীন সমাজ ব্যবস্থা নয় , তবে সেখানে 'সামঞ্জস্য' আছে অর্থাৎ গরীবেরা চরম শোষিত নয় । এ-উপন্যাসের প্রান যশোদা, তবে সে নিজেই বাস্তবতার জন্য সংকট । সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রয়োজনে শহরতলীতে তার বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটেছে ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রতিবিম্ব" (পত্রিকায় প্রকাশ ১৩৫০) উপন্যাসে একটি অকর্মন্য তরুন দ্রষ্টার চোখে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ক্রিয়াকলাপের ও জীবন যাপনের যে রূপ ধরা পড়ে তা উপস্থাপিত হয়েছে । এ-গ্রন্থের ভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই অকর্মন্য তরুন দ্রষ্টা সম্পর্কে বলেন ,'মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী সাধারণ কর্মী যুবকের মনে নবযুগের নতুন ভাবধারার প্রভাবে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, ভাবপ্রবণতা ও বাস্তব বোধের

১৮· " সহরতলী " (প্রথম পর্ব) , পৃ : ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্য কি রূপ নিয়েছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কোন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা উচিত এই নিয়ে যে দ্বিধা সংশয়ের ভারে সে ব্যাকুল হয়েছে , ... তারকের মত ছেলেদের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের সূচনা কি রূপ নিয়েছে , 'প্রতিবিম্ব' তারাই একটা দিককে রূপ দেবার চেষ্টা ।' ওই অকর্মন্য তরুন দুষ্টার নাম তারক । সে খেয়ালী এবং ঝোঁক তাড়িত । সে কোনো ব্যাপারেই বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হতে চায় না । সে এ-কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকুরির চেষ্টা করে না । সাম্যবাদী পার্টিকর্মীর সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রাম ও মফস্বলে পার্টির কাজ করে , চাষী মজুরদের পার্টির সভায় নিয়ে আসার কাজে তৎপর থাকে, কিন্তু পার্টিতে সে নাম লেখাতে উৎসাহ বোধ করে না । পার্টিকর্মী হয়ে ওঠার পরে যদি বাধ্যবাধকতার চাপে তার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় - এই শঙ্কায় সে পার্টিতে নাম লেখায় না । কিন্তু পার্টির সকল কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে । চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে কলকাতায় গিয়ে তারক কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মীদের জীবন যাপনের রীতি ও কর্মীজীবনের ধরনের সঙ্গে পরিচিত হয় , ওই জীবনকে সে দেখে কৌতুক বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে । কমিউনিস্ট কর্মীরা অনেকটা সমবায় ভিত্তিক যৌথ ক্যাম্প জীবন যাপন করে । দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তাগ্রস্ত ওই জীবন । 'গলির মধ্যে দোতলা একটা পুরোনো বাড়ি', নিচের তলাটা একটু স্যাঁতস্যাঁতে । দোতলার সিঁড়িটা কাঠের এবং ধাপগুলো অপ্রশস্ত । বিশেষ কায়দায় পা ফেলে ওঠা নামা করতে হয় । ... ছোট বড় ঘর আছে সাত খানা । ওই বাড়িতে কোনোদিন পনের জন কোনোদিন পঁচিশ জন মেয়ে পুরুষ বাস করে ।'[১১] পার্টিকর্মীরা নিজেদের ওই বাসস্থানকে একটি 'খাপছাড়া মেস' বলে অভিহিত করলেও, তারকের কাছে মনে হয় ওই, বাড়িতে একটি 'সার্বজনীন পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে ।' প্রথাগত জীবনের কোনো শৃঙ্খলা ওই জীবনে নেই । পার্টি কর্মীরা প্রত্যেকেই তর্কপ্রিয়, তর্কউন্মুখ এবং অস্থির । একই ঘরের মেঝেতে একদল তরুন কর্মী উত্তেজিত হয়ে পার্টি ও তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করে, অন্যকোনে 'শাড়ির পাড়ের ঢাকনি দেওয়া বাক্সের ওপর বই রেখে পড়া' করে কোনো তরুন পার্টিকর্মীর তরুনী পার্টিকর্মী বৌ ।

---

১১. "প্রতিবিম্ব" (মানিক গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খন্ড) , পৃ : ৩৯৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

পার্টিকর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থা করুণ, তাদের কেউ কেউ চাকুরি করে, কেউ শুধু পার্টির কাজ করে । সবার টাকা মিলিয়ে জুগ্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় । পার্টিকর্মীরা জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যথাসম্ভব বর্জন করে, দুঃখকষ্ট সহ্য করে । শ্রমজীবীদের মধ্যে কাজ করে যাও যাওয়ার ব্রতই যেন তারা পালন করে । রাতে তারা ঘুমায় গাদাগাদি করে ব্যারাকের সৈন্যদের মতো । নারী ও পুরুষ পারস্পরিক সম্পর্কের কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙে পাশাপাশি কাজ করে । পার্টিকর্মীরা মনে করে পার্টিতে নারী পুরুষের মেলামেশায় বিধিনিষেধের কড়াকড়ি নেই বলে ওই নারীপুরুষের মধ্যে বিকার ও অসংযম কম । পার্টিকর্মীরা শ্রমজীবীদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত থেকে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আয়েস ত্যাগ করে ঠিকই, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে ভেদাভেদ ও দলাদলি । একজন কর্মীর সামান্য প্রাধান্য অন্যজন সহ্য করতে পারে না । ওই পার্টিকর্মীরা বিশ্বাস করে এ-দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটলেই সর্বহারার স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে । পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটলে প্রচুর মিলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ওই কারখানাগুলোতে লক্ষ লক্ষ বেকার চাষী মজুরে পরিণত হবার সুযোগ পাবে । এভাবে সরাসরি তারা এসে পড়বে 'ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমে'র ভেতর এবং ওই 'সিস্টেমে'র চাপ তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে । ফলে তাদের সহজেই সংঘবদ্ধ ও লড়াইয়ে উদ্যোগী করে তোলা পার্টিকর্মীদের পক্ষে সম্ভব হবে । তারক পার্টিকর্মীদের জীবন যাপন বিশ্বাস কর্ম পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয় কিন্তু সে পার্টি কর্মীদের সদস্যভুক্ত না হয়ে গ্রামে ফিরে যায় কারণ তার মনে হয় শ্রমজীবী সাধারণ শ্রেণীটির প্রকৃত জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় নেই । তার মনে এমন বোধ জাগে যে 'আমার বাড়ির কাছে জৈনুদ্দিনের ঘর, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত বোধ হয় লাখ খানেক কথা ওর সঙ্গে আদান প্রদান হয়েছে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখছি লোকটা কি ভাবে, কেমন করে ভাবে, কিছুই জানি না । মানুষগুলোকে একটু চিনে আসি ।'[২০] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ-উপন্যাসের নাম "প্রতিবিম্ব" অর্থাৎ তিনি চেয়েছেন -এ-উপন্যাসে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের ক্রিয়াকলাপ ও বিশ্বাসের একটি অবিকল রূপ উপস্থাপন করতে । কিন্তু দর্পণ হিশেবে তিনি যাকে নিয়েছেন সে যদিও শ্রমজীবীদের মুক্তি চায়, তবু সে কমিউনিস্ট কর্মীদের মতো

---

২০. "প্রতিবিম্ব" (মানিক গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ: ৪৩০।

Dhaka University Institutional Repository

দীক্ষিত হয়ে ওঠে নি, অর্থাৎ একটি ভিন্ন দর্পণে তিনি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির রূপটি । তিনি ওই বাস্তবতাকে অবিকল উপস্থাপন করেছেন ঠিকই তবে দর্পনটিতে প্রতিবিম্ব পড়েছে এক বিশেষ কোন থেকে । তার ফলে সাম্যবাদী রাজনীতির একটি ভিন্ন প্রতিবিম্ব এ-উপন্যাসে রচিত হয়েছে । এ-উপন্যাসটি রচিত ও প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কমিউনিস্ট আদর্শে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত হবার আগে অর্থাৎ তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ (১৯৪৪) লাভ করার আগে । তাঁর আরো একটি উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে একই ধরনের রূপকে, সেটির নাম "দর্পণ" (১৩৫২/১৯৪৬) । সে-উপন্যাসে দেখা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দীক্ষিতের দৃস্টিতে উপস্থাপন করেছেন সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বাস্তবতা ।

কমিউনিস্ট আদর্শে অদীক্ষিত অবস্থায় রচিত "প্রতিবিম্ব"-এর পরেই দীক্ষিত অবস্থায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন "দর্পণ" (১৩৫২) । অদীক্ষিত অবস্থায় প্রধান ছিলো প্রতি-বিম্ব আর দীক্ষিত অবস্থায় প্রধান হয়ে ওঠে দর্পণ, "প্রতিবিম্বে" ছায়া পড়েছে কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপের, আর "দর্পণে" অবিকল প্রতিফলিত হয়েছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের রূপটি । "দর্পণ" শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই দর্পণ ।[২১] শ্রেণী বিরোধের রূপও এখানে উপস্থাপিত হয় । এ-উপ-ন্যাসের প্রেক্ষাপট রূপে নেয়া হয়েছে কলকাতা নগর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম ঝুমুরিয়াকে । বিশ শতকের ত্রিশের দশকের প্রথম ভাগের সময় প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত । এ-উপন্যাসে পাওয়া যায় চার ধরণের জীবনের রূপ : (১) কাঠগোলা ও কারখানার মালিক লোকনাথ ও ঠিকাদার হেরম্ব , (২) কলকাতার বস্তিবাসী, (৩) ঝুমুরিয়া গ্রামের চাষী, (৪) কমিউনিস্ট পার্টিকর্মী । এ-উপন্যাসে উচ্চবিত্ত মিল মালিক শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্ব করে লোকনাথ, সে ধূর্ত, ঠগ, ফন্দিবাজ ও কুটকৌশলী । নানা কৌশলে শ্রমিকদের শোষণ করে এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের ঐক্যে ফাটল ধরায় সে । সে এমনকী নিকট আত্মীয়ের সঙ্গেও প্রতারনা করে, ভগ্নিপতি রাখালের সঙ্গে সে সমান অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে জীবন বীমা কোম্পানী খুলে ব্যবসা জীবন শুরু করে । ভগ্নিপতির আক-স্মিক মৃত্যু ঘটলে তার শিশুপত্রের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে না দিয়ে পুরো টাকা নিজে আত্মসাৎ করে নেয় । লোকনাথের পারিবারিক জীবন কলুষ, অনৈতিকতা ও বিকারে পরিপূর্ণ । ওই পরিবারের নারীরা আয়েসী, আত্মসম্মান বোধশূণ্য, জড় পদার্থের মতো । স্বামীর দাসীত্ব করেই তারা

২১° নাজমা জেসমিন চৌধুরী, "বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি" (১৯৮০) , পৃ : ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সুশ্রী ও তৃপ্ত । ওই পরিবারের তরুণদের কেউ কেউ সিফিলিসগ্রস্ত, ওই রোগ তাদের দেহ থেকে সংক্রমিত হয় স্ত্রী ও নবজাত সন্তানের শরীরে । লাম্পট্য তাদের প্রধান ধর্ম । গ্রাম থেকে বেড়াতে আসা পরিচিতের সুশ্রী কন্যাকে সম্ভোগ করার জন্য তারা লোলুপ হয়ে ওঠে । লোকনাথের বিধবা মধ্যবয়স্কা বোন কালীতারা সারাদিন নিষ্ঠাবতী বিধবার জীবন যাপন করলেও মধ্যরাতে তার শয্যায় ডেকে নেয় বাড়ির সুদর্শন ঝাড়ুদারটিকে । গভীর রাতে নিজের ঘরে বসে বাঁশি বাজায় লোকনাথের কনিষ্ঠ পুত্র, আর তার সন্ন্যাসী ভ্রাতা খোলাছাদে বসে গম্ভীর উচুঁ গলায় গায় সাধন সঙ্গীত । বিভিন্ন কারখানার শ্রমজীবীরা বাস করে কলকাতার নানা বস্তিতে । বস্তির জীবন শ্বাসরুদ্ধকর, দারিদ্র্য ও দুর্দশায় পরিপূর্ণ । কলকাতার বস্তির বাতাস নর্দমা ও পচা আবর্জনার দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ । দিনের বেলায়ও ওই বস্তি অন্ধকূপ ছায়ান্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে, ধুলা ও ধোঁয়ায় গুমোট । বস্তির নারীরা পশুর মতো সংসার কর্ম ও সন্তান প্রসবের কাজ করে । কলহ ওই জীবনের নিত্যসঙ্গী । নানা ছুতায় কোন্দলে লিপ্ত হয় বস্তির নারীরা । প্রচলিত সামাজিক বিধি-সংস্কার-রীতি বাতিল হয়ে গেছে ওই জীবনে । অবিবাহিত জোয়ান পুরুষ বয়সে বড়ো হাফগেরস্থ নারীর সঙ্গে ভাব করে, শয্যাসঙ্গী হয় । বস্তির ছেলে প্রতিবেশী কোনো কিশোরীকে নিয়ে পালিয়ে যায়, সঙ্গে বাবামায়ের সঞ্চিত শেষ সম্বল নিতে ভোলে না । ওই জীবনে প্রয়োজনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় আত্মবোধ ও পাপপুণ্য বোধ । অস্তিত্ব রক্ষার সংকট ওই জীবনে অতি তীব্র । স্ত্রীকন্যা বোনদের সেখানে পুরুষের রোজগারের পাশাপাশি নিজেদের দেহ বিক্রি করে পেট ভরাবার আয়োজন করতে হয় ।

ঝুমুরিয়া গ্রামবাসীদেরওওসইতে হয় শোষকের অত্যাচার । সেখানে অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে জমিদারের ঠিকাদার জামাতা হেরম্ব । হেরম্ব ধান কাটার মৌসুমে গ্রামের কৃষকদের জোর করে ধরে নিয়ে যায় তার ঠিকাদারীর গাছ কাটতে । কৃষকেরা যেতে অস্বীকৃত হলে পাকা ধানের জমির ওপর দিয়ে লরি চালিয়ে ধান নষ্ট করে, ধানী জমির ওপর দিয়ে গ্রামের রাস্তার তৈরি করার কাজ সে এগিয়ে নেয় । গ্রামের কৃষকদের নেতা বীরেশ্বরকে গুলি করে হত্যা করে । একের পর এক ঘটনা কৃষকদের উত্তেজিত করে তোলে । তাদের এতো-দিনের চাপা ক্রোধ বিস্ফোরিত হয় এবং তারা প্রতিপক্ষের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে । তারা ঠিকাদার হেরম্ব, থানার দারোগা অশোককে হত্যা করে, থানায় অগ্নিসংযোগ করে । ওই জনতাকে নেতৃত্ব দেবার জন্য কোনো নেতা ছিলো না, তারা নিজেরাই নিজেদের পরিচালিত করে । সঠিক নেতৃত্বের

Dhaka University Institutional Repository

অভাবে বৃহত্তর ভূমিজীবী জনতার অভ্যুত্থান পর্যবসিত হয় একটি বিশৃঙ্খল দাঙ্গায় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবন উপস্থাপনা করেন নি , তিনি এদের উপস্থাপিত করেছেন শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে । "দর্পণে" কৃষকদের পারিবারিক বা কৃষিজীবনের বর্ণনা পাওয়া যায় না, বর্ণনা পাওয়া যায় তাদের বিপ্লবী সত্তার । তিনি কৃষকদের জীবনের বাস্তবতাকে বর্জন করে তাদের সংগ্রামী চেতনাকেই প্রধান করে তুলেছেন । সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রবণতার দিক থেকে তার এই উপস্থাপন চমৎকার হয়েছে কৃষকদের জীবনের বাস্তবতার মূল্যে ।

শহরের কারখানার শ্রমিক ও গ্রামের কৃষকদের মধ্যে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও সংগ্রামের চেতনা জাগ্রত করার জন্য কাজ করে বিভিন্ন পার্টিকর্মী । কৃষ্ণেন্দু পার্টির একজন প্রধান সক্রিয় কর্মী । শ্রমিক ও বস্তিবাসীরা তাকে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে তারা আত্মীয়তা বোধ করে এবং সকল সমস্যা, সুখদুঃখের সমাধান তারা তার কাছে প্রার্থনা করে । কৃষ্ণেন্দু মধ্যবিত্ত উন্নাসিকতামুক্ত, বিবেচক, দূরদর্শী এবং জনগণের কাছে আত্মসমর্পিত । সে পার্টির কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে । অন্যান্য পার্টিকর্মীদের মধ্যে মমতা, আরিফ উল্লেখযোগ্য । মধ্যবিত্ত তরুণী মমতা সর্বহারাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে, তাদের জীবন বদলাবার জন্য কাজ করে সে । মমতা তার দীর্ঘদিনের প্রেমিক ধনীপুত্র হীরেনকে বিয়ে করে একথা ভেবে যে বিয়ের পর ভালোবাসা দিয়ে হীরেনকেও পার্টির কাজে উৎসর্গীকৃত একজন কর্মী করে তুলবে । হীরেনের অর্থ, কারখানা মজুরদের উপকারে লাগবে । মমতা আবেগে অন্ধ । স্বামীকে নিবেদিত পার্টিকর্মীতে পরিণত করতে ব্যর্থ হয় সে । বিয়ের পর দেখা যায় বুর্জোয়া হীরেন পার্টির কাজে নিবেদিত স্ত্রীতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । স্ত্রীকে ওই জীবন ত্যাগ করতে বলে । পার্টির কাজের বদলে অন্যান্য ধনী মহিলাদের মতো খণ্ডকালীন সমাজসেবা করার জন্য মমতাকে চাপ দেয় । মমতা হীরেনকে ত্যাগ করে । হীরেন ও মমতা সহাবস্থান করতে ব্যর্থ হয় চেতনার পার্থক্যের কারণে, সংস্কার ও বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে । মমতা বস্তিবাসীদের ভালোবেসে তাদের সঙ্গে বস্তিতে জীবন যাপন করা শুরু করে । বস্তিবাসীরা কিছুতেই তাকে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না । বস্তিবাসী নারী ও পুরুষদের মধ্যে তাকে নিয়ে দেখা দেয় দু'রকম প্রতিক্রিয়া । বস্তির নারীরা প্রথমে মনে করে পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্য মমতা এসে বস্তিতে লুকিয়েছে, তারপর তাদের মনে ধারণা জন্মে ওই ধনী তরুণীটি স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষ চোখে দেখার খেয়ালের বশবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে বস্তিতে এসেছে, তাই বস্তির স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে ওঠে । আর বস্তির পুরুষগুলো তাকে সম্ভোগ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণ" একটি সুপরিকল্পিত বিপ্লবী চেতনার উপন্যাস । তাই এই উপন্যাসে উপস্থাপিত জীবনের রূপটিকে বাস্তবসম্মতভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থাপন করেছেন, তবে ওই উপস্থাপনের পেছনে তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে । যেমন, উপন্যাসের কাহিনীর সূচনাই ঘটেছে বিশেষ পরিকল্পনা থেকে । যা মানিক-এর বর্ণনায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে কিন্তু তলিয়ে দেখলে ঘটনার অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে । ঝুমুরিয়া গ্রামের বিপ্লবী চেতনা সম্পন্ন চাষী বীরেশ্বর মাইতি তার কন্যা রম্ভাকে কলকাতায় বেড়াতে নিয়ে যায় এবং কলকাতায় গিয়ে তারা ওঠে তাদের একই গ্রামের কলকাতা বাসী ধনী মিলমালিক লোকনাথের বাড়িতে । একজন চাষী-কলকাতায় যার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই সে তার মেয়েকে কলকাতা দেখাতে নিয়ে গেছে এটা খুব স্বাভাবিক মনে হয় না । কিন্তু মানিক কাহিনীর প্রয়োজনে রম্ভাকে কলকাতায় নিয়েছেন, তাকে লোকনাথের বাসায় উঠিয়েছেন, সেখানে লোকনাথের কারখানার শ্রমিক রামপালের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন এবং পরে তাদের বিয়ে দিয়েছেন । তিনি এক কৃষক কন্যাকে এক শ্রমিকের জীবনের সঙ্গে জড়িত করে ধনিকের জীবন ও শ্রমিক চাষীর জীবনকে একসূত্রে গেথে দেয়ার জন্য এই ঘটনা ঘটিয়েছেন । লোকনাথের পারিবারিক জীবনের যে বর্ণনা মানিক দিয়েছেন তা বাস্তবসম্মত । ওই জীবন ক্লেদ, কলুষ, ও বিকারে পরিপূর্ণ । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধনী পরিবারটিকে উপস্থাপিত করেছেন ধনী পরিবার সম্পর্কে পূর্বধারণা থেকে এবং ওই জীবনে তিনি বিন্দুমাত্র সুন্দর ও শুভময়তা দেখেন নি । তার কারণ ধনিক শ্রেণীর জীবনের একটি কলংকিত রূপ এ-উপন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় ছিলো । এই জীবনের পাশাপাশি পাওয়া যায় বস্তির জীবন । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তির জীবনের দারিদ্র্য,কলুষতা,খন্ডকালীন পতিতবৃত্তির বিশ্বস্ত রূপ উপস্থাপন করেছেন । কিন্তু তিনি এই জীবনকে এক ধরণের মহত্ত্বের মহিমা পরিয়ে দিয়েছেন । তিনি দেখান এরা শুধুই মার খাওয়া অসহায় পশুমাত্র নয় । তারা প্রতিবাদী, সৎ, বলিষ্ঠ ও খাঁটি । বস্তির জীবন অসুন্দর এবং শ্বাসরুদ্ধকর হলেও সেখানে আছে পারস্পারিক মমতা, সহানুভূতি । একের বিপদে পাশে দাঁড়াবার মহৎ মানবিক গুণসম্পন্ন ওই শ্রমজীবীরা, সততা তাদের সাধারণ চারিত্র । ওই বস্তির নারীরা টাকার জন্য, বিলাসী জীবন যাপনের জন্য পতিতাবৃত্তি বা পাপ করে না, তারা জীবন ধারণে অনন্যোপায় হয়ে ওই পথ গ্রহণ করে ;

Dhaka University Institutional Repository

'শুধু ঘর গেরস্থালি বজায় রাখবার জন্য এসব মেয়ে পাপ করে, স্বামী মুখ বুজে থাকে । ... ঘরকন্নাকে বড় করে পাপকে ছোট করে নিয়েছে বলেই বোধ হয় এটা সম্ভব হয়েছে । পুরুষ যেমন কলকারখানায় গতর খাটিয়ে রোজগার করছে বৌও তেমনি গতর খাটিয়েই রোজগার করছে, সেটা পরপুরুষের আলিঙ্গন সইতে গতর খাটানো হোক, আর যাই হোক । ব্যাপারটা ওরা বোধ হয় এই ভাবে নেয় ।'[২২] পার্টিকর্মীদের মধ্যে কৃষ্ণেন্দু ও আরিফ দুটি শর্তই পুরণ করেছে - বাস্তবতার শর্ত এবং শ্রেণী সংগ্রামের শর্ত - দুটিই পুরণ করেছে তারা । কিন্তু মমতা শ্রেণী সংগ্রামের শর্তটি পুরণ করলেও বাস্তবতার শর্তটি পুরণ করে নি,,তার বস্তি জীবন বাসের ঘটনা শ্রেণী সংগ্রামের দাবি পুরণ করেছে কিন্তু বাস্তবতার দাবি ততোটা পুরণ করে নি, "দর্পণ" উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেণী সংগ্রামের একটি সুপরিকল্পিত রূপ উপস্থাপনের জন্য বাস্তবতাকেও সুপরিকল্পিতভাবে সংশোধন করেছেন ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আদায়ের ইতিহাস" (১৯৪৭) উপন্যাসে একটি নিম্নমধ্যবিত্ত অকর্মন্য তরুণের সাম্যবাদী চেতনায় দীক্ষিত হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে । এ-উপন্যাসটি কলকাতা নগরীর প্রেক্ষাপটে রচিত । এ-উপন্যাসে কেরানী জীবনের বাস্তবতা উপস্থাপনার পাশাপাশি সাম্যবাদী চেতনায় দীক্ষিত কিছু মানুষের জীবনের রূপ ও আদর্শবাদিতার উপস্থাপনা করা হয়েছে । স্টিরিওটাইপ নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানীর বেকার পুত্র, নানা রকম ঝোঁক ও স্বপ্ন তাড়িত সে । তাকে তাড়িত করে মহৎ কিছু করার ঝোঁক, কখনো তাড়িত করে ধনী হবার ঝোঁক । পিতা নানাভাবে ধরাধরি করে তার জন্য কাজ জোগাড় করলেও সে ওই চাকুরি গ্রহণ করতে চায় না । তার মনে যে বোধ কাজ করে তা এমন : 'নিজের জীবনকে সবদিক দিয়া সার্থক করিবার' যে 'প্রতিজ্ঞা সে গ্রহণ করিয়াছে মানুষ হিসাবে তার যা প্রাপ্য সব সে আদায় করিয়া ছাড়িবে, জগৎকে বুঝাইয়া দিবে তার কাছে আর ফাঁকি চলিবে না ; কিন্তু সে সব সম্ভব করিবার জন্য সকলের আগে একটা উপায় তো তার খুঁজিয়া বাহির করা চাই ?'[২৩] তার মনে হয় চাকুরি নিয়ে জীবন শুরু করলে 'সে পথ যদি খুঁজিয়া না পায় ? পথ খুঁজিয়া পাইলেও পথ ধরিয়া চলিবার

---

২২. দর্পণ" (মানিক গ্রন্থাবলী পঞ্চম খন্ড), পৃ : ১১৭ ।

২৩. "আদায়ের ইতিহাস" (মানিক গ্রন্থাবলী ষষ্ঠ খন্ড), পৃ : ১৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা যদি তা না থাকে ?'[২৪] অর্থাৎ সে উদ্বাস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন, অকর্মন্য ভাবুক মাত্র। একসময় তার ঝোঁক চাপে প্রতিবেশী তরুণী কুনুলাকে বিয়ে করার। পৃথিবীর কাছ থেকে ধন-ঐশ্বর্য আদায় করার বদলে এসময় একটি নারীকে আদায় করার ঝোঁক তাকে দিশেহারা করে তোলে, 'কয়েকদিন মনের এলোমেলো গতির কোনো হদিস পায় না ত্রিস্টুপ।... দিশেহারা ভাবটা কোনোমতেই কাটিতেছে না। কুনুলাকে সে বিবাহ করিবে। ওটা তার করা চাই। মনীশের মত না থাক, কুনুলা তাকে পছন্দ না করুক, কুনুলাকে সে বিবাহ করিবে। এটা জিদের কথা নয়, গোয়ার্তুমি নয়, এই তার সঙ্কল্প। প্রেম চুলোয় যাক, সুখের নীড়ের স্বপ্ন আকাশে থাক। সে পুরুষ সে কুনুলাকে চায়। তা-ই সে কুনুলাকে বিবাহ করিবে। কুনুলা তার কাম্য ও প্রাপ্য - ওকে সে আদায় করিবে। যে ভাবেই হোক।'[২৫] ত্রিস্টুপের পিতা নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানী। ওই জীবনে পালিত হয় নানা সংস্কার। মাসশেষে ত্রিস্টুপকে মাইনের টাকা এনে পিতার হাতে তুলে দিতে হয়। কোনো মাসে মাইনে পেয়ে সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান করে হুল্লোড় করলে পিতামাতা ব্যাপারটাকে বয়সের দোষ বলে মনে করে এবং বয়সের দোষ কাটাবার জন্য পুত্রের বিয়ে দেওয়াকেই একমাত্র উপায় বলে মনে করে। ত্রিস্টুপের ভগ্নিপতি তিনবৎসর ধরে বেকার এবং শ্বশুরের সংসারে আশ্রিত। বোন প্রভা গ্লানি, অসম্মানবোধ, বেদনায় 'কুঁদুলী হিচকাঁদুনীতে' পরিণত হয়।

শোষিত বঞ্চিত মানুষের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত মনীশ। তার পরিবারের তরুণ সদস্য সদস্যারাও ওই মতাদর্শে দীক্ষিত। মনীশ ত্রিস্টুপের সঙ্গে বোন কুনুলার বিয়ে দিতে সম্মত নয় কারণ সে মনে করে ত্রিস্টুপ আর তার জাত আলাদা। যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও ঐশ্বর্যশালী হওয়ার সাধনা করে মনীশ তাদের একজাতের মানুষ বলে মনে করে, আর ওই ঐশ্বর্যশালীদের পায়ের নিচে যারা 'চ্যাপটা' হয়ে মরছে তাদের অন্যজাত বলে মনে করে। অর্থাৎ মানুষকে মনীশ শোষক ও শোষিত এই দুটো শ্রেণী বা জাতে বিভক্ত করে। সে শোষিত শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে আর ত্রিস্টুপ ধনশালী হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে,

---

২৪. "আদায়ের ইতিহাস" (মানিক গ্রন্থাবলী ষষ্ঠ খন্ড), পৃ: ১৪১।

২৫. "আদায়ের ইতিহাস" (মানিক গ্রন্থাবলী ষষ্ঠ খন্ড), পৃ: ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাই মনীশের কাছে ত্রিস্টুপ 'বেজাত', ওই 'বেজাতের' হাতে বোনকে সমর্পন না করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। মনীশের কাছে অর্থ,ঐশ্বর্য মূল্যবান নয়, মূল্যবান হচ্ছে ব্যক্তির সততা, আদর্শ, জীবনের শুদ্ধ লক্ষ্য। মতাদর্শের অভিন্নতাই দুটি মানুষকে সুখী করতে পারে বলে মনীশ বিশ্বাস করে। কুন্তলার বড় বোন রমলা সাম্যবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত। মনীশ একই মতাদর্শে দীক্ষিত একজন কেরানীর সঙ্গে রমলার বিয়ে দেয়। আদর্শগত অভিন্নতা রমলাকে দারিদ্র্য সত্ত্বেও সুখী করে তোলে। কুন্তলার ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করতে চায় মনীশ। যদিও উপন্যাসের শুরু থেকে মনীশকে দূরদর্শী, খাপছাড়া, সামাজিক বিধিপালনে অনীহ, আপন বুদ্ধিবিবেকের নির্দেশ পালনে মনোযোগী সচেতন এক তরুণ বলে মনে হতে থাকে, তবে তাকে কোনো সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত পার্টির সভ্য বলে মনে হয় না। উপন্যাসের শেষাংশে কুন্তলার জবানীতে জানাযায় মনীশ শোষিত বঞ্চিত মানুষের স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিত পার্টিকর্মী। যদিও পুরো উপন্যাসে তার আচরণ কর্ম কোনোকিছুতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। মনীশকে শ্রমজীবীদের মধ্যে কাজ করতে দেখা যায় না, পার্টির অন্যকোনো দায়িত্বও সে পালন করে না। কুন্তলার জবানীতে মনীশের সাম্যবাদী পার্টিকর্মী সত্তা সম্পর্কে জানা যায়। উপন্যাসের শেষাংশে কুন্তলা মানুষের দুই শ্রেণী, ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হবার জন্য মতাদর্শগত অভিন্নতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে মতামত দেয় তা হয়ে ওঠে অনেকটা সমাজতান্ত্রিক ইশতেহার। এ-উপন্যাসে সাম্যবাদী কর্মী মনীশ শ্রমজীবীদের চেতনার বদল ঘটানো ও স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত নয়, মতাদর্শগত অভিন্নতা দাম্পত্য জীবনের সুখের জন্য কতোটা জরুরি তা প্রতিপাদনে ব্যাপৃত। উপন্যাসের শেষে ত্রিস্টুপ ধনিক সম্প্রদায়ের পায়ের নিচে 'চ্যাপটা' হয়ে মরা বা শোষিত শ্রেণীটির পক্ষাবলম্বী হয়ে ওঠে। তবে চেতনার পরিবর্তন বা আদর্শগত কারণে সে ওই শোষিত শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে না, শুধুই কুন্তলাকে পাবার বাসনা তাকে ওই মতাদর্শ অনুসারী করে। এ-উপন্যাসে বিশদ উপস্থাপিত হয়েছে কেরানী পরিবারের জীবনের বাস্তবতা, তার সাথে আছে ত্রিস্টুপের নানা ঝোঁক বা খেয়াল এবং এর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে শ্রেণী দ্বন্দ্বের তত্ত্বকথা। তাই সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি এ-উপন্যাসে গৌণ হয়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিহ্ন" (১৩৫৩) ১৯৪৬-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আবদুর রশীদ খাঁ-র কারাদণ্ডাদেশের প্রতিবাদে কলকাতায় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের দলিলধর্মী বিবরণ। উপন্যাসটি ঘটমান বাস্তবতার বিবরণ অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

যে ঘটনা ঘটে গেছে এটি তার উপস্থাপন নয়, বরং ফেব্রুয়ারীর ১১ এবং ১২ তারিখে কলকাতায় ঘটমান ঘটনাবলীর উপস্থাপন ক্যাপ্টেন রশীদের কারাদন্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় ছাত্র-জনতার বিশাল শোভা যাত্রা বেরোয়, পুলিশ গুলি ছোঁড়ে, জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিআক্রমন করে, জনতার শোভাযাত্রা বাধা পেয়ে অবস্থান ধর্মঘটের রূপ নেয়। ১২ই ফেব্রুয়ারী জনতা ডালহৌসী স্কোয়্যারে শোভাযাত্রা বের করে, ওই শোভাযাত্রায় পাশাপাশি ওড়ে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্টদের ও খাকসারদের পতাকা এবং সারা শহর বিক্ষোভে প্রতিবাদে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।[২৬] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিহ্ন" এই ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসটি শুরু হয় ১১ই ফেব্রুয়ারীর গণ প্রতিরোধের বিবরণের মধ্য দিয়ে এবং সমাপ্ত হয় ১২ই ফেব্রুয়ারীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরপতাকা সামনে নিয়ে প্রতিবাদী জনতার শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। একই ঘটনা নিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন "ঝড় ওঝরাপাতা" (১৩৫৩)। তারাশঙ্কর উপস্থাপন করেছেন বিক্ষুব্ধ, উন্মত্ত, বিধবংসী, বেপরোয়া, দাবানল ধর্মী জনতার অভ্যুত্থানের রূপ; আর মানিক উপস্থাপন করেছেন স্থির, অনমনীয়, দৃঢ়সঙ্কল্প, সংহত, অবস্থান ধর্মঘটরত জনতার প্রতিবাদের রূপ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটমান বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার সাথে সাথে বিভিন্ন চরিত্রের মনোগত দ্বন্দ্ব, সংকট এবং চেতনার রূপান্তরের রূপটিও উপস্থাপন করেন। তিনি একটি বাণীও জ্ঞাপন করেন যে শোষিত শ্রেণীটি আজ সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের কাছে পরাজিত হচ্ছে শাসক শ্রেণী। জনতা যেন বুঝতে পেরেছে ঐক্যই শক্তি। ওই জনতার মধ্যে রয়েছে ছাত্র, নিম্নমধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী, শ্রমিক। তাদের প্রতিরোধ বিভিন্ন জনের মনে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রদের স্বগত ভাবনার মধ্য দিয়ে তার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে গ্লানি, হতাশা, ব্যর্থতাবোধ ও দারিদ্র্য, কিন্তু এই ঐক্য তাদের চেতনাকে বদলে দিয়ে তাদের মনে জাগিয়ে তুলছে সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা। মানিক এই উপন্যাসে জনতার প্রতিবাদের রূপ অবিকল উপস্থাপন করে তাদের মনোজগতের রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিও উপস্থাপন করেছেন। বাহ্যবাস্তবতাকে তিনি মানুষের আত্মচেতনা রূপান্তরের কাজে ব্যবহার করেছেন।

---

২৬. নরহরি কবিরাজ, "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা" (১৯৫৪) পৃ: ২৩৭-২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জীয়ন্ত" (১৩৫৭) উপন্যাসে ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরবর্তী সময় প্রেক্ষাপটটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ-উপন্যাসের পটভূমি বাঙলাদেশের একটি মফস্বল শহর ও নিকটবর্তী গ্রাম। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন বিপথে চলার উপক্রম হতেই নেতারা ওই আন্দোলন বন্ধ করে দেয় এবং জনগণের সামনে আন্দোলনের নতুন কোনো কর্মসূচি তুলে ধরতেও ব্যর্থ হয়। এসব কিছু জনগণকে হতাশ ও লক্ষ্যহীন করে তোলে। তবে অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণকারী তরুণেরা হতাশ ও অবসাদগ্রস্ত ও লক্ষ্যহীন জীবন যাপন না করে তারা নতুন ধরণের মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিশেবেই দেখা দেয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। ওই শহরের তরুণ কালীনাথ 'চরকাব্রতীদের টিমে' রাজনৈতিক কর্মকলাপ থেকে সরে গিয়ে নতুন ভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ শুরু করে। শহরের ছেলেদের জন্য গড়ে তোলে ব্যায়াম সমিতি, সেখানে ডনবৈঠক, সাঁতার, কুস্তি, বক্সিং, ছোরাখেলা, যুযুৎসু সবকিছু শেখানো, হয়, 'চরিত্র গড়া হয় আর মানানো হয় কঠোর ডিসিপ্লিণ।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রস্তুতি পর্বের বিবরণ দিয়েছেন। যেমন, তারা নির্দোষ ব্যায়াম সমিতির ছদ্মবেশে স্থাপন করে বিপ্লবী সংঘ, সেখানে প্রশিক্ষণ দিতে থাকে বিপ্লবী কর্মীদের। তাদের চোখে গান্ধীবাদী আন্দোলন উপহাসের বস্তু কেন না তা নিরামিষ আন্দোলন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি তাদের পারস্পারিক কলহ এবং মতদ্বন্দ্বের বিবরণ দিয়েছেন। দেখিয়েছেন বিপ্লবী সংঘগুলোর মধ্যে ঐক্য নেই। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের অনৈক্য ও পরিকল্পনাহীনতার ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। যেমন ওই শহরের একটি বিপ্লবী সঙ্ঘের নেতা কালীনাথ সংঘের শক্তিবৃদ্ধি, অস্ত্রসংগ্রহ, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদির জন্য অন্য একটি বিপ্লবী সংঘের সঙ্গে মিলে সরকারী ভান্ডার লুটের পরিকল্পনা করে। কিন্তু অপর দলটির নেতা নারায়ণ মিলিতভাবে কাজ করতে রাজি হয় না, সে বরং তাৎক্ষণিক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য দারোগার বউয়ের গয়না ছিনতাই করে। মানিক দেখিয়েছেন তারা দেশের মুক্তিপ্রচায় ঠিকই, প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু তারা হঠকারী ও ঐক্যহীন। ওই বিপ্লবীদের আরেকটি দল বিপ্লবীদের বোমায় নিহত ম্যাজিস্ট্রেট লিটনের স্মৃতি মনুমেন্ট তৈরির জন্য জনসাধারনের কাছ থেকে তোলা চাঁদার টাকা ছিনতাই করে। এর ফল যা হতে পারে তার বিস্তৃত বর্ণনা মানিক দিয়েছেন, অর্থাৎ শুরু হয় পুলিশি ধরপাকড়, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের অন্তরীন করে রাখা ইত্যাদি। তবু বিপ্লবীরা থাকে অদম্য। কিন্তু তাদের আত্মোৎসর্গও ব্যর্থ হয়

Dhaka University Institutional Repository

কেন না তারা ছিলো জনবিচ্ছিন্ন, জনসাধারণের মধ্যে তারা বিপ্লবের চেতনা সঞ্চারিত করতে পারে নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃটিশ শাসক ও এদেশী সরকারী চাকুরে দালালদের তৎপরতা নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বিবরণও দিয়েছেন এবং ওই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপটি উপস্থাপন করেছেন।

নিকটবর্তী গ্রাম আটুলি গাঁ-র কৃষকসম্প্রদায়ও অহিংসা আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের খাজনা বন্ধের ডাকে সাড়া দেয়, ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় আটুলি গাঁ-র দুজন কৃষক ধনদাস ও ভ্রাতা জ্ঞানদাস। গ্রামের জমিদার কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে জমিদার বসন্ত নন্দীও কংগ্রেসে যোগ দিয়ে হয়ে ওঠে কংগ্রেসের পান্ডা স্থানীয় ব্যক্তি, সে-সব কাজে জেল হয় তা করা থেকে বিরত থেকে কংগ্রেসের কাজ করে চলে সে। খদ্দর পরে, চরকা চালায়, নাইট স্কুলে সাহায্য করে। অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর হতাশা লক্ষ্যহীনতায় ওই গ্রামবাসীরা অবসন্ন ও নির্জীব হয়ে পড়ে, জমিদার তখন পুর্ণোদ্যমে অত্যাচার চালানো শুরু করে। কারণে অকারণে প্রজাদের ধরে নিয়ে বেঁধে রেখে প্রহার করে, এভাবে আন্দোলন করার ও খাজনা বন্ধ করার শাস্তি দিতে থাকে। মানিক দেখিয়েছেন ওই কৃষকদের জীবনে গভীর দারিদ্র্য আছে, জমিদারের অত্যাচার আছে, তবে চাষীদের মনে আছে অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়াবার বলিষ্ঠতা ও সাহস। তাদের জানা আছে প্রবল বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বিরোধিতার সময় আত্মরক্ষার কৌশল। ধনদাস জ্ঞানদাস অহিংস আন্দোলনের সময় মুখোমুখি হয় জমিদারের, আর অহিংস আন্দোলন পরবর্তী কালে ধনদাসের কিশোর পুত্র পঁচা ও তার সমবয়সী কিশোরেরা নারীলিপ্সু চরিত্রহীন জমিদার পুত্রকে শায়েস্তা করতে সংঘবদ্ধ হয়। জমিদার পুত্রটি কাপুরুষ ; প্রজাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে প্রতিশোধস্পৃহায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে না, বরং চুপিসারে কলকাতায় পালিয়ে যায়। জমিদার পিতা বসন্ত নন্দী কৌশলে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়। সে গ্রামে একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়ে নিকটবর্তী থানার পুলিশদের জানায় যে আটুলি গাঁ-য়ের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এই কাজটি করেছে। পুলিশ এসে পুরো গ্রামের সাধারণ চাষীদের বাড়িঘর লন্ডভন্ড করে সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে, একুশজন তথাকথিত ডাকাত ধরে নিয়ে যায় তারা। মানিক দেখিয়েছেন অহিংস আন্দোলনের ব্যর্থতার পর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগে গ্রামের সাধারণ জনজীবন নানাভাবে অত্যাচারিত ও বিপর্যস্ত হয়েছে। গ্রামের ক্রুর চক্রান্ত পরায়ণ জমিদার অত্যাচারে তৎপর, আর পুলিশ হাকিম প্রভৃতি শাসক শক্তি

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে দাঁড়ায় তার সহায়ক শক্তি । তবে গ্রাম-জীবনের বা কৃষক পরিবারের জীবন বাস্তবতা এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় নি ,, দরিদ্র কৃষক প্রজাদের অদম্য অনমনীয় সংগ্রামী সত্তার পরিচয়ই উপস্থাপিত হয়েছে ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "তিমির তীর্থ" (১৩৫১) উপন্যাসটি বরিশালের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত । ১৯২১-এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কিছু পরের সময় প্রেক্ষাপটটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে । এ-উপন্যাসের নায়ক প্রফুল্ল, সে গান্ধীবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত । বরিশালের প্রত্যন্ত গ্রাম মহাদেবপুরে স্বরাজের বাণী প্রচার করতে যায় সে । এ-উপন্যাসে ওই গ্রামের সমাজ জীবন বাস্তবতার উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে ওই গান্ধীবাদী রাজনৈতিক কর্মীর কর্মতৎপরতার উপস্থাপনা ঘটেছে । প্রফুল্ল হেডমাস্টারের কাজ নিয়ে ওই গ্রামে যায় । ব্রাহ্মণ প্রধান ওই গ্রামের সমাজ সংকীর্ণতা কুসংস্কার রেষারেষিতে পূর্ণ । দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় সাধারণ মানুষের জীবন নির্জীব । অস্বাস্থ্য ও নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ওই সমাজের মানুষ । অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কিংবা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কোনো ঢেউ এসে ওই জীবনে পৌঁছে নি । স্বরাজ আন্দোলনের ছদ্মবেশী সৈনিক প্রফুল্ল ওই গ্রামের তিমির অন্ধকার দূর করতে সচেষ্ট হয় । সে প্রথমে সমাজসেবা শুরু করে । স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে গ্রামের ভাঙারাস্তা মেরামত করে, কচুরিপানা পরিষ্কার করে । ছাত্রদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও উৎসাহী করে তোলে । প্রতি হাটবারে হাটে গিয়ে গ্রামের অন্ত্যজ মাতাল, জুয়ারী শ্রমজীবীদের নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য উপদেশ দেয় । হাটের সমবেত লোকদের নানা বিষয়ে সজ্ঞান করে তোলার চেষ্টা চালায় প্রফুল্ল । ওই অজ্ঞ, আত্মপরায়ণ মানুষগুলোকে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মানুষ হিশেবে তাদের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে সজ্ঞান করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয় । প্রফুল্ল যে কর্মতৎপরতা চালায় তা যতোটা রাজনৈতিক কর্মীর, তার চাইতে বেশি একজন সমাজ সেবকের । নানা ছোটখাটো সমাজসেবা ও উপদেশের মধ্য দিয়ে ওই জীবনের অন্ধকার দূর করার সাধনাই সে করে, রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার সে করে না । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ-ব্যাপারটিকে গণ্য করেন বিপ্লব বা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতি বলে । তিনি যে সামাজিক জীবনের উপস্থাপনা করেন তা নিশ্চল, স্থবির ও নৈরাশ্যপূর্ণ । সেখানে দরিদ্রদের জীবন অনৈতিকতা দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও কলুষে বিষাক্ত, উচ্চশ্রেণীর শোষণ ওই জীবনকে রিক্ত করে তুলেছে । আর সমাজের মধ্যবিত্ত ও সম্পন্নদের জীবন আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা,

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক রেষারেষির ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি মাত্র । ওই জীবনে একদিন এসে পৌঁছে স্বরাজ আন্দোলনের ঢেউ । এর ফলে মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তারাও আন্দোলনের অংশী হয়ে ওঠে । তিনি দেখান তারপরই ঝড় আসে । শাসক শক্তি কঠোর হাতে দমন করে সচেতন উদ্বুদ্ধ মানুষেদের । জীবন হয়ে ওঠে আগের মতোই হতাশা ও নৈরাজ্যপূর্ণ ও স্থবির । এ-উপন্যাসে প্রফুল্লকেও পুলিশ গ্রেফতার করে, তার গ্রেফতারের পর নিভে যায় উদ্দীপ্ত জনগণ । প্রত্যন্ত গ্রামে রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ এসে পৌঁছুলে ওই জীবনে যে আলোড়ন জেগে ওঠে, ওই আলোড়নের রূপ উপস্থাপনাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লক্ষ্য । ওই আলোড়ন পূর্ববর্তী গ্রাম জীবনের স্থবিরতা নির্দেশের জন্যই তিনি ওই সমাজ জীবনের রূপে তুলে ধরেন উপন্যাসে । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ওই সমাজ জীবন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা করেন, কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক । দুর্দশাগ্রস্ত অন্ত্যজদের বেদনা দুর্গতির জন্য তিনি বেদনা বোধ করেণ ও ব্যথিত মন্তব্য করেণ । জনতার জাগরণ ব্যর্থ হয়ে গেলেও উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে ছক বাঁধা আশাবাদের মধ্য দিয়ে । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজ কাঠামোর আমূল রূপান্তরবাদী নন, তিনি গান্ধীবাদী । তাঁর রাজনীতি সমাজ সেবা ও স্বরাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "মন্দ্রমুখর" (১৩৫২) উপন্যাসে ১৯৪২-এর আগস্ট বিদ্রোহের সময় প্রেক্ষাপটটি গৃহীত হয়েছে । বাঙলাদেশের একটি ছোটখাটো মফস্বল শহর নিশ্চিন্ত নগর ও তার আশেপাশের দেহাতী গ্রামের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত । ১৯৪২-এর আগস্ট বিদ্রোহ ওই মফস্বল শহরের মধ্যবিত্ত জীবন ও দেহাতী গ্রামবাসীদের মধ্যে কেমন আলোড়ন প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে এ-উপন্যাসে তার রূপ তুলে ধরা হয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ওই সময়ে ওই মফস্বল জনজীবন নানা সমস্যায় পীড়িত । দেহাতী গ্রামবাসীরা ক্ষুধা তাড়িত, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্ব-গতির কারণে বিপন্ন, আরো বিপন্ন সরকারী শাসন যন্ত্রের নানা পেষনে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর সরকারী চৌকিদার হাটে হাটে ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করে যায় যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা না করার সরকারী হুকুম । হুকুম জারি করা হয় যুদ্ধ বিষয়ক অসঙ্গত যেকোনো আলোচনার কারণেই ব্রিটিশ সরকার ভারতরক্ষা আইনের ধারা অনুসারে মানুষকে গ্রেফতার করবে । ফলে দেহাতী গ্রামবাসীরা যুদ্ধ সম্পর্কে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সকল প্রসঙ্গেই নীরবতা পালন করে । মফস্বল শহরের সমাজ মধ্যবিত্ত উকিল মোক্তার মহকুমা হাকিমের সমাজ। তারা তর্কপ্রিয় । কর্মের অবসরে ক্লাবে বসে সংবাদপত্র পড়ে, তারা শুধু রাজনৈতিক তর্কে মত্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়, কিন্তু কেউই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত হয় না । সরকারকে ক্ষিপ্ত করে নিজের নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের শান্তি নষ্ট করার দুঃসাহস তাদের নেই । ওই নিস্তরঙ্গ নির্জীব জীবনে এসে পৌছে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে গান্ধী ও নেতাদের গ্রেফতারের সংবাদ । ওই জনজীবনে চাঞ্চল্য জাগে, ক্রোধ ও প্রতিবাদে বিস্ফোরিত হয় দেহাতী গ্রামবাসীরা । তারা শহরে এসে সরকারী অফিস আদালত থানা ভাংচুর করে , অগ্নিসংযোগ করে প্রতিবাদ জানায় । স্থানীয় পুলিশ বিশাল জনতাকে প্রতিরোধে অসমর্থ হলে জেলা শহর থেকে বিদ্রোহ দমনের জন্য আসে সরকারী ফৌজ । নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করে তারা, আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় একের পর এক দেহাতী গ্রাম । দেহাতী মানুষগুলো যেমন হঠাৎ জেগে উঠেছিলো তেমনি হঠাৎ তারা নিভে যায় । স্থাবির একটি জনপদে পরিণত হয় আবার নিশ্চিন্ত নগর ও আশেপাশের গ্রামগুলো ।

১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের কালে একটি বিক্ষুব্ধ জনপদের মানুষদের বিক্ষোভ-বিদ্রোহের পরিচয় এ-উপন্যাসে তুলে ধরার পাশাপাশি গান্ধী ও গান্ধীবাদের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা-বোধ প্রকাশিত হয়েছে । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গান্ধীকে গণ্য করেছেন অন্ত্যজ অবহেলিত শ্রেণীটির মুক্তিদূত রূপে, যিনি ওই শ্রেণীটিকে দৃঢ়চেতা, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, প্রতিবাদী ও সংগ্রামী হতে শিক্ষা দিয়েছেন । তিনি দেখিয়েছেন ১৯২১-এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ওই দেহাতীদের চেতনার ব্যাপক বদল ঘটায়, তারা বলিষ্ঠ, আত্মসচেতন, সংগ্রামী মানুষ হয়ে ওঠে । একজন মধ্যবিত্ত মহকুমা হাকিমের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে লেখকের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে, 'কী আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে দিন । কুড়ি বছর আগেকার '''দেহাতী মানুষ ....আইন আদালতকে কী ভয়ানক ভয় করত । ... উকিলের একটি ভ্রূকুটিতেই পাকা ঘুঁটি তারা কাঁচিয়ে ফেলত,...একটি ধমক খেয়েই সবকিছু গোলমাল করে ফেলত তারা - .....সেই ওরা আজ কী বলছে । বিচারের কথা, আইনের কথা । কলিযুগ কি বদলে গেল নাকি ? নেংটি পরা গান্ধী মহারাজ সম্পর্কে বিনোদ বাবুর যতটা অনুকম্পাই থাক না কেন, লোকটার যে ক্ষমতা আছে সে কথা মানতেই হবে ।'[২৭] এ-উপন্যাসেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, সংঘবদ্ধ জনতার শক্তি সম্পর্কে ব্যক্ত হয়েছে প্রবল আশাবাদ । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হঠাৎ ফুঁসে ওঠা বিধ্বংসী বিদ্রোহ

---

২৭. "মন্দ্রমুখর" (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড), পৃঃ ১২১-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

চান না, তিনি চান সুসংহত গণ সংগ্রাম । উপন্যাসের শেষে একজন তরুণ রাজনৈতিক কর্মী ব্যর্থ পরাজিত দেহাতীদের মধ্যে নতুন করে প্রতিবাদী চেতনা জাগাবার জন্য দেহাতীদের গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে । তবে লেখক ওই তরুণ কর্মীর রাজনৈতিক দলের কোনো পরিচয় নির্দেশ করেন না । সে দেহাতীদের মধ্যে যে বাণী প্রচার করতে চায় তা এমন:

> এই তো কাজের সময় । এখন গিয়েই তো ওদের বলতে হবে বিশ্বাস হারিয়ো না । যা হারিয়েছ, যা ত্যাগ করেছ-যতখানি রক্ত দিয়েছ — তার ঋণ একদিন শোধ করবেন বিশ্বের ভান্ডারী । কিন্তু ভুল করেছিলে ভাই — বিপথে গিয়েছিলে । আত্মস্থ হও — প্রকৃতিস্থ হও । বিপ্লবের প্রদীপ নিবিয়ো না — বুকের রক্ত দিয়ে জ্বালিয়ে রাখো — ঐক্যবদ্ধ হও — শক্তি অর্জণ করো । আকস্মিক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ নয় — গণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও ।[২৮]

ওই রাজনৈতিক কর্মীর কাছে আগস্ট আন্দোলনের বিদ্রোহ গণ্য হয় হঠকারিতা ও আত্মঘাতী বিস্ফোরণ রূপে ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "বৈতালিক" (১৩৫৪) উপন্যাসটিতেও উত্তর বঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হয়েছে । এ-উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৩৪ সাল । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণত গ্রামের অন্ত্যজ কৃষিজীবী শ্রেণীটির দুর্দশাপূর্ণ জীবন ও তাদের মধ্যে ক্রমজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনার রূপটি তুলে ধরেন । ওই শ্রেণীটির সমগ্র জীবন বাস্তবতার উপস্থাপনা উপন্যাসে তিনি করেন না, শুধু মাত্র তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা ও দুর্গতির পরিচয়টুকু প্রথাগতভাবে তুলে ধরেন । ওই অন্ত্যজদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার দায়িত্ব পালন করে কখনো গান্ধীবাদী কর্মী, কখনো আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নেতা । "বৈতালিক" উপন্যাসে অন্ত্যজ রুইদাস শ্রেণীটিকে সচেতন ও সংগ্রামী করে তোলার দায়িত্ব পালন করে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী অতুল মজুমদার । সে বংশী পারমানিক নাম গ্রহণ করে ওই রুইদাস সমাজে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করে এবং রুইদাসদের মনে প্রতিবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য কাজ করে বলে । গান্ধীবাদীদের মতো নৈতিক উন্নতি সাধণ কিংবা সমাজ সংস্কার শুধু তার লক্ষ্য নয়, সে ওই

২৮° "মন্দ্র মুখর" (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা বলী, দ্বিতীয় খন্ড) পৃ : ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীটিকে শোষক জমিদার ও অন্যদের শোষণ সম্পর্কে সুজ্ঞান করে তোলে, প্রতিবাদী করে তোলার সাধণা করে অর্থাৎ তাদের শ্রেণী-সচেতন করে তোলাই তার লক্ষ্য । তার সাধণা ব্যর্থ হয় না । ওই অপমার্গ জর্জরিত নিঃস্ব নিদ্রিত মানুষগুলো এক সময় জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ হয় । তবে অন্ত্যজ শ্রেণীর এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় । পুলিশ এসে অত্যাচারচালায়, গ্রামের বিদ্রোহী প্রতিবাদী গায়েনকে ধরে নিয়ে যায় । আত্মরক্ষার জন্য এবং নতুন করে বিপ্লব শুরু করার তাগিদে ছদ্মবেশী অতুল মজুমদার আত্মগোপন করে । ওই রুইদাস সম্প্রদায় আবার নিস্তেজ, মূক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতিকে তাঁর উপন্যাসের বিষয় রূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি ঠিক রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিক নন । গান্ধীবাদী রাজনীতির বাণীটি তিনি বহণ করেন, প্রচারও করেন, কিন্তু তাকে গভীর ভাবে সংক্রমিত করতে পারেন না । তাঁর উপন্যাসে কোনো একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে হঠাৎ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে কোনো প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা, পল্লীবাসীরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং শাসকদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয় । তিনি অবশ্য আশাবাদ পোষণ করেন যে ওই আন্দোলন ব্যর্থ হবে না, কিন্তু ওই আশা ছক বাঁধা আশা বলেই মনে হয় ।

সতীনাথ ভাদুড়ীর "জাগরী" (১৯৪৫) এ-সময়ে রচিত রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাস-সমূহের মধ্যে অনন্য । ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে একটি রাজনীতি দীক্ষিত পরিবারের চার সদস্যের (পিতা, মাতা ও দুই পুত্র) স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ওই সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতার রূপটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে "জাগরী"তে । উপন্যাসটি বাঙলা-দেশের পটভূমিতে রচিত নয়, রচিত হয়েছে বিহারের পটভূমিতে, এও উপন্যাসটিকে অন্যান্য রাজ-নৈতিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে । এ-উপন্যাসের চারটি প্রধান চরিত্র বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং তাদের সমগ্র জীবন ওই বিশ্বাসের কাছে উৎসর্গিত । এ-উপন্যাসে বাবা পূর্ণিয়া সরকারী ইংরেজি স্কুলের হেডমাস্টার, যে গান্ধীর আহ্বানে যোগ দেয় অসহযোগ আন্দোলনে, চাকুরি ছেড়ে খোলে আশ্রম এবং জীবনে ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বাস্তবায়িত করে গান্ধীবাদ । মা স্বামীর আদর্শ অনুসারে মহিলা কংগ্রেসের কর্মী । তাদের এক পুত্র বিলু, সে তরুণ, আত্মোৎসর্গিত কংগ্রেস কর্মী । তাদের আরেক পুত্র নীলু, সে প্রথমে ছিলো

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেস কর্মী, পরে যোগ দেয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। আগস্ট আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য বাবা-মা ও বিলু কারারুদ্ধ হয় এবং বিলু মৃত্যু দণ্ডিত হয়। "জাগরী" উপন্যাসে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্বরাত্রে চারজনের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসী রাজনীতি এবং আগস্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক বাস্তবতা রূপায়িত হয়।

"জাগরী"তে উপস্থাপিত বাস্তবতা সম্পর্কে গোপাল হালদার বলেছেন;

> প্রত্যেকের বাস্তবভিত্তিক কথায় প্রতিটি উল্লেখের মধ্য দিয়ে দেশের অবস্থা, তার জনজীবন, তাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস বা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ঘটনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ... চারটি মানুষের স্মৃতি সঞ্চরণে শুধু তারা নিজেরা মূর্ত নয়, কিংবা শুধু পরস্পরকে মূর্ত করে তাও নয়, মূর্তকরে তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত পরিবেশ, নানা নারী পুরুষ, ইতিহাসের মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির আভাস।[২৯]

সতীনাথ এই "মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির আভাস' সৃষ্টি করেছেন চারজনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিস্তৃত স্মৃতি-চারনার মধ্য দিয়ে। তারা তাদের জীবনের একটি চূড়ান্ত সংকট মুহূর্তের পূর্বরাত্রিতে স্মৃতি-চারণ করেছে, কিন্তু বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করেছে ধীর শান্ত ভঙ্গীতে। বাবার স্মৃতোক্তিতে ধরা পড়ে তার গান্ধীবাদী হয়ে ওঠার ইতিহাস, আশ্রম জীবনের পরিচয়, জেলখানার 'আপার ডিভি-শন ওয়ার্ডে'র রূপ, সহবন্দী অন্যান্য গান্ধীবাদীদের সংকীর্ণতা ও বিহার প্রদেশের গান্ধীবাদীদের জাত্যাভিমানের রূপ। বাবা চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়ে গান্ধীর আদের্শে যে আশ্রম খোলে সেখানে খাওয়া দাওয়া কাজকর্ম সমস্ত কিছুতেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুকরণ করা হয় গান্ধীর আশ্রমের। গান্ধী-বাদী বাবার কাছে ধর্ম ও রাজনীতি অচ্ছেদ্য। পুত্রদের রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করে সে গান্ধীবাদী রাজনীতিকেই মহৎ বলে গণ্য করে, 'নীলু বিলুদের দলের প্রোগ্রামের ভিত্তি মানুষের মন আজ কেমন আছে তাহার উপর, আর আমাদের কার্যক্রমের ভিত্তি হিংসা লোভহীন আদর্শ মানব মনের উপর।'[৩০] বাবা এই আদর্শকে প্রাণপনে রক্ষা করতে চায়, তবে গান্ধীবাদের অন্যান্য অনুসারীদের স্থূলতা ও অধ্যয়ন বিমুখতা তাকে পীড়িত করে;

---

২৯. গোপাল হালদার, "সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা", পৃ : ৫০-৫১।

৩০. "জাগরী", (সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১), পৃ : ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

> নীলু বিলুর কী পড়ার ঝোঁক । আর আমাদের পন্থার লোকদের ? তাদের কথা আর বলিয়া কী হইবে? আমি একখানা বই লইয়া বসিলেই বলে - মাস্টার সাহেব, আবার ইতিহাস দিবেন নাকি? ... ইহাদের ধারণা গান্ধীজীর মতের উপর যাহাদের আস্থা আছে তাহাদের আবার পড়াশুনা করিয়া নতুন জানিবার কী থাকিতে পারে ?[৩১]

বিহার প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীদের জাত নিয়ে দলাদলি, সংকীর্ণতা তার মধ্যে বিরক্তি ও ঘৃণা উদ্রেক করে । জেলখানার ওই ওয়ার্ডেও গান্ধীবাদী নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে জাত নিয়ে দলাদলি লেগে থাকে :

> বিহারের গরমপন্থীরা অর্থাৎ সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষান সভার সদস্যরা, দক্ষিণ পন্থীদিগকে এই বলিয়া ঠাট্টা করে যে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কেবল স্থানীয় ভূমিহার ও রাজপুত জাতের পারস্পরিক দলাদলির মুখপাত্র । প্রাদেশিক কংগ্রেসে নাকি রাজনৈতিক দলাদলি নাই, দলাদলি আছে জাত লইয়া, আর ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া । কথাটা কতকাংশে সত্য । জেলের মধ্যেও দেখি রামশরণজী আর হরিহরজী জাতে ভিত্তিতে ছোট ছোট উপদল গড়িবার চেস্টা করেন - বাহিরে গিয়াও যাহাতে তাহাদের লীডার গিরি বজায় থাকে। আমাদের স্বরাজ কি কখনও হইবে? এক এক সময় ঘৃণা ধরিয়া যায় ।[৩২]

মা আপার ডিভিশন 'আওরাৎ কিতা'য় বন্দী । তার স্বগতোক্তিতে ধরা পড়ে আশ্রম জীবনের রূপ, দুই পুত্র বিলু নীলুর বাল্য-কৈশোর- যৌবন কালের নানা ঘটনা, 'আওরাৎ কিতা'র পরিবেশ ইত্যাদি । এখানে মা-র রাজনৈতিক সত্তা নয় , জননী সত্তাই প্রধান । আওরাৎ কিতা'র বন্দী নারীরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল । মা ঠাকুর দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও জাগ্রত দেবী পূর্ণেশ্বরীর চাইতে গান্ধীজীকেই বড় বলে মনে করে । আশ্রম জীবন নানা ঝামেলার পরিপূর্ণ হলেও মুখ বুজে স্বামীর আদর্শ অনুসরণ করে যাওয়াই হয়ে ওঠে মায়ের জীবন । মা স্বামী অনুগতা, - মৃদুভাষী, সংসারসুখী ও বাৎসল্য পরায়ণ । পুত্র বিলু নীলুই তার সুখ ও

৩১° "জাগরী" (সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১), পৃ : ৬৭।

৩২° "জাগরী" (সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১), পৃ : ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণতা । স্বামী তাকে সক্রিয় কংগ্রেসকর্মী করে তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু সক্রিয় কর্মী হবার প্রবণতা ও শক্তি তা মধ্যে ছিলো না । কংগ্রেস কর্মী হিশেবে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের চাইতে, আশ্রমের সংসার চালানো, ছেলে মানুষ করার দায়িত্ব সম্পাদনই সে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে করতে পারে । স্বামীর সকল কাজে থাকে তার পূর্ণ সমর্থন, স্বামীর সকল আচরণ নিঃশব্দে সহ্য করলেও ওই ক্লান্তি কালে স্বামীর অন্যায় আচরণ প্রসঙ্গে তার মনে জাগে ক্ষোভ,

> তোমার হুজুগ, তোমার শখ গান্ধীজীর সেবা করা ; আমার কথা, ছেলেদের কথা একবার ভেবেছ ? এক একদিন এক এক হুজুগ তোমার । দিনকতক ছোলা খেয়ে থাকলে, দিনকতক রোজ বেথুয়ার শাক চাই । দিনকতক খালি বিলিতি বেগুনের শরবত । .... পদে পদে জ্বালাতন । আর সে কি কেবল এই গান্ধজীর রাস্তায় এসেই নাকি ? তার আগেই বা কী ? চাবিটা থাকবে নিজের কাছে ইস্কুলে যাবার সময় একটা টাকা আমাকে দেওয়া হল বাজার খরচের । আমার কাছে চাবি রাখলে কি আমি সব টাকাকড়ি নিজের পেটে পুরতাম নাকি ? না তোমার ভান্ডার উজাড় করে আমার বাপের বাড়ি পাঠাতাম ? কী ভাবতেন কেজানে । সে কথা কোনো দিন জিজ্ঞাসাও করিনি, তা জানাবার প্রবৃত্তিও ছিল না ।[৩৩]

পুত্র বিলুর প্রাণদণ্ডাদেশে ব্যাকুল জননী দেবকুলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে । তার মনে হয় তারই কোনো অজ্ঞাত অপরাধের জন্য তার পুত্র এই শাস্তি পেতে চলেছে । বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে ভারতবর্ষের সকল সাধারণ জননীর মতোই ব্যাকুল হয়ে সন্তানের প্রাণভিক্ষা করতে থাকে,

> মা পূর্ণেশ্বরী ....মা, তুমি তো জাগ্রতা । দেবী, বিলু তো একরকম তোমারই ছেলে, ওকে এবার বাঁচিয়ে দাও । আর আমি তোমার কাছে কোনো দোষ করব না । আর আমি গান্ধীজীকে তোমার চাইতে বড় মনে করব না । ...
>
> ডিহওয়ার ঠাকুর নিশ্চয়ই আবার সেই সময়ের মনের কথা বুঝেছিলেন । তাই তিনি রাগ করে আমার এই কপাল করলেন । কিংবা হয়তো তা গ্রামের মেয়ে সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর বিয়ে দিইনি বলে; তিনি আমার এই দশা করেছেন ।

৩৩. "জাগরী" (সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১), পৃঃ ১২১-১২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

> ডিহ্ওয়ার ঠাকুর, আজ আমার বিলুকে বাঁচিয়ে দাও। তারপর যাতে তুমি খুশী হও তাই করব। [৩৫]

বিলুর স্মৃতিচারণায় ধরা পড়ে জেলখানার 'ডিভিশন থ্রি' ওয়ার্ডের রূপ, আশ্রম জীবন ও ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের উন্মাতাল বিহারের রূপ। ওই বাস্তবতা এখানে স্মৃতিচারনার মধ্য দিয়ে খণ্ড খণ্ড রূপে উপস্হাপিত। রাজবন্দীরা নিজের আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে অকুণ্ঠিত, কিন্তু ব্যক্তিগত নানা তুচ্ছ ব্যাপরে তারা সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। বিলুর চোখে ওই অসঙ্গতি পীড়াদায়ক বলে মনে হয়,

> যে রাজনৈতিক কয়েদী দেশের জন্য নিজের স্বার্থ ও নিজের ভবিষ্যৎ সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছে, যে স্বদেশের জন্য হাসিমুখে সর্বদা মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত তাহাকেও জেলের মধ্যে সামান্য স্বার্থের জন্য নীচ মনের পরিচয় দিতে দেখিয়াছি। কমরেড ভোলা ফাঁসির সাজা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, কিন্তু কয়েকটি মোকদ্দমা মিলাইয়া মোট তেত্রিশ বৎসরের শাস্তি হইয়াছে। অসম্ভব ফূর্তিবাজ, সর্বদা হাসিমুখ,... এই কমরেডকেও দুইনম্বর ওয়ার্ডে থাকিবার সময় ডালের লঙ্কা লইয়া কালেশ্বর প্রসাদের সহিত মাথা ফাটাফাটি করিতে দেখিয়াছি। [৩৫]

জেলের রাজবন্দীদের সময় কাটাবার জন্য নিত্য নতুন খোরাকের দরকার হয়। তাই তাদের নানা প্রকার জটলা, দলাদলি ও পলিটিক্সের অবতারনা করতে হয়। রাতে প্রতি ঘন্টায় একজন ওয়ার্ডার একঘেয়ে সুরে কয়েদীদের গুণ চলে দায়সারা ভাবে। বিলুর মনে পড়ে আগস্ট আন্দোলনের উন্মাতাল বিহারকে। বিক্ষোভে বিস্ফারিত বিধবংসী জনগণকে তার মনে হয় 'যুগ সঞ্চিত জগদ্দল পাথরের নিচে'র 'সুপ্তশক্তি'। ওই 'শক্তি' জেগে উঠে অসাধ্য সাধন করে। 'আধঘন্টারমধ্যে প্রায় সিকি মাইল রেল লাইন' তারা নিশ্চিহ্ন করে ব্রিটিশ মিলিটারী যাতায়াত পথে বিঘ্ন তৈরি করে। 'রেলগুলি ও কাঠের স্লিপারগুলি সকলে কাঁধে করিয়া ভুট্টার ক্ষেতে বা রেল লাইনের ধারে ধারে জলে মধ্যে ফেলিয়া' দেয়। কাঠের পুলে আগুন ধরায়, রাস্তায় নিমেষে ব্যারিকেড তৈরি করে। জনতার যেন মহাজাগরণ ঘটে। ওই জাগরণকে বিলু দেখে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে,

---

৩৪. "জাগরী" (সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১) পৃ: ১২৪।

৩৫. "জাগরী" (সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১) পৃ: ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

> বড় বড় গাছের গুঁড়ি গড়াইয়া আনিয়া রাস্তায় স্তূপীকৃত করিতেছে, কবৈয়া গ্রামের শতাধিক লোক । হাস্য কৌতুকের মধ্যে থামদাহাপূর্ণিয়া রোডের উপর গাছের গুঁড়ির একটি 'ব্যারিকেড' গড়িয়া উঠিল । অদম্য উৎসাহ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে । যে গরিব কিষাণের দল জীবনে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অবকাশ পায় নাই, তাহাদের আজ হইল কী ? প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলিবার আছে ।.... কাঠের গুঁড়ির স্তূপ অনেক উঁচু হইয়া উঠিয়াছে - আর মিলিটারী লরি আসিতে পারিবে না । এতক্ষণ মনে পড়ে নাই— রহু- য়ার কাছে রাস্তার ধারে বড় বড় বটগাছ । 'চলো-ও' । 'চলো-ও' । কুড়ুল কোদাল দা কাটারি যে যাহা পাইয়াছে হাতে লইয়াছে । কুইক মার্চ নয়, বেশ দুরন্ত দৌড় । পরিশ্রান্ত হইলেও থামিবার উপায় নাই ।[৩৬]

'ভূতাবিষ্ট ও নেশাগ্রস্তের মত' ওই জনতা মিলিটারী লরি এলে ছুটে পালায় যে 'যেদিকে পারে' , অমান্য করে জাতি ভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ অনায়াসে জল খায় মুচির হাতে । সকল ধরণের বিভেদ বিস্মৃত হয়ে জনগণ পরিণত হয় ঐক্যবদ্ধ বিধ্বংসী শক্তিতে ।

ছোট ভাই কমিউনিস্ট পার্টিকর্মী নীলুর কাছেও ১৯৪২-এর আগস্টের ভারতবাসীকে 'এক বৈদ্যুতিক শক্তি' বলে মনে হয়, তবে জনতার ওই উন্মত্ততাকে সে দেখে সমালোচকের দৃষ্টিতে । ওই জনতাকে তার মনে হয় উন্মত্ত ঃ

> এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশশুদ্ধলোককে উদভ্রান্ত ও দিশেহারা করিয়া দিয়াছে । সেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না । মাইলের পর মাইল রেল লাইন তুলিয়া ফেলিয়াছে - লোহার রেল লাইন, ভারী ভারী রেলওয়ে স্লিপার, আরও কত জিনিস দূরের নদীতে গিয়া ফেলিয়া আসিতেছে । টেলিগ্রাফের তার কাটা, পোস্ট অফিস ও মদের দোকান জ্বালানোর ভার গ্রামের বালকদের উপর । বয়স্ক লোকে ওই সব তুচ্ছ কাজ করিয়া নিজেদের হাত গন্ধ করিতে চায় না ।[৩৭]

---

৩৬. "জাগরী" (সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১) পৃ ঃ ৩৭-৩৮।

৩৭. "জাগরী" (সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১) পৃ ঃ ১৫৪-১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

নীলু গান্ধীবাদ ও কংগ্রেসকে সমালোচনা করে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে । তার চোখে ধরা পড়ে ওই দলের অসঙ্গতি, শ্রমজীবীদের শোষণের পদ্ধতি ও শোষণ জিইয়ে রাখার কংগ্রেসী চক্রান্ত । সচ্ছল কংগ্রেস কর্মীদের অসহযোগিতার কারণে ব্যর্থ হয় কংগ্রেস পার্টির নানা সৎ উদ্দেশ্য । তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বিহারের ধনী কিষাণ কংগ্রেস কর্মীদের প্রবণতা ও সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ ঃ

> কংগ্রেস সংগঠন, সম্পূর্ণ ধনী কিষানদের হাতে, জমিদারের শোষণ হইতে তাহারা মুক্ত হইতে চায় ; কিন্তু নিজেরা তাহাদের সীমিত ক্ষেতে অধিয়াদার, বাটাইদার বা নিঃসম্বল ক্ষেত মজুরদের উপর শোষণ বন্ধ করিতে চায় না ; কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় নিঃস্ব রায়তদের জন্য যতগুলি আইন তৈয়ারি হইয়াছিল, সবগুলিই ইহারা কূটকৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে । ....দহিভাত গ্রামের সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি যে কংগ্রেস অফিসে ...আসিয়াই কাঁদিতে বসিত, দাদাকে বলিত,... সহদেও-এর ভাই কপিল দেও আমার সব জমিজামা নিয়ে নিতে চায় । জমি প্রায় পঞ্চাশ বিঘা । তার বাড়ির কাছে জমি কিনা ;...
>
> আমার দহিভাতে গেলে কপিল দেও পুরী তরকারি খাওয়াইয়া দেয় , কিন্তু কাজের কথায় আমল দেয় না । ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলে যে তাহারও তো মহাত্মাজীর ভক্ত, সে তো জেলা কংগ্রেস কমিটির মেম্বার, আশ্রমের চাল ছাইবার 'খড় তো সেই প্রতিবৎসর দেয়, এক ভাইকে তো সে কংগ্রেসে দান করিয়াছে । [৩৮]

উপন্যাসের শেষে অভাবিত ঘটনা ঘটে, বিলুর মৃত্যুদণ্ড স্থাপিত হয় , এর ফলে সমস্ত উপন্যাসটি জুড়ে উপস্থাপিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় আক্রান্ত পাঠক হঠাৎ ভারমুক্ত বোধ করে । এ-উপন্যাসে ৪২-এর আন্দোলন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতার রূপটি উপস্থাপিত হয়েছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ।

গোপাল হালদার "জাগরী"র বাস্তবতাকে অভিহিত করেণ 'সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতা' বলে, কারণ এতে 'সমস্ত সত্য মূর্ত হয়ে ওঠে – দেশের সত্য, সমাজের সত্য, জীবনের সত্য, মানুষের সত্য'।[৩৯]

৩৮· "জাগরী" (সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১) পৃ ঃ ১৪১-১৪২।

৩৯· গোপাল হালদার "সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সাহিত্য ও সাধনা", পৃ ঃ ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

"জাগরী" দলিলধর্মী উপন্যাস নয়, তবে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটিতে রচিত হয় ওই সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি অসাধারণ ভাষ্য।

সতীনাথ ভাদুড়ীর "চিত্রগুপ্তের ফাইল"(১৩৪৬) ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব ও পরবর্তী কয়েক বছরের পটভূমিতে বিহারের বলীরামপুর জুট মিল অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে রচিত। উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত হয়েছে কারখানার মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও শ্রমিকদের অনিবার্য পরাজয়। শ্রমিকদের পারিবারিকজীবন এর উপস্থাপনার বিষয় হয় নি যদিও একজন নেতৃস্থানীয় শ্রমিকের প্রেমের উপাখ্যান এতে স্থান পেয়েছে। এতে প্রধান হয়ে উঠেছে বলীরামপুর মজদুর ইউনিয়নের কার্যাবলী, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার তৎপরতা, শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে তোলার প্রয়াস, ইউনিয়নকে শক্তিশালী করার জন্য সেক্রেটারীর ক্রিয়া কলাপও মালিক পক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরোধ। সতীনাথ ভাদুড়ী তার নিজের কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস উপন্যাসে আরোপ করেন নি, তবে নিরপেক্ষ বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন স্বাধীনতা শ্রমিকদের জন্য কোনো নতুন জীবন নিয়ে আসে নি। তারা আগেও শোষিত ছিলো, এখনও শোষিত; ব্রিটিশ শাসকেরা যেমন মালিকদের পক্ষে ছিলো, নতুন ভারতের শাসকেরাও তাদেরই পক্ষে। পুঁজিবাদী শোষণের রূপটি উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। মজদুর ইউনিয়ন শ্রমিক শ্রেণীর সংঘ হলেও অবিশ্বাস প্রবণ ও সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত শ্রমিকেরা ইউনিয়নের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে না। তারা ইউনিয়নে চাঁদা দিতে চায় না কারণ পূর্ববর্তী দুজন সেক্রেটারী ইতিপূর্বে শ্রমিকদের অর্থ আত্মসাৎ করেছিলো। বর্তমান সেক্রেটারী পিউচন্দ্রিকা ইউনিয়নের ওপর থেকে শ্রমিকদের অবিশ্বাস দূর করার জন্য নানা উদ্যোগ নেয়। নিয়ম করা হয় দুএকজন মজুরকে সঙ্গে না নিয়ে ইউনিয়নের নেতাদের কেউ মালিক পক্ষের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসবে না। মালিক পক্ষের সকল অন্যায় থেকে মজুরদের রক্ষা করার জন্য ইউনিয়ন সতর্কভাবে কাজ করে চলে। মজুররা যাতে সস্তায় খাবার পায় ইউনিয়ন এ জন্য মালিক পক্ষের কাছে দাবি জানায়, সেই সঙ্গে কাজের সময় মেয়ে মজুরদের ছোট সন্তানদের রাখার জন্য 'ক্রেশে'র দাবি তোলে। এ-দুটি দাবি আদায় হলে ইউনিয়ন সেক্রেটারী ইউনিয়নকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে উদ্যোগী হয়। ইউনিয়ন শ্রমিকদের মজুরি সপ্তাহে আরো দুতিন টাকা বাড়াবার দাবি জানায়, ক্যান্টিনের অব্যবস্থার নিন্দা করে এবং 'ক্রেশে'র দুধের কারচুপির তদন্ত দাবি করে। যতোদিন মজুরেরা ইউনিয়নের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হয় নি, ততোদিন ইউনিয়ন নিয়ে মালিক পক্ষের মাথা ব্যথা ছিলো না। ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

মজুরদের সংঘবদ্ধ করেশক্তিশালী হয়ে উঠলেই তারা ইউনিয়নটি নষ্ট করে দেবার ও ইউ-নিয়নের ওপর সাধারণ শ্রমিকদের অবিশ্বাস জন্মাবার জন্য তৎপর হয় । ইউনিয়ন অফিসঘরের বাড়িওয়ালা হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ দেয়, মালিক পক্ষের কাছ থেকে টাকা খেয়ে একদল দালাল শ্রমিক মিলের এক নম্বর গেটের পাশে হঠাৎ একদিন নতুন ইউনিয়ন অফিস খুলে বসে । মালিক পক্ষের চক্রান্তে ইউনিয়েনের প্রধান কর্মী কালু সিং নারী ঘটিত কেলেঙ্কারীর অভিযোগে জেলে যায় । মিল ব্যারাকের দারোয়ান মালিক পক্ষের নির্দেশে ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মজুর-দের ঘরে তালা দিয়ে দেয় ভাড়া বাকি থাকার অজুহাতে । লেবার অফিসার মিলের ক্যান্টিন ও 'ক্রেশে'র অব্যবস্থা তদারকী করতে এলে মালিক পক্ষ লেবার অফিসারকে হাত করে এবং ইউনিয়নের সেক্রেটারী শিউচন্দ্রিকা ও কর্মী অভিমন্যুর নামে মালিক পক্ষ কুৎসা রটায় । এভাবে চক্রান্তকারী মালিক পক্ষ জয়ী হয়, সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা বহু বিভক্ত হয়ে যায় ও ইউনিয়নকে অবিশ্বাস করতে থাকে । অভিমন্যুর নামে নারীঘটিত অপবাদ রটে বলে ক্ষুব্ধ পার্টির প্রধান অফিস অভিমন্যুকে বলীরামপুর থেকে স্থানান্তরিত করে প্রত্যন্ত পাড়াগাঁয়ের কৃষক সংগঠনে কাজ করতে পাঠিয়ে দেয় । ইউনিয়ন হয়ে ওঠে বিধবস্ত প্রায় । শিউচন্দ্রিকার নামে পুলিশ শান্তি শৃঙ্খল ভঙ্গের অভিযোগ আনে এবং অবিলম্বে বলীরামপুর ত্যাগের নির্দেশ দেয় তারা । শিউচন্দ্রিকার বিরুদ্ধে সদ্য স্বাধীন ভারতের প্রশাসন এ ব্যবস্থা নেয় । অভিমন্যু পার্টির নির্দেশে শিরনিয়া গ্রামে কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দেখে হিন্দুস্থানে 'আজাদী' এলেও আজাদী পেয়েছে কেবল গ্রামের জমিদার অযোধিয়া চৌধুরী । কৃষকদের জমির ধান নিজের গোলায় তোলার ষড়যন্ত্র করে সে, এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করে থানার দারোগা ও কনস্টেবল । তারা জমিদারের কাছ থেকে নিয়মিত ঘুষ খেয়ে থাকে । এমন কী ওপর পর্যায় থেকে যে তদন্তকারী অফিসার আসে সেও কৃষকদের ধান জমিদারের গোলায় তুলে রাখারই নির্দেশ দেয় । প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়ে ধান কেটে নেবার জন্য অগ্রসর হলে, জমিদারের লাঠিয়াল ও পুলিশের আক্রমনে ছত্রভঙ্গ হয় অভিমন্যু প্রচণ্ড আহত হয় এবং মারা যায়, তার প্রেমিকা মীনাকুমারী আত্মহত্যা করে । এ-উপন্যাসে মিল মালিক ওশ্রমিকদের দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে । আমরা জানি মালকেরা শোষণ করে এবং শ্রমিকেরা শোষিত হয় । এই বিমূর্ত কথাটি ছাড়া শোষণের প্রক্রিয়াগুলো সাধারণের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায় । সতীনাথ

Dhaka University Institutional Repository

ভাদুড়ী মিল মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের ক্রিয়াকলাপের বাস্তব রূপটি উপস্থাপন করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী মার্কসীয় দৃষ্টি কোন থেকে শ্রমিক পীড়ণ ও শোষণের রূপটি উপস্থাপন করেন নি, তাঁর উপস্থাপন নিরপেক্ষ।

বনফুলের "অগ্নি" (১৩৫৩) ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেস পার্টিকর্মী ও উন্মত্ত জনগণের বিদ্রোহ, বিধ্বংসী ক্রিয়াবলী এ-উপন্যাসে নায়ক অংশুমানের স্মৃতিচারনার মধ্য দিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ-উপন্যাসে বনফুলের গান্ধীবাদের প্রতি প্রবল পক্ষপাত প্রকট এবং সেই সঙ্গে সাম্যবাদকে হেয় করার প্রবণতাও অত্যন্ত প্রকট। বনফুল এ-উপন্যাসে সাম্যবাদীদের সুবিধাবাদিতা ও চরিত্রহীনতা নির্দেশে ব্যাপৃত থেকেছেন। ১৯৪২-এ গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হলে এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কংগ্রেস পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে যে ভাঙচুর ধ্বংস প্রতিবাদের আন্দোলন দেখা দেয় অংশুমান তার একজন সক্রিয় সদস্য। বিধ্বংসী জনতার সঙ্গে সে নানা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করে। টেলিফোন ও বিদ্যুতের লাইন কেটে দেয়, রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে দেয় থানা, পোস্ট অফিস, উপড়ে দেয় রেললাইন। শাসক শক্তিকে নানাভাবে বিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এ সব ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তারা। নির্বিচারে গণহত্যা ও গ্রামের নিরীহ নারীদের ধর্ষণের আদেশ দেয় ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ মিলিটারী মেজর। বিক্ষুব্ধ জনতা ওই মেজরকে অকম্প হাতে পুড়িয়েও মারে। মিলিটারীদের চলাচলের পথে রাতের অন্ধকারে তারা গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করে, মিলিটারী যাতে সহজে চলাচল করতে না পারে সেজন্য নদী পারাপারের নৌকা ডুবিয়ে দেয়। জেলে বন্দী অংশুমান ওইসব উন্মত্ত, বিধ্বংসী, প্রতিবাদী ঘটনাগুলোর স্মৃতি চারনা করে। এই ঘটনাগুলো তার মনে দেখা দেয় টুকরো ছবির আকারে। কখনো তার মনে প্রতিরোধ ও আন্দোলনের ছবিগুলো ভেসে ওঠে, কখনো ভেসে ওঠে দয়িতা অনুরার সঙ্গে কাটানো মধুর মুহূর্তগুলোর ছবি। জেলে সে যাপন করতে থাকে ঘোরগ্রস্ত আচ্ছন্ন জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্টালিন মিত্রবাহিনীতে যোগ দিলে এদেশী কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ শাসকের পক্ষ অবলম্বন করে। কমিউনিস্ট পার্টির এই নীতিকে প্রবল ভাবে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা হয়েছে এ-উপন্যাসে। বনফুল নির্দেশ করেন যে ওই রাজনীতির পেছনে কোনো মহৎ আদর্শ নেই, এ-পার্টির কর্মীরা স্বার্থপর, সুযোগসন্ধানী। নীতিহীনতাই তাদের

Dhaka University Institutional Repository

নীতি । তিনি দেখান ধনিকদের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ ওই পার্টিকর্মীরা শ্রমিকদের পক্ষ নেয় । সমাজ বদলের কথাবলা ওই ঈর্ষাকে আবৃত রাখার একটি কৌশল মাত্র । তারা সুবিধাবাদী, নীতিহীন । তাই সুবিধামতো সরকার পক্ষে যোগ দেয়, আমলা হয়ে জনগণের ওপর কঠোর নিপীড়ণ চালায় । ১৯৪২-এ যখন পুরোদেশ বিক্ষোভে ও স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল, কমিউনিস্ট কর্মীরা তখন আত্মস্বার্থ পুরণে নিয়োজিত । তিনি দেখান কংগ্রেসকর্মী নীতিবাদী ও আপোষহীন। আগস্ট আন্দোলনে গান্ধীবাদী কর্মীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে, ধরা পড়েও শত অত্যাচারেও তারা সহযোদ্ধাদের নাম বলার জন্য মুখ খোলে না । অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টিকর্মী নীতিহীন ও আপোষ কর্মী । ইহজাগতিক সুখ সুবিধার জন্য সহজেই আদর্শ জলাঞ্জলি দেয় । বনফুল নির্দেশ করেন যে আধুনিক তরুণীদের কমিউনিস্ট পার্টি করা এক ধরণের ফ্যাশন মাত্র । তারা ওই পার্টি করে না বুঝে, অন্ধ অনুকরনের কারনে ; আর ছেলেরা করে সুবিধাবাদী চারিত্রের কারণে । এককালের কমিউনিস্ট অনুরার স্বীকারোক্তিতে বনফুল তাঁর নিজের ওই বিশ্বাস ও সংকীর্ণতা প্রকাশ করেছেন । এককালের কমিউনিস্ট অনুরা ডেপুটি গৃহিনী হবার পর বুঝতে পারে যে সে ওই পার্টি করতো পরশ্রীকাতরতার তাড়নায় । অনুরার স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে বনফুল সাম্যবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান । অনুরার স্বীকারোক্তি এমন :

> তোমাদের দলে যতদিন ছিলাম, ততদিন বুঝিনি, এখন কিন্তু ভাল করে বুঝতে পারছি যে আমার অন্তত কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা ছিল দেশ প্রেম নয়, আত্মপ্রেম । ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করার যে মুখস্থ বুলি আওড়াতাম তা পরশ্রীকাতরতার তাড়নায়, প্রোলেটারিয়েটদের প্রতি বেদনা বোধের তীব্রতায় নয় ।.... আমার বিশ্বাস, আজকাল এই যে দলে দলে ছেলেমেয়েরা বিশেষ-করে মেয়েরা কমিউনিস্ট হচ্ছে ওটা যতটা ফ্যাশানের খাতিরে, কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ততটা নয় ।....একটা কথা আমি বুঝেছি,...শ্রমিকদের উদ্দারের ছুতোয় যা করতাম, চলতি ভাষায় তার নাম - আড্ডা দেওয়া এবং অত্যন্ত বাজে কাজে সময় নষ্ট করা । তার মধ্যে ত্যাগ ছিল না, ছিল মুখোশপরা স্বার্থপরতা ।[৪০]

৪০° "অগ্নি" (বনফুল রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড) পৃ : ৩১-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

বনফুল বিশ্বাস করেন প্রাচীন ভারতীয় সমাজেই আছে প্রকৃত সাম্যবাদ, সাম্যবাদ খোঁজার জন্য রাশিয়ায় যাবার প্রয়োজন নেই। তার মতে ধনীকে শোষক বলে ডাকাও ভারতবর্ষের রীতি অনুসারে অশোভন, কারণ ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অনুরার জবানীতে বনফুল এই ধারণা ব্যক্ত করেন ঃ

> ...ধনী মাত্র পাজি, শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই জুয়াচোর এইনীতি প্রচার করা অন্য যে কোন দেশের পক্ষে শোভন হোক, ভারতবর্ষের পক্ষে নয়। যে হিন্দু ধর্ম ভারত বর্ষের গৌরব, পরমত সহিষ্ণুতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পতি শ্রদ্ধা যে হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য, সেই ভারত বর্ষের ধনী মাত্রেই পাজি - এই মত প্রচার করতে যাওয়া কি লজ্জাকর! ... হিন্দু ধর্মই প্রকৃত স্বাধীনতার ধর্ম। প্রকৃত সাম্যবাদ আত্মানুসন্ধী হিন্দু ধর্মেই আছে, অন্য কোন ধর্মে নেই, ... হিন্দু ধর্মই একমাত্র ধর্ম, যে প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগতআধ্যাত্মিক প্রেরণাকে শ্রদ্ধা করেছে, বেয়নেট উঁচিয়ে বলে নি - তুমি এই ইজমে বিশ্বাস করবে কি না, যদি না কর তা হলে তোমার বাঁচবার অধিকার নেই। এই সাম্য বোধই হিন্দু ভারতবর্ষকে আধি ভৌতিক জগতে দুর্বল করেছে হয় তো, সে নির্বিচারে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করতে পারে নি বলেই এ দেশে এত ধর্ম বৈচিত্র্য, এত মতানৈক্য।[৪১]

বনফুল এ-উপন্যাসে হয়ে উঠেছেন প্রাচীন হিন্দু ধর্মবাদী প্রতিক্রিয়াশীল।

---

৪১. "অগ্নি" (বনফুল রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড), পৃ ঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

দশম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিগত ক্লেদ-ব্যাধি ও রসাতলের বাস্তবতা

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে বাঙলা উপন্যাসে উপস্থাপিত বাস্তবতার প্রধান ধারাগুলোর স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে । আমরা দেখেছি এ-সময়ের ঔপন্যাসিকেরা ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করেছেন পল্লী জীবন ও সমষ্টি বাস্তবতা ,উদভ্রান্ত-অস্থির ও কামনা বিকার ঘোরগ্রস্ত জীবনের বাস্তবতা, নগর ও শহরতলীর জীবন বাস্তবতা, রাজনৈতিক বাস্তবতা । বাস্তবতার ওই এলাকাগুলো বাঙলা উপন্যাসে পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত হয়েছে এবং এই সময়ের প্রধান উপন্যাসগুলো বাস্তবতার উল্লেখিত এলাকাগুলোর কোনো না কোনোটি উপস্থাপন করেছে । তবে এ-সময় কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে যেগুলো প্রবণতায় ও পরিমানে বাঙলা উপন্যাসের প্রধান ধারার অন্তর্ভুক্ত নয় । কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে যেগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে ব্যক্তির আপাত শোভন বাহ্য জীবনের অন্তরালে লুকোনো ক্লেদ ও ব্যাধি এবং গুটিকয় উপন্যাস রচিত হয়েছে যেগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে রসাতল বা সমাজের নিম্নতম স্তরের আদিম জীবনের বাস্তবতা । ক্লেদ ও ব্যাধি, এবং রসাতলের বাস্তবতা উপস্থাপক উপন্যাস সংখ্যায় স্বল্প । তাই এ-দু'ধরনের উপন্যাস আলোচিত হলো একই পরিচ্ছেদে । উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বাহ্য জীবন শোভন মুখোশে আবৃত, কিন্তু তার ভেতরে লুকিয়ে আছে নানা ব্যাধি ও ক্লেদ । কিছু উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে ওই ক্লেদ ও ব্যাধির স্বরূপ ; মানুষের অন্তরালবর্তী রূপটি উন্মোচন করে দেখানো হয়েছে যে তা ক্লেদ-ব্যাধি-পঙ্কিল । এ-ধরনের উপন্যাস মানুষ সম্পর্কে ধারনাই বদলে দেয়, দেখিয়ে দেয় যে মানুষ অন্তর্লোকে অসুস্থ । অসুস্থতাই জীবনের সারকথা এরকম একটি বক্তব্য এ-উপন্যাস-গুলোতে প্রতিভাত হয় । এ-ধরনের উপন্যাসের পেছনে মানুষ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব সাধারণত থাকে। পাশ্চাত্য প্রাকৃতবাদী উপন্যাসগুলোতে তা দেখা গেছে, কিন্তু আমাদের ঔপন্যাসিকেরা এমন কোনো তত্ত্ব প্রয়োগ করেন নি । তত্ত্বহীন ভাবেই তাঁরা মানুষের অন্তরালবর্তী ক্লেদ-ব্যাধি উদঘাটন করেছেন । পাশ্চাত্যে রসাতলের অর্থাৎ সমাজের নিম্নতম স্তরের প্রায় আদিম মানুষের জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা ভালো ভাবে উদঘাটন করেছেন প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকেরা । তাদের ধারনা ছিলো রসাতলের মানুষদের মধ্যেই আদিম প্রবৃত্তিগুলোর খাঁটি রূপ পাওয়া যায় । রসাতলের মানুষেরা দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে বলে তারা সভ্যতার শোভনতার সীমা থেকে অনেক নিচে অবস্থান করে । এবং তাদের মধ্যে বিরাজ করে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলো । বাঙলায় যে কটি উপ-ন্যাসে রসাতলের বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো পাশ্চাত্য অর্থে খাঁটি প্রাকৃতবাদী উপন্যাস নয় ; তবে প্রাকৃতবাদী উপন্যাসের কিছু লক্ষণ সেগুলোতে রয়েছে । এ-উপন্যাসগুলোতে সমাজের নিম্নতম স্তরের ব্যক্তির আদিম রূপ উদঘাটিত হয়েছে । তারা আদিম কেননা তারা দরিদ্র, দারিদ্র্য সীমার অনেক নিম্নে অবস্থানের ফলে তাদের জীবন প্রবৃত্তি শাসিত ।

জগদীশ গুপ্তের "অসাধু সিদ্ধার্থ" (১৩৩৬) উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে একটি তরুণের ক্লেদাক্ত, প্রতারক জীবনের রূপ । ওই তরুণটির নাম নটবর । তার জন্ম ক্লেদের মধ্যে, সে বৈষ্ণবী বেশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের অবৈধ সন্তান । অসুস্থ প্রতিবেশে সে বেড়ে ওঠে এবং তরুণ হয়ে তাকেও ক্লেদাক্ত অসুস্থ জীবন গ্রহণ করতে হয় । কিছুটা প্রতিবেশের চাপে কিছুটা ওই জীবনের প্রতি তার আকর্ষণেই সে কলুষ ও প্রতারনাপূর্ণ জীবন গ্রহণ করে । মানুষকে নানা ভাবে প্রতারণা করাই হয়ে ওঠে তার জীবন । জন্মসূত্রে সে পায় ইতরামো করার প্রবণতা এবং তারে জীবন হয়ে ওঠে ধারাবাহিক ইতরতার সমষ্টি । নটবর দেখতে সুদর্শন এবং তার কণ্ঠ সুললিত । বাল্যকালে এক বাবুর অনুগ্রহে সে মুদি দোকানের ভৃত্য থেকে সখের থিয়েটারে সখী হবার সুযোগ পায় । তার উচ্চারণের গ্রাম্য দোষ দূর করার জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাকে 'তৈরী' করতে তৎপর হয় । তারা 'একখানি বর্ণপরিচয় কিনিয়া দিয়া তাহাকে পাঠ দিতে লাগিয়া গেল ।' তার মেধা ও আগ্রহ দেখে ওই বাবু তাকে স্কুলেও ভর্তি করে দেয়, তবে লেখাপড়ায় তার উন্নতি হইল ঢের কিন্তু মনের ইতরতা ঘুচিল না ।'[১] সুস্থ স্বাভাবিক জীবন তাকে আকৃষ্ট করে না, বরং সে আগ্রহ বোধ করে ক্লেদ কলুষময় জীবনে । অর্থলোভ তার জন্মগত । এবং সহজে অর্থবান হবার জন্য যে কোনো কুকর্ম করায় পশ্চাদপদ নয় সে । তরুণ বয়সে অর্থলোভে এবং সহজে ধনী হবার জন্য সে এক বৃদ্ধা বারাঙ্গনার শয্যা সহচর হয় । ওই বারাঙ্গনা মারা গেলে 'বৃদ্ধাকে হাসপাতালের

---

১. "অসাধু সিদ্ধার্থ", জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (প্রথম খন্ড) পৃঃ ১৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository

ডোমের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া তাহারই পরিত্যক্ত অর্থ মূলধন করিয়া সে শুরু করিল ব্যবসা।' প্রতারণা বা শঠতায় সে যেমন দক্ষ ও যোগ্য, ব্যবসা বা জীবিকা নির্বাহের কোনো বৈধ কাজে সে ততোখানিই অযোগ্য ও ব্যর্থ। ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকার জন্য সে চুরি করে, জোচ্চুরি করে, পাওনাদারদের টাকা না দিয়ে পালিয়ে যায়। সে বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী নয়। সে দুর্বল, অভিসন্ধিপরায়ণ। যে কোনো ব্যাপার থেকে সে স্বার্থ সিদ্ধি করার সুযোগ খোঁজে। পাওনাদার তার নামে মামলা করতে উদ্যত হলে সে পায়ে ধরে পাওনাদারকে নিবৃত্ত করে। এক গ্রামে কার্যোপলক্ষে গিয়ে এক বিধবা তরুণীকে তার প্রেমে পড়তে বাধ্য করে। আবার তাকে লেখা ওই তরুণীর চিঠিগুলোভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্য তুলে রাখে। পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে সে প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকায় পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সে পরিচিত হয় বায়ু বদলাতে যাওয়া পিতৃমাতৃহীন ধনীসন্তান রজত ও ভগ্নী অজয়ার সঙ্গে। নটবর সহজে ধনী হবার লোভে অজয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। বহুদিন আগে তার সঙ্গে পরিচিত ব্রতকর্মে আত্মউৎসর্গকারী জনৈক সিদ্ধার্থ বসুর পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করে। অজয়ার সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেলে সিদ্ধার্থের জনৈক আত্মীয়ের হস্তক্ষেপে নটবরের জালিয়াতি ধরা পড়ে। নটবর আবার পথে নামে।

পাশ্চাত্য প্রাকৃতবাদী উপন্যাসগুলোতে মানুষকে দেখা হয় একটি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। জোলা এবং অন্যরা দেখান যে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে দুই শক্তি—বংশগতি ও প্রতিবেশ, মানুষ এ-দুয়ের ক্রীড়নক মাত্র। "অসাধু সিদ্ধার্থ" উপন্যাসেও তেমন একটি তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যদিও এ-তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে অসচেতণভাবে। নটবর বা সিদ্ধার্থ তার পুরো জীবনে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে দুই অমোঘ শক্তি দ্বারা ; একটি হচ্ছে তার পরিবেশ ও পরিস্থিতি, অন্যটি হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইতরতা ও কুকর্ম প্রবণতা। বেশ্যার জারজ সন্তান নটবর মেধাবী, জীবনে সৎভাবে জীবন যাপন করার সুযোগও সে পায়, মহৎ তরুণ সিদ্ধার্থ সেনের সঙ্গে পরিচিত হবার পর জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও সে জানে, এবং তার মধ্যে জীবন সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসা, চিন্তা ভাবনা জেগে ওঠে। নিজের ক্লেদাক্ত জীবনের জন্য গ্লানি হয়। কিন্তু এ-সবই সাময়িক ব্যাপার মাত্র। ওইসব শুদ্ধ ভাবনা চিন্তাকে সরিয়ে দিয়ে ইতর ভাবনা চিন্তা তার মনকে অল্প সময়ের মধ্যে দখল করেনেয়। তার ওই শুদ্ধ ভাবনাচিন্তা হয়ে ওঠে সাময়িক বিকার মাত্র। তার অন্তর্গত প্রবণতা এর পরেই তাকে নতুন কোনো জোচ্চুরি, জালিয়াতি করার জন্য চাপ দিতে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে, নতুন কোনো নোংরামিতে জড়িত হতে অনুপ্রাণিত করে । আবার জীবন ধারনে অনিশ্চয়তা, ক্ষুধা, আকণ্ঠ ঋণও তাকে ঠেলে দেয় গভীর থেকে গভীরতর পাপের পথে । তার ঋণ-গ্রস্ততার সুযোগে পাওনাদার তাকে দিয়ে দুস্কর্ম করায় । সে আপত্তি জানালে আদালতে পাওনা টাকার জন্য নালিশ করার ভয় দেখায় । নিরুপায় নটবর ওই দুস্কর্ম করে দিতে বাধ্য হয় । এ-ভাবে তার জীবন হয়ে ওঠে 'দুস্কৃতি, অপকর্মের' সমষ্টি মাত্র । তার মধ্যে কখনো কখনো জাগে ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্ব । অজয়াকে ভালোবেসে শুদ্ধ ও সুন্দর হয়ে ওঠার সাধ হয় তার, 'সে কায়মনোবাক্যে সংশোধিত হইয়া খোলস ছাড়িতে চায়, সেই ক্ষণটি তার এখন উপস্থিত যে ক্ষণটি মানুষের জীবনে বিদ্যুতের মত একবার চকিতে দেখা দেয় - তাহারই আলোক যে ধরিয়া রাখিতে পারে জীবনে তার আলোর অভাব ঘটেনা ।'[২] পরক্ষনেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে স্বার্থ চিন্তা । তার মনে হয় 'এত গেল ভাবের কথা । অভাবের কথাটিও ভাবা চাই । টাকা নাই, কিন্তু দেনা আছে, তার ক্ষুধা আছে । এই যুগল মূর্তি প্রভুভক্ত কুকুরের মত এক মুহূর্ত তার সঙ্গ ছাড়িবে না । তাদের অশ্রান্ত চীৎকার তাকে কেবলই নরকের দিকে ঠেলিতে থাকিবে। কাজেই পলায়ন স্থগিত রাখিয়া সিদ্ধার্থ মাথা ঠান্ডা করিতে বসিল ।'[৩] জগদীশ গুপ্তের স্বভাব হচ্ছে মানুষের অন্তর্গত ইতরতার রূপ উন্মোচন করা; তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ মাত্রই ইতর । তাঁর পল্লী বিষয়ক উপন্যাসগুলোর পাত্রপাত্রীরাও স্বভাব ইতর । "অসাধু সিদ্ধার্থ" সমাজকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস এবং এ-উপন্যাসে উদঘাটিত হয়েছে একটি ব্যক্তির জীবনের ক্লেদ । জগদীশ গুপ্ত ওই ব্যক্তিটির হীন জীবনের মূলে দুটি শক্তির ক্রিয়া দেখিয়েছেন; একটি উত্তরাধিকার ও অন্যটি পরিস্থিতি । এ-দুশক্তির ক্রিয়ায়ই নটবর বা সিদ্ধার্থ পরিণত হয়েছে অপমানুষে । এ-উপন্যাসে জোলা ধর্মী প্রাকৃতবাদের আভাস লক্ষ করা যায় ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "কুয়াশা" (পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৩০-৩২) উপন্যাসের নায়ক প্রদ্যোত বসু যাপন করে দুই জীবন; একটি তার অতীত জীবন, তা কলুষময় ও ইতরামোতে পরিপূর্ণ, অন্যটি তার বর্তমান জীবন, তা শুদ্ধ ও সৎ জীবন । অতীত জীবনে প্রদ্যোত ছিলো জোচ্চোর ও শঠ।

---

২. "অসাধু সিদ্ধার্থ", জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ঃ ১৩৩ ।

৩. "অসাধু সিদ্ধার্থ", জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ঃ ১৪৫-৪৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

সৎ যে কোনো পেশার প্রতি ছিলো তার অনীহা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অসৎ যে কোনো পেশা বা দুষ্কর্মের প্রতি তার ছিলো প্রবল আকর্ষণ । নানা ভাবে লোক ঠকিয়ে অর্থ আয় করা ছিলো তার আনন্দ । নির্বোধ ধনীপুত্রদের সে ধীরে ধীরে জুয়া, মদ ও পতিতায় আসক্ত করে তুলে অর্থ আয় করতো । মানুষকে সর্বস্বান্ত করাই ছিলো তার নেশা । প্রয়োজনে সে জড়িত হয় জাল নোট তৈরির কুচক্রীদের সঙ্গেও । প্রদ্যোত যে সময় শুদ্ধ ও সৎ জীবন যাপন করছে ওই সময় সে স্মৃতিভ্রষ্ট । জালনোট তৈরি কালে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় অতিরিক্ত উদ্বেগে সে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যায় । এই জীবনে সে পরোপকারী, বিবেচক, হৃদয়বান ও সৎ । তার সঙ্গে একই মেসে বসবাসরত অমলবাবুর মৃত্যু ঘটলে অমলবাবুর বিপন্ন অসহায় মায়ের পাশে সে দাঁড়ায় পুত্রের মতো , সে প্রচুর টিউশনী করে অর্থ আয়ের উদ্যোগ নেয়, ওই টাকা দিয়ে ওই বিপন্ন পরিবারটিকে সাহায্য করে, এমনকী অমলবাবুর ছোট বোনের সঙ্গে তার প্রণয় সম্পর্কও স্থাপিত হয়। কিন্তু তার এই জীবনে একদিন অতীত জীবনের এক দোসর এসে হানা দেয়, নষ্ট হয় প্রদ্যোত বসুর শুদ্ধ, সুন্দর জীবন ধারনের স্বপ্ন । ওই শুদ্ধ সুন্দর জীবনের আততায়ী সে নিজেই। অতীত জীবনের ঋণশোধ করার জন্য সে আবার পথে নামে । এ-উপন্যাসে পাওয়া যায় ক্লেদ কলুষময় জীবনের পাশাপাশি শুদ্ধ সুন্দর জীবন যাপনকারী এক ব্যক্তির আখ্যান । যার মধ্যে দুই ভিন্ন সত্তা বিদ্যমান । ওই ব্যক্তির একসত্তা কলুষময় ইতরতা পরিপূর্ণ দুষ্কৃতিকারীর জীবনকেই সুখকর জীবন বলে গণ্য করে, আরেক সত্তা প্রথাগত সাধারণ সৎ জীবনকেই গণ্য করে সুখকর ও পুণ্যময় জীবন রূপে । পরিস্থিতির চাপে তার কলুষিত সত্তাটির জয় হয় । তবে এই উপন্যাসে কলুষিত সত্তাটির রয়েছে পরোক্ষে, ক্লেদব্যাধির বাস্তবতার পরিচয় বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপিত হয় নি ।

বনফুল তাঁর উপন্যাসে যে জগতের উপস্থাপনা করেন তা আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ, নৈতিক, স্বাভাবিক, কিন্তু বাহ্য শোভনতার আড়ালে ওই জীবনে আছে অনৈতিকতা ও কলুষ । ওই জীবনের প্রতিটি ব্যক্তি কলুষময় জীবন যাপন করে, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো গোপন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, যে রোগ সে অর্জন করে অনৈতিক জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে । যদিও বাহ্যিকভাবে তারা যাপন করে সম্মানিত সামাজিক জীবন, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবন নোংরামো ও অসুখে পরিপূর্ণ । বনফুল দেখান যে-ব্যক্তি গোপন শারীরিক অসুখে আক্রান্ত নয়, সে আক্রান্ত মনোবিকারে অর্থাৎ ওই মানুষগুলো কেউই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নয় । বনফুলের উপন্যাসে একজন চিকিৎসকের

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিতে মানুষকে দেখা হয় এবং তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে প্রতিটি মানুষই অসুস্থ । কিন্তু বনফুল ওই অসুস্থতার চিকিৎসক নন, প্রতিটি মানুষের অসুস্থতাকে নির্দেশের জন্যই তিনি ওই অসুস্থ ব্যক্তিদের রোগ উদঘাটন করেন । তিনি দেখান যে মানুষ বাহ্যিকভাবে যতোই শোভন ও সম্মানিত জীবন যাপন করুক না কেনো অভ্যন্তরে সে অসুস্থ ও অস্বাভাবিক । বনফুল প্রতিটি মানুষের ব্যাধি দেখিয়ে যেন বলেন - দেখো মানুষ কতো অসুস্থ । পাশ্চাত্য প্রকৃতবাদীরা মানুষের ব্যাধির উদঘাটন করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তারা সমাজদেহের চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেন । আর বনফুল বিদ্রুপ করেন মানুষ ও তার ব্যাধিকে । বনফুল জীবনের ওই খণ্ডিত বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা করেন না, তিনি ওই বাস্তবতাকে দেখেন বক্র দৃষ্টিতে এবং সেভাবেই উপস্থাপন করেন ।

বনফুলের "তৃণখণ্ড" (১৩৪২) উপন্যাসে খণ্ড খণ্ড ঘটনার মধ্য দিয়ে শহুরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পাত্রপাত্রীর ব্যাধি ও কলুষের রূপটি উপস্থাপিত হয়েছে । এ-উপন্যাসে রয়েছে একজন চিকিৎসক, যার কাছে আসে নানা ধরণের রোগী, তবে বনফুল সে সমস্ত রোগীদের বিবরণী বিশেষভাবে দিয়েছেন যারা সামাজিকভাবে নিন্দিত কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত । তারা কেউ সিফিলিস বা গনোরিয়া আক্রান্ত। ওই নারী পুরুষেরা বাহ্যিকভাবে সামাজিক শোভন জীবন যাপন করে, কিন্তু তাদের গোপন জীবন খুবই অশোভন ও অনৈতিক । বনফুল এ-উপন্যাসে ওই গোপন অশোভন, অনৈতিক বাস্তবতার রূপটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উদ্ঘাটন করেছেন । যেমন, পাঁচুগোপাল বসাক একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিকভাবে সম্মানিত কিন্তু সে গণোরিয়া আক্রান্ত। তার দেহ থেকে গণোরিয়া সংক্রমিত হয় স্ত্রীর দেহে । এতে স্ত্রীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে, গণোরিয়া আক্রান্ত স্ত্রীটি একটি কুৎসিত সন্তান জন্ম দেয়, যে জন্মের সাথে সাথে মারা যায় এবং স্ত্রীটির সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় । সে উন্মাদ হয়ে ওঠে এবং আত্মহত্যা করে । গ্রাম্য যুবতী আসমানি প্রেমিকের সঙ্গে সুখের আশায় গৃহত্যাগ করে কিন্তু বাধ্য হয় পতিতাবৃত্তি গ্রহণে । সে হয় সিফিলিসগ্রস্ত , এ-উপন্যাসে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা জেনে শুনে যক্ষারোগগ্রস্ত মুমূর্ষু পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে । তার ফলে জন্ম নেয় পাঙুটে, কুৎসিত 'চামচিকে'র মতো সন্তান । এ-উপন্যাসে তরুণী বিধবা জমিদার পত্নী সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে, গোপন গর্ভপাতের উদ্যোগ নেয়, যদিও সামাজিক জীবনে ওই জমিদার পত্নী ধর্মপরায়ণা, শুদ্ধশীলা নারী রূপে পরিচিত ।

Dhaka University Institutional Repository

"তৃণখণ্ডে" দৈহিক অসামাজিক ব্যাধিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তরা। তাদের একজন খাদ্যলোলুপ। মৃত আত্মীয়ের শয্যাপার্শ্বে রাখা দুধের গ্লাস থেকে দুধ ওই লাশের পাশে দাঁড়িয়েই তৃপ্তির সঙ্গে পান করে। তাদের একজন প্রেমবাতিকগ্রস্ত। সে মনে করে যে নারী তার দিকে তাকায় সেই তা প্রেমে পাগল। বনফুল মানুষের অমনুষ্যত্ব ও কামের কাছে আত্ম-সমর্পনের পীড়াদায়ক চিত্রও অঙ্কন করেছেন। এ-উপন্যাসে পিতা তার নিউমোনিয়াগ্রস্ত মুমূর্ষু পুত্রের শয্যাপার্শ্বে থাকার চেয়ে বেশি পছন্দ করে তার তৃতীয় স্ত্রীর শয্যায় থাকতে। পুত্র যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে তখন পিতা এবং তার তৃতীয় স্ত্রী সম্ভোগে মত্ত থাকে। বনফুল "তৃণখণ্ডে" মানুষের গোপন অনৈতিক, রুগ্ন জীবনের রূপ উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়ে-ছেন বাহ্যিক খোলসের ভেতরে এরা সবাই রুগ্ন ও পাপিষ্ঠ। বনফুল বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যৌনতার ওপর এবং দেখিয়েছেন মানুষ প্রধানত কামের শিকার। বনফুলের উপস্থাপনা রীতিটি নৈর্ব্যক্তিক নয়; বিদ্রূপ ও অ্যান্টিক্লাইমেক্সের ব্যবহারের ফলে তাঁর উপস্থাপিত বাস্তবতা হয়ে উঠেছে অনেকটা কৌতুককর, তা জীবনের গভীর সত্যরূপে উপস্থাপিত হয় নি।

বনফুলের "বৈতরণী তীরে" (১৩৪৩) উপন্যাসেরও উপজীব্য বিষয় জীবনের অন্ধকার দিক, বিকা[illegible] ক্লেদ। এ-উপন্যাসেও বাস্তবতার সকল অংশের অবিকল উপস্থাপনা ঘটে নি, স্মৃতি[illegible]রণার মধ্য দিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত রূপটি। সাধারণ জীবন বাস্তবতার পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না, শুধু মাত্র জীবনের বিকার, দুর্গতি, কলুষের রূপ এখানে চড়ারঙে আঁকা হয়েছে। বনফুলের এ-উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র প্রবৃত্তি-তাড়িত এবং পরিনামে তাদের অপঘাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়। তাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয় অপঘাতে। কেউ অফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে, কেউ খায় সায়ানাইড বা কলকে বিচি, কেউ রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করে, কেউ নিজে দেহে অগ্নিসংযোগ করে, কেউ গলায় দড়ি দেয়। এদের প্রত্যেকেরই জীবন বিপর্যস্ত হয় নানা সঙ্কটে। এরা প্রত্যেকেই এতো সংবেদশীল যে রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে কিংবা বাসনার অচরিতার্থতার কারণে এরা মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। জীবনের চেয়ে মৃত্যুই এদের কাছে আর্কষনীয় বলে গণ্য হয়।

ধনীবন্ধু দরিদ্র স্বামীর রূপসী স্ত্রীকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে স্বামীত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। স্ত্রী পরিত্যক্ত অপমানিত দরিদ্র স্বামী ওই বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে কলকে ফুলের বিচির বিষ পান করে। নিঃসম্বল জমিদার পুত্রের অসহায় তরুণী বিধবা স্ত্রী দেবর প্রণয়ীর

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে গৃহত্যাগ করে অবশেষে পতিতায় পরিণত হয় বহু পুরুষের তৃষ্ণা মিটিয়েও তার অতৃপ্তি এবং বেদনা ঘোচে না। সে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োয়। অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত বিপ্লবী তরুণ ভালোবাসে দলের তরুণী সদস্যাকে। সে জানতে পারে ওই তরুণী আবেগ বোধ করে তারই প্রিয় বন্ধুর প্রতি। ঈর্ষান্বিত ও আহত তরুণ বিপ্লবী সহযোদ্ধাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। বন্ধুর ফাঁসি হয়ে যাবার পর সে দেখে ওই তরুণী অকুণ্ঠ চিত্তে বিলেত ফেরত আই,সি, এসকে বিয়ে করে সুখী জীবন যাপন করে চলে। অনুতপ্ত তরুণ জর্জরিত হয় অপরাধবোধে, নিজের জন্য সে গ্রহণ করে কষ্টকর মৃত্যুর পথ, সে সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে। নিজের দেহে বার্ধক্যের লক্ষণ দেখে মধ্যবয়সী সুদর্শন ধনী হৃদপিণ্ড বরাবর গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করে। সে মাথায় গুলি করেনি এজন্য যে তাতে তার সুন্দর চেহারাটি বিকৃত হয়ে যাবে। সে এতোই বিকারগ্রস্ত যে প্রাণের চেয়েও তার কাছে দৈহিক সৌন্দর্য গুরুত্বপূর্ণ। মৃত অবস্থায় বিনিদ্র চিকিৎসকটির কাছে সে তার আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে যে স্বীকারোক্তি করে তা এমন :

> ... আমি প্রেমে পড়ে মরিনি। আমি মরেছি আপন খুশিতে সজ্ঞানে বহাল তবিয়তে। ... জীবনে কখনো কোনো ব্যাপারে হার মানিনি। ... প্রেমের ব্যাপারেও চিরকাল জিতেছি। পেটের জন্যেও কারও কাছে হাত পাতবার দরকার হয় নি। ব্যাচিলার মানুষ আনন্দেই ছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি ... দু-একগাছা চুল পেকেছে। সমস্ত সকালটা মন খারাপ হয়ে রইল। খবরের কাগজে মন দিতে পারলাম না। বন্ধুরা এলেন। আলাপ জমল না। দিনটা একরকম কাটল। রাত্রে কিন্তু ওই পাকা চুল দুটো বড় জ্বালাতন করতে লাগল। যেই একটু ঘুম আসে, অমনই মনে হয়, যেন মাথার পাকা চুল দুটো সাদসাদা প্রেত মূর্তির মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, ওহে ভাগ্যবান ধনীর দুলাল, এইবার তো সময় হল। এইবার হার মানতে হবে। আর দেরি নেই। ঘুম হল না। এমনই প্রায় রোজ। আমাদের বাড়ির পাশে একজন থুড়থুড়ে বুড়ো থাকত। একদিন স্বপ্নে দেখলাম, সে যেন বলছে, "কিহে ছোকরা, ভারি যে আমাকে অনুকম্পা করতে ; এইবার ?' বলছে আর হাসছে।"

Dhaka University Institutional Repository

.... আমারও মনে হল, এই তো আমারও 'নোটিস' এসে গেছে । এইবার যম কোনদিন এসে চুলের মুঠিটা ধরবে । তারপর শুরু হবে টানাটানি । একদিকে ধরবে আত্মীয়-স্বজনরা, আর একদিকে যমদূতরা । সেই টানাটানির মধ্যে দারুন যন্ত্রনায় প্রাণটা বেরিয়ে যাবে । অসহ্য । এ চিন্তাও অসহ্য । শেষ-কালে জরার কাছে পরাভব স্বীকার করব ? কেন স্বীকার করব - রিভলবার থাকতে ? ... ভাল করি নি ?" হাসিমুখে ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন । "মাথায় গুলি করি নি । তার কারণ, আমার এমন সুন্দর চেহারাটা নষ্ট করতে মায়া হল । আচ্ছা, দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমার মুখের চেহারা ঠিক আছে তো ?"[৪]

বিবাহিতা নারী একতরফাভাবে পরপুরুষে আসক্ত হয়, ওই পুরুষটিকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয় । সে বিবাহিত জেনেও তাকে ভালোবাসে প্রতিবেশী জনৈক কবি । ওই কবি তাকে প্রেম নিবেদন করলে সে রুক্ষ ভাষায় কবিকে প্রত্যাখ্যান করে । কবি যেমন প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রনা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে,তেমনি ওই বিবাহিত নারীও প্রত্যাখ্যান ও উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে দেহে অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যা করে । বনফুলের জগতে কোনো কিছুই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ঘটে না । বিবাহিত নারী স্বামীকে ভালোবাসতে পারে না স্বামীর ভালোমানুষ স্বভাবের জন্য, সে ভালোবাসতে চায় শক্তিমান নিষ্ঠুর পুরুষকে । নিষ্ঠুরতা ও শক্তিকেই সে গণ্য করে পৌরুষ রূপে । বনফুলের জগতের প্রতিটি ব্যক্তি বাসনার অচরিতার্থায় আত্মহননের পথ বেছে নেয় । এভাবে তারা সমাধান করে সকল অসঙ্গতি ও অপূর্ণতার । "বৈতরণী তীরে" উপন্যাসে বনফুলের লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের একরাশ অস্বাভাবিকতার রূপ উপস্থাপন করা । তাই তিনি এমন একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন যে কৌশলের সাহায্যে কয়েকটি মানুষের অপমৃত্যুর কারণ ও প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে । তবে এ কৌশল বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত নয়, এ কৌশলে অতিরঞ্জিত অস্বাভাবিকতাই আকর্ষনীয় রূপে বর্ণনা করা সম্ভব । "বৈতরণী তীরে" উপন্যাসে তাই হয়েছে । জীবনের সত্য এ-উপন্যাসে হয়ে উঠেছে কৌতুককর ।

বনফুলের "রাত্রি" (১৯৪১) কামতাড়িত দুইনারী-মা ও তার কন্যা রাত্রির উপাখ্যান । রাত্রির মা তরুণী বয়সে স্বামী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায় একজনের সঙ্গে । তারা

৪. "বৈতরণী তীরে" (বনফুল রচনাবলী প্রথম খণ্ড), পৃ : ১০৬-১০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহিত হয় না, তবে তাদের দীর্ঘকাল সহবাসের ফলে জন্ম নেয় দুটি সন্তান সূর্যেন্দু ও রাত্রি। ওই পুরুষের সঙ্গে বসবাসেও একসময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে প্রথম পক্ষের সন্তানের জন্য অনুতাপ জাগে, তাই সে রাত্রি সূর্যেন্দুকে ছেড়ে ফিরে যায় স্বামীর কাছে। রাত্রি ও সূর্যেন্দু ভাই-বোন হলেও দুজনের দৈহিক কাঠামো ও গাত্রবর্ণ ভিন্ন। রাত্রির জন্মের আগে তার মা মাদ্রাজী খ্রিস্টান ড্রাইভার কার্নান্দিজকে নিয়ে দেবদর্শণ করতে গিয়ে সেখানে দুরাত্রি যাপন করে আসে। রাত্রির গায়ের রঙ ও শারীরিক কাঠামোর সঙ্গে ওই ড্রাইভারটির গায়ের রঙ ও শারীরিক কাঠামোর সাদৃশ্য স্পষ্ট। রাত্রির মা স্বামীর কাছে ফিরে গেলে তার উপস্বামী সূর্যেন্দু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এবং রাত্রি ও সূর্যেন্দু যাপন করতে শুরু করে অস্বাভাবিক জীবন।

রাত্রির গায়ের রঙ কালো হলেও তার সৌন্দর্য ও স্বভাব রহস্যময়। তাই বহু পুরুষ তাকে সম্ভোগ করতে চায়। রাত্রি কারো বাসনা পরিতৃপ্ত করে, কাউকে প্রত্যাখ্যান করে। রাত্রি আকৃষ্ট হয় জ্যোতির্ময়ের প্রতি; তবে জ্যোতির্ময় সবিতা নামের আরেক তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হলে রাত্রি অনেক ছলনা করে জ্যোতির্ময়কে নিয়ে বোম্বাই পালিয়ে যায়। জ্যোতির্ময় সন্তান সম্ভবা রাত্রিকে ফেলে প্যারিসে চলে যায়। জ্যোতির্ময় রাত্রির মায়ের প্রথম পক্ষের সন্তান, তাদের পিতা ভিন্ন হলেও মা অভিন্ন। তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই লিপ্ত হয় অজাচারে। জ্যোতির্ময় চলে যাবার পর রাত্রি কিছুদিন জীবন যাপন করে অবনীশের সঙ্গে, অবনীশও তাকে ত্যাগ করে। রাত্রিকে অবশেষে বিয়ে করে তার প্রতি গভীর অনুরক্ত এক তরুণ চিকিৎসক। রাত্রির একটি পুত্র সন্তান জন্মে, ওই সন্তানের পিতা জ্যোতির্ময়। সন্তানটি রাত্রির কাছে বোঝা হয়ে ওঠে এবং আকস্মিক অসুখে একদিন মারা যায়, রাত্রিও স্বামীকে ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। রাত্রির জীবনের মতোই অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে তার ভাই সূর্যেন্দু। সে পরীক্ষায় ভালো ফল করেও কোনো কাজ জোটাতে ব্যর্থ হয়, এবং ভুগতে থাকে নানা বিকারে। পরিশেষে সে একটি খুন করে; এই খুনের মধ্য দিয়ে বিমোক্ষণ ঘটে তার অবদমিত ক্রোধ ও হতাশার। "রাত্রি" উপন্যাসে দুটি নারীর – মাতা ও কন্যার কাম স্বেচ্ছাচারিতার রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক এর পেছনে কোনো সুস্পষ্ট তত্ত্ব প্রয়োগ করেন নি, তবে মাতা ও কন্যার আচরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাদের এই কাম স্বেচ্ছাচারিতা জন্মলব্ধ এবং তা মাতা থেকে কন্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে সংক্রমিত হয়। তবে বনফুলের দৃষ্টি অগভীর। তিনি এই কাম স্বেচ্ছাচারিতার মূল উদঘাটনের বদলে শুধু ওই কাম স্বেচ্ছাচারিতার কথা উল্লেখ করেন, তিনি বিশদ বিবরণও দেন না। তাই "রাত্রি"

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে কাম স্বেচ্ছাচারিতাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, বরং মনে হয় দুটি নারীর কল্পিত কাম জীবন নিয়ে আকর্ষণীয় গল্প ফাঁদা হয়েছে ।

এ-সময় কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়েছে যেগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে সমাজের নিম্নতম স্তর বা রসাতলের (Lower Depths) জীবন বাস্তবতা । পাশ্চাত্যে প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকেরাই প্রধানত রসাতলের জীবন বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপক (দ্রষ্টব্য ৩.১; ৩.২; ৩.৩)। প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকেরা এ-শ্রেণীর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন মানুষের আদিম পাশবিক রূপটি । বাঙলা ভাষায় খাঁটি প্রাকৃতবাদী উপন্যাস রচিত হয় নি , রসাতলের জীবন বাস্তবতাও বিশেষ উপস্থাপিত হয় নি; তবে তিনটি উপন্যাসে রসাতলের জীবন বাস্তবতার রূপ কিছু পরিমানে উপস্থাপিত হয়েছে । এগুলো হচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "পাঁক" (১৯২৪), "উপনায়ণ" (?), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মা নদীর মাঝি" (১৯৩৮) ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "পাঁক" (১৯২৪) উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে বস্তি জীবন । কলকাতা শহরের এক প্রান্তের মুচিপাড়া ও মেথর বস্তির প্রেক্ষাপটটি এ-উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো সুসংবদ্ধ পরিণামমুখী কাহিনী এ-উপন্যাসে নেই । ওই বস্তিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবন, অনিশ্চিত কর্ম জীবন, মালিক কর্তৃক শোষণ, বস্তিবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় খণ্ড খণ্ড ঘটনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে । ওই জীবন চরম দারিদ্র্য গ্রস্ত । ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত ওই বস্তির নারী পুরুষগুলো, শিশুদেরও কোনো না কোনো ভাবে অর্থ আয়ের জন্য ওই জীবনে চাপ দেয়া হয় । বস্তির পরিবেশ শ্বাসরুদ্ধকর, ঘিনঘিনে । কদর্য কলহ ওই জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে, এক নারী প্রতিবেশী অন্য নারীর সঙ্গে লিপ্ত হয় কুৎসিৎ কলহে । সবমিলিয়ে ওই মানুষগুলো মানবিকভাবে এতোই অবনতিগ্রস্ত যে তারা অনেকটা পশুর স্তরে অবস্থান করে । ওই রসাতলের পাশবিক জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে "পাঁক" উপন্যাসে । বস্তির জীবনের বিভীষিকা চিত্রনের জন্য তাদের ঘর বাড়ি প্রাত্যহিক জীবন কলহ ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে । বস্তির ঘরগুলো সংকীর্ণ, স্থানাভাব তাতে তাতে প্রকট । বর্ষায় বস্তির পরিবেশ হয়ে ওঠে নারকীয় ।

> বর্ষায় সমস্ত মুচিপাড়াটার এমন অবস্থা হয়েছিল যে এক পাও কাদায় না পড়ে যাবারউপায় ছিল না । অধিকাংশ ঘরের ভেতরকার অবস্থা বাইরের চেয়ে বিশেষ ভাল ছিল না । সমস্ত মাটির মেঝে ফুঁড়ে জল ওঠার দরুণ

Dhaka University Institutional Repository

> ঘরের মধ্যে শোয়াবসা অসম্ভব হলেও উপায় তা ছাড়া নেই । পুকুরের পাশেই যাদের ঘর, বৃষ্টির জলে পুকুর ভরে উঠে তাদের বাড়ির ভেতর পর্যন্ত চড়াও হয়েছে । চারিদিকে পচা গাছপালার একটা দুর্গন্ধ, বাতাস ভারী করে তুলেছিল । তারিমাঝে উলঙ্গ গুটিকতক ছেলে মেয়ে ময়লা দেহে কাদায় গড়াগড়ি করে খেলা করছিল ।[৫]

প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহের মধ্য দিয়ে ওই বস্তিবাসী নারীরা দিন শুরু করে । তারা রূঢ় ভাষায় পরস্পরকে আক্রমন করে । কুৎসিত গালিগালাজ করা, পরস্পরকে নানাভাবে খোঁটা দেয়া, অভি-সম্পাত করা ওই কলহের বৈশিষ্ট্য;

> তিনকড়ির বৌ কেউটের মত ফোঁস করে উঠে বললে, 'কে গলাগলি করতে যায়, কে ? আমার কি মরবার দড়ি কলসি জোটে না, উই শতেক-খোয়ারীর সঙ্গে গলাগলি করতে যাব ?' কালাচাঁদের বোন পাঁচি, এতক্ষণ চৌকাঠের উপর বসে মুখ ফিরিয়ে পচা পুকুরের দিকে চেয়েছিল, এই মুখ ভেংচে বললে, 'না, গলাগলি করতে যাবি কেন ? "ও পাঁচি, দুটো পয়সা দিতে পারিস ? ও পাঁচি দুটো বেগুন ধার দিবি ?" - তখন যে সোহাগ আর ধরে না, আজ সকালে যে নেকী সেজে চাল চেয়ে নিয়ে গেছিস । এখনো যে ভাত হজম হয় নি । আবার ফুটানি করিস কিসের ?' ঝগড়া হলেই এই ধারের খোঁটাটা পাঁচি প্রত্যেকবার দেয়, খোঁটাটাও সত্যি, তাই বড় লাগে । তিনকড়ির বৌ ক্ষেপে উঠে সকলের দিকে চেয়ে বললে, 'শোন তোমরা গো সবাই এক কুনকে চাল দিয়ে - তাও ধার, ভালো খাকীর খোটা শোন । তবু যদি তোর নিজের ঘর থেকে দিতিস পাঁচি - তবু যদি না ভায়ের ঘরের ঢেঁকি হতিস । ভাই এর ঘরে ঢেঁকি হয়ে থাকার লজ্জাটা পাঁচি নিজেই বড্ড বেশী করে বুঝত, তাই এই নিদারুণ খোঁটাটা তাকে পাগল করে তুললে । প্রায় কাঁদকাঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে বললে, 'তোর

---

৫ "পাঁক", (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড), পৃ : ১১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

> বাবার কিরে মাগী ? আমি আমার ভাই-এর ঘরের ঢেঁকি আছি তাতে তোর বাপের কি ? তোর বাপের খাই আমি, না পরি ? আ বেহায়া, লজ্জাও হয় না । ধার করে খেয়ে, কোঁদল করতে আসিস । মর মর, গলায় দড়ি দে ।' তিনকড়ির বৌ এর উপযুক্ত জবাব দিলে, 'আমি মরতে যাব কেন লা, কিসের দুঃখে, আমি তো আর ভাতারের মাথা খেয়ে তিনকুল পুড়িয়ে বসে নেই ডাইনি থুবড়ি হয়ে । যে মরলে সকলের হাড় জুড়োয় সে মরুক ।'[৬]

অধিকাংশ পুরুষই মুচির কাজ করে, তাতে পরিবারের সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তির অর্থও হয় না । অনেকে যায় দিন মজুরের কাজে, সেখানে নানাভাবে শোষিত হয় তারা । খুব ভোরে 'নোংরা কানি পরা' বস্তির শিশুরা 'টুকরি হাতে' বেরিয়ে পড়ে, 'ছায়ের গাদায় আর টিনের ঘেরা জঞ্জালের স্তূপে' তারা 'আবর্জনার সম্পদ' সন্ধান করে । ওই আবর্জনা কুড়ানো শিশুদের মধ্যেও আছে নানা বিধি বা নিয়ম পালনের প্রবণতা :

> ....প্রথম নিয়ম, আগে যে রাস্তা যারা নেবে সে রাস্তা তাদের । কারুর বা মৌরশী রাস্তা আছে । রাস্তার চৌমাথাগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করা । একজনদের মোড় আরেকজনরা নিতে পারে না। নিজেদের ভেতর তাদের আইন যে-বাবু একজনকে পয়সা দিয়েছে, তাকে সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে। না দেখালে হর-তাল তার সঙ্গে। তাদেরও বিধি আছে,যথা-ময়লার গাদায় হাত দেবার আগে যদি কাকের ডাক শোনা যায় তা হলে কিছু মিলবে না । যে রাস্তায় ধুলোয় পাখির পায়ের দাগ সে রাস্তা অপয়া । বাদলার দিন বাবুরা বেশি পয়সা দেয় ।[৭]

কেউ কেউ ভিক্ষা করতে বেরোয়, কোনো কোনো কিশোরী মেয়ের কোলে থাকে ছোট ভাই । ভিক্ষা করার বিচিত্র কৌশল তাদের আয়ত্তে । কম বয়সের বাবু দেখলে তারা যে কৌশলে ভিক্ষা চায় বেশি বয়সের বাবুদের কাছে সে কৌশল ব্যবহার করে না । কম বয়সের বাবু দেখলে বলে 'বাবু, তোমার রাঙা বউ আসবে, বাবু তোমার গোড় লাগি, রাঙা ছেলে হবে বাবু-' একটু বেশি বয়স

৬· "পাঁক", (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড), পৃ : ৬৫-৬৬ ।

৭· "পাঁক", (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড), পৃ : ৯৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

দেখলে ... বলে -'বাবু' এই বাচ্চার জন্য এক পয়সার মুড়ি কিনব বাবু, সারা দিন খায়নি বাবু, দুধের বাচ্চা বাবু, বাবু তুমি রাজা হবে ... ।'[৮] ওই বস্তির জীবনে আছে পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস । ভিক্ষা করে অর্থোপার্জনের জন্য শিশুদের চাপ দেয়া হয় পরিবার থেকে । কোনো কোনো দিন কেউ কেউ ভিক্ষা লাভে ব্যর্থ হলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে কারণ ভিক্ষা না পাবার কথাটি পরিবারের কেউই বিশ্বাস করবে না বরং শিশুটি ওই অর্থ আত্মসাৎ করে ফেলেছে মনে করে শিশুটিকে নানাভাবে প্রহার করা হবে । ওই জীবনে শিশুরাও পরস্পরের প্রতি মমতাহীন । তারা ক্রূর এবং স্বার্থ সচেতন । বস্তিবাসী কিশোর বয়সী ভাইবোন শশী আহলাদির আচরণে এ-সত্যই ধরা পড়ে :

> বাদলার দিন । তবু প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেলেও আহলাদী কিছু পায় নি । টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল । ট্রাম থেকে নেমে ব্যস্ত ভদ্রলোকেরা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছিল । নিজের নোংরা আঁচলটা দিয়ে কোন রকমে শিশু ভাইয়ের মাথাটা ঢেকে বৃষ্টির মাঝে আহলাদী ছুটোছুটি করছিল, এমন সময় শশী এসে জিজ্ঞেস করলে, 'ঘরকে যাবি নি ? আহলাদী বললে 'না, তুই যা'। শশী কৌতূহলী হয়ে বললে, 'কিছু পাসনি বুঝি ?' 'তোর সে খোঁজে কি দরকার ? তুই কি পেয়েছিস ?' শশী ট্যাক নেড়ে তিনটে পয়সা বার করে দেখালে । ছোঁমেরে একটা পয়সা কেড়ে নেবার বিফল চেষ্টা করে আহলাদী বলকে, 'একটা পয়সা দে না ভাই, সেই সকাল থেকে হাবু কিছু খায় নি ।' হাত পাঁচেক সরে গিয়ে শশী বললে, ' আহা হা আবদার আর কি । নিজের পয়সায় খাওয়াও না ।' লজ্জার সঙ্গে আহলাদী স্বীকার করলে যে, সে একটা পয়সাও পায় নি । শশী কিন্তু পয়সা না দিয়ে চলে গেল ।[৯]

প্রেমেন্দ্র মিত্র ওই রসাতলের জীবন বাস্তবতার নিরপেক্ষ ও নির্মোহ উপস্থাপক নন । ওই রসাতলের মানুষগুলো যে জীবন যাপন করে তা কদর্য্য, অপরিমেয় দারিদ্র্য ও নিস্ঠুরতা পরিপূর্ণ । ওই জীবনের উপস্থাপনা মাত্র তাঁর লক্ষ্য নয়, তিনি দেখাতে চান ওই রসাতলের মানুষদের

---

৮. "পাঁক", (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড) পৃ : ৯৬ ।

৯. "পাঁক", (প্রেমেন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড) পৃ : ৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্গত মহত্ত্ব, কোমলতা, প্রণয় আবেগ ইত্যাদি। তিনি দেখাতে চান ওই পাঁকের পোকাদের মধ্যেও মানবিক মহত্ত্ব বিরাজমান।[১০] অনটন, ক্ষুধা, দুর্গতি, হানাহানির মধ্যে মনুষ্যত্ব বর্জিত পাশবিক জীবন যাপন করলেও কখনো কখনো তাদের মধ্যে ঝলসে ওঠে মানবিক উচ্চ গুণ রাশির উপস্থিতি দেখিয়েছেন তা একান্তই মধ্যবিত্ত সুলভ। তাদের প্রণয়াবেগ জ্ঞাপনের ধরণ, আবেগের টানাপোড়েন, উপলব্ধি সবকিছুই মধ্যবিত্ত সুলভ।

বর্ষণমুখর রাতে মজুরনারী নেত্যর মানসিক অবস্থা :

> উল্কি কাটা বাইশ বছরের মেয়েটা ঘুমোতে পারছিল না। টিনের চালে বৃষ্টির মাতামাতি তাকে বিশেষ বিরক্ত না করলেও তার ঘুম আসছিল না। বাইশ বছরের মেয়ের মনে অনেক স্বপ্ন, অনেক গানের ভিড় - বিশেষত বর্ষা রাতে।[১১]

বোনের জন্য একটি কাপড় ধার চাইতে আসা মজুর কালাচাঁদের সঙ্কোচ ও বেদনা দেখে নেত্যর মনে জাগে এমন অনুভূতি :

> খোঁচা না দিয়ে যে কোনদিন কথা কয় নি তার মুখের এই সঙ্কোচে নেত্যর কিন্তু গলা ধরে যাচ্ছিল কান্নায়। লোভ হচ্ছিল এই নির্জন ঘরে একবারটি ওর পায়ের কাছে মাথা রেখে বলে - তুমি আমায় ঠাট্টা কর, গাল দাও যা খুশী তাই বল, কিন্তু অমন কাঙালপনা করো না, আমি সইতে পরি না।[১২]

কালাচাঁদকে নেত্য আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ জানায় এমন ভাষায় :

> একটা বড় শাল পাতার ঠোঙায় মুড়িমুড়কি আর বেগুনি ফুলুরি নিয়ে ঘরে ঢুকে নেত্য কালাচাঁদের কাছে রেখে বললে - 'খাও'। 'নইলে আমার মাথা খাও - খেতেই হবে।'[১৩]

"পাঁক" উপন্যাসে বস্তি জীবনের বাহ্যিক বর্ণনা সামাজিক রসাতলকে কিছু পরিমানে তুলে ধরেছে, তবে এটি খাঁটি রসাতলের উপন্যাস হয়ে ওঠে নি। কারণ এ-উপন্যাসের চরিত্রগুলো পুরোপুরি আদিম নয়। তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সুলভ নানা আবেগ রয়েছে।

---

১০. বুদ্ধদেব বসু, 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড) পৃঃ ৫৫৭

১১. "পাঁক", পৃ : ১০।

১২. "পাঁক", পৃ : ১২।

১৩. "পাঁক", পৃ : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "উপনায়ণ" (১৯৩৩) উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তরুণ সন্ন্যাসী অমৃতানন্দের অতীত জীবন, যে-জীবন তার বর্তমান জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে এখন শুদ্ধ পবিত্র ও নির্মল জীবন যাপন করছে, কিন্তু তার অতীত জীবন হচ্ছে রসাতলের জীবন, যেখানে দারিদ্র্য অনৈতিকতা, মনুষ্যত্বহীনতা ছিলো স্বাভাবিক। প্রেমেন্দ্র মিত্র সন্ন্যাসী অমৃতানন্দকে পঙ্কজ রূপে উপস্থাপিত করেছেন, তাঁর লক্ষ্য পঙ্কে কী-ভাবে পদ্ম বিকশিত হয় তার চিত্র রচনা, তবে এ-উপন্যাসে রসাতলের জীবনেরও বর্ণনা রয়েছে। সন্ন্যাসী অমৃতানন্দের আসল নাম বিনু। সে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান, তার পিতা নিম্নচাকুরিজীবী, মদ্যপ, দায়িত্বহীন, নিষ্ঠুর, জুয়ারী অর্থাৎ সমস্ত সামাজিক পাপে সে লিপ্ত। দারিদ্র্যবশত ক্রমশ তাদের শ্রেণী অবনতি ঘটে, নিম্নবিত্ত থেকে তারা বিত্তহীন হয়ে পড়ে। তারা হয় বস্তিবাসী। পিতার জেল হয় এবং মাতা আত্মহত্যা করে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করে। অনাথ বিনু আশ্রয় পায় ঠগ নকুড় দাসের কাছে। নকুড় দাস গঙ্গার তীরে পরিত্যক্ত এক কোঠায় স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করে। এখানে শুরু হয় বিনুর রসাতলের জীবন, যে-জীবনে কোনো সুস্থতা নেই। নকুড় দাসের সঙ্গে সে প্রতিরাতে সরকারি বাগানের সবজি আনাজ চুরি করে, দিনের বেলা নকুড় দাসের সঙ্গে মাতৃহীন পুত্র রূপে ভিক্ষা করে, কিছুদিন ট্রামে পিতৃহীন দায়গ্রস্ত পুত্র সেজেও ভিক্ষা করে। প্রেমেন্দ্র মিত্র বিনুর এই জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তবে রসাতলের বাস্তবতার বিস্তৃত রূপ উপস্থাপন প্রেমেন্দ্র মিত্রের লক্ষ্য নয়, এই রসাতল থেকে বিনুর উত্তরণ বর্ণনাই তাঁর লক্ষ্য। এর ফলে উপন্যাসটির বাস্তবতা-নিষ্ঠা ক্ষুন্ন হয়েছে; বিনুর সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ হয়ে ওঠা খুবই আকস্মিক ঘটনা। বিনুর হওয়ার কথা ছিলো রসাতলের আদিম অধিবাসী, কিন্তু সে হয়ে উঠেছে অমৃতানন্দ। এর ফলে লেখকের রোম্যান্টিক মনোবৃত্তির জয় হয়েছে, বাস্তবতার নির্মমতাকে বর্জন করে তিনি গ্রহণ করেছেন অবাস্তবতার অমৃত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মা নদীর মাঝি" (১৯৩৮) উপন্যাসের বাস্তবতা দু-ভাগে বিভক্ত : এর ভিত্তি-ভূমিতে রয়েছে পদ্মা-তীরবর্তী একটি জেলে পল্লীর রসাতলের বাস্তবতা এবং এর ওপর-ভূমিতে রয়েছে পদ্মা ও প্রেমের রোম্যান্টিক সৌন্দর্য। উপন্যাসটির প্রথম তিন পরিচ্ছেদ জুড়ে কেতুপুর নামক জেলে পল্লীর ও উপন্যাসের নায়ক কুবেরের জীবনের যে-বর্ণনা রয়েছে, তাতে রসাতলের বাস্তবতার রূপটি প্রাকৃতবাদী রীতিতেই উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসে জেলে জীবনের বিস্তৃত ব্যাপক দলিল রচনা করেন নি,

Dhaka University Institutional Repository

তাই চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকেই তিনি সরে গেছেন ওই বাস্তবতা থেকে। উপন্যাসে কপিলার প্রবেশের পর রসাতলের বাস্তবতা ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছে রোমান্টিক বাস্তবতায় এবং হোসেন মিয়ার প্রবেশের পর ওই বাস্তবতা রূপান্তরিত হয়েছে রহস্যময়তায়। তবে "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসে প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ জুড়ে সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ ও তাদের জীবনের বাস্তবতার যে রূপ উপস্থাপিত হয়েছে, বাঙলা উপন্যাসে তার তুলনা দুর্লভ।

"পদ্মা নদীর মাঝি"র প্রধান চরিত্র কুবের। সে জেলে, তবে তার নিজস্ব নৌকা ও জাল নেই। সে ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরে, মাছের চার ভাগের এক ভাগ সে পায়। কুবের 'গরিবের মধ্যে সে গরিব' ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক।... তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।'[১৪] কুবের বিবাহিত, তার স্ত্রীর নাম মালা। মালা পঙ্গু, তার 'একটা পা ... হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া' গেছে। 'কেতুপুরের দশ মাইল উত্তরে চরডাঙা গ্রামের এমনি এক কুটীরে তার মায়ের এক বামুন ঠাকুরের নামে কানাকানি করা পাপের প্রমান স্বরূপ এই ভাঙা পা-টি লইয়া সে জন্মিয়াছিল।' পঙ্গু বলে মালা যাপন করে স্থবির জীবন। তবে দুরন্ত পুত্রদের প্রতি সে বোধ করে পাশবিক বাৎসল্য। সারাদিন দুরন্তপনার পর পুত্রেরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এলে পুত্রদের সঙ্গে মালা এরকম আচরণ করে :

> মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়, একছেলের মুখে নুন গুঁজিয়া রাখিয়া আর দুজনকে ভাত মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিয়া খাওয়ানোর শখ মালার একার নয়, এমনি ভাবে খাওয়াইয়া না দিলে ওরা খাইতে চায় না। আর হ, মালা রূপকথা বলে। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়, তাই এ-সময়টা সে যে কত বড় নিখুঁত ভদ্রমহিলা, অসামঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়। লখা ও চণ্ডী উলঙ্গ, চকচকে ভিজা-ভিজা গায়ের চামড়া, ডিবরির শিখাটি ঊর্ধ্বগ ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরে চাল পচা শণের, চারি পাশের দেয়ালে চেরাবাশের স্যাঁতসেতে ঢেউতোলা, মাটির মেঝে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার।[১৫]

---

১৪. "পদ্মা নদীর মাঝি" (মানিক গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড), পৃ : ৭।

১৫. "পদ্মা নদীর মাঝি" (মানিক গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড), পৃ : ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ওই পল্লীর অন্যান্য নারীরা মালার মতোই । ওই 'আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী'তে তাদের জীবন ধারনের জন্য কঠোর শ্রম দিতে হয় । পরিশ্রম ও দারিদ্র্যের পেষণে তাদের মন থেকে মানসিক কোমলতা অনুহিত হয় । 'অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কোন সন্তানের ছোট ছোট বিপদ-আপদের কথা ভাবিবারও যেমন তাহাদের সময় নাই, ওদের স্নেহ করিবার মত মানসিক কোমলতাও নাই । নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনি আসে অসভ্য উদাসীনতা । ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মড়াকান্না কাঁদে ।[১৬]

কেতুপুরের রসাতলের জীবনের শোচনীয়তার বর্ণনা দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নরূপেঃ

> জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোন দিন বন্ধ হয় না । ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসি কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না । এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণতর ভদ্র-মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ আসে শোক । টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয় । জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষন্ন । জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায় । আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয় , ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয় । ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে । এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।[১৭]

মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রসাতল বর্ণনা বিস্তৃত নয়, তবে এই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কেতুপুরের জেলে পল্লীর রসাতল স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ওই পল্লীর চার দিকের বিস্তৃত গ্রামে যেমন ঈশ্বর থাকে তেমনি মানুষও থাকে, আর কেতুপুরের এই রসাতলে বাস করে সভ্যতা, ধর্ম, সদাচার থেকে বহিস্কৃত আদিম পশু-মানুষেরা । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পারস্পরিক

---

১৬. "পদ্মা নদীর মাঝি" (মানিক গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড), পৃ ঃ ৩২ ।

১৭. "পদ্মা নদীর মাঝি" (মানিক গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড), পৃ ঃ ৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপের মধ্যদিয়েও আদিমতার রূপটি নির্দেশ করেছেন :

ক°　স্বামীকে মালা তাগিদ দিয়া বলে, আগো যুগইলা নি কিছু কয় ? কুবের তাহাকে চোখ ঠারিয়া বলে, কয় না ।

কী কয় ?

তা শুইনা তর কাম কী ? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক । পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস - রাও করস কেরে ?

.....

গাও জ্বালাইনা কথা দেহি খইর পারা কোটে, মায় নি মুখে মধু দিছিল আঁতুড়ে ?

গোসা হইলে মারুম গোপীর মা । মারবা নাকি ? আগো মার, মার - নাযদি মার লখার মাথা খাইবা ।[১৮]

মালা শেষে রাগিয়া বলে, ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান ? কবে কই নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মধ্যি থাইকা আইলাম, এউক্কা দিনের লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান ? যা, বেড়া গিয়া মাইজা কত্তার লগে - হারামজাদী বদ ।

কী কইলা মাঝি, কী কইলা ?

তারপর কী কলহই দুজনের বাধিয়া গেল ।..... শেষে রাগের মাথায় কুবের হঠাৎ কলিকাটা মালার গায়ে ছুড়িয়া মরিল । কলিকার আগুনে মালা ও তাহার কোলের শিশুটির গা স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল, কাপড়েও আগুন ধরিয়া গেল মালার ।[১৯]

কোমল অনুরাগ, সহিষ্ণুতা, প্রীতি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নেই । এসব চর্চার সুযোগ ও অবকাশ ওই দুঃস্থমানুষদের জীবনে নেই । তারা অকারণে কলহে লিপ্ত হয়, ক্রুদ্ধ হয়, ক্রোধ

১৮°　"পদ্মা নদীর মাঝি" (মানিক গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড), পৃ : ৩০ ।

১৯°　"পদ্মা নদীর মাঝি" (মানিক গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড), পৃ : ৮২-৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিবৃত্তির জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায় । স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে স্বামী পোষণ করে সন্দেহ, ওই সন্দেহের প্রকাশ ঘটায় কদর্য কলহে । এসবই তাদের চরিত্রের আদিমতাকে নির্দেশ করে । দারিদ্র্যের পাশাপাশি ওই জীবনে আছে যৌন ব্যভিচার । পরস্ত্রীর নামে কুৎসা রটনা করে কেতুপুরের পুরুষেরা এক ধরনের আনন্দ পায় । ওই জেলে পল্লীর সব পুরুষই ব্যভিচারে আগ্রহী, কিন্তু তারা পরস্ত্রীর ব্যভিচার নিয়ে কৌতুক করে এবং কুৎসা রটনা করে আদিম সুখ অনুভব করে । কেতুপুরের এক জেলে কন্যা ওই জেলেপল্লীরই এক পাশে জমিদারের মুহুরীর রক্ষিতা হিশেবে একসঙ্গে বসবাস করে চলে । এ-ব্যাপারটি জেলে সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে না কিংবা সমাজ-স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে না তারা । বরং এ-নিয়ে তারা পরিহাস কৌতুক করে চলে, এমনকী মেয়ের পিতার সামনেও পরিহাস করতে কুণ্ঠিত হয় না তারা । কুবেরের স্ত্রী গৌর বর্ণের সন্তান প্রসব করলে তার চরিত্র নিয়েও কানাকানি রসিকতা করতে থাকে প্রতিবেশীরা । প্রতিবেশী নকুল কুবেরকে এমন পরিহাসে বিদ্ধ করে, 'তুই ত দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরা-চাঁদ আইল কোয়ান থেইকা ? ঘরে ত থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু ।'[২০] ওই মানুষেরা যেমন দারিদ্র্য দিয়ে পরিবৃত হয়ে আছে, তেমনি আদিম কামও তাদের পরিবৃত করে রেখেছে । এই কামই কুবেরকে কপিলার দিকে আদিম শক্তিতে আকৃষ্ট করে এবং তাকে ওই রসাতলের বাস্তবতা থেকে উদ্ধার করে ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসটিতে রসাতলের বাস্তবতার অবিকল সম্পূর্ণ উপস্থাপন করেন নি । ওই বাস্তবতার খণ্ডিত উপস্থাপনার পরই উপন্যাসে প্রবেশ করে রোম্যান্টিকতা ও রহস্যময়তা । তবে "পদ্মা নদীর মাঝি"র প্রথমাংশ রসাতলের উপস্থাপন হিশেবে আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে অনন্য ।

২০· "পদ্মা নদীর মাঝি" (মানিক গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

র চ না প ঞ্জি

রচনাপঞ্জিতে বাঙলা বই দ্বৈত উর্ধ্বকমা ও প্রবন্ধ একক উর্ধ্বকমা দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে, এবং ইংরেজি বই নিম্নরেখাঙ্কিত করা হয়েছে ।

ক।। আলোচিত উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৩৩৫ "বেদে" । "অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড) । বিশেষ সংস্করণ ১৯৮০ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৩৭ "আকস্মিক"। "অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড)। বিশেষ সংস্করণ ১৯৮০ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৩৮ "বিবাহের চেয়ে বড়ো" । "অচিন্ত্যকুমার গ্রন্থাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড) । বিশেষ সংস্করণ ১৯৮০ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

১৩৩৮ "কাকজ্যোৎস্না" । "অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড) । বিশেষ সংস্করণ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৩৯ "প্রথম প্রেম" । "অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড) । বিশেষ সংস্করণ ১৯৮০, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

১৩৩৭ "আগুন নিয়ে খেলা" । "অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড)। ১৯৮৭ । বাণীশিল্প ও শ্যামলী, কলকাতা ।

১৩৩৮ "অসমাপিকা" । এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩২ "যার যেথা দেশ" । ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা ।

১৯৩৩ "অজ্ঞাত—বাস" । ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা ।

১৯৩৪ "কলঙ্কবতী" । ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ "দুঃখ মোচন" । ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা

১৯৪০ "মর্ত্যের স্বর্গ" । ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা ।

১৯৪২ "অনুসরণ" । ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা ।

গোপাল হালদার

১৯৩৯ "একদা"। গোপাল হালদার রচনাসমগ্র"(১) । ১৯৮৯ । এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪৪ "পঞ্চাশের পথ" । পুথিঘর, কলকাতা ।

১৯৪৭ "ভাঙন" । "ভাঙনীকূল" (বাংলাদেশ সংস্করণ) । পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৪ । মুক্তধারা, ঢাকা ।

১৯৫০ "স্রোতের দীপ" । পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৬ । মুক্তধারা, ঢাকা ।

১৯৫০ "উজান গঙ্গা" । পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৪ । মুক্তধারা, ঢাকা ।

১৯৫০ "অন্যদিন" । "গোপাল হালদার রচনাসমগ্র"(১) । ১৯৮৯ । এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

জগদীশগুপ্ত

১৯০০ "অসাধু সিদ্ধার্থ"। "জগদীশগুপ্ত রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড)। ১৩৮৫ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯২৯ "মহিষী" । জগদীশগুপ্ত রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ১৩৮৫ । গ্রন্থালয় প্রাইভেটড লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৩৮ "লঘু-গুরু" । "জগদীশগুপ্ত রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), ১৩৮৫। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৩৮ "দুলালের দেলা" । "জগদীশগুপ্ত রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), ১৩৮৫ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৩৮ "তাতল সৈকতে" । "জগদীশগুপ্ত রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), ১৩৮৫ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৩৮ "রোমন্থন" । "জগদীশগুপ্ত রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৩৯১ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ "নন্দ আর কৃষ্ণা" ।"জগদীশগুপ্ত রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৩৯৯ ।
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪৯ "রতি ও বিরতি" । "জগদীশগুপ্ত রচনাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৩৯৯ ।
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৩৮ "চৈতালী ঘূর্ণি" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণঃ
১৩৮৬। মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪০ "নীলকন্ঠ" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রনঃ ১৩৮২।
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪১ "রাইকমল" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রনঃ ১৩৮২।
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪২ "প্রেম ও প্রয়োজন"। তারাশঙ্কর রচনাবলী, (চতুর্থ খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণঃ
১৩৮৪ । মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ।

১৩৪৬ "ধাত্রী দেবতা" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণঃ
১৩৮৬ । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪৭ "কালিন্দী"। "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ ঃ ১৩৮২ ।
মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

১৩৪৮ "কবি" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী", (ষষ্ঠ খণ্ড) প্রপ্রঃ ১৩৮০ । মিত্র ও
ঘোষ, কলকাতা ।

১৩৪৯ "গণ দেবতা" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণঃ
১৩৮২ । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫০ "পঞ্চ গ্রাম" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (চতুর্থ খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণঃ
১৩৮৪। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

১৩৫০ "মন্বন্তর" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (পঞ্চম খণ্ড), প্র,প্রঃ ১৩৮০ ।
মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

১৩৫২ "সন্দীপন পাঠশালা" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (সপ্তম খণ্ড), দ্বিতীয়
মুদ্রণঃ ১৩৮৯ । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫৩ "ঝড় ও ঝরাপাতা" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (অষ্টম খণ্ড), প্র,প্রঃ ১৩৮১ । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

১৩৫৪ "হাসুলী বাঁকের উপকথা" । "তারাশঙ্কর রচনাবলী" (সপ্তম খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৩৮৯ । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

১৩৫৭ "পদচিহ্ন" । "তারাশঙ্কত রচনাবলী" (নবম খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৩৮৮ । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৫ "অনুশীলা" । "ধূর্জটি-প্রসাদ রচনাবলী" ১, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৫ । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

১৯৩৫ "আবর্ত" । "ধূর্জটি-প্রসাদ রচনাবলী"-১, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৫ । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

১৯৪৩ "মোহানা" । "ধূর্জটি-প্রসাদ রচনাবলী"-১, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৫ । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৩৫৩ "দ্বীপপুঞ্জ" । "নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), ১৩৮৩ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

? "উপনিবেশ"(দ্বিতীয় খণ্ড)। "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী"(দ্বিতীয় খণ্ড), ১৩৮৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা ।

? "উপনিবেশ"(প্রথম খণ্ড) । "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), ১৩৮৩ । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

১৩৫১ "তিমির-তীর্থ" । "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা বলী" (প্রথম খণ্ড) । প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৮৬ । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা

১৩৫২ "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী" । "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), ১৩৮৬ । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫২ "মন্দ্রমুখর" । "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী" (প্রথমখণ্ড), ১৩৮৬। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫৪ "বৈতালিক" । "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৬। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৯২৪ "পাঁক" । "প্রেমেন্দ্র রচনাবলী", (প্রথম খণ্ড), ১৩৮৭ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯২৮ "মিছিল" । "প্রেমেন্দ্র রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড) । ১৩৮৭ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩০ "আগামীকাল" । "প্রেমেন্দ্র রচনাবলী"(প্রথম খণ্ড), ১৩৮৭ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪৬ "কুয়াশা" । "প্রেমেন্দ্র রচনাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্কারণ : ১৩৮৭ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

? "উপনায়ন" । "প্রেমেন্দ্র রচনাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্করণ: ১৩৮৭ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

বনফুল

১৩৪২ "তৃণখণ্ড" । "বনফুল রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), বিশেষ সংস্করণ : ১৩৮১। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪৩ "বৈতরণী তীরে" । "বনফুল রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), বিশেষ সংস্করণ: ১৩৮৯ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪৪ "দ্বৈরথ" । "বনফুল রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), বিশেষ সংস্করণ : ১৩৮১। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪১ "রাত্রি" । "বনফুল রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্করণ : ১৩৮১। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫০ "জঙ্গম"(১ম খণ্ড) । "বনফুল রচনাবলী" (চতুর্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ : ১৩৮১ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪৫ "জঙ্গম"(২য় খণ্ড) । "বনফুল রচনাবলী" (চতুর্থ খণ্ড) । প্রথম প্রকাশ : ১৩৮১ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫৩ "অগ্নি" । "বনফুল রচনাবলী" (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ : ১৩৮২।
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৩৬ "পথের পাঁচালী" । "বিভূতি রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ মুদ্রনঃ
১৩৮৬ । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৩৮ "অপরাজিত"(প্রথম ভাগ) । "বিভূতি রচনাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড) । পঞ্চম
মুদ্রণ : ১৩৯০ । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

১৩৩৮ "অপরাজিত"(দ্বিতীয় ভাগ) । "বিভূতি রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), তৃতীয়
মুদ্রণঃ ১৩৮৩ , মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

১৩৪৫ "আরণ্যক" । "বিভূতি রচনাবলী" (পঞ্চম খণ্ড)। তৃতীয় মুদ্রণঃ ১৩৮৪।
মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪৭ "আদর্শ হিন্দু হোটেল" । বিভূতি রচনাবলী" (ষষ্ঠ খণ্ড) । তৃতীয় মুদ্রণঃ
১৩৮৫ । মিত্র ও ঘো প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪৮ "দুই বাড়ী" । "বিভূতি রচনাবলী" (দশম খণ্ড) । দ্বিতীয় মুদ্রণঃ ১৩৮৩ ।
মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ।

১৩৪৮ "বিপিনের সংসার" । "বিভূতি রচনাবলী" (ষষ্ঠ খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণঃ
১৩৮৫ । মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫০ "অনুবর্ত্তন" । "বিভূতি রচনাবলী" (সপ্তম খণ্ড) । তৃতীয় মুদ্রণঃ ১৩৮৭ ।
মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪৫ "কেদার রাজা" । "বিভূতি রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড)। তৃতীয় মদ্রণ :
১৩৮৩ । মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫৪ "অথৈজল" । "বিভূতি রচনাবলী" (একাদশ খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৮৬।
মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫৬ "ইছামতী" । "বিভূতি রচনাবলী" (দ্বাদশ খণ্ড) । দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৮৭।
মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৬৬ "অশনি-সংকেত" । ''বিভূতি রচনাবলী" (পঞ্চম খণ্ড)। চতুর্থ মুদ্রণঃ ১৩৯০। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ।

বুদ্ধদেব বসু

১৯৩১ "অকর্মণ্য বা একটি বাঙালী রুণ্ডিন" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ" প্রথম খণ্ড), ১৩৮১ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩২ "রডোডেনড্রন-গুচ্ছ" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৩৮২। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৩ "সানন্দা" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (তৃতীয়খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা ।

১৯৩৩ "হে বিজয়ী বীর" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (তৃতীয় খন্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯ । গ্রন্থালয় লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৩ "অসূর্যস্পশ্যা" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৩ "আমার বন্ধু" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ"(তৃতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৩ "যেদিন ফুটলো কমল" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ(তৃতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৩ "ধূসর গোধূলি" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (চতুর্থ খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৪ "রূপালি পাখি" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (ষষ্ঠ খণ্ড), ১৩৮৫। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৪ "একদা তুমি প্রিয়ে" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৪ "সূর্য্যমুখী" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৪ "লালমেঘ", । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (পঞ্চম খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৫ "বাসর ঘর" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (পঞ্চম খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৮ "পরিক্রমা" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (অষ্টম খণ্ড), ১৩৮৮। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪২ "কালো-হাওয়া" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (ষষ্ঠ খণ্ড), ১৩৮৫। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪৯ "তিথিডোর" । "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ(সপ্তম খণ্ড), ১৩৮৬। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৫ "দিবারাত্রির কাব্য" । মানিক গ্রন্থাবলী" (প্রথম খণ্ড), পঞ্চম সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৫ "জননী" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৭। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৬ "পদ্মা নদীর মাঝি" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (প্রথম খণ্ড), পঞ্চম সংস্করণঃ ১৩৮৯ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

? "প্রতিবিম্ব" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৭। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৬ "পুতুল নাচের ইতিকথা" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), ১৩৮৯ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৬ "জীবনের জটিলতা" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (প্রথম খণ্ড), পঞ্চম সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৩৮ "অমৃতস্য পুত্রাঃ" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), ১৯৮২। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০ "সহরতলী" (প্রথম পর্ব) । "মানিক গ্রন্থাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৭। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪১ "সহরতলী" (দ্বিতীয় পর্ব) । "মানিক গ্রন্থাবলী" (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৭। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪১ "ধরা-বাঁধা জীবন" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (চতুর্থ খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণঃ ১৩৮৫ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৪৮ "অহিংসা" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (চতুর্থ খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণঃ ১৩৮৫ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ।

১৩৫২ "সহরবাসের ইতিকথা" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (পঞ্চম খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫৩ "চিহ্ন" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (ষষ্ঠ খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮৭। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫২ "দর্পণ" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (পঞ্চম খণ্ড), বিশেষ সংস্করণঃ ১৩৮৯ । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫৩ "চিন্তামণি" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (ষষ্ঠ খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৩৮৭। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪৭ "আদায়ের ইতিহাস" । "মানিক গ্রন্থাবলী"(ষষ্ঠ খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৩৮৭। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৯৪৮ "চতুষ্কোণ" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (ষষ্ঠ খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৩৮৭। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

১৩৫৭ "জীয়ন্ত" । "মানিক গ্রন্থাবলী" (সপ্তম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণঃ১৩৮৯। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৩৩২ "ষোল আনা" । বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ।

সতীনাথ ভাদুড়ী

১৯৪৫ "জাগরী" "সতীনাথ গ্রন্থাবলী"-১, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৯৭৫। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫৬ "চিত্রগুপ্তের ফাইল" । "সতীনাথ গ্রন্থাবলী"-১। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৯৭৫। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

১৩৪০ "আকাশ ও মৃত্তিকা" । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা ।

খ॥ সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৩৫৭ "কল্লোল যুগ" । চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৩৬৬। ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা ।

অচ্যুত গোস্বামী

১৩৫৩ 'বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ততম অধ্যায়'। "পরিচয়", ১৬ঃ১, পৌষ।

অজিতকুমার চক্রবর্তী

১৩১৯ 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রহীন'? "প্রবাসী", আষাঢ়,১৩১৯।

১৩২৪ 'ভাবী সাহিত্য সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা' । "প্রবাসী", ১৭ ঃ ২ ঃ ১, কার্তিক।

১৩২৫ 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্বন্ধ' । "প্রবাসী" ১৮ঃ২ঃ১।

অজ্ঞাত নাম

১২৮০ 'প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন, সরোজিনী নাটক'।"বঙ্গ-দর্শন", ১৩৮০।

১৩০১ "সহযোগী সাহিত্য'। "সাহিত্য", ৫ঃ২, জ্যৈষ্ঠ ।

১৩৩২ 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'। "মানসী ও মর্মবাণী", ১৭ ঃ ২ ঃ ১, ভাদ্র।

১৩২৫ 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'। "সাহিত্য", ২৮ঃ৩, আষাঢ় ।

১৩৩৫ 'মদনের পুনর্জন্ম'। "শনিবারের চিঠি" পৌষ ।

১৩৩৫ 'ভূমিকা' । "শনিবারের চিঠি" পৌষ ।

১৩৩৬ 'অনুবির্বহারী'। "শনিবারের চিঠি" ভাদ্র।

১৩৪৬ 'অতি আধুনিক স্টাইল'। "শনিবারের চিঠি", বৈশাখ ।

১৩৫৫ 'কথাসাহিত্যে প্রকৃতিপন্থা' ।"বঙ্গদর্শন" ২ঃ১, আশ্বিন-ফাল্গুণ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪৭ 'কখগ (ত্র্যামিতিক গল্প)'। "শনিবারের চিঠি" কার্তিক ।

১৩৫১ 'বই সাহিত্যের অকৃত্রিম বিবরণ'। "বসুমতী" ২৩:১:৬, আশ্বিন।

অতুল চন্দ্র দত্ত

১৩২১ 'আমাদের জাতীয় শিল্প ও সাহিত্য সাধনা কোন পথে যাইবে ?' "প্রবাসী" ১৪:২:৪, মাঘ।

অনিলবরণ রায়

১৩৩৬ 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ'। "বিচিত্রা" ৩:১, ভাদ্র ।

অনিলা গোস্বামী

১৩৫৩ 'নূতন সাহিত্য' । "পরিচয়" ১৬:২, চৈত্র ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

১৯৪৪ 'বিনুর বই" । "প্রবন্ধ" প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৪। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলকাতা।

অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র

১৩৫৪ 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' । "পরিচয়" ১৭:২, মাঘ।

অমল হোম

১৩৩৩ 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' । "ভারতবর্ষ" ১৪:২:২, মাঘ ।

অরুণকুমার সিকদার

"আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস"। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

১৩৫৪ 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' । "পরিচয়" ১৭:১, পৌষ ।

১৩৫৪ 'বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য' । "পরিচয়" ১৭:২, চৈত্র ।

আশালতা সিংহ

১৩৪৪ 'বাস্তব ও কল্পনা' ।"পরিচয়', ৭:১, কার্তিক ।

আশীষ গুপ্ত

১৩৪০ 'আধুনিক সাহিত্য' । "বিচিত্রা", ৭:১, শ্রাবণ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

? 'অনুশীলার বিচার'। "ধুর্জটি প্রসাদ রচনাবলী"(১), প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৫ । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

কলমবাজ কালিরত্ন

১৩৩৬ 'অতি আধুনিক উপন্যাস' । "বসুমতী", ৮ঃ২ঃ৬, চৈত্র ।

কামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩০১ 'বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ' । "সাহিত্য", ৫ঃ৩, আষাঢ় ।

কামিনী রায়

১৩৩১ 'সাহিত্য ও সুনীতি'। "প্রবাসী", ৩২ঃ২, কার্তিক ।

কালিদাস রায়

? "সাহিত্য প্রসঙ্গ" (২য় খন্ড) । রসচক্র সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩২৫ 'গল্পসাহিত্যে তত্ত্বের খিচুড়ী' । "সাহিত্য", ২৮ঃ৩, আষাঢ়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

১৮৬১ "হুতোম প্যাঁচার নকশা"। পুর্নমুদ্রণ ১৩৪৪। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

ক্ষেত্রগুপ্ত

? "বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস" (প্রথম খন্ড) । গ্রন্থনিলয়, কলকাতা ।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১৩৪২ 'বঙ্গসাহিত্যের বাণী' । "ভারতবর্ষ", ২৩ঃ১ঃ৬, অগ্রহায়ণ ।

গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৫৪ 'পলিটিক্স ও সাহিত্য' । "বসুমতী", ২৬ঃ২, অগ্রহায়ণ ।

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

১৩৩৪ 'সাহিত্য ধর্ম্ম' । "বঙ্গবাণী", ৬ঃ দ্বিতীয়ার্ধঃ ১, ভাদ্র ।

গোপালচন্দ্র রায় (সম্পাদক)

১৯৫৪ "শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স, কলিকাতা ।

গোপাল হালদার

১৯৭৮ "সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সাহিত্য ও সাধনা" । অয়ণ, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

১৩৫৩ 'প্রচারবাদী সাহিত্য' । "পরিচয়", ১৫ঃ২ঃ৬, আষাঢ় ।

চিন্মোহন সেহানবীশ

১৩৫৩ "সাহিত্য ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা' । "পরিচয়", ১৬ঃ২, মাঘ ।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩২৫ 'ন্যাসপতি ও নবন্যাস' । "সাহিত্য", ২৮ঃ৩, আষাঢ় ।

তারকনাথ সাধু

১৩৩৯ 'বাথরুম বা অসংযত সাহিত্য' । "বসুমতী", ১১ঃ২ঃ৪, মাঘ ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৫১ 'আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ' । "বসুমতী", ২৩ঃ২ঃ৫, ফাল্গুন ।

১৩৫১ 'মন্বন্তর ও সাহিত্য' । "ভারতবর্ষ", ৩২ঃ২ঃ৪, চৈত্র ।

১৩৮৭ "স্মৃতিকথা" (প্রথম খণ্ড)। নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা।

দীনেশচন্দ্র সেন

১৩২৭ 'দেশী ও বিদেশী' । "প্রবাসী", ২০ঃ১ঃ১, বৈশাখ ।

দীপ্তি ত্রিপাঠী

১৯৫৮ "আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়" । তৃতীয় সংস্করণ, ঃ ১৯৮৪ ।। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

দেবপ্রসাদ ঘোষ

১৩৪৩ 'বঙ্গ সাহিত্যে অর্বাচীন যুগ' । "বসুমতী", ১৫ঃ২ঃ৫, ফাল্গুন ।

১৩৪৯ 'সাহিত্যে প্রলাপ ও বিলাপ' । "বসুমতী", ২১ঃ১ঃ১, বৈশাখ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৯৮০ "ভারতীয় দর্শন" (আদি পর্ব) । পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮০ । কে পি বাগচী এ্যান্ড কোং, কলিকাতা ।

ধনঞ্জয় দাশ

১৯৭৫ "মার্কসবাদী সাহিত্য বির্তক'"। প্রথম খণ্ড, প্রাইমা পাবলিকেশন্সঃ কলিকাতা ।

১৩৮২ "মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক" । (দ্বিতীয় খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৩৮৮। নতুন পরিবেশ প্রকাশনী ঃ কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮৫ "মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক" । তৃতীয় খণ্ড । দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৭। নতুন পরিবেশ প্রকাশনী : কলকাতা ।

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১৩৪৩ 'উপন্যাস পাঠ' । "বসুমতী", ২৫:১:৪, শ্রাবণ ।

ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

১৩৩৫ 'বাঙ্গালার কথা সাহিত্য' । "বসুমতী", ৭:২:৩, পৌষ ।

ধীরেন্দ্রনাথ রায়

১৩৫৩ 'পাঠক গোষ্ঠী' ।"পরিচয়" ১৬:২, ফাল্গুন ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৩৩৫ 'সমাজ ধর্ম ও সাহিত্য' । ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৪)-তে সংকলিত ।

১৩৪৪ 'প্রগতি' । ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৫)-তে সংকলিত ।

১৩৬৪ "বক্তব্য"। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ।

নরহরি কবিরাজ

১৯৫৪ "স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা" । মনীষা, কলকাতা ।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

? 'সাহিত্য ধর্ম্মের সীমানা' । "যুগপরিক্রমা", ১৯৬১, সেনগুপ্ত ট্রাস্ট, কলিকাতা।

১৩৩১-৩২ 'বাঙ্গালার কথার আভিজাত্য' । "বঙ্গবাণী", ৪ প্রথমার্ধ : ৫ ।

১৩৬৮ "যুগ পরিক্রমা" । সেনগুপ্ত ট্রাস্ট, কলিকাতা ।

নলিনীকান্ত গুপ্ত

১৩২৬ 'বিশ্বসাহিত্য' । "প্রবাসী", ১৯:১:১, বৈশাখ ।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী

১৯৮০ "বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি" । বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৫৫ 'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য' । ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৫)-তে সংকলিত ।

নিত্যকৃষ্ণ বসু

১৩১০ 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' । "সাহিত্য", ১৪:১০, মাঘ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৩৫২ 'বাংলার তামসিক সাহিত্য' । ভারতবর্ষ, ৩৩ঃ১ঃ৪, আশ্বিন ।

পুলকেশ দে সরকার

১৩৪৯ 'আমাদের সাহিত্য' । "পরিচয়", ১২ঃ২, চৈত্র ।

পূর্ণচন্দ্র বসু

১২৮৪ 'শৈবলিনী' । "আর্য্যদর্শন" (চতুর্থ খণ্ড), ভাদ্র,১২৮৪।

প্রবোধচন্দ্র শর্মা

১৩৮৬ "মায়াবাদ" । পুনর্মুদ্রণ । বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ।

প্রভাতকুমার দত্ত

১৩৫৩ 'পাঠক গোষ্ঠী' । "পরিচয়", ১৬ঃ২, ফাল্গুন ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৩৪৩ "রবীন্দ্র জীবনী" (দ্বিতীয় খণ্ড) । চতুর্থ সংস্করণ ঃ১৩৮৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৩৫ 'সাহিত্যে যুগ প্রবর্ত্তন' । "মানসী ও মর্মবাণী", ২০ঃ১ঃ৫, আষাঢ় ।

প্রমথ চৌধুরী

১৩২১ 'বস্তুতন্ত্র বস্তু কি'? "প্রবন্ধ সংগ্রহ", পুনর্মুদ্রণ ১৯৬১ । বিশ্বভারতী ।

প্রমথনাথ বিশী

১৩৪৬ 'স্বপ্নবাদ বনাম বাস্তববাদ'। "শনিবারের চিঠি", ১১ঃ১, বৈশাখ ।

১৩৫৪ 'গণ সাহিত্য' । "বঙ্গ-দর্শন", ১ঃ১ঃ২, আদ্র ।

প্রমথনাথ শর্মা

১৩৫০ "মায়াবাদ" । পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৩৮৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৬ 'উত্তরচরিত' । " বিবিধ প্রবন্ধ" (প্রথম খণ্ড), "বঙ্কিম রচনাবলী" (২য় খণ্ড), ১৩৬১। সাহিত্য, সংসদ, কলিকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

? 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' । ওই ।

১২৮৭ 'ঋতুবর্ণন' । ওই ।

১২৮৪ 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' । ওই ।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৩২৫ 'পুরাতন বনাম নতুন বাঙ্গালা সাহিত্য' । "প্রবাসী", ১৮:২:৪, মাঘ ।

বসন্তকুমার ভৌমিক

১৩৪২ 'উপন্যাসের উপাদান' । "ভারতবর্ষ", ২৩:১: ৬, অগ্রহায়ণ ।

বসুধা চক্রবর্তী

১৩৪৮ 'সাহিত্যের দিগদর্শন' ।"পরিচয়", ১১:১, আশ্বিন ।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৩৪০ "জীবনবাণী" । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স, কলিকাতা ।

বিনয় ঘোষ

১৩৫৩ 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য '। "পরিচয়", ১৬:১, আশ্বিন ।

বিপিনচন্দ্র পাল

১৩১৮ 'চরিত-চিত্র রবীন্দ্রনাথ' । "বঙ্গদর্শন", ১১:১২, চৈত্র, ১৩১৮ ।

বিপিনবিহারী গুপ্ত

১৩১৭ 'সাহিত্যে সুরুচি' । "প্রবাসী", ১০:১:৪, শ্রাবণ ।

বিভূতিভূষণ ঘোষাল

১৩৩৫ 'সাহিত্য ও আর্ট' । "বিচিত্রা", আষাঢ় ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৫৩ 'সাহিত্যে বাস্তবতা' । "বিভূতি-রচনাবলী" (১২শ খণ্ড), ১৩৭৯। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

১৩৩৪ 'সাহিত্য ও রস' । "বঙ্গবাণী", ৬: দ্বিতীয়ার্ধ :৪, অগ্রহায়ণ ।

বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায়

১৩৫৪ 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য' । "পরিচয়" ১৭:১, পৌষ ।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধদেব বসু

১৩৩৪ 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য'। "বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ" (৩য় খণ্ড), ১৯৭৬। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

১৯৩৩ 'আর্টে রিয়ালিজম'। ওই (৫ম খণ্ড), ১৩৮৪। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

১৯৩৮ 'সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য : আধুনিক লেখকদের অবস্থা'। ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৪)-তে সংকলিত।

ব্রজদুর্লভ হাজরা

১৩৩৪ 'রস ও রুচি'। "প্রবাসী", ২৭:১:৬, আশ্বিন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৪৪ "নববাবু বিলাস" : ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক)

১৩৪৭ "আলালের ঘরের দুলাল" : টেকচাঁদ ঠাকুর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

? 'উত্তরচরিত' গ্রন্থের সমালোচনা'। "বিবিধ প্রবন্ধ" (প্রথম ভাগ), ২য় সংস্করণ, ১৩২২। চুঁচড়া বোধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

? 'মৃচ্ছকটিক' গ্রন্থের সমালোচনা'। ওই।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯৪৫ 'সাহিত্যে প্রগতি'। ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৫)-তে সংকলিত।

১৯৪৫ 'প্রোলেটারীয় সাহিত্যের স্বরূপ'। ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৫)-তে সংকলিত।

ভোলানাথ ঘোষ

১৩৪৫ 'সাহিত্যিক প্রশ্নোত্তর'। "ভারতবর্ষ", ২৬:১:৪, আশ্বিন।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

১৩২৫ 'সাহিত্যে ভাববিপর্যয়'। "সাহিত্য", ২৮:১১, ফাল্গুন।

মহীতোষকুমার রায়চৌধুরী

১৩২৭ 'সাহিত্যে পতিত'। "ভারতী", ৪৪:৩, আষাঢ়।

Dhaka University Institutional Repository

মাখনলাল মুখোপাধ্যায়

১৩৫০ 'শরৎ সাহিত্যে বাস্তবতার শৈলী' । "ভারতবর্ষ", ৩১ঃ ১, আষাঢ় ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৫৬ 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'। ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮২)-তে সংকলিত।

মোহিতলাল মজুমদার

১৩৪৯ "সাহিত্য বিতান"। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়ঃ কলিকাতা ।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ

১৩৩১ 'বঙ্গে শারদীয় সাহিত্য সম্মেলন'। মানসী ও মর্মবাণী, ১৬ঃ২ঃ২, আশ্বিন ।

১৩৩১ 'সাহিত্য বিচার'। "মানসী ও মর্মবাণী" , ১৬ঃ২ঃ৩ঃ, কার্তিক ।

১৩৩১ 'আর্টের অনুশাসন'। "মানসী ও মর্মবাণী, ১৭ঃ১, চৈত্র ।

১৩৩২ 'সাহিত্য ও সত্য'।"মানসী ও মর্মবাণী", ১৭ঃ২ঃ৫, পৌষ ।

১৩৩৩ 'সাহিত্যিক গবেষণা'। "মানসী ও মর্মবাণী", অগ্রহায়ন ।

রনেন মজুমদার

১৩৪৭ 'ভ্রান্ত রিয়ালিজম'। "পরিচয়", ৯ঃ২, আষাঢ় ।

রবিন পাল

১৯৮০ "কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ"। প্রতিভূমি পাবলিশিং, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩২১ 'বাস্তব'। "সাহিত্যের পথে"। পুর্নমুদ্রন ১৩৮৮। বিশ্বভারতী, কলকাতা ।

১৩২১ 'লোকহিত'। "কালান্তর", "রবীন্দ্ররচনাবলী" (২৪শ খন্ড),১৩৫৪। ওই ।

? 'কবির কৈফিয়ৎ'। "সাহিত্যের পথে"। পুর্বোক্ত।

? 'সাহিত্য ধর্ম'। ওই ।

১৩৩৪ 'সাহিত্য নবত্ব'। ওই ।

১৩৩৪ 'সাহিত্য ধর্ম'। ওই ।

১৩৩৫ 'সাহিত্যরূপ'। ওই ।

১৩৩৫ 'সাহিত্য সমালোচনা'। ওই ।

১৩৩৬ 'সাহিত্যবিচার'। ওই ।

Dhaka University Institutional Repository

? 'আধুনিক কাব্য'। ওই ।

১৩৩৬ "শেষের কবিতা"। পুর্নমুদ্রন ১৩৭৪। বিশ্বভারতী, কলকাতা ।

১৩৩৯ 'নূতন শ্রোতা'-২। "পরিশেষ", "রবীন্দ্ররচনাবলী(২৫শ খন্ড)।বিশ্বভারতী,কলকাতা।

১৩৪০ "বাঁশরী"। " রবীন্দ্ররচনাবলী" (২৪শ খন্ড) । পুর্নমুদ্রন ১৩৮৪।
বিশ্বভারতী, কলকাতা ।

১৩৪১ "শ্রাবন-গাথা"। "রবীন্দ্ররচনাবলী"(২৫শ খন্ড)। ১৩৫৫। বিশ্বভারতী,কলকাতা।

? 'মানবপ্রকাশ'। "সাহিত্য"। পুর্নমুদ্রন ১৩৮১। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

১৯৬০ "ছিন্নপত্রাবলী"। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

১৩৭০ "চিঠিপত্র"(৮ম খন্ড)। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

১৩৮০ 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি ধুর্জটিপ্রসাদকে'। "দেশ", সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮০।

১৩৮১ 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি বুদ্ধদেব বসুকে'। "দেশ", সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১।

রমাপ্রসাদ চন্দ

১৩২১ 'সবুজ সাহিত্য'। " সাহিত্য ", ২৫ঃ২, জ্যৈষ্ঠ ।

রমেশচন্দ্র দত্ত

১৮৯৪ "সমাজ"। "রমেশ রচনাবলী", দ্বিতীয় সংস্করন ১৯৭০।সাহিত্য সংসদ,কলকাতা।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

১৩২১ 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক'। "বর্তমান বাঙালা সাহিত্য" , প্রকাশ কাল নেই।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স, কলিকাতা।

১৩২১ 'সাহিত্যে বাস্তবতা'। ওই ।

১৩২২ 'সাহিত্য ও স্বদেশ'। ওই ।

রাধারানী দত্ত

১৩৩৬ 'আমাদের সমাজ ও সাহিত্য'। "ভারতবর্ষ", ১৬ঃ২ঃ৬ঃ, জ্যৈষ্ঠ ।

লক্ষীনারায়ন

১২৮৪ 'চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী'। "আর্য্যদর্শন", পৌষ ১২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

লেনিন, ভ, ই

১৯৭৬ "সাহিত্য প্রসংগে"। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

লোকনাথ চক্রবর্তী

১২৮৪ 'শৈবলিনী চরিত্র সমালোচনা'। "আর্য্যদর্শন"। ১২৮৪।

১২৮৪ 'আনুসাংগিক পত্র'। "আর্য্যদর্শন", পৌষ ১২৮৪।

শঙ্কর ঘোষ

১৯৭৫ "স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন", সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

শঙ্খ ঘোষ

১৩৮৯ "নির্মাণ আর সৃষ্টি"। বিশ্বভারতী।

শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যায়

১৩৩০ 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত'। "শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ" (৮ম সম্ভার, প্রকাশকাল নেই। এম সি সরকার এন্ড সন্স লিঃ, কলকাতা।

১৩৩১ 'সাহিত্য ও নীতি'। ওই।

১৩৩৪ 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'। ওই।

১৩৩৬ 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি'। ওই।

? 'মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে কথোপকথন'। "শরৎ সাহিত্যসংগ্রহ", (১৩শ সম্ভার)। এম সি সরকার এন্ড সন্স, কলিকাতা।

শান্তি বসু

১৩৫৭ 'সংগ্রামী সাহিত্য'। ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮২) তে সংকলিত।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১৩৩৫ 'সাহিত্যে আধুনিকতা'। "বিচিত্রা", শ্রাবণ।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১৩৩৮ 'সাহিত্য ও জীবন'। "প্রবাসী", ৩১ঃ২ঃ১, কার্তিক।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৩৩ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ'। "বঙ্গবাণী", ৫ঃ দ্বিতীয়ার্ধ ঃ ২, আশ্বিন

১৩৭২ "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"। ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৩৮০। মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সজনীকান্ত দাস

১৩৪৭ 'যুগ সাহিত্য' । "শনিবারের চিঠি" ১২শ বর্ষ, বৈশাখ ।

১৩৬১ 'আত্মস্মৃতি" (প্রথম খণ্ড) । ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা ।

১৩৬৩ "আত্মস্মৃতি" (দ্বিতীয় খণ্ড)। ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা ।

সত্যসুন্দর দাশ

১৩৩১ 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' । "বঙ্গশ্রী" ১:১, আষাঢ় ।

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

১৩৩৬ 'সাহিত্য ও সমাজ' । "বসুমতী" ৮:১:৩, আষাঢ় ।

সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

১৩৪০ 'সাহিত্যের আবহাওয়া' ।"বঙ্গশ্রী" ২:১:১, মাঘ ।

সমর সেন

১৯৪০ 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' । ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৫)-তে সংকলিত ।

সরোজ কুমার দত্ত

১৯৩৯ 'ছিন্ন কর ছদ্মবেশ' । ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৫)-তে সংকলিত ।

১৯৪০ 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' । ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৫)-তে সংকলিত ।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬২ "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর" । দে'জ সংস্করণ ১৯৮০, দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা ।

সীতা দেবী

১৩৪০ 'বাস্তব' । "প্রবাসী" ৩৩:১, ভাদ্র ।

১৩৪১ 'সাহিত্যের ভাষাও বস্তু' । "প্রবাসী" ৩৪:২, মাঘ ।

সীতাংশু মৈত্র

১৩৫৪ 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' । "পরিচয়" ১৭:২, ফাল্গুন ।

সুকুমার সেন

১৩৬৫ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (চতুর্থ খণ্ড) । বর্ধমান সাহিত্য সভা ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১৯৩৬ 'সূর্যাবর্ত' । "সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর প্রবন্ধসংগ্রহ", ১৩৯০ । হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

সুধীর চন্দ্র কর

১৩৫২ 'আধুনিক বাস্তব সাহিত্য'। প্রবাসী, ৪৫:১, শ্রাবণ।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

১৩৪৪ 'সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা'। ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮৫)-তে সংকলিত।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

১৩৪৫ 'আধুনিক সাহিত্যের উৎসমূল'। "প্রবাসী" ৩৮:১, বৈশাখ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩২৭ 'বাংলার নতুন সাহিত্য ও তরুণ সম্প্রদায়'। "প্রবাসী" ২০:১:৪, শ্রাবণ।

সুশীলকুমার দে

১৩৪১ 'বর্তমান সাহিত্য সংকট'। "বঙ্গশ্রী" ২:১:৪, বৈশাখ।

সুদেশ বসু

১৩৫৬ 'প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা'। ধনঞ্জয় দাশ (১৩৮২)-তে সংকলিত।

হিরণকুমার সান্যাল

১৩৫৩ 'পত্রিকা প্রসঙ্গ'। "পরিচয়" ১৬:১, পৌষ।

হুমায়ুন কবীর

১৩৩৯ 'সাহিত্যে বাস্তবতা'। "পরিচয়" ১:২, কার্তিক।

হেমচন্দ্র রায়

১৩৩৫ 'নাগরিক সাহিত্য'। "বিচিত্রা" ২:১, ভাদ্র।

Abrams, M.H.

1958 The Mirror and the Lamp. Norton and Co., New York.

Alexis, Paul

1891 'Naturalism is not Dead'. In Becker (ed, 1963).

Allot, Miriam

1959 Novelists on the Novel. New Edition, 1973. Columbia University Press, New York.

Baldwin, J.M. (ed.,)

1902 Dictionary of Philosophy and Psychology. Macmillon, New York.

Dhaka University Institutional Repository

Baldwin, J.M.(ed.,)

1911 Dictionary of Philosophy and Psychology. vol 1. Macmillon, New York.

Bazan, Emilia Pardo

1881 'On spanish Realism'. In Becker (ed. 1963).

Becker, George J.(Ed.,)

1963 Documents of Modern Literary Realism.Princeton University Press: New Jecrey.

Belinsky, Vissaran

1835 'On Realistic Poetry'. In Becker (1963).

Belyaev, Albert

1978 The Idiological Struggle and Literature. Progress Publishers, Moscow.

Bersane, Leo

1970 Balzac to Beckett. Oxford University Press: New York.

Carter, Everett

1950 Howells and the Age of Realism. New Edition, 1954. J.B. Lippin,Colt Co., New York.

Chernishevsky, N.G.

1853 'Life and Aesthetics'. In Becker (ed., 1963).

Cowley, Malcolm

1947 'A Natural History of American Naturalism'. In Becker (ed.,1963).

Cuddon, J.A. (ed.,)

1977 A Dictionary of Literary Terms. Penguin Books, U.K.

Desnoyers, Fernand

1855 'On Realism'. In Becker (ed., 1963).

Dhaka University Institutional Repository

Donald, Batler

1964 Four Philosophies. Harper and Row, London.

Dreiser, Theodore

1903 ' The Art Speaks Plainly'. In Becker (ed., 1963).

Duranty, Edmond, and Sainte-Beuve, C.A.

1857 'Two View of Madame Bovary'. In Becker (ed., 1963).

Edwards, Paul (ed.,)

1962 The Encyclopedia of Philosophy. Vol.7and8. Macmillon, New York.

Eliot, George

1859 'On Realism', In Becker (ed., 1963).

Ellmann, Richard and Charles Feidelson(eds.)

1965 The Modern Tradition. 7th Printing, 1977. Oxford University press, New York.

Engles, Friedrich

1888 'On Socialist Realism'. In Becker (ed., 1963).

Flaubert, Gustave

1926-1933 'On Realism'. In Becker (ed., 1963).

Forester, Norman (ed.,)

1957 American Poetry and Prose. 3rd Edition, 1957; 4th 4th Edition, 1977. Haughton Mifflin Co., Boston.

Forster, E.M.

1927 Aspects of the Novel. Reprinted 1963. Penguin.

Goncourt, Edmond de

1879 'Levels of Realism'. In Becker(ed., 1963).

Goncourt, Edmond and Concourt, Jales de

1865 'On True Novels'. In Becker (ed., 1963).

Gorky, Maxim

? On Literature. Progress Publishers, Moscow.

Gosse, Edmond

1890 'The Limits of Realism'. In Becker (ed., 1963).

Hoffman, Frederick J.

1951 The Modern Novel in America. Henry Regnery Co., Chicagu.

Hall, L. Sargent (ed.,)

1965 A Grammar of Literary Criticism. Macmillan Company, New York.

Hosper, Jbhn

1956 An Introduction to Philosophical Analysis. Revised Edition, 1970. Routledge and Kegan paul ltd, U.K.

Hart, Heinrich and Hart, Julius

1882 'For and Against Zola'. In Becker (ed., 1963).

Huysmans, J.K.

1876 'Emile Zola and L'Assommoir'. In Becker (ed., 1963).

Howells, W.D.

1891 'On Truth in Fiction'. In Becker (ed., 1963).

Hosper, John

1970 An Introduction to Philosophical Analysis. Routledge and Kegan Paul, U.K.

Jadurath Sinha

1956 A History of Indian Philosophy. Vol. I. Sinha Publishing House, Calcutta.

James, Henry

1934 The Art of the Novel. Charles Scribner's Sons, New York.

Kovacevic, Ivanka

1975 Fact in Fiction : English Literature in the Industrial Scene. Leicester University Press.

Kulikova, I and Zis, A. (eds.)

1976 Marxist , Leninist Aesthetics and Life. Progress Publishers, Moscow.

Levin, Harry

1966 The Gates of Harn ! A Study ofv Five French Realists. Oxford University Press. New York.

Larkin, Maurice

1977 Man and Society in Nineteenth Century Realism. Macmillan Press, U.K.

Lilly, W.S.

1885 'The New Naturalism'. In Becker (ed., 1963).

Lemonnierv Leon

1929 'A Literary Manifesto : The Populiest Novel'. In Becker (ed., 1963)

Mirsky, D.S.

1964 A History of Russian Literature. Edited and Abridged by F.J. Whitificld. Routledge and Kegan Paul, London.

Markov, Dmitry

1978 Socialist Literature : Problems of Development. Raduga English trauslatin 1984. Raduga Publishers, Moscow.

Maupassant, Guy de

1882 'The Lower Elements'. In Becker (ed., 1963).

Dhaka University Institutional Repository

National Vigilence Association

1889 'Permicious Literature'. In Becker (ed., 1963).

Nochlin, Linda

1971 Realism : Style and Civilization. 2nd Edition, 1985. Penguin Books, England.

Nikunja Vehari Banerjee

1975 The Spirit of Indian Philosophy. Curzon Press, London.

Patrick, George Thomas White

1925 Introduction to Philosophy. Revised Edition, 1961. George Allen and Unwin Ltd, London.

Rosenthal, M, and P. Yudin (eds.)

1967 A Dictionary of Philosophy. Progress Publishers, Moscow.

Reese, William L.

1980 Dictionary of Philosophy and Riligion. Humanities Press, New Jersey.

Rahv, Philip

1949 'Notes on the Decline of Naturalism. In Becker (ed., 1963).

Rosney, J. Hetal

1887 'The Manifesto of Five against La Terre'. In Becker (ed., 1963)

Sarvapalli Radhakrishnan and Charles A. More (eds.)

1957 The Source Book of Indian Philosophy. Princeton University Press, New Jersey.

Dhaka University Institutional Repository

Selden, Roman

1985 A Readers' Guide to Contemporary Literary Theory. Harvester Press, Sussex.

Stromberg, Roland N.

1968 Realism, Naturalism and Symbolism : Modes of Thought in Europe, 1848-1914. Macmillon, London.

1975 An Intellectual History of Modern Europe. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.

Taine, Hippolyte

1858 'The World of Balzac'. In Becker (ed., 1963).

Wagenknecht, Edward

1952 Cavalcade of American Novel. Indian Edition, 1969. Oxford and I.B.H. Publishing Co. Delhi.

Walcutt, C. Child

1956 American Literary Naturalism. A Divided Stream. University of Minnesota Press, Minneapolis.

Watt, Ian

1957 The Rise of the Novel. New Edition, 1963. Penguin Books, England.

Wellek, Rene

1963 Concepts of Criticism. Yale University Press, New Haven.

1966 A History of Modern Criticism : 1750-1950. Jonathan Cape, London.

Dhaka University Institutional Repository

Whitefield, J.H.

1962 A Short History of Italian Literature. Carsell and Co., London.

Zis, A. Lyubimova, T. and Ovsyannikov, M. (eds.,)

1984 Problems of Contemporary Aesthetics. Raduga Publishers, Moscow.

Zola, Emile

1880 'Naturalism in the Theatre'. In Becker (ed., 1963).

1871 'On the Rougan - Macquart Series'. In Becker (ed., 1963).

1880 'The Experimental Novel'. In Becker(ed., 1963).